পাক পাঞ্জতন

অর্থাৎ

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাল্‌ঃ), হজরত
আলী (কঃ—ওঃ), হজরত ফাতেমাঃ
যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত
এমাম হাছন (রাজিঃ) ও হজরত
এমাম হোছেন (রাজিঃ)
এর পবিত্র বৃহৎ জীবনী।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাল্‌ঃ)-এর জীবন-চরিত, হজরত ফাতেমাঃ
যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবন-চরিত, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-
এর জীবন-চরিত, এসলাম-তত্ত্ব, প্রভৃতি বহু পুস্তক-পুস্তিকা
প্রণেতা, সুধাকর, সোলতান, নবযুগ এছলাম প্রচারক
প্রভৃতি দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্রের
প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক বা সহযোগী সম্পাদক,
বঙ্গ-বিখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিক

মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ প্রণীত।

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

পাক পাঞ্জতনের সূচীপত্র

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ)-এর জীবনী।

দ্বিতীয় ভাগ।

হজরত আলী মরতুজা (কঃ—ওঃ)।

বিষয় । পৃষ্ঠা ।

বিষয় | | পৃষ্ঠা।

তৃতীয় ভাগ।

খাতুনে-জন্নত হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবনী।

বিষয় পৃষ্ঠা।

চতুর্থ ভাগ।

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর জীবন চরিত।

পঞ্চম ভাগ।

হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর জীবনী।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

পাক পাঞ্জতন

অর্থাৎ

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ), হজরত
আলী (কঃ—ওঃ), হজরত ফাতেমাঃ
যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত
এমাম হাছন (রাজিঃ) ও হজরত
এমাম হোছেন (রাজিঃ)
এর পবিত্র বৃহৎ জীবনী।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ)-এর জীবন-চরিত, হজরত ফাতেমাঃ
যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবন-চরিত, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-
এর জীবন-চরিত, এসলাম-তত্ত্ব, প্রভৃতি বহু পুস্তক-পুস্তিকা
প্রণেতা, সুধাকর, সোলতান, নবযুগ এছলাম প্রচারক
প্রভৃতি দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্রের
প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক বা সহযোগী সম্পাদক,
বঙ্গ-বিখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিক

মুন্শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রণীত।

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

প্রকাশক :—

মনিরুদ্দীন আহ্মদ

৩৩৭ নং আপার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩৩৬ সাল, বৈশাখ।

কলিকাতা, ১৫৫ নং মস্জিদবাড়ী ষ্ট্রীট্

সোলেমানী প্রেসে

মোহাম্মাদ সোলেমান দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

গ্রন্থকারের আত্ম-পরিচয় ও আত্ম-নিবেদন,—

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ এব্‌নে মুন্‌শী মায়যুদ্দীন আহ্‌মদ মরহুম, জন্মস্থান—কাউনিয়া, বরিশাল টাউন। পূর্ব্ব পুরুষদিগের বাসস্থান রাঙ্গামাইলা, জেলা ঢাকা। অধীন থাকছার সমাজের একজন অধম 'তাবেদার' ও ক্ষুদ্রতম সেবক। লেখক বিগত ৫০ বৎসর যাবৎ যে, সমাজের সেবা ও বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিতেছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। মোসলেম-বঙ্গ-সাহিত্যের অন্ধকার যুগে যখন অত্যল্প সংখ্যক মোছলমান, বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন; সেই সময় এই অধম সমাজ-সেবকের প্রাণে বঙ্গ-সাহিত্যালোচনার ইচ্ছা বলবতী হয়। অধীনের বিদ্যা, সাধারণ বাঙ্গালায় সীমাবদ্ধ—মধ্য-বাঙ্গালা অর্থাৎ ছাত্রবৃত্তি ক্লাস পর্য্যন্ত; পরে কিঞ্চিৎ উর্দ্দু। আমার শৈশবাবস্থায়—১২৭৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস ১লা রমজান্নুল-মবারক শুক্রবার প্রত্যুষে, মদীয় পরম শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ মাজেদ বরিশাল—কাউনিয়াস্থ স্বীয় বাস-ভবনে এন্তেকাল করেন। ১২৯৪ সালের চৈত্র মাসে পরম শ্রদ্ধাভাজন জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার পরলোক গমনে আমাকে বিদ্যালয়ের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হয়। তখন বঙ্গীয় মোস্‌লেম-সাহিত্যক্ষেত্রে মীর মশাররফ্ হোছেন সাহেবেরই প্রধানতঃ প্রভাব দৃষ্ট হইত। আর মৌলবী নয়ীমুদ্দীন মরহুম, মৌলবী আনিছুদ্দীন আহ্‌মদ মরহুম, খান বাহাদুর মৌলবী তছলিমুদ্দীন আহ্‌মদ মরহুম,

পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ মাশ্‌হাদী মরহুম, খান বাহাদুর মৌলবী আবদুল আযিয্‌ মরহুম, মৌলবী আবদুল হামিদ খান ইউছফ্‌জয়ী মরহুম, ছৈয়দ আবদুল আগ্‌ফর মরহুম, মৌঃ নওশের আলী খান ইউছফ্‌ জয়ী মরহুম, কবিবর মোজাম্মেল হক্‌ ছাহেব, খান বাহাদুর মৌলবী একিমুদ্দীন আহ্‌মদ ছাহেব, মুন্‌শী ওহাজুদ্দীন আহ্‌মদ মরহুম, মুন্‌শী শেখ আবদুর রহিম ছাহেব-প্রমুখ মুষ্টিমেয় মোছলেম-সাহিত্যিকের পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়। অধীন ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত রূপসা গ্রামে স্বীয় পরম আত্মীয় মহাপরাক্রান্ত ও দাতাগ্রগণ্য আদর্শ জমীদার চৌধুরী মোহাম্মদ গাজী মরহুম মগ্‌ফুরের পরিবারভুক্তরূপে, তদীয় আশ্রয়ে থাকিয়া প্রথমে একটি পাঠশালার পরিচালন-ভার গ্রহণ করে; তৎকালে ঐ অঞ্চলে বাংলা বা ইংরাজী স্কুলের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। জমীদারী মক্তবে, সরকারী জায়গীরে, দুইজন অতি বিদ্বান্‌ মুন্‌শী ছাহেবের অধ্যাপকতায় ঐ মক্তব প্রায় ৫০ জন ছাত্রকে আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। আরবী অর্থে কোরআন শরীফ্‌ বুঝিতে হইবে। আমার ঐ পাঠশালাটি ক্রমে মধ্য-বাঙ্গালা ও মধ্য-ইংরেজী স্কুলে উন্নীত হইয়া এক্ষণে একটি বিরাট হাইস্কুলে পরিণত হইয়াছে। আমি একটি "রিডিংরুম" স্থাপন করিয়াছিলাম, বর্ত্তমানে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত। একটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিস স্থাপন করা হইয়াছিল, উহাও আমারই একান্ত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায়। উহা এক্ষণে একটি উন্নতিশীল সাব্‌-পোষ্ট-আফিস। অধীনের অতি প্রিয় ছাত্র, স্থানীয় অন্যতম ভূম্যধিকারী মুন্‌শী মোহাম্মদ মোজাফ্‌ফর হোছেন মরহুম আজীবন আমার পরে পোষ্টমাষ্টার ছিলেন; অধুনা তাঁহার একটি পুত্র পোষ্ট-মাষ্টারের কার্য্য করিতেছেন।

আমি ১২৮৫ কিংবা ৮৬ সালে, পণ্ডিতপ্রবর দয়ারসাগর মহানুভব

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত " বোধোদয় " নামক পুস্তকখানির কয়েকটি ভুল প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখি। তখন আমার বয়ঃক্রম ১৬।১৭ বৎসরের অধিক নহে। ছেলেমানুষী খাম-খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সেই পত্রখানি লেখা হয়; ৭।৮ দিন পরেই পণ্ডিত প্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত একখানি পত্র আমি প্রাপ্ত হই। পত্রখানিতে ঐ কয়টি ভুল স্বীকার করিয়া, আমাকে ধন্যবাদ প্রদান ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। সঙ্গে সঙ্গেই বোধোদয় পুস্তকে, একটি বিজ্ঞাপন ছাপিয়া ভুল স্বীকার এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ঐ বিজ্ঞাপনখানি বোধোদয় পুস্তকে তাঁহার জীবিত-কাল পর্য্যন্ত বরাবর ছাপা হইয়া ছিল। পরে তদীয় উত্তরাধিকারিগণ উহা তুলিয়া দেন।

ঐ সময় " বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, 'সময় " প্রভৃতি ২৲ টাকা মূল্যের সুলভ সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলি জোরে-জোরে বাহির হয়। অধীন সর্ব্বপ্রথমে হুগলীর " এডুকেশন গেজেটে " ও " দৈনিক " পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করি। পণ্ডিত রজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসের মোছলমান সম্রাট্‌দিগের নাম বিশুদ্ধভাবে লিখিয়া পাঠাই; তদনুসারে তিনি উহা সংশোধন করেন; রূপসার স্বনামধন্য জমীদার আমার ভাগিনেয় চৌধুরী আহ্‌মদ গাজী মরহুম মগ্‌ফুর পারসী ভাষার তওয়ারিখ্‌ হইতে ঐ সকল নাম আমাকে বিশুদ্ধভাবে লিখাইয়া দেন। ইঁনি পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আবার পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র-বিদ্যারত্ন প্রেসে মুদ্রিত * * * বসাকের ইতিহাসের অনেক স্থল সংশোধন করিয়া দিই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বিদ্যারত্ন মহাশয় স্ব স্ব প্রণীত পুস্তকাবলী আমার প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীতে দান করেন। তদানীন্তন বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ও আমার প্রার্থনানুসারে রাজকীয় ব্যয়ে

মুদ্রিত মহাভারত প্রভৃতি বহু পুস্তক আমার লাইব্রেরীতে প্রদান করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রজনী কান্ত গুপ্ত মহাশয়ও নিজের সমস্ত পুস্তক দান করেন। ত্রিপুরা—পশ্চিমগাঁয়ের নওয়াব ফয়েজন্নেছা চৌধুরাণী ছাহেবা মরহুমাও লাইব্রেরীর অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। জমীদার চৌধুরী আহমদ গাজী মরহুম এই লাইব্রেরীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময় পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদিত " রাজস্থান " কলিকাতা—বহুবাজারস্থ বরাট প্রেস মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। আমি চিঠি-পত্র লিখিয়া তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হই এবং লাইব্রেরীর জন্য রাজস্থান গ্রহণ করা হয়। এডুকেশন গেজেট, হুগলীর দৈনিক, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, সময়, ঢাকা-প্রকাশ প্রভৃতি দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এই লাইব্রেরীতে মূল্য দিয়া গ্রহণ করা হইত। হিন্দুদিগের নূতন নূতন সংবাদপত্র দেখিয়া আমার মনেও জাতীয় মোছলমান সংবাদপত্র বাহির করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। এই সময় বাবু চন্দ্র কিশোর রায় নামক একজন কলিকাতা-প্রবাসী উদ্যোগী পুরুষের সঙ্গে অধীনের পত্র-বিনিময় হইতে থাকে। তিনি তখন একজন কমিশন এজেণ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে কলিকাতায় আসিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে থাকেন। আমার সংবাদপত্র বাহির করিবার ইচ্ছা এত বলবতী হইয়াছিল যে, সর্ব্বদাই ঐ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। এই সময় বন্ধুবর কবি মোজাম্মেল হক্ সাহেবের লিখিত " কুসুমাঞ্জলি " নামক পুস্তক খানির বিজ্ঞাপন বা সমালোচনা সংবাদ-পত্রে দেখিয়া, পত্র লিখিয়া উহা গ্রহণ করা হয় এবং সেই সূত্রে তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হই। তখন অন্য কোনও মোছলমান লেখকের অস্তিত্ব আমি অবগত ছিলাম না; কেবলমাত্র মীর মশাররফ্ হোছেন মরহুমের নামই অবগত ছিলাম; কিন্তু তাঁহার লিখিত কোনও পুস্তক তৎকাল পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল না। সম্ভবতঃ ১২৮৬ সালে " বোধোদয়-তত্ত্ব " নাম দিয়া

বোধোদয়ের একখানি বৃহৎ অর্থ-পুস্তক, ঢাকা-গিরীশ যন্ত্রে মুদ্রিত করি। কলিকাতার সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীতে প্রধানতঃ উহা বিক্রয় হইত। পরে পরবর্ত্তী সংস্করণ সমূহের ৫।৬ হাজার করিয়া পুস্তক নগদ মূল্যে প্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা গুরুদাস বাবু গ্রহণ করিতেন। পূর্ব্বোক্ত পাঠশালাটি তখন মধ্য বাঙ্গালা স্কুলে পরিণত হইয়াছিল। আমার শিক্ষক সাইসাঙ্গা মধ্য-বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান শিক্ষক উদার হৃদয় পণ্ডিত আনন্দ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় হেড্ পণ্ডিত, মাষ্টার-বসন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ২য় শিক্ষক এবং আমি তৃতীয় শিক্ষকের পদে কাজ করিতে থাকি। স্কুলের কতকগুলি ফার্ণিচার এবং আমার দোকানের কতকগুলি জিনিষ-পত্র খরিদ-জন্য ১২৮৬ কিংবা ৮৭ সালে আমার পরম বন্ধু মৌলবী মহছেনুদ্দিন আহ্‌মদ এবং দোকানের প্রধান কর্ম্মচারী মুন্‌শী নাসিরুদ্দীন সাউদকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্ব-প্রথমে ষ্টীমার ও রেলযোগে আমি কলিকাতায় আগমন করি। ঐ সময় সংস্কৃত "পদ্য-প্রসূন" নাম্নী একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মির্জ্জাপুর—পটলডাঙ্গার ব্যানার্জ্জী প্রেসে ছাপাইয়া লই। ৯।১০ দিন কলিকাতায় থাকিয়া, কলিকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া ও আবশ্যক জিনিষ-পত্র লইয়া কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে রূপসা রওয়ানা হই। বেলেঘাটা হইতে সুন্দরবন ঘুরিয়া ১৫ দিনে রূপসার পঁহুছিয়া ছিলাম। স্কুলের জন্য চেয়ার, টেবিল, ক্লক্‌ঘড়ি, বড় বড় মানচিত্র, কতকগুলি বাঁধাই খাতা-পত্র, ডিক্সনারী, অভিধান প্রভৃতি নেওয়া হইয়াছিল। রূপসা বাজারে আমার একখানি কাপড় এবং মনোহারী দোকান ছিল। ব্রাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টারও আমিই ছিলাম। আমার ও আমার ওয়ালেদা মাজেদার খাওয়া দাওয়া এবং বস্ত্রাদি সমস্ত মদীয় আত্মীয় জমীদার ছাহেবের নিকট হইতে পাইতাম। আমি একই দস্তরখানে বসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিতাম। এমন কি, আমার দোকানের ২।৩ জন কর্ম্মচারীর খোরাকীও সরকারে

ছিল। এই সময় আমার মাসিক আয় ২৫৲ টাকার কম ছিল না। ইহার উপর বরিশালে একখানি তালুকের ও কাউনিয়া বাসাবাড়ীর খাজানা বৎসরে ৭০৲—৭৫৲ টাকা পাইতাম। এত সুবিধা স্বত্বেও বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা ও জাতীয় সংবাদপত্র বাহির করিবার প্রবল বাসনা আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। আর পল্লীগ্রামে কূপ-মণ্ডুক হইয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা হইল না। অবশেষে ১২৯০ সালের ভাদ্র মাসে প্রায় ২০০০৲ টাকার জিনিস-পত্র সম্বলিত ঐ দোকানটি কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ফেলিয়া, অত-বড় হিতৈষী আত্মীয় জমীদার ছাহেব এবং অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুবর্গের মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান কলিকাতায় আসিয়া পড়িলাম। কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্যামোদীর মধ্যে মিত্রবর পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ মাশ্‌হাদী মরহুমকে মাত্র প্রাপ্ত হইলাম; আর বন্ধুবর কবি মোজাম্মেল হক্ সাহেবের সাক্ষাৎ মাত্র পাইলাম; কিন্তু তিনি অল্পদিন মধ্যে কলিকাতা ছাড়িয়া স্বীয় বাসস্থান "শান্তিপুরে" চলিয়া গেলেন। বাবু চন্দ্র কিশোর রায়-আমাকে পাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন; আমার জন্য তিনি পূর্ব্বেই মির্জ্জাপুর—৬৪ নং ওল্ড্ বৈঠকখানা রোডে একটি পাকা কামরা ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন; হাফেজ আবদুল আজিজ ছাহেব ঐ বাড়ীর স্থায়ী ভাড়াটে ছিলেন। আমি আমার বাল্য-বন্ধু ও রূপসার জমীদার ছাহেবের চাচ্চাযাদ ভাই চৌধুরী আবদুল ওয়াহ্‌হাব মরহুমের সঙ্গে ঐ গৃহে বাস করিতে লাগিলাম।

কলিকাতায় পঁহুছার মাস দুই পরে একদা মহানুভব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। সে দিনের কথা স্মরণ করিতে আজও আমার হৃদয়ে আনন্দের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস অনুভূত হয়! মনে আছে, শৈশবে—১২৭৫ বা ৭৬ সালে ওয়ালেদ মাজেদ মরহুম মগ্‌ফুরের নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রণীত "বর্ণ-পরিচয়" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া

ছিলাম। প্রায় ২০ বৎসর পরে আজ সেই পুস্তকের বিশ্ব-বিশ্রুত গ্রন্থকার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, দুইটি হৃষ্টপুষ্ট স্থূলাঙ্গ বালক বাহিরে (বিস্তৃত আঙ্গিনায়) খেলা করিতেছেন; পরে জানিতে পারিলাম, ইঁহারা তাঁহারই দুইটি দৌহিত্র-রত্ন—প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি ও তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর। একতলে বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলাম, একজন ধুতি-চাদর পরিহিত সুদর্শন হিন্দু যুবক তথায় বসিয়া আছেন। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, ইঁনি একজন নবাগত হিন্দু ব্যারিষ্টার। ভৃত্য একখানি শ্লেট্ ও পেন্সিল আনিয়া দিলে, উভয়ে তাহাতে নাম লিখিয়া দিলাম। ভৃত্য শ্লেট্খানি লইয়া উপরে চলিয়া গেল। ২।৩ মিনিট পরে আসিয়া সে আমাকে উপরে যাইতে ইঙ্গিত করিল। তদনুসারে আমি তাহার সঙ্গে দ্বিতলে আরোহণ করিলাম। প্রথমে একটি বৃহৎ কামরায় আমাকে লইয়া উপস্থিত করিল। দেখিলাম, অতি সুন্দর সোণালী বাইণ্ডিং করা কেতাব সমূহে পরিপূর্ণ ১০।১২টি গ্লাস কেশ আলমারী ঐ কামরায় রহিয়াছে। একটি ভৃত্য পরিষ্কার রুমাল দিয়া এক একখানি পুস্তক মুছিয়া আলমারীর যথা-স্থানে রাখিতেছে; একখানি প্রকাণ্ড টেবিলের চারিদিকে ১০।১২ খানি চেয়ার। টেবিলের উপর একখানি পিতল নির্ম্মিত ক্ষুদ্র হ্যাণ্ডে দেখিলাম একখানি লেপাফাযুক্ত পত্র। পত্রখানির শিরোনামা দেখিয়া চিনিতে পারিলাম, আমার লিখিত সেই পত্রখানি—যাহা ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিয়াছিলাম। আমার পত্রখানি এরূপ যত্ন-পূর্ব্বক রাখিতে দেখিয়া আমি নিতান্তই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। সেখানে ২।৩ মিনিট বসিবার পর ভৃত্য আমাকে আর একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। দেখিলাম, সেই প্রকোষ্ঠেও ঐরূপ সুন্দর গ্রন্থরাজি পরিপূর্ণ আলমারী-গুলি শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান আছে; একখানি বৃহৎ টেবিলের পার্শ্বে

সৌম্য-মূর্ত্তি এক প্রবীণ পুরুষ চেয়ারে বসিয়া আছেন, কিন্তু চেয়ারে তিনি পৃষ্ঠ সংলগ্ন করেন নাই। আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য-সহকারে পার্শ্ববর্ত্তী ১ খানি চেয়ারে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি "সালাম" করিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি একজন বয়স্ক পুরুষ; এখন দেখিতেছি তরুণ যুবক মাত্র। তোমার কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। ইহার পর আমাকে অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আদবের সঙ্গে উত্তর দিতে লাগিলাম; কি উদ্দেশ্যে সুদূর মফঃস্বল ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়াছি, তাহা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার উদ্দেশ্যের বিষয় শুনিয়া বেশ আনন্দানুভব করিলেন। কলিকাতা বড় প্রলোভনময় স্থান; নবাগত লোকের জন্য নানা বিপদের আশঙ্কা; নানা শ্রেণীর জুয়াচোর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; নূতন লোক পাইলেই জালে ফেলিতে চেষ্টা করে; ইত্যাকার বহু উপদেশই আমাকে প্রদান করিলেন। নিজের সম্বন্ধে বলিলেন, পূর্ব্বে আমি লাট সাহেব ও বড় বড় সাহেব সুবাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতাম, ইদানীং আমি আর তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি না। আর সেই শ্রেণীর সহৃদয় সাহেব-সুবাও আজকাল বড় একটা বিলাত হইতে এদেশে আইসেন না। আমার পরিচয়াদি বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন; অবশেষে বলিলেন, মাঝে মাঝে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। এইবার আমি ভক্তিভাবে সালাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। ভৃত্যটীও আমার সঙ্গে সঙ্গে সিড়ি দিয়া নিম্নে নামিয়া আসিল; সে আমাকে বলিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় এত অধিক সময় পর্য্যন্ত কাহারও সঙ্গে বসিয়া আলাপ করেন না; পাঁচ-দশ মিনিটকাল আলাপ করিয়াই বিদায় দেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, আপনার সঙ্গে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত খুব আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করিলেন। আমি নীচে নামিয়া আসিলে

ভৃত্যটি সেই ব্যারিষ্টার সাহেবকে ডাকিয়া উপরে লইয়া গেল। আমি ৪ টার পরে আছরের নমায্ পড়িয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিলাম এবং প্রায় ৫।।০ টা কিংবা ৫৸০ টার সময় ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের বাসাগৃহ হইতে তাঁহার আবাস বাটী (বিদ্যাসাগর বাটী) অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। চন্দ্র কিশোর বাবুকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপাদির বিষয় বলাতে তিনি অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। অতঃপর কয়েক মাস পরে শীতকালে গিয়া একদিন সাক্ষাৎ করি, তখন তাঁহার গায়ে একখানি বনাত ছিল; সে দিনও প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল আলাপাদি করিয়াছিলেন।

ঐ শীতকালেই একদা আমি ঢাকা—বিক্রমপুর—বানারি, ও ত্রিপুরা—রূপসা গমন করিয়াছিলাম; এবং ঢাকা শহরে কিয়দ্দিবস থাকিয়া তত্রত্য "মুসলমান-সুহৃদ-সম্মিলনীর" অনুষ্ঠাতা বন্ধুদিগের অনুরোধে—বিশেষতঃ অক্লান্তকর্ম্মী সমাজ-সেবী বন্ধুবর খান বাহাদুর মৌলবী আবদুল আযিয্ বি-এ মরহুমের সঙ্গে থাকিয়া সমিতির মেম্বর সংগ্রহ ও চাঁদা আদায় করিতে লাগিলাম। তাঁহারা অনেকদিন আমাকে ঢাকায় আট্কাইয়া রাখিলেন।

ঢাকা হইতে বানারি হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, মিত্রবর পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহ্মদ ছাহেবের সঙ্গে সংবাদ-পত্র পরিচালন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে আমাকে আবার ঢাকা—বানারি আমার ফুফাতো ভগিনীপতি চৌধুরী গোলাম আহ্মদ ছাহেবের বাড়ীতে যাইতে হইল। ঐ সময় আমার ওয়ালেদা মাজেদা ছাহেবা ও বানারিতেই ছিলেন। বিক্রমপুরের কোনও ভূম্যধিকারীর পিতৃহীনা কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল; তজ্জন্যই এত শীঘ্র বানারিতে প্রত্যাগমন! এই অবসরে বন্ধুবর চৌধুরী আবদুল ওয়াহ্হাব মরহুম তাঁহার মাতুল ও খালা ছাহেবার সঙ্গে ভাগলপুরে তাঁহাদের পীর

ছাহেবদিগের আস্তানায় গমন করিলেন তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে রেল-গাড়ীতে বর্দ্ধমানে তাঁহার কলেরা হইল এবং কলিকাতা আসিয়া বিশেষ চিকিৎসাধীন থাকিয়াও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার মাতা ভ্রাতা এবং ভগিনিগণও আমার পক্ষে ইহা একটি অতীব শোকাবহ ঘটনা ছিল।

এই সময় প্রসিদ্ধ লেখক মীর মশাররফ্ হোছেন মরহুম ময়মনসিংহ—দেলদুয়ারের জমীদার-পত্নী করিমন্নেছা খানম ও তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র-দ্বয়ের পক্ষে ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন; এবং তাঁহার প্রণীত "বিষাদসিন্ধু" পুস্তকখানিও প্রায় এই সময় বাহির হইল। স্যার এ, কে গজনভী ছাহেব সেই বৎসরই বিলাত গমন করিলেন। ১৪।১৫ বৎসর বয়স্ক গজনবী ছাহেবকে লইয়া মীর ছাহেব একদিন আমাদের সেই ক্ষুদ্র বাসায়—৬৪ নং ওল্ড বৈঠকখানা রোড্—মির্জ্জাপুরে আগমন করিলেন; আমিও একাধিকবার তাঁহাদের ওয়েলেস্লী ষ্ট্রীট্স্থ বাড়ীতে গমন করিয়াছিলাম। অতঃপর যে সকল সাহিত্যিক ও সংবাদপত্র ঘটিত ব্যাপার ঘটিয়াছিল, অতি সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ মাত্র করিতেছি।

(১) আমি ১ম বার ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, রাইট অনারেবেল ছৈয়দ আমীর আলী মরহুমের (তখন তিনি ব্যারিষ্টার) কেরাণী আবদুল হাকীম নামে বিজ্ঞাপিত ও "ইণ্ডিয়ান একো" নামক ইংরেজী সংবাদ পত্রের পরিচালক বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পরিচালিত "মুসলমান" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হইলাম। পণ্ডিত রজনী কান্ত গুপ্ত ও পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় আমার এই নিয়োগ-কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন; কিন্তু এই কাগজখানি ১০।১২ সপ্তাহের অধিককাল জীবিত ছিল না।

(২) ২য় বার ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতে পাইলাম, আমার সেই হিন্দু বন্ধু বাবু চন্দ্র কিশোর রায় "শ্রীমন্ত সওদাগর" নামক

একখানি বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিয়া, স্বীয় কার্য্য-স্থল মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ হইতে ৩নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। বাবু কালী নারায়ণ সান্ন্যালের "ভারত-মিহির প্রেসে" পঞ্চাননতলা লেন হইতে কাগজখানি ছাপা হইয়া বাহির হইত। আমি সহযোগী সম্পাদকরূপে কাজ করিতে লাগিলাম। রাত্রি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত আমাকে অনেক সময় ছাপাখানায় থাকিয়া ঐ কাগজের প্রুফ্ দেখিতে হইত। ঐ সময় কালী নারায়ণ বাবু ও সিটি কলেজের অঙ্ক শাস্ত্রের প্রোফেসার (পরে আলীগড় কলেজের অঙ্ক শাস্ত্রের প্রোফেসার) বাবু যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয়। অতঃপর চন্দ্র কিশোর বাবু নিজে একটি ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করাতে আমাকে বাধ্য হইয়া আহিরীটোলার নিকটস্থ ৭ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীটে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়।

ইতিপূর্ব্বে ডফ্টন ও সেণ্ট জেভিয়ার কলেজদ্বয়ের আরব্য-পারস্যাধ্যাপক সমাজ-হিতৈষী মহাপ্রাণ মৌলবী মেয়রাজুদ্দীন আহ্মদ ছাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। সংবাদপত্র পরিচালন সম্বন্ধে তিনি আমাকে মহা উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঢাকা—মুসলমান-সুহৃদ-সম্মিলনীর অনুরোধে বালিকাদিগের শিক্ষার্থে মৌলবী ছাহেব ও আমি "তোহ্ফ্তুল মোস্লেমিন" নামক একখানি মস্লার কেতাব প্রণয়ন করি; সান্ন্যাল প্রেসে উহা ছাপা হইয়াছিল। মুসলমান-সুহৃদ-সম্মিলনী ছাপার আংশিক ব্যয় প্রদান পূর্ব্বক, অনেকগুলি পুস্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় বন্ধুবর কবি মোজাম্মেল হক্ ছাহেব ষ্টীমারযোগে শান্তিপুর হইতে আসিয়া, আমার গৃহে কখন কখন অবস্থান করিতেন। এখানে আসিয়া দেখিলাম, তিনি নীলের দালালী এবং কমিশন এজেণ্টের কাজ করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জ্জন

করিতেছেন। আমাকে ঘরভাড়া ও খোরাকি বাবদ মাসে ২০৲—২৫৲ টাকার বেশী দিতেন না। ক্রমে তাঁহার মেযাজের পরিবর্ত্তন ঘটিল, গতিক ভাল নয় দেখিয়া আমি তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। এই সময় আমার আবার ঢাকায় যাওয়া হইল। ঢাকাই বন্ধুগণ মোসলমান্-সুহৃদ্-সম্মিলনীর কাজে প্রায় ৬ মাসকাল আমাকে ঢাকায় রাখিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ঐ স্থান—মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মির্জ্জাপুরে চলিয়া আসিলাম।

এই সময় "ক্রেসেণ্ট্" নামক ইংরেজী সংবাদপত্রের পরিচালক মুন্‌শী আবদুল মজেজ একখানি বাংলা সংবাদপত্র বাহির করিবার মতলব করিলেন। বন্ধুবর মৌলবী মেয়রায্ উদ্দীন আহ্‌মদ ছাহেব আমাকে ঐ সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করাতে, আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম। যে কোনওরূপে একখানি জাতীয় সংবাদপত্র বাহির করা—আমাদের অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু তখন আবদুল মজেজ ছাহেবের পুঁজিপাটা ইংরেজী সংবাদপত্র "ক্রেসেণ্ট্" কর্ত্তৃক প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল। যদিও "নব-সুধাকর" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি আমার সম্পাদকতায় বাহির হইল; কিন্তু ৫।৬ সপ্তাহের মধ্যেই উহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছিল।

৩। ইতিপূর্ব্বে খান বাহাদুর মৌলবী একিনুদ্দীন আহ্‌মদ বি-এ ছাহেব কর্ত্তৃক "ইস্‌লাম" নামক মাসিক পত্র ২।৩ সংখ্যা বাহির হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। উক্ত মাসিকপত্র সম্বন্ধেও আমি কতকটা খাটিয়াছিলাম।

৪। এই সময় মুন্‌শী শেখ আবদুর রহিম ছাহেব, মৌলবী মেয়রাজুদ্দীন আহ্‌মদ ছাহেবের সাহায্যে হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর জীবন-চরিত প্রথমে বাহির করেন এবং ঠিক ঐ সময়ই আমার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও

বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই সময় আমরা উভয়ে সংবাদপত্র বাহির করিবার উদ্দেশ্তে ব্যারিষ্টার ছৈয়দ আমীর আলী ছাহেবের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।

৫। অতঃপর মৌলবী ছাহেব, শেখ ছাহেব ও আমি "এস্‌লাম-তত্ত্ব" নামক এস্‌লাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক গ্রন্থখানি বাহির করি। উহার ২য় খণ্ড বাহির হইয়াছিল এবং মোছলমানদিগের ব্রাহ্ম ও খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বনের গতিরোধ করিতে অনেকটা সমর্থ হইয়াছিল। তদানীন্তন ইণ্ডিয়া গেজেটে এই পুস্তকখানির অতি উচ্চ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল।

৬। ইতিমধ্যে পণ্ডিত রজনী কান্ত গুপ্ত মহাশয়ের চেষ্টায় আমি প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর এবং আরও কয়েকখানি অর্থ পুস্তক লিখিয়া দিয়াছিলাম। তজ্জন্ম উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক ও পাইয়াছিলাম।

৭। "এস্‌লাম-তত্ত্ব" প্রকাশের পর আবার আমাদের মনে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিবার প্রবল বাসনা জন্মিল। তখন বৈঠকখানা রোডের ৮০ নং বাড়ীতে আমাদের কার্য্যালয়।

১২৯৫ সালের প্রারম্ভে কলিকাতা নিবাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ মৌলবী আবদুল ওয়াহ্‌হাব মরহুমের জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ, নওয়াব বদরুদ্দীন হায়দার খান বাহাদুর মরহুমের প্রযত্নে ও তত্ত্বাবধানে, তাঁহারই গৃহে সুসম্পন্ন হইল। ১২৯৬ সালের আশ্বিন মাসে আমরা "সুধাকর" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, ৯০ নং ওল্ড্‌ বৈঠকখানা রোড হইতে বাহির করিলাম। এই সংবাদপত্রের ইতিহাস বহু বিস্তৃত। চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ছয়মাসকাল আমরা ইহা চালাইয়া ছিলাম। ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে হাইকোর্টের তদানীন্তন স্বনাম প্রসিদ্ধ উকীল মৌলবী (পরে

- নওয়াব) ছেরাজল এছলাম খান বাহাদুর ইঁহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ঐ সময় আমি উহার বেতনভোগী সম্পাদক ছিলাম। ছয়মাস-কাল চালাইয়া প্রায় ২১।২২ শত টাকা ক্ষতি বহন করিয়া তিনি কাগজ-খানি বন্ধ করিলেন।

৮। ইঁহার কিছুকাল পূর্ব্বে খান বাহাদুর মৌলবী কবিরুদ্দীন আহ্‌মদ মরহুমের মৃত্যু হওয়াতে, তদীয় সুবিখ্যাত ছাপাখানা "উর্দ্দু গাইড্‌ প্রেস", "উর্দ্দু গাইড্‌" সংবাদপত্র ও ইংরাজী "মোহামেডান অবজার্ভার" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের স্বত্ব হাইকোর্টের উকীল মৌলবী (পরে নওয়াব স্যার) ছৈয়দ শমসুল হোদা এম-এ, বি-এল ছাহেব ও তাঁহার পরম বন্ধু মৌলবী মোহাম্মদ আমজদ ছাহেব ক্রয় করেন। "সুধাকর" চালাইবার ভার ও তাঁহারাই গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্ববৎ উহার সম্পাদক ছিলাম।

৯। একবৎসর পরে নওয়াব ছাহেব ছাপাখানা ও "সুধাকর" -সংবাদপত্রের সংস্রব ত্যাগ করেন। তখন মৌলবী মোহাম্মদ আমাজদ ছাহেব একাকীই প্রেস ও কাগজ চালাইতে থাকেন; এই সময় কাগজ সম্পর্কে আমি একটা মানহানীর ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়ি। কিছুদিন পরে "সুধাকর" চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়।

১০। ১২৯৯ সালে আমি "বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা" বাহির করি। ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত উহা চলিয়াছিল। অবশেষে নানা বিপদ পরম্পরায় আমি উহা বন্ধ করিতে বাধ্য হই।

১১। ঐ সময় আমি "রেয়াজুল ইস্‌লাম প্রেস" নামক একটি ছাপাখানা স্থাপন পূর্ব্বক, মোছলমান গ্রন্থকারদিগের পুস্তকাবলী বিশেষরূপ সংশোধন করিয়া ছাপিতে আরম্ভ করি।

১২। ১৩০৬ সালে মৎকৃত "গ্রীস-তুরস্ক-যুদ্ধ" প্রথমভাগ মুদ্রিত হয়। পরে উহার দ্বিতীয়ভাগ ও যথাসময়ে মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৩। ১২০৮ সালের আশ্বিন মাসে আমার সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা আহ্‌লিয়া (পত্নী) আয়েশা খাতুন ছাহেবা অকস্মাৎ এন্তেকাল করেন; ইহা আমার জীবনের আর একটি ভীষণ শোকবহ ঘটনা। এই ব্যাপারে আমার সংসার-বন্ধন ছিন্ন ও পারিবারিক শৃঙ্খলার লণ্ড-ভণ্ড হইয়া যায়।

১৪। ১৩০৯ সালের মাঘ মাসে, যশোহর মির্জ্জানগর (বাদশাহী সময়ের প্রাচীন শহর) নিবাসী এবং যশোহর চাকলার কাজী বংশধর ছৈয়দ রহমান বখ্‌শ্‌ ওর্ফে বাদশাহ্‌ মিয়াঁ পেশ্‌কার মরহুমের ২য়া কন্যা হাফেজা খাতুনের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। তখন তাঁহারা নদীয়া—কুষ্টিয়ার অধিবাসী ছিলেন। আমার এই আহ্‌লিয়া ছাহেবা "মোস্‌লেম-পাক-প্রণালী" ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ প্রণয়ন করিয়াছেন। বঙ্গীয় মোছলমান-সমাজে ইহা বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইতেছে।

১২৯৬ কিংবা ৯৭ সালে আমি বঙ্গীয় মোছলমানদিগের একনিষ্ঠ নেতা কর্ম্মবীর নওয়াব বাহাদুর আবদুল লতীফ্‌ মরহুমের সঙ্গে পরিচিত হই। তিনি আমার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন।

১৫। ইহার পর মৎকৃত "কৃষক-বন্ধু", "আমার সংসার জীবন", "জঙ্গেরুম ও ইউনান", "হক নছিহত" প্রভৃতি পুস্তক ও পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৬। সম্ভবতঃ ১৩১২ সালে "সোলতান" সংবাদপত্র আমার সম্পাদকতায়, রংপুর—মহীপুরের বিখ্যাত জমীদার খান বাহাদুর চৌধুরী আবদুল মজীদ-মরহুম ও মৌলবী মির্জ্জা মোহাম্মদ ইউছফ আলী সাব্‌ রেজিষ্ট্রার মরহুমের অর্থানুকূল্যে, বঙ্গের অদ্বিতীয় বাগ্মী মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ মরহুম, এছলাম প্রচারক মুন্‌শী জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ ছাহেব

ও মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী ছাহেবের বিশেষ সাহায্যে বাহির হয়। মৌলবী নুর আহ্‌মদ ছাহেব (অধুনা হাইকোর্টের পুরাতন রেকর্ড-বিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ও কলিকাতা—টালিগঞ্জের ম্যারেজারেজিষ্ট্রার) ও মাষ্টার ওয়াজেদ আলী মরহুম সহকারী সম্পাদক এবং প্রসিদ্ধ বক্তা ও গ্রন্থকার দেওয়ান নসিরুদ্দীন আহ্‌মদ ছাহেব কাগজের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রায় দুইবৎসর পরে নানাপ্রকার গোল-যোগ ও বিপ্লবে কাগজখানির ছাপাখানা ও দফ্‌তর প্রথমে কড়েয়া হইতে স্থানান্তরিত হইয়া সিন্দুরিয়া পটিতে—মাওলানা হাফেজ জামালুদ্দীন মরহুমের মস্‌জেদে যায় এবং কিছুকাল পরেই বন্ধ হয়; তদনন্তর নূতন পলিসীতে (কংগ্রেসীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া) মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী ছাহেবের সম্পাদকতায় চলিতে থাকে; অবশেষে নানা পরিবর্ত্তনাদির পর চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হইয়া বন্ধ হয়।

১৩১৫ সালে আমি মাননীয় নওয়াব ছৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী মরহুমের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত " মিহির ও সুধাকর " সংবাদ পত্রের সহযোগী সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হই। ইহার কিছুকাল পরে এই সংবাদ-পত্রখানি চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়।

যখন জনাব মাওলানা শাহ্‌ ছুফী মোহাম্মদ আবুবকর পীর ছাহেবের পৃষ্ঠ-পোষকতায় এবং মৌলবী আবদুর রহমান ছাহেবের তত্ত্বাবধানে ও মুন্‌শী শেখ্‌ আবদুর রহিম ছাহেবের সম্পাদকতায় " মোসলেম-হিতৈষী " বাহির হয়, তাহার কিয়ৎকাল পরে আমি উহার এডিসনাল সম্পাদক নিযুক্ত হই। পরে কাগজের আপিস-গৃহাদি অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইলে উহা কিছুকালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়।

নিজের বরিশাল (বাখরগঞ্জ) জেলাস্থ পৈতৃক ভূ-সম্পত্তির দরুণ নিম্ন আদালত হইতে হাইকোর্টে পর্য্যন্ত মোকদ্দমায়, এবং " বেরাদরে

ইউছফ " রূপী হিন্দুভ্রাতাদিগের চক্রান্তে কয়েকখানি পুস্তক প্রেসে ছাপা হওয়ার দরুণ আমি আদালতে অভিযুক্ত হইয়া দুইবার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হই। ঐ সকল মোকদ্দমা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত পরিচালনে বহু অর্থ ব্যয় হওয়াতে আমি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ি। অতঃপর ১২২১ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯১৪ খৃঃ অব্দে) ইউরোপের মহাযুদ্ধে কাগজ, কালী প্রভৃতি ছাপাখানার সরঞ্জাম নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়ে ; কাজেই ছাপার কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। বাড়ী ভাড়া ১৫॥০—১৬৲ টাকা হইতে ৪০৲—৪২৲ টাকায় পরিণত হয় ; সুতরাং ঋণজালে আরও বিষমভাবে জড়িত হইয়া পড়ি।

অতঃপর এই বিপদকালে ১৩২৩ সালে আমার ওয়ালেদা মাজেদা ছাহেবা এন্তেকাল করেন। সেইদিন হইতে আমার বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া আইসে। কারণ আমাকে দোওয়া করিবার জন্য কোনও মুরুব্বিই অবশিষ্ট রহিলেন না। এই সময় প্রায় ৪০০০৲ টাকার পুস্তক ও ২৫০০৲ টাকা মূল্যের ছাপাখানাটী কোন ব্যক্তির হস্তে ন্যাস্ত করিয়া দুই বৎসরের জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করি। দুই বৎসর পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখি সে আমার তৎসমস্তই আত্মসাৎ করিয়া আমাকে একেবারেই কপর্দ্দক শূন্য করিয়াছে। অর্থাভাবে যথাসময়ে মোকদ্দমাও রুজু করিতে পারিয়াছিলাম না ; সুতরাং নিতান্ত দৈন্য-দশায় পতিত হই।

ইহার কিছুকাল পরে বঙ্গীয় মোছলমানদিগের গৌরব-কেতন, হাই-কোর্টের এড্ভোকেট্, প্রকৃত সমাজ-হিতৈষী মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক্ এম-এ, বি-এল (আমার ওয়ালেদ মাজেদ মরহুমের পরম বন্ধু দাতা ও সহৃদয় কাজী আকরম আলী মোখ্তার মরহুমের পৌত্র এবং বরিশালের গবর্ণমেণ্ট্ প্লীডার, স্বনামখ্যাত উকীল, আমার ভক্তি-ভাজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃস্থানীয় মৌলবী মোহাম্মদ ওয়াজেদ বি-এল মরহুমের পুত্র-রত্ন) স্বীয় তত্ত্বাবধানে

পরিচালিত " নবযুগ " সংবাদপত্রের সম্পাদক-পদে আমাকে গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, বিপদকালে তিনি আমাকে ক্রমশঃ পাঁচশত টাকা অর্থ সাহায্যও করিয়াছিলেন। এই সময় এক ব্যারিষ্টার বন্ধু, বঙ্গীয় প্রজাদিগের স্বার্থ রক্ষার্থে একখানি সংবাদপত্র বাহির করিতে ইচ্ছুক হন। তিনি তদানীন্তন বঙ্গীয় কাউন্সিলের মেম্বরও ছিলেন। তিনি আমাকে ঐ কাগজের সম্পাদক মনোনীত করেন। আমি কাগজখানির নাম রাখিলাম " রায়ত-বন্ধু "। ব্যারিষ্টার সাহেব বিনা পুঁজিতে কাগজ বাহির করিলেন। রায়ত সম্প্রদায়ের সাপক্ষে জ্বলন্ত ভাষায় প্রবন্ধাদি লেখাতে কাগজের গ্রাহকও বেশ বাড়িতে লাগিল; কিন্তু বিনা পুঁজিতে কি কাগজ চলিতে পারে? কিছুদিন পরে কাগজখানি বন্ধ হইল। এইরূপে একখানি অতি প্রয়োজনীয় সংবাদপত্রের সমাধি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

এই সময় আমি বেকার ও সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। কিন্তু খোদা-তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে একটি বৃহৎ ছাপাখানার বহু কার্য্যভার পাইয়া শান্তির নিশ্বাস ফেলিতে সক্ষম হইলাম।

অতঃপর প্রায় ৩ বৎসর পূর্ব্বে আমার পরম হিতৈষী বন্ধু, বঙ্গের অদ্বিতীয় বাগ্মী সোদর-প্রতিম মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ মরহুমের সহকর্ম্মী ও সহযোগী, বঙ্গবিখ্যাত বক্তা নদীয়া—গাঁড়াডোব নিবাসী মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ ছাহেব, মুন্‌শী তাজুদ্দীন আহ্‌মদ মরহুমের অতি প্রাচীন ছাপাখানার অন্যতম উত্তরাধিকারী ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র, বটতলার প্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক—এখন হইতে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যিনি মুসলমান-সমাজে ধর্ম্ম ও শিক্ষার আলো প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যিনি বঙ্গের পুঁথি-সাহিত্যের একজন আদি প্রচারক, মুসলমান-সমাজের উজ্জ্বল নক্ষত্র, স্বজাতি-বৎসল, সমাজগতপ্রাণ, অক্লান্ত কর্ম্মী এবং আমার বন্ধু স্থানীয়, ঢাকা—

গড়পাড়া নিবাসী মুন্‌শী মনিরুদ্দীন আহ্‌মদ মরহুমের সুযোগ্য দ্বিতীয় পুত্র স্নেহাস্পদ আফ্‌তাবুদ্দীন আহ্‌মদ "সাহিত্য-রত্ন" ছাহেবকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আগমন করেন এবং আমার দ্বারা "পাক-পাঞ্জতনের" পবিত্র জীবন-চরিত লিখাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আমি তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে আফ্‌তাব মিয়াঁ প্রয়োজনীয় উর্দ্দু গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া আমাকে দেন। পাক পাঞ্জতনে এই ৫টী জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্‌মদ মোজতবা (ছালঃ); ২। হজরত আলী (কঃ—ওঃ); ৩। খাতুনে-জন্নত হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ); ৪। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ); ও ৫। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)—এই চারিজন মহামাননীয় পুরুষ ও একজন মহামাননীয়া নারীর জীবন-চরিতই "পাক পাঞ্জতন" এর জীবনী। সর্ব্ব প্রথমে হজরত রছুলে-আখেরজ্জমান (ছালঃ)-এর জীবনী বিস্তৃত আকারে লিখিয়া স্বতন্ত্ররূপে বাহির করা হয়। ২য়তঃ হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবনীও স্বতন্ত্র আকারে বাহির হইয়াছে। এক্ষণে এই ৫ পাঁচজন মানব-রত্নের পবিত্র জীবন-চরিত একত্রে "পাক পাঞ্জতন" নামে, ১৬ পেজি ডবল ক্রাউন৬৩ ফর্ম্মায় ও ১০০৮ পৃষ্ঠা আকারে বাহির হইল। এছলামের ৫ জন গৌরব-স্তম্ভের জীবনী কত পবিত্র, কত মূল্যবান্, কত উন্নত আদর্শে পরিপূর্ণ, কত হৃদয়-গ্রাহিণী, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এ অগাধ সমুদ্রের অমূল্য মুক্তা-মালা ও রত্নাবলী গুণগ্রাহী পাঠক ও গুণ-গ্রাহিণী পাঠিকাগণই ভক্তিভাবে গলে ধারণ করিবেন বলিয়া আশা করি। এই সকল অমূল্য জীবনীর অমূল্য শিক্ষা ও অমূল্য উপদেশমালা যিনি গ্রহণ করিবেন, তিনি আদর্শ মানবে পরিণত হইবেন, তাঁহার পরকালের পথ পরিস্কৃত হইবে।

সর্ব্ব-সাধারণ মোছলমান ভ্রাতা ও ভগিনিগণের বোধ-সৌকার্য্যার্থ এই পুস্তকখানি যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় লিখিয়াছি; এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক অনেক সহজ আরবী ও পারসী এবং উর্দ্দু শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। মোছলমানের বাঙ্গালা ভাষা মোছলমানী হওয়াই দরকার। সংস্কৃত-মূলক হিন্দু-ভাষার প্রভাবে পড়িয়া মোছলমানগণ জাতীয় ভাব, জাতীয় খেয়াল, জাতীয় কল্পনা সমস্তই হারাইয়াছে। তাহাদের হৃদয় আজ হিন্দুভাবে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের চিন্তাধারা হিন্দু প্রভাবময়।

আমি এই গ্রন্থে যে সকল আরবী, পারসী ও উর্দ্দু শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, তাহা 'কোটেশনের' মধ্যে দিয়া, বন্ধনীর মধ্যে উহার বাঙ্গালা অর্থ লিখিয়া দিয়াছি। সুতরাং প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ সহজেই ঐ সকল শব্দের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন।

আমার বয়ঃক্রম এক্ষণে ৬৫—৬৬ বৎসর; সুতরাং জীবনের শেষ-সীমায় উপস্থিত হইয়াছি। উপরোক্ত ছাপাখানা ও পুস্তকালয়ের সাহায্যে যদি আমি অবশিষ্ট জীবনে, আরও পবিত্রাত্মা মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিত ও ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি লিখিয়া জন-সমাজে প্রচার করিতে পারি; তবে জীবন সার্থক মনে করিব। প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনিগণ দোওয়া করিবেন, যেন আমার এবং সমগ্র মোছলমানের ইহকাল এবং পরকাল শান্তিপূর্ণ ও মঙ্গলময় হয়।

২৯শে রমজানুল মবারক,
১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৫ সাল।
প্লট নং ৩০৪, কড়েয়া;
পোঃ বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

খাদেমুল কওম—

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ

পাক পাঞ্জতনের সূচীপত্র

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাল্লঃ)-এর জীবনী।

বিষয় পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় ভাগ।

হজরত আলী মরতুজা (কঃ—ওঃ)।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

তৃতীয় ভাগ।

খাতুনে-জন্নত হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবনী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।

চতুর্থ ভাগ।

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর জীবন চরিত।

পঞ্চম ভাগ।

হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর জীবনী।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

পাক পাঞ্জতন।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সালঃ) এর জীবনী।

হজরত ঈসা আলায়হেস্-সালামের জন্মের পর ৫৭০ বৎসর গত হইয়া গিয়াছে ; পৃথিবীতে আর কোনও পয়গম্বরের (নবী—তত্ত্ববাহকের) আবির্ভাব হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীতে কোনও এক সময় এমন অতীত হইয়াছিল না, যে সময় ত্বনিয়া পয়গম্বর শূন্য ছিল। এক এক সময় পৃথিবীতে শত সহস্র পয়গম্বরও বিরাজ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পবিত্র ওয়াহ্‌দানিএত (একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম) প্রচার করিতেন। উপরোক্ত সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পৃথিবী একেবারে পয়গম্বর (নবী ও রসুল) শূন্য অবস্থায় ছিল। সুতরাং উহাকে সম্পূর্ণ 'যামানায় জাহেলিয়াত' (অন্ধকার-যুগ) বলা যাইতে পারে। এই সময় একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্-তায়ালার উপাসনা-আরাধনা এবং তাঁহার একত্ববাদ প্রচারের কোনও অস্তিত্বই পৃথিবীতে পাওয়া যাইত না।

হজরত এস্‌মাইল আলায়-হেস্‌সালামের বংশধরগণ আরবদেশের অন্তর্গত মক্কা মোয়াজ্জমায় বাস করিলেও, তাহারা ঘোর পৌত্তলিক হইয়া গিয়াছিল ; তন্মধ্যে অনেকে পবিত্র কাবা-গৃহে মানুষের মূর্ত্তি রাখিয়া পূজা করিত। অল্পসংখ্যক খৃষ্টীয়ান বা য়িহুদী ছিল ; তাহাদের মধ্যেও পবিত্র একেশ্বরবাদ

ধর্ম্মের কোনও চিহ্ন বিদ্যমান ছিল না। যত প্রকার পাপাচার অনাচার মানুষের দ্বারা হইতে পারে, তাহার কোনটাই তাহারা বাদ দিত না। নরহত্যা, ব্যভিচার, পরস্বাপহরণ, সুরাপান, জুয়াখেলা, স্ব স্ব কন্যাগুলির বধ-সাধন, পরস্পর দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কতকগুলি পূর্ব্বতন বীর-পুরুষের মূর্ত্তি পূজা, বিমাতাকে পত্নীরূপে গ্রহণ ইত্যাদি বহুপ্রকার পাপানুষ্ঠান তাহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন বংশের লোকের মধ্যে অনবরত মারামারি, কাটাকাটি চলিত। সমাজ-বন্ধন একেবারে শিথিল হইয়া গিয়াছিল। এই ত গেল আরবের অবস্থা। সিরিয়া, মিসর, ইউরোপ ও আফ্রিকার বহুদেশ ও জনপদে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বিকৃত আকারে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; য়িহুদী জাতি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নানা দেশে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মও অতি মাত্রায় বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছিল। বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের অধিবাসিগণ—জোরোয়াষ্টার (জর্-দশ্ত) প্রবর্ত্তিত অগ্ন্যুপাসনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া, ভ্রান্ত-পথের পান্থ হইয়াছিল। বিশাল মহাচীন ও চীন দেশের লোকেরা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও কন্-ফিউশিশ্ বা কন্‌ফিউশন প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক এক প্রকার নাস্তিকত্বে পরিণত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্মের প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া পৌরাণিক পৌত্তলিক ধর্ম্মের ভিত্তি মজবুৎ হইয়াছিল। কিন্তু উহার কোনটাই একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম ছিল না। তদ্ব্যতীত মূর্ত্তি-পূজক, নর-পূজক, গো-পূজক, প্রস্তর ও বৃক্ষ-পূজক, ভূত ও প্রেত-পূজক, নদী ও নালা-পূজক প্রভৃতি কত শত প্রকারের ধর্ম্ম-হীন মানুষে ধরা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

আরব দেশের ভৌগোলিক অবস্থা, প্রাচীন ইতিহাস, জাতি-বিভাগ ইত্যাদি হজরত রেছালত মাবের (ছালঃ) বড় বড় জীবন-চরিতে বিস্তৃত-ভাবে লিখিত হইয়াছে, এজন্য এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তাহা লিখা হইল

না। হজরতের দাদা (পিতামহ) মহাত্মা আবছুল মোত্তালেবের তেরটী পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে; তন্মধ্যে আবছুল্লা সর্ব্ব কনিষ্ঠ ও পিতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র ছিলেন। এক সময় তিনি এই প্রিয়তম পুত্র-রত্নকে হজরত ইব্রাহিম (আলাঃ) কর্ত্তৃক হজরত ইস্মাইল (আলাঃ) এর কোরবাণী করার ন্যায় কোরবাণী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। শেষ সাজা-নাম্নী জনৈক কাহেনার (গণক-নারীর) কথানুসারে দশ দশটী করিয়া উষ্ট্রের সঙ্গে আবছুল্লার নামে করয়্যা (গণনা সম্বন্ধীয় গুটি) ফেলাতে, প্রত্যেক বারেই আবছুল্লার নাম উঠিতে লাগিল; ১০০ সংখ্যা পূর্ণ হইলে উষ্ট্রের নামে করয়্যা উঠিল। পরবর্ত্তী আর তিন বারও ঐরূপ উটের নামে গুটি উঠাতে, তিনি আবছুল্লার পরিবর্ত্তে ১০০ উট কোরবাণী দিলেন। [১]

হজরত এস্মাইল আলায়হেস্ সালাম হইতে হজরত রছুলে আক্রম মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্মদ মোজ্তবা (সালঃ) পর্য্যন্ত কুর্সীনামা (বংশ-তালিকা) নিম্নে দেওয়া হইল।

১। হজরত ইস্মাইল (আলাঃ); ২। কীজার; ৩। আওয়াম; ৪। ঔছ (১); ৫। মররহ (১); ৬। সমায়; ৭। জররাহ; ৮। নাজব; ৯। ময়াচ্ছের; ১০। ঈহাম; ১১। অফ্তাদ; ১২। ঈছা; ১৩। হাচ্ছান; ১৪। আন্ফা; ১৫। অরওয়া; ১৬। বল্খী; ১৭। বছরী; ১৮। হারী; ১৯। অস্নুন; ২০। হুমরান;

---

[১] গণক বা আম্রেলগণ ছক্ (পাশা) ভূতলে নিক্ষেপ করে; কিংবা পাতায় বা কাগজে নাম লিখিয়া লটারী খেলার মতন তদ্দ্বারা শুভাশুভ নির্দ্দেশ করে, উহাকে "করয়্যা" বলে।

২১। আর্রুয়া; ২২। আবিদ; ২৩। আনক্; ২৪। আছকী; ২৫। মাহি; ২৬। নাখুর; ২৭। কাজেম; ২৮। কালেহ্; ২৯। বদলান; ৩০। ঈল্দারুম; ৩১। হেরা; ৩২। নাসেন; ৩৩। আবিল আউয়াম; ৩৪। মত্সাভিল; ৩৫। বরু; ৩৬। ঔছ; ৩৭। সলামান; ৩৮। হমিসা; ৩৯। উদদ; ৪০। আদনান; ৪১। মুয়েদ; ৪২। হমল; ৪৩। নাবেত; ৪৪। সলামান; ৪৫। ছমিসা; ৪৬। আল্-ঈসাউ; ৪৭। উদদ; ৪৮। আদ; ৪৯। আদনান; ৫০। মুয়েদ; ৫১। নজার; ৫২। মজর; ৫৩। এল-ইয়াস্; ৫৪। মদরকা; ৫৫। খজাইমা; ৫৬। কানানা; ৫৭। নজর; ৫৮। মালেক; ৫৯। ফেহের বা কোরায়েশ। এই কোরায়েশ্ হইতেই মক্কার সুপ্রসিদ্ধ কোরায়েশ্ বংশের উৎপত্তি।

কোরায়েশ্ হইতে হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) পর্য্যন্ত।

১। কোরায়েশ্; ২। গালেব; ৩। লোয়াই; ৪। কায়াব; ৫। মোরা; ৬। কেলাব; ৭। কোছায় বা কোছাই; ৮। আবদ্-মনাফ্; ৯। হাশেম; ১০। আবদুল-মোত্তালেব; ১১। আবদুল্লা; ১২। হজরত রছুলে আকরম মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্মদ মোজ্তবা ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ও ছাল্লাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হজরত ইস্-মাইল আলায়হেস্সালাম হইতে ৬৯ উনসত্তর পুরুষ পরে আমাদের হজরত রসুলোল্লাহ্ (সালঃ) আবির্ভূত হইয়া ছিলেন।

আ-ম আল্ ফিলের (এমনাধিপতি আব্রাহা কর্ত্তৃক মক্কা আক্রমণের) কয়েক দিন পূর্ব্বে আবদুল মোত্তালেব স্বীয় পুত্র আবদুল্লার সহিত, কোরেশের অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বিবী আমেনা-বিন্তে-দহবের বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিলেন। বিবাহ কালে আবদুল্লার বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর

ছিল। এইস্থানে একথাও উল্লেখ যোগ্য যে, আবদুল মোত্তালেব স্বয়ং আমেনা বিবীর আত্মীয়া—হালাঃ-বিন্তে দহিবকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহার এই পত্নীর গর্ভে জগদ্বিখ্যাত মহাবীর হজরত আমীর হাম্‌যাঃ জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহের কিছু দিন পরে আবদুল মোত্তালেব পুত্র আবদুল্লাকে তেজারতি কাফেলার (বণিক্ দলের) সঙ্গে বাণিজ্যার্থ শাম দেশে (সিরিয়ায়) প্রেরণ করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আবদুল্লা পীড়িত হইয়া মদীনায় স্বীয় আত্মীয়বর্গের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং স্বীয় ব্যারামের সংবাদ পিতার নিকট পাঠাইলেন। মক্কায় যখন আবদুল মোত্তালেব প্রিয়-পুত্রের পীড়ার সংবাদ পাইলেন, তখন স্বীয় অন্যতম পুত্র হারেস্‌কে তাঁহার 'খবর-গিরি' ও সেবা-শুশ্রূষার জন্য মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু হারেসের পঁহুছিবার পূর্ব্বেই আবদুল্লা পরলোক গমন করিলেন। তদীয় মদীনাস্থ আত্মীয়গণ বনু নজারের কবর স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করিল। হারেস শোকার্ত্ত-হৃদয়ে মক্কায় পঁহুছিয়া এই শোকাবহ ঘটনা পিতার নিকট জ্ঞাপন করিল। আবদুল্লার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে কয়েকটী উষ্ট্র, কতিপয় ছাগ, আর ওম্মে-এমিন নাম্নী একটী দাসী মাত্র ছিল। এই সময় হজরত আমেনা গর্ভবতী ছিলেন। হজরত নবী দো-জাহান (ছালঃ) তখন মাতৃ-গর্ভে। তিনি মাতৃ-গর্ভেই এতিম (পিতৃহীন) হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে আবদুল্লার বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। আছহাব ফিলের বায়ান্ন কিংবা পঞ্চান্ন দিন পরে—

১২ই রবিওল্‌-আউওল সোমবার ছোবেহ ছাদেকের সময় দুনিয়ার শান্তিদাতা, মানুষের মুক্তিদাতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব শেষ নবী, ফখরে আম্বিয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্‌মদ মোজ্‌তবা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে-অ-ছাল্লাম জন্মগ্রহণ করিলেন।

তাঁহার জন্মের তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আধুনিক কোনও কোনও ঐতিহাসিক ও গণনাবিদ্যা বিশারদ লোকদিগের মতে হজরতের জন্মের তারিখ ১২ই রবিওল-আউওল নয়—৯ই রবিওল-আউওল, ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দঃ, ১লা জ্যৈষ্ঠ ৬২৮ সংবৎ—সোমবার। প্রসিদ্ধ ইতিহাস-বেত্তা তাবরী, এব্‌নে-খল্লদুন, এব্‌নে-হেশাম, কামেল প্রভৃতি হজরতের জন্ম দিন ১২ই রবিওল-আউওলই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক আবুল ফেদার মতে জন্মের তারিখ ১০ই রবিওল-আউওল; সোমবার এবং ছোবে ছাদেক অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব সময় সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। বর্ত্তমান সময়ের বহু ঐতিহাসিক ও গণনাবিদ্যা বিশারদ ব্যক্তিগণ সূক্ষ্ম হিসাব দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ১২ই রবিওল-আউওল সোমবার হইতে পারে না। মিশরের প্রথিতনামা জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত মহ্‌মুদ পাশা ফলকী একখানি পুস্তক লিখিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হজরতের জন্ম ৯ই রবিওল-আউওল সোমবার হইয়াছিল। কিন্তু ১২ই রবিওল আউওল তারিখে হজরতের জন্ম হইয়াছে বলিয়া, সমগ্র পৃথিবীতে যেরূপ ভাবে মোসলমানদিগের বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে; তাহাদের সেই ধারণা কিছুতেই অপনীত হইবার নহে।

হজরতের জননী আমেনা খাতুন গর্ভাবস্থায়ই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, এক ফেরেশ্‌তা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তোমার গর্ভে যে সন্তান আছে, উহার নাম আহ্‌মদ। এজন্য মাতা তাঁহার নাম **আহ্‌মদ** রাখিলেন।

যখন হজরত জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন বৃদ্ধ আবদুল মোত্তালেব কাবাগৃহে বসিয়া মক্কার কতিপয় প্রধান প্রধান লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিতে ছিলেন। এই সময় হজরতের জন্মগ্রহণ সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হইল। অশীতিপর বৃদ্ধ আবদুল মোত্তালেব এই সুসংবাদে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি গৃহে গমনপূর্ব্বক প্রিয়-পৌত্রের মুখ-চন্দ্র দর্শন

করিলেন ; এবং এই নব-প্রসূত পৌত্রের নাম **মোহাম্মদ** (সালঃ) রাখিলেন। আবুল ফেদা বলেন, এই নাম শুনিয়া উপস্থিত লোকেরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আবদুল মোত্তালেবকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আপনার বংশ-প্রচলিত নামগুলি পরিত্যাগ করিয়া, নবজাত পৌত্রের এমন একটী বিস্ময়কর নাম কেন রাখিলেন? তদুত্তরে আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, আমি এই নাম এজন্য রাখিয়াছি যে, আমার পৌত্র সমস্ত দুনিয়ার গৌরব এবং প্রশংসার পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। এব্‌নে ছায়াদ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন হজরত রছুলে আক্‌রম (সালিঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তখন তৎসঙ্গে প্রসূতির উদর হইতে কোনও আলাএশ্‌ (কদর্য্য শোণিত ইত্যাদি) বাহির হইয়াছিল না—যেমন অন্যান্য সন্তান ভূমিষ্ঠ কালে প্রসূতিদিগের ঐ সকল বাহির হয়। তিনি মাতৃ-গর্ভ হইতে মখ্‌তুন (খৎনা হওয়া অবস্থায়) ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ ইহাও রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, যখন হজরত ছারওয়ারে কায়েনাত ফখরে আম্বিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, ঐ সময় একটী ভূমিকম্পে মদায়েন রাজধানীতে কেছরা (পারস্য-সম্রাট্‌) নওশেরওয়াঁর রাজ-প্রাসাদ প্রকম্পিত হইয়া, উহার চৌদ্দটী কাঙ্গুরা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আতসখরের সুবিখ্যাত অগ্নিকুণ্ড (পারসিকদিগের যে অগ্নিকুণ্ড সদা প্রজ্জ্বলিত থাকে—মুহূর্ত্তের জন্যও নির্ব্বাপিত হয় না) হঠাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল ; সাওয়া নামক হ্রদের পানী শুকাইয়া গিয়াছিল। অনেকে এই সকল মোজেজা (অলৌকিক ঘটনা) অস্বীকার করেন। অবশ্য এই শ্রেণীর ব্যাপারে অনেক অতিরিক্ত কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু জগতের সর্ব্বপ্রধান পয়গম্বর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্ব্বোচ্চপদ বিশিষ্ট রছুল ও ভবিষ্যদ্বক্তা মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ কালে কোনও কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটা কিছুতেই অসম্ভব নহে। এক্ষণে এই সকল ব্যাপারে এত বিভিন্ন প্রকারের—বিভিন্ন শ্রেণীর রওয়ায়েত (বর্ণনা) লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে,

নকল হইতে আসল বাহির করিয়া লওয়া একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং এ বিষয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ।

যাহা হউক, আবছুল মোত্তালেব হজরতের জন্মগ্রহণের ৭ম দিবসে আনন্দ প্রকাশার্থ পশু কোরবাণী করিলেন এবং সমগ্র কোরেশদিগকে 'দাওত' (নিমন্ত্রণ) করিয়া মহাভোজ দিলেন।

হজরতের জন্মগ্রহণের পর ৭দিন পর্য্যন্ত, আবুলহব-বিন্-আবছুল মোত্তালেবের আযাদ (মুক্তি প্রাপ্তা) দাসী সোয়েবাঃ তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইয়াছিল। আবার হজরত রছুলোল্লার চাচ্চা (পিতৃব্য) হামযাঃ কেও সোয়েবাই দুগ্ধ পান করাইয়াছিল। এই হিসাবে মস্‌রুক-বিন-সোয়েবাঃ ও হজরত হামযাঃ ইঁহারা উভয়ে হজরতের রেজায়ী ভাই (দুগ্ধ-ভ্রাতা) ছিলেন। ৮ম দিবসে শরীফ (সম্ভ্রান্ত) আরবদিগের প্রথানুযায়ী হওয়াযন জাতির বনি সায়াদ কবিলার (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর) বিবী হালিমা নাম্নী ধাত্রীর হস্তে প্রতিপালনার্থ হজরত সমর্পিত হন। উদ্দেশ্য, তিনি ধাত্রীরূপে হজরতকে দুগ্ধ পান করাইবেন, এবং নিজের কাছে—নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া প্রতিপালন করিবেন। আরবের—বিশেষতঃ মক্কার সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ এজন্য পুত্র-সন্তানদিগকে বদ্দু জাতীয়া ধাত্রিদিগের হস্তে প্রতিপালনার্থ প্রদান করিতেন যে, তাহারা জঙ্গল ও ময়দানের মুক্ত বাতাসে থাকিয়া—ফিরিয়া চলিয়া স্বাস্থ্য-সম্পদ লাভ করে, এবং বলবান্ ও মজবুৎ হয়; আর তাহাদের ভাষা বিশুদ্ধ এবং নির্দ্দোষ হইতে পারে। কারণ ভ্রমণশীল বা পল্লীবাসী বদ্দুদিগের ভাষা নাগরিকদিগের ভাষা হইতে পরিষ্কার, খাঁটি, ভেজাল-শূন্য ও বিশুদ্ধ। সাধারণতঃ শহরবাসীদিগের ভাষা বিভিন্ন স্থানবাসী লোকদিগের ভাষার সংমিশ্রণে অনেকটা বিকৃত হইয়া পড়ে। কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরের অধিবাসীদিগের কথাবার্ত্তা শুনিলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইতে পারে।

ধাত্রী বিবী হালিমা প্রতি ছয়মাস অন্তর—অর্থাৎ বৎসরে দুইবার হজরতকে মক্কায় আনিয়া জননী আমেনা খাতুন ও দাদা (পিতামহ) আবদুল মোত্তালেবকে দেখাইয়া লইয়া যাইতেন। হজরত দুই বৎসর কাল বিবী হালিমা ছায়াদিয়ার দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। দুগ্ধ ত্যাগের পর আরও দুই বৎসর—অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ চারি বৎসর কাল হজরত, বিবী হালিমা ছায়াদিয়ার গৃহে—বনি ছায়াদিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। যখন হজরতের বয়ঃক্রম চারি বৎসর হইল, তখন তাঁহার জননী বিবী আমেনা তাঁহাকে মক্কায় নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে যখন হজরতের বয়স ছয় বৎসর হইল, তখন তাঁহার গর্ব্ভধারিণী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মদীনাস্থ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। মদীনায় একমাস কাল থাকিয়া যখন মক্কাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-ছিলেন, তখন "আবু-আমীন" নামক স্থানে পঁহুছিয়া সেই মোছাফেরি অবস্থায় (প্রবাসে) তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই স্থানেই তাঁহার সমাধি কার্য্য সম্পন্ন হইল। কাফেলার লোকেরা সেই মাতৃহীন শোকার্ত্ত বালককে মক্কায় তাঁহার পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের নিকট পৌছাইয়া দিল। তিনি পিতৃ-মাতৃহীন পৌত্রের প্রতিপালন-ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে হজরত পাঁচ বৎসর কাল ধাত্রী হালিমা বিবীর গৃহে ছিলেন; আর এক বৎসর কয়েকমাস কাল মাত্র গর্ব্ভধারিণীর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার স্নেহ-ভালবাসা ভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর বয়সেই তিনি এতিম ও এছির (পিতৃ-মাতৃহীন) হইলেন। যখন হজরতের বয়স পাঁচ বৎসর ছিল, আর তিনি স্বীয় দুধ-ভাই-ভগিনী অর্থাৎ হালিমা বিবীর পুত্র-কন্যা ও বনি-ছায়াদের সমবয়স্ক বালক-বালিকাদিগের সঙ্গে ঘরের বাহিরে—ময়দানে ছাগপাল চরাইতেন, সেই সময় একদা তাঁহার সিনা-চাক(বক্ষঃ-বিদারণ)

কার্য্য সম্পন্ন হয়। ছিরাতে এব্‌নে হেশাম নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসে বিবী হালিমার বর্ণিত বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে :—বিবী হালিমা বলিয়াছেন, "একদা আমার দুইটী পুত্র-সন্তান দৌড়িয়া আমার নিকট আসিল, এবং বলিল, দুইজন ছফেদ পোষ (শ্বেতবস্ত্র পরিহিত) লোক আমাদের কোরেশী ভাইকে (হজরতকে) ধরিয়া লইয়া গিয়া, তাঁহার সিনা চাক (বক্ষঃ বিদারণ) করিয়া ফেলিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া আমি এবং আমার স্বামী আহারছ-বিন্‌-আবদুল আযি,—উভয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তথায় গমন করিলাম। দেখিলাম, ভয়ে বালকের দেহ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। আমি দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে গলায় জড়াইয়া লইলাম, এবং ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, দুইজন শ্বেতবস্ত্র পরিহিত লোক, আমার নিকট আগমন করিলেন, এবং আমাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া আমার বক্ষঃ বিদারণ করিলেন; আর বক্ষের ভিতর হইতে কোনও বস্তু তুলিয়া লইলেন।" হালিমা বিবী তাঁহার বক্ষঃস্থল দেখিলেন, কিন্তু কোনও যখম (ক্ষত) বা রক্তের চিহ্ন তাহাতে দেখিতে পাইলেন না। হালিমা বিবী মনে করিলেন, এই বালকের উপর হয় ত কোনও জ্বেনের বা অন্য কোনও অপদেবতার 'আছর' (প্রভাব) হইয়াছে, সুতরাং ইঁহাকে আর আমার নিকট রাখা উচিত নহে, এই মনে করিয়া অতি সত্বরে তাঁহাকে মক্কায় লইয়া গিয়া তদীয় জননীর হস্তে সমর্পণ করিলেন; এবং হজরতের বক্ষঃ বিদারণের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ধারণা ও বিশ্বাসানুযায়ী বলিলেন, এই বালকের উপর কোনও জ্বেন বা ঐ শ্রেণীর কোনও অপদেবতার আছর হইয়াছে। হজরত আমেনা বিবী বলিলেন, ইহাতে কোনও চিন্তার কারণ নাই। আমার এই পুত্র দুনিয়াতে আজিমশ্বান (বিরাট—অসাধারণ) মর্ত্তবা (সম্মান ও গৌরব) লাভ করিবে ও অসাধারণ মানুষ হইবে। এই বালক সর্ব্ববিধ বিপদ

এবং সর্ব্ব প্রকার ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইবে। আর খোদাতায়ালা স্বয়ং উহার হেফাযত (রক্ষণাবেক্ষণ) করিবেন। কারণ, এই বালক যখন আমার গর্ভে ছিল, তখন গর্ভাবস্থায় আমি স্বপ্ন-যোগে বহুতর বেশারত (শুভ ভবিষ্যদ্বাণী) ফেরেশ্‌তাদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। আর ইহার বহুতর কারামত (অলৌকিক কার্য্য) নিজেও দেখিয়াছি। সহি মোস্‌লেমে আনস্‌-বিন্‌-মালেক (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত আছে যে, এক দিবস যখন হজরত বালকদিগের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন, ঐ সময় হজরত জেবরাইল (আলাঃ) তাঁহার (হজরতের) নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহার দেল (হৃৎপিণ্ড) বিদীর্ণ করিলেন, এবং এক কাৎরা (বিন্দু) কোনও জিনিষ বাহির করিয়া বলিলেন, ইহা শয়তানের অংশ ছিল। পরে তাঁহার দেল যম্‌যমের পানী দিয়া ধৌত করিলেন। তৎপরে উহা বক্ষঃস্থলের যে স্থানে ছিল, সেই স্থানে পুনঃ সন্নিবেশিত করিলেন।

মাতৃ-বিয়োগের পর হজরত দুই বৎসর কাল, পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের ছরপরস্তিতে (আশ্রয়ে) ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম আট বৎসর, তখন পিতামহ আবদুল মোত্তালেবও অতি বৃদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যখন আবদুল মোত্তালেবের যানাযাঃ (শবদেহ) উঠান হইল, তখন হজরত বাষ্পাকুলিত লোচনে যানাযার সঙ্গী হইলেন। আবদুল মোত্তালেব মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রিয় পৌত্র (হজরত) সম্বন্ধে এই এন্তেজাম (বন্দোবস্ত) করিয়াছিলেন যে, স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু-তালেবের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে দিয়া বিশেষভাবে অছিয়ত (অন্তিম-উপদেশ প্রদান) করিয়া গিয়াছিলেন যে, তুমি তোমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পূর্ণরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ; এ সম্বন্ধে যেন কোনও রূপ ত্রুটী না হয়। হজরতের আরও কতিপয় চাচ্চা (পিতৃব্য)—আবদুল মোত্তালেবের পুত্র—ছিল। কিন্তু তন্মধ্যে আবু তালেব সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্‌, বিচক্ষণ এবং হৃদয়বান্‌

পুরুষ ছিলেন। তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবার আরও একটী কারণ এই ছিল যে, আবু তালেব ও আবদুল্লা একই মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; আবদুল মোত্তালেবের কতিপয় পত্নী থাকাতে, ভিন্ন ভিন্ন পত্নীর গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আবু তালেব সহোদর ভ্রাতার পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ পুত্রকে অধিক স্নেহ করিবেন মনে করিয়াই ভবিষ্যদ্দর্শী আবদুল মোত্তালেব এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ধারণা ও এই বিশ্বাস পরিণামে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। কর্ত্তব্যপরায়ণ ও পিতৃভক্ত আবুতালেব পিতার অছিয়ত অতি মনোযোগ ও সাহসিকতার সহিত প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃ-মাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও হজরতকে অতি স্নেহের সহিত পালন করিয়া স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই।

হৃদয়বান্, কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও সৎ-সাহসী আবু তালেব হজরতকে স্বীয় পুত্রগণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন ও স্নেহ করিতেন। তিনি স্নেহাষ্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রকে চক্ষের আড়াল হইতে দিতেন না। রাত্রিকালে নিজের কাছে লইয়া শয়ন করিতেন। হজরতের বাল্যাবস্থা আরবের অন্যান্য বালকের অবস্থার তুলনায় অতি আশ্চর্য্য ও অতুলনীয় ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি অন্যান্য ছেলেদের ন্যায় ক্রীড়ামোদে কখনও লিপ্ত হন নাই। খেলা-ধূলায় তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ এবং প্রবৃত্তি ছিল না; বরং তিনি ঐ সকল কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তিনি সেই বাল্যকালেই সত্যতা ও সত্ততার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী ছিলেন; ক্রীড়াশীল, আমোদ-পরায়ণ বালকদিগের সঙ্গে তিনি একেবারেই মিশিতেন না। সর্ব্বপ্রকার দুশ্চরিত্রতা ও জঘন্য আচার-ব্যবহার এবং কার্য্য-কলাপ হইতে তিনি সম্পূর্ণ পাক (পবিত্র) ছিলেন। একবারের একটী ঘটনা এই যে, কতিপয় নব্য-আরব যুবকের সঙ্গে এক বিবাহ-সভায়

তাঁহাকে যাইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। ঐ স্থানে গান বাজনারও বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। তিনি বিবাহ-সভায় যাইয়াই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সমস্ত রাত্রি গভীর নিদ্রায় অভিভূত থাকিলেন। এমন কি, রাত্রি অবসান হইল, বিবাহ-সভা ভঙ্গ হইল, লোকজন চলিয়া গেল; তখন তিনি নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন। এইরূপে ঐ গান-বাদ্য যুক্ত সভার কোনও অংশই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল না। বাল্যকাল হইতেই সর্ব্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদ জনক কার্য্য ও অনুষ্ঠানে তাঁহার বীতানুরাগিতা দৃষ্ট হইয়াছিল।

হজরতের বয়ঃক্রম যখন ৭ বৎসর, তৎপূর্ব্বে জল-প্লাবনে কাবাগৃহের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। এক্ষণে উহা নূতন ভাবে নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইল। এই কাবা-নির্ম্মাণ কার্য্যে সপ্ত বৎসর বয়স্ক হজরত (সাল:) প্রস্তর সকল তুলিয়া লইয়া গিয়া, রাজ-মিস্ত্রিদের নিকট পঁহুছাইয়া দিতেন। তিনি তহবন্দ পরিয়াছিলেন, এজন্য চলিতে-ফিরিতে ও প্রস্তরগুলি রাজ-মিস্ত্রিদের নিকট পঁহুছাইয়া দিতে অনেকটা অসুবিধা হইতেছিল; তহবন্দ পায় জড়াইয়া গিয়া বা উহার প্রান্তদেশ পদতলে পড়িয়া আছাড় খাইবার উপক্রম হইত। সাত বৎসর বয়স্ক বালকের উলাঙ্গবস্থায় চলা-ফেরা করা তখন দূষনীয় বলিয়া গণ্য হইত না; এজন্য তাঁহার অন্যতম পিতৃব্য আব্বাস্ তাঁহাকে তহবন্দের অসুবিধা হইতে মুক্ত করিবার জন্য, তহবন্দের কেনারা ধরিয়া টান দিয়া উহা খুলিয়া ফেলিলেন; বালক উলঙ্গ হইয়া গেলেন। তাঁহার লজ্জা ও শরম এত অধিক ছিল যে, উলঙ্গ হইবামাত্র বেহোশ্ (অচৈতন্য) হইয়া পড়িলেন। লোকদিগের সম্মুখে আপনাকে উলঙ্গ অবস্থায় থাকা সহ্য করিতে পারিলেন না। সকলে তাঁহার ঈদৃশ লজ্জাশীলতা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল; এবং তাড়াতাড়ি তাঁহাকে তহবন্দ পরাইয়া দিল।

শামের প্রথম সফর।

মক্কার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ছিল। তাহারা বেশীর-ভাগ শাম (সিরিয়া) দেশেই বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিত। তদ্ব্যতীত ইরাক ও ইমন প্রদেশেও যাতায়াত করা হইত। হজরতের বয়স যখন বার বৎসর, সেই সময় এক তেজারতি কাফেলার সঙ্গে আবু তালেবও কিছু বিক্রয়ের মাল লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি হজরতকে মক্কায়—স্বীয় গৃহে রাখিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; কিন্তু পিতামহের মৃত্যুর পর তিনি পিতৃব্যকে ছাড়িয়া কখনও একাকী থাকেন নাই ; সুতরাং তিনি চাচ্চাজানের জুদায়ী (বিচ্ছেদ) সহ্য করিতে অক্ষম ছিলেন। এজন্য যাত্রাকালে আবু তালেবকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আবু তালেবও ভ্রাতুষ্পুত্রের দেল-শকনী (মনোভঙ্গ) করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে লইয়া শামের 'সফরে' যাত্রা করিলেন। শামের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত 'বোছরা' (বজরাঃ) নামক স্থানে যখন মক্কার বণিক্‌দলের কাফেলা পঁহুছিল, তখন বহিরা নামক একজন ঈসায়ী রাহেব (খৃষ্টীয়ান সন্ন্যাসী) হজরতকে , দেখিয়াই নবী-আখেরজ্জমান (শেষ পয়গম্বর—তত্ত্ববাহক বা প্রেরিত পুরুষ) বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তিনি আবু তালেবের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র নবীয়ে আখেরজ্জমান হইবেন। ইঁহার মধ্যে ঐ সকল নিদর্শন বর্ত্তমান—যাহার সম্বন্ধে তওরিত ও ইঞ্জিলে লিখিত আছে ; অতএব ইঁহাকে আর সম্মুখের দিকে লইয়া যাওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। ইহাকে লইয়া য়িহুদীদিগের দেশে প্রবেশ করা কোনও ক্রমেই উচিত নয়। তাহাদের দ্বারা ইঁহার কোনওরূপ বিপদ ঘটিতে পারে। বহিরা রাহেবের কথা শুনিয়া আবুতালেব স্বীয় বাণিজ্য-দ্রব্যগুলি তাড়া-

তাড়ি ঐ স্থানেই বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন; এবং হজরতকে লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যদিও আবু তালেব শামের (সিরিয়ার) অভ্যন্তর ভাগস্থ কোনও শহরে প্রবেশ না করিয়া বাণিজ্য-দ্রব্যগুলি শামের প্রবেশ-পথে—দক্ষিণদিকস্থ বোছরা শহরেই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেই তিনি প্রচুর লাভবান্ হইয়াছিলেন। অন্য রওয়ায়েতে (বর্ণনায়) আছে যে, আবু তালেব বহিরা সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া হজরতকে লোকজন সঙ্গে দিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন, ও স্বয়ং সিরিয়া-গামী বণিক্‌দলের সঙ্গে চলিয়া গেলেন; এবং বাণিজ্য-দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যথাসময়ে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হরবে ফোজ্জার অর্থাৎ প্রথম শরকৎ যুদ্ধ।

আরবের "ওকায্" নামক স্থানে প্রতি বৎসর একটি বৃহৎ মেলা বসিত। এই মেলায় শায়ের অর্থাৎ কবিদিগের কবিতার প্রতিযোগিতা এবং ঘোড় দৌড় হইত, তদ্ব্যতীত পাহালওয়ান দিগের কুশ্‌তি-কস্‌রৎ, যোদ্ধাদিগের যুদ্ধাভিনয়—'দঙ্গল'ও হইত। তদানীন্তন আরবের সকল সম্প্রদায়ের লোকই যুদ্ধ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। কথায় কথায় তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ-লড়াই বাঁধিয়া যাইত, একটুতেই প্রতিপক্ষের উপর তরবারি চালাইত। ওকাযের মেলায় সামান্য কোনও কথা লইয়া হাওয়াজেন সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোরেশ সম্প্রদায়ের 'ছেড়্-ছাড়্' তর্ক-বিতর্ক—বাক্-বিতণ্ডা আরম্ভ হইয়া গেল। প্রথমতঃ উভয় সম্প্রদায়ের বুদ্ধিমান্ মুরব্বি লোকেরা এই বিবাদ বাড়িতে দেয় নাই; সুতরাং এ ব্যাপারের এখানেই এক-প্রকার পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু বিবাদ-প্রিয়, কুচক্রী 'ওয়াকেয়া-পছন্দ' (সুযোগান্বেষী) লোক সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে; তদ্দ্বারা এই সামান্য বিবাদের পরিণাম ফল এই দাঁড়াইল যে, মিটিয়া যাইবার পর

বিবাদানল আবার তীব্রতেজে জ্বলিয়া উঠিল। এইবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মার্-কাট্ আরম্ভ হইল, উভয় পক্ষের বহুলোক হত এবং আহত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধ মহর্‌রম মাসে আরম্ভ হইয়াছিল, এজন্য ইহা "জঙ্গে-ফোজ্জার্" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কারণ আরব জাতির তদানীন্তন আকিদা (বিশ্বাস) অনুযায়ী মহর্‌রম মাসে যুদ্ধ করা মহা পাপের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই মাসে চলিত যুদ্ধ-হাঙ্গামাও মূলতবি (স্থগিত) রাখা হইত। এই সামান্য যুদ্ধ পরবর্ত্তী চারিটি বড় বড় যুদ্ধের ভূমিকা স্বরূপ ছিল; এবং প্রত্যেক পরবর্ত্তী যুদ্ধ, পূর্ব্ববর্ত্তী যুদ্ধাপেক্ষা ভীষণ ও লোক ক্ষয়কর মারাত্মক সমরাভিনয়ে পরিণত হইয়াছিল। কারণ যে যুদ্ধ প্রথমতঃ কেবল মাত্র হাওয়াযেন সম্প্রদায় ও কোরেশ দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; ক্রমে হাওয়যেন দলের সঙ্গে 'কয়েস্' ও 'য়িলান' সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এবং কোরেশ দলের সঙ্গে কেনানা সম্প্রদায়ের সমুদয় দল-উপদল যোগদান করিয়া অতি ভীষণ ও সর্ব্বসংহারক মহা সমরাভিনয়ের সূত্রপাত করিল। অতঃপর আরও বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন দল উভয় দলের যে কোনও দলে যোগদান করিয়া, যুদ্ধটীকে অতি ভীষণ হইতে ভীষণতর করিয়া তুলিল। অবশেষে এই যুদ্ধানল বিস্তৃতি লাভ করিয়া কয়েস সম্প্রদয় ও কানানা সম্প্রদায়ের জাতীয় মহাযুদ্ধে পরিণত হইল। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ যুদ্ধ অতি ভীষণ লোকক্ষয়কর ও হৃদয়-বিদারক সমরাভিনয় ছিল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহুতর দলপতি স্ব স্ব পদদ্বয়ে এজন্য বেড়ি পরিয়াছিল যে, যেন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাৎপদ হইতে বা পলায়ন করিতে না পারে। এই শেষ যুদ্ধে আমাদের হজরত রেছালতমাব রছুলে আরবী (ছালঃ) ও অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। বনি-কানানার প্রত্যেক দলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেনাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। তদনুসারে

বনি হাশেমের পক্ষে হজরতের অন্যতম পিতৃব্য যোবের-বিন্-আবদুল মোত্তালেব সেনাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সমগ্র বনি কালাব-এর পক্ষে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছিলেন হরব-বিন্-ওম্মিয়া। হজরত রেছালত পানার (সালঃ) বয়ঃক্রম এই সময় ১৫ বৎসর মাত্র ছিল। তাঁহার উপর এই ভারার্পিত হইয়াছিল যে, যুদ্ধকালে তিনি স্বীয় চাচ্চা- (পিতৃব্য) দিগের তীরগুলি তাহাদের হস্তে তুলিয়া দিতেন। তাঁহাকে কাহারও সঙ্গে সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে বা ভীষণ শোণিতপাত-জনক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া কাহারও শোণিত পাত করিতে হয় নাই। এই লোকক্ষয়-কর ভীষণ যুদ্ধে প্রথমতঃ বনি হাওয়া যেনকে জয়ী বলিয়া বোধ হইতেছিল, কিন্তু পরে যুদ্ধের 'হাওয়া' ফিরিয়া গেল। অবশেষে বনি কানানাই জয়ী ও বনি-ক্বয়েস্ পরাজিত হইল। স্থূলকথা, পরিণামে কোরেশ দলই জয়লাভ করিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইব্নে খলদুনের মতে এই যুদ্ধকালে হজরতের বয়স ১০ বৎসর ছিল; কিন্তু সহি অর্থাৎ নির্ভুল ঐতিহাসিক মত এই যে, ফজার্ যুদ্ধের সময় হজরতের বয়ঃক্রম ১৫ বৎসরই ছিল।

হজরতের তেজারত বা সওদাগরী।

হজরত যখন জওয়ান (পূর্ণ বয়স্ক যুবক) হইলেন, তখন তেজারত অর্থাৎ সওদাগরীর দিকে মনোযোগ প্রদান করিলেন। তাঁহার পিতৃ স্থানীয় চাচ্চা (পিতৃব্য) আবুতালেবও তাঁহার জন্য এই কার্য্যই পছন্দ (মনোনীত) করিলেন। ইহার পর তিনি মক্কার বণিক্দলের সঙ্গে কয়েকবার বাণিজ্যার্থ বিভিন্ন প্রদেশে গমন করেন। প্রত্যেক বারেই বাণিজ্যে বেশ লাভ হইয়াছিল। এই সকল সফরে (বাণিজ্য যাত্রায়) লোকেরা হজরতের

দেয়ানত ও আমানত (বিশ্বস্ততা ও গচ্ছিত দ্রব্যের সংরক্ষণ), কারবারের সাধুতা ও কারবারিদিগের সঙ্গে সদ্ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছিল। বিশেষতঃ মক্কাবাসী যে সকল লোকের সঙ্গে কারবার-সূত্রে সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে বিশ্বস্ত, প্রতিশ্রুতিতে অটল, সত্যবাদী ও কারবারে খোশমামেলা (সদ্ব্যবসায়ী) পাইয়াছিল। ফলতঃ সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী তৎকালে তাঁহার তুলনায় আর একজনও ছিল না। আবদুল্লা-বিন্-আবি-আলহামছা (রাজিঃ) নামক একজন ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ব-ছতের (পয়গম্বরি লাভের পূর্ব্বে) যখন হজরত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন, ঐ সময় আমি হজরতের সঙ্গে কোন কারবার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে-ছিলাম। কিন্তু কথাবার্ত্তা শেষ হইবার পূর্ব্বে আমাকে কোনও বিশেষ প্রয়োজনে অন্যদিকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল, যাইবার সময় আমি হজরতকে বলিয়া গেলাম, আপনি এই স্থানে অপেক্ষা করুন, আমি এখনই ফিরিয়া আসিয়া কারবার সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তার শেষ মীমাংসা করিব। সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করার পর ওয়াদার (প্রতিশ্রুতির) কথা আমি ভুলিয়া গেলাম ; তৃতীয় দিবসে যখন আমি ঐ পথ দিয়া গমন করিতেছিলাম, দেখিলাম, তিনি সেই স্থানেই দাঁড়া-ইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া এই কথা মাত্র বলিলেন "তুমি আমাকে কষ্ট ও পরিশ্রমে ফেলিয়াছ। আমি সেই হইতে এই স্থানে থাকিয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছি।" এইরূপে ছায়েব (রাজিঃ) নামে একজন ছাহাবী ছিলেন ; তিনি যখন ঈমান আনিলেন (পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন), তখন কেহ কেহ হজরতের খেদমতে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তচ্ছ্রবণে তিনি ফরামাইলেন যে, আমি ছায়েবকে তোমাদের অপেক্ষা ভালরূপে জানি। হজরতের উক্তি শুনিয়া

ছায়েব (রাজিঃ) আরজ করিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক। হুজুর এক সময় তেজারতে আমার সঙ্গে শরীক (অংশী) ছিলেন ; এবং আপনি কারবার সম্বন্ধীয় হিসাব-পত্র অতি পরিষ্কার ভাবে রাখিয়া ছিলেন। দেনা-পাওনায় একটুও গোলমাল হয় নাইঃ।

বনু আসদ সম্প্রদায়ের খোদায়জাঃ বিন্তে খোয়ায়লেদ নাম্নী এক সম্রান্ত মহিলা, কোরেশ দলের মধ্যে একজন খুব ধনী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তিনি বিধবা ছিলেন ; ইতিপূর্ব্বে ক্রমান্বয়ে তাঁহার দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় স্বামী বিপুল ঐশ্বর্য্য রাখিয়া যান। বিবী খোদায়জাঃ স্বীয় কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সর্ব্বদা শাম (সিরিয়া), এরাক (মেসোপটেমিয়া) ও ঈমনে বাণিজ্য-দ্রব্যাদি চালান দিতেন। হজরত রেছালতমাবের (ছালঃ) সততা, বিশ্বস্ততা ও কার্য্য-পটুতার প্রশংসাবাদ শুনিয়া তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রুতিমাকে হজরতের নিকট পাঠাইয়া এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি আমার বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া শামে গমন এবং প্রধান কর্ম্মচারী রূপে এই কার্য্য সম্পাদন করিলে আমি সুখী হইব। হজরত স্বীয় চাচ্চা (পিতৃব্য) আবুতালেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, এবং তাঁহার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন। বিবী খোদায়জাঃ-ও তাঁহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বিবী খোদায়জার বাণিজ্য-দ্রব্যের প্রধান কর্ম্মচারী রূপে কাজ লইয়া বাণিজ্যার্থ শামে গমন করিলেন। এই বাণিজ্য-যাত্রায় বিবী খোদায়জার (রাঃ-আঃ) বিশ্বস্ত ক্রীতদাস ময়ছারাঃ ও তাঁহার একজন আত্মীয় খযিমাঃ এব্নে হকিম হজরতের সঙ্গে গমন করিয়াছিল।

শামের দ্বিতীয় সফর।

উপরোক্ত তেজারতি কাফেলা, যাহার সঙ্গে হজরত প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা রূপে গমন করিতেছিলেন—ঐ কাফেলা শামে (সিরিয়ায়) প্রবেশ করিয়া এক ঈসায়ী সাধনাশ্রমের নিকট শিবির সন্নিবেশিত করিল। ঐ আশ্রমে একজন রাহেব (সাধু বা সন্ন্যাসী) বাস করিতেন, তাঁহার নাম নস্তরা। নস্তরা হজরতকে দেখিতে পাইয়া ঐ সাধনাশ্রম হইতে কতিপয় প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থ লইয়া আসিলেন। রাহেব (সন্ন্যাসী) হজরতের নিকটে আসিয়া তাঁহার শরীর ও বদন মণ্ডল অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। একবার তাঁহাকে দেখেন, আবার কেতাব সমাবিয়া (খোদা-প্রেরিত গ্রন্থ) পাঠ করেন; এবং গ্রন্থোল্লিখিত নিদর্শন সমূহের সঙ্গে হজরতের শরীর, বদন মণ্ডল প্রভৃতি মিলাইয়া দেখেন। সন্ন্যাসীর এইরূপ অদ্ভুত কার্য্য-কলাপ দর্শনে খযিমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল; তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "এয়া আলে গালেব" অর্থাৎ আহ্‌লে গালেব, সাহায্যার্থ অগ্রসর হও। এই আওয়াজ শুনিয়া কাফেলার সমস্ত কোরেশ সেখানে দৌড়িয়া আসিল। নস্তরা কোরেশদিগকে দলবদ্ধ হইয়া আসিতে দেখিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন; এবং স্বীয় আশ্রম-গৃহের ছাদের উপর উঠিয়া বসিলেন। সেখান হইতে কাফেলার লোক-দিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমাদের ভয়ের কোনও কারণ নাই। তোমাদের সঙ্গে ঐ যে লোকটী আছেন, আমি সমাবিয়া গ্রন্থের সঙ্গে উঁহার দেহ এবং দেহের নিদর্শন সমূহ মিলাইয়া দেখিতেছিলাম। নবী আখেরম্ জমানের (শেষ পয়গম্বর বা প্রেরিত পুরুষের) যে সকল চিহ্ন, নিদর্শন ও লক্ষণ কেতাবে লিখিত আছে, সেই সমস্তই এই লোকটীর মধ্যে দেখিতে পাইতেছি। একথা শুনিয়া কাফেলার লোকদিগের উৎকণ্ঠা দূর হইল।

এ যাত্রায়ও বাণিজ্য-দ্রব্য সিরিয়ায় বিক্রয় করিয়া বেশ লাভবান্ হওয়া গেল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে কয়েক বার হজরত, বিবী খোদেজার (রাঃ—আঃ) বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া পূর্ব্বদিকে বাহ্-রায়েন, দক্ষিণ দিকে ঈমন এবং উত্তর দিকে শাম (সিরিয়া) দেশে গমন করিলেন ; এবং প্রত্যেক বাণিজ্য-যাত্রায়ই প্রচুর লাভ হইল।

হজরত (সালঃ) এর সঙ্গে বিবী খোদায়জার (রাঃ-আঃ) বিবাহ।

হজরতের দেয়ানত, আমানত, সদ্ব্যবহার, পবিত্রতা, শিষ্টতা, ভদ্রতা, নম্রতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ নিচয় বিবী খোদেজার (রাঃ-আঃ) অবিদিত ছিল না। যদিও মক্কার শরীফ্ (সম্ভ্রান্ত) ও ওমরাঃ (ঐশ্বর্য্যশালী) ব্যক্তিগণ বিবী খোদেজাতুল কোব্‌রার (রাঃ—আঃ) পাণিগ্রহণের একান্ত আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং নফিছাঃ নাম্নী এক স্ত্রী-লোকের দ্বারা—অন্য রওয়ায়েতে আতেকা-বিন্তে-আবদুল মোত্তালেব দ্বারা হজরত রেছালত মা'বের (ছালঃ) খেদমতে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। হজরত, প্রতিপালক পিতৃব্য আবুতালেবের অভিমত জানিতে চাহিলে, তিনি এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করাতে, তিনি নিজেও তাহাতে সম্মতি জানাইলেন। তদনুসারে যথাসময়ে শুভ-বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। মক্কার তদানীন্তন প্রথানুযায়ী বিবাহ কার্য্য সম্পাদন ও আবুতালেব কর্ত্তৃক বিবাহের খোতবা পঠিত হইল। এই বিবাহে ওরকা-বিন্-নওফল, ওমর-এব্‌নে আসদ প্রভৃতি বিবী খোদেজাতুল কোব্‌রার (রাজিঃ-আঃ) সমস্ত আত্মীয়গণ, পক্ষান্তরে হজরতের রেশ্‌তাদার (স্বজন বর্গ) উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের সময় হজরতের বয়ঃক্রম ২৫ পঁচিশ বৎসর

এবং হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রার (রাঃ—আঃ) বয়স ৪০ চাল্লিশ বৎসর ছিল। হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রার (রাঃ—আঃ) গর্ভে হজরত (ছালঃ) এর তিনটী পুত্র ও ৪টী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

ছাদেক এবং আল-আমিন উপাধি লাভ।

কেবলমাত্র মক্কা-মোয়াজ্জমায় নহে—সমগ্র-আরবে তাঁহার নেকী (পুণ্যানুষ্ঠান), সদাশয়তা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, শিষ্টতা, নম্রতা, সৌজন্য, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, লোকে তাঁহার নাম উল্লেখ না করিয়া "আল্‌-ছাদেক" কিংবা "আল্‌-আমীন" বলিয়া ডাকিতেন। ঐ সময়ই সমগ্র আরবে "আস্‌-সাদেক" ও "আল-আমীন" বলিলে কেবলমাত্র তাঁহাকেই বুঝাইত। আর এই সকল নামেই লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিত। ভারতীয় থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর পেশোয়া (পরিচালিকা বা নেত্রী) মিসেস্ এনি বেসান্ত হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) সম্বন্ধে কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও একবার দেখুন :—"পয়গম্বর আজম (হজরত রছুলে আকরম [ছালঃ]), যে কথায় আমার হৃদয়ে তাঁহার আজমত (বড়ত্ব, মহত্ত্ব) বোজর্গী (সম্মান) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ঐ ছেফৎ (গুণ), যদ্দ্বারা তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহাকে "আল্‌-আমীন" (বড় দেয়ানতদার—গচ্ছিত-দ্রব্য বিশ্বস্ততার সহিত সংরক্ষণকারী) উপাধি প্রদান করিয়াছিল; কোনও প্রশংসা ইহা অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না। **আর** কোনও কথা ইহা অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব বোধক মোসলমান ও অমোসলমানের—উভয়ের জন্য অনুকরণ যোগ্য (গ্রহণ যোগ্য) নাই।" * * * ইত্যাদি।

বহু প্রাচীনকালে আরব দেশে বিশেষতঃ মক্কায় অনেকে মিলিয়া পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিল যে, আমরা সর্ব্বদা উৎপীড়িত লোকদিগের পক্ষাবলম্বন ও জালেম (অত্যাচারী) লোকদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিব। যে সকল লোক এই সম্প্রদায় ভুক্ত ছিল, ঘটনা বশতঃ ইহাদের নামে "ফজল" শব্দ ব্যবহৃত হইত। এজন্য তাহাদের এই অহদ (সন্ধি বা সঙ্ঘবদ্ধতা) কে "হলফুল ফজল" বলা যাইত। হজরতের (ছালঃ) আবির্ভাব কালে এই সম্প্রদায়ের লোকের অস্তিত্ব আরব দেশে ছিল না। কিন্তু কথা-প্রসঙ্গে তাহাদের বিষয় উল্লেখ করা হইত। ফজ্জার যুদ্ধের পর হজরতের পিতৃব্য যোবের-বিন্-আবদুল মোত্তালেবের মনে এই খেয়াল পুনরায় জন্মিল যে, পূর্ব্বোক্ত বিষয় আবার নূতনভাবে উজ্জীবিত করা হউক। তদনুসারে কতিপয় কোরেশ আবদুল্লা-বিন্-জদয়ানের গৃহে সমবেত হইয়া পরস্পর শপথ করিল যে, আমরা সর্ব্বদা অত্যাচারীর বিরুদ্ধাচরণ এবং উৎপীড়িতের সাহায্য করিব। হজরত (ছালঃ) ঐ সময় বালক থাকিলেও,:ঐদলে যোগদান করিয়াছিলেন। যখন তিনি বাল্যাবস্থা ছাড়াইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তখন তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন দলের নেতা, ছরদার এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণ বুদ্ধিমান লোক-দিগের নিকট দেশের অশান্তি, মোসাফের(প্রবাসী বা বণিক্)-দিগের মাল-পত্র লুণ্ঠন, বৃদ্ধ এবং দরিদ্রদিগের প্রতি বলবান্ যবরদস্ত এবং আমীর (বড় লোক)-দিগের অত্যাচার ইত্যাদি অবস্থা জলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া,-বক্তৃতা প্রদান করিয়া) এই সকল বিষয়ের সংশোধন ও প্রতিকার জন্য সকলকে উৎসাহিত ও মনোযোগী করিলেন। অবশেষে একটী "আঞ্জমন" (সমিতি) গঠিত হইল। উহাতে বনু-হাশেম, বনুল-মতলেব, বনু-আসদ, বনু-যহ্‌রাঃ ও বনু-তমিম সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্মিলিত হইল। কিন্তু বনু-ওম্মিয়া ও বনু-নওফল্ উহাতে যোগদান করিল না। এই আঞ্জমনের প্রত্যেক মেম্বরকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইত যে,

(১) আমরা দেশের বদ আমনী (অশান্তি) দূর করিব ; (২) মোসাফের-দিগের হেফাযৎ (তত্ত্বাবধান ও রক্ষা কার্য্য) করিব ; (৩) গরীব-(দরিদ্র) দিগের সাহায্য করিব ; দুর্ব্বলকে সবলের হস্ত হইতে রক্ষা করিব। এই আঞ্জমন দ্বারা দেশবাসীদিগের মহোপকার সাধন হইতে লাগিল। যখন হজরত (ছালঃ) পয়গম্বরী লাভ করিলেন, তখনও তিনি বলিতেন, যদি আজও আমাকে পূর্ব্বোক্ত সমিতি নামে লোকে আহ্বান করে, এবং আমার নিকট সাহায্য চায়, তবে আমি তাহাকে জওয়াব দিব—অর্থাৎ সকলের প্রথমে তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইব।

কোরেশ দলের উপর হজরতের নেতৃত্ব লাভ।

অসতর্কতা বশতঃ পবিত্র কাবাগৃহে আগুণ লাগিয়া ছিল। আগুণের প্রভাবে অনেক স্থানের প্রাচীরাদি ফাটিয়া গিয়াছিল। কোরেশগণ সঙ্কল্প করিল যে, এই অগ্নি-বিধ্বস্ত ইমারতকে একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঐ স্থলে নূতন ইমারত নির্ম্মাণ করা হউক। এই মতে সকলেই সায় দিলেন বটে, কিন্তু পুরাতন কাবা-গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কেহই সাহস পাইতেছিল না। তাহারা মনে করিতেছিল, যে কেহ পবিত্র গৃহ ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার বিপদ অনিবার্য্য। অবশেষে কোরেশ ছর্দ্দারদিগের মধ্য হইতে অলিদ-বিন্ মসিরা প্রথমে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। তৎপর ক্রমশঃ সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই পুরাতন ও দগ্ধীভূত কাবাগৃহ ভগ্ন করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ঠিক ঐ সময়েই "জেদ্দা" বন্দরের সম্মুখে লোহিত সাগরে একখানি জাহাজ ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র কোরেশগণ উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া ঐ জাহাজের কাঠগুলি ক্রয় করাইল। তন্মধ্যে যে গুলি কার্য্যের উপযুক্ত,

মক্কা শরিফ ও খানে কাবা
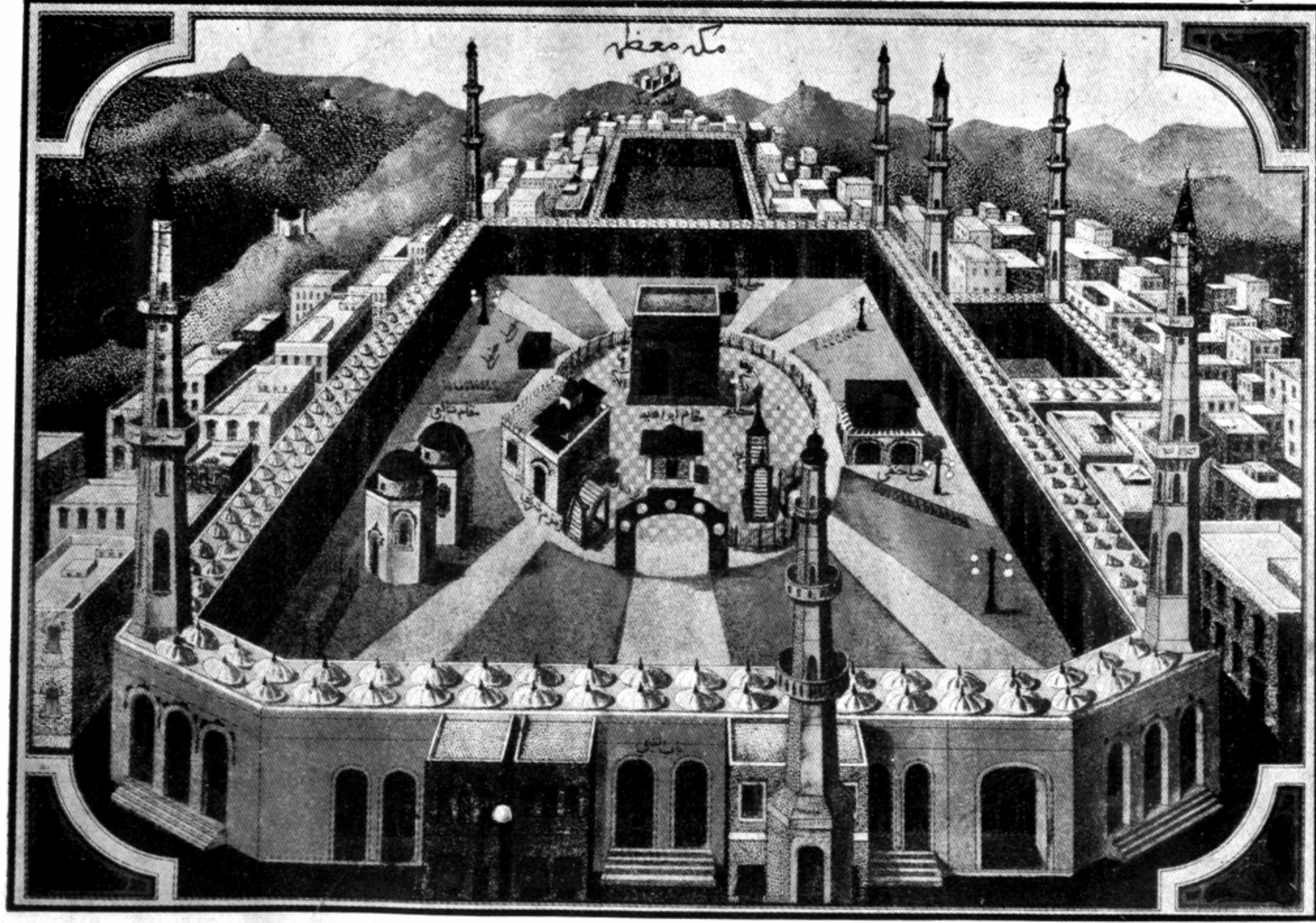
পাক পাঞ্জতন। ২৪ পৃষ্ঠা।

এবং ভাল অবস্থায় ছিল, উহা উষ্ট্রের সাহায্যে মক্কায় আনীত হইল। এই মজমুৎ কাষ্ঠগুলি কাবা গৃহের ছাদে লাগাইবার জন্য ক্রয় করা হইয়াছিল। পুরাতন কাবা-গৃহ ভাঙ্গিয়া এবং উহার মাল-মসালা সরাইয়া ভিত্তি গাঁথিতে গাঁথিতে যখন ইব্রাহিমির বনিয়াদ (ভিত্তি) পর্য্যন্ত পঁহুছিল, তখন ঐ স্থান ছাড়িয়া উহার পর হইতে আবার বনিয়াদ গাথার কাজ আরম্ভ হইল। পূরা ছাদের জন্য পূরা মাপের বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ড সকল ছিল না, এজন্য খানা কাবা ইব্রাহিমি বনিয়াদের উপর পুরা গাঁথুনী করা হইল না। বরং একদিকে অল্প স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ,এক্ষণে গাথাই (নির্ম্মাণ) কার্য্য ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে উঠিতে ঐ স্থান পর্য্যন্ত উঠিল, যেখানে "হজরল আছওয়াদ" নামক পবিত্র প্রস্তর খণ্ড স্থাপন করিতে হইবে। এই প্রস্তর স্থাপন-ব্যাপার লইয়া কোরেশদিগের মধ্যে এমন মনোবাদের সৃষ্টি হইল যে, তাহা লইয়া একটা ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া দাঁড়াইল। এই বিবাদের কারণ এই ছিল যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দলপতি ইচ্ছা করিতেন, আমি হজরল আছওয়াদ যথাস্থানে স্থাপন করিব। দলপতিদিগের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ঐ পবিত্র প্রস্তর যথাস্থানে স্থাপন জন্য জেদ করিতে লাগিল। দলপতিগণ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া পরস্পরের মুণ্ডপাত করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইল। বনু-আব্দ দার অর্থাৎ আব্দ্ দার বংশীয়গণ শপথ করিয়া বলিল যে, হয় আমরা প্রস্তর যথাস্থানে স্থাপন করিব, নয় প্রতিপক্ষদিগের মুণ্ডপাত করিব, এবং একাজের জন্য নিজেদের প্রাণ দিব। এই বিবাদের জন্য নির্ম্মাণ কার্য্য পাঁচ দিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিল। অবশেষে কোরেশ বংশের নেতাগণ কাবা-গৃহে সম্মিলিত হইলে, তথায় একটী সভার অধিবেশন হইল। এই 'মজলেসে' (সভায়) আবু ওম্মিয়া-বিন্-মগিরা একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিল। সেই প্রস্তাবটী এই—

আগামী কল্য যে ব্যক্তি সর্ব্ব-প্রথমে পবিত্র কাবা-গৃহে প্রবেশ করিবে, তাহাকেই 'হাকেম' (মীমাংসাকারী) নির্ব্বাচিত করা হইবে ; ঐ ব্যক্তি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা সকলকেই মান্য করিতে হইবে। সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। পরদিন অতি প্রত্যূষে দেখা গেল, সর্ব্ব প্রথমে হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) কাবা-গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে "আল-আমীন"—"আল্ আমীন" শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল ; এবং সকলে বলিয়া উঠিল, আমরা সকলেই আপনার 'ফয়সলার' (মীমাংসার) উপর নির্ভর করিতে প্রস্তুত। হজরত সভায় উপস্থিত হইবামাত্র সকলে ঘটনাটী তাঁহার গোচরীভূত করিল ; এবং বলিল, আপনি যেরূপ ভাল মনে করেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করুন। আপনি যে মীমাংসা করিবেন, আমরা সকলেই তাহা মানিয়া লইব। এস্থলে ভাবিবার ও 'খেয়াল' করিবার বিষয় এই যে, যে সম্মান ও প্রাধান্য মক্কার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গর্ব্বিত ছর্দ্দার ও নেতাগণ লাভ করিতে ইচ্ছুক ছিল, আর শোণিত পূর্ণ পেঁয়ালায় অঙ্গুলী প্রক্ষেপ পূর্ব্বক, ঐ সময়কার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে মরিতে কিংবা মারিতে প্রস্তুত হইয়া 'গলিজ' (অপবিত্র) শপথ করিয়াছিল,— ঐ সম্মান ও প্রাধান্য হজরতকে প্রদান জন্য সকলেই ইচ্ছুক ও আগ্রহান্বিত ছিল। এই দলিল ও প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, হজরতের ন্যায়-বিচার ও বিশ্বস্ততার প্রতি সকলেই আস্থা স্থাপন করিত। অমন গর্ব্বোন্মত্ত, 'যেদ্দি,' আত্মম্ভরী, গোঁয়াড়-গোবিন্দ কোরেশ জাতির হৃদয় অধিকার করা, তাহাদের কঠোর হৃদয় আকর্ষণ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। যে সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহারা হজরতের প্রতি আস্থা সম্পন্ন ও তাঁহার ভক্ত এবং অনুরক্ত হইয়াছিল, সে গুণ ও সে শক্তি অতুলনীয় এবং অসাধারণ। তিনি ব্যাপারটী জানিতে পারিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, এবং অনতিবিলম্বেই বিবাদীয়

বিষয়ের অতি সহজ মীমাংসা করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে বৃদ্ধ, বিচক্ষণ, বহুদর্শী কোরেশ-ছরদারগণ হজরতের (সালঃ) প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব, অগাধ বিচার-ক্ষমতা ও বিবেক্-শক্তি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল; সঙ্গে সঙ্গে "মার হাবা" শব্দে গগন পবন মুখরিত হইয়া উঠিল। তিনি যাহা মীমাংসা করিলেন, তাহা এই:—হজরত (সালঃ) একখানা চাদর বিছাইলেন; তাহার উপর স্বহস্তে হজরল আছওয়াদ স্থাপন করিলেন; তৎপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ছরদার ও নেতাগণকে বলিলেন আপনারা সকলে চাদরের কেনারা ধরিয়া তুলুন; তদনুসারে তাহারা সকলে চাদরের চতুর্দ্দিক ধরিয়া তুলিল, এবং পবিত্র কাবা গৃহের যে স্থানে ঐ প্রস্তর খণ্ড স্থাপন করা যাইবে, সেই পর্য্যন্ত চাদরসহ লইয়া যাইলে হজরত পবিত্র প্রস্তর খানি চাদর হইতে তুলিয়া লইয়া ঐ স্থানে স্থাপন করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে রাজমিস্ত্রিরা তাহা প্রচীরের সঙ্গে গাথিয়া ফেলিল। এই ব্যাপার এমন সুন্দরভাবে—বিনা খট্‌কায় সম্পাদিত হইল যে, কাহারও কোন "শেকায়েত" বা আপত্তি করিবার উপায় রহিল না; কেহ ইহাতে প্রতিবাদ-যোগ্য কোন কথা পাইল না। পরস্পর বিরুদ্ধবাদী সকল দলই ইহাতে সন্তোষ লাভ করিল, একটা ভীষণ ও মারাত্মক আসন্ন যুদ্ধের হস্ত হইতে কোরেশগণ অব্যাহতি লাভ করিল। এই ব্যাপারে ওত্‌বাঃ-বিন্‌-রবীয়া-বিন আব্‌দ শামছ্‌, আছুদ বিন্‌-মতলব বিন্‌-আছদ-বিন্‌-আবদুল ওয়া, আবু হযিফাঃ-বিন্‌-মগিরাঃ-বিন্‌-ওমর-বিন্‌-ফথ্‌রুম এবং কায়ম্‌-বিন্‌-আদি আল ছমি এই চারি প্রধান ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক 'যেদ' করিতেছিল। প্রস্তর উত্তোলনের গৌরব ও সম্মান লাভ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে কেহই অপরের নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। হজরত কর্ত্তৃক যে সুন্দর মীমাংসা হইল, তাহাতে এই চারিজন পরাক্রান্ত ছরদার (দলপতি) ও খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিল। যদি এই যুদ্ধ

সঙ্ঘটিত হইত, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় যুদ্ধ হইতে আরবে ইহা অতি ভীষণ আকার ধারণ করিত। কত বংশ:ধ্বংস হইত, কত গৃহ উজাড় হইত, কত নারী বিধবা হইত, কত বালক বালিকা 'এতিম (অনাথ) হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। হজরতের মীমাংসায় এই ভীষণ ও মহা সংহারক যুদ্ধানল অতি সহজেই নির্ব্বাপিত হইল। এই সময় হজরতের বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর ছিল।

হজরত আলী (রাজিঃ) ও যায়েদ (রাজিঃ) এর তরবিয়ত (শিক্ষাদি)।

হজরতের (ছালঃ) উচ্চ সম্মান ও সকলের হৃদয়াকর্ষক গুণ এবং শক্তি মক্কায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। তৎকাল পর্য্যন্তও কেহ তাঁহার শত্রু ছিল না। হজরতের (সালঃ) প্রতি স্নেহ প্রদর্শনকারী এবং তাঁগার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী লোকের সংখ্যা অনেক ছিল। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা প্রীতি-জনক ব্যবহার, সত্য- বাদিতা, বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সমগ্র দেশে আলোচনা হইত। তেজারত (বাণিজ্য) তাঁহার পেশা ছিল। খোদেজাতুল কোব্‌রার (রাঃ—আঃ) সঙ্গে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর তিনি সচ্ছল অবস্থায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। এক সময় মক্কায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। হজরতের চাচ্চা আবুতালেবের পরিবারে লোকসংখ্যা অধিক ও আয়ের পরিমাণ কম থাকাতে, দরিদ্রতা তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। যদিও তিনি স্বকীয় জ্ঞান-গরিমায়, বুদ্ধিমত্তায়, বংশ-মর্য্যাদায় মক্কায় একজন বিশেষ সম্মানিত পুরুষ ছিলেন ; কিন্তু অর্থাভাবে অনেকটা ক্লেশ ভোগ করিতেন। দরিদ্রতা যেন তাঁহার চির সহচর ছিল। বিবাহের পর হজরত পিতৃব্যের আশ্রয় ছাড়িয়া নব-পরিণীতা সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতেছিলেন। হজরত

দুর্ভিক্ষের প্রকোপে পিতৃব্য আবুতালেবের কষ্ট ও অসুবিধা দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন; এবং অন্যতম পিতৃব্য আব্বাস (রাজিঃ) কে (যাঁহার বংশধরগণ বোগদাদ নগরের প্রতিষ্ঠা ও তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়া জগদ্বিখ্যাত আব্বাসিয়া খেলাফতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন) বলিলেন, চাচ্চাজান! এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় বড় চাচ্চাজান বিপুল পরিবার বর্গ লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, কিছুতেই সংসারের ব্যয় সঙ্কুলন করিতে পারিতেছেন না। আসুন, আপনি তাঁহার একটী পুত্রের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করুন, আর একটীর ভরণ পোষণের ভার আমি গ্রহণ করি। আব্বাস-বিন্-আবদুল মোত্তালেব হজরতের এই প্রস্তাব 'পছন্দ' (মনোনীত) করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা উভয়ে আবুতালেবের 'খেদমতে' উপস্থিত হইলেন, এবং আপনাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তচ্ছ্রবণে আবুতালেব বলিলেন, তোমাদের এ প্রস্তাবে আমার আপত্তি নাই, আকিল (আবু তালেবের দ্বিতীয় পুত্র)-কে আমার নিকট রাখিয়া আর যাহাকে যাহাকে তোমাদের লইয়া যাইবার ইচ্ছা হয়, তাহাদিগকে লইয়া যাইতে পার। তদনুসারে আব্বাস জা-ফর-তইয়্যার বিন আবু তালেব কে (তৃতীয় পুত্র) এবং হজরত (ছালঃ) ৪র্থ অর্থাৎ সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র (হজরত) আলী (রাজিঃ) কে প্রতিপালনার্থ স্ব স্ব গৃহে লইয়া গেলেন। ইহা ঐ বৎসরের ঘটনা, যে বৎসর পবিত্র কাবাগৃহ পুনর্নির্ম্মিত হয়। এই সময় হজরতের বয়স ৩৫ বৎসর, আর হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুহু বয়ঃক্রম ৫ বৎসর মাত্র ছিল। ইহা কাবা গৃহ পুনর্নির্ম্মাণের পরবর্ত্তী সময়ের ঘটনা।

হজরত খোদেয়েজাতুল-কোবরার (রাঃ—আঃ) ভ্রাতুষ্পুত্র হকিম-বিন্-খরাম কোনও স্থান হইতে একটী গোলাম (দাস) ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল; হকিম সেই ক্রীত দাসটীকে স্বীয় ফুপ্‌পিকে নজর (উপঢৌকন) স্বরূপ প্রদান করে। হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রা

(রাঃ—আঃ) আবার সেই দাসটী হজরতকে নজর স্বরূপ দিয়াছিলেন। এই ক্রীত দাসের নাম যয়েদ বিন্-হারেছঃ(রাজিঃ) ছিল। এই যুবক-দাস প্রকৃত পক্ষে এক স্বাধীন খৃষ্টীয়ান পরিবারের বালক ছিলেন। কোনও লুঠ-মারের হাঙ্গামায় ধৃত হইয়া দাস রূপে বিক্রীত হন। কিছুদিন পরে যয়েদের পিতা হারেছ্ ও তাঁহার পিতৃব্য কায়াব জানিতে পারে যে যয়েদ ক্রীতদাস রূপে মক্কায় কোন ও ব্যক্তির গৃহে আছে। তাহারা তদনুসারে মক্কা-মোয়াজ্জমায় আসিয়া হজরতের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইল যে যয়েদকে দাসত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন, আমরা উহার পিতা এবং পিতৃব্য। হজরত তাহাদের প্রার্থন তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করিয়া ফরমাইলেন যে, যদি যয়েদ তোমাদের সঙ্গে যইতে চায়, তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই,—সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। তদনুসারে যয়েদকে ডাকিয়া আনান হইল, হজরত রেছালত মাব (সালঃ) তাঁহাকে বলিলেন, যয়েদ ! তোমার পিতা ও পিতৃব্য তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে; আমার পক্ষ হইতে তোমাকে 'এজাযত' (অনুমতি) দেওয়া যাইতেছে যে, তুমি উহাদের সঙ্গে চলিয়া যাও। যয়েদ (রাজিঃ) বলিলেন, আমি ত আপনাকে ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে ইচ্ছা করি না। আমি আজীবন আপনার খেদমতেই থাকিব। তচ্ছ্রবণে যয়েদের পিতা ক্রোধান্বিত হইয়া যয়েদ (রাজিঃ)-কে বলিল, তুই স্বাধীনতা হইতে গোলামী (দাসত্ব) পছন্দ করিতেছিস্? তদুত্তরে যয়েদ (রাজিঃ) বলিলেন, আমি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ) এর মধ্যে ঐ সকল মহৎ গুণ দেখিয়াছি, যাহা আমি আমার পিতা এবং সমস্ত দুনিয়ার লোককেও তাঁহার উপর তরজিহ্ (প্রাধান্য) দিতে পারি না। হজরত রেছালত মাব (সালঃ) যয়েদের (রাজিঃ) উত্তর শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যয়েদ (রাজি) কে সঙ্গে লইয়া পবিত্র কাবাগৃহে গমন করিলেন, এবং

উচ্চৈঃস্বরে 'ফরমাইলেন', হে উপস্থিত লোক সকল! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি আজ যয়েদ (রাজিঃ) কে 'আযাদ' (স্বাধীন) *করিয়া দিলাম (দাসত্ব হইতে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক স্বাধীনতা দান করিলাম), এবং তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলাম। অদ্য হইতে যয়েদ আমার ওয়ারেস্ (উত্তরাধিকারী) হইবে; পক্ষান্তরে আমি উহার ওয়ারেছ হইব।) যয়েদের (রাজিঃ) পিতা ও পিতৃব্য এই ব্যাপার দর্শনে আনন্দ লাভ করিল, আর যয়েদ (রাজিঃ) কে প্রসন্ন চিত্তে হজরতের নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল। ঐ দিন হইতে যয়েদ (রাজিঃ) যয়েদ-বিন্ হারেস স্থলে, যয়েদ-বিন্-মোহাম্মদ (সালঃ) নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু হজরতের (ছালাঃ) হেজরতের পরে যখন পবিত্র কোরআন শরীফে এই আয়েত 'নাযেল' হইল যে, মুখে পুত্র বলিয়া ডাকিলে পুত্র হইতে পারে না; ঐরূপ পুত্র করা 'যায়েজ' (সিদ্ধ) নহে। তখন হইতে যয়েদ (রাজিঃ) আবার যয়েদ-বিন্-হারেস্ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু যয়েদের (রাজিঃ) প্রতি হজরতের (ছালঃ) স্নেহ ও ভালবাসা পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণই রহিয়া গেল। বরং দিন দিন উহার মাত্রা (পরিমাণ) বাড়িতে লাগিল। এই ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, নবুয়ত লাভের পূর্ব্বে তাঁহার স্বভাব ও 'আখ্‌লাক' (শিষ্টতা ও সৌজন্য) কিরূপ উন্নত ছিল।

খোদা তা-লার দিকে রুজু ও নির্জ্জন বাসের ইচ্ছা।

যখন হজরতের বয়ঃক্রম বত্রিশ তেত্রিশ বৎসর হইয়াছিল, তখন আল্লাহ্ তা-লার দিকে হৃদয়ের আকর্ষণ ও একাকী নির্জ্জনে থাকিবার ইচ্ছা বড়ই

বাড়িয়া গেল। ঐ সময় হইতে একটী চমক ও জ্যোতিঃ (রওশনি বা আলো) তাঁহার দৃষ্টি পথে প্রায়ই পতিত হইত। ঐ রওশ্‌ান (নূর বা জ্যোতিঃ) দর্শনে তিনি আতঙ্কিত ও ভীত হইতেন। ঐ রওশ্‌নির মধ্যে কোনও কিছুর আকৃতি দৃষ্ট হইত না, কিংবা তন্মধ্য হইতে কোনও 'আওয়াজ' (শব্দ) ও শুনা যাইত না। আরবের মশরেকানা (অংশীবাদিত্ব) কার্য্যকলাপের প্রতি তিনি সর্ব্বদাই ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন। এক সময় মক্কার কতিপয় মশ্‌রেক (অংশীবাদী) কোনও সভায় হজরতের সম্মুখে কিছু খাদ্য দ্রব্য রাখিল, যাহা তৎপূর্ব্বে বোত অর্থাৎ প্রতিমার ভোগ স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ঐ খাদ্যদ্রব্য (রুটি প্রভৃতি) যয়েদ বিন্‌-ওমরুর দিকে সরাইয়া দিলেন। যয়েদ-বিন্‌-ওমরুও ঐ খাদ্য দ্রব্য খাইলেন না; এবং মশরেক অর্থাৎ প্রতিমা-পূজকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি প্রতিমার নামে ভোগ দেওয়া (উৎসর্গীকৃত) খাদ্য-দ্রব্য আহার করি না। ইনি সেই যয়েদ-বিন্‌-ওমরু-বিন্‌-নফেল—যাহার কথা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। যিনি দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ্‌ আনহুর 'চাচ্চা' (পিতৃব্য) ছিলেন। হজরত একাকী নির্জ্জন বাসকালে আল্লাহ্‌ তা-লার কোদরতের (মহিমাব) প্রতি গওর- ফোকর (চিন্তা ও আলোচনা করিতেন। আর খোদাতা-লার অনন্ত মহিমাও বর্ণনায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন; অর্থাৎ নিবিষ্ট মনে খোদাতালার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। শেক এবং 'মশরেকানা' কার্য্যে (আল্লাহ তা-লার অংশীবাদিত্ব এবং ঐ শ্রেণী সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানে) তিনি চিরদিনই বিরত থাকিতেন। পয়গম্বরী লাভের—অর্থাৎ তাঁহার বয়ঃক্রম ৪০ চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে, যতই ঐ সময় নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; ততই তিনি একাকী নির্জ্জন বাসে খোদাতা-লার অসীম মহিমা, অফুরন্ত করুণা ও অতুলনীয় শিল্প চাতুর্য্যের দিকে মনোনিবেশ ও আত্ম-নিয়োগ

করিতে লাগিলেন। তদনুসারে মক্কার নিকটবর্ত্তী "হেরা" নামক গিরিগুহা স্বীয় সাধনার উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনোনীত করিয়া লইলেন। কিঞ্চিৎ ছাতু ও কিছু পানী সঙ্গে লইয়া তিনি মক্কার অদূরবর্ত্তী সেই গিরি-গহ্বরে প্রবেশ পূর্ব্বক, অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা-লার উপাসনা ও আরাধনায় নিযুক্ত হইতেন। যখন ছাতু ও পানী ফুরাইয়া যাইত, তখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, এবং ঐ সমস্ত লইয়া আবার গারে হেরায় (হেরা পাহাড়ের গুহায়) প্রবেশ পূর্ব্বক, মহামহিমাময় আল্লাহ্ তা-লার ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হইতেন। গারে হেরা আজকাল "জবল-নুর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা মক্কা হইতে ৩ মাইল দূরে—মিনা যাইবার পথে—বাম দিকে অবস্থিত। যে গহ্বরে বসিয়া হজরত (ছালঃ) এবাদত-বন্দেগী ও ধ্যান-ধারণা করিতেন, উহা দৈর্ঘ্যে ৪ চারি গজ ও প্রস্থে ১৮০ পৌণে দুই গজ। ধ্যানাবস্থায় যে স্বপ্ন দৃষ্ট হইত, তাহাতে সোবেহ্-ছাদেকের 'রওশনির' (আলোর) ন্যায় আলো তিনি দেখিতে পাইতেন। ভোর বেলা যে ঘটনা ঘটিবে, রাত্রিকালেই তিনি সেই ঘটনার বিষয় দেখিতে পাইতেন। সুদীর্ঘ ৭ বৎসর কাল এইরূপ পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার এবাদত-বন্দেগী ও ধ্যানধারণায় তাঁহার অতিবাহিত হইয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে শেষ ছয়মাস কাল তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ খোদা-তালার-ধ্যানে ও প্রেমে সম্পূর্ণ আত্মহারা এবং তন্ময় হইয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত ছয়মাসে তিনি সর্ব্ব-নিয়ন্তা আল্লাহ্ তা-লার নির্ম্মল ও পবিত্র প্রেমে সর্ব্বাতোভাবে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি পার্থিব কোনও কার্য্যের সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখিয়াছিলেন না; পার্থিব কোনও চিন্তা বা 'খেয়াল' স্বীয় মনে স্থান দিয়াছিলেন না। মহিমাময় জ্ঞানময় প্রেমময় বিশ্ব-পতির প্রেমে যথা-সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। তাপস কুলের অগ্রণীরূপে তিনি মহাতপস্যায়

আপনাকে নিয়োজিত করিয়া, মহাতাপস কুলের মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইস্লাম-সূর্য্যোদয়।

ইস্লামের সুপ্রভাত ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ সম্বন্ধে উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে ; হজরতের (ছাল্ঃ) বয়ঃক্রম এক্ষণে ৪০ চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। পৃথিবীতে 'হেদায়েত' ও 'রেছালত' (ধর্ম্মোপদেশ ও পয়গম্বরত্ব বা নবুয়তের) প্রচণ্ড সূর্য্য উদয় হইল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এই যে যখন ঐ রূহানী তাকত (আধ্যাত্মিক শক্তি) আল্লাহ্‌তা-লা তাঁহার মধ্যে পূর্ণভাবে বিকাশ করিলেন, যখন এবাদত-বন্দেগী ও সাধনা পূর্ণতা লাভ করিল, অহি এবং নবুয়ত লাভের শক্তি তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে স্থান পরিগ্রহ করিল, দেল ও দেমাগ্ (হৃদয় ও মস্তিষ্ক) মজবুৎ হইল, তখন একদা গারে হেরায় (হেরা পর্ব্বত-গহ্বরস্থ সাধনাশ্রমে) তাঁহার নিকটে এক ফেরেশ্‌তা (স্বর্গীয় দূত) আবির্ভূত হইলেন, এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এক্‌রা পড় ; তিনি বলিলেন, " মা আনা ব-কারিয়াত " (আমি ত পড়িতে জানি না) ; তখন ফেরেশ্‌তা তাঁহাকে জোরের সহিত দাবাইলেন (চাপিয়া ধরিলেন) ; এবং বলিলেন, এক্‌রা ; তিনি আবার উত্তর করিলেন, " মা আনা বকারিয়া " ; ফেরেশ্‌তা আবার খুব জোরে তাঁহাকে দাবাইলেন ; এবং ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, " এক্‌রা বেছ্‌মে রব্বেকাল্লাযী খালাক্, খালাকাল্ ইন্‌ছানা মিন্ আলাক্ * * * * (পূর্ণ আয়াত)—"আপন প্রভুর নামে পড়, যিনি সকল জিনিষ সৃষ্টি করিয়াছেন, আর মানুষকে জমাট শোণিত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন ; পড়, আর তোমার রব (প্রভু) বড় বোযর্গ, যিনি কলম দ্বারা এলেম (বিদ্যা) শিক্ষা দিয়াছেন, মানুষকে

তিনি এমন সকল বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তাহারা জানিত না।" এই কথা বলিয়া ফেরেশ্‌তা 'গায়েব' (অদৃশ্য) হইয়া গেলেন। (১) তিনি ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে তথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; এবং হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ) কে বলিলেন ঃ—যেম্মোলুনী, যেম্মোলুনী " আমাকে কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত কর, আমাকে কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত কর"। ওম্মোল মুমেনিন হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ) তাঁহাকে কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি ও এই বলিয়া ঘাব্‌রাইয়া (ব্যতিব্যস্ত হইয়া) গেলেন যে, এ কি হইল ? একি ব্যাপার ! একটু পরে যখন হজরত স্থির হইলেন, তখন হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রার (রাঃ—আঃ) নিকট সকল ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন, "লাকাদ খশিতো আনা নফ্‌ছি " (আমাকে নিজের জীবনের জন্য ভয় হইয়াছে)। তচ্ছ্রবণে হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ) বলিয়া উঠিলেন, "কালা বাশের ফওয়াল্লাহ লাইয়াখ্‌যিকাল্লাহো আবাদান ইন্নাকা লে তাছাল্লেব রহ্‌মে ওয়া তাছদেকোল হাদীছে ওয়া তাহ্‌মেলোল কুল্লে ওয়া তাকৃছেবোল্‌ মায়ত্‌মে ও তাকাররোয যায়েফে ও তাইওনো আলা নওয়া এবেল হাক্কে। "না, না, আপনাকে 'খুশী' (সন্তুষ্ট) হওয়া চাই যে আল্লার শপথ, তিনি আপনাকে কখনও অপ্রতিভ (অপ্রস্তুত —অবমানিত) করিবেন না। কেননা, আপনি সর্ব্বদা মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, এবং সর্ব্বদা সত্য কথা বলিয়া থাকেন ; আর যাহাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা কষ্টকর, তাহাদের ভরণ পোষণের খরচ-পত্র যোগাইয়া থাকেন ; আপনার মধ্যে ঐ সকল:আখ্‌লাকী(শিষ্টতা-জনিত) সৌন্দর্য্য বিদ্যমান আছে,—যাহা অন্য লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না। আপনি মেহ্‌মান 'নওয়ায্‌' (অতিথি-পরায়ণ বা অতিথি সেবার

(১) হজরত জিব্‌রিল ফেরেশ্‌তা আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

তৎপর), তদ্ব্যতীত হক্ কথা বলা ও সদনুষ্ঠান করার জন্য যদি কেহ বিপদগ্রস্ত হয়, তবে আপনি তাহার সাহায্যকারী হন। এইরূপ প্রবোধ ও সাহস প্রদানের পর হজরত খোদেজাতুল্ কোব্রা (রাঃ—আঃ) হজরতকে স্বীয় চাচ্চাত ভাই (পিতৃব্য পুত্র) ওয়ারকাঃ-বিন্-নওফলের নিকট লইয়া গেলেন। ঐ ব্যক্তি তৎকালে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ভ্রাতা ওয়ারকা-বিন্-নওফলের নিকট সমস্ত অবস্থা বর্ণন করিলেন। ওয়ারকা সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, ইহা সেই অহি আকবর (আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী)—যাহা (এক সময়) হজরত মুসা আলায়হেস্ সালামের প্রতি 'নাযেল' (অবতীর্ণ) হইয়াছিল। যাহা হউক, আমি যদি যুবক হইতাম, এবং ঐ সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতাম,—যখন আপনাকে 'কওম' (জাতি) স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে, (সেই ব্যাপার দেখিতে পাইতাম)। তচ্ছ্রবণে হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, 'আওয়ামোখ্‌রুহুম্', বাস্তবিক কওম (স্বজাতি বর্গ) কি আমাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবে ? ওয়ারকা-বিন্-নওফল বলিলেন, হাঁ, তাহারা আপনাকে দেশত্যাগী করিতে বাধ্য করিবে। পৃথিবীতে যত রছুল (নবী বা পয়গম্বর—ভবিষ্যদ্বক্তা বা তত্ত্ববাহক) আগমন করিয়াছেন, এবং তওহিদের (একত্ববাদের) মহাবাণী ঘোষণা করিয়াছেন, ও ঐ শিক্ষা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 'কওম' প্রথম হইতেই তাঁহাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিয়াছে। কোনও পয়গম্বরই স্বজাতির শত্রুতাচরণ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই। অতঃপর হজরত সেখান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পুর্ব্বক যথানিয়মে গারে হেরায় (হেরা গিরিগুহায়) গমন করিলেন। কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি কোনও ওহি নাযেল (অবতীর্ণ) হইল না। উহাকে 'ফেৎরতাঃ যমানাঃ' বলা যায়। অবশেষে একদিন হজরত হেরা পর্ব্বত-গুহা হইতে যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলেন ; সেই

সময় তিনি পথিমধ্যে আবার ঐ ফেরেশতাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ফেরেশ্‌তাকে দেখিয়া পুনরায় থামিয়া গেলেন, এবং দণ্ডায়মান হইয়া বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাবয়ব আচ্ছাদন করিলেন; তখন তাঁহার কর্ণে এই 'পোর জালাল' (গৌরবময়) আওয়ায্ পঁহুছিল :—"ইয়া আইয়ো হাল্ মোদ্দাচ্ছেরো কুম ফান্‌যের ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বের ওয়াছিয়া বাকা ফাতাহ্ হের্ ওয়া রাজয্ ফাহ্‌জোর" অর্থাৎ হে চাদরাচ্ছাদিত ব্যক্তি, উঠ, আর ঐ লোক-দিগকে আল্লাহ্‌র গযব্ (ক্রোধ) হইতে রক্ষা কর, ও স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তার মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য বর্ণনা কর, শুদ্ধ বা পবিত্র কর; এবং আপনার কাপড় পাক কর, অর্থাৎ অপবিত্রতা, শের্ক (অংশীবাদিত্ব) ও কুকার্য্য হইতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন কর (রক্ষা পাও)। ইহার পর হইতেই আঁ হজরতের (ছালঃ) প্রতি ক্রমাগত ওহি (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হইতে লাগিল। একদিন জিব্‌রাইল (আলাঃ) আগমন করিলেন, এবং হজরত ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ও ছাল্লামকে পাহাড়ের পাদদেশে লইয়া আসিলেন; হজরতের সম্মুখে জিব্‌রাইল আমীন স্বয়ং ওজু করিলেন; তাঁহার দেখা দেখি হজরত রছুল আকরম (ছালঃ) ও সেই প্রণালীতে ওজু-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অজু সমাপন হইবার পর হজরত জিব্‌রাইল আমীন (আলাঃ) এমাম হইয়া নামাজ পড়াইলেন।

তব্‌লিগল্ ইস্‌লাম বা ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার।

হজরত রেছালতমাব, নবীয়ে দো-জাহান (ছালঃ) পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লা কর্ত্তৃক তওহিদ (একত্ববাদ) প্রচারের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র তব্‌লিগ্ অর্থাৎ ইস্‌লাম-প্রচার কার্য্যে মহা উৎসাহ সহকারে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। লোকদিগকে শের্ক্ অর্থাৎ অংশিবাদিত্ব হইতে

নিবৃত্ত রাখিবার জন্য, এবং 'তওহিদ এলাহী' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা-লার একত্ব-বাদ প্রচারের কার্য্য তিনি সর্ব্বাগ্রে নিজের ঘর (বাটী বা পরিবারবর্গের মধ্য) হইতেই আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী সাধ্বী সতী হজরত খোদেজাতুল্ কোব্রা (রাঃ—আঃ) তাঁহার উপর ঈমান আনিলেন (তাঁহাকে খোদা-তা-লার প্রেরিত নবী বলিয়া স্বীকার করিলেন)। হজরত আলী-বিন্-আবি তালেব (রাজিঃ) এবং হজরত যয়েদ-বিন্-হারেস (রাজিঃ) ও প্রথম দিনই হজরতের উপর ঈমান আনিলেন। উঁহারা ৩ জনই হজরতের নিজের ঘরের লোক ছিলেন। তদ্ব্যতীত হজরতের বন্ধু, হজরত আবুবকর আবদুল্লা বিন্-আবুক্কহাফাঃ (রাজিঃ) ও প্রথম দিনেই হজরত রেছালত মাবের (ছালঃ) উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। এই প্রথম ঈমান আনয়নকারী ও পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী ও ধর্ম্মাবলম্বিনী চারিজনের মধ্যে একজন তাঁহার আহ্লিয়া (পত্নী), একজন চাচ্চা যাদ ভাই (পিতৃব্য-পুত্র), একজন স্বাধীনতা প্রাপ্ত ক্রীতদাস ও একজন একান্ত অনুরক্ত অকপট বন্ধু। একথা অবিদিত নহে যে, উপরোক্ত ৪ জন নরনারী হজরতের আখ্লাক (সৌজন্য), ও স্বভাব-চরিত্র বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। আর হজরতের জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোনও ঘটনা বা কোন কার্য্যই তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। ইঁহাদের পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার প্রতি ঈমান আনা (পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া), ন্যায়-পরায়ণতা ও সত্য-বাদিতার এক জীবন্ত দলিল বা প্রমাণ। হজরত সর্ব্ব প্রথমে আপনার শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রচার কার্য্য নিতান্ত নীরবতার সহিত, স্বীয় পরম আত্মীয় ও বিশ্বস্ত বন্ধুদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলেন। ইস্লাম প্রচারের এই প্রাথমিক যুগে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খেদমত আদায় করিয়াছিলেন। তাঁহার সে জলন্ত উৎসাহ ও জীবন্ত ধর্ম্মভাবের বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। হজরত আবুবকর

ছিদ্দিক (রাজিঃ) কোরেশদিগের মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও বিস্তর ছিল। তাঁহার পশার-প্রতিপত্তি এবং বক্তৃতার প্রভাবে হজরত ওস্মান-বিন্-আফ্‌ফান (রাজিঃ), হজরত তাল্‌হা-বিন্-ওবায়েদুল্লা (রাজিঃ), হজরত আবদুর রহমান-বিন্-অওফ্‌ (রাজিঃ), হজরত যোবের বিন্-অল-আওয়াম (রাজিঃ) প্রভৃতি মান্যগণ্য পুরুষ-গণ-হজরতের প্রতি ঈমান আনিয়া পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই সকল মহাত্মাগণ উত্তর কালে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের সুদৃঢ় স্তম্ভরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর হজরত আবুওবেদা-বিন্-যাব্‌রাহ (রাজিঃ), হজরত আবুছলমাঃ আবদুল আসদ-বিন্-হেলাল (রাজিঃ), হজরত ওস্মান-বিন্-মজয়ুন (রাজিঃ), হজরত কদামাঃ-বিন্-মজয়ুন (রাজিঃ), হজরত ছয়ীদ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ), হজরত ফাতেমা (রাঃ—আঃ)—(হজরত-ওমর-বিন্-খাত্তাবর [রাজিঃ] সহোদরা ভগিনী ও হজরত সয়ীদ (রাজিঃ) এর সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি পবিত্র ইস্‌লামের 'দায়েরায়' (গণ্ডিতে) 'দাখেল' হইলেন। ইঁহাদের পরে হজরত সায়াদ-বিন্-আবিওক্কাস্ (রাজিঃ) পবিত্র ইস্‌লামের সুশীতল আশ্রয়চ্ছায়ায় আগমন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ভ্রাতা হজরত য়ামীর (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা বিন্-মস্‌উদ (রাজিঃ) ও হজরত জাফর-বিন্-আবুতালেব (রাজিঃ) ঈমান আনিলেন; এবং মোসলমানদিগের একটী ক্ষুদ্র দল গঠিত হইল। এই দলে বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকল শ্রেণীর লোকই ছিলেন। প্রবল মোশরেক—অর্থাৎ অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের ভয়ে ইঁহারা মক্কা নগরের বাহিরে পাহাড়ের ঘাটি সমূহে গিয়া গোপনে নমাজ আদায় করিতেন। তিন বৎসর পর্য্যন্ত ইস্‌লামের প্রচার কার্য্য এইরূপ চুপে চুপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। লোকেরা আস্তে আস্তে শের্ক্‌ (অংশিবাদিত্ব) ও বোত-পরস্তিতে (প্রতিমা-পুজায়) বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া, ক্রমশঃ ইস্‌লামে

আকৃষ্ট ও ঐ সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই তিন বৎসর কালের মধ্যে কোরেশদিগের প্রত্যেক সভা-সমিতি এবং প্রত্যেক বৈঠকে এই নূতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিপরীত চর্চ্চা ও আলোচনা হইতেছিল। মোসলমানগণ আপনাদের ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের ঘোষণা প্রচার করিতেন না; এজন্য মোসলমানদিগের পরস্পরের মধ্যেও সকলকে সকলে চিনিতেন না। ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া সকলেই চুপে চুপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন; দুর্দ্দান্ত কোরেশদিগের ভয়ে প্রকাশ্যভাবে উপাসনাদি করিতেন না। কোরেশগণ প্রথমাবস্থায় ইস্‌লাম প্রচার কার্য্যকে তেমন গুরুতর ও ভয়ানক ব্যাপার বলিয়া মনে করে নাই; সুতরাং এই নূতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হাসি-ঠাট্টা, উপহাস-পরিহাস এবং বাচনিক কটু-কাটব্য বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিত। মোটামুটি ভাবে সমগ্র কওম (সম্প্রদায়) মোসলমানদিগের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিত না। পক্ষান্তরে কোরেশদিগের মধ্যে এমন অনেক গুলি কুটীলমনাঃ, বিবাদ-প্রিয় লোক ছিল, যাহারা সুযোগ পাইলে মোসলমানদিগের প্রতি কঠোর অত্যাচার করিত, এবং তাহাদের প্রতি দৈহিক যাতনা প্রদান করিতে ও কুণ্ঠিত হইত না। একদা হজরত ছায়াদ বিন্‌-আবিওক্কাস্ (রাজিঃ) কতিপয় সঙ্গী সহকারে পাহাড়ের ঘাটিতে (পার্ব্বত্য দরিপথে) নমাজ পড়িতে ছিলেন; অকস্মাৎ মক্কার কতিপয় মোশরেক (অংশীবাদী—পৌত্তলিক) ঐস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা মোসলমানদিগকে নমাজ পড়িতে দেখিয়া, অতীব কঠোরতার সহিত নমাজে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইল; তখন হজরত ছায়াদ-বিন্‌-আবিওক্কাস্ (রাজিঃ) তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তরবারির আঘাতে একজন কাফের আহত হইল। ইহাই মোসলমান-দিগের মধ্যে কাফেরের বিরুদ্ধে আল্লার নামে প্রথম অস্ত্র পরিচালন।

একদা হজরত রেছালত মাব (সালঃ) ও হজরত আলী (রাজিঃ)

পাহাড়ের কোনও ঘাটিতে নমাজ পড়িতেছিলেন ; ঘটনাক্রমে আবিতালেব ঐ পথে আসিয়া বাহির হইলেন ; এবং চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। যখন হজরত (ছালঃ) নমাজ শেষ করিলেন, তখন আবুতালেব ভ্রাতুষ্পুত্রকে (হজরত [সালঃ] কে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ মজহব (ধর্ম্ম)—যাহা তুমি অবলম্বন করিয়াছ ? উত্তরে হজরত রেছালত পানাহ্ (ছালঃ) বলিলেন, ইহা দীনে-ইব্রাহিম (হজরত ইব্রাহিম আলায় হেস্-সালামের অবলম্বিত ধর্ম্ম)। সঙ্গে সঙ্গে পিতৃব্য আবুতালেবকে বলিলেন, আপনিও এই দীন কবুল (গ্রহণ) করুন। আবুতালেব বলিলেন, আমি ত আমার পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। কিন্তু হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে পুত্র ! তুমি (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর সঙ্গ ছাড়িও না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ) তোমাকে ভালর দিক্ ভিন্ন মন্দের দিকে লইয়া যাইতে কখনই চেষ্টা পাইবে না। স্থূলকথা এই যে, ওহি অবতীর্ণ হইবার প্রথম হইতে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ইস্লাম প্রচার কার্য্য নীরবে সম্পাদিত হইয়াছিল ; এবং পবিত্র রূহ (আত্মা) সকলকে আকর্ষণ করিয়া নিজের দিকে (ইস্লামের দিকে) আনয়ন করিতেছিল। অর্থাৎ যাঁহাদের হৃদয় পরিষ্কার ছিল, যাঁহাদের সত্য পথে—প্রকৃত ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেই সকল মহান্ পুরুষ পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মের সুশীতল আশ্রয়চ্ছায়ায় শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। এই সময় আল্লাহ্ তালার এই ওহি অবতীর্ণ হইল :—"ফাছদায় বেমা তু মারো" তোমাকে যে আদেশ করা হইয়াছে, উহা খুলিয়া (প্রকাশ্য ভাবে) লোকদিগকে শুনাও। এই আদেশ নাযেল (অবতীর্ণ) হইবামাত্র তিনি " ছাফা " নামক পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রত্যেক কবিলার (সম্প্রদায়ের) নাম

উচ্চারণ পূর্ব্বক সত্য ধর্ম্মের দিকে—পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের দিকে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই আহ্বান শ্রবণে আরববাসিদিগের দস্তর মতাবেক (নিয়মানুযায়ী), লোকেরা সেখানে আসিয়া সমবেত হইল। যখন সকল লোক সেখানে সমবেত হইল, তখন তিনি ফরমাইলেন :—"লও আখবর তোকুম আনাল্ আদু ওয়া মছ বাহকুম আও মমছবাকুম আম্মা কুন্তম তছদকুনী" হে কোরেশগণ! যদি আমি তোমাদিগকে সংবাদ প্রদান করি যে, সকালে কিংবা সন্ধ্যাকালে তোমাদের প্রতি তোমাদের শত্রুদল আক্রমণ করিবে, তাহা হইলে তোমরা কি আমাকে সত্যবাদী বলিয়া মনে করিবে? তখন কোরেশগণ একবাক্যে বলিল "হাঁ; কারণ আমরা ইতিপূর্ব্বে তোমাকে সত্যবাদী বলিয়া জানিয়াছি। এই উত্তর শুনিয়া হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, "আচ্ছা, বেশ কথা; এক্ষণে আমি তোমাদিগকে সংবাদ দিতেছি যে, আল্লাহ্ তালার আযাব (ক্রোধাগ্নি বর্ষণ) নিকটবর্ত্তী, তাঁহার উপর ঈমান আন (তাঁহাকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল বলিয়া বিশ্বাস কর), আল্লাহ্ তালার ক্রোধাগ্নি হইতে আপনাদিগকে বাঁচাও।" এই কথা শুনিয়া কোরেশগণ উচ্চহাস্যে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল। হজরতের (সালঃ) অন্যতম পিতৃব্য পাপাচারী ইস্‌লাম-শত্রু আবু লহব বলিয়া উঠিল, "তোমার নিপাত সাধন হউক, তুমি এই জন্য আমাদিগকে সমবেত হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে?" ইহার পর সমবেত জন-মণ্ডলী সেখান হইতে চলিয়া গেল। তাহারা হজরতের কথার বিকৃত ও বিপরীত সমালোচনা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আবুলহব উঠিয়া যাওয়ায় পরে ছুরে "তাব্বাত্ এদা আবি লাহাবেওঁ" নাযেল (অবতীর্ণ) হয়। কয়েক দিন পরে "ওআন্‌যর আশিরাতা কাল আকরবিন"—অর্থাৎ করিবী রেশ্‌তাদার (নিকট আত্মীয়)-গণকে ভীতি-প্রদর্শন কর।" এই বাক্য নাযেল হইয়া-

ছিল। তদনন্তর হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) হজরত আলী (রাজিঃ) কে :একটী যেয়াফতের (নিমন্ত্রণের) আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে হজরত আলী (রাজিঃ) একটী যেয়াফতের (নিমন্ত্রণের) আয়োজন করিলেন। অতঃপর হজরত সমস্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গকে দাওত দিলেন। তাঁহার প্রায় ৪০ চল্লিশ জন আত্মীয় নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ তদীয় গৃহে আগমন করিলেন। যখন মেহমানদিগের আহার কার্য্য সম্পন্ন হইল, তখন তিনি একটী বক্তৃতা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আবুলহব এমন 'বেহুদা' (অন্যায় ও অসঙ্গত) বাক্যালাপ করিতে লাগিল যে, হজরত বক্তৃতা প্রদানের কোনও সুযোগ পাইলেন না। ক্রমে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। দ্বিতীয় দিবস তিনি আবার যেয়াফতের বন্দোবস্ত করিলেন ; স্বীয় আত্মীয় স্বজনকে আবার দাওত (নিমন্ত্রণ) করিয়া পাঠাইলেন। যখন সকলের আহার কার্য্য শেষ হইল, তখন তিনি সকলকে এই বলিয়া মোখাত্তেব (আপনার দিকে আকৃষ্ট) করিলেন যে, " দেখ, আমি তোমাদের নিকট ঐ কথা লইয়া আসিয়াছি, যাহা হইতে ভাল কথা কেহ স্বীয় কবীলার (সম্প্রদায় বা দলের) জন্য আনয়ন করে নাই। বল, একাজে কে কে আমার সাহায্য-কারী হইবে।" এই কথা শুনিয়া সকলে চুপ হইয়া রহিল ; কেহই কোন উত্তর প্রদান করিল না। এই সময় হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহু দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, যদিও আমি দুর্ব্বল এবং বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ, কিন্তু আমি আপনার সঙ্গী (সাহায্যকারী) হইব। একথা শুনিয়া সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল, এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল।

প্রকাশ্য ভাবে ইস্লাম প্রচার।

এক্ষণে হজরত রছুল করিম (সালঃ) সাধারণ ভাবে—প্রকাশ্য রূপে লোকদিগকে তওহিদ (একত্ববাদ) ও ইস্লামের দিকে আহ্বান করিলেন ; এবং মক্কা নগরের সর্ব্বত্র বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হইতে তাঁহার উপর, এবং তদীয় অল্পসংখ্যক শিষ্যদলের উপর দুর্দ্ধর্ষ কোরেশ দিগের ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল। সভা সমিতিতে, মেলা সমূহে, বাজারগুলিতে, জন-সমাগম স্থানে, গলি-কুচায় এবং লোকদিগের গৃহে গমন পূর্ব্বক হজরত (ছালঃ) তওহিদের (একত্ববাদের) সৌন্দর্য্য বর্ণনা এবং পৌত্তলিকতা (পুতুল পূজা) করিতে লোকদিগকে নিষেধ করিতেন। মূর্ত্তি পূজার অবৈধতা ও অপকারিতা লোকদিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতেন। যেনা (ব্যভিচার), দ্যূতক্রীড়া (জুয়াখেলা), মিথ্যা বলা, বিশ্বাস ঘাতকতা, চুরি, দস্যুতা ইত্যাদি কুকর্ম্ম হইতে লোকদিগকে বিরত রাখিতে চেষ্টা পাইতেন। মক্কার কোরেশ বংশ অতি সম্ভ্রান্ত এবং শরীফ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের মজ্হব (ধর্ম্ম) এবং তাহাদের কার্য্য-কলাপ ও আচার ব্যবহারের নিন্দাবাদ নীরবে সহ্য করা তাহাদের পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিল না। তাহাদের মধ্যে প্রভু এবং ক্রীতদাসের পার্থক্য একটা গুরুতর ও অপরিবর্ত্তনীয় ব্যাপার ছিল। ইস্লাম এক সাধারণ ভ্রাতৃভাব কায়েম করিয়া প্রভু এবং দাসকে একই পংক্তিতে স্থান দিত। * প্রভু ও দাসের মধ্যে এরূপ সাম্য ভাব তাহাদের

* এই তেরশত বৎসর পরেও সেই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই ; এখনও মস্জেদে নমাজের সময় বাদশাহ এবং দাস পাশাপাশি হইয়া দাঁড়ান। দাস প্রথম পংক্তিতে (কাতারে) এবং প্রভু পরবর্ত্তী পংক্তিতে থাকিলে দাসের পদতলে প্রভুর মস্তক লুণ্ঠিত হয়।

পক্ষে অসহ্য ছিল। কোরেশ এবং অন্যান্য মক্কাবাসীর যে সম্মান ও প্রতিপত্তি আরবের অন্যান্য লোকদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইত, তাহা ঐ বোত (প্রতিমা বা মূর্ত্তি) গুলির জন্যই ছিল—যাহার পূজা করিবার জন্য আরবের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা মক্কায় সমবেত হইত; এবং কাবা-গৃহে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিগুলির পূজা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। ইস্‌লাম পৌত্তলিকতার শত্রু ছিল। যাহার প্রকাশ্য পরিণাম ফল ঐ পৌত্তলিকদিগের অবনতি এবং উৎসন্ন-প্রাপ্তি ব্যতীত : আর কিছুই ছিল না। বড় বড় ছরদার (গোষ্ঠিপতি) এবং উচ্চ সম্মানিত লোকেরা ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না যে, তাহারা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্‌মদ মোজ্‌তবা (সালঃ) কে আপনাদের নবী বলিয়া মানিয়া লয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ছরদারী ও প্রাধান্য পরিত্যাগ করিয়া হজরতের প্রভুত্ব স্বীকার করে। কোরেশের অধিকাংশ সম্প্রদায় (গোষ্ঠী) বনুহাশেমের প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ ছিল। এজন্য তাহারা ইহা সহ্য করিতে পারিত না যে, এক প্রতিপক্ষ শত্রু সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে আপনাদের নবী (রসুল বা পয়গম্বর) বলিয়া স্বীকার করে, ও তাঁহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়। উপরোক্ত প্রকাশ্য ধর্ম্ম-প্রচারের ফল এই হইল যে, সমগ্র কোরেশ জাতি হজরতের সহিত কঠোর শত্রুতাচরণ এবং বিরুদ্ধবাদিতা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল। ইস্‌লাম ও কোফরের এই প্রকাশ্য বিবাদ-বিসম্বাদ হজরতের নবুয়ত (পয়গম্বরী) লাভের ৪র্থ বৎসরেই খুব প্রবল আকার ধারণ করে। এই সময়েই হজরত (সালঃ) ছাফা পাহাড়ের পার্শ্বে অবস্থিত আরকম-বিন্‌-আরকমের গৃহখানিকে ইস্‌লামী 'দরছগাহ্' (বিদ্যালয়) স্বরূপ ব্যবহার করিতেছিলেন। এই গৃহে ইস্‌লামে নব-দীক্ষার্থী লোকেরা আগমন করিতেন, এবং পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ইস্‌লাম সম্বন্ধে শিক্ষালাভ

করিতেন। সুতরাং এই গৃহে সকল সময়ই মোসলমানদিগের সমাগম হইত। হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ) এই গৃহেই ইস্লাম সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতেন। আর এই গৃহেই সকলে মিলিয়া জময়াতে নমাজ আদায় করিতেন। তিন বৎসর, অর্থাৎ হজরতের উপর নবুয়ত অর্পিত হইবার ৩য় বৎসর পর্য্যন্ত হজরতের অবস্থান-স্থান এবং ইস্লামী শিক্ষার কেন্দ্রস্থান এই গৃহেই ছিল। এই তিন বৎসরে যাঁহারা পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মের আশ্রয়চ্ছায়ায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহাদের সম্মান ও "আউওলুল মোস্লেমিন" অর্থাৎ প্রাথমিক মোসলমান বলিয়া খুব উচ্চ ছিল। দারুল-আরকমে' মোসলমান ধর্ম্মে যাঁহারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন, হজরত ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ আনহু তাঁহাদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি। তিনি ইস্লাম মধ্যে দীক্ষিত হওয়ায় মোসলমানদিগের বেশ শক্তি বৃদ্ধি হইল; আর মোসলমানগণ তখন "দারু আরলকম" হইতে বাহিরে আগমন করিলেন; কোরেশগণ যখন হজরত (সালঃ) এবং তাঁহার দলের উদ্দেশ্য ও কার্য্য-কলাপের বিষয় বুঝিল, তখন তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করা, এবং তাঁহা-দিগকে কষ্ট প্রদান করার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিল।

কোরেশদিগের শত্রুতাচরণ।

ঈমান গ্রহণকারী ও ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত লোকদিগের মধ্যে কয়েকজন ক্রীতদাসও ছিলেন। আর কতক লোক এমন ছিলেন—যাঁহারা আপনাদের শক্তি সম্পন্ন ও বলবান্ আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য লাভে বঞ্চিত থাকাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ইঁহাদিগকে মুসলমান হইতে মোরতেদ্ (ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট বা ধর্ম্মদ্রোহী) করিবার জন্য দুর্দ্দান্ত কোরেশগণ তাঁহাদের প্রতি শারীরিক যাতনা প্রদান আরম্ভ করিল। যে সকল

লোকেরা কোনও কবীলা অর্থাৎ গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতেন, উহাদের প্রতি সাধারণ লোকের অত্যাচার করা এজন্য আশঙ্কাপ্রদ ছিল যে, তাঁহাদের কবীলা-ওয়ালা (গোষ্ঠীস্থ ব্যক্তি)-গণ না উৎপীড়নকারীদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। এজন্য ইস্‌লাম গ্রহণকারীদিগের আত্মীয়-স্বজনকে এইরূপ কার্য্যে বাধ্য করিতে চেষ্টা পাইল যে, তাহারা নিজেরাই যেন আপনাদের ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণকারী আত্মীয়-স্বজনবর্গকে শাস্তি ও কষ্ট প্রদান পূর্ব্বক মোরতেদ (ধর্ম্মভ্রষ্ট) করিয়া লয়। মোসলমানদিগের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, তাঁহাদিগের নিন্দাবাদ প্রচার করা, তাঁহাদের প্রতি গালি বর্ষণ করা ইত্যাদি কার্য্যের জন্য দস্তুর মতন আয়োজন করা হইতে লাগিল। উদ্দেশ্য, যাহাতে নূতন নূতন লোককে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সাহস ও সুযোগ লাভ না ঘটে। এদিকে হজরত (ছালঃ) পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রকাশ্যভাবে প্রচার আরম্ভ করিলেন। ওদিকে কোরেশগণও পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে শত্রুতাচরণের জন্য দৃঢ়তার সহিত প্রস্তুত হইল। হজরত বেলাল (রাজিঃ), ওম্মিয়া বিন্‌-খলফের গোলাম (ক্রীতদাস) ছিলেন। তাঁহার ইস্‌লাম-গ্রহণের সংবাদ যখন প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন ওম্মিয়া-বিন্‌-খলফ্‌ তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল। সূর্য্য-তপ্ত অগ্নিবৎ গরম বালুকার উপর শোয়াইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে উত্তপ্ত ও ভারী প্রস্তর খণ্ড চাপাইয়া রাখা হইত। মোশক বাঁধিয়া কোড়া দ্বারা প্রহার করা হইত। অনাহারে রাখিত। গলায় দড়ি বাঁধিয়া ছেলেদিগের হস্তে সমর্পণ করিত; উহারা মক্কা নগরের গলি কুচার এবং নগরের পার্শ্বস্থ পাহাড় অঞ্চলে দড়ি ধরিয়া টানিয়া বেড়াইত। সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিত। এই সকল ভীষণ অত্যাচারও ও কঠোর শাস্তি হজরত বেলাল (রাজিঃ) অম্লান বদনে সহ্য করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে

"আহাদ-আহাদ." শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া সুখ ও শান্তি অনুভব করিতেন। কোনও কষ্ট বা যন্ত্রণাকেই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। হজরত এমার (রাজিঃ), স্বীয় পিতা এয়াছর (রাজিঃ) ও মাতা ছমিতাঃ (রাঃ—আঃ) সহ পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; আবুজহল তাঁহাদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতেছিল। হজরত ছমিতাঃ রাজিঃ আল্লাহ্ আন্‌হাকে পাষণ্ড আবুজহল এমন ভীষণভাবে নেযা (বল্লম বিশেষ) দ্বারা আঘাত করিল যে, সেই আঘাতেই তিনি শহিদ হইয়া গেলেন। হজরত যনিরাঃ রাজি আল্লাহ আন্‌হুকে ঐ অত্যাচারী দুর্ব্বৃত্ত আবুজহল এমন নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিল যে, তিনি চক্ষু-রত্ন হারাইয়া অন্ধ হইলেন ; এইরূপে বহু সংখ্যক ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর উপর পাষণ্ড কোরেশগণ এমন ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল যে, সে কথা স্মরণ করিলে দেহ রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু ইস্‌লাম এমন একটী জবরদস্ত (অপরাজেয়) শক্তির নাম যে, কোরেশদিগের হৃদয় বিদারক ভীষণ শক্তির দ্বারা ও তাহাদিগের হৃদয় বিচলিত করিতে এবং মন টলাইতে পারে নাই। তাঁহাদের মধ্যে একজনকেও মোরতেদ (ধর্ম্মভ্রষ্ট) করিতে সক্ষম হয় নাই। তাঁহারা অবিচলিত চিত্তে সকল ক্লেশ ও সকল অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছিলেন। হজরত ওস্‌মান বিন্‌-আফ্‌ফান (রাজিঃ) বনি ওর্ম্মিয়ার মধ্যে একজন আমীর (ধনী) ব্যক্তি ছিলেন ; তিনি পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তাঁহার চাচ্চা (পিতৃব্য) তাঁহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া খুব প্রহার করিল ; সঙ্গে সঙ্গে আরও নানাপ্রকার যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে হজরত ছায়াদ-বিন্‌-আবি-ওক্কাস্‌-(রাজিঃ) কে তাহার কবীলার (গোষ্ঠীর) লোকেরা নানাপ্রকার শারীরিক যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল। হজরত যোবের-বিন্‌-আল্ আওয়াম (রাজিঃ)-কে তাঁহার পিতৃব্য চেটাইতে (মাদুরে) লেপ্টাইয়া তাঁহার নাকের ভিতর ধূম প্রদান

করিত। হজরত আবুযর গফ্‌ফারি-(রাজিঃ) কে কোরেশগণ কোরআন শরীফ্‌ পাঠ করিতে শুনিয়া, এরূপ নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল যে, তিনি 'বেহোশ' (অচেতন) হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। উহারা তাঁহাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিবারই সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু ঐ সময় আব্বাস-বিন্‌-আব্‌দুল মোত্তালেব তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া ঐরূপ পৈশাচিক সঙ্কল্পে বাধা দিলেন যে, দেখ, এই ব্যক্তি বনু-গফ্‌ফার-সম্প্রদায়ের লোক, তাহারা তোমাদের বাণিজ্য-যাতায়াতের পথে বাস করে, বাণিজ্য-যাত্রা কালে তাহারা পথিমধ্যে তোমাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিবে। তাঁহার কথায় অত্যাচারী কোরেশদিগের চৈতন্যোদয় হইল; সুতরাং হজরত আবুযর গফ্‌ফারির (রাজিঃ) জীবন রক্ষা পাইল। এইরূপে হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-মসউদ (রাজিঃ)-কে কাবা-গৃহের চাতালে (প্রাঙ্গণে) প্রহার করিতে করিতে অচৈতন্য করিয়া ফেলিয়াছিল; হজরত জনাব বিন্‌-আরস (রাজিঃ)-কে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত করিয়াছিল; একদা জ্বলন্ত কয়লারাশির উপর তাঁহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যক্তিকে তাঁহার বুকের উপর বসাইয়া দেয়; উদ্দেশ্য, তিনি যেন পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে না পারেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ও কোমরের সমস্ত চর্ম্ম ও মাংস পুড়িয়া কাবাবের আকার ধারণ করিয়াছিল। কোনও কোনও ছাহাবা (রাজিঃ)-কে গরু কিংবা উষ্ট্রের কাঁচা চামড়ার ভিতর পুরিয়া, মজবুৎ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিত। কাহাকেও কাহাকেও লোহার যরাহ্‌ (লৌহ-নির্ম্মিত গাত্রাবরণ—যাহা যুদ্ধ কালে ব্যবহৃত হয়) পরাইয়া জ্বলন্ত অগ্নি কিংবা জ্বলন্ত কয়লা রাশির উপর ফেলিয়া দিত।

হজরত রছুল আকরমের (সালঃ) সঙ্গে কোরেশদিগের বে-আদবী ও দুর্ব্ব্যবহার।

হজরত রছুল করিম (সালঃ) একদা পবিত্র কাবাগৃহে নামাজ পড়িতেছিলেন। ঐ সময় ওক্‌বা-বিন্‌-আবি ময়তিরা তাঁহার গলদেশে চাদর জড়াইয়া এমন জোরে টানিয়াছিল যে, তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যখন এই সংবাদ হজরত আবুবকর সিদ্দিকের নিকট পঁহুছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া কাবাগৃহে আসিলেন। তিনি সেই দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে হজরত (ছালঃ)-কে রক্ষা করিলেন; এবং কোরেশদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আতাক্‌ তুলুনা রেজালান্‌ আঁইইয়াকুলা রাব্বি আল্লাহো"—তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য বধ করিতেছ যে, তিনি বলেন, আমার রব (প্রভু) আল্লাহ্‌ তালা? দুর্দ্ধর্ষ কোরেশগণ হজরত-(সালঃ) কে ত ছাড়িয়া দিল; কিন্তু হজরত আবুবকর সিদ্দিক-(রাজিঃ) কে জড়াইয়া ধরিল; এবং প্রহার করিতে লাগিল। তিনি নীরবে সে অত্যাচার সহ্য করিলেন। একবার কাবাগৃহের ছহনে (সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে) কোরেশগণ হজরতকে ঘিরিয়া (বেষ্টন করিয়া) লইল; এবং তাঁহার সঙ্গে বে-আদবী ও অত্যাচার করিবার উদ্যোগ করিল; এই সংবাদ যখন হজরত হারেস-বিন্‌-আবিহালাহ্‌ (রাজিঃ) শুনিতে পাইলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ কাবাগৃহে দৌড়িয়া আসিলেন, এবং অত্যাচারীদিগের অবমাননা এবং অত্যাচার হইতে হজরত-(ছালঃ)কে রক্ষা করিলেন। আহা! দুরাচার কাফেরগণ হজরত হারেস-(রাজিঃ) কে ঐ স্থানে শহিদ করিয়া ফেলিল। কিন্তু হজরতের প্রতি আর হস্তোত্তোলন করিতে দুর্ব্বৃত্তদিগের সাহসে কুলাইল না। হজরত রাত্রি-

কালে যে পথ দিয়া গমনাগমন করিতেন, অত্যাচারী কোরেশগণ সেইপথে কাঁটা বিছাইয়া রাখিত। উদ্দেশ্য, পায়ে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া তিনি কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করেন। আর একবার হজরত রছুল আকরম (ছালঃ) কাবাগৃহের প্রাঙ্গণে নমাজ পড়িতেছিলেন, কোরেশদিগের কতকগুলি লোকও সেখানে উপস্থিত ছিল ; দুষ্ট চূড়ামণি আবুজহল বলিল, অমুক স্থানে উষ্ট্র জবেহ্ করা হইয়াছে ; উহার নাড়ী ভুড়ি সেখানে পড়িয়া আছে, কেহ যাইয়া উহা উঠাইয়া আন, এবং (হজরত) মোহাম্মদের (সালঃ) উপর প্রক্ষেপ কর। এতচ্ছ্রবণে ওক্‌বা-বিন্-আবি-মরতাঃ সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া উষ্ট্রের সেই নাড়ী-ভুড়িগুলি লইয়া আসিল। যখন হজরত নামাজের ছেজদাঃ করিলেন, তখন সেই আতুড়ি উঝুড়ি (নাড়ী-ভুড়ি) গুলি তাঁহার পৃষ্ঠোপরি নিক্ষেপ করিল। হজরত আল্লাহু তা-লার উপাসনায় এমনই নিমগ্ন ছিলেন যে, এ বিষয় কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। কিন্তু কাফেরগণ হাসিয়া লুট পাট হইতেছিল ; তাহাদের আনন্দ ও উল্লাসের সীমা পরিসীমা ছিল না। হজরত আবদুল্লা-বিন্ মসউদ (রাজিঃ) ও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি সাহস করিয়া কিছু বলিতে বা প্রতিকার করিতে পারিলেন না। ঘটনা বশতঃ ঐ সময় হজরত ফাতেমা যোহরাঃ (রাজিঃ আল্লাহ আনহা) তথায় আসিয়া পঁহুছিলেন ; এবং পিতার (হজরতের) পৃষ্ঠদেশ হইতে সেই উষ্ট্রের নাড়ী ভুড়িগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত অত্যাচারী কোরেশদিগকে ভৎর্সনাও করিলেন। হজরতের গৃহে দুর্দ্দান্ত কোরেশগণ প্রস্তরও বর্ষণ করিত। নানাপ্রকার পঁচা ছড়া দুর্গন্ধময় জিনিষ তাঁহার গৃহে প্রক্ষেপ করিতেও ত্রুটী করিত না। একবার হজরত ফরমাইলেন, হে বন্ধু-আব্‌দে মন্নাফ্! তোমরা প্রতিবেশীর বেশ হক্ আদায় করিতেছ। কেহ হজরত (সালঃ)-কে 'শায়ের' (কবি) বলিয়া

উপহাস করিত; কেহ তাঁহাকে 'ছাহের' :(ঐন্দ্রজালিক বা যাদুকর) বলিয়া সম্বোধন করিত; কখনও তাঁহাকে 'কাহেন' (গণক) বলিয়া উল্লেখ করিত, আর কখনও বা উন্মাদ (পাগল) বলিয়া অভিহিত করিত। স্থূলকথা, মক্কার কোফ্‌ফার (খোদাদ্রোহী কাফের)-গণ হজরত রেছালতমাব (সাঃ) এবং তাঁহার হস্তে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত মুষ্টিমেয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের প্রতি ভীষণ অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতে এবং হজরতের আরব্ধ কাজে সর্ব্বপ্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করে নাই। পক্ষান্তরে হজরত (সাঃ) ও জ্বলন্ত উৎসাহে, অতুলনীয় অধ্যবসায় সহকারে এবং দীপ্ততেজে সে কার্য্য সাধন করিতেছিলেন। কোনও বাধা বিঘ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; কোনও বাধা-প্রতিবন্ধকতারই তিনি "পরোয়া" করেন নাই। যত বাধা পাইতেছিলেন, তাঁহার সাহস, ধর্ম্মবল ও সহিষ্ণুতা, উৎসাহ ও উদ্যম ততই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। অত্যাচারী কোরেশগণ যখন দেখিতে পাইল, আমাদের সর্ব্বপ্রকার যত্ন-চেষ্টা, যোগাড়-যন্ত্র প্রভৃতি কিছুই কার্য্যকরী হইতেছে না, তখন তাহারা অন্য উপায় অবলম্বন করিল।

কোরেশগণের সন্ধির প্রার্থনা।

কোরেশগণ সমবেত হইয়া পরামর্শ করিল এবং ওক্‌বা-বিন্-রবিয়া-কে আপনাদের পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া হজরত রছুল আক্‌রমের (সাঃ) খেদমতে পাঠাইল। তদনুসারে ওক্‌বা হজরতের নিকট আসিয়া খুব নম্রতার সঙ্গে বলিতে লাগিল, মোহাম্মদ (সাঃ) তুমি শরীফ (ভদ্র) ব্যক্তি, তোমার বংশও ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত; কিন্তু তুমি কওমের

(জাতি বা সম্প্রদায়ের) মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি প্রকাশ করিয়া বল, তোমার উদ্দেশ্য কি? যদি তুমি অর্থ ও ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা কর, তবে বল, আমরা তোমাকে এত ঐশ্বর্য্য ও ধন-সম্পত্তি প্রদান করি, যাহাতে তুমি মক্কা নগরীতে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী হইতে পার। যদি তুমি ছরদারী ও নেতৃত্ব চাও, তবে আমরা তোমাকে আমাদের সর্ব্বোপরিস্থ নেতা নির্ব্বাচন করিতে প্রস্তুত আছি। তোমার কর্ত্তৃত্ব ও আদেশ প্রতিপালনে আমরা সর্ব্বদা তৎপর থাকিব। যদি তুমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও সম্মানিত ঘরে, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী পাত্রী তোমার জন্য নির্ব্বাচন করিয়া দি। যদি এই সকল বিষয়ে তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আমরা সকলে মিলিয়া তোমার এই সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিব না। তুমি স্বীয় অভিলাষ আমাদিগের নিকট জ্ঞাপন কর, আমরা প্রাণপণ চেষ্টায় তোমার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিব।

ওক্‌বাঃ যখন স্বীয় বক্তব্য শেষ করিল, তখন হজরত (সালঃ) উত্তর স্বরূপে পবিত্র কোরআনের সুরা হা-মিম্-সেজদাঃ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে হজরতের (সালঃ) রেছালতের বর্ণনা, এবং যাহারা ইস্‌লামে অবিশ্বাসী, তাহাদের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন বিষয় উল্লেখ আছে। যখন তিনি দ্বিতীয় রুকুর নিম্ন-লিখিত আয়েত পাঠ করিতে লাগিলেন, "ফইয়েন আরাদু ফকুন আন্‌য়ার তাঁকুম ছায়েকাতান্ মেছলা ছায়েফাতে আদে ও ছামুদ" তখন ওক্‌বার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে হজরতের মুখের উপর হাত রাখিয়া বলিল, তুমি এমন কথা বলিও না। তৎপর হজরত ছেজদাঃ করিলেন; সেজদা হইতে মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন, তুমি কি আমার উত্তর শুনিয়াছ? ওক্‌বা আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া কোরেশ-দিগের নিকট চলিয়া গেল, এবং বলিল, আমার মত এই যে, ঐ ব্যক্তিকে

(হজরত রেছালত পানাহ্-কে) তাঁহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও। অর্থাৎ তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় করুক, সে বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া দরকার নাই। তোমরা সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষতা অবলম্বন কর। যদি (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ) আরব দেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তাহাতে বাধা প্রদানের কি প্রয়োজন ? কারণ তিনি ত তোমাদেরই ভ্রাতা। তাঁহার সাফল্য লাভ, তোমাদেরই সাফল্য লাভ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আর যদি তিনি অকৃতকার্য্য হন, ধ্বংস প্রাপ্ত হন, তবে তোমরা অতি সহজেই অভীপ্সিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে। একথা শুনিয়া কোরেশগণ ওতবাঃকে কহিল, তোমার কথায় বোধ হইতেছে, (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ) তোমাকে যাদু (ইন্দ্রজালিক বিদ্যায় বাধ্য) করিয়াছে। তচ্ছ্রবণে ওতবাঃ বলিল, তোমাদের যাহা ইচ্ছা বল এবং কর, আমি আমার স্বাধীন মত ব্যক্ত করিলাম।

আবুতালেবের নিকট কোরেশদিগের দূত প্রেরণ।

যখন ওত্বার চেষ্টা বিফল হইল, তখন ওতবাঃ, শাইয়েবাঃ, আবুল বখ্তরি, আস্দ, অলিদ ও আবুজহল প্রেরিত একওফদ্ (ডেপুটেশন) আবুতালেবের খেদমতে উপস্থিত হইল। তাঁহার নিকট এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের বোত (দেবপ্রতিমা)-দিগকে মন্দ বলিতে ক্ষান্ত হইতেছে না। তুমি তাহাকে বুঝাইয়া বল, এবং অন্যায় কার্য্য হইতে তাহাকে নিবৃত্ত রাখ। আবুতালেবও এই দূত দলকে উপযুক্তরূপে উত্তর প্রদান করিলেন ; তিনি বলিলেন, তোমরাও তাহার প্রতি এবং তাহার দল ভুক্ত লোকের

প্রতি কঠোর উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিতে কিছুমাত্র ক্রটী করিতেছ না। সে দিন ত তাহারা চলিয়া গেল; দ্বিতীয় দিন যুক্তি ও পরামর্শ আঁটিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল; উহারা উপস্থিত হইলে আবু-তালেব হজরত (সালঃ)-কে ডাকিয়া তাহাদের সম্মুখে আনিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতেই পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। কোরেশ ছরদারগণ ঐ সকল কথা হজরতের সম্মুখে উত্থাপন করিল—যে সকল কথা ইতিপূর্ব্বে ওতবাঃ কোরেশদিগের পক্ষ হইতে পেশ করিয়াছিল। তাহারা বলিল, হে (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ)! আমরা এ সময় কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথার জন্য তোমাকে ডাকাইয়াছি। স্বীয় সম্প্রদায়ের উপর এরূপ বিপদ কেহ আনয়ন করে নাই—যেরূপ বিষম বিপদ তুমি আনয়ন করিয়াছ। যদি তুমি তোমার এই নূতন দীন (ধর্ম্ম) দ্বারা ঐশ্বর্য্য ও ধন-সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে আমরা তোমাকে এত ঐশ্বর্য্য ও ধন-সম্পদ জমা করিয়া দিব যে, অপর কাহারও নিকট তাহা হইবে না। যদি মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আমরা তোমাকে আমাদের ছরদার (নেতা) স্বীকার করিয়া লইতেছি। যদি রাজত্ব ও বাদশাহী লাভের ইচ্ছা থাকে, আমরা তোমাকে সমগ্র আরবের বাদশাহ করিয়া দিতেছি। আর যদি কোনও জেন বা অপদেবতা তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তজ্জন্য তুমি এরূপ প্রলাপ বকিয়া থাক এবং অস্বাভাবিক খেয়াল তোমার মনে স্থান লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা আমাদের 'কাহেন' (গণক)-গণ ও চিকিৎসকগণ দ্বারা তোমার চিকিৎসা করাইতে প্রস্তুত আছি। হজরত রেছালত পানাঃ (ছালঃ) কোরেশদিগের এই সকল কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর স্বরূপ পবিত্র কোরআন শরীফের কতিপয়-আয়েত পাঠ করিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, খোদাতায়ালা

আমাকে তোমাদের জন্য রছুল (পয়গম্বর বা তত্ত্ববাহক) বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। আমি খোদাতা-লার আদেশসমূহ তোমাদিগকে পঁহুছাইয়াছি। যদি তোমরা আমার প্রদত্ত শিক্ষ সমূহ গ্রহণ কর; তবে তোমাদের পক্ষে ইহকাল এবং পরকালের মঙ্গল বিধান হইবে। আর যদি এ বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন কর, তবে আমি সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ তায়ালার আদেশের অপেক্ষা করিব; এবং তোমাদিগকে জানাইব যে, তোমাদের জন্য এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া কোরেশগণ বলিল, আচ্ছা, যদি তুমি খোদা তা-লার রছুল (প্রেরিত পুরুষ) হও, তবে পাহাড়গুলিকে আরব দেশ হইতে হঠাইয়া দাও, এবং মরুভূমিকে শ্যামল শস্যক্ষেতে পরিণত কর; আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে জীবিত করিয়া দাও; বিশেষতঃ কছরী বিন্-কেলাবকে অবশ্য অবশ্য জীবিত কর। যদি কছরী বিন্-কেলাব জীবিত হইয়া তোমাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লন, আর তোমাকে রছুল (নবী বা পয়গম্বর) বলিয়া স্বীকার করেন, তবে আমরাও তোমাকে রছুল বলিয়া স্বীকার করিব। তচ্ছ্রবণে হজরত রছুল করিম (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি এই সকল কার্য্যের জন্য রছুল মনোনীত হই নাই। আমার ত কার্য্য এই যে, তোমাদিগকে খোদা তা-লা কর্ত্তৃক অবতারিত আদেশ সমূহ শুনাইয়া, এবং তাহার মর্ম্ম বেশ করিয়া বুঝাইয়া দি। আমি নিজ হইতে—স্বেচ্ছানুসারে কোনও কার্য্য করিতে পারি না। এইরূপ কথাবার্ত্তা হওয়ার পর কোরেশগণ নারাজ ও বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং আবুতালেবকে ধমক দিয়া (ভয় দেখাইয়া) সেখান হইতে প্রস্থান করিল। কোরেশ দলপতিগণ চলিয়া যাওয়ার পর আবুতালেব হজরতর (ছালঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমি কোরেশদিগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে (যুদ্ধ-হাঙ্গামা করিতে) সমর্থ

নহি; তুমি আমাকে এমন শ্রম-সাধ্যকার্য্যে বাধ্য করিও না, যাহা আমার শক্তি ও সামর্থের বহির্ভূত,। আমি কর্ত্তব্য মনে করি যে, তুমি নিজের দীনের (ধর্ম্মের) ঘোষণা করিতে এবং বোত (প্রতিমা) গুলির প্রকাশ্য ভাবে নিন্দাবাদে ক্ষান্ত হও। পিতৃব্যের বক্তব্য শুনিয়া হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, পিতৃব্য! যদি কেহ আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য্য এবং বাম হস্তে চন্দ্র আনিয়া রাখিয়া দেয়, তবু আমি স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে বিরত থাকিতে পারি না। আবুতালেবের কথা শুনিয়া হজরত (ছালঃ) মনে করিলেন, পিতৃব্য এক্ষণে আমার সাহায্য করিতে বিরত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। আবুতালেব মক্কার ছরদার-(দলপতি) দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত ও প্রভাব সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আবার বনি-হাশেম সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান নেতা বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহার জন্য কোরেশদল হজরতের প্রতি আক্রমণ করিতে অনেকটা ভয় ও সঙ্কোচ করিত। তাহারা ভাবিত, যদি ইহার প্রতি বেশী অত্যাচার করি, আর সমগ্র বনু-হাশেম তাহার সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হয়, তবে ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। পিতৃব্য আবুতালেবের সহায়তায় হজরতের মনে অনেকটা সাহস ও ভরসা ছিল, এক্ষণে তাঁহার মুখে নৈরাশ্য-জনক কথা শুনিয়া তিনি কিয়ৎ পরিমাণে হতাশ হইলেন। অবশেষে বাষ্পাকুলিত লোচনে এই বলিয়া পিতৃব্যের নিকট হইতে উঠিলেন যে, শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য! আমি স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য ঐ সময় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিব না, যে পর্য্যন্ত খোদার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন না হয়; আর এই কার্য্য সমাধা করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত আমি মৃত্যুর কবলে পতিত না হই। হজরতের (সাল ঃ) এই দৃঢ়তা ও করুণাব্যঞ্জক উক্তি শ্রবণে আবুতাবের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল; তিনি স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন; আচ্ছা! তুমি তোমার অভিপ্রেত কার্য্য যথাযথভাবে সম্পন্ন কর, যে পর্য্যন্ত

আমার দেহে জীবন থাকিবে, ততদিন আমি তোমার সাহায্য করিতে বিরত থাকিব না এবং তোমাকে কখনও শত্রু হস্তে সমর্পণ করিব না।

হাবশাঃ অর্থাৎ আবিসিনিয়ার হেজরত।

(মোসলমানদিগের প্রথম বার জন্মভূমি ত্যাগ)

কাফের কোরেশগণ যখন সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও যোগাড়-যন্ত্রে বিফল-মনোরথ হইল, আর তওহিদ (একত্ববাদ) ও ইস্‌লাম প্রচার-কার্য্য যথা-নিয়মে চলিতে লাগিল, তখন তাহারা খুব বিচলিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহারা দেখিতে পাইল যে, ইস্‌লাম প্রচারকার্য্যকে তাহারা ছেলেখেলা মনে করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা ক্রমশঃ বদ্ধমূল ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া এমনই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে যে, উহার গতিরোধ করা সহজ ব্যাপার নহে। উহারা এক্ষণে ইস্‌লাম প্রচারের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বাধা প্রদান জন্য প্রস্তুত হইল। তাহারা হজরতের (ছালঃ) কাবাগৃহে প্রবেশ করা বন্ধ করিয়া দিল। নগরের 'আওয়ারা' ও উচ্ছৃঙ্খল বালকদিগকে বলিয়া দিল, হজরত (ছালঃ) বা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে যেখানে দেখিতে পাইবে, হাততালি দিতে থাকিবে। তাঁহাদিগকে গালি দিবে, এবং রাস্তায় ও গলি-কুচায় চলিতে ফিরিতে বাধা দিবে। ভিন্ন স্থান হইতে আগত মোসলমানদিগকে মোহাম্মদ (সালঃ)-এর সঙ্গে মিলিতে-মিশিতে বা সাক্ষাৎ করিতে দিবে না। আর যতদূর সম্ভব, তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে কষ্ট দিবে। তদনুসারে সংখ্যায় অল্প ও দুর্ব্বল মোসলমানদিগের উপর নূতন ভাবে নানাপ্রকার ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল। কোনও প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়নেই তাহারা ক্ষান্ত হইল না। মুষ্টিমেয় মোসলমানদিগের পক্ষে এই অবস্থা

দাঁড়াইল যে, মক্কা নগরে বাস করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইল। মোসলমানদিগের জীবন রক্ষা করা দায় হইল। একান্ত নিরুপায় হইয়া হজরত শিষ্যদিগকে বলিলেন, তোমরা আপাততঃ মক্কা পরিত্যাগ করিয়া হাবশাঃ রাজ্যে চলিয়া যাও। লোহিত সাগরের অপর তীরবর্ত্তী আফ্রিকা মহাদেশস্থ হাবশাঃ বা আবিশিনিয়া রাজ্য তখন জনৈক খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বী নৃপতির দ্বারা শাসিত হইত। হজরতের (ছালঃ) আদেশানুসারে নবুয়ত লাভের পঞ্চম বর্ষে—রজব মাসে, ১১ জন পুরুষ এবং ৪ জন স্ত্রীলোক হাবশাঃ রাজ্যে গমন জন্য মক্কা নগর ত্যাগ করিলেন ; এই পনর জন-লোকের ক্ষুদ্র দলটী রাত্রিকালে, অতি সঙ্গোপনে মক্কা-নগর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রোপকূলের দিকে গমন করিলেন। তাঁহারা জেদ্দা বন্দরে উপনীত হইয়াই আবিশিনিয়ায় গমনার্থী একখানি জাহাজ পাইলেন। তাঁহারা সেই জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক হাবশা রাজ্যে পঁহুছিলেন। এই প্রথম হেজরতকারী মহাত্মাগণের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ মোসলমান-গণ ছিলেন। (১) হজরত ওস্‌মান-বিন্-আফ্‌ফান (রাজিঃ), (২) তাঁহার পত্নী হজরত রোকয়া বিন্তে রছুলোল্লাহ্ (সালঃ), (৩) হজরত আবু হযিফাঃ-বিন্-ওতবাঃ, (৪) হজরত ওস্‌মান-বিন্ মযয্‌ূন (রাজিঃ), (৫) হজরত আবদুল্লা-বিন্ মস্‌য়ূদ (রাজিঃ), (৬) হজরত আবদুর রহমান-বিন্-অওফ্ (রাজিঃ), (৭) হজরত যোবের-বিন্-আওয়াম (রাজিঃ), (৮) হজরত মছয়াঃ বিন্-য়ামীর (রাজিঃ), (৯) হজরত আমের-বিন্-রবিয়াঃ (রাজিঃ), (১০) হজরত সহেল-ইব্‌নে বয়যাঃ (রাজিঃ)। ইহারা প্রধানতঃ কোরেশদিগের শক্তিশালী ও বিখ্যাত গোষ্ঠীর (বংশের) লোক। ইহা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, কাফের কোরেশগণের অত্যাচার কেবলমাত্র দুর্ব্বল শ্রেণীর মোসলমানদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না ; বরং প্রত্যেক মোসলমানকে, তাঁহারা যত বড়

বংশের, যেমন প্রসিদ্ধ গোত্রের, যে যত বড় শক্তিশালী গোষ্ঠীর লোকই হউক না কেন, তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে অণুমাত্র ও কুণ্ঠিত হয় নাই। ইহাও প্রমাণিত হয় যে, এই হেজরতকারী লোক-দিগের মধ্যে এমন দরিদ্র লোকও ছিলেন, যাঁহারা প্রবাসের উপযোগী জিনিষ পত্রও সংগ্রহ করিতে সক্ষম ছিলেন না। বিধর্ম্মী কোরেশগণ জানিতে পারিল যে, কতিপয় মোসলমান মক্কা হইতে হাবশাঃ রাজ্যাভি-মুখে প্রস্থান করিয়াছেন; তখন তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু জেদ্দায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই হেজরতকারী (দেশ-ত্যাগী) মোসলমানগণ জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক হাব্‌শাঃ রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন। মোসলমানগণ আবিশিনিয়ায় পঁহুছিয়া নিশ্চিন্ত মনে ও নিরুদ্বেগে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর মোসলমানগণ ক্রমশঃ মক্কা ছাড়িয়া হাবশায় চলিয়া যাইতে লাগিলেন। হজরত জাফর-বিন্-আবিতালেবও হাব্‌শায় গিয়া স্বীয় মোসলমান ভ্রাতাদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে দেশত্যাগী মোসলমানদিগের সংখ্যা ৮৩ তিরাশি পর্য্যন্ত পঁছছিল। মোসলমানগণ হাব্‌শায় পৌঁছিবার কয়েকমাস পরেই এই জনরব শুনিতে পাইলেন যে, মক্কার কোরেশগণের সকলেই পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে মোসলমানগণের পক্ষে মক্কায় কোনও আশঙ্কা বা ভয়ের কারণ নাই। এই সংবাদ শুনিয়া কতিপয় মোসলমান হাবশাঃ হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আর অবশিষ্ট সকলে এই সংবাদের সত্যতা 'তস্‌দিক্‌' হওয়ার অপেক্ষায় হাব্‌শায়ই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যে সকল মোসলমান মক্কাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহারা মক্কার নিকটস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন, ঐ সংবাদ ভিত্তিশূন্য; কোরেশদিগের অত্যাচার পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। তচ্ছ্রবণে কতকলোক পুনরায় আবিশিনিয়ায়

প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; আর কেহ কেহ মক্কায় কোনও কোনও শক্তিশালী কোরেশের 'জামানতে' (প্রতিভূত্বে) মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন। ইঁহারা মক্কায় আসিয়া, অন্যান্য মোসলমানদিগকে হাব্‌শা রাজ্যের নিরাপদতা ও সুযোগ-সুবিধা বুঝাইয়া দিয়া, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আবার হাব্‌শা রাজ্যে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহাই হাব্‌শা রাজ্যে মোসলমানদিগের দ্বিতীয় হেজরত নামে অভিহিত হয়।

মক্কার কোরেশদিগের আর একটী অকৃতকার্য্যতা।

মক্কার কাফের কোরেশগণ যখন দেখিতে পাইল যে, মক্কার অধিবাসিগণ ক্রমশঃ মোসলমান হইয়া হাব্‌শা রাজ্যে চলিয়া যাইতেছেন, এবং সেখানে সুখ-স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে বসবাস করিতেছেন, তখন তাহাদের মনে এই আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল যে, এই অবস্থায় খুব সম্ভব, আমাদের বহু সংখ্যক লোক ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, বাহিরে কোনও নিরাপদ স্থানে সমবেত ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া আমাদের উপর কোনও বিপদ আনয়ন করে। উহার প্রতিকারার্থ কোরেশ কাফেরগণ হজরতের (সালঃ) প্রতি ও তাঁহার শিষ্যদিগের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল ; আর ওমরু-বিন্‌-অল আছ ও আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-রবিয়, এই দুইজন সম্ভ্রান্ত লোককে সফির (দৌত্য) পদে নিযুক্ত করিয়া হাবশার বাদশাহ নজ্জাশীর দরবারে পাঠাইয়া দিল। মক্কার কোরেশ ও আবিশিনিয়া গভর্ণমেণ্টের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই একটী বাণিজ্য-সন্ধি স্থাপিত থাকাতে সেই সন্ধি-সর্ত্ত অনুযায়ী মক্কার কোরেশ ও হাব্‌শা রাজ্যের বাণিজ্য 'কায়েম' (প্রচলিত) ছিল। কোরেশগণ এই দুইজন ছফিরের (দূতের) হস্তে

হাব্‌শা-রাজের জন্য বহুমূল্যবান্ উপঢৌকন পাঠাইয়াছিল। ছাফরদ্বয় আবিশিনিয়ায় উপস্থিত হইয়া ঐ সকল উপঢৌকন বা নজরানা বাদশাহের দরবারে পেশ করিল, এবং 'দরবারী' (মন্ত্রী ও পারিষদ)-বর্গকে আপনাদিগের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন করিতে প্রয়াস পাইল। অতঃপর এই প্রার্থনা জানাইল যে, আমাদের কতিপয় গোলাম (ক্রীতদাস) বিদ্রোহী হইয়া আপনার রাজ্যে আগমন করিয়াছে; আর আপনাদের পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে— যে ধর্ম্ম অন্যান্য প্রচলিত সকল ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা, ঐ ক্রীতদাসদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করা হউক। বাদশাহ তাহাদের ঐ প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন, আমি প্রথমে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করি, পরে তোমাদের দরখাস্ত (আবেদন পত্র) সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে। মন্ত্রী ও সভাসদগণ এই ছফির (দূত)-দ্বয়ের দরখাস্তের অনুকূলে অনেক কথা বলিল; কিন্তু বাদশাহ নজাশী মোহাজের (হেজরতকারী বা দেশত্যাগী) মোসলমানদিগকে স্বীয় দরবারে ডাকাইয়া পাঠাইলেন; তাঁহারা উপস্থিত হইলে বাদশাহ বলিলেন, উহা কোন্ মযহব (ধর্ম্ম)—যাহা তোমরা অবলম্বন করিয়াছ? মোসলমানদিগের পক্ষ হইতে জা-ফর তইয়্যার বিন্-আবিতালেব (রাজিঃ) সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া বাদশাহ নজাশীর সম্মুখে এই মর্ম্মে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন :—

"হে বাদশাহ্ নামদার! আমাদের জাতি (মক্কার কোরেশ প্রভৃতি সম্প্রদায়) পূর্ব্বে অত্যন্ত মূর্খ ও বর্ব্বর ছিল, আমরা বোত-পরস্ত্ (প্রতিমা-পূজক), চন্দ্র ও সূর্য্যোপাসক, বৃক্ষ-প্রস্তর, ভূত-প্রেত, পূর্ব্ববর্ত্তী নামজাদা মানুষ ও নানাপ্রকার জড় পদার্থের পূজা ও উপাসনা করিতাম। মৃত জীব জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতাম। সর্ব্বপ্রকার অশ্লীল ও ঘৃণিত কার্য্য আমাদের অঙ্গের ভূষণ হইয়াছিল। মায়া-মমতা,-স্নেহ প্রীতি, দয়া-

সহানুভূতি প্রভৃতি আমাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছিল। প্রতিবেশীদিগের সঙ্গে অসৌজন্য প্রদর্শন ও নানাপ্রকার দুর্ব্যবহার করা হইত। আমাদের মধ্যে যাহারা শক্তিশালী ও ঐশ্বর্য্যশালী হইত, তাহারা দুর্ব্বলের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিত এবং বলপূর্ব্বক তাহাদের বিষয়-সম্পদ কাড়িয়া লইত। আমাদের অবস্থা যখন এইরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তখন করুণাময় আল্লাহ্ তা-লা আমাদের মধ্যে একজন রছুল (পয়গম্বর বা তত্ত্ববাহক) প্রেরণ করিলেন। তাঁহার বংশ-মর্য্যাদা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র আমরা পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলাম। তিনি আমাদিগকে পরম কারুণিক আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করিলেন। তিনি আমাদিগকে 'মওহেদ' (একেশ্বরবাদী) করিয়া পৌত্তলিকতা হইতে ফিরাইলেন। তিনি আমাদিগকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হইতে এবং আত্মীয়-স্বজনের হিত সাধন করিতে, প্রতিবেশীদিগের প্রতি সদাচার ও সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করিলেন। নরহত্যা, মিথ্যা কথা, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, এতিম (পিতৃহীন অনাথ)-দিগের সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং সতী নারীদিগের চরিত্রে অপবাদ প্রদান ইত্যাদি অন্যায় কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। আর অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র উপাসনা করিতে আদেশ দিলেন। আমরা ঐ রছুলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি ; এবং তাঁহার আদেশ পালন করিতেছি। এজন্য আমাদের জাতি আমাদের উপর 'নারাজ' (প্রতিকূল) হইয়াছে। আমাদিগের প্রতি নানাপ্রকার হৃদয়-বিদারক ভীষণ অত্যাচার ও কঠোর শাস্তি প্রদান করিতেছে। অত্যাচার অসহ্য হওয়াতে আমরা নিরূপায় হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। অগত্যা আপনার রাজ্যে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার রাজ্যে আমরা কোনও রূপ উৎপীড়িত হইব না—সম্পূর্ণ-নিরাপদে থাকিব।

হজরত জাফর তৈয়্যার-বিন্-আবিতালেব-(রাজিঃ) এর বক্তৃতা শ্রবণে হাব্শা-রাজ নাজ্জাশী বলিলেন, তোমার রছুলের প্রতি খোদা-তা-লার যে কালাম নাযেল (বাক্য অবতীর্ণ) হইয়াছে, উহার কিছু আমাকে পড়িয়া শুনাও। তদনুসারে হজরত জাফর তইয়্যার (রাজিঃ) কোরআন পাকের সুরা মরিয়ম তেলাওত (পাঠ) আরম্ভ করিলেন। কোরআন করিমের আয়াত শুনিয়া বাদশাহ নাজ্জাশী ও তাঁহার দরবারি-(সভাসদ) বর্গের নেত্র হইতে বারিধারা প্রবাহিত হইল। যখন হজরত জাফর (রাজিঃ) সুরে মরিয়মের প্রথম আয়াত পড়িয়া শেষ করিলেন, তখন বাদশাহ্ নজ্জাশী বলিলেন, এই কালামে ঐ রং (ভাব) বিদ্যমান, যাহা হজরত মূসা আলায়-হেস্-সালামের তওরাত গ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে; এ উভয় কালাম (বাক্য বা উক্তি) একই প্রকার বলিয়া বোধ হয়। কোরেশদিগের প্রেরিত এল্‌চি-(দূত) গণ বলিল, ইহারা হজরত ঈসা আলায়হেস্ সালামেরও বিরুদ্ধবাদী; একথা বলিবার তাহাদের এই উদ্দেশ্য ছিল যে, হাব্শাধিপতি নজ্জাশী খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং এই কথা শুনিলে তিনি মোসলমানদিগের প্রতি নারাজ হইবেন। হজরত জাফর-বিন্-আবিতালেব (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন যে, না একথা কখনই নয়; বরং তচ্ছ্রবণে বাদশাহ্ নজ্জাশী বলিলেন, তোমাদের এই আকিদা (বিশ্বাস) সম্পূর্ণ ঠিক। ইঞ্জিলের ও ইহাই উদ্দেশ্য। নজ্জাশীর নিকট হইতে কোরেশদিগের এল্‌চি (দূত)-দিগকে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। তিনি তাহাদিগকে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, আমি এই লোকদিগকে কিছুতেই তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিব না। সঙ্গে সঙ্গে কোরেশদিগের প্রেরিত সমস্ত তহফাও হাদিয়া (নযর ও উপঢৌকন প্রভৃতি) ফেরত দিলেন। এতদ্দ্বারা তাহারা আরও অবমানিত হইল। এই ঘটনা নবুয়তের ৬ষ্ঠ সালে ঘটিয়াছিল। কোরেশগণ যখন হাবাশ-

রাজ নজ্জাশীর দরবারেও বিফল মনোরথ হইল, তখন মোসলমান দিগের প্রতি শত্রুতা ও বৈরিভাব আরও প্রবল আকার ধারণ করিল।

হজরত আমীর হামযার ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ।

হজরতের সঙ্গে ও নব-দীক্ষিত মোসলমানদিগের সঙ্গে শত্রুতায় কোরেশদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। একদা হজরত ছফা পর্ব্বত কিংবা উহার প্রান্তদেশে বসিয়াছিলেন। আবুজহল ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল। সে হজরতকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার ভর্ৎসনা ও গালি-গালাজ করিল; যখন তিনি উহার এই অসঙ্গত ও বে-আদবীপূর্ণ কথার কোনও উত্তরই দিলেন না; তখন সে একখণ্ড পাথর তুলিয়া হজরতের গায় ছুঁড়িয়া মারিল। প্রস্তরাঘাতে হজরতের (সালঃ) দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধির ধারা প্রবাহিত হইল। তিনি সেই অবস্থায় নীরবে গৃহে চলিয়া আসিলেন। আর আবুজহল পবিত্র কাবা-গৃহের প্রাঙ্গণে—যেখানে অন্যান্য লোকেরা বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল, সেখানে আসিয়া বসিল। হজরত আমীর হামযাঃ (রাজিঃ) হজরত রেছালত মাবের (ছালঃ) চাচ্চা (পিতৃব্য)—আবার তাঁহারা উভয়ে প্রায় সমবয়স্কও ছিলেন। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে খুব প্রণয়ও ছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি (হামযাঃ) শের্কে (অংশিবাদিতায়) 'কায়েম' এবং মোশরেকদিগের সঙ্গী ছিলেন। তাঁহার নিয়ম ছিল, প্রত্যহ সকালে তীর ও ধনুক লইয়া জঙ্গলের দিকে শিকারে বাহির হইতেন, সারা দিন শিকারের সন্ধানে ফিরিতেন, এবং শিকার করিয়া বেড়াইতেন; সায়ংকালে শিকারের পশুপক্ষী সহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, এবং সন্ধ্যার সময় কাবাগৃহের তওয়াফ্ করিতেন, পরে গৃহে

ফিরিয়া আসিতেন। তিনি যথা নিয়মে শিকার হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, আবুজহলের দাসীর বাচনিক হজরতকে গ্লানি লালাজং ও লাঞ্ছনা করা, প্রস্তর নিক্ষেপে আহত করা ইত্যাদি ব্যাপার, এবং সঙ্গে সঙ্গে হজরতের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত নীরব থাকা ও শোকর করার বিষয় প্রভৃতি সকল ঘটনাই শুনিতে পাইলেন। হজরত হাম্‌যাঃ (রাজিঃ) হজরত রেছালত মাবের চাচ্চা (পিতৃব্য) হওয়া ব্যতীত রেযাই ভ্রাতা (দুধ-ভাই) ও ছিলেন; একদিকে শোণিত সম্পর্ক, অন্য দিকে দুগ্ধের সম্বন্ধ—এই উভয়ের জোশে (উত্তেজনায়) তাঁহাকে অধৈর্য্য করিয়া তুলিল। তিনি প্রথমে কাবা-গৃহে গমন করিলেন; তথায় কাবাগৃহের তওয়াফ্ (প্রদক্ষিণ) কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সোজাসোজি ঐ দলের অভিমুখে গমন করিলেন,—যেথানে আবুজহল বসিয়া সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছিল। হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) একজন বড় পাহালওয়ান (ডন্‌গীর), মহাযোদ্ধা এবং আরবের বীরপুরুষদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠতম বীর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়াই আবুজহলের মস্তকে এমন জোরে ধনুকের আঘাত করিলেন যে, তাহার মাথা ফাটিয়া শোণিতপাত হইতে লাগিল। পরে বলিতে লাগিলেন, আমি মোহাম্মদের (সালঃ) ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াছি, আর আমিও ঐ কথাই বলি, তিনি যে কথা বলিয়া থাকেন। যদি তোমার সাহস থাকে, তবে যাহা বলিবার আছে, আমার সম্মুখে বল। আবুজহলের সঙ্গিগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহার সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হইল; আবুজহল হজরত হামযায় শৌর্য্য-বীর্য্য ও বীরত্বে এতদূর প্রভাবান্বিত ছিল যে, সে নিজেই স্বীয় সঙ্গীদিগকে এই বলিয়া বাধা প্রদান করিল, এবং বলিল যে, বাস্তবিক আমি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি; যদি হামযাঃ আমার নিকট হইতে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতিশোধ গ্রহণ না করিত,

তবে সে 'বে-হামিএত' বলিয়া গণ্য হইত। হয় ত আবুজহল হজরত আমীর হামযার কথা শুনিয়া তাহার মনে এই আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছিল যে, আমার ব্যবহারে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সে মোসলমান না হইয়া যায়। এজন্য মহাবীর হজরত আমীর হামযার (রাজিঃ) ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত করণার্থ তাঁহার সম্মুখে এমন নম্রভাব প্রকাশ করিল, যাহাতে এই ব্যাপারের এই স্থলেই পরিসমাপ্তি ঘটে ; আর হামযাঃ (রাজিঃ) মোসলমান হওয়ার দিকে অগ্রসর না হয়েন। হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) আবুজহলকে 'শায়েস্তা' করিয়া, হজরত রেছালত মাবের (সালঃ) নিকটে আগমন করিলেন। এবং বলিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র ! তুমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবে যে, আমি আবুজহল হইতে তোমার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি। হজরত ফরমাইলেন, পিতৃব্য ! আমি এইরূপ কার্য্যে সন্তোষ লাভ করি না। হাঁ, আপনি যদি মোসলমান হন, তবে আমি আনন্দ লাভ করিতে পারি। এই কথা শুনিয়া হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। হজরত আমীর হামযাঃ (রাজিঃ) ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে, বিপদগ্রস্ত মোসলমান সম্প্রদায় বিশেষ শক্তি ও সাহায্য লাভ করিলেন। ইহা নবুয়তের ৬ষ্ঠ বর্ষের ঘটনা। যখন হজরত (সালঃ) দার-আরকমে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ঐ সময় মক্কার কোরেশগণ হজরতের প্রতি নানাপ্রকার গোস্তাখী (অসভ্যতা ও বর্ব্বরতা) প্রকাশ করিতেছিল ; এক্ষণে মহাবীর হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) পবিত্র ইস্‌লামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করাতে, তাহারা অনেকটা সংযত ভাব ও সভ্যতা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। তদনুসারে তাহারা হজরতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনে ও অত্যাচার করণে অনেকটা সঙ্কোচ ও ভয় করিতে লাগিল।

হজরত ওমর ফারুকের (রাজিঃ) ইস্‌লাম গ্রহণ।

হজরত হামজার (রাজিঃ) ইস্‌লাম গ্রহণের সংবাদ শ্রবণে কোরেশ-দিগের দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতাচরণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইল। হামযার (রাজিঃ) ভয়ে সে ভাব কতকটা গোপন রাখিল বটে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে গোপনে যুক্তি-পরামর্শ চলিতে লাগিল। হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) হজরত হামযার (রাজিঃ) ন্যায় প্রসিদ্ধ পাহালওয়ান ও দেশ-বিখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন। মোসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতে ও হজরতের (সালঃ) বিরুদ্ধাচরণে উৎসাহের সহিত অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি মোসলমানদিগকে ধরিয়া নির্দ্দয়ভাবে মারিতেন (প্রহার করিতেন), মারিতে মারিতে যখন অবসন্ন হইয়া পাড়িতেন, তখন নিরস্ত হইতেন ; অবসাদ ভাব দূর হইলে আবার মারিতে আরম্ভ করিতেন। এইরূপে অত্যল্প সংখ্যক মোসলমান-দিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল লোকদিগকে বেদম প্রহার করিয়া তিনি আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন। স্থূলকথা, তিনি মোসলমানদিগকে 'মোরতেদ' (কাফের বা বিধর্ম্মী) করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেন ; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। অবশেষে একদিন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, এবং কোফ্‌ফার কোরেশদিগের সভায় প্রতিশ্রুতি দান করিলেন যে, আমি একাই কোরেশদিগের উপর আক্রমণ-কারী বিপ্লবের মূলোৎপাটন করিব—অর্থাৎ এই বিপ্লবের উৎপাদক (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ)-কে হত্যা করিয়া সকল গোলযোগ মিটাইয়া ফেলিব। আবুজহল তাহার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি শুনিয়া বলিল, যদি তুমি এই কার্য্য করিতে পার, তবে তোমাকে ১০০ একশতটী

উষ্ট্র ও ১০০০ এক সহস্র আওকিয়া চান্দি (রৌপ্য) উপহার স্বরূপ প্রদান করিব। তদনুসারে হজরত ওমর (রাজিঃ) অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ঘর হইতে বাহির হইলেন ; এবং হজরতের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে হজরত সায়াদ-বিন্-আবি ওক্কাসের (রাজিঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ওমর ! এরূপ যোদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া কোথায় যাইতেছ ? প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন, (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ)-কে হত্যা করিতে যাইতেছি। কেননা, আমি দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছি যে, আজ কোরেশদিগের বিপদ ও মানসিক অশান্তির ভার লঘু করিব। হজরত সায়াদ (রাজিঃ) বলিলেন, তুমি বনি হাশেমের প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় কর না ? আর ইহাও কি জাননা যে, (হজরত). মোহাম্মদ (সালঃ)-কে হত্যা করা সহজ কার্য্য নহে। হজরত ওমর (রাজিঃ) বলিলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার হস্তে তরবারি আছে, ততক্ষণ আমি কাহাকেও 'পরওয়া' (গ্রাহ্য) করি না। তৎপর হজরত ছায়াদ (রাজিঃ) কে বলিলেন, তুমিও তাহার (হজরতের) সাহায্যকারী, এস, প্রথমে তোমারই কার্য্য শেষ করি। হজরত ছায়াদ (রাজিঃ) তচ্ছ্রবণে বলিলেন, তুমি আমাকেও (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ) কে পরে হত্যা করিবে, প্রথমে নিজের ঘরের সংবাদ গ্রহণ কর। তোমার ভগিনী ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন ; ইস্লাম তোমার ঘরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। হজরত ওমর (রাজিঃ) এই তীব্র শ্লেষ বাক্য শুনিয়া দ্রুতগতি স্বীয় ভগিনীর গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে হজরত রেছালত মাবের (সালঃ) হত্যা করণোদ্দেশে বাহির হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বীয় ভগিনীর গৃহাভিমুখে গমন করায় যেন ইস্লামের দিকেই তাঁহার অগ্রগতি হইয়াছিল ; তিনি যেন পাবত্র

ইস্‌লাম কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াই স্বীয় গতি পরিবর্ত্তিত করিলেন। যাহা-হউক, হজরত ওমর (রাজিঃ) মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুতগমনে ভগ্নীর গৃহে গিয়া পঁহুছিলেন। সেখানে হজরত জনাব-বিন্-আল-আরছ (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুকের (রাজিঃ) ভগিনী ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) এবং তাঁহার স্বামী হজরত ছয়ীদ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ) কে কোরআন শরীফের শিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন। হজরত ওমরের (রাজিঃ) আগমনের 'আছট' (পদশব্দ) শুনিয়া হজরত জনাব (রাজিঃ) তাড়াতাড়ি ঐ গৃহের কোনও নিভৃত কক্ষে আত্ম-গোপন করিলেন। আর কোরআন করিম যে সকল কাগজে বা পাতায় লিখিত ছিল, তাহাও লুকাইয়া ফেলিলেন; হজরত ওমর (রাজিঃ) গৃহে প্রবেশ করিয়াই ভগিনী এবং ভগিনীপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি পড়িতেছিলে? সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় ভগিনীপতি ছয়ীদ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ)-কে ধরিয়া সজোরে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন; এবং নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, তোমরা কেন মোসলমান হইয়াছ? তাঁহার ভগিনী স্বীয় স্বামীকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন, এবং ভ্রাতাকে লেপ্টাইয়া (জড়াইয়া) ধরিলেন। এই ধ্বস্তাধ্বস্তিতে তিনি মস্তকে এমন আঘাত পাইলেন যে, মস্তক হইতে সজোরে শোণিত ধারা প্রবাহিত হইল। ফলতঃ হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ভগিনী ও ভগিনীপতিকে খুবই মারিলেন; যাঁহার বীরত্বে মক্কা কম্পিত হইত, যাঁহার হুহুঙ্কারে বড় বড় বীর পুরুষের শোণিত শুষ্ক হইত, দুইজন নিরীহ নরনারীকে প্রহার করিয়া ক্ষত বিক্ষত করা তাঁহার পক্ষে একটা ছেলেখেলা মাত্র। ইস্‌লাম ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত তাঁহার ভগিনী অবশেষে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, হাঁ ওমর, আমরা মোসলমান হইয়াছি, আর হজরত মোহাম্মদের (ছালঃ) আদেশ পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছি; এক্ষণে তুমি

যাহা করিতে পার, তাহা কর। হজরত ওমর (রাজিঃ) ভগিনীর এতাদৃশী তেজসম্পন্ন ও সাহসোদ্দীপক উক্তি শ্রবণ করিলেন, এবং তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত দেহ শোণিত-রঞ্জিত হইয়াছে, আঘাত প্রাপ্ত স্থান সমূহ হইতে রক্তের ধারা ছুটিয়াছে। এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে একটা প্রতিক্রিয়া হইল। তাঁহার সেই ভীষণ ক্রোধাগ্নি কতকটা নিস্তেজ হইয়া আসিল। তখন হজরত ওমর (রাজিঃ) ভগিনীকে বলিলেন, আচ্ছা, তুমি ঐ কালাম (কোরআনর আয়াত বা বাণী) দেখাও কিংবা পড়িয়া শুনাও—যাহা তোমরা এখনই পড়িতেছিলে, আর যাহা পড়ার আওয়াজ গৃহ-প্রবেশ কালীন আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম। হজরত ওমরের (রাজিঃ) এই বাক্য কতকটা সহানুভূতি-সূচক ভাব-ব্যঞ্জক ছিল, ইহাতে তাঁহার ভগিনীর মানসিক শক্তি আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল; তিনি বলিলেন, তুমি প্রথমতঃ স্নান কর, তৎপর আমি আমার ছাহিফাঃ (কোরআনের লিখিতঅংশ) তোমাকে পড়িতে দিতে পারি। হজরত ওমর ফারুক তৎক্ষণাৎ গোছল (স্নান) করিলেন। গোছল শেষ করিয়া কোরআন মজিদের আয়াত কাগজের যে সকল পাতায় লেখা ছিল, তাহা লইয়া পাঠ করিলেন, কয়েকটী আয়াত পড়ার পরই বলিয়া উঠিলেন, কি মধুর কালাম (বাক্য); ইহার ক্রিয়া আমার কলবের (হৃদয়ের) মধ্যে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে; ইহা শুনিবামাত্র হজরত জনাব (রাজিঃ)—যিনি মহাবীর হজরত ওমরের (রাজিঃ) ভয়ে গৃহের এক কামরায় লুক্কায়িত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া ঐ স্থানে আসিলেন, এবং আনন্দোচ্ছ্বাসের সহিত বলিলেন, হে ওমর (রাজিঃ), মবারক হও, হজরত মোহাম্মদ রছুলোল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া সাল্লামের দোওয়া (আশীর্ব্বাদ) তোমার জন্য কবুল (গ্রাহ্য) হইয়াছে। আমি গতকল্য হজরত রছুল (সালঃ)-কে এই প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছি,

"হে এলাহি! ওমর-বিন্-আল্-খেতাব কিংবা আবুজহল এই দুইজনের মধ্যে একজনকে অবশ্য মোসলমান করিয়া দাও।" অতঃপর হজরত জনাব (রাজিঃ) স্বরে তাহার প্রথম রুকু পড়িয়া শুনাইলেন; হজরত ওমর (রাজিঃ) স্বরে তাহার আয়াত শুনিতেছিলেন, আর ক্রন্দন করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই হজরত জনাব (রাজিঃ)-কে বলিলেন, আমাকে এখনই হজরত রছুল করিম (সালঃ) এর কাছে লইয়া চল। তদনুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) কে হজরত রছুল করিম (সালঃ) এর খেদমতে লইয়া চলিলেন। তখনও হজরত ওমরের (রাজিঃ) হস্তে উন্মুক্ত তরবারি ছিল। কিন্তু ঐ তরবারি এক্ষণে ঐ সঙ্কল্পে তাঁহার হস্তে ছিল না, যে সঙ্কল্পে স্বীয় ভগিনীর গৃহাভিমুখে তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত হৃদয়ে গমন করিয়াছিলেন। দারে আরকমের দরওয়াযায় পঁহুছিয়া হজরত ওমর (রাজিঃ) দরওয়াযায় করাঘাত করিলেন; যে সকল ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ) গৃহ মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দ্বার খুলিয়া, হজরত ওমর (রাজিঃ) কে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দেখিয়া দরওয়াজার পাট ভিরাইয়া দিয়া হজরত (ছালঃ) কে জানাইলেন. ওমর (রাজিঃ) উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে; হজরত রেছালত মাব (সালঃ) আদেশ করিলেন যে, দ্বার খুলিয়া দাও। হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, তাঁহাকে আসিতে দাও, যদি তাঁহার এরাদা (সঙ্কল্প) নেক (সৎ) হয়ত, ভালই; নচেৎ উহারই হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা উহার মস্তক উড়াইয়া দেওয়া যাইবে। দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল, হজরত ওমর (রাজিঃ) গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; জনাব হজরত রছুলে মকবুল (সালঃ) তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অগ্রসর হইলেন, এবং তাঁহার দামন (বস্ত্রের এক প্রান্ত) ধরিয়া খুব জোরে ঝট্‌কা দিলেন, এবং বলিলেন, হে ওমর!

তুমি কি নিরস্ত হইবে না? হজরত ওমর (রাজিঃ) বলিলেন, ইয়া রছুলুল্লাহ্ (সালঃ)। আমি ইমান আনিবার (ইস্লাম গ্রহণ করিবার) জন্য আপনার খেদমতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিবামাত্র হজরত রছুলে আকরম (সালঃ) উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহ্ আকবর" বলিয়া উঠিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ঐ দারল আরকমে উপস্থিত মোসলমানগণ এত উচ্চ আওয়াযে "আল্লাহ্ আকবর" শব্দ উচ্চারণ করিলেন যে, মক্কার পাহাড় সমূহে তাহার প্রতিধ্বনি হইল। পবিত্র তক্‌বির ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক গুঞ্জরিয়া উঠিল। হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) ও হজরত ওমর (রাজিঃ) ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে মোসলমানদিগের খুব শক্তি বর্দ্ধিত হইল। তাঁহারা বেশ শক্তি-সম্পন্ন হইলেন। হজরত ওমর (রাজিঃ) ইস্লাম গ্রহণের পর হজরত (সালঃ) ও ছাহাবা (রাজিঃ) মণ্ডলীর সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা বলিয়া সোজাসুজি আবুজহলের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি দ্বারে করাঘাত করিবামাত্র আবুজহল ঘর হইতে বাহিরে আসিল; উৎফুল্ল ভাবে তাঁহার সহিত মিলিল, এবং "সহনান্" "মরহাবান" বলিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হজরত ওমর (রাজিঃ) বলিলেন, খোদাতায়ালাকে ধন্যবাদ, আমি মোসলমান হইয়াছি। আর হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) কে আল্লার রছুল বলিয়া স্বীকার করিতেছি। ইহা শুনিবামাত্র আবুজহল বিরক্তি সহকারে মুখ-বিকৃত করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। হজরত ওমর (রাজিঃ) ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার তথায় গমনের এই উদ্দেশ্য ছিল যে, ইস্লামের সর্ব্বপ্রধান শত্রুকে আপনার মোসলমান হওয়ার সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাহার হৃদয় দগ্ধীভূত করা। হজরত ওমর (রাজিঃ) ইস্লামে দীক্ষিত হইয়াই হজরতকে বলিলেন যে, আমাদিগকে আর গৃহে বসিয়া গোপনে নমাজ পড়া উচিত নহে; বরং প্রকাশ্যভাবে কাবাগৃহে নমাজ পড়া

চাই। তদনুসারে মোসলমানগণ প্রকাশ্যভাবে কাবাগৃহে নমাজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম যে সকল কোরেশ কাফের মোসলমান-দিগের নমাজে বাধা দিতে লাগিল, হজরত ওমর (রাজিঃ) তাহাদের সঙ্গে অস্ত্র পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। বেগতিক দেখিয়া কোরেশগণ নমাজে বাধা দিতে নিরস্ত হইল ; সুতরাং মোসলমানগণ বিনা বাধায় খানা কাবায় নামাজ পড়িতে লাগিলেন। অতঃপর ইস্লাম সূর্য্য মক্কায় জ্বলন্তভাবে প্রকাশ পাইল। ইহা নবুয়তের ৬ষ্ঠ বর্ষের শেষ মাস ছিল ; হজরত ওমরের (রাজিঃ) বয়ঃক্রম তখন ছিল ৩৩ বৎসর মাত্র। এই সময় মক্কায় মোসলমানদিগের সংখ্যা ৪০ জন পূর্ণ হইয়াছিল। আবিশিনিয়ায় যে সকল দেশত্যাগী মোসলমান ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা ইঁহাদের অন্তর্নিবিষ্ট নহে।

শয়ব আবুতালেব।

হজরত ওমর ফারুক রাজিঃ আল্লাহ্ আন্হু পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে কোরেশদিগের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। ওদিকে মোসলমানগণ প্রকাশ্যভাবে পবিত্র কাবাগৃহে নমাজ পড়িতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে বহুসংখ্যক মোসলমান আবিশিনিয়া-রাজ নজ্জাশীর রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন—যাঁহাদের উপর কোরেশদিগের কোনও জোর চলিত না। হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) ও হজরত ওমরের (রাজিঃ) বিদ্যমানতায় তাহারা মোসলমানদিগের প্রতি অত্যাচারের হস্ত প্রসারণ করিতে সাহসী হইতেছিল না। এই সকল অবস্থা দর্শনে কোরেশগণ ভাবী বিপদের আশঙ্কায় ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণার্থ নবুয়তের ৭ম বর্ষের প্রারম্ভে— মহার্‌রম মাসে একটী প্রকাশ্য সভার অধিবেশন করিল, এবং মোসলমান-

দিগের সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা ভবিষ্যতে তাহাদের কিরূপ ক্ষতির আশঙ্কা আছে, তাহা সমগ্র জাতি ও সম্প্রদায়কে ঐ সভাস্থলে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিল। আর আসন্ন বিপদ হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহার উপায় বিধান সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। অবশেষে সেই সভায় এই সিদ্ধান্ত হইল যে, বনিহাশেম ও বনি আবদুল মোত্তালেব যদিও সকলে মোসলমান হয় নাই, কিন্তু তাহারা (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ) এর সাহায্য করিতে ও তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যাহা হউক, প্রথমতঃ আবুতালেবের প্রতি এই দাবী করা হউক যে, সে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) কে আমাদের হস্তে সমর্পণ করুক। যদি সে এ প্রস্তাবে অসম্মত হয়, তবে বনু হাশেম ও বনু আবদুল মোত্তালেবের সঙ্গে বিবাহ-শাদী, মেলা-মেশা, খাওয়া দাওয়া, উঠা-বসা, দেখা-সাক্ষাৎ, সালাম-অভিবাদন ইত্যাদি সমস্ত বন্ধ করা হইবে। কোনও জিনিষ তাহাদের নিকট বিক্রয় করা যাইবে না; আহার্য্য ও পানীয় কোন দ্রব্য যেন তাহাদের নিকট পঁহুছিতে না পারে, তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত রূপ ব্যবস্থা করা হইবে। আর এইরূপ কঠোর অসহযোগিতা ঐ সময় পর্য্যন্ত দৃঢ়তার সহিত জারী রাখা হউক, যে পর্য্যন্ত (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ)-কে আমাদের হস্তে সমর্পণ না করা হয়। এই প্রস্তাবানুসারে এই 'মোকাতেয়া' অর্থাৎ অসহযোগিতা সম্বন্ধে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এক 'আহদনামা' (সন্ধিপত্র) লেখা হইল। কোরেশদলের সমুদয় রইস্ (নেতা বা দলপতি) মণ্ডলী এই ব্যবস্থা প্রতিপালনার্থ শপথ করিল। অবশেষে সকলে এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিল। এই স্বাক্ষর যুক্ত চুক্তি-পত্রখানি পবিত্র কাবাগৃহে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গেই বনু হাশেম ও বনু আবদুল মোত্তালেবের সঙ্গে অসহযোগিতা আরম্ভ হইল। কোরেশদিগের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আবুতালেব, বনু হাসেম ও বনি

আবহুল মোত্তালেবের আত্মীয় স্বজনবর্গকে সঙ্গে লইয়া, মক্কার নিকটবর্ত্তী এক পাহাড়ের উপত্যকায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলে গিয়া ঐ ক্ষুদ্র উপত্যকায় ঐ সঙ্গে আশ্রয় লইলেন। উত্তর কালে ঐ উপত্যকা "শোয়ব আবুতালেব" নামে অভিহিত হইয়াছে। উহা পাহাড়ের একটী দরিপথ মাত্র। ঐ বংশের কেবলমাত্র একটী লোক ঐ কয়েদ ও নযরবন্দী হইতে মুক্ত ছিল। সে আবহুল মোত্তালেবের অন্যতম পুত্র, হজরতের (ছালঃ) ভীষণ শত্রু ইস্লাম-বিদ্বেষী আবুলহব। সে কাফের কোরেশ-দিগের সঙ্গী ও তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। অল্প পরিমাণ শষ্যাদি যাহা বনু হাশেম ও বনু আবহুল মোত্তালেব সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন খাদ্য দ্রব্যের অভাবে তাঁহাদের বিষম কষ্ট হইতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত উপত্যকায় প্রবেশ করিবার জন্য একটী মাত্র সঙ্কীর্ণ পথ ছিল; কেহ সেখান হইতে বহির্দ্দেশে বাহির হইতে পারিতেন না। স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগকে লইয়া ইহাদের যে কি কষ্ট হইয়াছিল, তাহা কল্পনার অতীত। তাঁহাদের ঘর বাড়ী জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল; গৃহপালিত পশুপালের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা অনুমান করাও কঠিন ব্যাপার। সুদীর্ঘ ৩ বৎসর কাল শোয়ব আবুতালেবে ইঁহাদিগকে এই কল্পনাতীত ভীষণ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। সে বিপদ ও কষ্টের কথা স্মরণ করিলেও শরীর কণ্টকিত হয়। কেবলমাত্র বৎসরের মধ্যে হজ্জের সময় তাঁহারা অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে বাহিরে আসিতে পারিতেন। ঐ সময় যে কোনও শত্রুর সহিত শত্রুতাচরণ করা তৎকালে নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং ঐ অত্যল্প সময় মধ্যে যতদূর সম্ভব, অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণ খাদ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া উপত্যকা মধ্যে লইয়া যাইতেন। হজরত (ছালঃ) ও ঐ সময় বাহিরে আসিতেন;

এবং বিভিন্ন দেশ হইতে আগত লোকদিগের মধ্যে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। কিন্তু কাফের কোরেশগণ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে বিরত হইত না। তাহারা লোকদিগকে তাঁহার কথা শুনিতে নিষেধ করিত। তাঁহাকে পাগল ও যাদুকর (ঐন্দ্রজালিক) বলিয়া প্রচার পূর্ব্বক, লোকদিগকে তাঁহার উপদেশ শুনিতে দিত না; নানাপ্রকার গোলমাল করিত। শয়ব আবুতালেবের তিন বৎসর কষ্ট ভোগ ও নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ দ্বারা একথাও বেশ প্রতিপন্ন হয় যে. খান্দানে অর্থাৎ বংশের প্রতি সহানুভূতি ও এক অসাধারণ ও বিস্ময়কর ব্যাপার। আর ঐ বংশগত হামদর্দ্দী, ও সহানুভূতি প্রভাবে বনু হাশেম ও বনি আব্‌দুল মোত্তালেবের যে সকল লোক এযাবৎ ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন না, তাঁহারাও হজরতের সঙ্গে সুদীর্ঘ কাল এই দুঃখ কষ্ট, অসুবিধা সহ্য করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। একদিকে বনু হাশেমের খান্দানী হামিএত (বংশগত সাহায্য-কারিতা) তাহাদিগকে হজরতের সাহায্য করিতে বাধ্য করিয়াছিল, পক্ষান্তরে শয়ব আবুতালেবের (মক্কার সন্নিকটস্থ পূর্ব্বোক্ত উপত্যকা বা ঘাটির) ৩ বৎসর কয়েদ ও নযরবন্দীতে বনু হাশেম হজরতের (ছালঃ) অতুলনীয় আখ্‌লাকের—সচ্চরিত্রতা, সহৃদয়তা, সদাশয়তা, স্নেহ-ভালবাসা ইত্যাদি সদগুণের—সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের সুনীতি, উহার সত্যতা এবং সার্ব্বজনীন কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিবারও সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই সকল ঘটনা পরম্পরায় হজরত (ছালঃ) এর প্রতি বনু হাশেমের সহানুভূতি ও সমবেদনা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। বনু হাশেমের প্রতি সুদীর্ঘ ৩ বৎসর কাল এইরূপ ভীষণ অত্যাচার, একটী সঙ্কীর্ণ স্থানে তাহাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখা, খাদ্যাভাবে তাহাদের অকথ্য ক্লেশ ভোগ করা প্রভৃতি ব্যাপারে কোরেশদিগের মধ্যেও কোন কোন

ব্যক্তির হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। ছোট ছোট বালক বালিকাগণের খাদ্যাভাবে করুণ আর্ত্তনাদ, তদ্দর্শনে তাহাদের জননীগণের অধীরতা ও ব্যাকুলতা, এই সকল বিষয় বনু হাশেমের সম্পর্কিত কতিপয় কোরেশ-প্রধানকে অস্থির করিয়া তুলিল। সর্ব্ব প্রথমে যাহার হৃদয় বনু-হাশেমের দুর্গতি ও কষ্টে ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিল, তাহার নাম যহির-বিন্-ওমিয়া-বিন্-মগিরা। আবুতালেব ইহার মাতুল এবং আবদুল মোত্তালেব ইহার মাতামহ ছিলেন; সুতরাং এই হামদর্দ্দী ও সহানুভূতি আত্মীয়তা-জনিত ছিল। যহির প্রথমে মতয়ম বিন্-আদি-বিন্-নওফল-বিন্-আব্‌দে মনাফ্-কে আত্মীয়তার বিষয় স্মরণ করাইয়া অতি নিষ্ঠুরতা-মূলক আহদনামা (চুক্তি-পত্র) ভঙ্গ করিবার জন্য সম্মত করাইল। তৎপর আবুল জত্‌রি-বিন্-হেশাম ও যময়্যা-বিন্-আল-আসুদকে ও আপনার 'হাম-খেয়াল' (একমতাবলম্বী) করিয়া লইল। স্থূলকথা, মক্কার বিভিন্ন বংশীয় কতিপয় নেতৃস্থানীয় পুরুষ—যাহাদের সঙ্গে বনু হাশেমের 'করাবত্ত' (আত্মীয়তা) ছিল, বনু হাশেমকে মজলুম (উৎপীড়িত ও অত্যাচারগ্রস্ত) মনে করিয়া, এই অত্যাচার-মূলক চুক্তিপত্র ভঙ্গ করিবার জন্য আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিল। ঠিক ঐ সময়ই হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) পিতৃব্য আবুতালেবকে বলিলেন, আমাকে খোদাতা-লার পক্ষ হইতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, কোরেশ-দিগের আহদ-নামার (চুক্তি-পত্রের) সমস্ত লিখিত বিষয় কীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু উহার মধ্যে যে যে স্থানে "আল্লাহ্" শব্দ লিখিত ছিল, তাহা যেমন তেমনই আছে। আল্লাহ্ শব্দ ব্যতীত চুক্তি পত্রের লিখিত সমস্ত এবারত নষ্ট হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া আবুতালেব পাহাড়ের ঘাটি হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, এবং কোরেশ নেতাদিগের নিকট গিয়া কহিলেন, আমাকে (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ) সংবাদ

দিয়াছেন যে, তোমাদের চুক্তি-পত্র কীট (সম্ভবতঃ, উইপোকা) কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে। তোমরা ঐ চুক্তিপত্র গিয়া দেখ, যদি বাস্তবিক এই সংবাদ সত্য হয়, চুক্তিপত্রের লিখিত বিষয় নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে এই 'মোকাতেয়া' (অসহযোগিতা) 'বাতেল' (শেষ বা অগ্রাহ্য) হওয়া উচিত। তচ্ছ্রবণে কোরেশ নেতৃমণ্ডলী দৌড়িয়া কাবাগৃহে উপস্থিত হইল। চুক্তিপত্রখানি লইয়া দেখিল, উইপোকায় উহার লিখিত সমস্ত 'এবারত' খাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু যেখানে যেখানে " আল্লাহ্" শব্দ লিখিত ছিল, তাহা উইপোকা কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় নাই। এই ব্যাপার দর্শনে কোরেশগণ 'হয়রান-পেরেশান' ও বিস্ময়াপ্লুত হইয়া গেল; তখন তখনই চুক্তিপত্র ভঙ্গ হইল বলিয়া কোরেশগণ ঘোষণা প্রচার করিল। বনু হাশেমগণও সমুদয় মোসলমান ৩ বৎসর পরে সেই পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ উপত্যকা হইতে বাহির হইলেন; এবং মক্কা নগরে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব গৃহে বসবাস করিতে লাগিলেন। শয়ব আবুতালেবে (পাহাড়ের উপত্যকা বা ঘাটিতে) বনু হাশেম এবং মোসলমানদিগকে খাদ্যাভাবে অনেক সময় গাছের পাতা খাইয়া জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল। কাহারও কাহারও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, যদি কোনও স্থানে শুষ্ক চর্ম্মখণ্ড পাইতেন, তাহা তুলিয়া আনিয়া পরিষ্কার ও নরম করিয়া আগুনের উপরে সেঁকিতেন, আগুণ হইতে তুলিয়া তাহাই চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃ করিতেন; হকিম-বিন্-খরাম কখন কখন স্বীয় ক্রীতদাসের হস্তে কিছু খাদ্য-দ্রব্য আপনার ফুপ্‌পি (পিসি) হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রার (রাঃ—আঃ) জন্য গোপনে ঐ উপত্যকায় পাঠাইয়া দিত। এই ব্যাপার যখন একবার আবুজহল জানিতে পারিল, তখন ঐ গোলামের হস্ত হইতে খাদ্য দ্রব্য কাড়িয়া লইল; এবং সেই হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা সতর্কতার সহিত পাহারার বন্দোবস্ত করিল।

আম-আল্-হাযন অর্থাৎ নবুয়তের দশম বৎসর।

হজরত রছুল মকবুল (ছালঃ) যখন শয়ব আবুতালের হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার নবুয়তের দশম বৎসর আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সমূহের আলোচনা করিলে ইহাই অনুমান হইতে পারে যে, অতঃপর কোরেশগণ মোসলমানদিগের সঙ্গে নম্র ও কোমল ব্যবহার করিবে, বিদ্বেষ-ভাব পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু সে ধারণা ভ্রান্তি-মূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। বরং মোসলমানদিগের বিপদ ও হজরতের (ছালঃ) প্রতি দুর্দ্ধর্ষ কোরেশদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সত্বরেই এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, ঐ বৎসরের নাম "আম-আল্হযন" অর্থাৎ গম (শোক)-এর বৎসর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। ঐ বৎসরের পবিত্র রজব মাসে, ৮০ বৎসর বয়সে হজরতের পরম শুভানুধ্যায়ী পিতৃব্য আবুতালেব পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। আবুতালেবের মৃত্যু হওয়াতে মক্কার কোফ্ফার অর্থাৎ ইস্লামের শত্রুদলের সাহস অনেক বৃদ্ধি পাইল। আবুতালেবই এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, এবং বনু হাশেমের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তি ও প্রভাবসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, যাঁহাকে সকলেই ভয় করিত, সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা ভক্তিও করিত। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন বনু হাশেমের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল, মক্কায় ঐ বংশের প্রভাব ও প্রাধান্য লোপ পাইল। কোরেশগণ যখন দেখিল, বনু হাশেমের মধ্যে আর প্রভাবসম্পন্ন লোক কেহই নাই, তখন তাহারা মহামান্য হজরত (ছালঃ) ও মোসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিবার জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। তৎপক্ষে তাহাদের জন্য এ সময় ময়দান খালি ছিল। এই বৎসরই হজরত আবুবকর সিদ্দিক

(রাজিঃ) কাফেরদিগের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হইয়া মক্কা হইতে হেজরত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদনুসারে তিনি মক্কা হইতে নির্গত হইয়া ৪ মঞ্জেল পথ অতিক্রম করিলে, বরক্-অল্ গমাদের নিকট কারা নামক সম্প্রদায়ের ছরদার (নেতা) এব্নে আল্-গনাহ্র সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাইতেছেন? উত্তরে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) বলিলেন, আমার কওম (জাতি বা সম্প্রদায়) আমার প্রতি এমন ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে, এবং করিতেছে যে, আমি ইচ্ছা করিয়াছি, মক্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কোনও স্থানে গিয়া বসবাস এবং নিশ্চিন্তে বসিয়া আপনার 'রব' (আল্লাহ্)-এর 'এবাদত' (উপাসনা-আরাধনা) করিব। এব্নে আল্-গনাহ্ বলিল, আপনি এমন একব্যক্তি যে, না আপনার মক্কা পরিত্যাগ করা উচিত, আর না আপনার কওমের আপনার প্রতি এমন ব্যবহার করা সঙ্গত যে, যদ্দ্বারা আপনাকে মক্কা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। আমি আপনাকে নিজের পানাহে (আশ্রয়ে) লইতে প্রস্তুত আছি, আপনি ফিরিয়া মক্কায় চলুন। মক্কায় বসিয়াই আপনি রবের (আল্লাহ্র) 'এবাদত বন্দেগী, (উপাসনা-আরাধনা) করিতে থাকুন। তদনুসারে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন। এব্নে আল্-গনাহ্ কোরেশদিগকে এক সভায় আহ্বান করিয়া, তাহাদের এই অত্যাচার-উৎপীড়ন সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া তাহাদিগকে খুব লজ্জিত ও অপ্রস্তুত করিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিল যে, তোমরা এমন সচ্চরিত্র ও আদর্শ পুরুষকে মক্কা হইতে বহিষ্কৃত করিতে বাধ্য করিতেছ, যাঁহার বিদ্যমানতা কওমের (গোষ্ঠীর) গৌরবের বিষয়। অতঃপর হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) স্বীয় গৃহের আঙ্গিনায় একটী ক্ষুদ্র চবুতরাঃ ও মস্জেদ নির্ম্মাণ করিলেন; তিনি সেখানে বসিয়া কোরআন শরীফ্ 'তেলাওত' এবং খোদা তা-লার উপাসনা-আরাধনায়

'মশ্‌গুল' থাকিতেন। তাঁহার কোরআন শরীফ্‌ পাঠের সুমধুর আওয়াজ মহাল্লার স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাদিগের হৃদয়ে বিশেষ ক্রিয়া করিত। কোরেশদিগের পক্ষে ইহাও অসহ্য হইল। তাহারা আল্‌-গনাহ্‌-কে বলিল, আবুবকরের (রাজিঃ) কোরআন পড়াও বন্ধ করিতে হইবে। কিংবা সে যেন উচ্চৈঃস্বরে কোরআন না পড়ে। আল্‌-গনাঃ তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পড়িতে নিষেধ করাতে তিনি বলিলেন, আমি তোমার আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার খোদার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ; উহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমি কোনও ক্রমেই কোরআন পড়া বন্ধ করিতে পারিব না।

আবুতালেবের মৃত্যুর প্রায় দুই মাস পরে—নবুয়তের দশম বৎসর রমজান মাসে, হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ) ও পরলোক গমন করিলেন। ওম্মোল মুমেনিন হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রার (রাঃ—আঃ) সঙ্গে হজরতের (সালঃ) গভীর প্রণয় ছিল। সেই পতিগত-প্রাণা মহিয়সী মহিলা হজরতের (ছালঃ) পবিত্র প্রণয়ে তন্ময় ছিলেন। স্বীয় বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশি তাঁহারই পদে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে তিনিই হজরতের (সালঃ) নবুয়তে (প্রেরিতত্ত্বে—পয়গম্বরীতে) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন ; আর তাঁহার সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রকার আপদ-বিপদে, দুঃখ-কষ্টে হজরতের (ছালঃ) সঙ্গিনী ছিলেন। তিনি হজরত (ছালঃ)-কে সাহস দিতেন, মহা বিপদ কালেও সান্ত্বনা দিতেন, এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেন। আবুতালেব ও হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ) ইঁহারা উভয়ে হজরতের এমন হিতৈষী ও হিতৈষিণী ছিলেন যে, ইঁহাদের পরলোক গমনে তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোফ্‌ফার কোরেশদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা বাড়িয়া চলিল।

একদা তিনি রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কোনও দুর্ব্বৃত্ত কতকগুলি কর্দ্দম লইয়া তাঁহার মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিল। মস্তক, কেশ, দাড়ি প্রভৃতি কর্দ্দমে প্লাবিত হইল, সমগ্র দেহ ও বস্ত্রাদি কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল, তিনি সেই অবস্থায়ই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হজরতের কনিষ্ঠা ছাহেবযাদী—স্বর্গের রাজ্ঞী হজরত ফাতেমা যোহরা (রাঃ—আঃ) পানী লইয়া হজরতের মস্তক ধৌত করিতে করিতে রোদন করিতেছিলেন। তাঁহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া হজরত (ছালঃ) ফরমাইতেছিলেন, অয়ি কন্যে! তুমি ক্রন্দন করিও না; খোদাতায়ালা স্বয়ং তোমার পিতার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

একবার হজরত (ছালঃ) কাবাগৃহে গমন করিলেন, সেখানে অনেক গুলি মেশ্‌রেকিন (ধর্ম্মদ্রোহী কাফের) বসিয়াছিল, তন্মধ্যে আবুজহল তাঁহাকে দেখিয়া শ্লেষ-সূচক বাক্যে কহিল, আব্‌দে মনাফ্‌ওয়ালাগণ আইস, দেখ, তোমাদের নবী আসিয়াছে। আত্‌বা-বিন্‌-রবিয়া বলিয়া উঠিল, আমাদের তাহাতে অস্বীকৃতি করিবার কি আছে, কেহ নবী হউক বা কেহ ফেরেশ্‌তা হউক তাহাতে কি আইসে যায়? হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) রবিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কখনও খোদা এবং রছুলের হেমাএত (সাহায্য বা পক্ষ সমর্থন) কর নাই; আর নিজের যেদের উপর অটল রহিয়াছ। আবার আবুজহলকে বলিলেন, তোমার জন্য ঐ সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে, যখন তুমি খুব কম হাসিবে, কিন্তু পরিণামে তোমাকে অনেক কাঁদিতে হইবে। অবশেষে সমুদয় মোশরেকিন (অংশিবাদী)-দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ঐ দিন নিকটবর্ত্তী, যে দিন (ধর্ম্ম) আজ অস্বীকার করিতেছ, উহাতেই দাখেল (প্রবিষ্ট) হইবে।

যাহা হউক কোফ্‌ফার (ধর্ম্মদ্রোহী) কোরেশদিগের জেদ ও হঠকারিতা দিন দিন বাড়িয়া চলিল; হজরত (ছালঃ) পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থান

করিবার সময় হইতে কোরেশ ব্যতীত যাহারা বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন স্থান হইতে হজ্জ্ করিবার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসিত, তাহাদের মধ্যেও সত্যধর্ম্ম ইস্‌লাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তদ্দ্বারা কোনও রূপ সফল কাম হইতে পারেন নাই। এক্ষণে মক্কাবাসীদিগকে সীমাতীত কঠোর-হৃদয় ও ইস্‌লামের প্রতি তাহাদিগের অত্যন্ত বিরাগ দেখিয়া তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, তায়েফ * বাসীদিগকে ইস্‌লামে আহ্বান করিবেন। তায়েফে বনি-সকিফ্ সম্প্রদায় বাস করিত, "লাত্" নামক দেবতার তাহারা উপাসক ছিল। তায়েফে লাত দেবের মন্দির ছিল; নগরের সমস্ত অধিবাসী উহার পূজারী (সেবাইত-'খাদেম') বলিয়া পরিচয় দিত। ১০ম হিজরীর শওয়াল মাসে—অর্থাৎ হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রার (রাজিঃ—আঃ) মৃত্যুর একমাস কাল পরে তিনি যয়েদ-বিন্-হারেছ্ (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে তায়েফে পঁহুছিলেন। সেখানে পঁহুছার পূর্ব্বে তিনি পথিমধ্যে প্রথমতঃ বনু বকর সম্প্রদায়ের আবাস স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যখন সেই সম্প্রদায়কেও মক্কার কোফ্‌ফার কোরেশদিগের হাম-খেয়াল (একই মত বা সঙ্কল্প বিশিষ্ট) দেখিতে পাইলেন, তখন কহতান বংশীয়দিগের বাসস্থানে গমন করিলেন; উহাদিগকেও কোরেশ-দিগের মতন কঠোর হৃদয় ও একমতাবলম্বী দেখিতে পাইয়া নিরাশ প্রাণে তায়েফে উপস্থিত হইলেন, এবং তথাকার রইস (সম্ভ্রান্ত) মণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন; তায়েফের ছরদার (নেতা)-দিগের মধ্যে আব্‌দ্

---

* তায়েফ মক্কা হইতে ৩ 'মঞ্জেল' অর্থাৎ ৬০ মাইল দূরে-তৎকালে মক্কার ন্যায়ই একটী বড় শহর ছিল; এখনও অতি উর্ব্বরা, শস্য-শালিনী এবং স্বাস্থ্যকর শহর বলিয়া বিখ্যাত। ১৩৩২ সালে ওহাবী-রাজ এব্‌নে সউদ তায়েফ্-বাসীদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন। বহু তায়েফ বাসীকে বর্ব্বর ওহাবিগণ অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়াছিল।

এয়ালয়েল-বিন্-ওমর-বিন্-যমির এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা মস্‌উদ ও জবিব সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাব সম্পন্ন এবং বনি সকিফের সর্ব্বপ্রধান নেতা বলিয়া পরিগণিত হইত। হজরত (ছালঃ) ঐ তিনজনের সহিতই সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাহাদিগকে ইস্‌লামের দিকে 'দাওত' (আহ্বান) করিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে ইস্‌লাম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহারা বড়ই অহঙ্কারী ও আত্মম্ভরী লোক ছিল; হজরতের (ছালঃ) কথায় তাহারা কর্ণপাত করিল না; বরং তাহাদের এক ভ্রাতা উপেক্ষিত ভাবে বলিল, তোমাকে যদি খোদা আপনার রছুল করিয়া প্রেরণ করিতেন, তবে তুমি এরূপ ভাবে জুতা চটকাইয়া পদব্রজে চলিতে ফিরিতে না। আর এক ভ্রাতা বলিল, খোদা কি আর কোনও লোক পাইয়াছিলেন না যে, তোমার ন্যায় লোককে রছুল বানাইলেন? তৃতীয় ভ্রাতা বলিল, তোমার সঙ্গে কথা বলাই উচিত নয়; যদি তুমি নিজের কথানুযায়ী খোদার রছুল হও, তবে তোমার বাক্য রদ (উপেক্ষা) করা বড় ভয়াবহ ব্যাপার। আর যদি তুমি মিথ্যা কথা বল, তবে এমন (মিথ্যাবাদী বা কপট) লোকের সঙ্গে কথা বলা কোনও ক্রমে সঙ্গত নহে।

হজরতের সঙ্গে তায়েফ্‌বাসীদিগের বে-আদবী।

যখন হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) আব্‌দ্ এয়ালয়েল ও তাহার ভ্রাতাদিগের নিকট নিরাশ হইলেন, তখন তাহাদিগকে বলিলেন, আচ্ছা, তোমাদের খেয়াল ও বিশ্বাস তোমাদিগের নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ, অন্য লোকের মধ্যে ইহা প্রচার করিও না। সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি তায়েফের অন্যান্য লোকের নিকট ইস্‌লাম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু আব্‌দ্ এয়ালয়েল ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয় আপনাদের গোলাম

(ক্রীতদাস)-গণ, শহরের বেরেল্লা-অশিষ্ট ছোকরাগণ ও ভবঘুরে লোকদিগকে হজরত (ছালঃ)-এর পেছনে লাগাইয়া দিল। হজরত (ছালঃ) যেখানে যাইতেন, এই বদমাশ দল, ভবঘুরের দল, ছোকরার দল তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া গালি দিত, তাঁহার প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিত, হাতে তালি দিত ; ঠিক কোনও পাগল বা ক্ষেপা লোকের পেছনে পড়িয়া শহরের দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ভবঘুরে ও ফচ্‌কে লোকেরা যেমন আজকালও শহর বন্দরে তাহাদের প্রতি অশিষ্টজনক ব্যবহার করিয়া থাকে ; হজরতের (ছালঃ) সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ আচরণ করিতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গে কেবলমাত্র তদীয় বিশ্বস্ত ও পরম ভক্ত দাস যায়েদ-বিন্‌-হারেছ (রাজিঃ) ছিলেন ; তিনি যথাসাধ্য এই অত্যাচার ও উপদ্রব হইতে হজরত (ছালঃ)-কে রক্ষা করিতেন। হতভাগ্য অশিষ্ট তায়েফ্‌ বাসীর প্রস্তর ও লোষ্ট্র বর্ষণে হজরত (ছালঃ) ও যায়েদ (রাজিঃ) উভয়েই যখ্‌ম (আহত বা ক্ষত-বিক্ষত) হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের পক্ষে তায়েফে তিষ্ঠান অসম্ভব হইল। রাজপথ হইতে যখন বাজারে উপস্থিত হইলেন, তখনও শহরের আওবাশ্‌ (ভবঘুরে ও বদমাশ)-গণ,ও বেআদব ছোকরা-গুলি দল বাঁধিয়া তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে হজরত (ছালঃ) যয়েদ (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া তায়েফ্‌ শহর ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন ! কিন্তু বদমাশের দল তখনও তাঁহার পশ্চাদনুসরণে ক্ষান্ত হইল না। এমন কি, শহরের বাহিরে ৩ মাইল পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল। হজরতের (ছালঃ) পবিত্র দেহ প্রস্তর বর্ষণে শোণিতাক্ত হইয়াছিল, শরীর হইতে এত শোণিত-পাত হইয়াছিল যে, পাদুকাদ্বয় শোণিতপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত এবং বস্ত্রাদি শোণিতদ্বারা রঞ্জিত হইয়াছিল। হজরত (ছালঃ) স্বয়ং ফরমাইয়াছেন, " আমি তায়েফ্‌ হইতে ৩ মাইল

পর্য্যন্ত পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলাম, ঐ অবস্থায় আমার এমন হোশ (জ্ঞান বা চৈতন্ত) ছিল না যে, আমি কোথা হইতে আসিতেছি, এবং কোথায় যাইতেছি।" তায়েফ্ হইতে ৩ মাইল দূরে মক্কার একজন প্রধান রইস্ আক্‌বা-বিন্-রবিয়ার একটী বাগান ছিল, হজরত (ছালঃ) ঐ বাগানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন তায়েফের বদমাশ্ দল তাঁহার অনুসরণে ক্ষান্ত হইয়া তায়েফাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হজরত (ছালঃ) ঐ বাগানের প্রাচীরের ছায়ায় উপবেশন করিলেন। স্বীয় নিরুপায় অবস্থা ও বিপদ-বিঘ্ন দেখিয়া পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার মহাদরবারে এই বলিয়া দোওয়া (প্রার্থনা) করিতে লাগিলেন যে, হে এলাহি! তুমিই নিরুপায়ের উপায় ও দুর্ব্বলের সহায়, আমি তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। কিন্তু এত উৎপীড়িত ও প্রস্তরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াও উৎপীড়ক তায়েফ্‌বাসীর জন্য 'বদ্‌দোওয়া' (অভিসম্পাত) প্রদান করেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত বাগানের মালেক (অধিকারী) আত্‌বা-বিন্-রবিয়া ঐ সময় বাগানে উপস্থিত ছিল। সে দূর হইতে হজরত (ছালঃ)-কে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া, আরবের ভদ্রতা ও অতিথি-পরায়ণতার বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় দাস আদ্দাসের হস্তে, এক বাসনে কতকগুলি তাজা আঙ্গুর হজরত (ছালঃ)-এর নিকট পাঠাইয়া দিল। ঐ ক্রীতদাস নিউবিরা দেশের অধিবাসী এবং খৃষ্টীয়ান ছিল। হজরত (ছালঃ) ঐ আঙ্গুর খাইলেন, এবং আদ্দাসকে ইস্‌লামের দিকে আহ্বান করিলেন। আদ্দাসের কলবে (হৃদয়ে) হজরত (ছালঃ)-এর কথার ক্রিয়া প্রকাশ পাইল; সে তখন মস্তক অবনত করিয়া হজরতের হস্ত চুম্বন করিল। ওক্‌বা দূর হইতে গোলামের এই কার্য্য দেখিতে পাইল। যখন আদ্দাস বাসন লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন ওতবা তাহাকে বলিল, ঐ ব্যক্তির কথা শুনিও

না; উহার দীন (ধর্ম্ম) হইতে তোমার ধর্ম্মই উত্তম। হজরত (ছালঃ) কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ঐ বাগানে বিশ্রাম করিয়া, শ্রান্ত-ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে একটু শক্তিলাভ করিয়া, বাগান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া তিনি " নখ্‌লাঃ " নামক স্থানে পঁহুছিলেন। একটী খর্জ্জুরের বাগানে তিনি হজরত যয়েদের (রাজিঃ) সঙ্গে নিশাযাপন করিলেন। ঐ স্থানে কতিপয় জেনের ছরদার (নেতা) তাঁহাকে কোরআন শরীফ্‌ পড়িতে শুনিল এবং মধুর আওয়াজে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং ঈমান আনিল (পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল)। নখলাঃ হইতে রওয়ানা হইয়া তিনি কোহ্‌-হেরায় (হেরাঃ নামক পাহাড়) উপস্থিত হইলেন; তিনি সেখানে থাকিয়া কোনও কোনও কোরেশ ছরদারের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন; কিন্তু কোনও ব্যক্তিই তাঁহাকে স্বীয় জামানতে (প্রতিভূ-ত্বে) এবং আশ্রয় প্রদান করিতে সম্মত হইল না। মতয়ম-আদির নিকট যখন হজরতের (ছালঃ) আশ্রয়-দানের প্রস্তাব উপস্থিত হইল, ঐ ব্যক্তি হজরত (ছালঃ)-কে স্বীয় জামানতে ও আশ্রয়ে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। এই ব্যক্তি কাফের থাকিলেও আরবী শরাফৎ (ভদ্রতা) ও জাতীয় সহানুভূতি বশে সমগ্র মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে এই কার্য্যে অগ্রসর হইল। কেবল প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াই ক্ষান্ত থাকিল না, তৎক্ষণাৎ হেরা পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক হজরত (ছালঃ)-কে সঙ্গে লইয়া মক্কায় উপনীত হইল। মতয়মের পুত্র উন্মুক্ত তরবারি লইয়া খানাহ্‌ কাবার (পবিত্র কাবাগৃহের) সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। হজরত (ছালঃ) কাবাগৃহের তওয়াফ্‌ (প্রদক্ষিণ-ধর্ম্মানুষ্ঠান বিশেষ) করিলেন। ইহার পর মতয়ম ও তাহার পুত্র উন্মুক্ত তরবারি লইয়া হজরত(ছালঃ)-কে নিরাপদে তাঁহার গৃহে পঁহুছাইয়া দিল। কোরেশগণ মতয়মকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গে (হজরত) মোহাম্মদের (সালঃ) কি

সম্বন্ধ ? মতয়ম উত্তর করিল, আমার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ ত কিছুই নাই, কিন্তু আমি (হজরত) মোহাম্মদের (সালঃ) 'হেমায়েতি,'—সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা। যে পর্য্যন্ত তিনি আমার আশ্রয়ে থাকিবেন, কেহ চক্ষু তুলিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিবে না। মতয়মের এই সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়া কোরেশগণ কতকটা নীরবতা অবলম্বন করিল। আর এক রওয়ায়েতে (বর্ণনায়) আছে, যখন হজরত (ছালঃ) তায়েফ্ হইতে পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় বাহির হইলেন, তখন এক ফেরেশ্তা তাঁহাকে আসিয়া বলিল, যদি আপনি আদেশ করেন, তবে আমি একটী পাহাড় উঠাইয়া আনিয়া তায়েফের উপর নিক্ষেপ করি, তাহাতে সমুদয় তায়েফ্-বাসী ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। হজরত (সালঃ) ফরমাইলেন, না, কখনই না; আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও আশা আছে যে, যদিও ইহারা ইস্লাম গ্রহণ না করে, কিন্তু উহাদের বংশধরগণ খাদেমে এস্লাম (এস্লামের সেবক) রূপে পরিগণিত হইবে এবং উহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সকলেই মোসলমান হইবে। আমি উহাদের ধ্বংস-সাধন পছন্দ করি না।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরদিগের অনেকের যামানায় বহু খোদা-দ্রোহী জাতি এইরূপ অবস্থায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, যথা :—আদ-সমুদ-লুৎ ও হজরত নূহের সময়ের খোদার নাফরমান জাতি সমূহ, মেছেরের ফেরাউনী দল ইত্যাদি। আমাদের হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) দয়া ও ক্ষমার সাগর ছিলেন ; এজন্য তাহার উপাধি ছিল " রহমতুল্লিল্-আলামিন।"

এই সালে—অর্থাৎ হেজরতের দশম বৎসরের শওয়াল মাসে হজরত (ছালঃ), হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) অতি অল্পবয়স্ক কন্যা হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ—আঃ) ও হজরত ছওদা-বিন্তে যময়্যা (রাজিঃ—আঃ)-কে বিবাহ করেন। এই বৎসরেই হজরতের (ছালঃ) মেররাজ হইয়াছিল। মেয়রাজ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ

ঐতিহাসিক তবরির উক্তি এই যে, অহি নাজেল হইবার প্রারম্ভে, নবুয়তের প্রথব বর্ষে মেয়রাজ হইয়াছিল। অর্থাৎ যে বৎসর নমাজ ফরজ হয়, মেয়রাজ ও সেই বৎসরেই হয়। এব্‌নে হযম বলেন, ১০ম হিজরীতে মেয়রাজ হইয়াছিল। কোনও কোনও ইতিহাসে উল্লেখ আছে, নবুয়তের ১২শ সালে মেয়রাজ হইয়াছিল। কোনও কোনও রওয়ায়েতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, মেয়রাজ মদীনায় হেজরতের পরে হইয়াছিল ; যেমন শক ছদর (হজরতের ছিনা চাক করা বা বক্ষঃ বিদারণ) সম্বন্ধে কতক আলেমের এই মত যে, উহা একাধিকবার হইয়াছিল, সেইরূপ মেয়রাজ সম্বন্ধে কতক আলেমের মত এই যে, উহাও একাধিক বার হইয়াছিল।

বিভিন্ন-প্রদেশে ও বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইস্‌লাম প্রচার।

হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) মক্কাবাসীদিগের নিকট 'না-ওম্মেদ' (নিরাশ) হইয়া, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তায়েফে গমন করিয়াছিলেন, তথাকার লোকেরা মক্কাবাসীদিগের অপেক্ষা ঘৃণিত 'নমুনা' (আদর্শ) দেখাইয়াছিল। মক্কাবাসীদিগের তাঁহার প্রতি ও নব-দীক্ষিত মোসলমান-দিগের প্রতি ঘৃণা, 'যেদ' ও বিদ্বেষ ভাব দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। উহাদের ষড়যন্ত্র, বিরুদ্ধাচারিতা, দুরাচারিতা ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু হজরত (ছালঃ)-এর খোদার প্রতি নির্ভরতা, সাহস, দৃঢ়তা, অকুতোভয়তা বিন্দুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া লাগিল। তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি মক্কার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের মধ্যে গিয়া ইস্‌লাম-প্রচার করিতেন, তাহাদিগকে কোরআনের পবিত্র বাণী শুনাইতেন।

বনু কন্দর ও বনু আবদুল্লা এই দুই সম্প্রদায়ের বাসস্থানে হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র প্রচার-বাণী পঁহুছিল। বনু-আবদুল্লা সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন; তোমাদের পিতা (পূর্ব্বপুরুষ) আবদুল্লা ছিল; তোমরা ও তদনুসারে 'এস্‌মেবা-মোছম্মা' (নামের সার্থকতা সম্পাদক) অর্থাৎ আল্লাহ তা-লার বান্দা বা দাস হইয়া যাও। বনু হানিফার বস্তিতে (গ্রামে) ও তিনি গমন করিলেন, তথাকার পাপাচারী দুরাত্মা লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত ও পশোচিত ভাবে হজরতের (ছালঃ) সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল। তাহারা সেই ঘৃণিত আচরণের দ্বারাই আপনাদের অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিল।

মক্কার বহির্দ্দেশ হইতে যে সকল 'মোছাফের' (প্রবাসী) মক্কা নগরে আগমন করিত, কিংবা হজ্জের সময় দূরবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে যে সকল কাফেলা আসিত, হজরত (ছালঃ) তাহাদের ডেরা বা তাম্বু সমূহে গমন পূর্ব্বক ইস্‌লাম প্রচার করিতেন; এবং পবিত্র কোরআনের মহাবাণী শুনাইতেন। কিন্তু তাঁহার অন্যতম পিতৃব্য আবুলহব, তদীয় শক্রতাচরণে সর্ব্বাপেক্ষা আমোদ বোধ করিতে। সে সর্ব্বদা হজরতের (ছালঃ) পশ্চাদনুসরণ করিত; আর প্রবাসী ও দূরদেশ হইতে আগত লোকদিগকে তাঁহার কথা শুনিতে প্রাণপণে বাধা দিত। কিন্তু হজরত (ছালঃ) তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তিনি বনু কলব, বনু আমের, বনু-শয়বান, বনু-মহারেব, বনু-ফযারাঃ, বনু-গচ্ছান, বনু-ছলিম, বনু-আবস, বনু-হারেছ, বনু-আমরাঃ, বনু-যহল, বনু-মরুরা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকদিগকেও ইস্‌লামের দিকে আহ্বান করিলেন।

যখন তিনি বনু-আমের সম্প্রদায়ের সম্মুখে ইস্‌লাম ও পবিত্র কোরআনের মহাবাণী প্রচার করিলেন, ঐ সময় ফরাছ নামক এক ব্যক্তি বলিল, যদি আমি মোসলমান হই, আর আপনি আপনার শক্রদলের

উপর জয়ী হন, তবে আপনি আপনার পরে আমাকে খলিফা (প্রতিনিধি) নির্ব্বাচিত করিতে রাজী আছেন কিনা? হজরত ফরমাইলেন, এই কার্য্য ত খোদাতায়ালার কর্ত্তৃত্বাধীন; তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা, আমার স্থলে খলিফা নির্ব্বাচন করিবেন। তচ্ছ্রবণে ঐ ব্যক্তি বলিল, কি মজার কথা, এ সময় আমি আপনার ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সাহায্যকারী হইব, মাথা কাটাইব, আর যখন আপনি সফলকাম হইবেন, আর অন্য লোক হুকুমতের (রাজত্ব বা নেতৃত্বের) আস্বাদ গ্রহণ করিবে; যান, আপনার নিকট আমার কোনও প্রয়োজন নাই।

সুয়েদ-বিন্-সামতের কথা।

নবুয়তের একাদশ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। সুয়েদ-বিন্-সামত নামক মদীনার আওস্ বংশীয় একজন লোক মক্কায় আগমন করিলেন। স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ব্যক্তি "কায়েল" উপাধিধারী ছিল। ঘটনা বশতঃ মক্কায় আসিয়া হজরতের (ছালঃ) সাক্ষাৎ লাভ করিল। হজরত তাঁহাকে ইস্‌লামে দাওত দিলেন—অর্থাৎ তাহাকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সে বলিল, সম্ভবতঃ আপনার নিকট যাহা আছে, আমার নিকটও তাহাই আছে। হজরত (ছালঃ) বলিলেন, তোমার নিকট কি আছে, আমাকে শুনাও। সে বলিল, লোকমানের হেকমৎ। হজরত (ছালঃ) বলিলেন, তুমি পড়, আমি শুনি। সুয়েদ কয়েকটী কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইল; হজরত (ছালঃ) বলিলেন, এগুলি বেশ ভাল কথা। কিন্তু আমার নিকট কোরআন মজীদ আছে, যাহা ইহা অপেক্ষাও উত্তম, বহুগুণ সম্পন্ন এবং হেদায়েতে নূর (সদুপদেশের জ্যোতিঃ)। অতঃপর হজরত (ছালঃ) কোরআন মজীদ খানিক পড়িয়া

তাঁহাকে শুনাইলেন। সুয়েদ কোরআন মজীদ শুনিয়া স্বীকার করিল, হাঁ, বাস্তবিক ইহা অমূল্য উপদেশ ও নূর (স্বর্গীয় জ্যোতিঃ)। কোনও কোনও রওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, সুয়েদ তখন তখনই মোসলমান হইয়াছিলেন; কেহ কেহ বলেন, না সে তখন মোসলমান হয় নাই; কিন্তু হজরতের বিরুদ্ধাচরণ একেবারেই করিয়া ছিল না। মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর আওস ও খয্‌রজ জাতিদ্বয়ের মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সে নিহত হয়।

আয়াস্‌-বিন্‌-মায়ায্‌ (রাজিঃ)।

এই সময়েই আনস্‌-বিন্‌-রাফের, স্বীয় সম্প্রদায়—বনি আব্‌দ্‌-আশ্‌হলের কতিপয় লোককে সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে মক্কায় এই উদ্দেশ্যে আগমন করিল যে, মক্কার কোরেশদের সঙ্গে, খয্‌রজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সন্ধি স্থাপন করে। আর কোরেশদিগকে সন্ধি-সূত্রে আপনাদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে সন্ধি-বন্ধনে বন্দীভূত করিয়া লয়। এই 'ওফদ' (ডেলিগেট্‌ বা প্রতিনিধি) আগমনের সংবাদ শুনিয়া হজরত সর্ব্বাগ্রে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গমনের পূর্ব্বে তাহারা কোরেশ ছরদার-দিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে, ও আপনাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতে অবসর বা সুযোগ লাভ করিয়াছিল না। হজরত (ছালঃ) তাহাদের নিকট পঁহুছিয়াই তাহাদিগকে বলিলেন, আমার নিকট এমন জিনিষ আছে, যাহাতে তোমাদের মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। যদি তোমরা চাও, তবে তোমাদের নিকট উহা পেশ (উপস্থিত) করিতে পারি। তাহারা বলিল, বেশ কথা, আপনি তাহা পেশ করুন। হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি মনুষ্যদিগের হেদাএত ও সৎপথ প্রদর্শন জন্য রছুল (নবী বা ভবিষ্যদ্বক্তা) হইয়াছি।

শের্কে (অংশিবাদিতা) হইতে বারণ করি, আর কেবলমাত্র খোদা তা-লার উপাসনা করিতেই আদেশ প্রদান করিয়া থাকি। আমার প্রতি খোদা-তায়ালা কেতাব 'নাযেল' (অবতীর্ণ) করিয়াছেন। তৎপর তিনি ইস্লামের অস্থল (বিস্তৃত ব্যাখ্যা) বর্ণনা করিলেন এবং কোরআন মজীদের কতিপয় আয়েত পড়িয়া শুনাইলেন। মদীনার উক্ত দূত সম্প্রদায়ের মধ্যে আনস-বিন্-রাফেয়-এর সঙ্গে আয়াস-বিন্-মায়ায্ নামক এক যুবক ছিল। আয়াস হজরত রেছালত মাবের (সালঃ) পবিত্রবাণী ও কোরআন পাকের আয়েত শুনিয়া উল্লাস ভরে বলিয়া উঠিল যে, "হে আমার কওম (জাতি বা সম্প্রদায়), তোমরা যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মদীনা হইতে মক্কায় আসিয়াছ, নিশ্চয় এই জিনিষ উহা হইতে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট" দূতদলের নেতা আনস্-বিন্-রাফেয় আয়াস্-কে ধমক দিয়া বলিল, আমরা ঐ কাজের জন্য আসি নাই। আয়াস চুপ হইয়া রহিল; আর হজরত (ছালঃ) সেখান হইতে নীরবে চলিয়া আসিলেন। ফল এই হইল, উপরোক্ত ওফদ (ডেপুটেশন বা দূত সম্প্রদায়) বিফল মনোরথ হইয়া মক্কা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কোরেশদিগের সঙ্গে তাহাদের কোনও প্রকার সন্ধি-বন্ধন হইল না। মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কয়েক দিন পরে হজরত আয়াস-বিন্-মায়ায় প্রাণত্যাগ করিলেন; আর মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি ইস্লাম গ্রহণ পূর্ব্বক ঈমান আনিয়াছিলেন।

যমাদ আয্দি (রাজিঃ)।

যমাদ আয্দি আরবের বিখ্যাত তন্ত্রমন্ত্র বিশারদ এবং এমনের অধিবাসী ছিল। সে একবার মক্কায় আসিল; মক্কায় আসিয়া কোরেশ-দিগের বাচনিক শুনিতে পাইল, (হজরত) মোহাম্মদের (সালঃ) উপর

জেনের আছর আছে। সে বলিল, আমি মন্ত্র পড়িয়া এখনই তাঁহার চিকিৎসা করিব, এবং সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবে। এই বলিয়া সে হজরতের (ছালঃ) হুজুরে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে বলিল, আমি তোমাকে আমার মন্ত্র শুনাইতেছি; হজরত (ছালঃ) বলিলেন, প্রথমে আমার নিকট কিছু শুনিয়া লও, পরে তোমার মন্ত্র শুনাইবে। তদনুসারে তিনি স্বীয় খোদ্‌বার প্রারম্ভিক বাক্য এইরূপে আরম্ভ করিলেন:—"আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে নাহমদহু ও নাস্তাইনহু মাই ইহ্‌দি আল্লাহ ফালা মোদেল্লাহু ওমান ইয়ারিদেল্লাহু ফালাহু হাদিয়ালাহু ও আশ হা দোআন লায়েলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহদাহু লা-শরিকালাহু ও অশেহাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদাহু ও রাছুলাহু।" হজরত এই পরিমাণ বাক্য মাত্র বলিয়া ছিলেন, যমাদ অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল, এই বাক্য আপনি দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করুন। তদনুসারে যমাদ পুনঃ পুনঃ এই বাক্য হজরত (ছালঃ) দ্বারা পড়াইয়া শুনিলেন। তৎপর কহিল, আমি বহুতর মন্ত্রবিদ, যাদুকর, ও কবি দেখিয়াছি, এবং উহাদের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ সদুপদেশ পূর্ণ, উন্নত ভাব বিশিষ্ট সুমধুর বাক্য কখনও শ্রবণ করি নাই। তৎপরে হজরত (সালঃ)-কে বলিলেন, আপনার পবিত্র হস্ত বাড়াইয়া দিন, আমি মোসলমান হইতেছি। আমি ইস্‌লামের জন্য বায়েত করিতেছি। অবশেষে যমাদ্ (রাজিঃ) হজরতের (ছালঃ) পবিত্র হস্তে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

তফিল-বিন্-ওমরু দওসী (রাজিঃ)।

আরবে এমন প্রদশে "দওস্" নামক এক সম্প্রদায় বাস করিত। ঐ সম্প্রদায়ের ছরদার (দলপতি বা নেতা) তফিল-বিন্ ওমরু এমন

প্রদেশের একজন প্রধান রইস্ (অভিজাত) বলিয়া গণ্য হইতেন। তাফিল (রাজিঃ) বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ত ছিলেনই, তদ্ব্যতীত একজন বিখ্যাত শায়ের (কবি) বলিয়াও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই বৎসর—অর্থাৎ নবুয়তের একাদশ সালে ঘটনা বশতঃ তিনি মক্কায় আগমন করেন। তফিল-বিন্ ওমরুর (রাজিঃ) আগমন সংবাদ শুনিয়া কোরেশ দলপতিগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য মক্কা নগরের বাহিরে উপস্থিত হইল; এবং অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে শহরে লইয়া আসিল। কোরেশদিগের মনে এই আশঙ্কা হইল যে, তফিল (রাজিঃ)-এর সঙ্গে না হজরতের (ছালঃ) সাক্ষাৎ হইয়া যায়, আর তফিল (রাজিঃ) তাঁহার যাদুমন্ত্রে বশীভূত হইয়া পড়েন। তদনুসারে তফিল (রাজিঃ) নগরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহারা বলিল যে, আজকাল আমাদের এই মক্কা শহরে এমন একজন যাদুকর (ঐন্দ্রজালিক) আবির্ভূত হইয়াছে যে, ঐ লোকটী সমগ্র শহরে একটা 'ফেৎনা' (বিপ্লব) উপস্থিত করিয়াছে। তাঁহার কার্য্য-কলাপে পিতা পুত্র হইতে, পুত্র পিতা হইতে, ভ্রাতা ভ্রাতা হইতে, স্ত্রী স্বামী হইতে, স্বামী স্ত্রী হইতে 'জুদা' (স্বতন্ত্র) হইয়া পড়িয়াছে। আপনি আমাদের সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত অতিথি, সুতরাং আপনি সতর্ক থাকিবেন। সেই যাদুকরের—(হজরত মোহাম্মদের) (ছালঃ) মুখ-নিঃসৃত কোনও কথাই শুনিবেন না। কোরেশগণের পুনঃ পুনঃ ভীতি-প্রদর্শন ও নিষেধ করার ফল এই হইল যে, তফিল স্বীয় কর্ণদ্বয়ে তুলা গুঁজিয়া দিলেন; উদ্দেশ্য এই যে, এমন না হয়, (হজরত) মোহাম্মদের (ছালঃ) কথা আমার কাণে প্রবেশ করে।

একদিন অতি প্রত্যূষে তফিল (রাজিঃ) কাণে খুব শক্ত করিয়া তুলা গুঁজিয়া পবিত্র কাবা মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) নমাজ পড়িতে ছিলেন। নমাজ পড়িবার প্রণালী

যাহা তফিলের (রাজিঃ) দৃষ্টি-গোচর হইল, তাহা তাঁহার চক্ষে বড় ভাল লাগিল। তিনি তাঁহার নিকটে চলিয়া গেলেন। খুব নিকটবর্ত্তী হইলে কোরআন পাকের পবিত্র ও সুমধুর আওয়াজ তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। এক্ষণে তাঁহার মনে এই খেয়াল হইল যে, আমিও একজন বুদ্ধিমান্ লোক এবং কবি ; যদি এই ব্যক্তির কথা ভাল হয়, তবে তাহা মানিয়া লইব। যদি মন্দ হয়, তবে উহা গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিব। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া উভয় কর্ণ হইতে তুলাগুলি খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। হজরত রছুল করিম (ছালঃ) যখন নমাজ শেষ করিয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন, তখন তফিল (রাজিঃ) ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন ; এবং হজরত (ছালঃ) কে বলিতে লাগিলেন, আপনি আমাকে আপনার বাণী শুনাইবেন ? হজরত (ছালঃ) কোরআন মজীদের কতিপয় আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন ; আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী শুনিয়া তাঁহার মন এমন দ্রবীভূত হইল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ কলেমা পড়িয়া মোসলমান হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হজরত (ছালঃ)-কে বলিলেন, আপনি দোওয়া করুন যে, আল্লাহ্ তা-লা আমার দ্বারা আমার কবিলা (গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়)-কে ইস্‌লামে দীক্ষিত করিবার 'তওফিক' (শক্তি বা ক্ষমতা) প্রদান করেন। হজরত (ছালঃ) ও আল্লাহ তা-লার মহাদরবারে দোওয়া করিলেন, পরবর্ত্তী ঘটনা দ্বারা জানা যায় যে, খোদা তা-লা তাঁহার দোওয়া তখনই কবুল (মঞ্জুর, গ্রহণ) করিয়াছিলেন। তফিল (রাজিঃ) মক্কা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া 'তব্‌লীগ' (প্রচার অর্থাৎ ইস্‌লাম ধর্ম্ম-প্রচার) আরম্ভ করিলেন। হজরত তফিল (রাজিঃ) মক্কা হইতে যাত্রা ও হজরত (ছালঃ) হইতে বিদায় গ্রহণ কালে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, মক্কার কোরেশগণ আপনার প্রতি বড়ই অত্যাচার করিতেছে, আপনি এখান হইতে হেজরত 'ফরমাইয়া' আমার

দেশে চলুন। প্রত্যুত্তরে হজরত (ছালঃ) বলিলেন, খোদা তা-লা আমাকে যখন হেজরত করিতে আদেশ দিবেন, আমি তখনই হেজরত করিব; আর যেখানে যাইবার জন্য আদেশ করিবেন, হেজরত করিয়া তথায় গমন করিব। আমি এ যাবৎ হেজরতের জন্য আদিষ্ট হই নাই।

আবুযর গফ্ফারি (রাজিঃ)।

হজরত আবুযর গফ্ফারি (রাজিঃ) বনি-গফ্ফার সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। মদীনা শরীফের সান্নিধ্যে তাঁহার বাসস্থান ছিল। মদীনায় হজরতের (ছালঃ) প্রাদুর্ভূর্ত হইবার সংবাদ সুয়েদ-বিন্-ছামত ও আয়ায্ বিন্-মায়ায্ দ্বারা ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে পঁহুছিয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গেই এই সংবাদ হজরত আবুযর গফ্ফারির (রাজিঃ) কর্ণগোচর হইল। শ্রবণমাত্রেই তিনি এই সংবাদের সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য স্বীয় ভ্রাতা উনিস্কে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। এই উনিস একজন কবি ছিলেন। উনিস মক্কায় উপস্থিত হইয়া হজরত রছুল মক্বুলের (ছালঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আর মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হজরত আবুযর (রাজিঃ)-কে এইরূপ বলিলেম যে, আমি (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ)-কে এমন একব্যক্তি পাইলাম, যিনি সর্ব্ববিধ সৎকার্য্য করিতে উপদেশ দান করেন, এবং অসৎ কাজ করিতে নিষেধ করিয়া-থাকেন। হজরতআবুযর (রাজিঃ) এই বাক্যে তেমন প্রবোধ পাইলেন না, এবং শান্তিলাভও করিতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি স্বয়ং মদীনা হইতে পদব্রজে মক্কায় পঁহুছিলেন। পঁহুছিয়াই হজরতের (ছালঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ঙ্গে সসঙ্গেই কাবা-গৃহে উপস্থিত হইলেন; সেখানে তখন কাফের কোরেশদিগের এক প্রকাণ্ড দল ছিল, তিনি 'বোলন্দ-আওয়াজে' (উচ্চৈঃস্বরে) কলমাঃ

তওহিদ পড়িলেন; এবং কোরআন শরীফের যে আয়াত মুখস্থ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িতে লাগিলেন। কোরেশগণ বলিতে লাগিল, এই বেদীন (ধর্ম্মদ্রোহী)-কে প্রহার কর। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দুর্দ্দান্ত কোরেশ তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল; প্রহার করিতে করিতে তাঁহাকে 'বেহোশ' (অচৈতন্য) করিয়া ফেলিল। তাঁহাকে বধ করিবার জন্যই তাহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, ইতিমধ্যে আব্বাস্-বিন্-আবদুল—যিনি এখন পর্য্যন্ত ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন না, সেখানে উপস্থিত হইলেন; তিনি হজরত আবুযর্ গফফারি (রাজিঃ)-কে প্রহার করিতে দেখিয়া কোরেশদিগকে বলিলেন, তোমরা এ কি করিতেছ? এ ব্যক্তি গফ্‌ফার কবিলার (সম্প্রদায়ের) লোক মোত্তালেব—যাহাদের দেশে তোমরা বাণিজ্যার্থে গমন পূর্ব্বক খেজুর ক্রয় করিয়া লইয়া আইস। এই কথা শুনিয়া প্রহারকারী দুর্বৃত্ত লোকেরা নিরস্ত হইল। আবুযর (রাজিঃ) চৈতন্য লাভ পূর্ব্বক কাবাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং হজরতের (ছালঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া সকল ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। পরদিন আবার কাবাগৃহে গমন করিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত রূপে ইস্‌লাম সম্বন্ধে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কোরেশ কাফেরগণ পুনরায় তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। শেষ ব্যাপার এই যে, তিনি মক্কায় ইস্‌লাম সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়া স্বীয় বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

মদীনার ছয়টী পবিত্র আত্মা।

নবুয়তের ১১শ সনের শেষ মাস ছিল। মদীনাস্থ আওস্ ও খয্‌রজ জাতির প্রসিদ্ধ যুদ্ধ—যাহার সাজ-সজ্জা সংগ্রহ ও সাহায্য লাভার্থ বনু আব্‌দ্ আলা শহল মক্কায় আসিয়াছিল—এই যুদ্ধ "বো-আছ" নামে বিখ্যাত।

এই যুদ্ধে আওস্ ও খয্‌রজ দলের বড় বড় ছরদার (দলপতি) নিহত হইয়াছিল। অবশেষে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইল। খানাহ্ কাবার হজ্জব্রত সম্পাদনার্থ আরব দেশের বিভিন্ন প্রদেশ ও জনপদ হইতে হজ্জ-যাত্রীদিগের কাফেলা সকল মক্কায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। হজরত (ছালঃ) বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত যাত্রীদিগের শিবির সমূহে গমন পূর্ব্বক ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। আবুজহল ও আবুলহব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত; উদ্দেশ্য, ভিন্নদেশ হইতে আগত যাত্রীদিগের নিকট হজরত (ছালঃ) প্রচার করিতে গেলে, তাহাতে বাধা দিবে। হজরত (ছালঃ) উহাদের প্রতিবন্ধকতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গোপনে শহর হইতে বাহির হইয়া ২।৩ মাইল দূরে চলিয়া যাইতেন; এবং যেখানে যেখানে যাত্রীদিগের শিবির (তাম্বু) সকল পড়িয়াছিল, সেখানে সেখানে গিয়া যাত্রীদিগের নিকট বসিতেন; এবং 'বোতপরস্তির' (প্রতিমা পূজার) অনিষ্টকারিতা ও 'তওহিদের' (একত্ববাদিতার বা আল্লাহ্‌র উপাসনার) সত্যতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে ওয়াজ (বক্তৃতা) করিতেন। একদা মক্কা হইতে কয়েক মাইল দূরে রাত্রিকালে " য়কবা " নামক স্থানে তিনি কয়েক ব্যক্তির পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিবার আওয়ায্ (শব্দ) শুনিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট পঁহুছিয়া দেখিতে পাইলেন, উঁহারা ৬ জন লোক। তিনি তাঁহাদের নিকট গিয়া বসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাঁহারা যিস্‌রব্ (মদীনা) হইতে হজ্জ্ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা খয্‌রজ সম্প্রদায়ের লোক। তচ্ছ্রবণে তিনি তাঁহাদের নিকট ইস্‌লামের তব্‌লীগ্ (প্রচার) করিতে লাগিলেন; এবং কোরআন মজীদের কতিপয় আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন। উহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপরেই তাঁহারা বিনা বাক্যব্যয়ে ঈমান আনিলেন। যিসরব (যিয়েথে ব

বা মদীনা) নগরের অধিবাসিগণ ছুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল; তন্মধ্যে একদল য়িহুদী ও দ্বিতীয় দল পৌত্তলিক। পৌত্তলিকদিগের মধ্যে আওস্‌ও খয্‌রজ নামক ছুইটী পরাক্রান্ত জাতি ছিল। ইহারা য়িহুদীদিগের নিকট সর্ব্বদা শুনিয়া আসিতেছিল যে, তাহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ তওরাতে এক আজিমশ্বান (মহাশক্তিশালী ও বিখ্যাত) নবী শীঘ্রই আবির্ভূত হইবার ভবিষ্যাণী আছে। তিনি সকলের উপর গালেব হইয়া (প্রভাব বিস্তার করিয়া) থাকিবেন। এই কথাগুলি পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল, এজন্ম হজরতের (ছালঃ) বাক্য এবং তাঁহার পবিত্র মুখ-নিঃসৃত কোরআন আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহার প্রতি সহজেই বিশ্বাস স্থাপন করিলেন, এবং তাঁহার নিকট পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই ছয় জন পবিত্র-আত্মা-বিশিষ্ট লোকের নাম এই:—(১) আবু এমামাঃ আস্‌য়দ-বিন্ যরারহ:—ইনি বন্থ-নজ্জার বংশীয় ছিলেন এবং হজরতের (ছালঃ) আত্মীয় ও হইতেন। ইনিই সর্ব্বাগ্রে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। (২) অওফ্‌-বিন্‌-হারেস্; (৩) রাফেয়-বিন্‌-মালেক; (৪) কত্‌বা বিন্‌-আমের; (৫) জাবের বিন্‌-আবদুল্লা; (৬) ওক্‌বা-বিন্‌-আমের-বিন্‌-নাবী। হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) এই পবিত্রাত্মা পুরুষদিগের মধ্যে রাফেয়-বিন্‌-মালেক (রাজিঃ)-কে, এ পর্য্যন্ত কোরআন শরীফের যে পরিমাণ নাযেল (অবতীর্ণ) হইয়াছিল, তাহার এক লিখিত পাণ্ডুলিপি প্রদান করিলেন। এই ক্ষুদ্র দলটী পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; আর হজরতের (ছালঃ) নিকট প্রতিশ্রুতি দান করিয়া গেলেন যে, আমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া 'তব্‌লীগ্‌' (ইস্‌লাম-প্রচার) আরম্ভ করিব। তদনুসারে তাঁহারা স্বদেশে যাইয়া স্ব-গোত্রের (গোষ্ঠীর) মধ্যে প্রচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই

মদীনার প্রত্যেক গলি-কুচায় ইস্‌লামের চর্চ্চা ও আলোচনা হইতে লাগিল।

য়কৃবায়্য়েত্ বাঃ আওলা।

(যকৃবার প্রথম দীক্ষা)

নবুয়তের একাদশ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছিল ; দ্বাদশ নববী ও হজরত (ছালঃ) ঐরূপে দুঃখে-কষ্টে ও কোরেশদিগের প্রদত্ত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অতিবাহিত করিলেন। কোরেশদিগের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে হজরত রেসালত মাবের (ছালঃ) এই পূর্ণ (দ্বাদশতম) বৎসরটী আশা ও নৈরাশ্যের অবস্থায় : অতিবাহিত হইল। কারণ, পূর্ব্বোক্ত ছয়জন মদীনাবাসী নব-দীক্ষিত মোসলমানের বিশেষ খেয়াল ছিল—তাঁহারা 'তব্‌লীগ ইস্‌লাম' (ইস্‌লাম প্রচার) সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে। সে বিষয়ের কোনও সংবাদ না পাইয়া তিনি উদ্বিগ্ন ও চিন্তাযুক্ত ছিলেন। মদীনায় ইস্‌লাম-প্রচারের কি ফল হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্ম তাঁহার উৎকণ্ঠা বড় বাড়িয়া গিয়াছিল। দ্বাদশ নববী সালের শেষ মাস—জেলহজ্জ মাস আসিল ; তিনি মিনার নিকটস্থ পূর্ব্বোক্ত " য়কৃবা " নামক স্থানে প্রত্যহ যাইয়া যিস্‌রবের (মদীনার) কাফেলার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ; হঠাৎ একদিন তিনি সেই কাফেলা দেখিতে পাইলেন। যাঁহারা গত বৎসর পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, দেখিলেন, তাঁহারা সকলেই আসিয়াছেন। তাঁহারা ও হজরত (ছালঃ)-কে দেখিতে পাইয়া বড়ই ভক্তি এবং আগ্রহের সঙ্গে তাঁহাকে 'সালাম' করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে গলায় গলায় মিলিলেন। এবার তাঁহারা ১২ জন লোক ছিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন পূর্ব্ব বৎসরের দীক্ষিত মোসলমান, এবং কয়েকজন নূতন দীক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁহারা আওস্ ও খয্ রজ উভয় সম্প্রদায়ের লোক। এই ১২ জনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে। (১) আবু এমামাঃ; (২) অওফ্-বিন্-হারেছ-বিন্-রফায়্যা; (৩) রাফেয়-বিন্-মালেক-বিন্ আল য়েজলান; (৪) ফতাবাঃ-বিন্-আমের-বিন্-হাদিয়াঃ; (৫) ওকবা বিন্-আমের; এই পাঁচজন পূর্ব্ব বৎসর ইস্লামের শীতল আশ্রয়চ্ছায়ায় আগমন করিয়াছিলেন; অবশিষ্ট নবাগত ৭ জনের নাম-এই :—(১) মায়ায্-বিন্-হারেস্ (অওফ্-বিন্-হারেছের ভ্রাতা); (২) যকওয়ান-বিন্-আবদ কয়েস-বিন্-খালেদ; (৩) খালেদ বিন্-মখলদ-বিন্-আমের-বিন্-যরিক্; (৪) এবাদাঃ-বিন্-ছামত্-বিন্-কয়েস্ (ইনি বনু ইবিব সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন); (৫) আব্বাছ বিন্-এবাদাঃ-বিন্-ফদলাঃ। উপরোক্ত ১০জন খয্ রজ বংশীয় লোক ছিলেন (৬) আবু আল হাছলিম-বিন্-আতিহীন (ইনি বনু আবদ আলা সহল সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন); (৭) যোএম-বিন্-সায়েদাঃ (শেষোক্ত দুইজন আওস্ বংশীয় লোক ছিলেন)। এই বারজন বোজর্গ হজরত রেজালত মাব (ছালঃ) এর হস্তে বয়্য়েত হইলেন। এই বয়্য়েত "বায়্য়েতে য়কবাঃ আওলা" নামে প্রসিদ্ধ। বায়্য়েত য়কবাঃ আওলে, পূর্ব্বতন ছয় জন মদীনা বাসীর ইস্লাম গ্রহণের 'নতিজা' (ফল) স্বরূপ ছিল। এই নব দীক্ষিত মোসলমান-গণ হজরত (ছালঃ)-এর হুজুর হইতে বিদায় কালীন প্রার্থনা জানাইলেন যে, আমাদের সঙ্গে একজন কারী অর্থাৎ 'মবল্লগ্' (কোরআন-শিক্ষা-দাতা) প্রেরণের অনুমতি হউক। তদনুসারে হজরত (ছালঃ) মছয়ব-বিন্-য়মীর (রাজিঃ)-কে তাঁহাদের সঙ্গে মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন। মছয়ব-বিন্-য়মীর (রাজিঃ) মদীনায় পঁহুছিয়া আসয়দ-বিন্-যরাহ-রাজি আল্লাহ্ আনহুর গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আর ঐ গৃহই ইস্লাম প্রচারের

আশ্রমে পরিণত করিয়া, পবিত্র ইস্লামের তব্লীগ্ (প্রচার) আরম্ভ করিলেন। মকবাঃ আওলায় হজরত (ছালঃ) পূর্ব্বোক্ত ছয়জনের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, (১) আমরা একমাত্র আল্লাহ তা-লার এবাদত (উপাসনা) করিব, কাহাকে তাঁহার শরীক (অংশী) করিব না। (২) আমরা চুরি ও যেনাকারীর (ব্যাভিচারের) নিকটেও যাইব না; (৩) আপনাদের কন্যাদিগকে হত্যা করিব না; (৪) কাহারও প্রতি মিথ্যা-'তহমত' (দুর্ণাম) লাগাইব না; (৫) 'চোগলখুরি' (কোট্‌নামী) করিব না; (৬) প্রত্যেক ভাল (সৎ) কার্য্যে নবীর (রছুল অর্থাৎ প্রেরিত মহাপুরুষের) বশ্যতা (অধীনতা) স্বীকার করিব।

ময়ছব-বিন্-য়মীরের মদীনায় সাফল্য লাভ।

ময়ছব-বিন্-য়মীর মদীনায় পঁহুছিয়া নিতান্ত চেষ্টা, উদ্যোগ, পরিশ্রম ও যোগ্যতা সহকারে তব্লীগ্ ইস্লামের (ইস্লাম-প্রচারের) কার্য্য আরম্ভ করিলেন। খোদা তা-লার ফজল ও করমে মদীনার অধিবাসীদিগের মধ্যে ইস্লামের প্রভাব খুব বিস্তৃত হইল। দেখিতে দেখিতে দলে দলে লোক ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। মদীনার আওস্ নামক জাতি ও উহার শাখার মধ্যে বনু আবদ আলা শহলও বনু-জফর গোষ্ঠী খুব বিখ্যাত ও শক্তিশালী ছিল। ছায়াদ-বিন্-ময়ায, কবিলা (সম্প্রদায়) আবদ আলা শহলের ছরদার এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান ছরদার বা নেতা ছিলেন। আসিদ-বিন্-হছির বনু জফর শাখার ছরদার ছিল। উহার পিতা লবাব যুদ্ধে সমগ্র জাতির পক্ষে প্রধান সেনাপতি থাকিয়া ঐ যুদ্ধেই নিহত হয়। তাহার মৃত্যুতে আওস জাতি সায়াদ-বিন্-মায়ায্‌কে আপনাদের ছরদার (দলপতি) নির্ব্বাচন করে। ফলতঃ ছায়াদ

ও আসিদ এই দুই ব্যক্তি সমগ্র জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী ও শ্রেষ্ঠতম ছরদার বলিয়া পরিগণিত হইত। আসদ-বিন্-যররাহ (রাজিঃ)—যাঁহার গৃহে মছয়ব বিন্ যমীর (রাজিঃ) অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি ছায়াদ বিন্-মায়াজের খালা যাদ (খোলাতো) অর্থাৎ মাস্তুতো ভাই ছিলেন। একদিন মছয়ব-বিন্-যমীর (রাজিঃ) ও ছায়াদ-বিন্-যররাহ বনি আব্দ আলা শহল মহাল্লার (পল্লীর) মরক নামক কূপের পার্শ্বে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন! মছয়ব-বিন মীরের ঐ মহাল্লায় আইসা এবং তৎকর্ত্তৃক তব্লীগে ইস্লাম ছায়াদ বিন্-মায়াজের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য ছিল। ছায়াদ, য়ীসদ বিন্-হসিরকে ডাকিয়া বলিল, আছয়দ-আমার খালাযাদ ভাই বলিয়া চক্ষু-লজ্জা করি; তুমি যাও এবং কঠোরতার সহিত বলিয়া দাও যে, আমার মহাল্লায় তাহারা যেন কখনও না আইসে। ইহারা আমাদের লোকদিগকে বিগ্ড়াইতে এবং বেদ্বীন (ধর্ম্মভ্রষ্ট) করিবার জন্য আসিয়া থাকে। তদনুসারে ওসয়ীদ তরবারি হস্তে লইয়া চলিল, এবং আছয়াদ ও মছয়বের (রাজিঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কটু-কাটব্য বলিতে লাগিল। আর নিতান্ত কঠোরতার সহিত তাঁহাদিগকে ভীতি-প্রদর্শন করিল। মছয়ব বিন্-য়মীর (রাজিঃ) নিতান্ত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও নম্রতার সঙ্গে তাহাকে বলিলেন, যদি আপনি এখানে ক্ষণকালের জন্য বসিয়া যান, এবং আমার দুটি কথা শুনেন, তাহাতে আপনার কোনও ক্ষতি হইবে না। তৎপর আপনার যাহা ইচ্ছা সেইরূপ আদেশ প্রচার করিবেন। ওসয়ীদ "বহুত আচ্ছা" বলিয়া সেই স্থলে উপবেশন করিলেন। মছয়ব (রাজিঃ) ইস্লামের 'হকিকৎ' (বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য) বর্ণনা করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে কোরআন মজীদের কতিপয় আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন। য়সিদ চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। যখন মছয়বের (রাজিঃ) বক্তব্য

শেষ হইল, তখনই ওসয়ীদ বলিলেন, আমি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি। স্থূলকথা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইল। ওসয়ীদ বলিলেন, আমাদের আরও এক ব্যক্তি আছেন, তিনি যদি মোসলমান হন, তবে আপনাদের শত্রুতাচরণ করিবার লোক কেহই থাকিবে না। আমি এখনই যাইয়া তাঁহাকে আপনাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেছি। তদনুসারে ওসয়ীদ (রাজিঃ) তথা হইতে উঠিয়া সায়াদ-বিন্-মায়াজের নিকট গমন করিলেন। সায়াদ প্রথম হইতে ওসয়ীদের (রাজিঃ) জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, ওসয়ীদ আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বল, তুমি উহাদিগকে কি বলিয়া আসিলে ? ওসয়ীদ (রাজিঃ) বলিলেন, তাঁহারা বলিয়াছেন, তোমার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবেন না। কিন্তু সেখানে আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছে। বনু হারেসের কতিপয় নব্য যুবক সেখানে আসিয়াছিল ; তাহারা আসয়দ-বিন্-যরারাঃ কে হত্যা করিতে চাহিতেছিল। এ কথা শুনিবামাত্র সায়াদ-বিন্ মায়ায্ দণ্ডায়মান হইল, এবং তরবার উন্মুক্ত করিয়া অনতি-বিলম্বে তথায় পঁহুছিল ; সেখানে গিয়া দেখিতে পাইল, আসয়দ ও মছয়ব (রাজিঃ) নিশ্চিন্তে বসিয়া আছেন। ইহা দেখিয়া সায়াদের সন্দেহ হইল, সে মনে করিল, ওসয়ীদ (রাজিঃ) আমাকে ধোকা দিয়া এখানে পাঠাইয়াছে যে, আমি ও উহাদের কথা শুনি। এই খেয়াল মনে উপস্থিত হইতেই আসয়দ (রাজিঃ)-কে বলিল, কেবলমাত্র রেশতা দারীর (আত্মীয়তার) খেয়াল রহিয়াছে, নতুবা তোমার কি সাধ্য ছিল যে, আমার মহাল্লায় (পাড়ায়) আসিয়া লোকদিগকে ভড়্কাইতে। মস্য়ব (রাজিঃ) তাহাকে বলিলেন, আপনি বসুন, আমি কিছু 'আরজ' (নিবেদন) করিতেছি, যদি আমার কথা ভাল হয়,—গ্রহণ যোগ্য মনে করেন, গ্রহণ করিবেন ; নচেৎ রদ্দ্ করিয়া দিবেন। সায়াদ স্বীয় তরবারি খানি পার্শ্বে রাখিয়া

তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া গেলেন। মসয়ব (রাজিঃ) ওসরীদ (রাজিঃ)-কে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, সায়াদকেও ঐ সকল কথা বলিলেন। সায়াদও ঐ কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মোসলমান হইলেন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বজাতীয় লোকদিগকে আহ্বান করিলেন; তাহারা সমবেত হইলে, সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে কি মনে কর? সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, আপনি আমাদের ছরদার (নেতা বা দলপতি); আর আপনার রায় (মত) সর্ব্বদাই গ্রহণযোগ্য বলিয়া আমরা সম্মানের সহিত গ্রহণ করি। সায়াদ (রাজিঃ) বলিলেন, যে পর্য্যন্ত তোমরা মোসলমান না হও, আমার সঙ্গে তোমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই কথা শুনিয়াই সমুদয় বনু আব্দ আলা শহল মোসলমান হইলেন। এই প্রকারে মদীনার অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যেও ধীরে ধীরে ইস্লাম সম্প্রসারিত হইতে লাগিল। ইহা নবুয়তের ১৩শ বৎসর ছিল। এদিকে মছয়ব বিন্-রমীর (রাজিঃ)-এর সাফল্যের উপর সাফল্য লাভ হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে মক্কার কাফের কোরেশগণ মোসলমানগণের উপর এমন ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল যে, তাঁহাদের সেখানে তিষ্ঠান দায় হইয়া পড়িল। নবুয়তের ১৩শ সালের যেল হজ্জ মাস আসিলে মছয়ব-বিন্-য়মির (রাজিঃ) ৭২ জন পুরুষ ও ২ জন স্ত্রী-লোকের এক মোসলমান কাফেলা লইয়া মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মদীনার মোসলমানগণ ঐ কাফেলা এজন্য ও পাঠাইয়া ছিলেন যে, হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ)-এর যেয়ারত করিয়া কৃতার্থ হন; আর মদীনাবাসীদিগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মদীনায় তশরিফ্ আনিবার জন্য তাঁহার খেদমতে দরখাস্ত পেশ করা হয়।

য়কৃবার দ্বিতীয় বায়য়েত।

মদীনা হইতে মোসলমানদিগের যে কাফেলা আসিতেছে; হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ) পূর্ব্বেই তাহার সংবাদ পাইয়াছিলেন; রাত্রিকালে হজরত (সালঃ) গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। হজরত (সালঃ) এর পিতৃব্য হজরত আব্বাস্ এখন পর্য্যন্ত ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন না। কিন্তু হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি বিশেষে সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। কোরেশ-দিগের সাধারণ বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার সময় ও তিনি গোপন ভাবে তাঁহার সঙ্গে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে ক্রটী করিতেন না; হজরত (ছালঃ) এ বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। ঘটনা বশতঃ পথিমধ্যে হজরত আব্বাস এর সঙ্গে হজরত (ছালঃ)-এর সাক্ষাৎ হইল। হজরত তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন; এবং স্বীয় সঙ্কল্প তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে উভয়ে রাত্রির অন্ধকারে ওয়াদি য়কৃবায় গিয়া পঁহুছিলেন। সেখানে মদীনা হইতে আগত মোমেন মোসলমানগণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখানে একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মদীনা হইতে কেবলমাত্র মোসলমানগণই হজ্জ্ করিতে আসিয়া-ছিলেন না, প্রাচীন প্রথানুসারে বহুসংখ্যক 'মোশরেক' (অংশিবাদী) ও হজ্জ্ করিতে আসিয়াছিল। তাহারা মক্কা শহরের বাহিরে এক স্থানে ডেরা-ডাণ্ডা ফেলিয়াছিল; কিন্তু মোসলমানদিগের জন্য অন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল য়কবাঃ নামক ক্ষুদ্র ঘাটী বা উপত্যকায় তাঁহাদের (মদীনাস্থ মোসলমানদিগের) সঙ্গে হজরত (সালঃ) এর দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। এজন্য মদীনার মোসলমান এবং অ-মোসলমান যেহারা এস্লামকে পছন্দ করিত, এবং এই ধর্ম্মের সঙ্গে সহানুভুতি সম্পন্ন ছিল, তাঁহারা এই ঘাটিতে আসিয়া

হজরত (ছালঃ)-এর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অবশিষ্ট মদীনার মোশরেক (অংশিবাদী)-গণ রকবার এই দেখা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও সংবাদই অবগত ছিল না। উহারা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কেয়ামগাহ (তাম্বু বা শিবির) সমূহে গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল। হজরত (ছালঃ) রকবায় পঁহুছিয়া অপেক্ষাকারী মোসলমানদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। হজরত (সালঃ), হেজরত (দেশত্যাগ) করিয়া মদীনায় যাইতে স্বীকৃত, একথা জানিতে পারিয়া মহাত্মা আব্বাস্ বিন্-আরদুল-মোত্তালেব একটী সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় বক্তৃতা প্রদান করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"হে মদীনাবাসিগণ! (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) স্বকীয় 'খান্দান' (বংশীয় বা গোষ্ঠীয় লোকদিগের)-এর মধ্যে আছেন। ইহার 'খান্দান' ইহার 'হেফাজৎ' (তত্ত্বাবধান) করিয়া আসিতেছেন। তোমরা ইহাকে তোমাদের শহরে লইয়া যাইতে চাও; এ অবস্থায় স্মরণ রাখ যে, ইহাকে তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে হেফাজৎ (রক্ষণাবেক্ষণ) করিতে হইবে। ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যদি তোমরা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও শোণিতপাতের জন্য প্রস্তুত থাক, ভাল কথা; নচেৎ (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) কে লইয়া যাইবার নামও লইও না।"

তচ্ছ্রবণে বরাঃ বিন্-মছরুর (রাজিঃ) বলিলেন, আব্বাছ! আমরা তোমার বক্তব্য শুনিলাম। এক্ষণে আমরা হজরত রসূলের (ছালঃ) বক্তব্যও কিছু শুনিতে চাই। তদনুসারে হজরত বক্তৃতা করিলেন, এবং কোরআনের কতিপয় আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁহার বক্তৃতায় আল্লাহ্‌র 'হক্' এবং মনুষ্যের 'হক্' সম্বন্ধে বর্ণনা ছিল। হজরত উক্ত 'জিম্মাদারীর' (দায়িত্বের) কথা উল্লেখ করিলেন। তিনি মদীনায় গেলে মদীনাবাসীদিগের পক্ষে দাবী অবশ্য কর্ত্তব্য ও পালনীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। বরা-বিন্-মছরুর (রাজিঃ) হজরতের বক্তব্য শুনিয়া বলিলেন,

আমরা প্রস্তাবিত বিষয়গুলি পালনে প্রস্তুত আছি। আবুল হাশিম-বিন্-তিহান-(রাজিঃ) বলিলেন, হজরত! আপনি এই প্রতিশ্রুতি দান করুন যে, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কখনও চলিয়া আসিবেন না। প্রত্যুত্তরে হজরত (ছালঃ) বলিলেন, না, আমি আর এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। আমার জীবন এবং মরণ তোমাদেরই সঙ্গে হইবে। আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহা (রাজিঃ) বলিয়া উঠিলেন, হে রসুলুল্লা! (ছাঃ) ইহার বিনিময়ে আমরা কি পাইব? উত্তরে তিনি বলিলেন, জন্নত (বেহেশ্ত অর্থাৎ স্বর্গ) এবং আল্লাহ্ তা-লার 'রেজামন্দি' (রাজি থাকা বা সমষ্টি-লাভ)। ইহা শুনিয়া আব্দুল্লা (রাজিঃ) বলিলেন, বাস্, 'সওদা' (ক্রয় বিক্রয় কার্য্য) হইয়া গিয়াছে। অতঃপর না আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন, না আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিব। ইহার পর সকলে হজরতের (ছালঃ) হস্তে বায়্য়েত করিলেন। এই বায়্য়েতে বরাঃ-বিন্-মায়রুর (রাজিঃ) সর্ব্বাপেক্ষা আগ্রহ সম্পন্ন ছিলেন এই বায়্য়েতের নাম "বায়্য়েত-রকবা ছানিয়া" (রকবার দ্বিতীয় বায়্য়েত বা প্রভুত্ব স্বীকার) বলিয়া প্রসিদ্ধ। যখন বায়্য়েত কার্য্য সম্পন্ন হইল, তখন বরারাঃ (রাজিঃ) সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা একথা জ্ঞাত হও যে, এই 'কওল-করারের' (প্রস্তাব করা ও উহা গ্রহণের) উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখীন হইতে (প্রয়োজন মতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে) প্রস্তুত। তখন সকলে একবাক্য হইয়া বলিলেন, হাঁ, আমরা বেশ জানি যে, আমাদিগকে সমগ্র দুনিয়ার 'মোকাবেলা' (সম্মুখীন) হইতে হইবে। অতঃপর হজরত (ছালঃ) উপস্থিত লোকদিগের মধ্য হইতে ১২ জনকে নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন। আর তাঁহাদিগকে 'তব্লীগে এস্লাম' (এস্লাম প্রচার) সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি প্রদান পূর্ব্বক নিজের পক্ষ হইতে 'নকীব' (ছরদার বা নেতা

কিংবা প্রতিনিধি) নির্ব্বাচিত করিলেন। ইস্‌লামের তব্‌লীগ (ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করা) ইহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। এই দ্বাদশ জন লোক অর্থাৎ ইস্‌লাম-প্রচারকের নাম নিম্নে লিখিত হইল। (১) সায়াদ-বিন্‌-যরারাহ্‌ (রাজিঃ) ; (২) ওসয়ীদ-বিন্‌- হুছির, (৩) আবু-আল্‌ হাশিম-বিন্‌-আল্‌-তিহান্‌ (রাজিঃ) ; (৪) বরাঃ-বিন্‌-মায়রুর (রাজিঃ) ; (৫) আবদুল্লা-বিন্‌-রওয়াহা (রাজিঃ) ; (৬) এয়বাদাঃ বিন্‌-ছামত (রাজিঃ) ; (৭) ছায়াদ-বিন্‌-আল্‌-রবীয় (রাজিঃ) (৮) ছায়াদ-বিন্‌-এবাদাঃ (রাজিঃ) ; (৯) রাফেয়-বিন্‌-মালেক (রাজিঃ) ; (১০) আবদুল্লা-বিন্‌-ওমরু (রাজিঃ) ; (১১) সায়াদ-বিন্‌-হুছিমা (রাজিঃ) ; (১২) মন্‌যর-বিন্‌-ওমরু (রাজিঃ)।

এই ১২ জন নকীবের মধ্যে ৯ জন খয্‌রজ বংশীয় ও ৩ জন আওস্‌ বংশীয় ছিলেন। এই ১২ জন লোকের দিকে 'মখাতের' (লক্ষ্য করিয়া) হইয়া হজরত (ছালঃ) ফর্‌মাইলেন যে, যেরূপ হজরত ঈষা আলায়হেস সালামের ১২জন হাওয়ারি (বিশিষ্ট শিষ্য) ধর্ম্ম-প্রচার সম্বন্ধে 'জিম্মাদার' ছিলেন ; সেইরূপ আমি তোমাদিগকে তোমার কওমের (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর) ধর্ম্ম-শিক্ষাদান সম্বন্ধে জিম্মাদার নিযুক্ত করিলাম। পক্ষান্তরে আমিও তোমাদের জেম্মাদার। কথিত আছে, যখন য়কৃবার ঘাটিতে এই বায়্‌য়েত (দীক্ষা কার্য্য ও প্রতিনিধি নিয়োগ) হইতেছিল, ঐ সময় পাহাড়ের শীর্ষদেশ হইতে এক শয়তান (পাপ পুরুষ) চীৎকার করিয়া মক্কার কাফেরদিগকে বলিয়া উঠিল, দেখ, (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) ও তাহার জমায়াত (দলভুক্ত লোকেরা) তোমাদের বিরুদ্ধে পরামর্শ করিতেছে। হজরত (ছালঃ) স্বয়ং, কিংবা অন্যান্য মুমেনগণ এ সম্বন্ধে কোনও মনোযোগই প্রদান করেন নাই ; যখন সমুদয় সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইয়া গেল, তখন তিনি মদীনা যাইবার তারিখ, আল্লাহ্‌ আদেশের প্রতি নির্ভর করিলেন।

ইহার পরে এক এক জন ও দুই দুই জন করিয়া লোক সেই ঘাটি হইতে বাহির হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। উদ্দেশ্য, এই 'জল্‌ছার' (সভার) সংবাদ কেহ জানিতে না পারে। হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ) ও হজরত আব্বাস উভয়ে যকবার গোপনীয় সভা হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র কোরেশগণ উক্ত গুপ্ত জলসার বিষয় জানিতে পারিল। উহারা তৎক্ষণাৎ মদীনাবাসিগণের অবস্থান-স্থানে (নগর বহির্ভাগস্থ খিমা বা শিবিরে) গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা মদীনাবাসীদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রিকালে তোমাদের নিকট (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) আসিয়াছিল? মদীনাবাসীদিগের মধ্যে যাহারা অ-মোসলমান অর্থাৎ 'বোত্‌পরস্ত' (পৌত্তলিক) ছিল, তাহারা রাত্রির সেই গোপনীয় জল্‌সারী-বিষয় অবগত ছিল না; উহাদের মধ্যে আবদুল্লা-বিন্‌-আবি-বিন্‌-সলুল ও ছিল—যে ব্যক্তি উত্তরকালে মোনাফিক (কপট) দলের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিয়া, হজরত (ছালঃ) এর সঙ্গে আজীবন শত্রুতাচরণ করিয়াছিল। সে বলিল, না, না, ইহা কিরূপে সম্ভবপর যে, মদীনাবাসিগণ কোনও গুরুতর কার্য্য এখানে সম্পন্ন করিবে—আর তাহা আমরা জানিতে পারিব না? তাহার এই বাক্যে কোরেশদিগের সন্দেহ দূর হইল, তাহারা সেখান হইতে প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গেই মদীনা-বাসিগণ কুচ্‌ (যাত্রা) করিবার আয়োজন করিতে লাগিল, এবং কিছুকাল পরেই তাহারা স্বদেশ যাত্রা করিল। কোরেশগণ মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় বিশ্বস্ত-সূত্রে সেই রাত্রির গুপ্ত জলসার বিষয় জানিতে পারিল; এবং তাহারা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পুনরায় মদীনাস্থ কাফেলার অবস্থান-স্থানে পঁহুছিল। কিন্তু তখন কাফেলা (যাত্রিদল) রওয়ানা হইয়া চলিয়া গিয়াছিল; কেবলমাত্র ছায়াদ-বিন্‌-এবাদাঃ (রাজিঃ) ও মন্‌যর-বিন্‌-ওমরু (রাজিঃ) কোনও কারণে কাফেলা হইতে পেছনে

পড়িয়া গিয়াছিলেন। মনয়্যর (রাজিঃ) ত কোরেশদিগকে দেখিয়াই সরিয়া পড়িয়াছিলেন ; তিনি কোরেশদিগের হস্তে ধরা পড়িলেন না ; কিন্তু সায়াদ-বিন্-এবাদাঃ (রাজিঃ) উহাদিগের হস্তে 'গেরেফ্‌তার' (ধৃত) হইলেন। দুর্দ্দান্ত কোরেশগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে মক্কায় লইয়া আসিল। ছায়াদ-বিন্-এবাদার (রাজিঃ) বর্ণনা এইরূপ :— যখন কোরেশগণ আমাকে মক্কায় আনিয়া 'যদ ও কোব' (মার-পিট— প্রহার) করিতেছিল, তখন আমি দেখিতে পাইলাম, একজন শ্বেত ও লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট 'খুব ছুরত' (সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট) ব্যক্তি আমার দিকে আগমন করিতেছে। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, যদি ঐ 'কওমের' (কোরেশদিগের) কোনও ব্যক্তি দ্বারা আমার উপকারের আশা করা যাইতে পারে, তবে তাহা এই ব্যক্তিই হইবে। কিন্তু ঐ লোক যখন আমার নিকট আসিল, তখন সে খুব জোরে আমার মুখে একটী চড় মারিল। তখন আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল: যে, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কোনই লোক নাই, যাহার নিকট 'মরুওত' (চক্ষু-লজ্জা) ও 'রেয়ায়েতের' (ক্ষমা-প্রদর্শনের) আশা করা যাইতে পারে। এই সময় আর এক ব্যক্তি সেখানে আগমন করিল ; সেই ব্যক্তি আমাকে বলিল, কোরেশদিগের মধ্যে কি কোনও ব্যক্তির সহিত তোমার জানা-শুনা ও পরিচয় নাই ? আমি বলিলাম যে, যবির-বিন্-মতয়ম ও হারেছ-বিন্-ওম্মিয়া—আব্‌দে মনাফের এই পৌত্রদ্বয়ের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় আছে। সেই ব্যক্তি বলিল, তবে কেন তুমি তাহাদের নাম লইয়া চীৎকার করিতেছ না ? আমাকে এই 'তদ্‌বির' (উপায়) বলিয়া দিয়া সে উহাদের দুইজনের নিকট চলিয়া গেল ; এবং তাহাদিগকে বলিল যে মদীনাবাসী খয্‌রজ বংশীয় একজন লোককে কোরেশগণ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে, আর সে তোমাদের নাম লইয়া দোহাই দিতেছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল,

ঐ ব্যক্তির নাম কি ? ঐ ব্যক্তি বলিল, তাহার নাম ছায়াদ- বিন্-এবাদাঃ (রাজিঃ)। তাহারা বলিল, হাঁ, ঐ ব্যক্তির আমাদের উপর 'এহ্সান' (প্রত্যুপকারের দাবী) আছে। আমরা 'তেজারত'.(বাণিজ্য) করিবার জন্য তাঁহার গৃহে গমন করিয়া থাকি; আর তাঁহারই তত্বাবধানে সেখানে অবস্থান করি। যাহা হউক, তাহারা উভয়ে সেখানে আসিয়া আমাকে ছাড়াইয়া লইল। আমি মুক্তি পাইয়াই মদীনা (ইস্রব) অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেলাম।

এস্থলে একথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বায়্য়েত ছানিয়া অর্থাৎ দ্বিতীয় বায়্য়েতের বহুপূর্ব্বে, হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) কে, আল্লাহ্ তা-লা হইতে ইহা জানান হইয়াছিল যে, তোমাকে 'হেজরত' (দেশত্যাগ) করিতে হইবে। আবার একবার স্বপ্নেও হেজরত করিবার স্থান পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল; তিনি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, উহা খর্জ্জুরের বাগানপূর্ণ অতি সুন্দর ভূখণ্ড; অর্থাৎ সেখানে অসংখ্য খর্জ্জুর বৃক্ষ বিরাজ করিতেছে। এই স্বপ্ন দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, তাঁহাকে "এমামা" প্রদেশের দিকে হেজরত করিতে হইবে। কারণ এমামা প্রদেশে ও বহু খেজুরের বাগান আছে; এবং তথায় প্রচুর পরিমাণে খর্জ্জুর জন্মিয়া থাকে। এক্ষণে উপস্থিত ঘটনা পরম্পরায় তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে 'ইস্রবে' (মদীনায়) হেজরত করিতে হইবে।

মদীনায় হেজরত করিবার সাধারণ আদেশ।

মক্কার দ্বিতীয় বায়্য়েতের পর কোরেশদিগের ভীষণ অত্যাচারে মোসলমানদিগের পক্ষে মক্কায় বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সেই

অত্যাচারের পরিমাণ অনুভব করিবার পক্ষে নিম্ন-লিখিত কয়টী ঘটনার বর্ণনাই যথেষ্ট। হজরত (ছালঃ) কোরেশদিগের অত্যাচার সীমা অতিক্রম করিয়াছে দেখিয়া, সমুদয় মোসলমানকে (যাঁহারা সেই সময় মক্কায় অবস্থিতি করিতেছিলেন) আদেশ করিলেন যে, কোরেশদিগের ভীষণ অত্যাচার হইতে জীবন রক্ষার্থ তোমরা মক্কা হইতে হেজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া যাও। উৎপীড়িত ও বিপন্ন মোসলমানগণ এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে স্ব স্ব ঘর দ্বার খালি করিয়া, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মদীনাভিমুখে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। কোরেশগণ যখন দেখিল, ইহারা এখান হইতে বসবাস পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, অতঃপর মদীনায় যাইয়া নিরুদ্বেগে শান্তির সহিত বাস করিবে, তখন ইহাও তাহাদের পক্ষে অসহ্য হইল। তাহারা হেজরতকারীদিগকে পথিমধ্যে বাধা দিতে লাগিল। হজরত ওম্মে ছালমাঃ (রাঃ—আঃ) বলিয়াছেন, আমার স্বামী আবু সালমা (রাজিঃ) হেজরত করিবার সঙ্কল্প করিলেন ; তিনি গৃহত্যাগ করিবার 'এরাদায়' (ইচ্ছায়) আমাকে উষ্ট্রোপরি আরোহণ করাইলেন ; আমার ক্রোড়ে আমার দুগ্ধ-পোষ্য শিশু ছালমাঃ ছিল। যখন আমরা মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইলাম, তখন আমার কবীলার (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর) লোকেরা আমার স্বামীকে ঘিরিয়া (বেষ্টন করিয়া) লইল। তাহারা বলিতে লাগিল, তুমি চলিয়া যাইতে পার, কিন্তু আমাদের বংশের এই মেয়েকে (আমাকে) কিছুতেই যাইতে দিব না। এই সময় আমার স্বামীর গোষ্ঠীর লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, তুমি যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার ; কিন্তু আমাদের বংশধর এই ছেলেটীকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। তাহাদের (কোরেশদিগের) যেই কথা সেই কাজ। তদনুসারে বনু আব্দ্-আলা সদ আমার পুত্রটীকে কাড়িয়া লইয়া গেল ; আর বনি-মগিরাঃ (আমার কবীলার অর্থাৎ গোষ্ঠীর

লোকেরা) আমাকে (ওম্মে ছালমাঃ [রাজিঃ—আঃ]-কে) লইয়া চলিয়া গেল। নিরুপায় হইয়া আবু সালমাঃ (রাজিঃ) পত্নী ও পুত্রকে ছাড়িয়া একাকীই মদীনা চলিয়া গেলেন। হজরত আবু ছালমাঃ (রাজিঃ) স্ত্রী ও পুত্র ছাড়িয়া একাকীই হেজরতের ছওয়াব (পুণ্য) লাভ করিলেন। হজরত সহির রুমী (রাজিঃ) যখন মক্কা হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন মক্কাবাসিগণ তাঁহার সমস্ত 'মাল-আসবার' (সামগ্রী-সম্ভার—জিনিষ পত্র) কাড়িয়া লইল। সহস্র সহস্র টাকার সামগ্রী-সম্ভার কাড়িয়া লইয়া, কপর্দ্দকহীন অবস্থায় তাঁহাকে মদীনায় যাইতে বাধ্য করিল। হেশাম-বিন্-আছ (রাজিঃ) হেজরতের সঙ্কল্প করিলেন। মোশ্‌রেকিন (মক্কার অংশিবাদী অর্থাৎ পৌত্তলিকগণ) এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ধৃত করিল; এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিল; আর সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার শারীরিক যন্ত্রণা দিতে লাগিল। হজরত আয়াস (রাজিঃ) হেজরত করিয়া মদীনায় গিয়া পঁহুছিয়াছিলেন। সেখানে এই সকল মক্কাবাসী-মোসলমান, মদীনাবাসী সহৃদয় মোসলমানদিগের 'মেহমান' (অতিথি) রূপে বাস করিতে লাগিলেন। হজরত আয়াস (রাজিঃ) যখন মদীনায় পঁহুছিলেন, আবুজহল-তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাকে ধোকা দিয়া (শান্তির আশ্বাস দিয়া) মক্কায় লইয়া আসিল; কিন্তু তাঁহাকে মক্কায় আনিয়া বন্দী করিয়া রাখিল। স্থুল কথা এই যে, ঈদৃশ কঠোর বাধা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়াও একজন দুইজন করিয়া মোসলমানগণ জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদীনায় উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা এইরূপে হেজরত করিলেন, মোট মোসলমান সংখ্যার অনুপাতে তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। মক্কা হইতে আগত এই 'মেহমান' (অতিথি)-দিগের নাম " মহাজেরিন ", এবং মদীনাবাসী অর্থাৎ নবাগত অতিথিদিগের আশ্রয়-দাতা 'মেয্‌বান' (অতিথি সৎকার

কারী)-দিগের নাম " আন্ছার" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। আয়েন্দাঃ (ভবিষ্যতে) এই দুই সম্প্রদায়কে এই দুই পবিত্র নামেই অভিহিত করা যাইবে। এক্ষণে ১৪ নববী অর্থাৎ হজরতের (ছালঃ) পয়গম্বরী লাভের ১৪শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। মোসলমানদিগের মধ্যে মক্কায় এই সময় হজরত রেছালতমাব (ছালঃ), হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত আলী (ক-ওঃ) এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিলেন। অবশিষ্ট প্রায় সমুদয় মোসলমানই হেজরত করিয়া মদীনা নগরে গিয়া পঁহুছিয়াছিলেন। কতিপয় দুর্ব্বল, গমনাক্ষম, নিরুপায় ব্যক্তি—যাঁহারা হেজরত করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাঁহারাই মাত্র রহিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা খুব অল্পই ছিল। মক্কার যে সকল গৃহে মোসলমানগণ বাস করিতেন, সেই সকল গৃহ তখন জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছিল। হজরত (ছালঃ) স্বয়ং এযাবৎ হেজরতের (জন্মভূমি ত্যাগের) 'এরাদা' (সঙ্কল্প) করিয়াছিলেন না। কারণ তিনি খোদা তা-লার ওহি অর্থাৎ আদেশ প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছিলেন। হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) তাঁহার 'রফিক-সফর' (প্রবাস-সঙ্গী) হইবেন বলিয়া তাঁহাকে এযাবৎ হেজরত করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন না। হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু ও তাঁহার আদেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

দারন্নদওয়ায় কোরেশদিগের সভা এবং পরস্পর পরামর্শ।

কোরেশগণ দেখিতে পাইল যে, মোসলমানগণ এক এক করিয়া মক্কা হইতে চলিয়া গেলেন, আর মদীনার মোসলমানগণ একত্রিত হইয়া, এই নবাগত মোসলমানদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন;

সংখ্যাধিক্য বশতঃ তাঁহাদের মূল ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতেছে ; এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের শক্তি সঞ্চার এবং তাঁহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে নিজেদের বিপন্ন হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। এক্ষণে তাহাদের (কোরেশদিগের) মনে বাস্তবিকই আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। কোরেশগণের মনে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার খেয়াল হইল। তাহারা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল যে, মোসলমানদিগের মদীনায় গমন এবং সেখানে তাঁহাদের সংখ্যার প্রাচুর্য্য, ও ভিত্তি মূল দৃঢ়তর হওয়া, কোরেশদিগের অবনতি এবং দুর্গতির কারণ হইতেছে। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আমাদের সম্মান, অস্তিত্ব ও আত্ম-রক্ষা ইহার উপর নির্ভর করে যে, মোসলমানদিগের নেতার অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলা চাই। এ সময় মক্কা হইতে হজরতের (ছালঃ) শিষ্যমণ্ডলী সকলেই চলিয়া গিয়াছিলেন, কেবল তিনি একাই অবশিষ্ট ছিলেন ; আর ছিলেন হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ)* ও হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু। সুতরাং এই সময় হজরতের বিনাশ সাধন খুবই সহজ ব্যাপার। তাঁহার বিনাশ সাধন না করিলে এই বিষতরু ক্রমেই বদ্ধ-মূল হইয়া ও শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া আমাদিগের মহা সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। সুতরাং এই নূতন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতার বিনাশ সাধনে বিলম্ব করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। কারণ (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) যদি মক্কা হইতে অক্ষত শরীরে মদীনায় চলিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে এই নূতন ধর্ম্মের গতিরোধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। এই খেয়াল ও এই চিন্তা কোরেশদিগের সকল লোকের মধ্যেই বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহারা মৌখিক ও একথা প্রকাশ করিত ; এবং সকলেই এতৎ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য সাধনে 'দেমাগ' (মস্তিষ্ক) চালনা করিত। এমন কি, মক্কার-কোরেশদিগের এই "খুনী খেয়ালাত' (শোণিতপাতের চিন্তা) সকল দলের লোকের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অবশেষে সফর মাসের

শেষভাগে, নবুয়তের চতুর্দ্দশ সালে, বনু হাশেম ব্যতীত মক্কার কোরেশদিগের বড় বড় ছরদার (নেতা)-গণ "দারন্নদওয়া" নামক স্থানে এই বিষয়ের কর্ত্তব্য অবধারণ জন্য সমবেত হইল। এই সভায় সমবেত ছরদারদিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তির নাম এই :—আবুজহল-বিন্-হেশাম (বনু মখ্‌যুম সম্প্রদায়), বইয়াহ্ ও মলবাহ্ (হেজাজের পুত্রদ্বয়—বনু-সহম), ওম্মিয়া-বিন্-খলফ্ (বনু জোমহ্ সম্প্রদায়), আবুল-বখ্‌তরি-বিন্-হেশাম, যমর-বিন্-আস্‌দ, হকীম-বিন্-হযাম (বনু আল-আসদ সম্প্রদায়), নযর-বিন্-হারেছ (বনু আবদুল দার-সম্প্রদায়), নকিবাহ্ সরীছাহ্ (রবিয়ার পুত্র); আবু স্থফিয়ান-বিন্-হরব (বনু ওম্মিয়া সম্প্রদায়), তয়মা-বিন্-আদি, জরিব-বিন্-মতয়ম, হারেছ বিন্-আমের (বনু নওফল সম্প্রদায়)। এই সকল উল্লেখযোগ্য নেতৃ-মণ্ডলী ব্যতীত আরও বহু সংখ্যক ছরদার (নেতা) এই সভায় যোগদান করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত নজদের অধিবাসী একজন বিচক্ষণ, বহুদর্শী বৃদ্ধ-শয়তান ও এই সভায় যোগ দিয়াছিল ; এমন কি, উল্লিখিত নজদী বৃদ্ধ শেখ এই সভার সভাপতি পদে-অভিষিক্ত হইয়াছিল। এ বিষয়ে ত সকলেই একমতাবলম্বী ছিল যে, হজরতের (ছালঃ) বিদ্যমানতা, তাঁহার জীবিত থাকা, ভবিষ্যতে সর্ব্ব বিপদের মূলীভূত কারণ। এক্ষণে বিচার-বিতর্কের বিষয় এই ছিল যে, তাঁহার (হজরতের) সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায়। একজন বলিল, (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) কে ধরিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ কর ; এবং একটী কুঠরীতে (কামরা বা প্রকোষ্ঠে) বন্ধ করিয়া রাখ—যাহাতে সে শারীরিক ক্লেশে, অনাহারে ও পিপাসার্ত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। সেই বৃদ্ধ খান্নাছ নজদী-শেখ বলিল, এই মত সমীচীন নহে। কারণ উহার আত্মীয়গণ ও ভক্ত অনুগামিবৃন্দ এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া লইবার জন্য বিশেষভাবে প্রয়াস পাইবে ; এবং তদ্দ্বারা 'ফাছাদ' (ঝগড়া বা বিবাদ)

আরও বাড়িয়া যাইবে। আর একজন এই বলিয়া মত প্রকাশ করিল যে (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ)-কে মক্কা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দাও; আর কখনও তাহাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিও না। নজদী বৃদ্ধ শেখ এ প্রস্তাব ও পছন্দ করিল না। এইরূপে এই সভায় অনেকেই স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধ শয়তান প্রত্যেকের অভিমতই অগ্রাহ্য করিল। সে সকলের মতেরই এক একটা খুঁৎ বা দোষ প্রদর্শন করিয়া তাহা বাতিল করিয়া দিল। অবশেষে মক্কার 'জালেম'-চূড়ামণি আবুজহল স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিল; সে বলিল, আমার মত এই যে, প্রত্যেক কবীলা (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী) হইতে এক একজন 'শমশের যন্' (তরবারি পরিচালনে সুদক্ষ) পুরুষ নির্ব্বাচন করা হউক, এই সকল-অস্ত্রধারী লোক একত্রিত হইয়া (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ)-কে একই সময় চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক আক্রমণ করিবে; এবং তাহার হত্যা সাধন করিবে। এইরূপ ভাবে তাহাকে হত্যা করিলে উহা সর্ব্বতোভাবে ফলপ্রদ হইবে। (হজরত) মোহাম্মদের (ছালঃ) শোণিত সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে 'তক্‌ছিম' (বণ্টন) হইয়া যাইবে। বনু হাশেম সমগ্র কবীলার (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর) সঙ্গে 'মোকাবেলা' (বল পরীক্ষা) করিতে সক্ষম নহে, সুতরাং তাহার 'কাছাছের' (হত্যার বদলে হত্যা) পরিবর্ত্তে 'দিয়েত' (হত্যার পরিবর্ত্তে কিছু অর্থ) গ্রহণ করিতে তাহারা বাধ্য হইবে; সেই অর্থ সকলে মিলিয়া অতি সহজেই দিতে পারা যাইবে। আবুজহলের এই অভিমত নজদী শেখের খুবই পছন্দ হইল। তদনন্তর সভার সভ্যমণ্ডলী একমতাবলম্বী হইয়া এই প্রস্তাবের সমর্থন ও অনুমোদন করিল। এদিকে দারন্নদওয়ায় এই পরামর্শ স্থির হইতেছিল, ওদিকে আঁ হজরত ছাল্লাল্লাহু আলায়হে আছাল্লাম-কে খোদা তা-লা অহির দ্বারা 'কোফ্‌ফার'দিগের সমস্ত যুক্তি

পরামর্শের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রতি হেজরতের আদেশও 'নাযেল':(অবতীর্ণ) হইল।

খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক হজরত (ছালঃ) এর প্রতি হেজরতের আদেশ।

আঁ হজরত সাল্লাল্লাহ আলায় হে অ-সাল্লাম-কে আল্লাহ্ জল্লশানহু হেজরতের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। যে দিন ওহিযোগে তিনি এই আদেশ প্রাপ্ত হইলেন; সেই দিনই ঠিক দুই প্রহরের সময়—যখন নগরের অধিবাসিগণ ভীষণ আতপতাপে সন্তাপিত এবং অগ্নিবৎ উত্তপ্ত "লু" হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য গৃহাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; ভীষণ নিদাঘ কালীন প্রচণ্ড রৌদ্রে মানুষের গায় ফোস্কা পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল; রাস্তা ও গলি পথ সমূহ লোক চলাচল শূন্য ছিল; সেই সুযোগে হজরত রেছালতমাব (ছালঃ), হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বি-প্রহরের যে ভীষণ গরমে মানুষ ঘরের বাহির হয় না, পশুপক্ষীও চলাচল করে না, সেইরূপ সময়ে হজরতের (ছালঃ) গৃহ পরিত্যাগ করিয়া হজরত সিদ্দিক আকবরের (রাজিঃ) গৃহে উপস্থিত হওয়া এক 'খেলাফ্ মা-মুল' (সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত) ব্যাপার ছিল। হজরত (ছালঃ)-কে দেখিতে পাইয়াই হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ)-এর মনে এই ধারণা উপস্থিত হইল যে, অবশ্য হেজরতের আদেশ 'নাযেল'। (অবতীর্ণ) হইয়া থাকিবে। হজরত (ছালঃ) প্রথমেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঘরে ত কোনও অন্য লোক নাই? যখন জানিতে পারিলেন যে, ঘরে বাহিরের কোনও লোক নাই,—হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) ও তাঁহার দুই কন্যা হজরত

আস্‌মাঃ (রাঃ—আঃ) ও হজরত আয়েসা সিদ্দিক (রাঃ—আঃ)মাত্র গৃহে আছেন, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমার প্রতি ইস্রব (মদীনা) নগরে হেজরত করিবার আদেশ নাযেল হইয়াছে। তচ্ছ্‌বণে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুরের 'রফিক-সফর' (প্রবাস-সঙ্গী বা প্রবাস-বন্ধু) কে হইবে ? হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, তুমিই আমার 'রফিক-সফর' হইবে। এই সুসংবাদ শ্রবণে পরম ভক্ত হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ; তাঁহার নয়ন প্রান্তে আনন্দাশ্রু দেখা দিল ; তিনি বলিলেন, ইয়া রছুলোল্লাহ্‌ (ছালঃ) ! আমি প্রথম হইতেই দুইটী হৃষ্ট-পুষ্টা বলিষ্ঠা উষ্ট্রী ক্রয় করিয়া, তাহাদিগকে আহার প্রদানে 'মোটা তাযা' করিয়া রাখিয়াছি। উহার মধ্যে একটী আপনাকে নজর স্বরূপ দিতেছি। হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি ঐ উষ্ট্রীটী মূল্য দিয়া গ্রহণ করিব। তদনুসারে তিনি উহার মূল্য সিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-কে প্রদান করিলেন। তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া ঐ মূল্য গ্রহণ করিতে হইল। ঐ সময় হইতেই হেজরতের তৈয়ারি হইতে লাগিল। হজরত আস্‌মা-বিন্তে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ—আঃ) ছাতুর থলে (বস্তা) ও অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রী যোগাড় করিয়া দিলেন। হজরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ—আঃ) বয়স ঐ সময় খুব কম ছিল ; সুতরাং সফরের ছামান যোগাড় কার্য্যে তাঁহার দ্বারা তেমন কিছু সাহায্য হইল না। এক্ষণে যে রাত্রি সমাগত হইতেছিল, 'মোশ্‌রেক' (অংশিবাদী বা পৌত্তলিক)-দিগের 'এরাদা' (সঙ্কল্প) ছিল, পূর্ব্বদিনের সভার সিদ্ধান্তানুসারে ঐ রাত্রিতেই হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-কে হত্যা করিবে। তদনুসারে সন্ধ্যাকালেই উহারা দলবদ্ধ হইয়া তাহার গৃহ অবরোধ করিল। আর তাহারা এইজন্য অপেক্ষা করিতেছিল যে, তিনি রাত্রিকালে যখন নমাজ পড়িবার জন্য গৃহ হইতে

বাহির হইবেন, তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক হত্যা করিবে। হজরত (ছালঃ) ওহির মর্ম্মানুযায়ী, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে স্বীয় শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাঁহার নিকট লোকদিগের যে সকল টাকা কড়ি ও জিনিষ পত্র 'আমানত' (গচ্ছিত) ছিল, সেই সমস্ত উহার মালেকদিগকে প্রত্যর্পণ করা। হজরত আলী (কঃ-ওঃ)-কে তিনি ইহাও বলিয়া দিলেন যে, গচ্ছিত দ্রব্যাদি উহার মালেকদিগকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তুমিও সুযোগক্রমে অনতিবিলম্বে মদীনায় চলিয়া যাইবে। এই সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাত্রির অন্ধকারে তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি ছুরা ইয়াছিনের প্রারম্ভস্থ আয়াত " ফাহুমল ইয়াব ছেরুন " পর্য্যন্ত পড়িয়া এক মুষ্টি মৃত্তিকায় দম্ করিলেন এবং তাঁহার গৃহ অবরোধকারী কাফেরগণের দিকে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। কোফ্ফার গণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) পূর্ব্বোক্ত উভয় উষ্ট্রীকে আবদুল্লা-বিন্-আরিকতের ' জিম্মা' করিয়া দিয়াছিলেন; এই লোকটী অ-মোসলমান হইলেও বিশ্বস্ত এবং নির্ভর-যোগ্য ছিল। আর মদীনা পর্য্যন্ত পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অপেক্ষাও অতিরিক্ত পারিশ্রমিক তাহাকে দিয়াছিলেন। হজরত (ছালঃ) স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ)-এর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) ও তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। হজরত (ছালঃ) তাঁহার গৃহে পঁহুছিবামাত্র উভয়ে দ্রুতগতি তথা হইতে যাত্রা করিলেন। আর:মক্কা নগরের ৪ মাইল দূরবর্ত্তী ছুর নামক পাহাড়ের এক গহ্বরে উভয়ে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। উত্তরকালে ঐ গহ্বর "গারে ছুর " নামে প্রসিদ্ধি লাভ

করিয়াছে। এদিকে মক্কায় হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সারারাত্রি হজরতের (ছালঃ) বিছানায় শুইয়া রহিলেন। মক্কার কাফেরগণও সমস্ত রজনী হজরতের (ছালঃ) গৃহ অবরোধ করিয়া রহিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে শয্যায় শয়ান দেখিয়া তাহারা মনে করিয়াছিল, হজরত (ছালঃ) ই শয্যায় শুইয়া আছেন। তিনি ঘর হইতে বাহির হইবেন, এই অপেক্ষায় তাহারা সারারাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল। যখন রাত্রি অবসান হইল, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফজরের নমাজ পড়িবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন, এবং ঘর হইতে বাহির হইলেন, তখন গৃহাবরোধকারী কাফেরগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) কোথায়? শেরে খোদা (রাজিঃ) বলিলেন, আমি সে সংবাদ রাখি না; তাঁহার সংবাদ ত তোমাদের জানা থাকা উচিত, কারণ তোমরা সারারাত্রি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত ছিলে; আমি ত সমস্ত রাত্রি শুইয়া কাটাইয়াছি। তখন কাফেরগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে ধৃত করিল, প্রহার করিল, কিয়ংকাল বন্দী অবস্থায় রাখিয়া অবশেষে ছাড়িয়া দিল। অতঃপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সমুদয় আমানতি (গচ্ছিত) অর্থ ও জিনিষ পত্র উহার 'মালেক' (স্বত্বাধিকারী) দিগকে পঁহুছাইয়া দিলেন। এস্থলে একথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কাফেরগণ এক দিকেত তাঁহার প্রাণবধ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল। পক্ষান্তরে 'দেয়ানত' ও 'আমানত' সম্বন্ধে তাঁহার উপর উহাদের এমন বিশ্বাস ও আস্থা ছিল যে, আপনাদের মূল্যবান্ জিনিষ-পত্র, স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট 'আমানত' (গচ্ছিত) রাখিয়া যাইত। হজরত (ছালঃ) মক্কা হইতে 'রোখ্ ছত' (বিদায়) হওয়া কালেও সেই বিশ্বস্ততা এমন দৃঢ়তা সহকারে রক্ষা করিলেন যে, স্বীয় 'চাচ্চাযাদ' ভাই (পিতৃব্য-পুত্র)—যাঁহাকে তিনি অপত্য নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন, তাঁহার বিপদের আশঙ্কা থাকিলেও

কেবলমাত্র গচ্ছিত জিনিষ পত্র ও 'মাল-আস্‌বাব' উহার অধিকারীদিগকে পঁহুছাইবার জন্য নিতান্ত বিপদ-সঙ্কুল অবস্থায় তাঁহাকে স্বীয় গৃহে রাখিয়া মদীনায় যাত্রা করিলেন। যদি তিনি এরূপ ব্যবস্থা না করিতেন, তবে শূন্য গৃহ হইতে চোর-বাটপাড়গণ হয় ত তাহা আত্মসাৎ করিত; যাহাদের জিনিষ-পত্র, মাল-আসবাব জমা ছিল, তাহারা কিছুই পাইত না। শত সহস্র ঘোর-বিপদের মধ্যেও তিনি কর্ত্তব্য পালনে ক্ষণকালের জন্য বিমুখ হন নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।

যাহা হউক, কাফেরগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে ছাড়িয়া দিয়া সোজাসুজি হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) গৃহে গিয়া পঁহুছিল— এবং দ্বারে আওয়ায্‌ দিল। আওয়ায্‌ শুনিয়া হজরত আছমাঃ-বিন্তে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ—আঃ) ঘর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আবুজহল জিজ্ঞাসা করিল, অয়ি মেয়ে! তোমার পিতা কোথায়? বালিকা বলিলেন, আমি তাহা জানিনা। তচ্ছ্রবণে সেই নির্ম্মম পাষণ্ড তাঁহাকে এমন জোরে এক চড় মারিল যে, তাঁহার কাণের বালি (স্বর্ণালঙ্কার বিশেষ) খসিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। ইহার পর কাফেরগণ হজরত (ছালঃ)-কে সমগ্র মক্কা নগরী ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়, জঙ্গল, ময়দান, গিরিগুহা, উপত্যকা প্রভৃতি স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইল; কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইল না। যখন অনুসন্ধান করিয়া নিরাশ হইল, তখন তাহারা ঘোষণা প্রচার করিল যে, যে কোনও ব্যক্তি (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ)-কে জীবিত অবস্থায় কি মৃত অবস্থায় আমাদের নিকট পঁহুছাইয়া দিতে পারিবে, তাহাকে একশতটী উষ্ট্র পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। এই ঘোষণাপত্র শুনিয়া মক্কার বহুসংখ্যক লোক পুরস্কারের আশায় চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ছুর গিরি-গহ্বরে সূর্য্য ও চন্দ্রের একত্র সমাবেশ।

রাত্রির গভীর অন্ধকারে দুই বন্ধু, গারছুর অর্থাৎ ছুর নামক গিরি-গহ্বরের নিকট পঁহুছিলেন। হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-কে বাহিরে রাখিয়া, স্বয়ং সেই অপরিষ্কার ও অন্ধকার গিরি-গহ্বরে প্রবেশ পূর্ব্বক গহ্বরটী যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করিলেন। গহ্বরটীর যেখানে যেখানে 'ছুরাখ' (ছিদ্র) ছিল, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া স্বীয় পরিহিত বস্ত্র ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া তদ্দ্বারা সেই সকল গর্ত্ত বন্ধ করিলেন। এইরূপে সকল গুলি গর্ত্ত বন্ধ করিয়া, হজরত (ছালঃ)-কে গহ্বরের ভিতরে লইয়া গেলেন। এই আফ্‌তাব ও মাহতাব (সূর্য্য ও চন্দ্র) পূর্ণ ৩ দিবস ও ৩ রাত্রি সেই অন্ধকূপ স্বরূপ গহ্বর মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিলেন। কোরেশদিগের বড় বড় ছরদার (নেতা বা লীডার অথবা দলপতি) কেবল পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করিয়াই নিরস্ত ছিল না; তাহারা স্বয়ংও পদচিহ্ন দ্বারা ইহাদের গমন-পথ নির্দ্ধারণ জন্য সুদক্ষ অনুসন্ধানকারী দল লইয়া চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; এবং তাহাদের একদল গারেছুর অর্থাৎ ছুর নামক গিরি-গহ্বরের মুখ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। উহাদের সঙ্গীয় পদ-চিহ্ন দ্বারা অনুসন্ধানকারী লোকেরা (১) বলিল, এই পর্য্যন্তই পদচিহ্ন দৃষ্ট হয়; ইহার পরে আর পদ-চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে না; সুতরাং হয় ত: ইহার নিকটেই কোনও স্থানে তাহারা লুকায়িত আছে, কিংবা আকাশে উড়িয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিল, এই গহ্বরের মধ্যে

---

(১) আরবে—বিশেষতঃ মক্কায় তখন এরূপ একদল লোক ছিল, যাহারা বালির উপর লোকের পদ-চিহ্ন দেখিয়া তাহাদের গতিবিধি নির্দ্ধারণ করিত। মক্কার কাফেরগণ ইহাদেরই একদল লোককে হজরতের

একবার প্রবেশ করিয়া দেখা হউক না কেন ? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, এমন অন্ধকার ও ভয়ঙ্কর গর্ত্তে মানুষ প্রবেশ করিতে পারে না ; আমরা বহুকাল হইতে এই গহ্বরটাকে এই অবস্থায়ই দেখিতেছি। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, দেখ, এই গর্ত্তের মুখে মাকড়সা জাল বুনিয়া রাখিয়াছে ; কোনও লোক ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে এই জাল কদাচ অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিতে পারিত না ; উহা নিশ্চয়ই ছিন্ন হইয়া যাইত। চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, ঐ দেখ, ঐ স্থান হইতে কতিপয় কবুতর (পায়রা) উড়িয়া গেল ; এবং গাওর ভিতরে উহাদের আণ্ডা (ডিম) দৃষ্ট হইতেছে—, যাহার উপর ঐ কবুতর বসিয়াছিল। ইহার পরে সকলেরই ধারণা হইল যে, এই গহ্বরে কোনও মানুষ প্রবেশ করে নাই, সুতরাং উহার ভিতরে আর কেহ প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিল না। এই কোফ্‌ফার দল গহ্বরের এত নিকটে পঁহুছিয়া গিয়াছিল যে, হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) ও হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) তাহাদের পা দেখিতে পাইতেছিলেন ; আর তাহাদের কথাবার্ত্তাও স্পষ্ট উভয়ের কর্ণগোচর হইতেছিল। এরূপ 'খতরনাক ; (আশঙ্কা-প্রদ) অবস্থায় হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ), জনাব হজরত রেসালতমাব (ছালঃ)-কে বলিলেন, হুজুর ! কোফ্‌ফার ত এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছে ; হজরত (সালঃ) ফরমাইলেন, তুমি একটুও ভয় করিও না, আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌ আছেন। তুমি ঐ দুইজনকে কি মনে করিয়াছ ? যাহাদের সঙ্গে তৃতীয় খোদা আছেন (অর্থাৎ আমরা কেবলমাত্র দুইজন নহি, আমাদের সঙ্গে আর একজন আছেন ; তিনি মহাশক্তিশালী আল্লাহ্‌ তা-লা)। কোফ্‌ফারগণ

(ছালঃ) ও হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) পদচিহ্ন ধরিয়া তাঁহাদের খোঁজ লইতে নিযুক্ত করিয়াছিল। তাহাদেরই একদল লোক ছুর গিরি-গহ্বর পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল।

আপনাদের অনুসন্ধান কার্য্য, প্রাণপণ চেষ্টা ও উদ্যোগে বিফল মনোরথ হইয়া গহ্বরের নিকট হইতে চলিয়া গেল। তাহারা ৩ দিন পর্য্যন্ত মক্কা নগরের বিভিন্ন অংশে, পাহাড় ও উপত্যকা সমূহে, পথে, মাঠ-ময়দানে সর্ব্বত্র ইঁহাদের অনুসন্ধান করিয়া নিতান্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া, নিরাশ হৃদয়ে অনুসন্ধান কার্য্যে বিরত হইল। হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) প্রথম হইতেই স্বীয় পুত্র আবদুল্লা (রাজিঃ)-কে এই উপদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন যে, কোফ্‌ফারদিগের সর্ব্বপ্রকার-কর্য্যে-কলাপ, এবং তাহাদের সমস্ত দিনের কার্য্যাবলী রাত্রে যেন গোপনে আসিয়া তাঁহাদিগকে জানায়। এইরূপে স্বীয় ক্রীতদাস আমের-বিন্‌-ফহিরাঃ (রাজিঃ)-কে আদেশ দিয়াছিলেন যে, আমাদের ছাগলের পাল সারাদিন এদিকে ওদিকে চরাইয়া ফিরিবে, এবং রাত্রিকালে উহাদিগকে ছুর গিরি-গহ্বরের নিকটে চরাইতে লইয়া আসিবে; আর স্বীয় কন্যা আস্‌মাঃ (রাঃ—আঃ) এর প্রতি এই ভারার্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন যে, খানা পাকাইয়া রাত্রিকালে অতি সাবধানে "গারছুরে" আমাদের নিকট পঁহুছাইয়া দিবে। এইটি কত বড় কঠিন কাজ ছিল, চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ভয়ঙ্কর শত্রুদলের মধ্য দিয়া ৪ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে একটী বালিকার খাদ্য দ্রব্য পঁহুছান কি সহজ ব্যাপার ছিল? আসিতে যাইতে তাঁহাকে ৮ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইত। তাঁহার সাহস, নির্ভীকতা, ধর্ম্ম-পরায়ণতা, কর্ত্তব্য জ্ঞান, হজরত (ছালঃ) এবং পরম শ্রদ্ধেয় পিতার প্রতি ভক্তি প্রভৃতির বিষয় নিবিষ্ট মনে আলোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বর্ত্তমান মোস্‌লেম মহিলাদিগের পক্ষে ইহাতে শিক্ষনীয় কত বিষয় আছে।

যাহা হউক, হজরত সিদ্দিক আকবরের (রাজিঃ) পুত্র কন্যাদ্বয় প্রত্যহ নিয়মিত রূপে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেন। আর তাঁহার

গোলাম (ক্রীতদাস) আমের বিন্-ফহিরাঃ (রাজিঃ) রাত্রিকালে ছাগী সকল দোহন করিয়া উহার দুগ্ধ লুক্কায়িত গহ্বরবাসীদ্বয়কে পান করাইতেন ; এবং অধিক রাত্রিতে ছাগলের পাল লইয়া মক্কায় প্রবেশ করিতেন। এইরূপে আবদুল্লা (রাজিঃ) ও আস্‌মাঃ (রাঃ—আঃ) এর পদ-চিহ্ন ছাগ পালের গমনাগমনে মুছিয়া যাইত। এরূপ না করিলে কাফেরগণ পদচিহ্ন ধরিয়া লুক্কায়িত হজরত দ্বয়ের সন্ধান পাইতে পারিত। যখন হজরত (ছালঃ) ও হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) জানিতে পারিলেন যে, মক্কাবাসীদিগের 'জেশে-খরুশ' (উৎসাহ-উদ্যম ও উত্তেজনা) ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে; তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার আশায় নিরাশ হইয়াছে, তখন তাঁহাদের পূর্ব্ব নির্দ্দেশিত পথ-প্রদর্শক আবদুল্লা-বিন্-আরিকতের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে; তুমি উষ্ট্রীদ্বয়কে লইয়া ছুর গিরি-গহ্বরের নিকট উপস্থিত হও। এস্থলে আবদুল্লা-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ), আস্‌মাঃ (রাঃ—আঃ) ও আমের বিন্-ফহিরার (রাজিঃ) কার্য্য-কলাপ, পরিশ্রম, চেষ্টা-উদ্যোগের বিষয় উল্লেখ না করিলেও চলে, কারণ তাঁহারা মহামান্য হজরত (ছালঃ), পরম শ্রদ্ধেয় পিতা ও প্রভুর জন্য আপনাদের কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন, কিন্তু আবদুল্লা বিন্-আরিকেত মোসলমানও ছিল না ; বরং সাধারণ নিয়মে সে মোসলমানদিগের শত্রুই ছিল। আর সে নিতান্ত 'আজীর' (শ্রমিক) ছিল। উহার গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত না করা, বিশ্বস্ততা, সহৃদয়তা, পরোপকার-স্পৃহা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় এবং আরবজাতির সাধারণ গুণ বলিতে হইবে। উহাদের মধ্যে শত শত মারাত্মক দোষ থাকিলেও, অনেক গুলি উচ্চ গুণও বিদ্যমান ছিল।

সংবাদ পাইবামাত্র আবদুল্লা-বিন্-আরকেত, হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) এর উষ্ট্রী ২টী এবং নিজের উটটী লইয়া রাত্রিকালে ছুর গিরি-গহ্বরের নিকট উপস্থিত হইল। রবিওল-আউওল মাসের শুক্লপক্ষ

রজনীর এই ঘটনা। হজরত আস্‌মা-বিন্তে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ—আঃ) ও এই সময় প্রবাসীদিগের জন্য ছাতু এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) ও হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) সেই 'যেন্দান' বা অন্ধকূপ রূপী গহ্বর হইতে ৩ দিবা রাত্রির পর বাহির হইলেন। একটী উষ্ট্রীর উপর অাঁ হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ও সাল্লাম আরোহণ করিলেন; এই উষ্ট্রীটার নাম "আল্-কাছওয়া" ছিল। অপর উষ্ট্রীটার পৃষ্ঠে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) ও তাঁহার ক্রীতদাস আমের বিন্-ফহিরাঃ (রাজিঃ) আরোহণ করিলেন। আর তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক আবদুল্লা-বিন্-আরকেত নিজের উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। এই ৪ জন মোছাফের (প্রবাসী) মদীনার সাধারণ রাস্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, উহার এদিক্ ওদিক্ (যে দিক্ দিয়া লোক কিংবা কাফেলা চলাচল করে না) দিয়া চলিতে লাগিলেন; কারণ এখন পর্য্যন্ত কাফেরদিগের অনুসরণও পশ্চাদ্ধাবনের আশঙ্কা ছিল। এই সময়ের একটী ঘটনা বর্ণনা যোগ্য। হজরত আস্‌মা-বিন্তে আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ-আঃ) ঘর হইতে যে ছাতুর ঠিলিয়া (কলসী বা ঘড়া) আনিয়াছিলেন, ভুলক্রমে উহা লট্‌কাইবার তস্‌মা (রজ্জু বা দড়ি) আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন; যখন উহা উষ্ট্রের হাওদার সঙ্গে বান্ধিয়া লট্‌কাইতে চেষ্টা করিলেন, তখন দেখিলেন, রজ্জু নাই। তৎকালে অন্য কোনও দড়ীও সেখানে উপস্থিত ছিল না। হজরত আস্‌মাঃ (রাঃ—আঃ) তৎক্ষণাৎ নিজের 'নোতাকে' (কমরে বান্ধিবার ডুরি বা কমরবন্ধ) অর্দ্ধাংশ নিজের কমরে বান্ধিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ কাটিয়া ছাতুর ঠিলিয়া উষ্ট্রের হাওদায় বান্ধিয়া দিলেন। তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া হজরত রেছালত পানাহ্ (ছালঃ) খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন; এবং তাঁহাকে "যাত্ আল্ নতাক্বিন" বলিয়া সম্বোধন

করিলেন। তদনুসারে উত্তরকালে তিনি ঐ নামেই অভিহিত হইতেন। ইনি সেই হজরত আস্‌মাঃ-বিন্তে হজরত আবুবকর সিদ্দিক, (রাঃ—আঃ) মহাবীর হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) যাহার স্বামী, এবং হজরত আবদুল্লা বিন্‌-যোবায়ের (রাজিঃ) যাঁহার বীরপুত্র ছিলেন; এবং ওম্মিয়া বংশীয় ১ম খলিফা আবদুল মালেকের দুর্দ্ধর্ষ ও নির্দ্দয় সেনাপতি হোজ্জাজ্‌-বিন্‌ ইউসফ্‌ কর্ত্তৃক মক্কা মোয়াজ্জমায় অতি নৃশংস ভাবে শহিদ হন। এক সময় তিনিই মোস্‌লেম-জগতের খলিফা হইবেন বলিয়া সম্ভাবনা হইয়া ছিল। ফলতঃ সে সময় তাঁহার মতন সুযোগ্য ও বীর পুরুষ মোসলমান-দিগের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না।

আরও একটী ঘটনা এই হেজরত-ব্যাপারে উল্লেখ যোগ্য। হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) সমস্ত নগদ টাকা—যাহার পরিমাণ ৫।৬ হাজার দরম ছিল—সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন; তাঁহার পিতা আবি-কহাফাঃ তখনও ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন না; তিনি তখন অন্ধ ছিলেন। তিনি বাহির হইতে গৃহে আসিয়া উভয় পৌত্রীকে কহিলেন, আবুবকর (রাজিঃ) নিজেও চলিয়া গেল, আর সমস্ত আস্‌বাব ও টাকা কড়ি ও লইয়া গেল? হজরত আস্‌মা (রাঃ—আঃ) বলিলেন, দাদাজান! তিনি আমাদের জন্য অনেক টাকাকড়ি রাখিয়া গিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তিনি কতকগুলি পাথরের টুকরা কাপড়ে জড়াইয়া ঐ স্থানে (যেখানে টাকা থাকিত) রাখিয়া দিলেন। তারপর পিতামহের হাত ধরিয়া সেখানে লইয়া গেলেন; তিনি হাত দিয়া হাত্‌ড়াইয়া দেখিয়া মনে করিলেন, সত্য সত্যই দরম গুলি সেই স্থানে আছে। তখন বৃদ্ধ পৌত্রীদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এক্ষণে আবুবকরের (রাজিঃ) চলিয়া যাওয়াতে কোন 'গম' (দুঃখ) নাই।

হেজরতের সফর।

হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) আল্-কাছোয়া উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিবার পূর্ব্বে একবার মক্কার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; আর মর্ম্ম-বেদনার সহিত ফরমাইলেন, অয়ি মক্কা! তুমি আমার নিকট সকল শহর হইতে প্রিয়। কিন্তু তোমাতে যাহারা বাস করে, তাহারা আমাকে তোমার ক্রোড়ে থাকিতে দিল না। হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) ফরমাইলেন, ঐ সকল লোকেরা আপনাদের নবীকে তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিল। এক্ষণে উহারা 'হালাক্' (ধ্বংস) হইয়া যাইবে। ঐ সময়ই নিম্ন-লিখিত আয়াত 'নাযেল' (অবতীর্ণ) হইল।:—"ওযেনা লিল্লাযিনা ইউক্কাতেলুনা বেআন্না হুম যোলেমু ও আন্নাল্লাহা আলানাছ্‌রেহিম তাকা দিরুন।" এই স্থলে গওর করিয়া (অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া) দেখা যাইবে, এ যাবৎ যত লোক পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কি অবস্থায়, কোন ভাবে বিভোর হইয়া ইস্‌লামে দীক্ষা গ্রহণ করেন; এবং কি প্রকারে, কোন্ প্রমাণে প্রভাবান্বিত হইয়া মোসলমান হইয়াছিলেন। ইহাদিগকে কিরূপ ভীষণ 'জোলম' (অত্যাচার) সহ্য করিতে হইয়াছিল; আর মোসলমান হইয়া তাঁহারা কিরূপ হৃদয় বিদারক ভীষণ বিপদ রাশির সঙ্গে অকুতোভয়ে যুঝিয়া ছিলেন। কিরূপ সুদৃঢ় ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ইঁহাদের মন প্রাণ উজ্জীবিত হইয়াছিল। এই সকল দৃঢ়বিশ্বাসী ও দৃঢ়চেতা মোসলমানদিগের সম্বন্ধে কি এরূপ 'গোমান' (বিশ্বাস বা ধারণা) করা যাইতে পারে যে, ইহারা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, বা কোনও রূপ ভীতি-প্রদর্শনে মোসলমান হইয়াছিলেন? না, একথা কখনই নয়। এক্ষণে এই আয়াত নাযেল হইবার পর ঐ যামানাঃ শুরু (আরম্ভ) হইল যে, যখন দুরাচার লোকেরা

'কালমা হক্' (সত্যবাণী) প্রচারের গতিরোধ করিবার জন্য 'কতল' (হত্যা কাণ্ড) ও 'গারত' (ধ্বংসকার্য্য) হইতে নিবৃত্ত না হইল, তখন উহা-দিগকে (উপরোক্ত অত্যাচারী ও ধর্ম্মদ্রোহী দিগকে) শাস্তি প্রদানার্থ, আর সত্যবাণী প্রচারের ('তওহিদ' বা একেশ্বরবাদ ঘোষণার) পথাবরোধের বাধা প্রতিবন্ধকতা দূর করিবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হওয়া গেল।

ছরাকাঃ-বিন্-মালেক-বিন্ জয়শম মক্কার কোরেশদিগের মধ্যে একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ ও খ্যাতনামা যোদ্ধা ছিল। ছরাকার বৃত্তান্ত এইরূপ :— সে কয়েক ব্যক্তির সঙ্গে মক্কায় বসিয়া ছিল। অতি প্রত্যুষে কোনও ব্যক্তি আসিয়া তাহাদিগকে বলিল, আমি ৩ জন উষ্ট্রারোহীকে যাইতে দেখিয়াছি; তাহারা অমুক দিকে যাইতে ছিল। আমার বিশ্বাস যে, উহারা (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) ও তাঁহার বন্ধুবর্গ। ছরাকাঃ এই কথা শুনিয়াই ঐ ব্যক্তিকে চুপ থাকিতে ইঙ্গিত করিল, এবং বলিল আমি জানি, তাহারা অমুক অমুক ব্যক্তি—যাহারা অদ্য রজনীতে মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। ছরাকার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, আমিই উহাদিগকে 'গেরেফ্‌তার' (বন্দী) করিব, এখানকার অন্য কেহ না এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া পলাতক লোকদিগকে বন্দী করে; তাহা হইলেত আমি একশত উষ্ট্র পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হইব। একটু পরে ছরাকাঃ সেই বৈঠক হইতে উঠিল, এবং স্বীয় গৃহে আগমন করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় তেজগামী আরবীয় অশ্ব ও অস্ত্র শস্ত্রাদি ভৃত্যের দ্বারা শহরের বাহিরে পাঠাইয়া দিল। আর নিজে ও লোকের চক্ষু এড়াইয়া শহরের বাহিরে গিয়া পঁহুছিল। সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উষ্ট্রের পদচিহ্ন ধরিয়া খুব তেজে অশ্ব ছুটাইয়া দিল। কিছু দূর গিয়াই অশ্ব উছট্ খাওয়াতে ছরাকাঃ অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেল। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি আবার অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। উহার বিশ্বাস ও

ধারণা ছিল যে, আমি (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ) কে 'গেরেফ্তার' (বন্দী) অথবা কতল্ (হত্যা—শহীদ) করিয়া ঘোষণাকৃত ১০০ উষ্ট্র পুরস্কার গ্রহণ করিতে পারিব। যখন আঁ হজরত (ছালঃ) এবং তাঁহার বন্ধু ও সহচরগণের উষ্ট্র তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল; তখন তাহার অশ্ব আবার ঠোকর খাইল (পা হড়্কাইয়া পড়িয়া গেল), এবং উহার আগের পা দুখানি হাঁটু পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় (বালু রাশিতে) প্রোথিত হইয়া গেল। ছরাকাঃ যিনপোশ হইতে ভূতলে পতিত হইল, কিন্তু উঠিয়া আবার অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিল; এবং সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল; ও হজরতের (ছালঃ) আরোহিত উষ্ট্রীর অতি নিকটে গিয়া পঁহুছিল। নিকটে পঁহুছিবা-মাত্র উহার ঘোড়াটীর পেট পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছরাকাঃ ও ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; এই অবস্থা দেখিয়া সে নিতান্ত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল; এবং বুঝিতে পারিল, আমি ইঁহার (হজরত [ছালঃ]) এর প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। তদনুসারে সে স্বয়ং আওয়ায্ দিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) কে তাহার একটী কথা শুনিবার জন্য প্রার্থনা জানাইল। হজরত (ছালঃ) সওয়ারির (আরোহিত উষ্ট্রীর) গতিরোধ করিলেন। তখন ছরাকাঃ বলিল, আমি আপনাকে 'গেরেফ্তার' (বন্দী) করিবার জন্য আসিয়া ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে আমি ফিরিয়া যাইতেছি। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; আপনি আমাকে একখানি 'আমাল নামা' (শান্তির প্রতিশ্রুত পত্র) লিখিয়া দিন, আর আমাকে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি প্রত্যাবর্ত্তন কালে, যে সকল লোক আমার ন্যায় আপনাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে, তাহাদিগকেও বলিয়া কহিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইব। তদনুসারে হজরতের (ছালঃ) আদেশক্রমে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) কিংবা তাঁহার দাস আমের-বিন্-ফহিরাঃ(রাজিঃ)

উষ্ট্রী-পৃষ্ঠে বসিয়া বসিয়াই একখানি আমাল নামা লিখিয়া, 'উহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সে ঐ লিপিখানি লইয়া মক্কার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পথিমধ্যে আরও কতিপয় লোক হজরতের (ছাল:) অনুসরণে গমন করিতেছিল; পথিমধ্যে ছরাকার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল; সে তাহাদিগকে বলিল, আমি বহুদূর পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ও পলাতক-দিগের সাক্ষাৎ পাইলাম না; সুতরাং তাঁহাদের অনুসরণে তোমাদের গমন করা বৃথা। তচ্ছ্রবণে ঐ সকল লোকও আর অগ্রসর না হইয়া মক্কায় ফিরিয়া গেল। ছরাকা: মক্কা-বিজয়ের পর পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

গার স্থর (স্থর গিরি-গহ্বর) অর্থাৎ মক্কার সন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে রওয়ানা হইয়া আবদুল্লা-বিন্-আরিত, হজরত (ছাল:) কে সমুদ্র তীরের দিকে লইয়া চলিল। 'আছফান' নামক স্থানের ওদিকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া, সাধারণ রাস্তা অতিবাহিত করিল; তৎপর 'ওমজের' নিম্নদিকস্থ 'কদির' পর্য্যন্ত 'সফর' করিল; পরে সাধারণ রাস্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'খররার' এর ময়দান অতিক্রম করিতে লাগিল। 'ছনাত্তাল মররাহ্', 'লফত্', 'মদ-লজাহ', 'মহ্ হাজ' প্রভৃতি স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক, 'যওয়ানর যুয়ীন' এর এলাকাও পার হইল, তৎপর 'যিসলম' অতিক্রম করিয়া 'আলয়াবা বিদা: আল আরজ' প্রভৃতি স্থান পারে হইয়া গেল। 'আল্-য়াবরজ' এর নিকটবর্ত্তী 'ওয়াদী' তে হজরতের (ছাল:) এই কাফেলার একটী উষ্ট্রী চলিতে চলিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল। ঐ স্থানে আস্লম সম্প্রদায়ের আযস্-বিন্-হজর হইতে একটী উষ্ট্র চাহিয়া লওয়া হইল। আযস্-বিন্-হজর স্বীয় একজন গোলাম ও তাঁহার সঙ্গে দিল। সেখান হইতে এই কাফেলা 'সন্তাহ-আল্-ফায়ের' এর রাস্তা অতিক্রম পূর্ব্বক 'ওয়াদি-রিম' এ পঁহুছিল। ওয়াদি রিম হইতে যাত্রা করিয়া,

বেলা দ্বি-প্রহরের সময় এই পবিত্র কাফেলা 'কোবার' নিকট গিয়া পঁহুছিল।

ছরাকাঃ-বিন্-মালেক যখন হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) এর নিকট হইতে মক্কায় চলিয়া গেল, তথা হইতে হুজুরের কাফেলা কিছু দূর অগ্রসর হইলে, হজরত যোবের-বিন্-আওয়াম (রাজিঃ), শাম (সিরিয়া) হইতে তেজারতি মাল (বাণিজ্য-দ্রব্য) লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে এই পবিত্র কাফেলার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। হজরত যোবের (রাজিঃ) হজরতের (ছালঃ) হুজুরে কতক বস্ত্র অর্থাৎ পরিচ্ছদ পেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আরজ করিলেন যে, আমিও মক্কায় পঁহুছিয়া যত শীঘ্র সম্ভব মদীনায় পঁহুছিতেছি। এই সময়ে পথিমধ্যে যে সকল লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত, তাহারা সকলেই হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) কে চিনিতে পারিত। কারণ তিনি একজন প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদাই এইপথে গমনাগমন করিতেন। কিন্তু আঁ হজরত (ছালঃ) কে লোকে চিনিতে পারিত না। এজন্য লোকে হজরত সিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) কে জিজ্ঞাসা করিত, ইনি কে—যে আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন? হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) উহাদিগকে উত্তর দিতেন—ইনি আমার পথ-প্রদর্শক ও তরিকের (ধর্ম্ম-বিষয়ের) হাদী (উপদেষ্টা)।

ছফরের (প্রবাসের) পরিসমাপ্তি।

আট দিন পথ ভ্রমণের পর ১৪ই নববীর (পয়গম্বরী বা প্রেরিতত্ব লাভের ১৪শ সালে) ৮ই রবিওল আউওল বেলা দ্বি-প্রহরের সময় কোবার নিকটে এই পবিত্র ও চিরস্মরণীয় কাফেলা গিয়া পঁহুছিল। যে পবিত্র

ঘটনা স্মরণ করিতে অদ্যাপি (চৌদ্দশত বৎসর পরে) ও মোস্‌লেম-হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হয়; সেই পবিত্র দিনের কথা-স্বতঃই মনে উদয় হইয়া থাকে; ধমনীতে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হয়। যাঁহার হৃদয় ইস্‌লামের পবিত্র আলোকে আলোকিত, তাঁহার হৃদয়ে:ভাব ও ভক্তি স্রোত উথলিয়া উঠে।

কোবা মদীনা হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। উহা মদীনার শহর-তলিই ছিল। এমন কি, উহা মদীনার একটী মহাল্লা বলিয়াই পরিগণিত হইত। ঐ স্থানে বনি-ওমরু-বিন্-য়য়োফ্ গোষ্ঠীর (গোত্রের) লোকই অধিক সংখ্যায় বাস করিত। এই স্থানের বহুসংখ্যক লোকই ইতিপূর্ব্বে ইস্‌লামের পবিত্র মহাজ্যোতিঃ (আলোক) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মক্কা হইতে হজরত রেছালত পানার (ছালঃ) রওয়ানা হইবার সংবাদ কয়েক দিন পূর্ব্বেই মদীনায় পঁহুছিয়া ছিল। এজন্য মদীনার আনছারগণ প্রত্যহ প্রভাত হইতে বেলা দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত বস্তির বাহিরে যাইয়া ইস্‌লাম-সূর্য্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। যখন দিবাকরের প্রখর উত্তাপ অসহ্য বোধ হইত, তখন তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। হজরত (ছালঃ) বেলা দ্বি-প্রহরের সময় কোবায় পঁহুছিয়া ছিলেন। এজন্য কোবাবাসী শিষ্যও ভক্তবৃন্দ অপেক্ষা করিতে করিতে উহার একটু পূর্ব্বে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গিয়াছিলেন। একজন য়িহুদী, মোসলমান জন-সঙ্ঘকে প্রতিদিন এইরূপে বস্তির বাহিরে আসিয়া সমবেত হইতে দেখিত, এবং সে জানিত যে, আঁ হজরত (ছালঃ) শীঘ্রই মক্কা হইতে এখানে আগমন করিবেন; তাঁহার আগমন-জন্য—তাঁহার অভ্যর্থনার্থই এই সকল লোকেরা একান্ত আগ্রহ সহকারে এইরূপে সমবেত হইয়া থাকেন। ঘটনা বশতঃ ঐ দিন সে আপনার গৃহের ছাদে আরোহণ করিয়াছিল, সে দূর হইতে হজরত রেছালত পানার (ছালঃ) ক্ষুদ্র কাফেলাটী কে আসিতে দেখিয়া

বুঝিতে পারিল, ইহাই সেই কাফেলা—যে সঙ্গে হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) আসিতেছেন। তদনুসারে সে হজরত (ছালঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "এয়া মায়াশারল আরব ইয়া নবী কিলদ হাযা জদকুম :কা জায়া" অর্থাৎ হে আরববাসী (মদীনাবাসী)-গণ, হে দু-প্রহরে আরামকারিগণ, তোমাদের উদ্দেশিত, তোমাদের সৌভাগ্যের 'ছামান' (জিনিষ বা পাত্র) ত আসিয়া পঁহুছিয়াছেন।" এই আওয়ায্ শুনিবামাত্র লোকেরা স্ব স্ব গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। আর সমগ্র কোবায় আনন্দের উচ্ছ্বাস দৃষ্ট ও উল্লাসধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। আন্‌ছার (রাজিঃ)-গণ দেখিতে পাইলেন, হুজুর এক খর্জ্জুরের বাগানের দিকে যাইতেছেন। হজরত সিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) মনে করিলেন, লোকদিগের হজরত রসুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-কে চিনিতে না সন্দেহ হয়, এই উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ হজরতের পশ্চাদ্দিকে আসিয়া চাদর দ্বারা হজরতের (ছালঃ) উপর ছায়া করিলেন—যদ্দারা প্রভু ও সেবকের পরিচয় সহজেই পাওয়া গেল। হুজুর (ছালঃ) 'কোবা' মহাল্লায় প্রবেশ করিলেন। আন্‌ছার (রাজিঃ)-দিগের ছোট ছোট বালিকাগণ আনন্দোচ্ছ্বাসের সহিত সুমধুর স্বরে হুজুরের আগমন-জনিত সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। সঙ্গীতের একাংশের মর্ম্মানুবাদ এই :—

"আমাদের উপর বদর, ছানিয়াত আল্ ভেদা দ্বারা উদয় করিয়াছে ; (১) যে পর্য্যন্ত কোনও দোওয়া-কারী আছে, আমাদেয় উপর শোকর (কৃতজ্ঞতা

(১) ছানিয়াতের অর্থ আল্‌ভেদা,—রোখ্‌ছতের বিদায়ের ঘাটি সমূহ। মদীনাবাসিগণ যখন কাহাকেও মক্কার দিকে বিদায় করিত, তখন ঘাটি সমূহ পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে "আলবেদা" বলিবার জন্য আসিত। এজন্য উহা "সানিয়াত-আল্‌ভেদা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

স্বীকার) করা 'ওয়াজেব' (কর্ত্তব্য); হে আমাদের মধ্যে মবয়ুছ হওয়া ওয়ালা নবী, আপনি এমন আদেশ লইয়া আসিয়াছেন যে, ইহা পালন করা একান্ত আবশ্যক।"

হজরত (ছালঃ) রবিবার দিন কোবায় প্রবেশ করিলেন, এবং জুমার দিন পর্য্যন্ত তথায় থাকিলেন। ইস্লামে দৃঢ়-বিশ্বাসী মদীনাবাসীদিগের হৃদয়ে তখন যে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা এ সামান্য লেখনীর সাধ্যাতীত। এমন কি, আমাদের কল্পনার অতীত। আঁ হজরত (ছালঃ) কলছুম-বিন্-হদমের (রাজিঃ) গৃহে, আর হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) হবিব-বিন্- আছাফের (রাজিঃ) গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ছায়াদ-বিন্ খছিমল্লা (রাজিঃ)-এর গৃহে হজরতের 'মজলেছ' (দরবার) হইত; অর্থাৎ ছায়াদ-বিন্-খছিমাঃ (রাজিঃ)-এর গৃহে লোকেরা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। সকল সময়েই তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিপুল জনতা থাকিত। কোবায় এই কয়েক দিন অবস্থান কালে তিনি একটী মস্জেদের ভিত্তি স্থাপন করেন; ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম মস্জেদ। ইহার পর ১২ই রবিওল-আউওল জুমার দিন তিনি কোবা হইতে রওয়ানা হইয়া মদীনায় প্রবেশ করিলেন। হজরত রছুল আকরম (সালঃ) কোবায় থাকিতে থাকিতেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মক্কা হইতে কোবায়—হজরতের খেদমতে আসিয়া পঁহুছিলেন। এই সুদীর্ঘ এবং দুরতিক্রম্য পথ তিনি পদব্রজেই অতিক্রম করেন। হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) যে কয়দিন স্থর নামক গিরি-গহ্বরে ছিলেন, সেই কয়দিন পর্য্যন্ত শেরে খোদা (রাজিঃ) হজরতের নিকট গচ্ছিত দ্রব্য-সামগ্রী উহার 'মালেক' (স্বত্বাধিকারী)-দিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আবার ঘটনার সামঞ্জস্য এমনই বিস্ময়কর যে, যে দিন হজরত (ছালঃ) এবং সিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) স্থর গিরি-

গহ্বরে হইতে মদীনাভিমুখে যাত্রা করেন, হজরত আলী (রাজিঃ) ও সেই দিনই মক্কা হইতে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ) একাকী যাত্রা করিয়াছিলেন ; এজন্য তিনি সারারাত্রি পথ চলিতেন, এবং দিনের বেলায় কোনও নিভৃত স্থানে লুকাইয়া থাকিতেন। আঁ হজরত (ছালঃ) সাধারণ রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া অনেক স্থলেই উহার এদিক্ ওদিক্ দিয়া আগমন করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি ৮ দিনে কোবায় পঁহুছিয়াছিলেন, আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সাধারণ রাস্তা দিয়া পদব্রজে চলিয়া আসিয়াছিলেন ; এজন্য হজরতের ৩ দিন কিংবা ৪ দিন পরে তিনি কোবায় পঁহুছিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হজরতের মদীনায় প্রবেশ।

জুমার দিন হজরত (ছালঃ) কোবা ও বনি ওমরু-বিন্-বনি-য়য়োফ্—অর্থাৎ কোবাবাসিগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মদীনায় বাস করিবার জন্য রওয়ানা হইলেন। মদীনার প্রত্যেক মহাল্লার—প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক বাসনা করিতেন যে, আঁ হজরত (ছালঃ) আমাদের মহাল্লায় বাস করুন। হজরত (ছালঃ) বনু সালেম-বিন্ য়য়োফ্ দিগের মহাল্লায় থাকিতে থাকিতেই জুমার দিন আসিয়া পড়িল। তিনি ঐ স্থানেই এক ময়দানে শতাধিক লোকের সঙ্গে জুমার নমাজ আদায় করিলেন। ইহাই মদীনায় হজরত রেছালত মাব (ছালঃ)-এর প্রথম জুমা ও প্রথম খোত্‌বা ছিল। উত্তরকালে এই স্থানেও একটী মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। জুমার নমাজ আদায় করিয়া তিনি স্বীয় উষ্ট্রী কাছোয়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। বনুসালেহ্-বিন্-য়য়োফ্ সম্প্রদায়ের লোকেরা আসিয়া তাঁহার উষ্ট্রীর মোহার (বল্গা বা রসি) ধরিয়া লইলেন ; এবং

তাঁহাকে সেই স্থানে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। অন্যান্য মহাল্লার লোকেরা আপনাপন মহাল্লায় লইয়া যাইবার জন্য বিশেষরূপে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার লইয়া বিভিন্ন দলের লোকের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও বচসা হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে হজরত রেছালত পানাহ্ (ছালঃ) ফরমাইলেন, তোমরা আমার নাকার (উষ্ট্রীর) গতিরোধ করিও না। উহার মোহার (নাকের রসি) ছাড়িয়া দাও। উষ্ট্রী খোদা তা-য়ালা হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে; যেখানে আমার উষ্ট্রী আপনা হইতে বসিয়া যাইবে, আমি সেই স্থানে অবতরণ এবং বাস করিব। তদনুসারে উষ্ট্রীর মোহার (রজ্জু) ছাড়িয়া দেওয়া হইল; সে যথেচ্ছভাবে চলিতে লাগিল। সমুদয় আন্ছার ও মহাজেরগণ উষ্ট্রীর অগ্রপশ্চাতে এবং দক্ষিণ ও বামে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। হজরত রেসালত পানাহ্ (ছালঃ) উষ্ট্রীর মোহার একেবারে ঢিলা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। উষ্ট্রী আপন ইচ্ছা মতে আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছিল। কৌতূহল পরবশ লোকদিগের লক্ষ্য ঐ উষ্ট্রীর দিকেই ছিল; উষ্ট্রী কোথায় বসিয়া পড়ে, তাহাই দেখিবার জন্য সকলের একান্ত আগ্রহ। উষ্ট্রী চলিতে চলিতে যখন বনু-বেয়াযার মহাল্লায় (পাড়ায়) পঁহুছিল, তখন ঐ সম্প্রদায়ের ছরদার (দলপতি) যেয়াদ-বিন্-লবিদ ও ফরদাঃ-বিন্-ওমরু অগ্রসর হইয়া উষ্ট্রীর মোহার ধরিতে চাহিলেন। তদ্দর্শনে হজরত ছারওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) ফরমাইলেন,—"দায়োহা ফান্হা মা মুরতুন"—উহাকে ছাড়িয়া দাও, সে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার পর উষ্ট্রী বনু-সায়াদাঃ মহাল্লায় পঁহুছিল; এখানে বনু সায়াদ গোত্রের (গোষ্ঠীর) ছরদার (দলপতি) সায়াদ-বিন্-আল্ রবির, খারজাঃ-বিন্-যয়েদ, আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ আবার উষ্ট্রীর গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন। হজরত (ছালঃ) উহাদিগকেও ঐ কথাই বলিলেন।

তথা হইতে রওয়ানা হইয়া উষ্ট্রী বনু আদি-বিন্-আল্ নজ্জারের-মহাল্লায় পঁছছিল ; এই সম্প্রদায় হজরতের (ছালঃ) পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের 'নান্হিয়াল' (নানা অর্থাৎ মাতামহের বংশীয় লোক) ছিলেন ; এজন্য তাঁহাদের বিশেষ দাওয়া ছিল যে, আবদুল মোত্তালেবের মাতা সল্মি-বিন্তে-ওমরু আমাদের বংশের কন্যা ছিলেন ; সুতরাং আঁ হজরত (ছালঃ) আমাদের মহাল্লায়ই অবস্থান করিবেন ; সেই ধারণানুসারে সলিত-বিন্-কয়েস্ ও আছিরাত-বিন্ আবি-খারজাহ্ প্রভৃতি বনু আদির দলপতিগণ অগ্রসর হইয়া উষ্ট্রীর মোহার (নাকের রজ্জু) ধারণ করিলেন ; উহাদিগকেও এই আদেশ প্রদত্ত হইল যে, উষ্ট্রীর পথ ছাড়িয়া দাও ; সে খোদা তায়ালা হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। উষ্ট্রী যথেচ্ছ ভাবে চলিতে চলিতে বনু-মালেক-বিন্-আল্-নজার মহাল্লার এক অনাবাদি পতিত জমিতে গিয়া বসিয়া পড়িল ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইয়া গেল। দণ্ডায়মান হইয়া কিছু দূর চলিয়া গেল, আবার আপনা হইতেই ফিরিয়া আসিল ; এবং ঠিক ঐ স্থানে—যেখানে প্রথমে আসিয়া বসিয়াছিল, সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে 'গরদান' ঝুকাইয়া দিল, এবং পুচ্ছ হেলাইতে লাগিল। তখন হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) উষ্ট্রীর পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে অবতরণ করিলেন। এই জনহীন পতিত যমির নিকটেই হজরত আবু আইউব খালেদ বিন্-যয়েদ আন্ছারির (রাজিঃ) (১) গৃহ

(১) ইনি একজন অতি উচ্চদরের সাহাবী (রাজিঃ) ছিলেন। যখন খলিফা হজরত মোয়াবিয়া (রাজিঃ) কনষ্টান্টি নোপল আক্রমণ করেন, সেই আক্রমণকারী বীরপুরুষদিগের সঙ্গে ইনিও গমন করিয়াছিলেন। হজরত এমাম হোসায়েন (রাজিঃ) এবং এযিদ-বিন্-মোয়াবিয়া ও এই অভিযানে গমন করিয়াছিলেন। আর ও বহুসংখ্যক ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ) এই সঙ্গে গিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ দুই বৎসরকাল অবরোধের পরও যখন নগর

ছিল। তিনি অতি আনন্দের সহিত হজরত রছুল মকবুল (ছালঃ)-এর আস্‌বাব-পত্র স্বীয় গৃহে উঠাইয়া লইলেন। অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহার গৃহেই বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। এই পতিত যমি খণ্ড সহল ও সহিল নামক দুইটী এতিম (অনাথ) বালকের সম্পত্তি ছিল। এই ভূখণ্ডে কতিপয় খর্জ্জুর বৃক্ষ দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইত ; তদ্ব্যতীত কতিপয় মোশ্‌রেকের (অংশিবাদী বা কাফেরের) কবরও ছিল। আর চতুস্পদ জন্তুর দলও সেই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিত। তিনি লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পতিত যমিখণ্ড কাহার সম্পত্তি ? মায়ায্‌-বিন্ যফ্‌রাঃ আরজ করিলেন, এই ভূখণ্ড আমার আত্মীয় দুইটী 'এতিম' (অনাথ) ছেলের সম্পত্তি। তাহারা উভয়ে আমার গৃহেই প্রতিপালিত হইতেছে। আমি উহাদিগকে 'রেজামন্দ' (সম্মত) করিয়া লইব ; আপনি ঐ স্থলে স্বচ্ছন্দে মস্‌জেদ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি ঐ যমির উপযুক্ত মূল্য দিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি ; বিনামূল্যে লইব না। তদনুসারে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ)

অধিকার করা গেল না, তখন আরব-বাহিনী অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এই অবরোধ কালে হজরত আঁবু আইউব আন্‌ছারী (রাজিঃ) শহিদ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে নগর প্রাচীরের বহির্ভাগেই কবরস্থ করা হয় ; তুরস্কের মহামান্য ছোল্‌তান ২য় মোহাম্মদ কর্ত্তৃক কনষ্টান্টিনোপল অধিকৃত হওয়ার বহুকাল পরে এই পবিত্র সমাধি আবিষ্কৃত হয় ; এবং তদানীন্তন মহামান্য ছোলতান তথায় এক বিরাট মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করেন। কনষ্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলের মধ্যে অধুনা উহা এক বিখ্যাত মস্‌জেদ ; আর হজরত আবু আইউব আন্‌ছারী (রাজিঃ)-এর পবিত্র মজার শরীফ্‌ ঐ মহা নগরীর সর্ব্বপ্রধান 'যেয়ারত্‌গাহ্‌' বা তীর্থস্থান।

তৎক্ষণাৎ ঐ যমির মূল্য আদায় করিয়াদিলেন। তৎপর আঁ হজরতের (ছালঃ) আদেশে খর্জ্জুর বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলা হইল। মোশরেকিনের (অংশিবাদীদিগের) কবরগুলি সমতল করিয়া দেওয়া হইল। তৎপরে ঐ স্থানে মসজেদ নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ করা গেল। আঁ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং মসজেদ নির্ম্মাণ কার্য্যে যোগ দিতেন। মহাজেরিন ও আন্‌ছার (রাজিঃ)-গণ অতি উৎসাহ ও আনন্দের সহিত এই মসজেদ-নির্ম্মাণ কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। মসজেদের 'দিওয়ার' (প্রাচীর) প্রস্তর ও মৃত্তিকা দিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল; আর ছাদে দেওয়া হইয়াছিল খেজুরের কাঠ এবং খেজুরের পাতা। যে পর্য্যন্ত মসজেদ ও উহার নিকটে আঁ হজরত (ছালঃ) এর বসবাসের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত না হইল, সেই পর্য্যন্ত তিনি হজরত আবু আইউব আন্‌সারির (রাজিঃ) গৃহে, তাঁহার অতিথি রূপে বাস করিলেন। তিনি ১১ মাস কয়েক দিন হজরত আবু আইউব আন্‌সারির (রাজিঃ) গৃহে বাস করিয়াছিলেন। স্মরণ রাখা উচিত যে, এই মসজেদই ইস্‌লাম জগতের দ্বিতীয় পবিত্র উপাসনালয়; এবং সম্মান ও 'মর্ত্তবায়' (গৌরবে) ও পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয়। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুকের (রাজিঃ) খেলাফৎ কাল পর্য্যন্ত এই মসজেদ এই অবস্থায়ই ছিল। কিন্তু মুসল্লির (নমাজীর) সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি ইহার আকার বাড়াইয়াছিলেন। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান জিন্নুরায়নের (রাজিঃ) খেলাফৎ কালে ইহার প্রাচীর পাকা করা হয়। তিনি আর কোনও পরিবর্ত্তন করেন নাই; কিন্তু ওম্মিয়া বংশীয় খলিফা ওলিদ-বিন্-আবদুল মালেক ইহার সীমা অনেক বৃদ্ধি করেন, এবং আয্‌ওয়াজ মোতা হারাত নবুয়ী (ওম্মোল মুমেনিন [রাঃ—আঃ])-দিগের গৃহাবলীও মসজেদের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। আব্বাস (রাজিঃ) বংশীয় বিখ্যাত খলিফা মামুনর রশিদ

মদিনা শরিফ ও মস্‌জিদ নববি
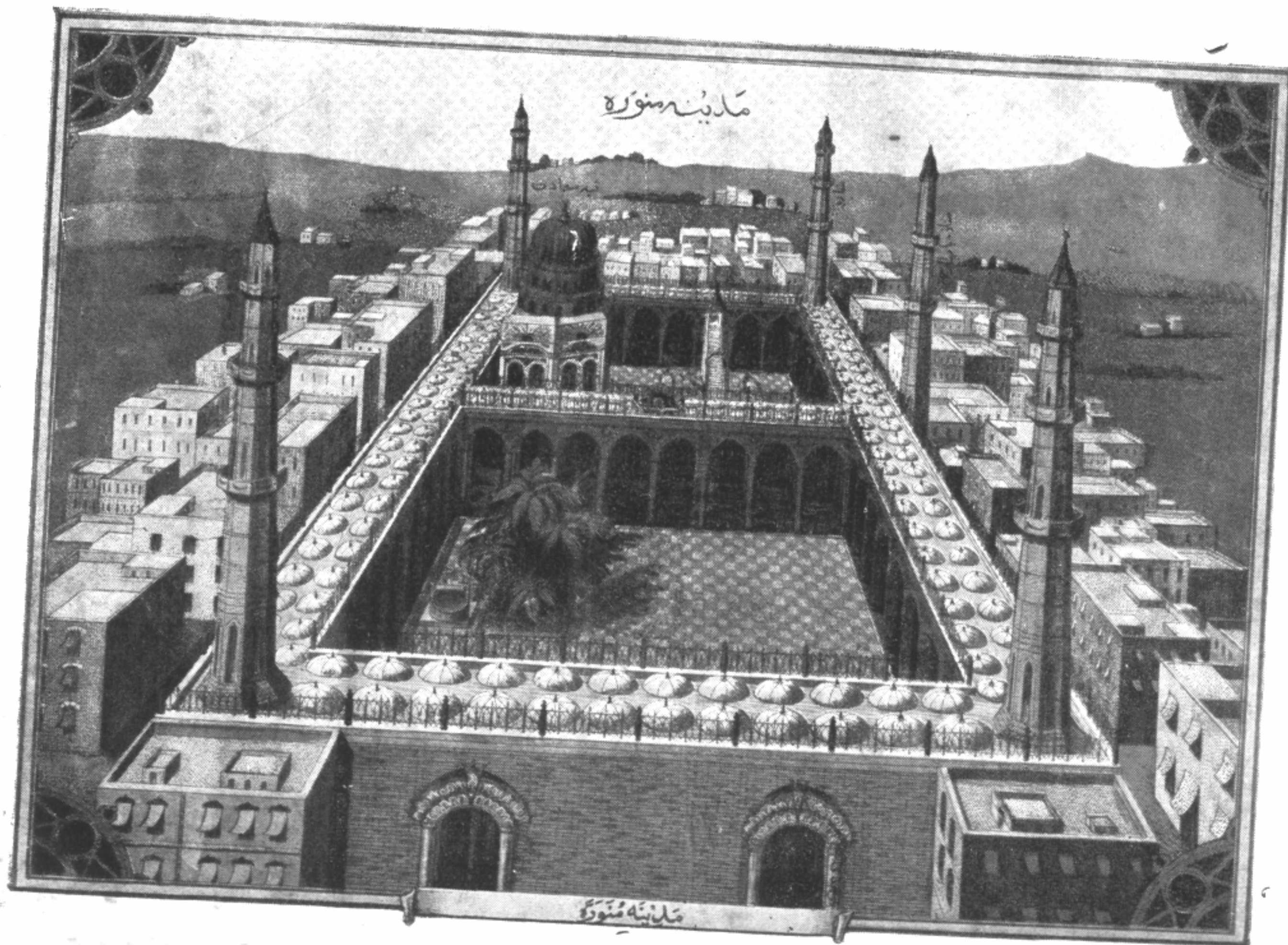
পাক পাঞ্জতন। ১৪৪ পৃষ্ঠা।

এই মস্‌জেদের অনেক উৎকর্ষ সাধন এবং অতি উন্নতভাবে উহা সুসজ্জিত করেন।

হজরত রেছালতমাব (ছালঃ), হজরত আবু আইউব আনুসারির (রাজিঃ) গৃহে থাকিতে থাকিতেই, যয়েদ-বিন্‌-হারেছ (রাজিঃ) ও আবু রাফেয় (রাজিঃ)-কে পাঠাইয়া স্বীয় দুহিতা-রত্ন হজরত ফাতেমা (রাঃ—আঃ) ও হজরত উম্মে কুলছুম (রাঃ—আঃ), হজরত সওদাঃ বিন্তে য়ময়া (রাঃ—আঃ), ওসামা-বিন্‌-যয়েদ (রাজিঃ) ও তাঁহার জননী এমিন (রাঃ—আঃ)-কে মক্কা হইতে মদীনায় আনাইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আবদুল্লা-বিন্‌-আবিবকর (রাজিঃ) আপনাদের পরিবার বর্গও আত্মীয়-স্বজন লইয়া মদীনায় চলিয়া আসিলেন। তাল্‌হা-বিন্‌-আবদুল্লা (রাজিঃ) ও ঐ কাফেলার সঙ্গে মদীনায় আগমন করিলেন। পরিবারবর্গ আগমন করাতে হজরত (ছালঃ) নব-নির্ম্মিত গৃহে গমন করিলেন।

হিজরী সনের প্রারম্ভ।

এ যাবৎকাল বৎসর গণনার জন্য সন নববী—অর্থাৎ হজরত (ছালঃ)-এর নবুয়ত লাভের সময় হইতে একটী সন গণনা করা হইতেছিল। ইহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) নবুয়ত লাভের এত বৎসর গত হইয়াছে। কিন্তু একথা জানা আবশ্যক যে, চান্দ্রমাসের নাম উহাই আছে, যাহা আরব দেশে পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। এজন্য সন নববীর প্রথম বৎসর কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। এই হেতু হজরত রেছালত পানার (ছালঃ) মদীনায় প্রবেশ রবিওল আউওল মাসে হইলেও, সন নববীর ১৪শ সাল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাস গণনার হিসাবে নবুয়তের সাড়ে

বার সাল মাত্র অতীত হইয়াছিল। এইরূপে আঁ হজরতের (ছালঃ) মদীনায় হেজরত করিয়া তশ্‌রিফ আনাতে হিজরী সাল আরম্ভ হয়। তিনি ১২ই রবিওল-আউওল মদীনা শরীফে আগমন করাতে, প্রথম হিজরী সাল মাত্র ৯ মাসেই শেষ হইয়া গেল। আর ১লা মোহার্‌রম তারিখে দ্বিতীয় সাল (সন) আরম্ভ হইল। ইহাও বুঝা চাই যে, আঁ হজরত (ছালঃ) দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাস পর্য্যন্ত হজরত আবু আইউব আনছারির (রাজিঃ) গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

হেজরতের প্রথম বৎসর

হিজরীর প্রথম বৎসরে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে মস্‌জেদ নববীর নির্ম্মাণ কার্য্য, হজরতের (ছালঃ) বাসগৃহ নির্ম্মাণ, মক্কার অবিশিষ্ট মোসলমানগণের মদীনায় আগমন প্রভৃতি ঘটনা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সময় মধ্যে আরও একটী বিশেষ ঘটনা এই ঘটিয়াছিল যে, হজরত আবু এমামাঃ-বিন্‌-আসদ-বিন্‌-যরা-যরারহ্‌ (রাজিঃ) হঠাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন। ইহা একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হজরত আবু এমামাঃ (রাজিঃ) প্রথম হইতে পীড়িত ছিলেন না; অকস্মাৎ কোনও রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সংবাদ যখন আঁ হজরতের (ছালঃ) নিকট পঁহুছিল; তখন তিনি ফরমাইলেন 'মোশ্‌রেক' (অংশিবাদী)-দিরগ এই কথা বলিবার সুযোগ ঘটিবে যে, এব্যক্তি কেমন রছুল যে, ইহার বন্ধুবর্গের মধ্যে একব্যক্তি হঠাৎ এইরূপে মরিয়া গেল? হজরত আবু এমামার মৃত্যুর পর বনু-নজ্জার সম্প্রদায়ের লোকেরা আঁ হজরতের (ছালঃ) খেদমতে 'হাজের' হইয়া আরজ করিল যে, আবু এমামাঃ (রাজিঃ) আমাদের 'ছরদার' (নেতা বা দলপতি) ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; এক্ষণে আপনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত রূপে অপর কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিকে আমাদের দলপতি নির্ব্বাচিত করিয়া দিন। প্রত্যুত্তরে হজরত নবী করিম (ছালঃ) বলিলেন, হে বনি নজ্জার বংশীয়গণ! তোমরা আমার মাতুল বংশীয়; এজন্য আমিও তোমাদের সম্প্রদায়ের অন্তভুক্ত, সুতরাং আমি নিজেই তোমাদের 'নকীব' (ছরদার) হইলাম। তচ্ছ্রবণে বনি-নজ্জার সম্প্রদায় অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই 'আন্দেশাঃ' (আশঙ্কা) ও দূর হইল যে, যদি অন্য কোনও ব্যক্তিকে 'ছরদার' 'মকরর' (নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত) করা হইত, তবে দলের অপর কোনও প্রধান ব্যক্তি—যাঁহাদের ছরদারী (নেতৃত্ব বা দলপতিত্ব) লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাঁহারা ঘোর শত্রুতাচরণ করিতেন। আর সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর যে একতা আছে, তাহা কিছু দিনের জন্য কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইত। আঁ হজরত (ছালঃ) ঐ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করাতে উক্ত 'কবীলার' (গোষ্ঠীর) 'হেম্মত' (সাহস), একতা ও ভ্রাতৃভাব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনায় পঁহুছিয়া সর্ব্ব-প্রথমে যে বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান করিলেন—'কোশেশ' (চেষ্টা) ও যত্ন প্রদর্শন করিলেন, উহা নগরে শান্তি স্থাপন, অধিবাসীদিগের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃভাব দৃঢ়ীকরণ, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ বর্দ্ধন প্রভৃতি। তিনি মদীনায় পঁহুছিয়াই এই বিষয়ে চিন্তা ও খেয়াল করিলেন যে, মহাজেরিনদিগের দল মক্কা হইতে মদীনায় আগমন করিয়াছে, উহারা যেন মদীনাবাসীদিগের জন্য কষ্টকর, দুর্ব্বহ ভারও গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া না দাঁড়ায়; এবং তদ্দরুণ একটা অশান্তির সৃষ্টি না করে। সঙ্গে সঙ্গে একথার ও খেয়াল ছিল যে, মহাজেরিনগণ—যাঁহারা দিন অর্থাৎ ধর্ম্মের অনুরোধে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এবং আপনাদের প্রিয় জন্মভূমি, বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-

স্বজন, ধন-সম্পত্তি, টাকাকড়ি, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদীনায় আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা অধিকতর 'পেরেশান' (চিন্তাকুল) ও ভগ্নমনাঃ না হইয়া যান। তদনুসারে তিনি সমুদয় আন্‌ছার ও মহাজ্জেরিনদিগকে এক সভায় আহ্বান করিয়া, ইস্‌লামী একতা ও ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে এক সুমধুর ও হৃদয়-গ্রাহিণী 'ওয়াজ' (উপদেশ-মূলক বক্তৃতা) প্রদান করিলেন। আর মোসলমানদিগের মধ্যে 'মওয়াখাতা' ও 'ভাইচারাঃ' (ধর্ম্ম-ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন) প্রতিষ্ঠা করিয়া মহাজ্জের ও আনছার-দিগের সম্বন্ধ অতি মধুর ও প্রাণস্পর্শী করিয়া দিলেন। তদনুসারে এক এক মহাজ্জের ও এক এক আন্‌ছারের মধ্যে ধর্ম্ম-ভ্রাতার পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) দিনি ভ্রাতা হজরত খারজাঃ-বিন্‌-যবির আন্‌ছারী (রাজিঃ) হইলেন। হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর ধর্ম্ম ভ্রাতা হইলেন হজরত য়ত্‌বান-বিন্‌-মালেক আন্‌ছারী (রাজিঃ)। হজরত আবুওবায়দা-বিন্‌-জার্‌রাহ (রাজিঃ)-এর সঙ্গে হজরত সায়াদ-বিন্‌-মায়ায্‌ আন্‌ছারী (রাজিঃ)-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইল। এইরূপ হজরত আবদুর রহমান বিন্‌ য়যোফ (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সায়াদ-বিন্‌ আর-রবিয় আন্‌ছারী (রাজিঃ)-এর হজরত যোবের-বিন্‌-আল্‌ য়াওয়ামের (রাজিঃ) সঙ্গে সালামাঃ-বিন্‌-ছালামাঃ (রাজিঃ)-এর, হজরত ওস্‌মান-বিন্‌-আফ্‌ফান (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ছাবেত-বিন্‌-আল্‌ মন্‌যর (রাজিঃ) আন্‌ছারীর, হজরত তাল্‌হা-বিন্‌-আবদুল্লা (রাজিঃ)-এর সঙ্গে কায়াব-বিন্‌-মালেকের (রাজিঃ), হজরত মায়াছব-বিন্‌-য়মরের (রাজিঃ) সঙ্গে হজরত আবু আইউব আন্‌ছারির (রাজিঃ), হজরত এমার-বিন্‌ এয়াছর (রাজিঃ)-এর সঙ্গে হজরত হযিফাঃ আলিমান রাজি আল্লাহ্‌ আন্‌হুর ধর্ম্ম-ভ্রাতৃ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল। স্থূলকথা, এক একজন মহাজ্জেরের সঙ্গে এক একজন আন্‌ছারের দিনি

ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ গঠিত ও দৃঢ়ীকৃত হইল। আন্ছারগণ এই পবিত্র ধর্ম্ম-ভ্রাতৃ, সম্বন্ধ এরূপ মনঃ-প্রাণের সঙ্গে—এরূপ উদারতার সহিত স্থাপন করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত নাই। সমুদয় আন্ছার, মহাজের-দিগকে ঠিক্ আপনাদের 'হকিকি ভাই' (সহোদর ভ্রাতা) রূপে গ্রহণ করিলেন, এবং আপনাদের অর্থ ও বিষয়-সম্পত্তি তাঁহাদের হস্তে প্রদান করিলেন। কোনও কোনও আন্ছার এতদূর ভ্রাতৃভাব ও উদারতা প্রদর্শন করিলেন যে, যাঁহাদের দুইটী স্ত্রী ছিল, অকৃতদার বা যাঁহাদের পরিবার গতাসু হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য এক একটী স্ত্রী তালাক দিয়া, ঐ সকল ধর্ম্ম-ভ্রাতার সঙ্গে তাঁহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে মহাজেরিন ভ্রাতাগণও আপনাদের আন্ছার ভ্রাতাদিগের মস্তকে সকল বোঝা না চাপাইয়া, নিজেরা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে, এবং তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অনেকে দোকানদারী ও অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন; এবং আপনাদের দৈনন্দিন খরচপত্র নির্ব্বাহের ভার নিজেরাই বহন করিতে লাগিলেন। ইহা দ্বারা আন্ছার ভ্রাতাদের ব্যয়ভার অনেক লঘু হইয়া গেল। মহাজেরগণ সকলেই সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভরশীল এবং কর্ত্তব্য জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং এই ধর্ম্ম-ভ্রাতাদিগের দ্বারা উদার-হৃদয়, কর্ত্তব্য-পরায়ণ আন্ছারগণ কোনও রূপ ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই বা কোনও রূপ অসুবিধা ভোগ করেন নাই। কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী মহাজেরগণ ক্রমশঃ সচ্ছল গৃহস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

এস্থলে হেজরতের পূর্ব্ববর্ত্তী একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। সেই ঘটনাটী এই যে, আঁ হজরত (ছালঃ) হেজরতের এক বৎসর পূর্ব্বে মদীনার অধিবাসীদিগের মধ্যে একটী 'আহদনামা' (সন্ধিপত্র) লিখাইয়া দিয়াছিলেন; তাহাতে মদীনার মোসলমান ব্যতীত য়িহুদী এবং মোশরেক-

গণও 'শরীক' ছিল ; সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দই স্বেচ্ছায় এই সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল। সকলেই এই সন্ধি-সর্ত্ত পালন করিতে আগ্রহশীল ছিল। ঐ সন্ধি-পত্রের কয়েকটী বিশেষ সর্ত্ত এই :—(১) মদীনা নগর যদি কোনও বৈদেশিক শক্তি আক্রমণ করে, তবে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে মদীনার সমুদয় অধিবাসী একত্রিত হইয়া সেই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে ; এবং সেই শত্রুর গতিরোধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইবে ; (২) মদীনার য়িহুদিগণ মক্কার কোরেশ কিংবা তাহাদের সাহায্যকারিগণকে মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে আশ্রয় দিবে না। (৩) মদীনার যে কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভুক্ত অধিবাসিগণ, তত্রত্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসিগণের জীবন ও অর্থের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। (৪) মদীনায় কোনও দুই 'ফরিক' (সম্প্রদায় বা দল) যদি পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হয়, আর নিজেরা তাহার বিচার-মীমাংসা করিতে না পারে, তবে উহার শেষ 'ফয়সলা' আঁ হজরত (ছালঃ) করিবেন—যাহা উভয় প্রতিপক্ষ দলের কেহই অমান্য করিতে পারিবে না। (৫) এই সর্ত্ত ও উহাতে ছিল যে, যুদ্ধের ব্যয় বহন এবং সর্ব্বপ্রকার হিতজনক কার্য্যের খরচবরদারি মদীনার সমগ্র অধিবাসী সমান ভাবে প্রদান করিবে। যে সম্প্রদায়, দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে মদীনাবাসী য়িহুদীদিগের 'মওয়াহেদা' (সন্ধি-বন্ধন) আছে, আর ঐ য়িহুদিগণ মদীনাবাসীর বন্ধু বলিয়া পরিগণিত, মদীনার মোসলমান-গণ উহাদিগকে ও বন্ধু বলিয়া মনে করিবেন ; এবং বন্ধুর ন্যায় তাহাদিগকে 'রেয়ায়েত' করিবেন। এইরূপে যে কবীলা (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী) মোসলমানদিগের বন্ধু, মদীনার য়িহুদিগণ তাহাদের সঙ্গেও বন্ধুবৎ ব্যবহার করিবে। মদীনা শহরের মধ্যে 'খুন-খারাবী' করা হারাম (সম্পূর্ণ-নিষিদ্ধ) বলিয়া পরিগণিত হইবে। উৎপীড়িত লোকের সাহায্য করা সকলের পক্ষে ফরজ (অবশ্য কর্ত্তব্য) বলিয়া মনে করিতে হইবে—ইত্যাদি।

এই সন্ধিটীকে পাকাপাকি করিবার পরেই হজরত রেছালিতমাব (ছালঃ) বিশেষ ভাবে চেষ্টা পাইলেন যে, মদীনার চতুর্দ্দিকে যে সকল পল্লী আছে, ঐ সকলের অধিবাসীদিগকেও এই সন্ধি-বন্ধনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে সর্ব্বপ্রকার অশান্তি ও শোণিতপাত একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তদনুসারে তিনি 'দোদ্দান' পর্য্যন্ত (যে স্থান মক্কা ও মদীনার মধ্যপথে অবস্থিত), এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'সফর' ফরমাইলেন এবং কবীলা (সম্প্রদায়)-বনিঃ হামযাঃ-বিন্-বকর-বিন্ আব্‌দে মনাফ্-কে এই সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া ঐ সম্প্রদায়ের 'ছরদার' (দলপতি) ওমরু-বিন্-মখ্‌শী দ্বারা ঐ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাইলেন। ফোহ্ বুত্যাত-এর অধিবাসীদিগকেও এই সন্ধি-বন্ধনে 'শরীক' (অংশী) করিলেন। লোহিত সাগরো-কূলবর্ত্তী ইয়াম্বুর দিকে যি আল-য়াসিরত নামক স্থানে তিনি তশরিফ্ লইয়া গেলেন। আর বনি মদলজদিগের দ্বারাও এই সন্ধি-পত্রে 'দস্তখত' (স্বাক্ষর) করাইলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনা মন্থওরায় পঁহুছিয়াই এইরূপ যত্ন-চেষ্টা করিলেন যে, সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে যেন সম্পূর্ণ শান্তির প্রতিষ্ঠা হয়; এবং সাধারণের হিতজনক কার্য্যের 'তরক্কি' (উন্নতি) সাধন হইতে পারে; সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা দীন এস্‌লাম-কে ভালরূপে বুঝি-বার, উহার গভীর তত্ত্ব গ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করে। এই মাত্র উপরোক্ত অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল, আর মদীনার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী জনপদসমূহের সকল অধিবাসী সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইতেও পারিয়াছিল না, এই সময় মধ্যে মদীনা শহরে 'খুফিয়াঃ' (গুপ্ত বা গোপনীয়) ও মদীনার বহির্ভাগে প্রকাশ্যভাবে শত্রুগণ আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিল।

মদীনা নগরে আবদুল্লা-বিন্-আবি-বিন্-সলুল নামক একজন অতি বুদ্ধিমান্, বহুদর্শী, 'হোশিয়ার', সুচতুর রাজনীতিবিদ্ ব্যক্তি ছিল। আওস্ ও খয্‌রজ সম্প্রদায়ের সকল লোকের উপরই তাহার বিশেষ প্রভাব

দৃষ্ট হইত। লোকেরা ইহার নেতৃত্ব বিনা বাক্য-ব্যয়ে মানিয়া লইত। আওস্ ও খয্‌রজ সম্প্রদায়ের লোকেরা ইতিপূর্ব্বে এক গৃহ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনাদের বহু বীরপুরুষের মাথা কাটাইয়া, বিলক্ষণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আবদুল্লা-বিন্-আবি এই সুযোগে নিজের বিলক্ষণ স্বার্থ সাধন করিয়া লইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীয় প্রভাব খুব বদ্ধমূল করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে মদীনাবাসিগণ সঙ্কল্প করিয়াছিল, আবদুল্লা বিন্-আবিকে আপনাদের সর্ব্বপ্রধান দলপতি কিংবা বাদশাহ নির্ব্বাচন করিবে। আর একটী বিরাট জন-সভা আহ্বান করিয়া উহাতে 'বা-কায়দা' (যথা নিয়মে) আবদুল্লা-বিন্-আবিকে ছরদার—সর্ব্বপ্রধান দলপতি বা রাষ্ট্রপতি বলিয়া ঘোষণা করিবে। এমন কি, আবদুল্লার জন্য একটী 'তাজ' (মুকুট) ও তৈয়ার করা হইয়াছিল। ইতি-মধ্যে মদীনায় ইস্‌লামের জলন্ত রশ্মি বিকীর্ণ হইল; এবং ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহ্ তা-লার একত্ব বিঘোষক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্‌মদ মোজ্‌তবা (ছালঃ) মদীনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হজরত 'ছারওয়ারে কায়েনাত' (ছালঃ) মদীনায় প্রবেশ করিলে, মোসলমানদিগের শক্তিই মদীনায় প্রবল বলিয়া প্রতিভাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মোসলমানদিগের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব, পূর্ব্বোক্ত 'আহদ নামায়' (সন্ধি-পত্রে) স্বাক্ষরিত হওয়ায়, মোসলমানদিগের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠালাভ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহমাত্র রহিল না। সমগ্র মদীনায় ইস্‌লামের জয়-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। ইস্‌লাম-সূর্য্যের আবির্ভাবে অজ্ঞান-তিমিররাশি তিরোহিত হইল। অধর্ম্ম রূপ কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গেল। মদীনার অধিবাসিগণ ক্রমশঃ সত্যধর্ম্ম ইস্‌লামের দিকে আকৃষ্ট হইয়া, সাগ্রহে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, আবদুল্লা বিন্-আবি ইব্‌নে-সোলুলের উচ্চ আশা-উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, সমস্তই ঘোর নৈরাশ্যে পরিণত হইল। উহার বাদশাহী,

উহার ছরদারী বা একাধিপত্যের কল্পনা মাটিতে মিশাইয়া গেল। কিন্তু লোকটি অতি বুদ্ধিমান্, অতি চালাক, অতি চালবাজ এবং 'হোশিয়ার' ছিল; এজন্য আঁ হজরত (ছালঃ)-কে যদিও সে আপনার প্রতিদ্বন্দী ও শত্রু মনে করিত, কিন্তু ঐ দোষণীয় ভাব প্রকাশ করা ক্ষতিজনক মনে করিয়া প্রকৃত মনের ভাব ও গূঢ় উদ্দেশ্য গোপন রাখিল। আওস্ ও খয্রজ দলের মধ্যে এখনও যে সকল লোক 'বোত-পরস্ত্' (পৌত্তলিক) ছিল; উহারা সকলেই আবদুল্লা-বিন্-আবির আনুগত্য ও প্রধান্য স্বীকার করিত। মক্কার কোরেশগণ যখন জানিতে পারিল যে, আঁ হজরত (ছালঃ-আম) এবং তাঁহার বন্ধু বা অনুগামিগণ মদীনায় গিয়া নিশ্চিন্তে ও নিরুদ্বেগে দিনাতিপাত করিতেছেন, আর ইস্লাম ধর্ম্মের সীমা-রেখা শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত করিয়া লইতেছেন, তখন তাহারা সর্ব্ব প্রথমে 'এই শরারৎ' (বদমাসী বা দাগাবাজী) এবং শয়তানী 'সাজেস্' (ষড়যন্ত্র) করিল যে, আবদুল্লা-বিন্-আবি ও মদীনার মোশ্রেক (অংশিবাদী বা পৌত্তলিক)-দিগের নিকট এই বলিয়া এক অনুযোগ-সূচক পত্র লিখিয়া পাঠাইল যে, তোমরা আমাদের লোকদিগকে আমাদের 'মরজির খেলাফ্' (মতের বিরুদ্ধে) আপনাদের নগরে বসবাস করিতে দিয়াছ; তোমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য এই যে, তোমরা উহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ কর; এবং উহাদিগকে তোমাদের শহর হইতে বাহির করিয়া (বিতাড়িত করিয়া) দাও। যদি তোমরা এই কার্য্য না কর, তবে আমরা পূর্ণ সাজ-সজ্জার সঙ্গে ভীষণভাবে মদীনা আক্রমণ করিয়া, তোমাদের 'জওয়ান' (যুবক বা বীর পুরুষ)-দিগকে হত্যা করিব। তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আমরা হস্তগত করিব। এই 'পয়গাম' (সংবাদ) পঁহুছামাত্র আবদুল্লা-বিন্-আবি সমুদয় মোশ্রেকিন (পৌত্তলিক)-কে ডাকাইল; এবং মক্কার কোরেশ বেদীন ও অন্যান্য কোফ্ফারদিগের 'পয়গাম' তাহাদিগকে অবগত করাইল, সঙ্গে সঙ্গে সকলকে

যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত, উত্তেজিত ও বাধ্য করিল। সৌভাগ্যের বিষয়, আঁ হজরত (ছাল) এই 'মজলেছ' (সভা) আহ্বান ও ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিলেন। তিনি সংবাদ পাওয়া মাত্র সেই সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন; আর সমবেত জন-সঙ্ঘকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মক্কার কোরেশগণ তোমাদিগকে 'ধোকা' দিতে চাহিতেছে। যদি তোমরা তাহাদের ধমক (ভীতি-প্রদর্শন) ও ধোকায় পড়িয়া যাও, তবে তোমরা বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তোমাদের পক্ষে এই উপায় অবলম্বন করা প্রশস্ততর যে, তোমরা উহাদিগকে পরিষ্কার ভাবে প্রতিকূল উত্তর দাও, এবং আমার সঙ্গে যে সন্ধি-বন্ধন হইয়াছে, তাহাতে অটল থাক; এরূপ করিলে কোরেশগণ মদীনা আক্রমণ করিলে তাহাদের সম্মুখীন হওয়া ও যুদ্ধ করা খুব সহজ কার্য্য হইয়া দাঁড়াইবে; কারণ আমাদের সঙ্গে যে সকল সম্প্রদায় ও যে সকল দল সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা আমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া উহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে। কিন্তু যদি তোমরা মোসলমান-দিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তবে স্বহস্তে আপনাদের পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজনকেই হত্যা করিবে; সঙ্গে সঙ্গে তোমরা শোচনীয়ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। আঁ হজরতের (ছালঃ) এই যুক্তিপূর্ণ উক্তি শুনিয়া সমবেত জন-মণ্ডলী তাহাতে অনুমোদন করিল, সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিপুল জন-সঙ্ঘ ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া গেল। আবদুল্লা-বিন্-আবি এই ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া রহিয়া গেল। স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল দেখিয়া সে দারুণ মনোবেদনা পাইল।

এই বৎসরেই মুসল্লিদিগকে মসজেদে আহ্বান করিবার জন্য আযানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল। এই বৎসরেই য়িহুদীদিগের একজন বিখ্যাত আলেম (ধর্ম্ম-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত) হজরত আবদুল্লা-বিন্-ছালাম (রাজিঃ) পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। আবার এই বৎসরেই হজরত সল্‌মান

ফারছী—যিনি প্রথমে আতশ্‌পস্ত্‌ (অগ্নুপাসক) ছিলেন, পরে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক য়িহুদী ও খৃষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং তওরাত ও ইঞ্জিলে শেষ তত্ত্ববাহক আঁ হজরতের (ছালঃ) আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—হজরত রছুল আক্‌রমের (ছালঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া ভক্তি-প্রবণ হৃদয়ে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। আর এই বৎসরেই 'যাকাত' ফরজ হয়।

হেজরতের দ্বিতীয় বৎসর।

আঁ হজরত (ছালঃ) যখন সদলবলে নিরুদ্বেগে, অক্ষতভাবে মদীনায় চলিয়া যাইতে সক্ষম হইলেন, এবং সেখানে গিয়া ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন, তখন কোরেশগণ আপনাদিগকে পরাজিত ও অকৃত-কার্য্য মনে করিতে লাগিল। এক্ষণে তাহাদের 'সমগ্র কোশেশ্‌' (যত্ন-চেষ্টা), সমস্ত উৎসাহ-উত্তেজনা, সমুদয় বাঞ্ছা-অভিলাষ মোসলমানদিগের নিকট হইতে প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। অন্য খেয়াল, অন্য চিন্তা, অন্য কল্পনা-জল্পনা তাহাদের মনে স্থান লাভ করিতেছিল না। আঁ হজরত (ছালঃ) এবং মোসলমানদিগকে হত্যা করা, ধ্বংস করার যোগাড়-যন্ত্র ও প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করা, মক্কাবাসী সমুদয় কোরেশ, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছিল। তাহাদের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের মধ্যে এই কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এজন্য তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে মনোবাদ ও মনোমালিন্য ছিল, তাহাও দূর করিয়াছিল। সমগ্র কওম (জাতি বা সম্প্রদায়) তাহাদের সমগ্র শক্তি এই একই কার্য্যে বিনিয়োগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। মক্কা ও মদীনার দূরত্ব ৩০০ মাইলের

কম ছিল না। সুতরাং, এতটা দূরে অভিযান করিতে হইলে তদুপযোগী সাজ-সজ্জা, অস্ত্র-শস্ত্র, উষ্ট্র-অশ্বতর ও অশ্ব প্রভৃতি পশুর দল এবং উপযুক্ত পরিমাণ রসদের যোগাড় করাও আবশ্যক ছিল। পথিমধ্যে যে সকল জাতির বাস, তাহাদিগকে এবং আরবের অন্যান্য জাতিকে আপনাদের সাহায্যকারী, কমপক্ষে সহানুভূতি সম্পন্ন করারও একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই ভাবী 'খতরাঃ' (আশঙ্কা) সম্বন্ধে হজরত (ছালঃ) ও একজন সুপরিপক্ক ছরদার (দলপতি) এবং ভবিষ্যদ্দর্শী সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায় দৃঢ়ভাবে উক্তি ফরমাইয়াছিলেন। খোদা তা-লা হইতে আত্মরক্ষা, 'খোদ-এখ্‌তেয়ারি' (স্বাধীনতা) ও শত্রুর গতিরোধের আদেশ-পূর্ণ আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল। দিন এস্‌লামের প্রচার ও বিস্তৃতি, দিন-এস্‌লামে প্রবেশকারীদিগের রাস্তায় অন্যায় রূপে প্রতিবন্ধকতা দূর করাও একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সময় মদীনা শরীফে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী পুরুষের সংখ্যা তিন চারি শতের অধিক ছিল না। মোসলমানগণ যদিও সংখ্যায় এবং অস্ত্র শস্ত্রে অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন, কিন্তু কাফেরদিগের 'ফেরেব—ফন্দী' 'দাগাবাজী' ও অত্যাচার-উপদ্রব দেখিয়া, তাঁহাদের আরবীয় সাহস ও 'সোজায়েত' (শৌর্য্য-বীর্য্য) উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। আর তাঁহারা পুনঃ পুনঃ কাফেরদিগের সম্মুখীন হইতে এবং তরবারি ও তীর দ্বারা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য হজরত রেছালতমাবের (ছালঃ) অনুমতি প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু আঁ হজরত (ছালঃ) সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে এবং 'খামুশ (নীরব) থাকিতে উপদেশ প্রদান করিতেন। এক্ষণে যখন জীবন্ত ইস্‌লাম ধর্ম্মের—ঈমানের শক্তি, পূর্ণভাবে প্রমাণিত হইল, আর মোসলমানগণ সর্ব্বপ্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতা, বিঘ্ন-বিপদ সহ্য করিয়া দুনিয়ার (পৃথিবীর) সম্মুখে এই 'ছবুত' (প্রমাণ) উপস্থাপিত করিলেন যে, যাঁহারা এস্‌লামে আসক্ত ও অনুরক্ত, তাঁহারা কোনও প্রকার

'খওফ (ভয়) ও 'লালচ্ (প্রলোভন) এর সঙ্গে কোনও রূপ সম্বন্ধ রাখে না। তদনুসারে ঐ সময় দুষ্ট লোকদিগকে শাস্তি প্রদান ও আপনাদের হেফাযৎ আপনাদিগকে করিবার জন্য আল্লাহ তা-লার আদেশ অবতীর্ণ হইল। তাহা হইলেও ঘটনার ধারাবাহিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইতে সন্ধিকে, এবং প্রতিশোধ গ্রহণাপেক্ষা অত্যাচার সহ্য করাকে 'পছন্দ' করিতেন।

করয্-বিন্-জাবের নামক মক্কার এক কাফের ছরদার (নেতা) একদা একদল লোক লইয়া মক্কা হইতে মদীনা মনুওরার পার্শ্ববর্ত্তী এক চেরাগাঃ (পশু চারণ ভূমি) আক্রমণ পূর্ব্বক, মোসলমানদিগের বহুসংখ্যক উষ্ট্র ধরিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। মোসলমানগণ যখন এই 'ছাপ্পা মারার' (পশু ধরিয়া লইয়া যাইবার) সংবাদ পাইলেন, তখন ঐ লুঠকারিদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া "ছফ্ওয়ান" নামক স্থান পর্য্যন্ত গমন করিলেন; কিন্তু উহারা খুব দ্রুতগতি পলায়ন করিয়াছিল; এজন্য তাহাদিগকে ধরিতে না পারিয়া অগত্যা ফিরিয়া চলিয়া আসিলেন। ইহা মক্কাবাসিদিগের পরিষ্কার ও খোলাখুলি ধম্কি (ভীতি-প্রদর্শন) এবং মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা ছিল। তাহারা মদীনাবাশাদিগকে ইহা জানাইয়া বা বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, আমরা সুদীর্ঘ ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক তোমাদের পশুপাল কিংবা অন্যান্য 'মাল-আস্বাব' (সামগ্রী-সম্ভার) লুণ্ঠন করিয়া আনিতে পারি। তদ্ব্যতীত অন্য 'তদ্বির' (যোগাড়) হইতে ও তাহারা 'গাফেল' নিশ্চেষ্ট ছিল না। উহারা একদিকে আবদুল্লা-বিন্-আবি ও মদীনাবাসী য়িহুদীদিগের সঙ্গে সর্ব্বদা পত্র-ব্যবহার করিতেছিল। আর তাহাদিগকে ভিতরে ভিতরে মোসলমানদিগের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এই বৎসরই শা'বান মাসে খোদা তা-লার পক্ষ

হইতে কেব্‌লার (কাবাভিমুখীন হইয়া নমাজ পড়ার) আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল। আর ইহার কয়েক দিন পরে, শ'বান মাস শেষ হইতে না হইতে রমজানের রোজা ফরজ হইল বলিয়া আদেশ 'নাযেল' হইল। রমজানের প্রারম্ভেই এই সংবাদ মদীনা মনুওরায় পঁহুছিল যে, মক্কা-'ওয়ালা'-দিগের এক 'কাফেলা' (বণিক্ দল) বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া শাম (সিরিয়া) প্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। সেই কাফেলা মদীনা নগরের নিকট দিয়াই চলিয়া যাইবে। আঁ হজরত (ছালঃ) মক্কাবাসী মোশ্‌রেক-দিগের উপর 'দাবাও ডালিবার' (প্রভাব বিস্তার) জন্য, এবং করয্‌-বিন্ জাবেরের পশুপাল লুঠিয়া লইবার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ মহাজেরিন ও আন্‌ছারদিগের একদল যোদ্ধপুরুষ এই উদ্দেশ্যে পাঠাইলেন, যেন তাঁহারা মক্কাবাসীদিগের ঐ কাফেলা অবরোধ করে। উদ্দেশ্য এই যে, মক্কার পৌত্তলিকগণ বুঝুক, মদীনাবাসিদিগের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ করা উহাদের বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি-জনক; এবং তদ্দ্বারা তাহাদের সিরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এই মোস্‌লেম-যোদ্ধপুরুষ-দিগকে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পাঠান হইয়াছিল না; বরং উদ্দেশ্য ভীতি-প্রদর্শন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্কীকরণ ছিল। এজন্য তাঁহাদিগকে প্রেরণকালে সামরিক সাজ-সজ্জার ও কোন বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল না। ফল এই হইল যে, মক্কা-ওয়ালাদিগের কাফেলা, মোসলমানদিগের এই যোদ্ধ দল রওয়ানা হইবার সংবাদ তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিল; এবং কাফেলার আমীর অর্থাৎ দলপতি আবু স্থফিয়ান, রাস্তা পরিবর্ত্তন করিয়া আপনার কাফেলা বাঁচাইয়া ভিন্ন পথে চলিয়া গেল। সে পথিমধ্যে যম্‌যম্‌-বিন্‌-ওমরু গফ্‌ফারিকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া মক্কায় কোরেশদিগের নিকট প্রেরণ করিল, এবং বলিয়া পাঠাইল, আমাদিগের কাফেলা মোসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা; স্থতরাং আমাদিগকে সাহায্য করিতে

অগ্রসর হও, এবং আপনাদের বাণিজ্য দ্রব্যগুলি রক্ষা কর। যম্‌যম্‌-বিন্‌ ওমরু-গফ্‌ফারি দ্রুতগতি মক্কায় গমন পূর্ব্বক এই সংবাদ প্রদান করিল। সংবাদ পাইবামাত্র কোরেশদিগের অন্যতম নেতা ও মোসলমানদিগের পরম শত্রু আবুজহল তাড়াতাড়ি প্রায় ১০০০ এক হাজার পরাক্রান্ত যোদ্ধপুরুষ—যাহার মধ্যে ৩০০ অশ্বারোহী ও ৭০০ উষ্ট্রারোহী সৈন্য ছিল) লইয়া বড়ই 'জোশখরুশ' (উৎসাহ-উত্তেজনা ও আড়ম্বর)-এর সহিত মক্কা হইতে বাহির হইল; এই সকল যোদ্ধা তৎকালোচিত সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত এবং সকলেই 'যরাহ্‌-পোষ' (লৌহ-বর্ম্মাবৃত) ছিল। গানেওয়ালা (রণ-সঙ্গীত গায়ক) ও সংবাদ-পাঠক এক এক দল লোকও তাহারা সঙ্গে লইয়াছিল। আব্বাস্‌-বিন্‌-আবদুল মোত্তালেব, ওক্‌বাঃ-বিন্‌-রাবিয়াঃ, ওম্মিয়া-বিন্‌খলফ্‌, নবর বিন্‌-হারেছ, আবুজহল বিন্‌-হেশাম প্রভৃতি তের জন লোক এই প্রবল বাহিনীর খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত কারক ও সরবরাহকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। অবশ্য অন্যান্য পরিচারক ও ক্রীতদাসগণ তাহাদের সাহায্য করিত। ইতিমধ্যে আবু সুফিয়ানের পরিচালিত তেজারতি কাফেলা নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া গেল, তাহাদিগকে ভীতি-প্রদর্শন জন্য যে সকল মহোজ্জেরিন ও আন্‌ছার মদীনার বাহিরে গিয়াছিলেন, তাঁহারাও নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আবুজহলের মক্কা পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই আবুসুফিয়ান মক্কায় উপস্থিত হয়; এবং তাড়াতাড়ি আবুজহলকে সংবাদ পাঠায় যে, আমরা নির্ব্বিঘ্নে মক্কায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি, তোমরা শীঘ্র ফিরিয়া চলিয়া আইস। কিন্তু আবু-জহল স্বীয় পরাক্রান্ত বাহিনীর প্রতি নির্ভর করিয়া, অহঙ্কারে এমনই মত্ত হইয়াছিল যে, তাহার একথা 'গওয়ারাঃ' (মনঃপুত) হইল না যে, এত বড় প্রবল পরাক্রান্ত সেনাদল লইয়া, মদীনাস্থ মোসলমানদিগকে

সম্পূর্ণ নির্য্যাতিত না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। প্রকৃত পক্ষে আবুজহল কেবলমাত্র কাফেলা রক্ষার্থেই এরূপ সুসজ্জিত প্রবল বাহিনী লইয়া মদীনাভিমুখে গমন করিয়াছিল না; বরং ইত্যগ্রে ওমরু-বিন্‌হয্‌রমি নামক এক ব্যক্তিকে, কোরেশদিগের শত্রু কতিপয় মোসলমান হত্যা করিয়াছিলেন; এই ব্যক্তি কোরেশদিগের গুপ্তচর রূপে মদীনার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; এই সংবাদ পাইয়াও হজরত (ছালঃ) কতিপয় মোসলমানকে ঐ গুপ্তচরকে ধৃত বা বিতাড়িত করিবার জন্য "বতন-নখ্‌লার" দিকে পাঠাইয়াছিলেন; তাঁহাদের হস্তেই ঐ ব্যক্তি নিহত হয়; আবুজহল ঐ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার 'বাহানায়' যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল। আর সে যখন মদীনা আক্রমণ করিবার জন্য রওয়ানাই হইতেছিল, ঠিক ঐ সময়ে যম্‌যম্‌-বিন্‌-ওমরু গফ্‌ফারি, কাফেলাওয়ালা দিগের পক্ষ হইতে সাহায্য প্রার্থনার সংবাদ লইয়া মক্কায় পঁহুছিল। এক্ষণে আবুজহল—যে ব্যক্তি প্রথম হইতেই মদীনার মোসলমানদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল—দ্রুতগতি সসৈন্যে মদিনাভিমুখে ধাবিত হইল। সে সসৈন্যে কুচ করিতে করিতে দ্রুত-গতি মদীনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কোরেশদিগের এই প্রবল অভিযানের সংবাদ হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) জানিতে পারিলেন, এবং ইহাও অবগত হইলেন যে, আবুজহল, ওকবাঃ, শয়েবাঃ, অলিদ, হন্‌যলাঃ, ওবিদাঃ, ওছি, হরছ, তায়েমাঃ, যমআ, আকিল, আবুল নজতরি, মস্‌য়ুদ, আবু কায়েস্‌, মনবীয়াঃ, মনবাঃ, নওফল, ছায়েব, রফায়া প্রভৃতি সমুদয় বড় বড় ছরদার (দলপতি) কোরেশদিগের ঐ সেনাদলের সঙ্গে আছে।

বদরের মহাযুদ্ধ।

হজরত (ছালঃ) এই সংবাদ পাইবামাত্র এক পরামর্শ-সভা আহ্বান করিলেন ; এবং সেই সভায় ছাহাবায়-কারাম (রাজিঃ) দিগকে লক্ষ্য করিয়া ফরমাইলেন, মক্কা আপনার হৃৎপিণ্ড স্বরূপ বাছা বাছা বীরপুরুষদিগকে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছে ; তাহাদের সঙ্গে 'মোকাবেলা' (যুদ্ধ) করা সম্বন্ধে তোমাদের কি মত ? সর্ব্বপ্রথমে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ), পরে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), তৎপর হজরত মেকদাদ (রাজিঃ) অত্যন্ত বীরত্ব-ব্যঞ্জক ও 'বাহাদুরী'-মূলক বাক্য প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, আমরা বনি এস্রাইলদিগের মতন নহি ; যাহারা মুসা আলায়হেস্ সালামকে বলিয়াছিল যে,"ফায্হাব আন্তা ও রাব্বোকা ফাকাতেলা ইন্না হা হাহুনা কায়েদুন " তুমি ও তোমার রব (প্রভু—আল্লাহ্ তা-লা) গিয়া যুদ্ধ কর, আমরা ত এখানে বসিয়া তামাসা দেখিব। ইহার পর হজরত রেছালতমাব্ (ছালঃ) আবার ফরমাইলেন, হে লোক সকল, ঐ কোফ্ফারদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে তোমরা কি পরামর্শ দান কর ? এই দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করার তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে, আন্ছারদিগের অভিপ্রায়ও ত জানা আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত মত ত কেবলমাত্র তিনজন মহাজেরিনই প্রকাশ করিয়াছিলেন। আন্ছারগণ হইতে যে বিষয়ে বায়্য়েত গ্রহণ করা হইয়াছিল, উহার মর্ম্ম এই ছিল যে, মদীনার উপর যখন কোনও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইবে, তখন সেই শত্রুর সঙ্গে তাঁহারা যুদ্ধ করিবেন ; এরূপ সর্ত্ত ছিল না যে, মদীনা হইতে বাহির হইয়া কোনও শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে। আন্ছারগণ হজরতের (ছালঃ) উক্তির মর্ম্ম তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন। তদনুসারে তাঁহাদের মধ্য হইতে হজরত ছায়াদ-বিন্-মায়ায্ (রাজিঃ) দণ্ডায়মান হইয়া আরজ করিলেন, হুজুর সম্ভবতঃ আমাদিগকে

লক্ষ্য করিয়াই শেষোক্ত উক্তি করিয়াছেন; হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, হাঁ, তোমাদের মতামত জানিবার জন্যই আমি ঐ কথা বলিয়াছি। তখন হজরত ছায়াদ-বিন্-মায়াব্ (রাজিঃ) আবার দাঁড়াইয়া বলিলেন, এয়া রছুলোল্লাহ্! আমরা আপনার উপর ঈমান আনিয়াছি; আপনাকে খোদার রছুল বলিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেছি, এরূপ ক্ষেত্রে ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে যে, খোদার রছুল কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবেন, আর আমরা ঘরে বসিয়া থাকিব? এই কাফেরগণ ত আমাদের মতনই মানুষ; আমরা কেন উহাদিগকে ভয় করিব? আপনি যদি আমাদিগকে আদেশ করেন যে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়, আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালন করিব। যখন হজরত (ছালঃ) এর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, সমুদয় ছাহাবা (রাজিঃ) শত্রুদলের সম্মুখীন হইবার জন্য এবং তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত ও প্রস্তুত, তখন তিনি মদীনা হইতে যুদ্ধার্থ রওয়ানা হইবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার এবং যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত লোকের সংখ্যা তিনশত দশ, তিনশত বার, কিংবা তিনশত তের জন মাত্র ছিল। নগরের বহির্ভাগে গিয়া তিনি একস্থানে এই মোস্‌লেম যোদ্ধ-দলের সংখ্যা গণনা করিলেন; তাহাতে সেই তিনশত দশ বার বা তের জনের মধ্যে কয়েকজন অপরিণত বয়স্ক বালক বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা এত অল্প বয়স্ক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার উপযুক্ত নহে। হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) উহাদিগকে নিতান্ত তরুণ বয়স্ক দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, তন্মধ্যে কতিপয় বালক বা একেবারে তরুণ যুবক যুদ্ধে যাইবার জন্য একান্ত উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া হুজুরে অনুমতি প্রার্থনা করাতে, অগত্যা তাঁহাদিগকে সৈন্যদলে থাকিতে দেওয়া হইল; অবশিষ্ট কতিপয় বালক গৃহে ফিরিয়া গেল। এই ইস্‌লামী

সৈন্যদলের সাজ-সজ্জা এইরূপ ছিল—তুইটী মাত্র অশ্ব, তাহার একটীতে হজরত যোবের (রাজিঃ) আর একটীতে হজরত মেকদাদ (রাজিঃ) আরোহণ করিয়াছিলেন। সত্তরটী উট ছিল, প্রত্যেক উটে ৩ জন ৪ জন করিয়া যোদ্ধপুরুষ আরূঢ় ছিলেন। যে উষ্ট্রে হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) আরোহণ করিয়া ছিলেন, উহাতেও আর তুইজন আরোহী ছিলেন। তদ্ব্যতীত কেহ কেহ পদব্রজেও গমন করিতে-ছিলেন। এই ক্ষুদ্র সৈন্যদল "বদর" নামক স্থানে পঁহুছিয়া দেখিতে পাইলেন, মক্কার কোফ্‌ফারগণ প্রথম হইতে এক উচ্চ ভূ-খণ্ড অধিকার করিয়া তাহাতে তাম্বু ফেলিয়া বাস করিতেছে। কাজেই মোসলমানদিগকে বালুকাময় নিম্ন-ভূমিতে অবস্থান-স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইল। কিন্তু বদরে যে সকল চশ্‌মাঃ (ঝরণা বা নির্ঝরিণী) ছিল, তাহা মোসলমান-দিগের অধিকারে আসিয়া গেল। হজরত (ছালঃ) আদেশ প্রচার করিলেন, শত্রুপক্ষের লোকেরা চশ্‌মাঃ হইতে পানী লইতে আসিলে তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিবে না ; অবাধে পানী লইয়া যাইতে দিবে। ছাহাবা (রাজিঃ)-গণ হজরত (ছালঃ)-এর অবস্থান জন্য একটী ক্ষুদ্র 'ঝুপড়ি' (কুটীর বা পর্ণশালা) প্রস্তুত করিয়া দিলেন! তিনি তাহাতে বসিয়া এবাদৎ এবং প্রার্থনা করিতেন। ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-গণ সংখ্যায় কোরেশদিগের এক তৃতীয়াংশ মাত্র ছিলেন। আর তাঁহাদের যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম কোরেশদিগের একশত ভাগের একভাগও ছিল না। কোফ্‌ফার-দিগের সকলেই দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ, নামজাদা বীরপুরুষ এবং যরাঃপোষ (বর্ম্মাবৃত) ছিল। মোসলমানগণ সাধারণতঃ 'ফাকাঃখাদাঃ' (ক্ষুধাতুর), 'না তোয়ান,' রুগ্ন ও তুর্ব্বল ছিলেন। সাধারণ যুদ্ধাস্ত্র ও পূর্ণভাবে তাঁহাদের নিকট ছিল না। কাহারও নিকট তলোয়ার ছিল ত নেযাঃ (বল্লম বা বড়শা) কিংবা তীর-ধনুক ছিল না ; কাহারও নিকট কেবলমাত্র তীর ধনুক ছিল, কিন্তু

তরবারি বা নেজা ছিল না। পক্ষান্তরে 'কোফ্‌ফার' কোরেশগণ সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। তাহাদের কোনও প্রকার অস্ত্রেরই অভাব ছিল না। তাহাদের বলবান্ অশ্বগুলি আরবের উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উষ্ট্র সংখ্যায় যেমন অধিক, তেমনই সবল ও তেজোগামী ছিল। যখন মোসলমানগণ বদরের এক প্রান্তে শিবির সন্নিবেশ করিলেন, সেই সময় কোফ্‌ফারগণ মোস্‌লেম সেনাদলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও সংখ্যা নির্ণয় জন্য য়মির-বিন্‌-দহব জমহিকে গুপ্তচর রূপে প্রেরণ করিল। য়মির গুপ্তচররূপে মোসলমান যোদ্ধগণের অবস্থা ও সংখ্যা নির্ণয় করিয়া গিয়া বলিল, মোসলমানদিগের সংখ্যা ৩ শত ১০ জনের অধিক নহে, আর তাহাদের মধ্যে ২ জন মাত্র অশ্বারোহী। কাফেরদিগের অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার পরিমাণ ইহা দ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে যে, মোসলমান সৈন্য-সংখ্যার অল্পতা ও যুদ্ধ-সরঞ্জামের অভাবের বিষয় অবগত হইয়া ওক্‌বাঃ-বিন্‌-রবিয়াঃ বলিয়া উঠিল, এত অল্পসংখ্যক লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দরকার নাই, আমাদিগের বিনা যুদ্ধেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিত; কারণ আমাদের সংখ্যা অনেক অধিক। কিন্তু আবুজেহল উহার প্রতিবাদ করিয়া কহিল, উহাদের অস্তিত্ব নিঃশেষ করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। অবশেষে আগামী দিবস ১৭ই রমজান অল্‌-মবারক (২য় হিজরীতে) যুদ্ধক্ষেত্র গরম হইল—উভয় দলে পরস্পর যুদ্ধারম্ভ হইয়া গেল। আঁ হজরত (ছালঃ) প্রথমতঃ নিজের সেই ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন, আর ক্রন্দন করিতে করিতে আল্লাহ্‌ তায়ালার মহাদরবারে এই 'দোওয়া' (প্রার্থনা) ও 'আরজ' (বিনীত নিবেদন) করিতে লাগিলেন :—হে দয়াময় করুণা সিন্ধু-আল্লাহ্‌ তা-লা যদি তুমি এই ক্ষুদ্র দলটীর ধ্বংস সাধন কর, তবে পৃথিবীতে তোমার 'এবাদত' (উপাসনা) করিবার জন্য কেহই (অবশিষ্ট) থাকিবে না। তৎপর তিনি দুই রেকায়াত নমাজ পড়িলেন।

অতঃপর অল্পক্ষণের জন্য তাঁহার ভাবাবেশ হইল। ইহার পর তিনি মুচ্‌কি হাসির সঙ্গে সেই কুটীর হইতে বাহির হইলেন; এবং প্রফুল্ল ভাবে ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ)-দিগের নিকট ফরমাইলেন, যুদ্ধে কোফ্‌ফার সৈন্যদিগের পরাজয় ঘটিবে; আর তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পুর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে।

আঁ হজরত (ছালঃ) মোসলমানদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তোমরা প্রথমে যুদ্ধারম্ভ করিবে না। মোসলমানদিগের মধ্যে ৮০ হইতে ৮৩ জন পর্য্যন্ত মহাজেরিন, অবশিষ্ট সকলেই আন্‌ছার ছিলেন। আবার আন্‌ছারদিগের মধ্যে ৬১ জন ছিলেন আওস সম্প্রদায় ভুক্ত। আর খয্‌রজ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন ১৭০ জন। দুই দলের সৈন্যগণই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। আঁ হজরতের (ছালঃ) হাতে একটী তীর ছিল। তিনি তদ্দ্বারা 'এশারা' (ইঙ্গিত) করিয়া স্বীয় যোদ্ধপুরুষদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতেছিলেন। ইহার পর আরবীয় যুদ্ধের নিয়মানুসারে কোফ্‌ফার দলের পক্ষ হইতে প্রথমতঃ রবিয়ার পুত্র ওত্‌বা ও শয়িয়েবাঃ এবং অলিদ-বিন্‌-ওতবাঃ সর্ব্বপ্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিল। আর মোসলমান যোদ্ধপুরুষদিগের মধ্য হইতে ৩ জনকে যুদ্ধার্থে আগমন করিবার জন্য অতি দর্প সহকারে আহ্বান করিল। ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আন্‌ছার দল হইতে য়োফ্‌ (রাজিঃ) ও মায়য়াব্‌ (রাজিঃ) নামক আদ্‌রাআর পুত্রদ্বয় এবং আবদুল্লা-বিন্‌ রওয়াহা (রাজিঃ) বাহির হইলেন। তদ্দর্শনে ওত্‌বাঃ বলিল "মান্‌-আন্‌তুম" তোমরা কে হও? উত্তরে তাঁহারা বলিলেন "নহ্‌ নুন্‌মিনাল্‌ আন্‌ছারে"—আমরা আন্‌ছার অর্থাৎ মদীনাবাসী। ওত্‌বা নিতান্ত গর্ব্বিত ও তাচ্ছিল্য ভাবে কহিল, "মালনা বেকুম মান্‌ হাজতাঃ" তোমাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। পরে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "এয়া মোহাম্মদ (ছালঃ)

আখ্‌রজালেনা আক্‌ফা আনা মিন্ কওমনা” হে মোহাম্মদ (ছালঃ) আমাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের যাত বেরাদরি (স্বজাতীয় ও স্ববংশীয়)—অর্থাৎ কোরেশদিগের মধ্য হইতে মহাজেরিনদিগকে পাঠাও। তচ্ছ্রবণে আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, ওত্‌বার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিবার জন্য হাম্‌যাঃ-বিন্-আবদুল মোত্তালেব, (রাজিঃ), ওত্‌বার ভ্রাতা শয়িবার বিরুদ্ধে ওবায়দাঃ-বিন্-আল্ হরছ (রাজিঃ), আর ওত্‌বার পুত্র অলিদের বিরুদ্ধে আলী-বিন্-আবিতালেব (রাজিঃ) গমন করুক। এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে উপরোক্ত তিনজন ছাহাবাঃ (রাজিঃ) মহোৎসাহে ও মহোল্লাসে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। ওত্‌বাঃ ইহাদের ৩ জনেরই নাম জিজ্ঞাসা করিল—যদিও সে ইহাদিগকে বিশেষ ভাবেই চিনিত। তাঁহারা স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করিলে সে বলিল, হাঁ, তোমাদের সঙ্গে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করিব। দেখিতে দেখিতে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) ও হজরত আলী (রাজিঃ)—পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র, তরবারির এক এক আঘাতেই ওত্‌বাঃ ও অলিদ—পিতা পুত্র উভয়কেই 'কতল্' (নিহত) করিয়া ফেলিলেন। শয়ীয়েবার সঙ্গে যুদ্ধে হজরত ওবেদাঃ (রাজিঃ) যখ্‌মি (আহত) হইলেন ; তিনি অতি ভীষণ ভাবে আহত হইয়াছিলেন ; সে আঘাতে তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না। অল্পকাল মধ্যেই তিনি রণক্ষেত্রে শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে খোদার শার্দ্দুল হজরত আলী (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাতে শইয়েবার মুণ্ডপাত করিলেন ; এবং হজরত ওবেদাঃ (রাজিঃ) কে আনিয়া আঁ হজরতের খেদমতে উপস্থিত করিলেন। ইহার পর কোফ্‌ফার শ্রেণীবদ্ধ ভাবে মোসলমান যোদ্ধপুরুষদিগকে আক্রমণ করিল। ওদিকে মোসলমানগণও সাধারণ ভাবে শত্রুদলকে আক্রমণ করিলেন। এক্ষণে উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় সৈন্য দল পরস্পর মিশ্রিত

হইয়া পরস্পরকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিতে লাগিল। উভয় প্রতিপক্ষ দলই বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল যুদ্ধ করিবার পর কোফ্‌ফার আপনাদের ৭০ জন বীরপুরুষকে নিহত ও ৯০ জনকে বন্দী হইবার সুযোগ প্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে আঁ হজরত (ছালঃ) একটীছত্র বা শামিয়ানার নীচে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধের অবস্থা দেখিতেছিলেন এবং 'মোজাহেদীন' (ধর্ম্মযোদ্ধা)-দিগকে আবশ্যক মত সময়োচিত আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। তিনি মোসলমানদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, বনু-হাশেমের মধ্যে যাহারা কোরেশদিগের দলে মিশিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, তাহারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করিতে আইসে নাই, তাহাদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া আসিতে হইয়াছে; সুতরাং উহাদের প্রতি 'রেয়ায়েত' (ক্ষমা) করা চাই। আর আব্বাস বিন্-আবদুল মোত্তালেবকে যেন হত্যা করা না হয়। এইরূপে আবুল বখ্‌তরি সম্বন্ধে 'দরগোযর' (দয়া প্রদর্শন) এবং 'রেয়ায়েত' করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। হজরতের এই আদেশ শুনিয়া আবু হোযায়ফাঃ (রাজিঃ) বলিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে যে, আমি আমার ভ্রাতাকে হত্যা করি, আর আব্বাসকে ছাড়িয়া দিই। যদি আব্বাস যুদ্ধে আমার সম্মুখীন হয়, আমি তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিব না। পরে এইরূপ উক্তির জন্য আবু হোযায়ফাঃ (রাজিঃ) বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন; এবং এরূপ উক্তি অন্যায় বলিয়া স্বীকার করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মখ্‌দর-বিন্-যেয়াদ (রাজিঃ) আবুল বখ্‌তরির 'মোকাবেলা' (সম্মুখীন) হইলে, মখদর (রাজিঃ) তাহাকে বলিলেন, আমাদের প্রতি আদেশ আছে, তোমার সঙ্গে যেন যুদ্ধ না করি, অতএব তুমি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও। আবুল বখ্‌তরি তাহার একজন সঙ্গীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল—যাহাকে

মখ্‌দর-বিন্‌-যেয়াদ (রাজিঃ) কত্‌ল (হত্যা) করিতে চেষ্টা পাইতে-ছিলেন; সেই উদ্যত অস্ত্রের আঘাতে আবুল বখ্‌তরি 'মক্‌তুল' (নিহত) হইল। ওম্মিয়া-বিন্‌-খলফ্‌ এবং উহার পুত্র আলী-বিন্‌-ওম্মিয়া যুদ্ধের প্রখরতা ও মোসলমানদিগের সাফল্য দর্শনে ভীত হইয়া স্ব স্ব জীবন রক্ষার জন্য রণক্ষেত্রের ইতস্ততঃ দৌড়িয়া ফিরিতেছিল, ওম্মিয়া ও হজরত আবহুর রহমান বিন্‌-য়স্নোফের (রাজিঃ) সঙ্গে ইস্‌লামের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় বড়ই বন্ধুত্ব ছিল; হজরত আবহুর রহমান-বিন্‌-য়স্নোফ্‌ (রাজিঃ) ওম্মিয়াকে বড় ব্যস্ত সমস্ত এবং ভীতও আতঙ্কিত দেখিয়া আপনার 'হেফাযতে' (তত্ত্বাবধানে) গ্রহণ করিলেন; আর ওম্মিয়ার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু হজরত বেলাল (রাজিঃ) ইহা দেখিতে পাইয়া কতিপয় আন্‌ছারকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া নিজের দিকে 'মতওজ্জ' (তাঁহার প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ) করিলেন; তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া ওম্মিয়া ও আলীকে হত্যা করিতে চাহিলেন; হজরত আবহুর রহমান বিন য়স্নোফ্‌ (রাজিঃ) তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু হজরত বেলাল (রাজিঃ), তাঁহার অনুরোধ উপরোধ কিছুতেই রক্ষা করিলেন না; পিতা-পুত্র উভয়কেই কতল করিয়া ফেলিলেন। হজরত য়মির-বিন্‌-আল্‌-হমাম আনছারি (রাজিঃ) খেজুর খাইতে খাইতে আঁ হজরতের (ছালঃ) সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আমি কাফেরদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু-মুখে পতিত হই, তবে কি তৎক্ষণাৎ জন্নতে (বেহেশ্‌তে) চলিয়া যাইব? আঁ হজরত (ছালঃ) বলিলেন, হাঁ—নিশ্চয়ই। তিনি তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত অবশিষ্ট খেজুর ফেলিয়া দিয়া, তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া, সমর-সাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন; আর শত্রুদলের সঙ্গে ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিয়া শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলেন। যখন যুদ্ধ খুব ভীষণভাবে চলিতেছিল, সেই সময় আঁ হজরত (ছালঃ) একমুষ্টি মৃত্তিকা হস্তে

লইয়া, এবং উহার উপর 'দম্' করিয়া (কিছু দোওয়া পড়িয়া) কাফেরদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, ঐ সময়ই কোরেশ সৈন্যদল পলায়ন আরম্ভ করিল। হজরত মায়ায্-বিন্-ওমরু আনছারী (রাজিঃ) নামক একজন তরুণ বয়স্ক যুবক, কোরেশ দলের প্রধান সেনাপতি সুবিখ্যাত বীর আবু জহলের সম্মুখীন হইলেন। আবুজহল যরাহপোষ (বর্ম্ম পরিহিত) ও দুর্ভেদ্য লৌহ দ্বারা বিমণ্ডিত ছিল ; হজরত মায়ায্-বিন্ ওমরু (রাজিঃ) সুযোগ পাইয়া এবং তাহার পায়ের নিম্ন-ভাগ বর্ম্মশূন্য দেখিয়া পায়ের গিরার নিম্নভাগে এমন সজোরে তরবারির আঘাত করিলেন যে, তাহার পায়ের গিরা হইতে নিম্ন-ভাগ ছিন্ন হইয়া দূরে গিয়া পড়িল ; আবু জহলের পুত্র আক্‌রমা এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়া মায়ায্-বিন্-ওমরু (রাজিঃ)-কে আক্রমণ করিল ; এবং এমন সবলে তাহার প্রতি তরবারির আঘাত করিল যে, তাঁহার বাম হাতের গোড়া (বাহুমূল) পর্য্যন্ত কাটিয়া গিয়া খানিক চামড়ায় আট্‌কাইয়া ঝুলিতে লাগিল ; হজরত মায়ায-বিন্-ওমরু (রাজিঃ) সারাদিন এই অবস্থায় যুদ্ধ করিলেন। অল্প চামড়ার দ্বারা লট্‌কানো হাতখানা যুদ্ধের বিষম প্রতিবন্ধক এবং অত্যন্ত অসুবিধাজনক বোধ হওয়াতে, তিনি হাতখানি পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া খুব জোরে ঝট্‌কা দিয়া 'আলাহেদা' (ছিন্ন) করিয়া ফেলিলেন ; এবং যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আবুজহলের ঐ অবস্থার পর মায়ায্-বিন্-য়াফ্‌রা (রাজিঃ) নামক একজন আন্‌ছার যুবক উহার নিকটে পঁহুছিয়া এমন সজোরে তরবারির এক আঘাত করিলেন যে, সে ভীষণভাবে আহত হইয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থাপন্ন হইল। যখন কাফেরগণ যুদ্ধক্ষেত্র খালি করিয়া মোসলমানদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল— মোস্‌লেম সেনাদল জয়ী হইলেন, এবং তাঁহারা বিজয়ী বেশে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকটে পঁহুছিলেন, তখন তিনি আদেশ করিলেন, আবুজহল সম্বন্ধে এই অনুসন্ধান কর যে, উহার মৃতদেহ

যুদ্ধক্ষেত্রে 'মওজুদ' আছে কিনা? এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্র হজরত আবদুল্লা-বিন্-মস্‌য়ুদ (রাজিঃ) নিহত কোরেশদিগের মৃতদেহগুলি দেখিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। আবুজহলের নিকট গিয়া দেখিলেন, সে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় ভূতলে পড়িয়া আছে। তদ্দর্শনে আবদুল্লা-বিন্-মস্‌য়ুদ (রাজিঃ) উহার প্রশস্ত বক্ষোপরি চড়িয়া বসিলেন, এবং বলিলেন, হে খোদার দোস্মণ (আল্লাহ তা-লার শত্রু) দেখ, খোদা তা-লা তোমাকে কেমন 'যলিল' (অপদস্থ) করিয়াছেন। আবুজহল জিজ্ঞাসা করিল, যুদ্ধের পরিণাম ফল কি হইয়াছে? হজরত আবদুল্লা-বিন্-মস্‌য়ুদ (রাজিঃ) বলিলেন, মোসলমানদিগের 'ফতেহ্' (জয়) ও কাফেরদিগের 'হযিমৎ' (পরাজয়) ঘটিয়াছে। ইহার পর হজরত আবদুল্লা-বিন্-মস্‌য়ুদ (রাজিঃ) যখন উহার মুণ্ডচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন আবুজহল বলিল, আমার 'গরদান' (ঘাড় বা গলা) ধড়ের সঙ্গে মিলাইয়া কাটিবে, যাহাতে অন্যান্য ছিন্ন-মুণ্ড হইতে আমার মস্তক বৃহৎ বোধ হয়, এবং ছরদারের (প্রধান সেনাপতির) মস্তক বলিয়া সকলে চিনিতে পারে। অতঃপর হজরত আবদুল্লা-বিন্ মস্‌য়ুদ (রাজিঃ) উহার মস্তক কাটিয়া হজরতের নিকট আনিয়া 'হাজের' (উপস্থিত) এবং তাঁহার পদতলে নিক্ষেপ করিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) আবুজহলের কর্ত্তিত মস্তক দেখিয়া খোদা তা-লার নিকট 'শোকর' (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করিলেন। এই যুদ্ধে মাত্র ১৪ জন সাহাবী (রাজিঃ) শহিদ হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে ছয়জন মহাজেরিণ ও ৮ জন আন্‌ছার ছিলেন। হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) যুদ্ধ হইতে অবসর লাভ করিয়া মোসলমান শহিদগণকে যথানিয়মে দফন করিলেন; আর মোশরেক (অংশিবাদী—পৌত্তলিক কাফের)-দিগের মৃতদেহ একটা বৃহৎ গভীর কূপে নিক্ষেপ করাইয়া উহার উপরে প্রচুর মৃত্তিকা ঢালাইয়া দিলেন। কেবলমাত্র ওম্মিয়া-বিন্-খলাফের-মৃতদেহ-ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া

যাওয়াতে কূপে নিক্ষেপ করা গেল না, স্থতরাং উহার সেই খণ্ডীকৃত মৃত-দেহের উপর মৃত্তিকা ফেলিয়া দিয়া উহা ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কাফেরগণ এমন ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল যে, আপনাদের প্রধান সেনাপতির মৃতদেহও সঙ্গে লইয়া যাইবার অবসর পাইয়াছিল না। হরছ-বিন্-যময়া, আবুকয়েস্-বিন্-আল্-ফাকাহ্, আলী-বিন্-ওম্মিয়া, আছ-বিন্-মনব্বা—ইহারা তরুণ বয়স্ক যুবক ছিল। আর আঁ হজরত (ছালঃ) যখন মক্কায় ছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে 'মহ্ব্বত (প্রণয় বা ভালবাসা) এবং সম্বন্ধ রাখিতেন। হয়ত তাহারা গোপনে মোসলমানও হইয়া গিয়াছিল। হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) হেজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিলে, উহাদের আত্মীয়-স্বজন, সম্প্রদায়স্থ লোক এবং বন্ধু-বান্ধবগণ তাহাদের উপর অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করে, 'মোরভেদ' (ইস্লাম-ধর্ম্মত্যাগী) হইবার জন্য বিশেষ ভাবে যেদ করিতে থাকে, তখন তাহারা প্রকাশ্যভাবে ইস্লাম ও হজরতের প্রতি 'নারাজী' প্রকাশ পূর্ব্বক মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য কাফের সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হইয়া মদীনায় আগমন করে। এই দলের সকলেই এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। মক্কার বড় বড় 'ছরদার' (দলপতি) গণ যাহারা এই যুদ্ধে আসিয়াছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গিয়াছিল। যখন এই পরাজিত ও উৎসন্ন প্রাপ্ত কোরেশ সেনাদলের অবশিষ্টাংশ যুথভ্রষ্ট মেষপালের ন্যায় মক্কায় গিয়া পঁহুছিল, তখন সেখানে ঘরে ঘরে শোকের হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দন ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। কাফেরগণ এমন ভীত, সন্ত্রাসিত ও আতঙ্কিত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল যে, তাহাদের বিপুল সামগ্রী-সম্ভার, রসদ-পত্র, অস্ত্র-শস্ত্র, অশ্ব-উষ্ট্র প্রায় সমস্তই যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া গিয়াছিল। হজরত (ছালঃ) ঐ সকল পরিত্যক্ত সামগ্রী-সম্ভার একস্থানে জমা করাইলেন; এবং বন্ধু-

নজ্জার সম্প্রদায়ের আবতুল্লা-বিন্-কায়াব (রাজিঃ)-এর হস্তে তৎ সমস্ত সমর্পণ করিলেন। আবতুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ (রাজিঃ) ও যয়েদ-বিন্-হারেছ (রাজিঃ)-কে মদীনার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী সমূহে এই বিজয়-সংবাদ ঘোষণা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। হজরত আসামা-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ)-কে হজরত (ছালঃ) মদীনায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছেন, আমি ঐ সময় এই যুদ্ধ-বিজয়ের সুসংবাদ প্রাপ্ত হই—যখন আমরা হজরত রেছালতমাবের (ছালঃ) কন্যা ও হজরত ওস্মান বিন্ আফ্ফান রাজি আল্লাহ আন্হুর 'যওজার' (সহধর্ম্মিণী) হজরত রকিয়া (রাঃ—আঃ)-কে দফন করিতেছিলাম। এই বিজয় সংবাদ মদীনা শরীফে ১৮ই রমজান-অল্-মবারক পঁহছিয়াছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) বদরের যুদ্ধে জয়ী হইয়া মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন; পথিমধ্যে "ছফ্রাঃ" নামক স্থানে আল্লাহ তালার আদেশানুসারে 'মালে গণিমত্' (যুদ্ধে বিজয়-লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার) মোসলমানদিগের মধ্যে সমভাগে বণ্টন করাইয়া দিলেন। যুদ্ধে বন্দীদিগের মধ্যে বনু-আব্দে দার বংশীয় নযর-বিন্-হারেছ বিন্ কালাহ-এর 'গর্দ্দান' মারিবার (হত্যা করিবার) আদেশ প্রদান করিলেন। এখান হইতে যাত্রা করিয়া 'আরকয্ বযিয়াঃ' নামক স্থানে পঁহছিলেন; এই স্থলে ওক্বাঃ-বিন্-আবি ময়্য়িত্-বিন্-আবি ওমরু-বিন্-লয়্য়ার মুণ্ডপাত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন; আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। উপরোক্ত রণবন্দী দুই ব্যক্তি আবুজহলের সম্পূর্ণ মতাবলম্বী ও পদানুসরণকারী কাট্টা কাফের ছিল ইহারা উভয়ে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে অত্যন্ত 'দোস্মণি' (শত্রুতাচরণ) করিত। তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে অপদস্থ, অপমানিত ও উৎপীড়িত করাই এই কয়টি লোকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। নযর-বিন্-আল্হারেছ কে সফ্রায় হজরত আলী (রাজিঃ), আর ওক্বা-বিন্-আবি মহিত কে

আরকয়্ ববিয়ার য়াছেম-বিন্-ছাবেত আন্ছারি (রাজিঃ) 'কতল্' (মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত অর্থাৎ হত্যা) করিয়াছিলেন। অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় আছহাব (রাজিঃ)-দিগকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতভাবে গমন করিতে লাগিলেন ; আঁ হজরত (ছালঃ) বন্দীদিগকে ও তাহাদের 'মহাফেজ' (রক্ষী)-দিগকে পশ্চাতে রাখিয়া মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন। হজরতের (ছালঃ) মদীনা পঁহুছার একদিন পরে বন্দিগণ ও রক্ষিদলে পরিবেষ্টিত হইয়া মদীনায় পঁহুছিল। বন্দীদিগকে ছাহবাঃ কারাম (ছালঃ)-দিগের মধ্যে 'তক্ছিম' (ভাগ) করিয়া, তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, ইহা-দিগের সঙ্গে 'নেক-ছলুক' (সদ্ব্যবহার) করিবে। এই রণবন্দী (কয়েদী)-দিগের মধ্যে আবু-য়াযিয্-বিন্-য়ামর নামক ব্যক্তি কাফের সেনাদলের পতাকা-বাহী ছিল ; ইহার সহোদর ভ্রাতা হজরত মছয়ব-বিন্-য়মির (রাজিঃ) একজন প্রসিদ্ধ ছাহাবী (হজরতের শিষ্য) ছিলেন। আবু য়াযিয্-এর বর্ণনা এইরূপ :—যখন আমাকে বন্দী করিয়া বদর হইতে মদীনায় লইয়া যাইতেছিল, তখন আমি একদল আন্ছারের তত্ত্বাবধানে ছিলাম। এই আন্ছার (রাজিঃ)-গণ যখন আহার করিতে বসিতেন, তখন আমাকে রুটী খাইতে দিয়া, নিজেরা খর্জ্জুর খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতেন। আমি লজ্জিত হইয়া ঐ সকল আন্ছাবের মধ্যে কাহাকেও সেই রুটী খাইতে দিতাম ; কিন্তু তিনি আবার আমাকেই তাহা প্রত্যর্পণ করিতেন। মদীনায় পঁহুছিয়া আমি আবু-আযিয্ আবি য়ুছির আন্ছারী (রাজিঃ)-এর ভাগে পড়িলাম। আমার ভ্রাতা হজরত মছয়ব-বিন্-য়মীর (রাজিঃ) আবি-য়ুছির আন্ছারী (রাজিঃ)-কে বলিতে লাগিলেন যে, ইহাকে খুব সতর্কতার সহিত কায়েদ রাখিবেন ; এবং ইহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিবেন ; কারণ ইহার মাতা খুব অর্থশালিনী ; ইহার জন্য প্রচুর 'ফিদিয়া' (বন্দীদিগের মুক্তিপণ) পাওয়া যাইবে। আবু আযিয্ যখন দেখিতে

পাইল যে, তাহার সহোদর ভ্রাতা, তাহার হেফাযৎকারী (জেম্মাদার প্রহরী)-কে তৎপ্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন, তখন বলিল, ভাই সাহেব! আপনি কি আমার জন্য ও 'খায়েরখাহী' (মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা) করিবেন না? তখন হজরত মছয়ব (রাজিঃ) উত্তর করিলেন, এক্ষণে তুমি আমার ভ্রাতা নও; ঐ ব্যক্তি আমার ভ্রাতা, যিনি তোমাকে নিজের পাহারায় রাখিয়াছেন। যাহা হউক, আবু আঁযিযের মাতা চারি হাজার দরহম মুক্তিপণ পাঠাইয়া উহাকে ছাড়াইয়া নিয়াছিলেন। বদর যুদ্ধে কোরেশদিগের ভীষণ ভাবে পরাস্ত হওয়ার সংবাদ যখন মক্কায় পঁহুছিল, তাহাতে কাফেরদিগের যেরূপ শোক ও দুঃখ হইল; পক্ষান্তরে যে মুষ্টিমেয় মোসলমান নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া তখনও মক্কায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। এবং আপনাদের ধর্ম্মবিশ্বাস গোপন রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে সেইরূপ বিমল আনন্দের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইল। আবুলহব-বিন্‌-আবদুল মোত্তালেব (আঁ হজরত [ছালঃ]-এর অত্যাচারী পিতৃব্য) কোনও কারণ বশতঃ এই যুদ্ধে যোগ দিতে পারিয়াছিল না, সে যখন মক্কার প্রধান প্রধান ছরদার (দলপতি), প্রধান প্রধান বীরপুরুষের নিহত হইবার, এবং তাহাদের শোচনীয় পরাজয় সংবাদ শুনিতে পাইল, তখন উহার হৃদয়ে এমনই একটা ধাক্কা লাগিল—এমনই একটা তীব্র বেদনা অনুভূত হইল যে, এই দুঃসংবাদ শুনিবার এক সপ্তাহ মধ্যেই তাহার জীবনান্ত ঘটিল। যুদ্ধের বন্দীদিগের সম্বন্ধে আঁ হজরত (ছালঃ) মস্‌জেদ নববীতে গিয়া ছাহাবা (রাজিঃ)-দিগের সম্বন্ধে পরামর্শ ও কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) বলিলেন, আমার মতে বন্দীদিগের যে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে যাহার আত্মীয়, সেই ব্যক্তি তাহাকে হত্যা করিবেন। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য, 'মোশরেক' (অংশিবাদি)-গণ বুঝুক যে, আমাদের নিকট খোদা ও রছুলের 'মহব্বত' (প্রণয় বা ভালবাসা) 'করাবত দারী'

(আত্মীয়তা) অপেক্ষা অনেক বেশী। আর ইস্‌লামের 'মোকাবেলায়' (সম্মুখে বা তুলনায়) আত্মীয়তার কোন মূল্যই নাই। হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) ফরমাইলেন, আমার মতে বন্দীদিগকে 'ফিদিয়া' (মুক্তি-পণ) দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তদ্দ্বারা মোসলমানদিগের কতকটা আর্থিক সাহায্য হইবে ; এবং ইহারা তদ্দ্বারা আপনাদের যুদ্ধের 'সাজ-সরঞ্জাম' ও ঠিক্ করিতে পারিবেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সম্ভবপর যে, বন্দিগণ মুক্তিলাভ করিয়া, পবিত্র ইস্‌লামের সুস্নিগ্ধ আশ্রয়চ্ছায়ায় আগমন করিতে পারে। হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ)-এর মতই 'পছন্দ' (মনোনীত) করিলেন। তদনুসারে বন্দী-দিগকে উপযুক্ত ফিদিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক মুক্তি প্রদান করিলেন। অনেক গরীব ও নিঃস্ব লোককে বিনা ফিদিয়ায় ও ছাড়িয়া দিলেন। প্রত্যেক কয়েদীর জন্য এক হাজার হইতে চারি হাজার দরহম পর্য্যন্ত 'ফিদিয়া' পাঠাইয়া মক্কাবাসিগণ আপনাদের আত্মীয় স্বজনদিগকে মুক্ত করিয়া লইয়াছিল। মোটামুটি ৭০।৭৫ জন বন্দীর জন্য অন্যূন দুই লক্ষ দরহম, মুক্তি-পণ স্বরূপ মোসলমানগণ পাইয়াছিলেন। যে সকল লোক লেখাপড়া জানিত, অথচ ফিদিয়া দিবার সামর্থ্য ছিল না, তাহাদিগকে বলা হইল, তোমরা প্রত্যেকে দশ দশটী মদীনাবাসী বালককে লেখাপড়া শিখাইয়া দিয়া মুক্তিলাভ করিবে। হজরত রছুলোল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহঃ আলায়হে ও সাল্লামের কন্যা হজরত যয়নব (রাজিঃ-আঃ) এখন পর্য্যন্ত মক্কায় তাঁহার স্বামী আবুল আছের গৃহেই ছিলেন। আবুল আছ ও এই যুদ্ধে বন্দী হন। হজরত যয়নব (রাঃ-আঃ) নিজের গলার হার তাহার ফিদিয়ার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) ঐ হার দেখিয়া ছাহাবা (রাজিঃ)-দিগকে বলিলেন, যদি 'মোনাছেব' (কর্ত্তব্য) মনে কর, তবে এই হার গাছা (ঐসমেত) যয়নব (রাঃ—আঃ)-কে ফেরত পাঠাইয়া দাও, কারণ ইহা স্বীয়

মাতা (হজরত) খোদেজার (রাঃ—আঃ) স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ উহার নিকটে রহিয়াছে। সকলেই আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন; এবং আবুল আছ-কে বিনা মুক্তি প্রদান করা হইল। আবুল আছ মক্কায় গমন পূর্ব্বক হজরত যয়নব (রাঃ—আঃ)-কে মদীনায় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। আবুল আছ এই ঘটনার ছয় বৎসর পরে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই শোচনীয় পরাজয়ের পর মক্কাস্থ নিহত ব্যক্তিদিগের 'ওয়ারেছ' (আত্মীয়-স্বজন)-গণ উচ্চৈঃস্বরে 'নোহা জারী (শোক প্রকাশক ক্রন্দন) করিয়াছিল না, কারণ ঐ রূপ শোক প্রকাশের সংবাদে মোসলমানগণ সুখী হইতেন। ছফওয়ান-বিন্-ওম্মিয়ার পিতা ওম্মিয়া, পিতৃব্য শয়িবাঃ ও ভ্রাতা আলী বদরের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল; এজন্য তাহার হৃদয়ে প্রতি হিংসানল প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হয়; তজ্জন্য সে য়মির-বিন্-দহবকে অতি সঙ্গোপনে এ বিষয়ে রাজী করিয়াছিল যে, সে যেন মদীনায় গমন পূর্ব্বক হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-কে হত্যা করে। য়মির-বিন্-দহব একখানি বিষাক্ত তরবারি সহ মক্কা হইতে মদীনায় গমন করিল। তাহাকে দেখিয়া হজরত ওমর রাজিঃ আল্লাহ আন্‌হুর মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি য়মিরের তরবারির কব্‌যাঃ (বাঁট) ধরিয়া, তাহাকে আঁ হজরত (ছালঃ) এর হুজুরে উপস্থিত করিলেন। তিনি ফরমাইলেন, ওমর! তুমি য়মিরকে ছাড়িয়া দাও। হজরত ওমর (রাজিঃ) উহার হাত ছাড়িয়া দিলে, হজরত (ছালঃ) য়মির কে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিজন্য মদীনায় আসিয়াছ? সে বলিল, আমার পুত্র যুদ্ধে বন্দী হইয়াছে, তাহাকে ছাড়াইয়া লইতে আসিয়াছি; আপনি আমার প্রতি 'রহম' (দয়া) প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে ছাড়িয়া দিন। আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমাকে হত্যা করিবার জন্য ছফওয়ান তোমাকে পাঠাইয়াছে, একথা কেন বলিতেছ না? তৎপর তিনি ছফওয়ান

রমিরের গুপ্ত পরামর্শের সকল ঘটনা প্রকাশ করিলেন; তচ্ছ্রবণে রমির বলিলেন, আমি মোসলমান হইতেছি, আর 'একরার' (স্বীকার) করিতেছি যে, আপনি খোদা তা-লার প্রেরিত 'ছাচ্চাঃ' (সত্য) রছুল, কারণ এই বিষয়ের 'খবর' (সংবাদ) আমিও ছফ্ওয়ান ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি কেহই জানিত না।

বদর যুদ্ধে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লা ফেরেশ্তাদিগের দ্বারা মোসলমানদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন; ফেরেশ্তাদিগের সাহায্য সম্বন্ধে কাফেরগণ ও মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তদ্বিষয় বর্ণনা করিয়াছিল।

বদরের যুদ্ধ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিলেও, কোরেশদিগের সৈন্যসংখ্যা, মক্কার প্রসিদ্ধ যোদ্ধৃ পুরুষদিগের একত্র সমাবেশ, তাহাদের সাজ-সজ্জা, উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র, অশ্ব ও উষ্ট্রের সংখ্যা, প্রচুর রসদ-পত্র ইত্যাদির তুলনায় মোসলমানগণ একেবারে দুর্ব্বল ও নগণ্য ছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা, সাজ-সজ্জা, অশ্ব ও উষ্ট্রের সংখ্যাদি ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ তা-লার বিশেষ অনুগ্রহ ও বিশেষ সাহায্য ব্যতীত মোসলমানদিগের পক্ষে এই যুদ্ধে জয়লাভ করা কোনও ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। অবশ্য মক্কার কাফেরদিগের পাশব দৈহিক বলই একমাত্র অবলম্বন ছিল; মোসলমানদিগের আল্লাহর প্রতি: পূর্ণ বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভৃতি ও যুদ্ধ জয়ের অন্যতম কারণ।

বদরের যুদ্ধ শেষ হইবার পর ২২শে রমজানল্-মবারক, হজরত রেছালত্-মাব (ছালঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই পবিত্র রমজান মাসের শেষ ভাগে 'ছাদকায় ফেতর' (রোজার ফেৎরাঃ) ওয়াজেব হইয়াছিল। ঈদের নমাজ ও কোরবাণীর আদেশ ও এই বৎসরেই প্রদত্ত হয়। এই বৎসরেই আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় দ্বিতীয়া কন্যা হজরত ওম্মে-কলছুমের (রাঃ—আঃ) বিবাহ, হজরত ওস্মান গণী (রাজিঃ)-এর সঙ্গে দেন।

এই হইতে তিনি (হজরত ওস্মান গণী [রাজিঃ]) " যেন্নুরায়েন " নামে অভিহিত হন। আবার এই বৎসরই আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় অতিপ্রিয় সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা হজরত-খাতুনে জন্নত হজরত ফাতেমা জোহরার (রাঃ— আঃ) শুভ-বিবাহ কার্য্য, স্বীয় স্নেহে পালিত পিতৃব্যপুত্র মহাবীর হজরত আলী (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সম্পন্ন করেন।

মক্কার কাফেরদিগের হৃদয়ে ভীষণ প্রতি-হিংসানল অতি প্রবল ভাবে প্রজ্জলিত হইতেছিল। বদর যুদ্ধের দুই মাস পরে, মক্কার কোরেশদিগের বর্ত্তমান নেতা আবু-সুফিয়ান যুদ্ধের উদ্দেশ্যে দুই শত অশ্বরোহী সৈন্য লইয়া মক্কা হইতে বহির্গত হইল। এই সৈন্যদল মদীনার সান্নিধ্যে পঁহুছিলে, আঁ হজরত (ছালঃ) সেই সংবাদ পাইয়া, শিষ্যদল সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে বহির্গত হইলেন। আবু-সুফিয়ান মদীনাস্থ শহরতলির খেজুরের বাগান গুলি অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত করিতেছিল। আর যে দুইজন নিরীহ 'কাশ্‌ৎকার' (কৃষক বা উদ্যান স্বামী) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে হত্যা করিল। ইঁহাদের মধ্যে একজন ত হজরত সয়ীদ-বিন্‌-ওমর আন্‌ছারী (রাজিঃ) ও আর একজন তাঁহারই সহযোগী ছিলেন। মোসলমানদিগের আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র কাফের সৈন্যগণ ভয়ে পলায়ন করিল; মোসলমানগণের সম্মুখীন হইতে তাহাদের সাহসে কুলাইল না। তাহারা এরূপ ভীত ও সন্ত্রস্ত ভাবে পলায়ন করিয়াছিল যে, পলায়ন কালে ভার 'হাল্‌কা' (লঘু) করিবার জন্য আপনাদের ছাতুর বস্তা (থলিয়া) গুলি পথে ফেলিতে ফেলিতে গিয়াছিল। মোসলমান সৈন্যগণ " কদর " নামক স্থান পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সেই নিক্ষিপ্ত ছাতুর বস্তা গুলি তাঁহারা পাইয়া ছিলেন। অতঃপর হজরত (ছালঃ) সশিষ্যে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই অভিযান " গয্‌ওয়ায় সওভিক " (সাভিক) নামে অভিহিত হইয়াছিল। গয্‌ওয়ায়-

সওভিক ২য় হিজরীর যেলহজ্জ মাসে সঙ্ঘটিত হয়। যেলহজ্জ মাসের শেষ পর্য্যন্ত আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনা শরীফে উপস্থিত ছিলেন; ঐ সময় পর্য্যন্ত আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

হেজরতের তৃতীয় বৎসর।

য়িহুদী ধর্ম্মাবলম্বী আবহুল্লা-বিন্ আবির কথা উপরে বর্ণিত হইয়াছে; কোথায় সে মদীনার রাষ্ট্রপতি বা বাদশাহ হইবে, রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করিবে, সেইস্থলে আঁ হজরতের (ছালঃ) মদীনায় আগমনে তাহার সকল আশা ও আকাঙ্খা নির্ম্মূল হইল; এজন্য সে আঁ হজরত (ছালঃ) ও মোসলমানদিগের প্রতি বড়ই বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিত। সে অতি বুদ্ধিমান্ ও সুচতুর লোক ছিল বলিয়া প্রকাশ্যে আঁ হজরত (ছালঃ), কিংবা মোসলমান দিগের প্রতি কোনও রূপ বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিত না; কিন্তু মক্কার কোরেশ, মদীনার মোশ্‌রেক ও য়িহুদীদিগের সঙ্গে মোসলমানগণের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা গোপনে ষড়যন্ত্র পাকাইত। বদরের যুদ্ধে মোসলমানগণ জয়ী হওয়াতে তাহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। এক্ষণে সে প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার অনুগত ও বাধ্য কতকগুলি পৌত্তলিক এবং য়িহুদীকে লইয়া কপট ভাবে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। প্রকাশ্যভাবে মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে সে এবং তাহার দলের লোকেরা শত্রুতাচরণ করিতে সাহস করিত না; এজন্য মোসলমানদিগের দলে ভুক্ত হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধন কবিতে সে কৃতসঙ্কল্প হইল।

পৌত্তলিক ব্যতীত মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লী সমূহের প্রবল য়িহুদী অধিবাসিগণ আঁ হজরত (ছালঃ) ও মোসলমানদিগের প্রতি বিষম বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিল। কারণ তাহারা হজরতের (ছালঃ) নবুয়তে বিশ্বাস করিতে একেবারেই

রাজী ছিল না। মদীনার শহরতলিতে ৩ দল য়িহুদী খুব পরাক্রান্ত ও প্রভাব-সম্পন্ন ছিল। উহাদের মহাল্লা গুলি কেল্লা বেষ্টিত থাকায় শত্রুর পক্ষে এক প্রকার অজেয় ছিল; ঐ তিন য়িহুদী সম্প্রদায়ের নাম এই :—(১) বনি-ক্বিন্‌কায়; (২) বনি-নযির ও (৩) বনি-করিযাঃ। বদরের যুদ্ধে-ফলে ইহারাও আঁ হজরত (ছালঃ) এবং মোসলমানদিগের উপর বড়ই বিদ্বেষ-পরায়ণ ও ক্রোধাবিষ্ট হইল। কায়াব-বিন্‌-আশরফ্ নামক একজন য়িহুদী কবি, বদর যুদ্ধে মোসলমানদিগের জয়লাভ করিবার ফলে তাঁহাদের প্রতি এমন বিদ্বেষ-পরতন্ত্র হইল যে, সে মদীনা ছাড়িয়া মক্কায় গমন পূর্ব্বক, বদর যুদ্ধে নিহত কোরেশদিগের শোক-গাথা লিখিয়া কোরেশ-দিগকে শুনাইতে লাগিল; এবং তজ্জন্য তাহাদের বিশেষ সহানুভূতি আকর্ষণ করিল। কিছুদিন পরে সে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মোসলমান-দিগের নিন্দা ও গ্লানি-সূচক কবিতা লিখিয়া বিদ্বেষ ছড়াইতে লাগিল। য়িহুদিগণ সুদখোর ছিল বলিয়া, মদীনার আওস্ ও খয্‌রজ্ বংশীয় মোসলমানদিগের মধ্যে অনেকেই তাহাদের নিকট ঋণী ছিল—যেমন বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় মোসলমানগণ হিন্দু সুদখোর দিগের নিকট ঋণ-জালে আবদ্ধ আছে। য়িহুদিগণ উত্তমর্ণ অর্থাৎ মহাজন বলিয়া, অধমর্ণ অর্থাৎ খাতক মোসলমানগণ তাহাদিগের অনেকটা 'দাবাও' তে ছিলেন। য়িহুদিগণ আপনাদিগকে উচ্চ সম্মানিত বলিয়া মনে করিত। মোসলমান-দিগের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া তাহারা জ্বলিয়া পুড়িয়া 'খাক' হইতেছিল। য়িহুদিগণ আঁ হজরত (ছালঃ) ও মোসলমানদিগের সঙ্গে বড়ই 'বে-আদবী' করিত। অনেক সময় তাঁহার সভায় আসিয়া ও অসভ্যতা এবং বর্ব্বরতা প্রকাশ করিত। আঁ হজরত (ছালঃ) নানাপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিলেও, উহারা তাহাতে কর্ণপাত করিত না।

একদা 'বনি-ক্বিনকাঃ' নামক মহাল্লায় একটি মেলা বসিয়াছিল;

একজন আন্ছার মহিলা ঐ মেলায় দুগ্ধ বিক্রয় করিতে গিয়া, একজন য়িহুদী স্বর্ণকার কর্ত্তৃক অবমানিতা হন। একজন আন্ছার পুরুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অবমানিতা স্বজাতীয়া ও স্বধর্ম্মাবলম্বিনী মহিলার পক্ষ সমর্থন করেন। ঐ সময় কতকগুলি উদ্ধত য়িহুদী যুবক তথায় উপস্থিত হইয়া সেই আন্ছারকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিহত করে। পরে আরও কতিপয় মোসলমান সেখানে উপস্থিত হন। মোসলমানদিগের সঙ্গে য়িহুদিগণের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। মোসলমানদিগের সংখ্যা খুব কম ছিল; সুতরাং তাঁহারা য়িহুদিদিগের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সংবাদ পাইয়া আঁ হজরত (ছালঃ) দল বল হইয়া যুদ্ধস্থলে গমন পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, য়িহুদিগণ মুষ্টিমেয় মোসলমানকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে। নবাগত মোসলমানগণ ও আঁ হজরতের (ছালঃ) আদেশে য়িহুদিদিগকে মহা পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিলেন। বনি-কিন্‌কায় সম্প্রদায়ের য়িহুদীদিগের মধ্যে যোদ্ধৃ পুরুষের সংখ্যা ছিল ৭০০ শত, তন্মধ্যে ৩০০ যোদ্ধা 'যরাপোষ' (বর্ম্মধারী) ছিল; কিন্তু অত্যল্প সংখ্যক মোসলমানের সঙ্গে তাহারা যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া, পলায়ন পূর্ব্বক আপনাদের দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মোসলমানগণ দৃঢ়ভাবে দুর্গ অবরোধ করিলেন। ১৫।১৬ দিন অবরোধের পর তাহাদের কেল্লা মোসলমানদিগের হস্তগত হইল। বনি-কিনকায় সম্প্রদায়ের সমস্ত য়িহুদীকে মোসলমানগণ বন্দী করিয়া ফেলিলেন। তৎকালের সাধারণ নিয়মানুসারে এই সকল বন্দী পুরুষদিগকে হত্যা এবং স্ত্রীলোকদিগকে দাসীরূপে বিক্রয় করার ব্যবস্থা ছিল। সকলে মনে করিয়াছিল, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আদেশে য়িহুদী যোদ্ধৃ পুরুষদিগের সকলেই নিহত হইবে। ওদিকে আবদুল্লা-বিন্-আবি (মোনাফেকদিগের দলপতি) ও এই য়িহুদী-দিগের প্রাণরক্ষার্থ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট 'ছোফারেশ' (অনুরোধ)

করিল। আঁ হজরত (ছালঃ) প্রাণদণ্ড না করিয়া উহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। তদনুসারে হজরত এবাদা-বিন্-ছামত (রাজিঃ) একদল ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া তাহাদিগকে " খয়বর " পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসিলেন। " খয়বরে " পূর্ব্ব হইতেই য়িহুদীদিগের একটী বড় আড্ডা ছিল। এই নির্ব্বাসিত য়িহুদিগণের গমনে খয়বরস্থ য়িহুদিগণের সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইল।

দুইজন দুর্ব্বৃত্তের হত্যা সাধন।

কায়াব-বিন্-আশরফ্ নামক মোস্লেম-বিদ্বেষী য়িহুদীর কথা ইতি-পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; ঐ দুর্ব্বৃত্ত লোকটা মোসলমান মহিলাদিগের প্রেম সম্বন্ধীয় অপমান-সূচক কবিতা লিখিয়া প্রকাশ্যভাবে মদীনার সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছিল। ইহাতে মোসলমানগণ আপনাদিগকে ঘোর অবমানিত মনে করিতে লাগিলেন। কায়াব-বিন্ আশরফ্ কেবল উহা করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না; সে আঁ হজরত (ছালঃ)—এর হত্যা সাধন জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল। যখন উহার কার্য্য-কলাপ ও দুরভিসন্ধি সীমা অতিক্রম করিল, তখন মোহাম্মদ-বিন্-মোস্লেমাঃ (রাজিঃ) নামক একজন সাহাবাঃ উহাকে হত্যা করিবার জন্য আঁ হজরতের (ছালঃ) নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; অনুমতি প্রদত্ত হইলে তিনি অপর দুইজন লোকের সাহায্যে উহার হত্যা কার্য্য সম্পাদন করিলেন। উহার হত্যা-কাণ্ডের পর ছালাম-বিন্-আবি হকিক নামক আর একটা দুর্ব্বৃত্ত গজাইয়া উঠিল। ইহার মোসলমান-বিদ্বেষ আরও ভীষণ আকার ধারণ করিল। সে খয়বরে বাস করিত; কায়াবকে বনু-আওস্ দলের মোসলমানগণ হত্যা করিয়াছিলেন। এক্ষণে বনু-খয্রজ দলের মোসলমানগণ এই দুষ্ক

দুর্ব্বৃত্ত লোকটাকে হত্যা করিবার জন্য আঁ হজরতের (ছালঃ) অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি প্রদত্ত হইলে খয্‌রজ সম্প্রদায়ের ৮ জন যুবক প্রচ্ছন্ন-ভাবে খয়বরে গিয়া উহার হত্যা কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। দুইটা বিষম কণ্টক নির্ম্মল হইল।

বদর যুদ্ধে শোচনীয় রূপে পরাস্ত হওয়াতে এবং তাহাদের প্রধান প্রধান দলপতি সেই যুদ্ধে নিহত হওয়ায়, মক্কার কোরেশগণের হৃদয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের ভীষণ বিদ্বেষাগ্নি প্রবল ভাবে জ্বলিতেছিল; তাহারা কেবল উপযুক্ত সুযোগের অন্বেষণ করিতেছিল। ওদিকে মদীনার য়িহুদী ও মোনাফেকগণ প্রতিশোষ গ্রহণ জন্য তাহাদিগকে অনবরত উত্তেজিত কারতোছল। আবার আবু-ছুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দার পিতা, পিতৃব্য ও ভ্রাতা বদর যুদ্ধে নিহত হওয়াতে তাহার হৃদয় ভীষণ প্রতিহিংসানলে দগ্ধীভূত হইতেছিল। সে স্বীয় স্বামী আবু-সুফিয়ানকে প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য অনবরত বিশেষভাবে উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করিতেছিল। মক্কার প্রায় সমুদয় দলপতি বদর-যুদ্ধে নিহত হওয়াতে, এক্ষণে আবু-সুফিয়ানই মক্কাবাসিগণের—বিশেষতঃ কোরেশদিগের ছরদার (দলপতি)-এর পদ লাভ করিয়াছিল। বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে আবু-সুফিয়ান যে সিরিয়ায় বাণিজ্য-যাত্রা করিয়াছিল, তাহাতে ৫০ হাজার মেশ্‌কাল স্বর্ণ ও ১০০০ টা উষ্ট্র লাভ হইয়াছিল; উহার লভ্যাংশ এ যাবৎ উহার মালেকদিগকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল না। এক্ষণে ঐ লভ্যাংশ দ্বারাই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করা হইল। বহু উত্তেজনাময়ী কবিতা পাঠক ও ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতাকারী, লোকদিগকে-যুদ্ধে যোগদান করাইবার জন্য আরবের বহু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেরিত হইল; তদ্দ্বারা বেশ সুফল ও ফলিল; বহু জাতি, বহু সম্প্রদায় ও বহু প্রদেশের অধিবাসিগণ এই যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। একদল রণ–রঙ্গিণীও যোদ্ধ পুরুষ-

দিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিবার জন্য যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত হইল। আবু-সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দাঃ তাহাদের নেত্রীত্ব পদ গ্রহণ করিল।

ওহদের ভীষণ যুদ্ধ।

মক্কাবাসি পৌত্তলিকদিগের উদ্যোগে নিজ মক্কা ও বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত যোদ্ধৃপুরুষের সংখ্যা ৩০০০ হইল। তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র, অশ্ব-উষ্ট্র ও রসদ-পত্রের কোনও অভাব ছিল না। শওয়াল মাসের প্রারম্ভে এই বিশাল কোফ্‌ফার-বাহিনী মক্কা হইতে মহাড়ম্বরে বাহির হইয়া, মদীনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। হেন্দাঃ-বিন্তে ওত্‌বাঃ নারীগণের সেনাপতি রূপে মহোল্লাসে এই যোদ্ধৃদলের সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। জবির-বিন্‌-মতয়মের ওহসী নামক একজন ক্রীতদাস ছিল; নেযাঃ (বর্শা বা বল্লম বিশেষ) নিক্ষেপে তাহার অসাধারণ পটুতা ছিল। জবির-বিন্‌-মতয়ম উহাকে বলিয়াছিল, যদি তুমি হামযাঃ (রাজিঃ) কে বধ করিতে পার, তবে তোমাকে দাসত্ব হইতে 'আযাদ' (মুক্ত) করিয়া দিব। আবার হেন্দাঃ-বিন্‌-ওতবাঃ তাহাকে বলিয়াছিল, যদি তুমি আমার পিতার হত্যাকারী হামযাঃ (রাজিঃ) কে বধ করিতে পার, তবে আমার অঙ্গস্থিত এই বহুমুল্য অলঙ্কার রাশি তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিব।

এই প্রবল কোফ্‌ফার সেনাদল যখন মদীনার সমীপবর্ত্তী হইল, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) তাহাদের আগমন সংবাদ পাইলেন; তিনি ছাহাবা (রাজিঃ)-দিগকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া এক পরামর্শ-সভা (সমর-সভা) আহ্বান করিলেন। আঁ হজরতের (ছালঃ) মত ছিল যে, মদীনায় থাকিয়া আত্মরক্ষা করেন। তাঁহার এরূপ মত প্রকাশের আর একটী কারণ এই উপস্থিত হইয়াছিল যে, তিনি স্বপ্নে দেখিয়া ছিলেন, তাঁহার

তরবারির ধার খানিকটা ঝরিয়া গিয়াছে; ইহা দ্বারা অনুমান করিয়া ছিলেন যে, হয় ত এই যুদ্ধে মোসলমানদিগের কতকটা ক্ষতি সাধন হইবে। আর একটী স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তিনি যেন স্বীয় হস্ত এক যরায় (বর্ম্মে) নিক্ষেপ করিয়াছেন। যরাঃ অর্থে তিনি মদীনা নগরকে বুঝিয়া ছিলেন। যাহা হউক, বহু আলোচনার পর অবশেষে এই স্থির হইল যে, মদীনার বাহিরে গমন করিয়াই শত্রুর গতিরোধ করিতে হইবে। আঁ হজরত (ছালঃ) তদনুসারে হজরত ওম্মে-মকতুম (রাজিঃ)-কে মদীনায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, মোনাফেকদিগের ৩০০ যোদ্ধপুরুষ সহ ১০০০ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ মদীনা হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু দেড় কিংবা দুই মাইল পথ অতিক্রম করার পর, মোনাফেক (কপট) দলপতি আবদুল্লা-বিন্-আবি, স্বীয় অনুগামী ৩০০ যোদ্ধা সহ মোসলমান সেনাদল ছাড়িয়া মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সুতরাং মোসলমান সৈন্য দলে মাত্র ৭০০ সৈন্য অবশিষ্ট রহিল। আবার আঁ হজরত ইহাদিগের মধ্য হইতে কতিপয় বালককে মদীনায় ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিলেন; কারণ তাহারা নিতান্তই তরুণবয়স্ক ছিল। সুতরাং অবশিষ্ট সৈন্যের সংখ্যা সাড়ে ছয় শত কিংবা পৌণে সাত শত ছিল বলিয়াই অনুমান। যাহা হউক, এই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া আঁ হজরত (ছালঃ) প্রায় দিবা অবসান কালে মদীনা হইতে ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী " ওহদ " নামক পাহাড়ের 'দামনে' (পাদদেশে) পঁহুছিয়া দেখিতে পাইলেন, কোফ্‌ফার সৈন্যদল অদূরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া আছে। মোসলমান সেনাদল ও ময়দানের এক প্রান্তে, ওহদ পাহাড় পশ্চাদ্দিকে রাখিয়া আপনাদের শিবির স্থাপন করিলেন। রাত্রি উপস্থিত হওয়াতে কোনও দলই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। তৃতীয় হিজরীর ১৫ই শওয়াল, শনিবার দিন ভোরে উভয় প্রতিপক্ষ দল ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে আঁ হজরত (ছালঃ) ৫০ জন সুশিক্ষিত

ও সুদক্ষ 'তিরান্দায্' (তীর বর্ষণকারী বা ধনুর্ধারী) সৈন্য, হজরত আবদুল্লা-বিন্-জবির আনছারির (রাজিঃ) অধিনায়কতায় আপনাদের পশ্চাদ্দিকস্থ এই অতি প্রয়োজনীয় ঘাটিতে (গিরিবর্ত্মে) শিবির স্থাপন করিলেন ; এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, দ্বিতীয় আদেশ প্রাপ্তির পূর্ব্বে তোমরা এই গিরি-বর্ত্ম কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। যুদ্ধের অবস্থা যাহা হউক না কেন, তোমরা এই আদেশের অন্যথা চরণ করিও না। এই গিরি-বর্ত্মটী এমনই ভাবে অবস্থিত ছিল যে, শত্রুদল ঘুরিয়া মোসলমানদিগের 'আকবে' (পশ্চাদ্ভাগে) গিয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত। গিরি-সঙ্কটের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াই আঁ হজরত (ছালঃ) এই সঙ্কীর্ণ স্থানে ৫০ জন সুদক্ষ ধনুর্ধারী সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন ; ঐ গিরি-বর্ত্ম রক্ষার জন্য ঐ পরিমাণ যোদ্ধপুরুষই যথেষ্ট ছিল। যাহা হউক, আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ ভাগে হজরত যোবের-বিন্-আওয়াম (রাজিঃ)-কে ও বামভাগে হজরত মন্যর-বিন্-ওমরু (রাজিঃ)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। মহাবীর হজরত হাময়াঃ (রাজিঃ)-কে 'মকদ্দমাতল জয়েশ' এর (অগ্রগামী সৈন্যদলের) সেনাপতি 'মকরর' (নিয়োগ) ফরমাইলেন ; আর হজরত ময়ছব-বিন্ য়মির (রাজিঃ) এর হস্তে পবিত্র যুদ্ধ-পতাকা প্রদান করিলেন। হজরত আবু দজানাঃ (রাজিঃ)-কে হজরত স্বীয় তরবারি খানি প্রদান করাতে, তিনি সেই পবিত্র তরবারি হস্তে লইয়া বিক্রান্ত সিংহের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অপর পক্ষে কোরেশগণ ও আপনাদের সেনাদলকে যুদ্ধার্থ শ্রেণীবদ্ধ করিল। তাঁহারা মহাবীর খালেদ-বিন্-অলিদকে আপনাদের দক্ষিণ বাহুর (ডান দিকের) সেনাপতি নিযুক্ত করিল। তাহার অধীনে ১০০ একশত বিক্রান্ত অশ্বারোহী সৈনা দেওয়া হইল। এইরূপে আকরমা-বিন্-আবুজহল ১০০ একশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ বাম বাহুর সেনাপতি

পদ লাভ করিল। আবদুল দার বংশীয়গণ যুদ্ধকালে সর্ব্বদাই কোরেশ-দিগের পতাকাধারীর কার্য্য করিত; বহু বাদানুবাদের পর এবারও তাহাদিগের হস্তেই রণ-পতাকা অর্পিত হইল। পূর্ব্বোক্ত দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য ব্যতীত কোরেশদিগের আরও দুইশত উৎকৃষ্ট ও দুর্দ্ধর্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল; উহাদিগকে প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য 'মহফুয্' (রক্ষিত রূপে) রাখা হইয়াছিল। কোরেশদিগের ধনুর্দ্ধারী সৈন্যদিগের অধিনায়ক ছিল আবদুল্লা-বিন্ বরযিয়াঃ। কোরেশদিগের সৈন্য সংখ্যা ৩০০০ ছিল, কেবল যে কোরেশদিগের মধ্য হইতে এই পরাক্রান্ত সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল, তাহা নহে; কোরেশ ব্যতীত আরবের বিভিন্ন দলের বিখ্যাত বীরপুরুষ দিগের দ্বারা এই বিক্রান্ত সেনাদল গঠিত হইয়াছিল। মোসলমান সৈন্যের সংখ্যা তাহাদের এক পঞ্চমাংশ মাত্র ছিল; তাঁহাদের অশ্বের সংখ্যা ছিল মাত্র দুইটী। আবার মোসলমানদিগের অস্ত্র-শস্ত্রাদি এবং যুদ্ধ-সরঞ্জামাদির বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোরেশদিগের তুলনায় মোসলমান-দিগের ঐ সকল জিনিষ শতাংশের একাংশও ছিল না।

মদীনাবাসী খৃষ্টীয়ান দলের আবু আমের নামক 'রাহেব' (সন্ন্যাসী) এই যুদ্ধের প্রথম সূচনা করে। এই লোকটা বিষম মোসলমান-বিদ্বেষী ছিল। সে মনে করিয়াছিল, আমাকে দেখিলে আওস্-বংশীয় মোসলমানগণ, মোসলমান পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সঙ্গে মিলিত হইবে। তদনুসারে সে অগ্রবর্ত্তী হইয়া আওস্ দলস্থ মোসলমানদিগকে নিজের দিকে আহ্বান করিতে লাগিল। কিন্তু আওস্-বংশীয় আন্ছারগণ তাহার আহ্বানে সাড়া দিবেন দূরে থাকুক, বরং তাহাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তাহাতে সে লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া প্রস্থান করিল। ইহার পরেই উভয় প্রতিপক্ষ দল উভয় দলকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিলেন। বীরেন্দ্র কেশরী হজরত হামযাঃ (রাজিঃ), হজরত আলী (রাজিঃ) ও হজরত আবু দজানাঃ (রাজিঃ)

এবং অন্যান্য মোসলমান বীর পুরুষগণ এমন পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, কোফ্‌ফারের সাহস, ধীর্য্যবত্তা ও উৎসাহাগ্নি ক্ষণকালের মধ্যে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল।

উগ্রচণ্ডা নারী হেন্দাঃ, যুদ্ধকালে হজরত আবু দজানার (রাজিঃ) সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল; আর একটু হইলেই তদীয় প্রচণ্ড তরবারির আঘাতে উহার মস্তক ভূ-লুণ্ঠিত হইত। কিন্তু তিনি যখন উহাকে নারী বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন আঁ হজরতের (ছালঃ) পবিত্র তরবারি দ্বারা নারীবধ করা অন্যায় কার্য্য বলিয়া মনে করিলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার দিক হইতে ফিরিয়া অন্য দিকে (পুরুষদলের মধ্যে) মহাসংহার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মহিষ-মর্দ্দিনী রূপিনী হেন্দাঃ মৃত্যুর কবল হইতে এ যাত্রা রক্ষা পাইল। হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) ক্ষুধিত শার্দ্দূলবৎ শত্রুদলে মহাসংহার কার্য আরম্ভ করিয়া কোরেশদিগের পতাকা ধারী তাল্‌হাকে 'কতল' (হত্যা) করিলেন। তৎপর ভীম-বিক্রমে দুই হস্তে তরবারি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রচণ্ড ঝড়ের ন্যায় কোরেশ সৈন্যের লাইন ছিন্ন ভিন্ন ও মথিত করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত 'নেযাবায্' ওহ্‌সী নামক ক্রীতদাস, হজরত হামযাঃ (রাজিঃ)-কে হত্যা (শহীদ) করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল; সে হজরত হামযাঃ (রাজিঃ)-কে ভীমবেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া একখানি প্রস্তরের আড়ালে লুকাইল। যখন এই মহাবীর তাহার 'নেযার' আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তখন সে তাঁহার প্রতি সবলে 'হরবাঃ' (নেজা বা বল্লম বিশেষ) নিক্ষেপ করিল। উহা তাঁহার দেহের একপার্শ্ব দিয়া প্রবেশ করিয়া অপর পার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে এই মহাপ্রাণ মহাবীর পুরুষ বিরাট তালতরুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'শহীদ' হইলেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে

রাযেউন)। ওহ্‌সী হজরত হামযাঃ (রাজিঃ)-কে শহিদ করিবার সংবাদ, প্রতিহিংসা-পরায়ণা রণ-রঙ্গিণী হেন্দাঃ কে প্রদান করিল। হজরত হন্‌যেলা (রাজিঃ) প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ পূর্ব্বক কাফেরদিগকে নিজের সম্মুখ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি আবু-সুফিয়ানের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে তরবারির আঘাত করিলেন, এই সময় মদাদ-বিন্‌-আস্বদ লেছি পশ্চাদ্দিক হইতে তাঁহাকে তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাত করিল, সেই আঘাতেই তিনি শীহদ হইলেন (ইন্না লিল্লাহে—)। হজরত নযর-বিন্‌-আনছ (রাজিঃ) ও হজরত ছায়াদ-বিন্‌-রবিয় (রাজিঃ) রণক্ষেত্রে অদ্ভুত বীরত্ব-প্রদর্শন পূর্ব্বক, বহু কোফ্‌ফারকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। কোরেশদিগের ১২ জন পতাকাধারী ক্রমান্বয়ে মোসলমানদিগের হস্তে নিহত হইল; তন্মধ্যে ৮ জনকে 'শেরে খোদা' (আল্লাহ্‌ তা-লার শার্দ্দূল) হজরত আলী (রাজিঃ) একাই 'ক্বতল' (হত্যা) করিয়াছিলেন। কোরেশ দিগের আবদুল দার বংশীয় পতাকাধারী গণের মধ্যে একজন নিহত হইলে, তৎক্ষণাৎ আর একজন সেই পতাকা তুলিয়া খাড়া করিত; কিন্তু ১২শ তম পতাকাধারী নিহত হইলে আর কেহই সেই পতাকা তুলিয়া খাড়া করিতে সাহসী হইল না। মুষ্টিমেয় মোস্‌লেম সৈন্যের অমানুষিক বীরত্বের সম্মুখে ৩ সহস্র বিক্রান্ত কাফের সৈন্য রণক্ষেত্রে আর টিকিতে পারিল না। বেলা দ্বি-প্রহরের সময় তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ তাহারা সুশৃঙ্খল ভাবে পশ্চাতে হটিতে ছিল; কিন্তু পরক্ষণেই বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিতে লাগিল। যে রণ-রঙ্গিণী রমণীগণ উৎসাহ-সূচক রণ-সঙ্গীত গাহিয়া ও দফ্‌ বাজাইয়া পুরুষদিগকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল, তাহারা এই সময় পলায়মান সৈন্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জলস্রোতের পশ্চাদ্বর্ত্তী তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া চলিল। তাহাদের নেত্রী হেন্দারও সেই দশা ঘটিল, সেও নিজের সামগ্রী-

সম্ভার যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া পলায়ন করিল। এই সময় মোসলমানদিগের জয় ও কোরেশদিগের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিয়াছিল। বেলা ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়ই কাফেরগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছিল। এই অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত ঘাটি (গিরি-সঙ্কট) রক্ষক ধনুর্ধারী সেনাগণের মনে এমনই 'জোশ' ও উত্তেজনা উপস্থিত হইল যে, তাহারা বলিতে লাগিলেন যুদ্ধে ত আমাদের সম্পূর্ণ জয়লাভ ঘটিয়াছেই, এক্ষণে শত্রুদলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের মহাসংহার কার্য্য সম্পন্ন করি; ইহা দ্বারা আমরা যুদ্ধ-বিজয়ীর উচ্চ গৌরব লাভ করিতে পারিব। ঐ দলের সেনাপতি হজরত আবদুল্লা-বিন্ জবির (রাজিঃ) তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, স্থানত্যাগ করিতে প্রাণপণে বাধা দিলেন, এবং বলিলেন, যে পর্য্যন্ত আঁ হজরতের (ছালঃ) আদেশ না পাওয়া যায়, তৎকাল পর্য্যন্ত কোনও প্রকারেই আমাদের এস্থান ত্যাগ করা উচিত নয়। কিন্তু বিজয় লাভের আনন্দে, কোফ্ফারের পশ্চাদ্ধাবন এবং তাহাদের হত্যা সাধনের 'শওকে' তাঁহারা কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহারা গিরি-সঙ্কট ছাড়িয়া রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সময় কোরেশদলের দক্ষিণ বাহুর সেনাপতি মহাবীর খালেদ-বিন্-অলিদ, নিজের অধীনস্থ একশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া পূর্ব্বোক্ত ঘাটি (গিরিপথ) অধিকার করিবার জন্য দ্রুতগতি প্রধাবিত হইল। ঐ প্রয়োজনীয় ঘাটিটীর দিকে তাহার পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্য ছিল; এবং উহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। মহাবীর খালেদ স্বীয় বিক্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া, প্রায় ১ মাইল পথ ঘুরিয়া সেই 'ঘাটির' (গিরি-সঙ্কটের) পশ্চাদ্দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন অধিকাংশ (প্রায় সমুদয়) মোসলমান 'তীরান্দায্' (ধনুর্দ্ধর) ঘাটি ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছিলেন। হজরত জবির (রাজিঃ) এর সঙ্গে যে অত্যল্প সংখ্যক 'তীরান্দায্' ছিলেন, তিনি তাঁহা-

দিগকে লইয়া আপনাদের অপেক্ষা প্রায় ২০ বিংশতি গুণ অধিক সংখ্যক পরাক্রান্ত অশ্বারোহী সেনাদলের সহিত যুদ্ধ করিয়া; অবশেষে সকলেই 'শহীদ' হইলেন। গিরি-সঙ্কটের এই আকস্মিক আক্রমণের এই ফল হইল যে, খালেদ-বিন্-অলিদ কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রবল অশ্বারোহী সেনাদল গিরি-সঙ্কট অধিকার করিয়া মোসলমানদিগের পশ্চাদ্দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে মোসলমানগণ অনেকটা হতবুদ্ধি ও চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। বিজয়ী মোসলমান সৈন্যদলের মধ্যে হঠাৎ এক বিশৃঙ্খল ভাব উপস্থিত হইল। যে সকল মোসলমান যোদ্ধপুরুষ কোফ্ফারের পশ্চাদ্ধাবন করিতে ছিলেন, তাঁহারা ও আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন। মোসলমানদিগের ঈদৃশ অবস্থা, চাঞ্চল্য ও ব্যস্ততা দর্শনে কোরেশদিগের বাম বাহুর সেনাপতি আকরমা-বিন্-আবুজহল ও স্বীয় অধীনস্থ অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া মোসলমানদিগের প্রতি ধাবিত হইল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান সেনাপতি আবু-সুফিয়ান—যে ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছিল—স্বীয় অধীনস্থ বিশৃঙ্খল পদাতি সৈন্যদলকে কতকটা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। যাহারা প্রাণভয়ে বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিতেছিল, আশার বাণী শুনাইয়া তাহাদিগের গতিরোধ করিল। এক্ষণে কোফ্ফারগণ নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া প্রবলবেগে মোসলমান যোদ্ধপুরুষ দিগের উপর আপতিত হইল। ক্ষণকালের মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা সম্পূর্ণ ফিরিয়া গেল। মোসলমানদিগের উপর চতুর্দ্দিক হইতে ভীষণ ভাবে আক্রমণ আরম্ভ হইল। মোসলমানগণ চতুর্দ্দিক হইতে কোফ্ফারদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলেন। এই সময় যুদ্ধের কোনও শৃঙ্খলা রহিল না। মোসলমানদিগের দল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল; তাঁহারা এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় একেবারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের সামরিক-শৃঙ্খলা নষ্ট হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের এই অবস্থা দাঁড়াইল যে, স্থানে স্থানে

অল্পসংখ্যক মোসলমান, বিপুল সংখ্যক কোরেশ সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বিষম বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। একদলের সংবাদ অন্য দল জানিতে পারিলেন না। কোথাও বা একজন মাত্র মোসলমান বীরপুরুষ বহুসংখ্যক কোফ্ফার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহ-বিক্রমে যুঝিয়া শহীদ হইলেন। মোসলমানদিগের প্রতি চতুর্দ্দিক হইতে তরবারি ও নেযাঃ বর্ষিত হইতে লাগিল। আঁ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং ১২ জন মাত্র ছাহাবীর (রাজিঃ) সঙ্গে একস্থানে কাফেরদিগের ঘেরার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। হজরত মছয়ব-বিন্-য়মির (রাজিঃ) মোসলমানদিগের পবিত্র পতাকা ধারণ করিয়া আঁ হজরতের (ছালঃ) অতি নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলেন। ক্বমিয়া লেছি নামক কোফ্ফারের এক বিখ্যাত অশ্বারোহী পুরুষ তাঁহাকে ভীষণ-ভাবে আক্রমণ করিয়া শহীদ করিয়া ফেলিল। হজরত মছয়ব (রাজিঃ)-এর সঙ্গে হজরত রেছালত মাব (ছালঃ)-এর দৈহিক কতকটা সৌসাদৃশ্য ছিল; এজন্য ক্বমিয়া লেছি মনে করিয়াছিল, সে আঁ হজরত (ছালঃ)-কেই হত্যা করিয়াছে। তদনুসারে সে এক উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল যে, " ক্বদ-ক্বৎলত মোহাম্মাদান "। এই সংবাদে মোশরেকদিগের উৎসাহাগ্নি প্রবল আকার ধারণ করিল। তাহারা আনন্দে পিশাচবৎ নৃত্য ও দানববৎ আস্ফালন করিতে লাগিল। মোসল-মানগণ ঐ আওয়ায্ (চীৎকার ধ্বনি) শুনিয়া 'হয়রান-পেরেশান' এবং নিদারুণ শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িল। ঠিক ঐ সময়ই হজরত কায়াব-বিন্-মালেক (রাজিঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-কে দেখিয়া উল্লাস-ভরে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, ভাই মোসলমানগণ! তোমরা আনন্দিত হও, আশ্বস্ত হও, হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ) 'যেন্দাঃ' (জীবিত) আছেন। পরে স্বয়ং আঁ হজরত (ছালঃ) উচ্চ শব্দে ফরমাইলেন, " ইল্লা এবাদাল্লাহে আনা রছুলুল্লাহে "—" খোদার বান্দাগণ আমার দিকে

আইস, আমি খোদার রছুল।" এই পবিত্র ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন মোসলমানগণ শত্রুদলের সঙ্গে ভীম পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এই আওয়ায্ শুনিয়া যুদ্ধক্ষেত্রস্থ কাফেরগণও জানিতে পারিল, তিনি কোন্ স্থানে আছেন। ইহার ফল এই হইল যে, তাহারাও ঐ দিকে ঝুকিয়া পড়িল; আঁ হজরত (ছালঃ)-কে শহীদ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং যে স্থানে হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) দণ্ডায়মান ছিলেন, ঐস্থানই এক্ষণে যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল। মোসলমানদিগের কতিপয় যোদ্ধপুরুষ এই স্থান হইতে এত দূরে এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারা শত্রু-সমুদ্র পার হইয়া—আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকটে পঁহুছিতে পারিতে ছিলেন না, তাঁহারা পূর্ব্ববৎ ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ই রহিয়া গেলেন। এই গোলমাল এবং ব্যস্তসমস্ততার অবস্থায় আবদুল্ল-বিন্-শাহাব যহরী শহাব আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খুব নিকট গিয়া পঁহুছিল; এবং ঐ পাষণ্ড তাঁহার পবিত্র দেহে তরবারির আঘাত করিল। তাহাতে হজরত (ছালঃ)-এর 'চেহেরা মবারক' (বদন মণ্ডল) 'যখ্মি' (ক্ষত-বিক্ষত) হইল। এব্নে কমিয়াঃ নামক এক দুর্ব্বৃত্ত আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খুব নিকটে পঁহুছিয়া এমন জোরে তাঁহাকে তরবারির আঘাত করিল যে, 'খুদ' (লৌহ-মুকুট—শিরস্ত্রাণ বা লোহার নির্ম্মিত-টুপি) এর দুই টুকরা চেহেরা মবারকে—চক্ষের নিম্ন দেশস্থ হাড্ডিতে (হাড় বা অস্থিতে) প্রবেশ করিল; হজরত আবু ওবায়দাঃ-বিন্-জারারাহ্ (রাজিঃ) যখন ঐ খুদের অংশ স্বয় দাঁত-দিয়া টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন তাঁহার দুইটী দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। যখন আঁ হজরত (ছালঃ)-এর চেহেরা মবারকে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তখন তিনি বলিলেন, "ঐ 'কওম' (জাতি বা

সম্প্রদায়) কিরূপে 'ফলাহ্' (মঙ্গল—শান্তি) পাইতে পারে, যাহারা আপনাদের নবীর চেহেরা এজন্য রক্তাপ্লুত করিতে পারে যে, তিনি তাহাদিগকে খোদার দিকে আহ্বান্ করেন।" কাফেরগণ আপনাদের পূর্ণশক্তি, আঁ হজরতের (ছালঃ) হত্যা সাধন জন্য প্রয়োগ করিতে লাগিল ; ওদিকে কতিপয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ) তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিয়া কাফেরগণের আক্রমণ রোধ করিতে লাগিলেন। হজরত আবু দজানাঃ (রাজিঃ) আঁ হজরতের (ছালঃ) দিকে মুখ ফিরাইয়া পৃষ্ঠদেশ ঢাল স্বরূপ করিয়া রহিলেন। উপরোক্ত ব্যবস্থায় শত্রুর তীর-বল্লম বর্ষণে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ চালুনীর আকার ধারণ করিল ; কিন্তু সেই ধর্ম্মগতপ্রাণ, জলন্ত বিশ্বাসী, রছুল ভক্ত 'জান-নেছার' (জীবনোৎসর্গকারী) পুরুষ অম্লান বদনে সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন ; একটু মাত্রও বিচলিত হইলেন না। হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওক্কাস্ (রাজিঃ), হজরত আবি তাল্হা (রাজিঃ), হজরত যোবের-বিন্-আল্-আওয়াম (রাজিঃ), হজরত আবদুর রহমান-বিন্ ঋয়োফ্ (রাজিঃ) প্রভৃতি পরম ভক্ত ও বিশ্ব-ত্রাস বীর পুরুষগণ, আঁ হজরতের 'হেফাযৎ' (সংরক্ষণ) জন্য লৌহ-প্রাচীরের ন্যায় হুজুরের (ছালঃ) চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান থাকিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তীর, নেযাঃ ও তরবারি চালাইয়া শত্রু-দলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। হজরত তাল্হাঃ (রাজিঃ) শত্রুদলের অস্ত্রাঘাত স্বীয় হস্ত দ্বারা রোধ করিতেছিলেন ; বহু অস্ত্রাঘাতে তাঁহার একখানি হস্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। হজরত যেয়াদ-বিন্-ছকন আনছারী (রাজিঃ) স্বীয় ৫ জন সঙ্গীসহ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হেফাযৎ করিতে করিতে ঐ স্থানেই অতি শোচনীয় ভাবে শহীদ হইয়া গেলেন। হজরত এমার-বিন্-যেয়াদ (রাজিঃ) ও আঁ হজরত (ছালঃ)-কে রক্ষা করিতে গিয়া 'শাহাদৎ' প্রাপ্ত হইলেন। ওম্মে এমারাঃ (নসিবাঃ বিন্তে কায়াব) নাম্নী বীরাঙ্গণা যুদ্ধ দেখিবার

জন্ম মোসলমানদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলেন; যখন বেলা দ্বি-প্রহরের পর যুদ্ধের অবস্থা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; তখন তিনি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খুব নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এব্‌নে-কমিয়া যখন আঁ হজরত (ছালঃ)-কে তরবারির আঘাত করিল, তখন এই বীরাঙ্গণা তরবারি গ্রহণ পূর্ব্বক এব্‌নে কমিয়াকে উপর্য্যুপরি দুইটী প্রচণ্ড আঘাত করিলেন; কিন্তু উহার দেহ ডবল যরাঃ (বর্ম্ম) দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, এজন্য তাহার গায় তরবারির আঘাত লাগিল না; কিন্তু সে ওম্মে এমারাঃ (রাঃ—আঃ কে) তরবারির এক ভীষণ আঘাত করাতে, তাঁহার স্কন্ধদেশের নিকট বাহুমুল কাটিয়া গেল; তিনি ভীষণ ভাবে আহত হইলেন। যখন আঁ হজরতের (ছালঃ) চতুর্দ্দিকে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল, ঐ সময় এক পাষণ্ড কাফের নরাধম দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া হুজুর (ছালঃ)-এর প্রতি একখানি প্রস্তর নিক্ষেপ করে, তাহাতে তাঁহার ওষ্ঠদেশে ভীষণ আঘাত লাগে; সেই আঘাতে তাঁহার নীচের পাটির একটী দাঁত শহীদ হয়। এই অবস্থায় তাঁহার পা 'মবারক' এক গর্ত্তে গিয়া পড়াতে তিনি তাহাতে পতিত হন। তখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহার হস্ত ধরিলেন; আর হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) এবং হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। যখন ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ)-গণ ক্রমশঃ যুদ্ধক্ষেত্রের নানাস্থান হইতে তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইতে লাগিলেন, মোসলমানদিগের দল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল; এবং যুদ্ধ অতি ভীষণ ভাবে চলিতে লাগিল; তখন কোফ্‌ফারের আক্রমণ ক্রমশঃ শিথিল হইতে আরম্ভ হইল। ঐ সময় ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-গণ কাফের দিগকে ভীষণভাবে আক্রমণ পূর্ব্বক দূরে হটাইয়া দিতে লাগিলেন। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগকে নিকটস্থ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করিলেন; এবং তদনুসারে সকলকে

লইয়া পাহাড়ের একটী টিলায় আরোহণ করিলেন। পাহাড়ে আরোহণ করিবার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, কোফ্‌ফারের বেষ্টনী হইতে বাহির হইয়া পাহাড়ের দিকে পৃষ্ঠদেশ স্থাপন পূর্ব্বক অন্ততঃ শরীরের পশ্চাদ্দিক কাফের-দিগের আক্রমণ হইতে যেন রক্ষা করিতে পারেন, এবং যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্রস্থল ঐ স্থানে স্থাপিত হয়। এই ব্যবস্থা যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় বড়ই কার্য্যকরী ও ফলপ্রদ হইয়াছিল; মোসলমানগণ পাহাড়ের টিলার শীর্ষদেশে আরোহণ করাতে, কোরেশদিগের প্রধান সেনাপতি আবু-ছুফিয়ান ও কতিপয় যোদ্ধপুরুষ সহ তথায় আরোহণ করিতে চেষ্টা করিল; তদ্দর্শনে হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-কে আদেশ করিলেন যে, উহাদিগকে পাহাড়ের উপরে উঠিতে বাধা প্রদান কর। তদনুসারে হজরত ওমর (রাজিঃ) কতিপয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া, তাহার দলটীকে আক্রমণ পূর্ব্বক পাহাড়ের নীচে হঠাইয়া দিলেন। এক্ষণে মোসলমানদিগের সংখ্যা এইস্থলে ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহারা আসিয়া আঁ হজরতের (ছালঃ) চারিদিকে সমবেত হইতে লাগিলেন। সুতরাং কোফ্‌ফারের এমন সাহস হইল না যে, সেই স্থলে মোসলমানদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু আবি-বিন্‌-খলফ্‌ নামক একজন কাট্টা কাফের পূর্ব্ব হইতেই আঁ হজরত (ছালঃ)-কে হত্যা করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল। সে অশ্বারোহণে পাহাড়ের উপরে উঠিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। আঁ হজরত (ছালঃ) তাহার আগমনে বাধা দিতে ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগকে নিষেধ করিলেন; সুতরাং সে বিনা বাধায় আঁ হজরতের নিকটে পঁহুছিয়া আক্রমণার্থ তরবারি উত্তোলন করিবামাত্র, হুজুর (ছালঃ) হারেছ-বিন্‌-ছম্মা (রাজিঃ)-এর হস্ত হইতে নেযাঃ গ্রহণ পূর্ব্বক উহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। নেযার ফলা উহার হাঁসলী অর্থাৎ গরদানের (ঘাড়ের) নীচের

অস্থিতে গিয়া লাগিল। এই আঘাত খুব সামান্য বলিয়া মনে হইয়াছিল; কিন্তু সে এই আঘাত প্রাপ্তিমাত্র ভয়ে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পলায়ন করিল। এই অবস্থায় মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যেই তাহার পাপ জীবনের অবসান হয়। ওহদের যুদ্ধে এই একটী মাত্র কাফের আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তে প্রথমে আহত, পরে নিহত হইয়াছিল।

অতঃপর আবু-ছুফিয়ান উচ্চৈঃস্বরে বলিল, (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) কি তোমাদের মধ্যে আছে? আঁ হজরত (ছালঃ) বলিলেন, তোমরা একথার কোনই উত্তর দিও না। তদনুসারে তাহার কথার কোন উত্তর দেওয়া হইল না। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে কি (হজরত) আবুবকর (সিদ্দিক—রাজিঃ) আছে? একথারও কোন উত্তর দেওয়া হইল না। পুনরায় সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে কি (হজরত) ওমর এব্‌নোল খেতার (রাজিঃ) আছে? ইহারও কোন উত্তর প্রদত্ত হইল না। সকলকে নীরব দেখিয়া সে বলিতে লাগিল, বোধ হইতেছে ইহারা সকলেই 'কতল' (নিহত) হইয়াছে। ইহা শুনিয়া হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) আর নীরব থাকিতে পারিলেন না; তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, হে খোদার দোস্মণ (শত্রু)! ইহারা খোদার ফজলে সকলেই জীবিত আছেন; তুমি অবমানিত ও অপদস্থ হইবে। এই কথা শুনিয়া সে বিস্ময়াপন্ন হইল। কিন্তু একটু পরেই আত্ম-গরিমা-সূচক ভঙ্গী ও ভাষায় বলিতে লাগিল, হবলের জয়, হবলের জয়, (হবল মক্কার কোরেশদিগের একটী উপাস্য দেবতা, 'বোত' বা প্রতিমা)। আঁ হজরতের (ছালঃ) উপদেশানুযায়ী হজরত ওমর (রাজিঃ) বলিলেন, "আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ বোযর্গ' (শরীফ্—মহাসম্মানিত)। আবু-ছুফিয়ান হজরত ওমর ফারুকের (রাজিঃ) মুখে এই কথা শুনিয়া বলিল, 'য়োজ্জ' আমাদের 'বোত' (উপাস্য দেবতা), তোমাদের নহে। হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), আঁ হজরতের (ছালঃ) ইঙ্গিত ক্রমে বলিলেন,

"আল্লাহ্ আমাদের 'ওয়ালী' (অধিপতি), তোমাদের ওয়ালী নহেন।" তৎপর আবু-ছুফিয়ান বলিল, এই যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের সমান হইয়াছে,—অর্থাৎ আমরা বদর যুদ্ধের 'বদলা' (প্রতিশোধ) লইয়াছি। হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) আঁ হজরতের (ছালঃ) ইঙ্গিত ক্রমে উত্তর দিলেন যে, না, তা কখনই নয়; এ যুদ্ধ বদর যুদ্ধের সমান হয় নাই—হইতে পারে না। কেননা, আমাদের শহীদগণ 'জন্নত' (বেহেশ্ত্—স্বর্গ)-বাসী হইয়াছেন, আর তোমাদের পক্ষের নিহত লোক গুলি 'দোযখ্' (নরক) এ গমন করিয়াছে। ইহার পর আবু-ছুফিয়ান কিছুকাল চুপ হইয়া থাকিয়া আর কোনও রূপ বাক্যব্যয় করিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার 'বোলন্দ আওয়াযে' (উচ্চৈঃস্বরে) বলিল, অতঃপর আগামী বর্ষে 'বদর ক্ষেত্রে' তোমাদের সঙ্গে আমাদের 'মোকাবেলা' (বল-পরীক্ষা) হইবে। আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, বলিয়া দাও, আচ্ছা, আমরা তোমাদের এই 'ওয়াদাঃ' (প্রতিশ্রুতি) মঞ্জুর করিতেছি। আবু-ছুফিয়ান স্বীয় বক্তব্য বলিয়া এবং হজরত রেছালতমাবের (ছালঃ) ইঙ্গিতানুযায়ী হজরত ওমর ফারুকের (রাজিঃ) উত্তর শুনিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। তখন আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে আবু-ছুফিয়ানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাঠাইলেন; তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, মক্কাবাসীদিগের যাত্রা করিবার ব্যাপার গোপনে প্রত্যক্ষ করিবে, যদি তাহারা উষ্ট্রের উপর হাওদা বা গদি বাঁধে, অশ্বগুলিকে শূন্য-পৃষ্ঠে রাখে, তবে উহারা মক্কাভিমুখে যাত্রা করিবে; আর যদি অশ্বোপরি আরোহণ করে, আর উটের উপর গদি না চড়ায়, তবে উহারা মদীনা আক্রমণের ইচ্ছা রাখে। যদি তাহারা মদীনা আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকে, তবে আমরা প্রথমেই উহাদিগকে আক্রমণ করিব। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আবু-ছুফিয়ানের পশ্চাদনুসরণ করিলেন; এবং কিছুকাল পরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বলিলেন,

উহারা উটের উপর চড়িয়া, অশ্ব গুলিতে জিনপোষ না কষিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে। এই সংবাদে আঁ হজরত (ছালঃ) নিশ্চিন্ত হইয়া পাহাড়ের টিলা হইতে নিম্নে (যুদ্ধক্ষেত্রে) অবতরণ করিলেন; ৬৫ জন আন্‌ছার ও ৪ জন মহাজেরীন এই ভীষণ যুদ্ধে 'শহীদ' (নিহত) হইয়াছিলেন। কাফেরগণ মোসলমানদিগের কোনও কোনও মৃতদেহ কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়াছিল। হেন্দাঃ-বিন্তে ওতবাঃ (আবু-ছুফিয়ানের স্ত্রী), হজরত আমীর হামযার 'লাশ' (মৃতদেহ) মোছলা করিয়াছিল; অর্থাৎ তাঁহার নাক কাণ কাটিয়া ফেলিয়াছিল; চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিয়াছিল; বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ কারিয়া 'জগর' (হৃৎপিণ্ড) কাটিয়া বাহির করিয়াছিল; এবং নরখাদিকাঃ রাক্ষসীর ন্যায় উহা চিবাইয়াছিল, কিন্তু গলাধঃ করিতে পারিয়াছিল না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, এক বৃক্ষতলে তাঁহার পবিত্র বীরদেহে পড়িয়াছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় পরম ভক্ত ও জীবনোৎসর্গকারী, সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত পিতৃব্যের মৃতদেহের এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া রোদন করিয়াছিলেন। হেন্দাঃ এই সময় "জগরখার" (হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ কারিণী) নামে অভিহিত হইয়াছিল। মোসলমানদিগের 'আলম-বরদার' (পবিত্র পতাকাধারী) হজরত মছয়ব-বিন্‌-য়মির (রাজিঃ) এই যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন; তাঁহার কাফনের জন্য মাত্র একখানা চাদর ছিল; সেই চাদর খানা এত ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকিলে পা খোলা থাকিত; আর পা ঢাকিলে মাথা খোলা থাকিত; অবশেষে চাদরখানা দিয়া মাথা ঢাকিয়া, ঘাস দ্বারা পদদ্বয় আচ্ছাদিত করা হইল। সমুদয় 'শোহাদা' (শহীদগণ)-কে বিনা গোছলে, শোণিত-রঞ্জিত অবস্থায়, প্রত্যেক কবরে দুই দুইটী করিয়া সমাধিস্থ করা হইল। আঁ হজরত (ছালঃ) শহীদগণের জানাযা ও দফন কার্য্য সমাধা করিয়া সদল বলে মদীনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই যুদ্ধ—যাহা মদীনা হইতে ৩ মাইল দূরে ওহদ ক্ষেত্রে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে 'আহদ-নামা' (সন্ধিপত্র) অনুসারে মদীনার য়িহুদিগণ মোসলমানদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া মক্কার কাফেরদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাধ্য ছিল। মোনাফেক দলপতি আবদুল্লা-বিন্-আবি যখন পথিমধ্য হইতে ৩০০ শত সহগামী সহ মোসলমানদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেল, এবং মোসলমান যোদ্ধপুরুষদিগের সংখ্যা ১০০০ হইতে ৭০০ শতে দাঁড়াইল, তখন কোনও কোনও ছাহাবাঃ (রাজিঃ) আঁ হজরত (ছালঃ)-কে বলিয়াছিলেন, এ সময় সন্ধি-শর্ত্ত অনুসারে য়িহুদি-দিগের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তিনি য়িহুদিগণের সাহায্য গ্রহণ করা সঙ্গত বোধ করিলেন না ; সুতরাং য়িহুদিগণ নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। হারেছ বিন্-ছোয়েদ নামক একজন 'মোনাফেক' (কপটী), মোসলমানদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া ওহদে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল ; যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন ঐ পাষণ্ড মোনাফেক লোকটা মজযর-বিন্-যেয়াদ (রাজিঃ) ও কয়েস্-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ) নামক দুইজন মোসলমান-কে 'শহীদ' করিয়া মক্কাভিমুখে পলায়ন করিল। যুদ্ধের কিছুকাল পরে সে আবার মদীনায় ফিরিয়া আসিল ; তৎপর সে ধৃত হইয়া হজরত ওসমান-বিন্-আফ্ফান (রাজিঃ)-এর হস্তে 'কতল' (নিহত) হইল।

আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনায় পঁহুছিয়া পরদিন (৩য় হিজরীর ১৬ই শওয়াল, রবিবার) আদেশ জারী করিলেন যে, যাহারা ওহদের যুদ্ধে যোগ দান করিয়াছিল, কেবল তাহারাই এবার কোফ্ফারের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য যাত্রা করিবে ; যাহারা ওহদ যুদ্ধে যোগদান করে নাই, তাহারা আগামী যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিবে না। কেবলমাত্র জাবের-বিন্-আবদুল্লা (রাজিঃ) নামক একজন ছাহাবাকে তিনি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। হজরতের আদেশানুসারে ওহদের যুদ্ধে যে সকল

ছাহাবাঃ (রাজিঃ) যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা, এমন কি—আহত ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ ও মহা উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) সশিষ্যে মদীনা হইতে বাহির হইয়া "হামরা-আল্-আছদ" নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন, এবং ৩ দিন পর্য্যন্ত তিনি সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। ঘটনাক্রমে মায়বদ-বিন্-আবি মায়বদ খযায়ী নামক এক ব্যক্তি মক্কায় যাইবার সময় ঐ দিক দিয়া গমন করিতেছিল। 'মোশ্রেকীন' প্রত্যাবর্ত্তন কালে "রুহা" নামক স্থান পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধে যে তাহারা জয়ী হয় নাই, বরং পরাজিত হইয়াছে, আলোচনার দ্বারা তাহা স্থির হইল। এই যুদ্ধে তাহাদের ১৭ জন খ্যাতনামা বীরপুরুষ এবং কোরেশ দলপতি, আর ৫।৬ জন অপর সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ যোদ্ধপুরুষ নিহত হইয়াছিল; তাহারাই প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিল; মোসলমান পক্ষের একজন লোককেও তাহারা বন্দী করিতে পারিয়াছিল না, তাহাদের কোনও জিনিষ-পত্র হস্তগত করিতেও সক্ষম হইয়াছিল না; মোসলমানগণ তাহাদের পরেও যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া স্বপক্ষীয় শহীদ লোকদিগের সমাধি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, সুতরাং কোরেশদিগের জয়ী হইবার দাবী সম্পূর্ণ নিরর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছিল। এজন্য তাহারা "মারিব, কিংবা মরিব" এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া, পুনরায় মদীনায় দিকে প্রধাবিত ও যুদ্ধ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তদনুসারে প্রধান সেনাপতি আবু-ছুফিয়ান এই সমগ্র সেনাদল লইয়া আবার রুহা হইতে মদীনার দিকে অভিযান করিতে প্রস্তুত হইল; উদ্দেশ্য, এইবার বিপুল বিক্রমে মদীনা নগর আক্রমণ পূর্ব্বক মোসলমানদিগকে নির্ম্মূল করিবে। এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত মায়বদ-বিন্-আবি মায়বদ মদীনার দিক হইতে রুহায় আসিয়া পঁহুছিল। ঐ ব্যক্তি আবু-ছুফিয়ান-প্রমুখ কোরেশ দলপতিগণকে এই সংবাদ শুনাইল যে, (হজরত)

মোহাম্মদ (ছালঃ) সদলবলে মদীনা হইতে বাহির হইয়া তোমাদের 'তায়াকুব' (পশ্চাদ্ধাবন) করিবার জন্য দ্রুতগতি আসিতেছেন। আমি ঐ মোসলমান সেনাদলকে "হামরায়ল-আসদে" দেখিয়া আসিয়াছি; আর সম্ভবতঃ তাঁহারা অতি সত্বরেই তোমাদের নিকট আসিয়া পঁহুছিবে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র কোরেশ সৈন্যদল ভয়ে একান্ত অভিভুত হইয়া, উৰ্দ্ধশ্বাসে মক্কাভিমুখে পলায়ন করিল। তাহাদের যত দর্প-গর্ব্ব—যত দম্ভ-বড়াই, মুহূর্ত্ত মধ্যে লোপ পাইল। ভীত ও আতঙ্কিত কোরেশ দল মক্কায় পঁহুছিয়া শান্তির নিশ্বাস ফেলিল। আঁ হজরত (ছালঃ) যখন বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিতে পারিলেন যে, কোফ্ফার ভীত ও আতঙ্কিত অবস্থায় মক্কার দিকে পলায়ন করিয়াছে, তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে সদলবলে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই অভিযানের ফলে মক্কার কোরেশদিগের হৃদয়ে মোসলমানদিগের ভয় দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল। আবার এই অভিযানের ফলে মদীনা নগর কোরেশদিগের ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

এই অভিযানের পর "যেলহজ্জ" মাস পর্য্যন্ত আর কোনও উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। এই বৎসর রমজান মাসের মাঝামাঝি সময়ে হজরত হাসান এব্নে আলী (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন।

হেজরতের চতুর্থ বৎসর।

৪র্থ হিজরীর ১লা মোহর্‌রম আঁ হজরত (ছালঃ) সংবাদ পাইলেন যে, "কতন" নামক স্থানে "বনি-আসদ" সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক বিপ্লববাদী সমবেত হইয়াছে; তালহা-বিন্-খোয়েলদ্ এবং সলমাঃ-বিন্-খোয়েলদ্ তাহাদের নেতা বা পরিচালক। সংবাদ পাইবামাত্র আঁ হজরত (ছালঃ)

আবু-ছালমাঃ-মখ্‌যোমি (রাজিঃ)-কে ১৫০ দেড়শত যোদ্ধপুরুষ সহ তাহাদের দমন জন্য পাঠাইলেন। হজরত আবু-ছালমাঃ (রাজিঃ) "কতনে" পঁহুছিয়া জানিতে পারিলেন যে, বিপ্লববাদিগণ মোসলমানদিগের রওয়ানা হইবার সংবাদ শুনিয়া, তাঁহাদের পঁহুছিবার পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের কতকগুলি পালিত পশু মোসলমানদিগের হস্তগত হইল; ঐ পশুপাল সহ হজরত আবু-ছালমাঃ (রাজিঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ওয়াদি আরফাতের নিকট "আরনাঃ" নামক একটী স্থান আছে, ঐ স্থানে ছফিয়ান-বিন্‌-খালেদ য়িয্‌লী নামক একজন কাট্টা কাফের বাস করিত। সে অন্যান্য কাফেরদিগকে সমবেত করিয়া মদীনা আক্রমণের জন্য রণ-সজ্জা করিতে লাগিল। উহার যুদ্ধ-সজ্জার সংবাদ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট ক্রমাগত আসিতেছিল। তদনুসারে তিনি ৪র্থ হিজরীর ৫ই মোহর্‌রম তারিখে আবদুল্লা-বিন্‌-আনিছ (রাজিঃ)-কে একদল সৈন্যসহ "আরনাঃ" অভিমুখে রওয়ানা করিলেন। আবদুল্লা-বিন্‌-আনিছ (রাজিঃ) দিবাভাগে সসৈন্যে কোথাও লুকাইয়া থাকিতেন; এবং রাত্রিকালে পথ চলিতেন; এইরূপে আরনায় গিয়া পঁহুছিলেন; এবং কোনও কৌশলে বিপ্লববাদীদিগের নেতা ছফিয়ান-বিন্‌-খালেদ য়িয্‌লীর মুণ্ডপাত করিলেন; তিনি যুদ্ধ-হাঙ্গামার দিকে গেলেন না; উহার ছিন্ন মুণ্ড লইয়া অতি সতর্কতার সহিত সরিয়া পড়িলেন; রওয়ানা হইবার ১৮ দিন পরে—২৩শে মোহর্‌রম তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং বিপ্লবপন্থী নেতার ছিন্ন মুণ্ড আঁ হজরতের (ছালঃ) পদতলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ মাসের সফর মাসে মক্কার কোরেশগণ বনি য়জল ও কারা-(বনু-আসদের ভ্রাতা সম্পর্কীত) ৭ ব্যক্তিকে 'ফেরেব' (চক্রান্ত) করিয়া আঁ হজরতের (ছালঃ) সমীপে পাঠাইয়া দিল। উহারা মদীনায় পঁহুছিয়া

'হুজুরের' (ছালঃ) খেদমতে 'আরজ' করিল, আমাদের সমগ্র সম্প্রদায় ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে ; অতএব আপনি আমাদের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সর্ব্ব প্রকার নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান জন্য কতিপয় উপযুক্ত শিক্ষাদাতা মোসলমান পাঠাইয়া দিন, তাঁহারা আমাদিগকে ইস্‌লামের সর্ব্ব-প্রকার নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিবেন। তদনুসারে আঁ হজরত (ছালঃ) সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, দশজন উপযুক্ত শিক্ষাদাতা মোসলমান-কে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইলেন। এই ধর্ম্মপ্রাণ মোসলমানগণ যখন বিশ্বাস ঘাতকদিগের সঙ্গে " রজিয় " নামক একটী কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন ; তখন উহাদের ইঙ্গিত ক্রমে হযিল সম্প্রদায়ের ২০০ দুই শত যোদ্ধপুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। মোসলমানগণ আপনাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন ; যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মোস্‌লেম-বীরগণ আদর্শ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া বহু শত্রুর নিপাত সাধন পূর্ব্বক ৮ জন সেই স্থানেই শহীদ হইলেন। কেবল খবিব-বিন্-আদি (রাজিঃ) ও যয়েদ-বিনল্-দছনাঃ (রাজিঃ)-কে কাফেরগণ ধৃত করিয়া মক্কায় লইয়া গেল ; কোরেশগণ এই দুইজন ধর্ম্মপ্রাণ আদর্শ মোসলমানকে তরবারির আঘাতে ও শূলবিদ্ধ করিয়া অতি নৃশংস ভাবে 'শহীদ' (হত্যা) করিল। ইঁহারা যে ভাবে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের রক্ষার্থে পরম করুণাময় আল্লাহ তা-লার এবং তাঁহার প্রিয় রছুলের আদেশ পালন পূর্ব্বক নির্ভীক ভাবে জীবন দান করিয়াছিলেন, জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। ইঁহাদের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে আঁ হজরত (ছালঃ) এবং ছাহাবাঃ (রাজিঃ) মণ্ডলী বড়ই দুঃখিত এবং মর্ম্মাহত হইলেন। ৪র্থ হিজরীর 'সফর' মাসে আবু-বরয়া-বিন্-আমের নজদী, আঁ হজরতের (ছালঃ) খেদমতে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে ইসলাম ধর্ম্ম-গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন ; সে আপাততঃ ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইয়া বলিল, আমাকে আমার

সম্প্রদায়ের 'খেয়াল' রহিয়াছে; আপনি কতিপয় উপযুক্ত লোক আমার সঙ্গে দিন, তাঁহার নজদে গমন পূর্ব্বক আমার জাতির মধ্যে ইস্‌লামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবেন, এবং যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে ইস্‌লামের দিকে আকৃষ্ট করিবেন। আঁ হজরত (ছাবঃ) ফরমাইলেন, নজদ বাসিদিগের সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ হইতেছে; তাহারা আমার লোকদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। আবু-বরয়াঃ বলিল, আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ইঁহাদিগকে নিজের হেফাযতে (তত্ত্বাবধানে) রাখিব। আঁ হজরত (ছালঃ) তচ্ছ্রবণে নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং মন্‌যর-বিন্‌-ওমরু-ছাদী (রাজিঃ)-কে ৭০ জন ছাহাবীর (রাজিঃ) সঙ্গে নজদে রওয়ানা করিলেন; এই ৭০ জন ছাহাবাঃ সকলেই "কারি" (১) এবং হাফেজ " (২) ছিলেন। যখন ইঁহারা " আরিজ্‌-বন্থ-আমের " এবং " হররাঃ-বন্থ-ছলিমের মধ্যবর্ত্তী " বীর-মউনায় " পঁহুছিলেন, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) একখানি পত্র হরাম-বিন্‌-মজান (রাজিঃ)-এর হস্তে আমের-বিন্‌-আল-তফিলের নিকট পাঠাইলেন। এই আমের-বিন্‌-আল্‌-তফিল, পূর্ব্বোক্ত আবুল-বরার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। সে এই পত্রখানি পড়িয়া ও দেখিল না; বরং হরাম-বিন্‌-মজান (রাজিঃ)-কে শহীদ করিয়া ফেলিল। পরে স্বীয় সম্প্রদায় বনি-আমেরকে উত্তেজিত করিয়া বলিল, এই সকল মোসলমানের হত্যা সাধন কর। কিন্তু বন্থ-আমের এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। তখন ঐ পাষণ্ড বন্থ-ছলিম সম্প্রদায়কে ঐ ভাবে উত্তেজিত করিল। তদনুসারে তাহাদের 'ছরদার' (দলপতি) রয়ল, যকোয়ান ও আছিয়াঃ এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। আর বিনা দোষে ও বিনা কারণে ঐ সকল পাষণ্ড বর্ব্বরগণ উপরোক্ত ৭০ জন মোসলমানকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে 'শহীদ'

---

(১) বিশুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে বিশুদ্ধ ভাবে কোরআন পাঠকারী।

(২) সম্পূর্ণ কোরআন পাক কণ্ঠস্থ (মুখস্থ) কারী।

(হত্যা) করিল। আবু-বরাঃ-বিন্-আমের বিন্-মালেকের হৃদয়ে, এই নির্দ্দয়তা-মূলক ব্যাপারে নিদারুণ আঘাত লাগিল। সে যাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবে বলিয়া সঙ্গে আনিয়াছিল, তদীয় দানব প্রকৃতির ভ্রাতুষ্পুত্র তাহাদিগকে অতি নির্দ্দয় রূপে হত্যা করিল। বহুসংখ্যক নির্দ্দোষ ক্বারী, হাফেজ, ভক্ত এবং আদর্শ মোসলমান অতি নৃশংস ভাবে শহীদ হইলেন। এই মানসিক যন্ত্রণায় আবু বরাঃ অতি অল্প দিন মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আমের-বিন-তফিল, হজরত ওমরু-বিন্-ওম্মিয়া যমিরি (রাজিঃ)-কে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল; সে তাঁহার দাড়ি মুণ্ডন করিয়া ছাড়িয়া দেয়। তিনি মদীনায় পঁহুছিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-কে সমুদয় ঘটনা জ্ঞাপন করিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) একমাস কাল পর্য্যন্ত ঐ সকল দুর্দ্দান্ত হত্যাকারিদিগের জন্য বদ-দোওয়া (অভিশাপ) প্রদান করিয়া ছিলেন। পাষণ্ড আমের-বিন্-তফিল একমাস পরে প্লেগ জাতীয় মহামারীতে শমন সদনে প্রেরিত হইল। হত্যাকারী অন্যান্য বহুলোকও অচিরে জাহান্নম-বাসী হইল। বলা বাহুল্য, নজদী লোক চিরদিনই দুর্দ্ধর্ষ, দুর্দ্দান্ত ও কঠোর হৃদয়। ওহাবী নজদী আমীর এব্‌নে ছউদের ওহাবী ভক্তবৃন্দ ও সৈন্যদল গত ১৩৩১ বঙ্গাব্দে "তায়েফ্" শহরে ১৩।১৪ শত মক্কা ওতায়েফ্ বাসী নির্দ্দোষ মোসলমানকে অতি নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করিয়াছিল। উহারাই মক্কা-মোয়াজ্জমা ও মদীনা-তৈয়বাঃ এবং ওহদের সমুদয় আহ্‌লে বয়েত, খোল্‌ফায়ে রাশেদীনদিগের মধ্যে হজরত ওস্‌মান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ), হজরত এমাম হাসান (রাজিঃ), স্বর্গের রাজ্ঞী হজরত ফাতেমা যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), মহাবীর হজরত হামযাঃ শহীদ (রাজিঃ), ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) গণ, প্রভৃতি শত শত বোযর্গের পাকা কবর ভাঙ্গিয়া 'মেছমার' করিয়াছে; মোসলমানদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই জালেম-চূড়ামণি এব্‌নে ছউদ আজ পবিত্র হেজাজের রাজা ও মক্কা-মদীনার খাদেম (?)।

হজরত ওমর-বিন্-ওম্মিয়া (রাজিঃ) নজদ হইতে প্রত্যাবর্তন কালে শত্রু-ভ্রমে বনু-আমেরের দুই ব্যক্তিকে কতল (হত্যা) করিয়াছিলেন। বনু-আমের সম্প্রদায় আঁ হজরত (ছালঃ) এর সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ ছিল; সুতরাং উক্ত দুই ব্যক্তির 'খুনবহাঃ' (মৃত্যুপণ বা মৃত্যুর পরিবর্তে ধন দান) করা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করিয়া, আঁ হজরত (ছালঃ) এতৎ সম্বন্ধে বনি-নবির দলের সঙ্গে পরামর্শ করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। তদনুসারে হজরত আবু-বকর সিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ও হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে সঙ্গে লইয়া তিনি বনি-নবিরদিগের মহাল্লায় গমন করিলেন, এবং উপরোক্ত রূপ মৃত্যু-পণ দানের প্রস্তাব করিলেন; তাহারা প্রকাশ্যে ত সেই ব্যাপারে যোগ দিতে প্রতিশ্রুত হইল; ও আপনাদের দুর্গ প্রাচীরের ছায়ায় তাঁহাদিগকে বসিতে আসন দিল; এবং অন্যান্য লোককে ডাকিয়া আনিবার 'ওছিলায়' (ছলে) এদিক ওদিকে চলিয়া গেল। উহারা আঁ হজরত (ছালঃ) ও প্রধান ছাহাবা (রাজিঃ)-ত্রয় কে যেস্থানে বসাইয়া ছিল, দুর্গের উচ্চ শীর্ষে স্থাপিত একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর তাঁহাদের উপর গড়াইয়া দিবার বেশ সুযোগ ছিল। তাহারা ইঁহাদের হত্যা সাধন জন্যই প্রস্তরখানি যথাস্থানে স্থাপন করে। ওমরু-বিন্-মহাছন নামক একজন য়িহুদী ঐ প্রস্তর গড়াইয়া ফেলিবার জন্য দুর্গ শীর্ষে আরোহণ করিল; প্রস্তর গড়াইয়া দিবার মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বেই পরম করুণাময় আল্লাহ তা-লা "ওহী" দ্বারা আঁ হজরত (ছালঃ)-কে য়িহুদি দিগের এই দুরভিসন্ধির বিষয় জ্ঞাপন করিলেন; তদনুসারে হুজুর (ছালঃ) ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ত্রয়কে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ মদীনায় প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের স্থান ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সেই বৃহদাকার প্রস্তরখানি ভীষণবেগে নিম্নে পতিত হইল। আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনায় পঁহুছিয়াই উহাদিগকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তোমরা ২য় বার আহদ নামা (সন্ধিপত্র) লিখিয়া দাও। তাহা না হইলে ১০

দিনের মধ্যে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। গর্ব্বোন্মত্ত য়িহুদিগণ ইহার কোনও প্রস্তাবেই সম্মত হইল না ; বরং ঔদ্ধত্য সহকারে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল এবং তাড়াতাড়ি যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আঁ হজরত (ছালঃ) ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ)-দিগকে লইয়া অনতিবিলম্বে উহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর য়িহুদিগণ পরাজিত হইয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মোসলমানগণ দুর্গ অবরোধ করিলেন ; ১৫ দিন অবরোধের পর তাহারা আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট আত্ম-সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। তদনুসারে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীত সমগ্র গৃহ-সামগ্রী লইয়া যাইতে হুজুর (ছালঃ) তাহাদিগকে অনুমতি দিলেন। তাহারা চিরদিনের জন্য জন্মভূমি হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, কতক খয়বরে ও কতক শামে (সিরিয়ায়) চলিয়া গেল। উহাদের মধ্যে কেবলমাত্র দুইজন য়িহুদী পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধ "গেয্‌ওয়ায়-বনি-নযির" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ৪র্থ হিজরীর রবিওল-আউওল মাসে—অর্থাৎ ওহদ যুদ্ধের ছয়মাস পরে এই যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ইহার পর বনু-মহারব এবং বনু-ছয়লবাঃ সম্প্রদায় বিপ্লব উপস্থিত করিবার উদ্যোগ করাতে, আঁ হজরত (ছালঃ) ৪০০ ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া উহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন ; কিন্তু আঁ হজরতের আগমন সংবাদ পাইয়াই তাহারা একান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিল, সুতরাং মোসলমানদিগকে আর যুদ্ধ করিতে হইল না। আঁ হজরত (ছালঃ) সশিষ্যে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আবু-ছুফিয়ান আগামী বর্ষে বদর-ক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ আসিবে বলিয়া গিয়াছিল। মদীনার মোনাফেকগণ কোরেশদিগকে মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। নয়ীম নামক মোনাফেক মক্কায় দূত স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল। সে কোরেশদিগের

নিকট হইতে পুরস্কার লাভের প্রতিশ্রুতি পাইয়া, মদীনায় আসিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল যে, কোরেশগণ বিরাট আয়োজনের সঙ্গে মদীনা আক্রমণ করিতে আসিতেছে ; এই সংবাদে মোসলমানগণ চিন্তিত ও ভীত হইলেন ; কিন্তু আঁ হজরত (ছালঃ) তাড়াতাড়ি যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া ১৫০০ ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) সহকারে বদরাভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেলেন। এই অভিযানে তিনি স্বীয় যুদ্ধ-পতাকা হজরত আলী (রাজিঃ)-এর হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাদলে অশ্বারোহী সৈন্য ছিলেন মাত্র ১০ জন, অবশিষ্ট সকলেই পদাতি সৈন্য ছিলেন। কোরেশদিগের এ সময় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, আঁ হজরতের (ছালঃ) সসৈন্যে বদর যাত্রার সংবাদে আবু-ছুফিয়ান অগত্যা সসৈন্যে বদরাভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহাদের সৈন্য-সংখ্যা ছিল ২০০০ দুই হাজার, তন্মধ্যে অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল ৫০। তাহারা 'য়্যাছফান' নামক স্থান পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া ভয়ে এই বলিয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল যে, এবার মক্কায় বিষম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত ; এই দুর্ভিক্ষের সময় যুদ্ধ করা সঙ্গত নহে। এই যোদ্ধদল যখন মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন তত্রত্য বীর রমণীগণ তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিল, তোমরা ত কেবল ছাতু খাইতে গিয়াছিলে ; যদি যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যাইতে, তবে কাপুরুষের ন্যায় বিনা যুদ্ধে ফিরিয়া আসিতে না। কোরেশগণ রসদের জন্য কতকগুলি ছাতুর বস্তা মাত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, এজন্য এই যুদ্ধ "জয়েশ-আস্-সভিক" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) কোরেশদিগের আগমন প্রতীক্ষায় ৮ দিন পর্য্যন্ত বদরে অবস্থিতি করিলেন ; যখন শুনিতে পাইলেন যে, কোরেশগণ "য়্যাছফান" নামক স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া মক্কায় ফিরিয়া গিয়াছে, তখন তিনিও সসৈন্যে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ৪র্থ হিজরীর রজব মাসে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

• আঁ হজরত (ছালঃ) শা'বান মাসের প্রারম্ভে মদীনা-মনুওরায়

ফিরিয়া আসিলেন। এই বৎসরেই হজরত আলীর (রাজিঃ) ২য় পুত্র হজরত এমাম হোসায়েন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। আর এই বৎসরই 'শরাব' (সুরা) হারাম হওয়া সম্বন্ধীয় আয়াত 'নাযেল' (অবতীর্ণ) হয়। আবার এই বৎসরেই ওস্‌মান জিন্নূরায়েন (রাজিঃ)-এর পুত্র আবদুল্লা ৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। এই বৎসরই জয়নব-বিন্‌-খযিমাঃ পরলোক গমন করিয়াছিলেন; আর আবদুস্‌-সালাম মখ্‌যুমীর (রাজিঃ) মৃত্যু হওয়াতে, তাঁহার বিধবা পত্নী ওম্মে-ছাল্‌মাঃ (রাঃ—আঃ) কো আঁ হজরত (ছালঃ) পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন। আবার হজরত ফাতেমাঃ—বিন্তে-আছিদ (রাঃ—আঃ) অর্থাৎ হজরত আলী করমুল্লাহ্‌ ওয়াজহুর 'ওয়ালেদা-মাজেদা' (জননী) ও এই ৪র্থ হিজরীতেই পরলোক গমন করেন।

হেজরতের ৫ম বৎসর।

(৫ম হিজরী)

বদরের দ্বিতীয় অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আঁ হজরত (ছালঃ), ৬।৭ মাস মদীনা-মনুওরায় 'কেয়াম ফরমাইলেন' (অবস্থান করিলেন)। এই কয়েক মাস সম্পূর্ণ শান্তির সহিতই অতিবাহিত হইয়াছিল। ৫ম হিজরী—রবিওল-আউওল মাসের প্রারম্ভে আঁ হজরত (ছালঃ) এই সংবাদ পাইলেন যে, সিরিয়া-সীমান্তস্থিত দোমতল জন্দলের শাসনকর্ত্তা খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী আকিদর-বিন্‌-আল্‌-মালেক, মদীনা-মনুওরা আক্রমণ করিবার জন্য এক বিরাট বাহিনী সজ্জিত করিয়াছে। আর যে সকল তেজারতি কাফেলা (বণিক্ দল) মদীনা হইতে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া শামে (শিরিয়ার)

গমন করে, সে পথিমধ্যে তাহাদের সামগ্রী-সম্ভার লুঠিয়া লয়। এই নূতন শত্রু ক্রমে ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে; আর উহারা মদীনা তৈয়বাঃ আক্রমণ করিলে এ রূপ আশঙ্কা ও আছে যে, মোনাফেকগণ, য়িহুদিগণ, আশপাশের আরব সম্প্রদায় (যাহারা তখনও পৌত্তলিক ছিল) মোসলমান-দিগের বিপদ আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিবে; এজন্য আঁ হজরত (ছালঃ) উচিত মনে করিলেন যে, প্রবল আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বেই এই বিপ্লবের মূলোৎপাটন করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে তিনি দোমতল জন্দলের শাসনকর্ত্তাকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, ছবায়-বিন্-আরফতাহ্ গফ্ফারি (রাজিঃ)-কে মদীনায় স্বীয় প্রতিনিধি নিয়োগ পূর্ব্বক, স্বয়ং এক হাজার যোদ্ধপুরুষ সঙ্গে লইয়া দোমতল জন্দল অভিমুখে অভিযান করিলেন। দোমতল-জন্দল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অতি প্রাচীন নগরী "দামেশ্ক্" শহর হইতে দক্ষিণে ৫ মঞ্জেল, ও মদীনা-তৈয়বাঃ হইতে উত্তরে ১০ মঞ্জেলের পথ—'শামের' (সিরিয়ার) দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। অর্থাৎ হেজাজ প্রদেশের উত্তর ও শাম দেশের দক্ষিণ দিকে এই সুবাটী তখন অবস্থিত ছিল। আঁ হজরত (ছালঃ), বনি-আয্রহ্ এর এক ব্যক্তিকে পথ-প্রদর্শক রূপে সঙ্গে লইয়াছিলেন। যখন দোমতল-জন্দল এক রাত্রির পথ দূরে রহিল, তখন পথ-প্রদর্শক বলিল, শত্রুদলের 'চেরাগাহ্' (পশু-চারণ-ভূমি) অতি নিকটেই অবস্থিত, উহাদের পশুপাল এই সুযোগে হস্তগত করা উচিত মনে করিতেছি। তদনুসারে আঁ হজরত (ছালঃ), মোসলমান দিগকে শত্রুদলের পশুদল হস্তগত করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রাপ্তিমাত্র মোসলমানগণ অগ্রসর হইয়া শত্রুদিগের বিরাট পশুদল হস্তগত করিলেন। এই সংবাদ যখন দোমতল-জন্দলের শাসনকর্ত্তার নিকট পঁহছিল, তখন এত শীঘ্র মোসলমান সেনাদলের তথায় উপস্থিত হইবার ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া সে পলায়ন করিল। শত্রুদল

'ফেরার' (পলায়ন পর) হওয়াতে আঁ হজরত (ছালঃ) কিয়দ্দিবস সেখানে অবস্থান পূর্ব্বক, যোদ্ধপুরুষদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ হইতে কেহই তাঁহাদের সম্মুখীন হইল না। এইরূপে শামের (সিরিয়ায়) সীমান্ত প্রদেশে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া, তিনি সদলবলে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে পাঁচ মাস কাল পর্য্যন্ত কোনও প্রকার উল্লেখযোগ্য 'আহম' (গুরুতর) ঘটনা ঘটিয়াছিল না। এই অবসরে আঁ হজরত (ছালঃ)-ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ)-দিগের 'তরবিয়ত' (শিক্ষা-দীক্ষা কার্য্য) এবং তবলিগল্-ইস্‌লাম (ইস্‌লাম-ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে) আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। ৫ম হিজরীর শ'াবান মাসে সংবাদ পঁহুছিল যে, " বনু-আল্-মছতালক " সম্প্রদায়ের ছরদার (দলপতি) হারেছ-বিন্-জরার বিপুল আয়োজনের সহিত সমর-সজ্জা করিতেছে। আর সে আরবের অন্যান্য 'কবায়েল' (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী)-কে আপনার 'শরীক' (দলভুক্ত) করিয়া লইতেছে। আঁ হজরত (ছালঃ) প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার জন্য বরিদাঃ-বিন্-হাছিব (রাজিঃ)-কে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঠাইলেন। তিনি বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা যে অবস্থা জানিতে পারিলেন, প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আঁ হজরত (ছালঃ)-কে তাহা বলিলেন। তিনি বলিলেন, হারেছ-বিন্-জরার মোসলমানদিগের জড়-মূল উৎপাটিত করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, এবং তজ্জন্য যতদূর সম্ভব, নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে। সে বহু বিভিন্ন সম্প্রদায় (দল বা গোষ্ঠী)-কে আপনার দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ পঁহুছিল যে, হারেছ অতি সত্বরে বিপুল বাহিনী লইয়া মদীনা আক্রমণার্থ অগ্রসর হইবে। তদনুসারে আঁ হজরত (ছালঃ) ও তৎক্ষণাৎ মোসলমান বীরপুরুষদিগকে সজ্জিত হইবার জন্য আদেশ দিলেন। মদীনায় যয়েদ-বিন্-হারেছাঃ (রাজিঃ)-কে

স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং 'লশ্‌কর-এস্‌লাম' (মোসলমান সেনাদল) সহকারে দ্রুতবেগে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। মহাজেরিন ও আন্‌ছার দিগের দুইটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'আলম' (যুদ্ধ-পতাকা) ছিল। আন্‌ছার দিগের যুদ্ধ-পতাকা হজরত ছায়াদ-বিন্‌-এবাদার (রাজিঃ) হস্তে, আর মহাজেরিন দিগের যুদ্ধ-পতাকা হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। হজরত ওমর-ফারুক (রাজিঃ)-কে "মকদ্দমাতুল-জয়েশ্‌" অর্থাৎ অগ্রগামী সেনাদলের সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক যুদ্ধে মোসলমানদিগকে সাফল্য মণ্ডিত দেখিয়া, যুদ্ধে জয়-লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার লাভের আশায় 'মোনাফেক' (কপটাচারী)-দিগের দলপতি আবদুল্লা-বিন্‌-আবি ও, তাহার দলের মোনাফেক দিগকে সঙ্গে লইয়া এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। এই মোনাফেক দল প্রকাশ্য ভাবে আপনাদিগকে মোসলমান বলিয়া পরিচয় দিত, এজন্য মোসলমানদিগের সর্ব্বপ্রকার 'হক্‌-হকুক্‌' (স্বত্বও অধিকার) উহারা লাভ করিত। সুতরাং যুদ্ধে যোগদান করিতে তাহাদিগকে নিষেধও করা যাইত না; আবার মোসলমানগণ এখন পর্য্যন্ত এমন শক্তিশালী হইয়াছিলেন না যে, প্রকাশ্য-ভাবে উহাদিগের সঙ্গে শত্রুতা ও যুদ্ধাদি করিয়া এই প্রবল দলটীর মূলোৎপাটন করিতে পারেন।

হারেছ-বিন্‌-জরার এক 'জাছুছ' (গোয়েন্দাঃ বা গুপ্তচর) পাঠাইয়াছিল, ঘটনাক্রমে সে মোস্‌লেম সৈন্যদলের সম্মুখে পতিত হইয়া ধৃত হয়; তাহাকে তৎক্ষণাৎ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হইল; সে যখন গুপ্তচর বলিয়া 'সাব্যস্ত' (প্রমাণিত) হইল, এবং ইস্‌লাম-ধর্ম্মগ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল, তখন তদানীন্তন 'জঙ্গী-কানুন' (সামরিক আইন) অনুসারে উহাকে 'কতল্‌' (প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বা হত্যা) করা হইল। হারেছ যখন জানিতে পারিল, তাহার গুপ্তচর ধৃত ও নিহত হইয়াছে, এবং আঃ হজরত

(ছালঃ) সসৈন্যে—দ্রুত গমনে অতি নিকটে পঁহুছিয়া গিয়াছেন, তখন সে নিতান্ত 'পেরেশান' (চিন্তাযুক্ত) ও 'বদ-হাওয়াছ' (ভীত ও সন্ত্রস্ত) হইয়া পড়িল। আঁ হজরত (ছালঃ) অগ্রসর হইয়া 'চশমা' (ঝরণা) মরছিয়ির তটে গিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। অগত্যা হারেছ ও নিজের সেনাদল লইয়া ঐ চশ্‌মার (ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর) অপর তটে আসিয়া পঁহুছিল। আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-কে আদেশ করিলেন, তুমি অগ্রসর হইয়া হারেছকে ইস্‌লামের 'দাওত' দাও (ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ জন্য প্রস্তাব বা অনুরোধ কর); তদনুসারে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) অগ্রসর হইয়া উহাকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ জন্য আহ্বান করিলেন; কিন্তু সে অতি বে-আদবীর সহিত রূঢ়ভাবে উহাতে এন্‌কার (অস্বীকার) করিল। ইহার অব্যবহিত পরেই উভয় প্রতিপক্ষ দল পরস্পরকে আক্রমণ করিল। ঘোরতর যুদ্ধের সময় কোফ্‌ফারের 'আলম-বরদার' (পতাকা-ধারী), হজরত আবু-কেতাদাঃ (রাজিঃ)-এর হস্তে নিহত হইল। হারেছের পতাকা-ধারী নিহত হওয়াতে, কাফের সেনাদলের পদ-স্খলন হইল, তাহারা ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া মোসলমান যোদ্ধপুরুষদিগের সম্মুখ হইতে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। বহু-সংখ্যক কাফের নিহত, আহত ও বন্দী হইল। বন্দীদিগের মধ্যে জোবেরিয়া নাম্নী কাফের সেনাপতির এক কন্যাও ছিলেন। 'মালে গণিমত' (যুদ্ধে জয়-লব্ধ দ্রব্য-সামগ্রী) ও বহু পরিমাণে মোসলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। মরছিয়ি নাম্নী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তটে—যে স্থানে বনি-মছতলক সম্প্রদায়স্থ য়িহুদিদিগের সঙ্গে আঁ হজরতের (ছালঃ) যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, উহা মদীনা-মনুওরাঃ হইতে ৯ মঞ্জেল পথ দূরে অবস্থিত।

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এই অভিযান ও এই ছফরে আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। সে ঘটনাটী এই:—

এই অভিযানে ওম্মোল-মুমেনিন (মোসলেম-মাতা) হজরত আয়েশা-সিদ্দিকা (রাঃ—আঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। এক "মঞ্জেলে" রাত্রিকালে মোসলমান সৈন্যগণ শিবির স্থাপন করিলেন। সেখান হইতে রওয়ানা হইবার সময় হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর 'হোদজ' (হাওদা) উটের উপর স্থাপন করা হইল; কিন্তু একথা জানিতে পারা গিয়াছিল না যে, তিনি হোদজের মধ্যে আছেন কিনা? কারণ তিনি ক্ষীণাঙ্গিনী ছিলেন বলিয়া উষ্ট্র-চালক তাঁহার অনুপস্থিতি বুঝিতে পারিয়া ছিল না। ফলতঃ তিনি "রফায়ে-হাজত" জন্য শেষ রাত্রে ময়দানের, দিকে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ এক ছড়া হার ছিঁড়িয়া যাওয়াতে উহা কুড়াইয়া লইতে তাঁহার কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শিবির-সন্নিবেশ স্থানে আসিয়া দেখিলেন, সে স্থান শূন্য পড়িয়া আছে; সেনাদল তাম্বু-কানাৎ তুলিয়া সঙ্গীয় পশ্বাদি সহ চলিয়া গিয়াছেন। তখন ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) বড়ই উৎকণ্ঠিত ও চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন। এই অবসরে ছফ্ওয়ান-বিন্-ময়তল (রাজিঃ)-কে স্বীয় উষ্ট্র লইয়া পশ্চাদ্দিক হইতে আসিতে দেখা গেল। ছফ্ওয়ান্-বিন্-ময়ওল (রাজিঃ), এই বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন যে, তিনি সকলের পশ্চাদ্ভাগে (সেনানিবাসের শেষ প্রান্তে) অবস্থান করিবেন; আর কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেলে, সর্ব্বশেষে পরিত্যক্ত 'কেয়ামগাহ্' (শিবির-সন্নিবেশ-স্থান) বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক পরে কাফেলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবেন। যদি কাফেলার কাহারও কোন জিনিষ ভ্রমক্রমে সেখানে পড়িয়া থাকে, তাহা যেন উঠাইয়া লইয়া আইসেন। এই বন্দোবস্তে কাহারও কোন জিনিষ হারাইবার বা পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। 'হাছবে-দস্তুর' (যথা নিয়মে) ছফ্ওয়ান (রাজি), শিবির সন্নিবেশ-স্থান পরিদর্শন করিতে করিতে স্বীয় উষ্ট্র সহকারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন;

এবং অদূরে বোরকাবৃত ওম্মোল-মুমেনিন (মোস্‌লেম-মাতা)-কে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন ; তিনি তৎক্ষণাৎ উষ্ট্র হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মহামাননীয়া মোসলেম-মাতাকে তাহাতে আরোহণ করাইলেন, আর স্বয়ং উষ্ট্রের 'মহার' (নাসিকা-রজ্জু) ধরিয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন ; এবং অনতিবিলম্বে মূল সেনাদলে গিয়া পঁহুছিলেন ; আর মোস্‌লেম-মাতা হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) কে কাফেলায় পঁহুছাইয়া দিলেন। যখন তিনি সেনাদলে আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং আঁ হজরত (ছালঃ) ও মোসলমানগণ পরম আনন্দ লাভ করিলেন ; আর ছফ্‌ওয়ান (রাজিঃ) এর কার্য্যের সকলেই প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি না থাকিলে মোস্‌লেম-মাতার (রাঃ—আঃ) কি অসুবিধা ও কি বিপদ ঘটিত, সে বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। কিন্তু দুরাচার মোনাফেক (কপটাচারী)-দিগের পক্ষ হইতে একটা দুর্ণাম রটনা করিবার বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিল। তাহারা পবিত্র চরিত্রা মোস্‌লেম-মাতার (রাঃ—আঃ) প্রতি কলঙ্কারোপ করিয়া, মোসলমান সেনাদলের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। আঁ হজরত (ছালঃ) এ সম্বন্ধে 'খামুশী' (নীরবতা) অবলম্বন করিলেন।

ওম্মোল-মুমেনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ—আঃ) প্রতি মোনাফেকগণ যে কলঙ্কারোপ করিয়াছিল, তাহার ফল এই হইল যে, তিনি সুদীর্ঘ দেড়মাস কাল পিতৃ-গৃহে থাকিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে তাঁহার, তাঁহার পিতা হজরত আবুবক্কর সিদ্দিক (রাজিঃ) এবং তদীয় পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের যে কি মানসিক যন্ত্রণা হইয়া ছিল, তাহা বর্ণনাতীত। মোসলমান দিগের মনে সাধারণ ভাবে মোস্‌লেম-মাতার (রাঃ—আঃ) চরিত্রের পবিত্রতা, নির্দ্দোষিতা এবং 'মজলুমী' (অত্যাচারগ্রস্ত) হওয়া

সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; তাঁহার প্রতি মোসলমান মাত্রেরই সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল। মাসাধিক কাল পরে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার পক্ষ হইতে, মোস্‌লেম-মাতা সিদ্দিকার (রাঃ—আঃ), পবিত্রতা ও নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে আদেশ 'নাযেল'—অর্থাৎ কোরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হইল। খোদা তা-লা স্বয়ং সিদ্দিকার "সিদ্দিকা" হওয়া সম্বন্ধে 'গাওয়াহী' (সাক্ষ্য) প্রদান করিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) তখন মোস্‌সেম-মাতা (রাঃ—আঃ)-কে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। এই ঘটনার বহুপূর্ব্বে আর এক সিদ্দিকার প্রতি ও য়িহুদিগণ মিথ্যা কলঙ্কারোপ করিয়াছিল। তিনি ছিলেন হজরত ঈসা আলায়হেস্‌-সালামের জননী পবিত্রচরিত্রা বিবী মরিয়ম। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে য়িহুদিগণ অযথা কলঙ্কারোপ করিয়া, মহা বিচারক আল্লাহ্ তা-লা কর্ত্তৃক সমুচিত দণ্ডভোগ করিয়াছিল। এই সিদ্দিকার প্রতি কলঙ্কারোপকারী য়িহুদী অর্থাৎ মোসলমান নামধারী কপট মোনাফেকগণ ও বিশেষ দণ্ডভোগ করিয়া পাপের সমুচিত প্রতিফল লাভ করিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, বনি-মস্তলক সম্প্রদায়ের ছরদার (দলপতি) হারেছের কন্যা জোয়েরিয়াঃ মোসলমানদিগের হস্তে বন্দিনী হইয়াছিলেন; বন্দী বণ্টনকালে তিনি ছাবেত-বিন্-কয়েস্ (রাজিঃ)-এর ভাগে পড়িয়াছিলেন। হারেছ কিছুদিন পরে মদীনায় আসিল, এবং স্বীয় কন্যাটীর 'আযাদ' (মুক্তি) প্রদানের প্রার্থনা জানাইল। আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহার প্রার্থনানুসারে নিজ হইতে ফিদিয়া দিয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন। কিন্তু সেই ধর্ম্ম-প্রাণা বুদ্ধিমতী কন্যা পিতার সঙ্গে যাওয়া অপেক্ষা, আঁ হজরত (ছালঃ) এর 'হেফাযতে' (তত্ত্বাবধানে) থাকাই পছন্দ করিলেন। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহার অভিপ্রায় ও হারেছের অনুমোদনানুসারে এই ইস্‌লামের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্না

ধর্ম্ম-প্রাণা বুদ্ধিমতী মেয়েটীকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন; সুতরাং তিনি মোসলমানদিগের মাতা হইবার গৌরব লাভ করিলেন; এই বিবাহে এই সুফল ফলিল যে, ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ) গণ বনি-মস্তলক সম্প্রদায়ের যে সকল লোক বন্দী করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে এই বলিয়া মুক্তি প্রদান করিলেন যে, যে সম্প্রদায় আঁ হজরতের (ছালঃ)-এর 'রেশ্‌তাদার' (বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ) হইয়াছে, আমরা সেই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে গোলাম (ক্রীতদাস) করিয়া রাখিতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে যে সকল 'মালে-গণিমৎ' (যুদ্ধে জয়-লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার) লইয়াছিলেন, ও ভাগে পাইয়াছিলেন, সে সকল ও বনি-মস্তলক সম্প্রদায়কে ফেরত দিয়া দিলেন।

খন্দক অর্থাৎ পরিখার যুদ্ধ।

অতঃপর কতিপয় ছোট ছোট মোস্‌লেম,-সেনাদল, কতিপয় মোস্‌লেম-বিদ্বেষী বা বিপ্লববাদী কিংবা বিদ্রোহোন্মুখ জাতির বিরুদ্ধে প্রেরিত হওয়াতে, তাহারা দমিত হইল। বনি-নযীর দলের হাই-বিন্‌-আখ্‌তব সর্ব্বাপেক্ষা বড় 'মোফ্‌ছেদ' (বিবাদ-প্রিয়—বিপ্লববাদী) ছিল; সে এবং বনী নযীরের প্রধান অংশ বা বৃহৎ দল মদীনা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া "খয়বরে" বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল। হাই-বিন্‌ আখ্‌তব, ছালাম-বিন্‌-আবিল হকিক্‌, ছালাম-বিন্‌-মশকম, কেনানা—বিন্‌-আল্‌-রবীয় প্রভৃতি বনি-নযীরের ছরদার (দলপতি) গণ, এবং হুদ-বিন্‌-কয়েস ও আবুল এমারাঃ প্রভৃতি বনু-ওয়ায়েলের ছরদার (নেতা) গণ এক মতাবলম্বী লইয়া প্রথমতঃ মক্কায় গমন করিল। সেখানে গিয়া কোরেশদিগকে মদীনা আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থে চাঁদার 'ফেহরেস্ত্‌'

(লিষ্ট বা খাতা) ও খুলিল ; তদনুসারে কোরেশগণ বিপুল মাল ও প্রচুর অর্থ যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রদান করিল। তৎপর পূর্ব্বোক্ত বিপ্লব বাদিগণ কোরেশদিগের সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ আঁটিয়া, প্রবল গৎফান সম্প্রদায়ের লোকদিগের নিকট গমন করিল ; সেখানেও ইহাদের বিশেষ সাফল্য লাভ ঘটিল। তাহারাও মহোৎসাহে ইহাদের সঙ্গে যোগ দিতে স্বীকৃত হইল। বনু-কেনানাঃ সম্প্রদায় তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া মোসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে, এবং তাঁহাদের মূলোৎপাটন করিতে রাজী হইল। তৎপর মদীনাবাসী অবশিষ্ট য়িহুদিগণের (বনু-করিজার) সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র চালাইতে লাগিল। যদিও বনু-করিজার সঙ্গে এতাবৎ কাল আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সন্ধি-বন্ধন ছিল ; কিন্তু তাহারা সে সন্ধি-বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। আর বনু-ছলিম ছত্তারাঃ, সজয়, বনু-ছায়াদ, বনু-মর্‌রাহ্ প্রভৃতি সম্প্রদায় ও উপজাতির লোকদিগকেও এই যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য বাধ্য করিল। এই 'তহরিক' (প্রস্তাব এবং আন্দোলন) যখন উন্নতির চরম সীমায় উঠিল, দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র জাল বিস্তৃত হইল, তখন কোরেশ জাতি, বনু-নজীর,বনু-গৎফান প্রভৃতি প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের ৫০ জন ছরদার (দলপতি বা নেতা), কাবাগৃহে গিয়া শপথ করিল যে, আমরা যতদিন জীবিত থাকিব, মোসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বিরত হইব না। আর ইস্‌লামের ভিত্তি উপাড়িয়া ফেলিতে,—উহার অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিতে যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যোগের কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না।

সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইলে কোরেশ দলপতি আবু-ছুফিয়ান মক্কার কোরেশ ও অন্যান্য বংশীয় যোদ্ধ-পুরুষ এবং সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ৪ চারি সহস্র বিক্রান্ত সৈন্য লইয়া, মক্কা হইতে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইল। 'মরান-তহরান' নামক স্থানে বনি-ছলিমের যোদ্ধদলও এই সেনাদলে আসিয়া যোগদান করিল। এইরূপে এই সেনাদল যতই

মদীনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যোদ্ধপুরুষগণ আসিয়া এই অভিযানকারী বিরাট বাহিনীর দলপুষ্টি করিতে লাগিল। বনি-নজীরের ছরদার হাই-বিন্-আখ্তব ও গৎফান সম্প্রদায়ের ছরদার আইনিয়াঃ-বিন্-জছিন, স্ব স্ব সেনাদলের সেনাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র সেনাদলের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি ছিল কোরেশ দলপতি আবু-ছুফিয়ান। এই প্রবল সেনাদল যখন প্রচণ্ড বাত্যাবর্ত্তের ন্যায় অগ্রসর হইয়া মদীনার সন্নিধ্যে উপস্থিত হইল, তখন অনেক ঐতিহাসিকের মতে উহাদের সংখ্যা ২৪ হাজার ছিল; আর কোনও কোনও ইতিবৃত্ত লেখক ঐ সৈন্যদলের নিম্নতম সংখ্যা ১০ হাজার নির্দ্দেশ করিয়াছেন; স্বতরাং মাঝা-মাঝি একটা সংখ্যা ধরিলেও এই সংখ্যা ১৫।১৬ হাজারে দাঁড়ায়। স্থূলকথা, ইতিপূর্ব্বে মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে এরূপ বিরাট সেনাদল আর কখনও অভিযান করে নাই। এই বিশাল সেনাদলের সঙ্গে ৪৫০০ সাড়ে চারি হাজার উষ্ট্র ও ৩০০ শত অশ্ব বা অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। এই বিরাট সেনাদলের মক্কা হইতে রওয়ানা হইবার সংবাদ যখন আঁ হজরত (ছালঃ) প্রাপ্ত হইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ একটী পরামর্শ-সমিতি বা সমর-সভা আহ্বান করিলেন। পরামর্শ সভায় স্থির হইল যে, মদীনা নগরের মধ্যে থাকিয়া শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইবে। এই সময় হজরত ছলমান ফারছী (রাজিঃ) পরামর্শ দিলেন যে, আমাদের দেশে (পারস্তে) 'হাম্‌লা-আওর' (আক্রমণকারী) সৈন্যদল হইতে 'মহ্ফুহ' (নিরাপদ) থাকিবার জন্য 'মহ্ছুর' (অবরুদ্ধ) অধিবাসী ও সৈন্যগণের সম্মুখে (সীমান্ত স্থলে) 'খন্দক' (পরিখা বা নালা) খনন করা হয়; এবং তদ্দ্বারা শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া থাকে। হজরত ছলমান ফারছী (রাজিঃ) পারস্য দেশবাসী ছিলেন বলিয়া, এইরূপ পরিখা খনন সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহার প্রস্তাব খুব 'পছন্দ'

(মনোনীত) করিলেন। মদীনা নগরের একদিকে পাহাড়-শ্রেণী ছিল; সেদিকে মদীনা-মহুওয়রার গৃহাবলী, প্রাচীর সমূহ, নগরের রক্ষা-প্রাচীরের কার্য্য করিতেছিল। আর নগরের যে দিক্ খোলা ও অরক্ষিত ছিল; এবং যে দিক্ দিয়া শত্রুদলের আক্রমণ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, অতি সতর্কতা ও সত্বরতার সহিত ঐ দিক্ দিয়া পরিখা খননের কার্য্য আরম্ভ করা হইল। পাহাড়ের 'ছেল-ছেলা' (লাইন বন্দী পাহাড় শ্রেণী) ও পরিখার ভিতরস্থ ভূখণ্ড অণ্ডাকৃতি ময়দানের আকার ধারণ করিল। ইহাই যেন মোসলমানদিগের কেল্লা (দুর্গ—আশ্রয়-স্থান) ছিল। এই সুরক্ষিত ময়দানের মধ্যস্থলে আঁ হজরতের 'খিমা' (তাম্বু বা শিবির) সন্নিবেশিত হইয়াছিল। 'খন্দক' (পরিখা) ৫ গজ চওড়া ও ৫ গজ গভীর ছিল। পরিখার দৈর্ঘ্য (লম্বাই) পরিমাণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক 'টুকরা' (খণ্ড) করা হইয়াছিল; উহার প্রত্যেক 'টুকরায়' (অংশে) দশ দশ জন ছাহাবাঃ (রাজিঃ) খননকারী রূপে, খনন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং একখণ্ড বা টুকরার খনন কার্য্যে যোগ দিয়া, নিজে ও অন্যান্যের সঙ্গে পরিখা খননে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই পরিখা খনন করিতে করিতে একস্থানের মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন এবং সুদৃঢ় প্রস্তরময় থাকাতে, খনন কার্য্যে প্রবল বাধা উপস্থিত হইল। সকলে মিলিয়া এই প্রস্তর কাটিবার জন্য বিশেষ বল-প্রয়োগ ও চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সেই কঠিন প্রস্তর খণ্ড কিছুতেই কাটিতে পারিলেন না; তখন খনন কারিগণ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে 'হাজের' হইয়া এই বিষয়ের আরজ করিলেন; ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের কথা শুনিয়া তিনি কোদাল ও শাবল প্রভৃতি লইয়া সেই কঠিন প্রস্তর যুক্ত স্থানে গিয়া পঁহুছিলেন; এবং স্বহস্তে শাবল ধারণ পূর্ব্বক এমন জোরে সেই বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর আঘাত করিলেন যে, তাহা বিদীর্ণ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই

সেই স্থান হইতে এক 'রওশনি' (জ্যোতিঃ) বিকীর্ণ হইল ; তদ্দর্শনে আঁ হজরত (ছালঃ) " আল্লাহ আক্‌বর " বলিয়া তক্‌বির ধ্বনি করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ছাহাবাঃ মণ্ডলী ও ঐ পবিত্র শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিলেন। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমাকে শামদেশের চাবি অর্পণ করা হইয়াছে। তৎপরে আঁ হজরত (ছালঃ) খুব জোরে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর দ্বিতীয় বার আঘাত করিলেন ; এই আঘাতে সেই প্রস্তর খণ্ড আরও অধিক পরিমাণে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল ; এবং পূর্ব্ববৎ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল। আবার " আল্লাহ আক্‌বর " বলিয়া তক্‌বির ধ্বনি করা হইল। আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমাকে পারস্য সাম্রাজ্যের চাবি অর্পিত হইল। আবার সেই সুদৃঢ় প্রস্তর খণ্ডের উপর হুজুর (ছালঃ) তৃতীয় বার আঘাত করিলেন, প্রস্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পূর্ব্ববৎ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল ; আঁ হজরত (ছালঃ) সজোরে " আল্লাহ আক্‌বর " বলিয়া তক্‌বির ধ্বনি করিলেন। ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ ও ঐ পবিত্র শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করাতে সেই আওয়ায্ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইল ; অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমাকে ইমনের 'কুঞ্জিয়াঁ' (চাবি গুচ্ছ) দেওয়া হইল। অবশেষে তিনি ফরমাইলেন, আমাকে জিব্‌রাইল আমীন (আলাঃ) সংবাদ দিলেন যে, উপরোক্ত সমস্ত দেশ ও সাম্রাজ্য (সত্বরেই) আপনার ও আপনার ওম্মতদিগের অধিকারে আসিবে। চিন্তা ও খেয়াল করিবার বিষয়, এই ঘোর বিপদ কালে, সর্ব্ব-শক্তিমান্ মহান্ আল্লাহ্ তা-লা, আঁ হজরত (ছালঃ)-কে, ইরাণ (পারস্য সাম্রাজ্য), রুম্ (রোমক-সাম্রাজ্য), শাম, ইমন প্রভৃতি সাম্রাজ্য, রাজ্য এবং দেশ সমুহে আধিপত্য লাভের 'খোশ্-খবরী' (সুসংবাদ) প্রদান করিলেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী খোদা তা-লা ভিন্ন মনুষ্যের কার্য্য বলিয়া কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না।

খুব তাড়াতাড়ি খন্দক খনন কার্য্য শেষ হইয়া গেল। যখন কোফ্ফার পরিখার তটে উপস্থিত হইল, তখন তাহারা উহা দেখিয়া 'হয়রান' ও বিস্ময়াপন্ন হইল। কারণ, আরবগণ ইতিপূর্ব্বে এরূপ পরিখা কখনও দেখিয়াছিল না। কোফ্ফারের পঙ্গপাল সদৃশ অগণিত সৈন্যদল মদীনা-মনুওরা অবরোধ করিল। এই আক্রমণ কোফ্ফারের শক্তি ও 'শওকতের' (আড়ম্বরের) 'এন্তেহা' (শেষ) দৃশ্য ছিল। কাফের সৈন্যদল কয়েকবার বিপুল বিক্রমে পরিখা পার হইতে চেষ্টা পাইয়াছিল; কিন্তু একবারও তাহাতে সফলকাম হয় নাই। যে স্থানে পরিখার 'চওড়াই' (পরিসর—প্রশস্ততা) কিছু কম ছিল, একবার শত্রুদলের তিনজন মহা বিক্রমশালী বীরপুরুষ অশ্ব ধাবিত করিয়া সেই স্থানে পরিখার মধ্যে অবতরণ করিয়াছিল; তন্মধ্যে ওমরু-বিন্-আবদ নামক একজন বীরপুরুষ শৌর্য্য-বীর্য্যে দুই হাজার অশ্বারোহীর সমান বলিয়া গণ্য হইত; তাহার বীরত্ব সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু **বীরেন্দ্র কেশরী হজরত আলী (রাজিঃ) তাহাকে 'কতল্' (নিহত) করিলেন;** অপর দুইজন পলায়ন করিয়া কোনও রূপে জীবন রক্ষা করিল। এই অবরোধ কার্য্য প্রায় একমাস পর্য্যন্ত 'জারী' ছিল। অবরোধকারী কাফেরগণ বাহির হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য পাইত, তাহাদের রসদ-পত্রের অভাব ছিল না; যোদ্ধদলের ও অভাব দৃষ্ট হইত না। নানাদিক্ হইতে, নানা সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে অনবরত যোদ্ধদল আসিয়া বিপক্ষগণের দলপুষ্টি করিতেছিল। পক্ষান্তরে মোসলমানদিগের এই অবস্থা ছিল যে, তাঁহারা বাহিরের কোনও স্থান হইতে কিছুমাত্র রসদ আনয়ন করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকে অনেক সময়ই অনাহারে থাকিতে হইত। একবার এক ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ক্ষুধার 'শেকায়েত' (অভিযোগ) করিলেন, এবং 'কুরতা' (পিরাহান) তুলিয়া আঁ হজরত

(ছালঃ)-কে দেখাইলেন যে, তিনি পেটে একখানি পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছেন ; যেন অনাহার জনিত দুর্ব্বলতায় কোমর ঝুকিয়া না পড়ে। আঁ হজরত (ছালঃ) কুরতা উঠাইয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার পেটে দুইখানি পাথর বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

যখন অবরোধের ২৭ সাত্তাইশ দিন গত হইয়া গেল ; ঐ দিবাগত রাত্রিকালে অতি প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঐ বায়ু ক্রমশঃ প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তে পরিণত হইল। ঝড়ের প্রকোপে কাফেরদিগের তাম্বুর খোঁটাগুলি খুলিয়া যাইতে এবং তাম্বুগুলি উড়িয়া যাইতে লাগিল। 'চুল্‌হার' (উনানের) উপর হইতে 'দেগ্‌চি' গুলি পড়িয়া গিয়া ভূতলে গড়াইতে লাগিল ; ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয় :—"ফা আর ছালনা আলায়হিম রিহাঁও ও জনুদা লাম তারাওহা" (ভাবার্থ) "আমি উহাদের উপর 'হাওয়া' (বাতাস) পাঠাইলাম, আর এমন একদল সৈন্য প্রেরণ করিলাম, যাহাদিগকে তুমি দেখিতে পাইতেছিলে না।" ভীষণ ঝড়-তুফানে কাফেরদিগের অনেক শিবিরেরই অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল ; এই আগুণ নির্ব্বাণ ব্যাপারকে তাহারা একটা বিশেষ দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করিল। তদনুসারে তাহারা সেই রাত্রিকালেই অতি ব্যস্ত-সমস্ততার সহিত 'ডেরা-ডাণ্ডা' তুলিয়া (শিবির ও তাম্বুগুলি গুটাইয়া) সেখান হইতে 'ফেরার' (পলায়ন-পর) হইল। কোফ্‌ফারের পলায়ন-সংবাদ খোদা তা-লার পক্ষ হইতে আঁ হজরত (ছালঃ)-কে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হযিফাঃ-বিন্‌-আল্‌-ঈমান (রাজিঃ)-কে, অবরোধকারী শত্রু-দলের অবস্থা জানিবার জন্য পরিখার পর পারে পাঠাইলেন ; তিনি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন, কোফ্‌ফারের 'লশ্‌কর-গাহ্‌' (সেনাদলের অবস্থান-স্থান) খালি পড়িয়া আছে, তাহারা সকলেই পলায়ন করিয়াছে। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, অতঃপর কোফ্‌ফার কোরেশগণ আমা-

দিগকে আর কখনও আক্রমণ করিবে না। অতঃপর মোসলমানগণ পরমানন্দে পরিখার নিকট (শহরতলি) হইতে খাছ মদীনা-মনুওয়ারায় (শহরে) প্রবেশ করিলেন। এই ঘটনা ৫ম হিজরীর জেল্‌কদ মাসে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনায় প্রবেশ করিয়া অতি অল্পকাল মাত্র তথায় অবস্থিতি করেন। তিনি জোহরের নমাজ আদায় করিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, কোনও যোদ্ধপুরুষ যেন আছরের নমাজ এখানে না পড়ে, বরং আছরের নমাজ 'বনি-করিজার' মহাল্লায় গিয়া আদায় করা চাই। কোনও কোনও ছাহাবাঃ (রাজিঃ) এ পর্য্যন্ত 'হাতিয়ার' (যুদ্ধাস্ত্র) ও খুলিয়া ছিলেন না, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আদেশ প্রাপ্তি মাত্রে ঐ অবস্থায়ই-বনি-করিজাঃ-সম্প্রদায়ের য়িহুদি-মহাল্লার দিকে মহোৎসাহে ধাবিত হইলেন। হজরত ছায়াদ--বিন্‌-মায়াষ্‌ (রাজিঃ)— যিনি পরিখার যুদ্ধের প্রারম্ভ কালে, বনি-করিজাকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া সুপথে আনয়ন জন্য, আঁ হজরত (ছালঃ) কর্ত্তৃক তাহাদের কেল্লায় প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু বনি-করিজাঃ গর্ব্বমদে মত্ত হইয়া নানাপ্রকার 'বে-আদবী' পূর্ণ কঠোর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক তাঁহাকে ফেরত পাঠাইয়া ছিল, তিনি বনিঃ-করিজার সঙ্গে সন্ধি-শর্ত্তে আবদ্ধ, এবং তাহাদেব প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি পরিখার যুদ্ধে আহত হওয়াতে বনি-করিজার যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন না। আঁ হজরত (ছালঃ) এই অভিযানে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে 'আলম-বরদার' (পতাকাধারী) নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং অগ্রগামী সেনাদলের সেনাপতি রূপে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বনি-করিজার মহাল্লার নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন, উহারা আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি (নউষ্‌ বেল্লাহে মেন্‌হা) গালি বর্ষণ করিতেছে। যাহা হউক, সমগ্র মোস্‌লেম সেনাদল আসিয়া বনি-করিজার মহাল্লা দৃঢ়ভাবে অবরোধ করিলেন।

কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত অবরোধ কার্য্য চলিলে, বনি-কুরিজাঃ সম্প্রদায় আত্ম-রক্ষার কোনও উপায় না দেখিয়া এই প্রস্তাব লইয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করিল যে, আমরা নিম্ন-লিখিত শর্ত্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি ; সেই শর্ত্ত এই যে, ছায়াদ-বিন্-মায়ায্ (রাজিঃ) আমাদের প্রতি যেরূপ দণ্ড বিধান করেন, ঐরূপ শাস্তি আমাদিগকে দেওয়া হউক। আঁ হজরত (ছালঃ) তাহাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। তদনুসারে বনু-কুরিজা সম্প্রদায় মোসলমানদিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিল। হজরত ছায়াদ-বিন্-মায়াজ (রাজিঃ) আহত অবস্থায় মদীনায় চিকিৎসাধীন ছিলেন ; তাঁহাকে পাল্‌কি বা ঐ শ্রেণীর কোনও যানে চড়াইয়া মোস্‌লেম-সেনাদলে আনয়ন করা হইল। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে আন্‌ছার (রাজিঃ)-গণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর হজরত ছায়াদ-বিন্-মায়ায্ (রাজিঃ) আপন 'কওমের' (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর) লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা খোদা তা-লাকে 'হাজের' ও 'নাজের' জানিয়া প্রতিশ্রুতি দান কর যে, আমার 'ফয়সলা' (মীমাংসা) খুশীর সঙ্গে কবুল করিবে। তখন সকলে একমতাবলম্বী হইয়া প্রতিশ্রুতি দান করিলেন যে, আমরা আপনার বিচার ও মীমাংসা শিরোধার্য্য করিব। তৎপর ছায়াদ-বিন্-মায়ায্ (রাজিঃ), এইরূপ প্রতিশ্রুতি আঁ হজরত (ছালঃ) এবং মহামান্য মহাজেরিন দিগের নিকট হইতেও গ্রহণ করিলেন। অতঃপর হজরত ছায়াদ-বিন্-মায়ায্ (রাজিঃ) ফরমাইলেন, আমি আদেশ প্রদান করিতেছি যে, বনু-কুরিজার সমুদয় বয়স্ক পুরুষ (যুবক, প্রৌঢ়) কে কতল্ (নিহত), এবং উহাদের স্ত্রী-পুত্র দিগের সঙ্গে 'আছিরানে জঙ্গের' (যুদ্ধে বন্দী লোকদিগের) ন্যায় ব্যবহার করা হউক ; আর তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি মোসলমানদিগের মধ্যে ভাগ-বন্টন করিয়া দেওয়া হউক। এই আদেশ জারী হইবার পর, বনু-

করিজার লোকদিগকে কেল্লা হইতে বাহির হইয়া আসিতে বলা হইল; তাহারা দুর্গ হইতে বাহির হইলে, সকলকে বন্দী করিয়া মদীনায় আনয়ন করা গেল। অতঃপর উহাদের বয়স্ক পুরুষদিগকে হত্যা করা হইল; আর তাহাদের গৃহাদি মোসলমানদিগের বস-বাসের জন্য ভাগ-বণ্টন করিয়া দেওয়া গেল। এই দিন হইতে মদীনা-মনুওরার অন্তর্বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

৫ম হিজরীর জেলহজ্জ মাসে হজরত আবু-ওবায়দাঃ বিন্-জার্‌রাহ্ (রাজিঃ), আঁ হজরতের (ছালঃ) আদেশক্রমে ৩০০ মহাজেরিন যোদ্ধ-পুরুষ লইয়া "ছায়েফ্-অল্-বহর" এর দিকে রওয়ানা হইলেন। হজরত আবু-ওবায়দা (রাজিঃ) ছয়েফ-অল্-বহরে পঁহুছিয়া সংবাদ পাইলেন যে, উহার অধিবাসিগণ বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে একান্ত ইচ্ছুক। এজন্য তাহাদের দমনার্থ মোহাম্মদ বিন্-মোস্‌লেমা (রাজিঃ)-কে ৩০ জন যোদ্ধপুরুষ সমভিব্যাহারে ঐ দিকে রওয়ানা করিলেন। বনি-কেলাব সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের ১০ জন লোক নিহত হইল; যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ঐ সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকেরা পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে ৩০টী উষ্ট্র ও ৩০০০ ছাগল বা দুম্বা মোসলমানদিগের হস্তগত হয়।

এইরূপে আকাশাঃ-বিন্-মহজ (রাজিঃ), 'কোরেশদিগের ভাব-গতিক পর্য্যবেক্ষণ জন্য মক্কায় প্রেরিত হইলেন। আর অল্পসংখ্যক ছাহাবা (রাজিঃ)-এর একটী ক্ষুদ্র দল 'নজদ' প্রদেশাভিমুখে পাঠান হইল। তাঁহারা প্রসিদ্ধ বিপ্লববাদী শমামাঃ-বিন্-আছালকে বন্দী করিয়া আনিলেন; শমামাঃ-বিন্-আছাল ভক্তি-প্রবণ হৃদয়ে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) ঐ বৎসরেই হাবশ রাজ্যাধিপতি নজ্জাশার আশ্রিত অবশিষ্ট হেজরতকারী মোসলমানদিগকে মদীনা-মনুওরায়

ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনেকে চলিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তখনও বহু সংখ্যক মহাজেরিন তথায় থাকিয়া গেলেন।

হেজরতের ৬ষ্ঠ বৎসর।

গয্‌ওয়া দোমতল-জন্দল হইতে আঁ হজরত (ছালঃ) যখন মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, ঐ সময় পথিমধ্যে য়েয়্‌নিয়া-বিন্‌-হছিন নামক একজন ছরদার তাঁহার খেদমতে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল যে, আমাদের পশুপাল মদীনার সান্নিধ্যে চরাইতে অনুমতি দিন। দয়ার সাগর আঁ হজরত (ছালঃ) তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে, সে স্বীয় সম্প্রদায়স্থ লোকের পশুপাল মদীনার নিকটস্থ চারণ-ভূমিতে পাঠাইয়া দিল। এক বৎসর কাল তাহাদের পশুপাল সেখানে উদর পূরিয়া ঘাস খাইল এবং বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট হইল; অবশেষে প্রত্যুপকার স্বরূপ ঐ অকৃতজ্ঞ সম্প্রদায়, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর উষ্ট্রগুলি অপহরণ করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল, এবং বনু-গফ্‌ফারের একজন লোককে হত্যা করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বন্দী করিয়া সঙ্গে লইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেএকদল ছাহাবাঃ (রাজিঃ) তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে, উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল, যুদ্ধে উষ্ট্রাপহারী দুর্ব্বৃত্ত দল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, মোসলমানগণ আঁ হজরতের (ছালঃ) উষ্ট্র দলের উদ্ধার সাধন ত করিলেনই, তদ্ব্যতীত তাহাদের পশুপাল ও ইঁহাদের হস্তগত হইল। আঁ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং ও এই অভিযানে গমন করিয়াছিলেন। এক দিবা-রাত্রি সেখানে থাকিয়া মদীনা-মনুওয়ারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই বৎসরেই আঁ হজরত (ছালঃ) সংবাদ পাইলেন যে, বনু-বকর সম্প্রদায় খয়বরের য়িহুদীদিগের সঙ্গে 'ছাজেশ্‌' (ষড়যন্ত্র) করিয়া মদীনা আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। তিনি সংবাদ পাইয়াই হজরত আলী

(রাজিঃ)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া, ২০০ দুই শত যোদ্ধ পুরুষের সঙ্গে তাহাদের 'ছরকোবি' (দমন) জন্ম পাঠাইলেন। পথিমধ্যে বনু-বকরের একজন 'জাছুছ্' (গুপ্তচর) মোসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইল। গুপ্তচর বলিল, যদি আমার প্রাণরক্ষা করেন, তবে আমি বনু-বকরের সমবেত হইবার স্থান আপনাদিগকে বলিয়া দিতে পারি। তদনুসারে হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহু উহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন; এবং বনু-বকরের একত্র সমাবেশ-স্থান জানিয়া লইয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গুপ্তচরটীকে মুক্তি প্রদান করিলেন। অতঃপর ইঁহারা "ফদক" নামক স্থানে গিয়া পঁহুছিলেন; এবং দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া অতর্কিত ভাবে শত্রুদলকে আক্রমণ করিলেন। উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ হইল; কিন্তু মোসলমানদিগের আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, শত্রুদল বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে ৫০০ উষ্ট্র ও ২০০০ ছাগ-মেষাদি পশু মোসলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। এই 'মালে-গনিমত' (যুদ্ধে জয়-লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার) লইয়া হজরত আলী (রাজিঃ) বিজয়ী-বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

উক্ত হিজরীর শা'বান মাসে আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়োফ্ (রাজিঃ)-কে, ইস্লাম-ধর্ম্ম প্রচার জন্য 'দোমতল-জন্দলে' প্রেরণ করিলেন। তাঁহার প্রচার-ফলে আছিগ-বিন্-ওমর কলবী নামক তথাকার একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছরদার প্রথমে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন; সঙ্গে সঙ্গে ঐ সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক আগ্রহের সহিত লোক মোসলমান হন। ঐ জাতির যে সকল ছরদার ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল না, তাহারা 'জজিয়া' নামক কর দিতে রাজী হইল। ছরদার আছিগের কন্যা তমাছর (রাঃ—আঃ) এর সঙ্গে হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়োফ্ (রাজিঃ)-এর শুভ-পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই কন্যার গর্ভে আবু-ছলমাঃ (রহঃ) নামক প্রসিদ্ধ ফকীহের (ফেকাহ্ শাস্ত্র-বিদ মহাপণ্ডিতের) জন্ম হয়। তিনি

'আকাবেরে-তাবেয়ীন্' অর্থাৎ প্রাথমিক তাবেয়ীনদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠতম পুরুষ বলিয়া গণনীয়।

'আরনিয়াঃ' নামক প্রান্তরময় জনপদের 'আকল' বংশীয় কতিপয় লোক মদীনায় আগমন পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে মোসলমান হইল। তাহারা কিছু-কাল মদীনায় বাস করিয়া এই 'শেকায়েত' (অভিযোগ) করিতে লাগিল যে, আমাদের পশু-দুগ্ধ পান করার অভ্যাস, শস্য-জাত খাদ্য খাইবার তত অভ্যাস নাই; মদীনায় বাস করিয়া ও অনভ্যস্ত দ্রব্য আহার করিয়া আমাদের গায়ে চর্ম্মরোগ হইয়াছে; তজ্জন্য আমরা শারীরিক বড় কষ্ট ভোগ করিতেছি। আঁ হজরত (ছালঃ) তাহাদিগের এই অভিযোগ শুনিয়া কোবার নিকটস্থ পাহাড় অঞ্চলে—স্বীয় উষ্ট্রাদির চারণ ভূমি ও বাথানে তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা কিছুদিন সেখানে থাকিয়া পশু-দুগ্ধ পান করিয়া যখন বেশ মোটা-তাজা হইল, তখন ঐ ভণ্ড অকৃতজ্ঞের দল, আঁ হজরতের (ছালঃ) উষ্ট্র গুলির রক্ষক ঈছার নামক ব্যক্তিকে একাকী পাইয়া অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিল। দুরাত্মাগণ উহার হাত-পা কাটিয়া ফেলিয়াছিল; চক্ষুর্দ্বয়ে বাবুলের কাঁটা বিদ্ধ করিয়াছিল; উহার হস্ত-পদ কর্ত্তিত মৃতদেহ এক বৃক্ষের শাখায় লট্‌কাইয়া দিয়াছিল, তৎপর নিশ্চিন্ত মনে উষ্ট্রগুলি হাঁকাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যখন এই সংবাদ মদীনায় পঁহুছিল, আঁ হজরত (ছালঃ) তৎক্ষণাৎ করয্-বিন্-খালেদ-আল্ ফহরি (রাজিঃ)-কে ২০ জন অশ্বারোহী যোদ্ধা সহকারে ঐ দুরাচারদিগের পশ্চাদ্ধাবন জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা অতি দ্রুতগতি গমন পূর্ব্বক পথিমধ্যেই উহাদিগকে অপহৃত উষ্ট্রগুলি সহ 'গেরেফ্‌তার' (বন্দী) করিলেন। যখন উহারা ধৃত হইয়া মদীনায় আনীত হইল, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) উহাদিগকে 'কতল্' (মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত—হত্যা) করিতে আদেশ দিলেন; আদেশ অনতিবিলম্বে প্রতিপালিত হইল।

৬ষ্ঠ হিজরীর শ'ওয়াল মাসে, আঁ হজরত (ছালঃ) 'খাবে' (স্বপ্নে) দেখিলেন, ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ)-দিগের সমভিব্যাহারে তিনি পবিত্র কাবাগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। স্বয়ং আঁ হজরত (ছালঃ) ও ছাহাবা কারাম (রাজিঃ)-দিগের ও কাবার 'তওয়াফ্' এবং 'যেয়ারত' করিবার ইচ্ছা ও অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। এই স্বপ্ন দর্শনে সেই ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি হইল। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) য়োমরাঃ ও কাবা যেয়ারত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তদনুসারে ৬ষ্ঠ হিজরীর 'যেল্‌কদ' মাসে তিনি ১ হাজার ৪ শত ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) কে সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন—য়োমরার এহ্‌রাম বাঁধিলেন—এবং কোরবানীর জন্য ৭০ টী উষ্ট্র সঙ্গে লইলেন। এহ্‌রাম বান্ধা ও কোরবাণীর উষ্ট্র সঙ্গে লওয়া দ্বারা একথা প্রমাণিত হইতেছিল যে, তিনি যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে মক্কায় যাইতেছেন না, বরং কেবলমাত্র 'বায়তোল্লার' (কাবা-গৃহের) 'যেয়ারত' করাই তাঁহার 'মক্‌ছদ' (উদ্দেশ্য) ছিল। মক্কার কোরেশদিগের এমন কোন হক্ (অধিকার) ছিল না যে, কাহাকেও কাবার যেয়ারত করিতে বাধা দিতে পারে। কারণ, সমগ্র আরবের অধিবাসিগণই (যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন) হজ্জ্ করিবার অধিকারী ছিল; এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও বাধা দিতে পারে নাই।

'যিল্-হুলিফা' নামক স্থানে পঁহুছিয়া আঁ হজরত (ছালঃ), এক ব্যক্তিকে 'জাছুছ' (গুপ্তচর) নিযুক্ত করিয়া অগ্রে রওয়ানা করিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি পথিমধ্যে 'আছফান' নামক স্থানে আসিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-কে সংবাদ দিল যে, কোরেশগণ আপনার আগমন সংবাদ পাইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য এক বিরাট বাহিনী সজ্জিত করিয়াছে; তাহারা আপনাকে মক্কায় ও খানাঃ কাবায় প্রবেশ করিতে প্রাণপণে বাধা দিবে। তখন আঁ

হজরত (ছালঃ) ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, সকলের অনুমোদন ক্রমে স্বীয় কাফেলা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। মোসলমানদিগের অগ্র-গমনে বাধা দিবার জন্য কোরেশগণ মহাবীর খালেদ-বিন্-অলিদের নেতৃত্বাধীনে একদল অশ্বারোহী সৈন্য "করায়-আল্-গমিম" নামক স্থানে পাঠাইল। আঁ হজরত (ছালঃ) আছফান হইতে রওয়ানা হইয়া, রাস্তা হইতে কিছু ডান দিকে সরিয়া অগ্রসর হইতে ছিলেন; এই অবস্থায় হঠাৎ খালেদ-বিন্-অলিদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খালেদ-বিন্-অলিদ মোসলমানদিগের এই আকস্মিক দ্রুত আগমনে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল, এবং অতি দ্রুতগতি অশ্বরোহণে মক্কায় গমন পূর্ব্বক, কোরেশদিগকে আঁ হজরতের (ছালঃ) আগমনের সংবাদ জ্ঞাপন করিল; এই অবসরে আঁ হজরত (ছালঃ) অগ্রসর হইয়া মক্কার খুব নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উষ্ট্রী এই স্থানে আসিয়া বসিয়া পড়িল। ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ বলিতে লাগিলেন, উষ্ট্রী আমাদিগকে ধোকা দিল। আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, উষ্ট্রী ধোকা দেয় নাই, বরং যে খোদা তা-লা হস্তীর গতিরোধ করিয়াছিলেন (আছহাব-ফিলের ঘটনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত), সেই আল্লাহ্ তা-লাই উষ্ট্রীর গতিরোধ করিয়াছেন। মক্কায় যুদ্ধ-হাঙ্গামা করিলে কাবার অসম্মান হয়, কাবার অসম্মান করা খোদা তা-লার ইচ্ছা নহে; এই জন্য তিনি তোমা-দিগকে বাধা দিতেছেন। তৎপর তিনি উষ্ট্রীকে ধম্‌কাইলেন, উষ্ট্রী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আবার চলিতে লাগিল। আঁ হজরত (ছালঃ) হোদিবিয়ার কূপের নিকট পঁহুছিয়া, সেই স্থানেই শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। যখন হোদিবিয়ায় আঁ হজরত (ছালঃ) সশিষ্যে 'মকিম' হইলেন (অস্থায়ী বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন), তখন মক্কার কোরেশদিগের পক্ষ হইতে বোদিল-বিন্-ওরক্কায়া খযয়ী স্ব সম্প্রদায়স্থ কতিপয় লোক সঙ্গে

লইয়া তাঁহার হুজুরে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ঐ দেখ, আমার কাফেলার অগ্রভাগে কোরবাণীর উষ্ট্র সকল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান আছে, আর আমরা এহ্রাম বান্ধিয়া আছি। বোদিল এই কথা শুনিয়া মক্কায় চলিয়া গেল, এবং কোরেশদিগকে বলিল, তোমরা বৃথা গোলমাল করিতেছ, (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) ত কেবলমাত্র বয়তুল্লার যেয়ারত করিতে আসিয়াছেন, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইসেন নাই। তচ্ছ্রবণে কোরেশদিগের উগ্রচণ্ড চরমপন্থী গোঁয়াড়-গোবিন্দ লোকেরা বলিতে লাগিল, আমরা উহাদিগকে বয়তোল্লার যেয়ারত করিতেও আসিতে দিব না। কিন্তু বুদ্ধিমান্, চিন্তাশীল ও ভবিষ্যদ্দর্শী বয়ঃস্থ লোকেরা নীরব থাকিল, এবং এ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। অনেক আলোচনাও বিবেচনার পর, মক্কাস্থ আহাবিশ্ সম্প্রদায়ের প্রধান ছরদার হোলিছ-বিন্-আলমাঃ কেনানীকে আপনাদের পক্ষ হইতে দূত নিযুক্ত করিয়া আঁ হজরতের খেদমতে পাঠাইল। এই বিচক্ষণ পুরুষ আঁঃহজরতের (ছালঃ) খেদমতে না পঁহুছিয়া, কেবলমাত্র কোরেবাণীর উষ্ট্রগুলি দেখিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিল, এবং কোরেশদিগকে যাইয়া বলিল (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) এবং মোসলমানগণ যুদ্ধ করিবার 'এরাদায়' (সঙ্কল্পে) আইসেন নাই, কেবল-মাত্র য়োমরা-ব্রত পালন ও কাবা যেয়ারত জন্য আসিয়াছেন। কাবার যেয়ারত করিতে বাধা দেওয়ার কাহারও অধিকার নাই। ইহা শুনিয়া উগ্রচণ্ড কোরেশগণ তাহাকে কটু-কাটব্য বলিতে লাগিল; আর বলিল, আমরা মোসলমানদিগকে কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবনা; প্রবেশ করিতে দিলে আমাদের অপমান হইবে। ছরদার হোলিছ, এই উদ্ধত লোক গুলির অন্যায় ও অসঙ্গত কথা শুনিয়া বলিল, যদি তোমরা মোসলমানদিগকে য়োমরা-ব্রত সম্পন্ন করিতে না দাও, তবে আমি আমার

দলের সকল লোক লইয়া তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। তাহার কথা শুনিয়া কোরেশগণ প্রমাদ গণিল, এবং নানাপ্রকার তোষামোদ করিয়া ও প্রবোধ দিয়া তাহার ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিল। অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) কোরেশদিগের নিকট দূত পাঠাইলেন, কোরেশগণ দূতের প্রস্তাব শুনিবে দূরে থাকুক, বরং তাঁহার উষ্ট্রটী যবেহ করিয়া দিল, এবং তাঁহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু ছরদার হোলিচ ও তাহার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে মক্কার কোরেশদিগের কবল হইতে রক্ষা করিয়া, নিরাপদে ফেরত পাঠাইয়া দিল। অতঃপর কোরেশদিগের একদল চরমপন্থী উগ্রস্বভাব যুবক মক্কা হইতে বাহির হইয়া ওয়াদিতে—মোসলমানদিগের শিবির শ্রেণীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইল; সুযোগ বুঝিয়া মোসলমানদিগকে আক্রমণ করিবে, ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-গণ দেখিতে পাইয়া ক্ষিপ্রকারিতার সহিত আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধৃত ও বন্দী করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু পরে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আদেশে সকলকে ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর অনেক আলোচনার পর আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত ওসমান গণী (রাজিঃ)-কে দূত স্বরূপ মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার গমনেও কোন ফল হইল না; বরং কোরেশগণ তাঁহাকে মক্কায় আটক (নযরবন্দী) করিয়া রাখিল। হজরত ওস্মান গণী (রাজিঃ)-এর ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়াতে, ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মধ্যে এইরূপ একটী জনরব উঠিল যে, কোরেশগণ হজরত ওস্মান গণী (রাজিঃ)-কে শহীদ করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি যে পর্য্যন্ত ওস্মানের (রাজিঃ) কতলের প্রতিশোধ গ্রহণ না করিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। তদনুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, সমুদয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-এর নিকট হইতে 'জান-নেছারীর' (জীবনোৎসর্গ

করিবার) বায়্য়েত্ গ্রহণ করিলেন। এই বায়্য়েত', বায়্য়েতে-রেদওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। এই বায়্য়েতের উল্লেখ পবিত্র কোরআন শরীফে এইরূপ আছে :—'লাক্বাদ রাদি আল্লাহ আনিল মুমেনিনা ইয্ ইয়ু বায়ে য়ুনাকা তাহ্তাশ্ শাজারাত" ; অনুবাদ :—হে রছুল, যখন মোসলমানগণ তোমার হাতের উপর বৃক্ষতলে বসিয়া বায়্য়েত করিল, তখন খোদা তা-লা তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন।"

এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরেই হজরত ওস্মান গণি (রাজিঃ), মক্কা হইতে অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনিও আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তে ঐরূপ 'বায়্য়েত' করিলেন। মক্কার কোফ্ফারের প্রবীণ, বুদ্ধিমান ও ভবিষ্যদ্দর্শী লোকেরা যুদ্ধ-হাঙ্গামাকে 'না-পছন্দ' করিতে-ছিল ; কিন্তু অধিকাংশ উদ্দাম যুবক ও 'গঁওয়াড়' প্রকৃতির লোকই 'ফাছাদ' (বিবাদ-বিসম্বাদ) এবং যুদ্ধের একান্ত পক্ষপাতী দৃষ্ট হইল। এক্ষণে মোসলমানদিগের যুদ্ধ-সজ্জার কথা শুনিয়া, এবং যুদ্ধ করিতে তাঁহাদিগকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, উহাদের মনেও কতকটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়া ছিল ; সেই জন্য তাহারা 'সোলেহ্' (সন্ধি) স্থাপন সম্বন্ধে অনেকটা আগ্রহান্বিত হইল। তদনুসারে মক্কাবাসিগণ বনু-ছকিফ্ দলের ছরদার য়োরুহ্-বিন্-মছউদকে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে প্রেরণ করিল। য়োরুহ্ আসিয়া হুজুরের (ছালঃ) সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা বলিল ; এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বাহাদুরীর হাঁক ও কতকটা হাঁকিল। আঁ হজরত ও তাহার কথার খুব দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক উত্তর দিলেন। য়োরুহ যখন মক্কায় কোরেশদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন অন্যান্য কথার সঙ্গে কোরেশদিগকে ইহাও বলিল যে, হে কোরেশ দলপতিগণ! আমি রুমের হারকল্ (রোমক সম্রাট্ হিরাক্লিয়স্) এবং পারস্য-সম্রাট্ কেছরার দরবার দেখিয়াছি, এবং আরও অনেক বাদশাহের রাজ-দরবারে গমন করিয়াছি, কিন্তু কোনও সম্রাট্

বা বাদশাহকে তাঁহার 'হামরাহী' (সঙ্গী—সভাসদ-পারিষদ) দিগের এমন প্রিয়পাত্র দেখি নাই—যেমন (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর আছহাব ও শিষ্য মণ্ডলী, তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করেন। যখন তিনি কথা বলেন, তখন আর সকলে চুপ করিয়া থাকেন। আর তাঁহাকে এতদূর 'তায়জিম' (সম্মান-প্রদর্শন) করেন যে, তাঁহার দিকে কেহ চক্ষু তুলিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না। ইঁহারা কোনও ক্রমেই (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি তোমাদের সম্মুখে যে প্রস্তাব 'পেশ' করিয়াছেন, তোমরা তাহা বিনাপত্তিতে 'কবুল' (স্বীকার) কর; এইরূপ সন্ধি-স্থাপন মঙ্গল জনক ও যথেষ্ট বলিয়া মনে করা উচিত। অতঃপর কোরেশগণ বিশেষভাবে যুক্ত পরামর্শ করিয়া ছহিল-বিন্-য়োমরুকে সর্ব্বক্ষমতাপন্ন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে পাঠাইল। আর তাহাকে বলিয়া দিল যে, 'ছোলেহ্' (সন্ধি) কেবলমাত্র এইরূপে হইতে পারে যে, এ বৎসর (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) আপনার সঙ্গী (ছাহাবাঃ)-দিগকে লইয়া ফিরিয়া চলিয়া যাইবেন, আর আগামী বৎসর আসিয়া য়োমরাঃ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন। যাহা হউক, ছহিল, আঁ হজরতের (ছালঃ) হুজুরে উপস্থিত হইয়া সন্ধির শর্ত্ত সকল পেশ করিল; আঁ হজরত (ছালঃ) উহার সকল শর্ত্তই 'কবুল' (গ্রহণ) করিলেন। তৎক্ষণাৎ 'ছোলেহ্-নামা' (সন্ধি-পত্র) লিখিবার জন্য হজরত আলী (রাজিঃ)-কে ডাকাইয়া উহা লিখিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আঁ হজরতের (ছালঃ) কথানুযায়ী হজরত আলী (রাজিঃ) সন্ধি-পত্র লিখিলেন। ঐ সন্ধি-পত্রের শর্ত্ত সমূহ নিম্নে লিখিত হইল।

১। মোসলমানগণ এ বৎসর য়োমরাঃ-অনুষ্ঠান করিবেন না; আগামী বর্ষে আসিয়া য়োমরাঃ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। মক্কায় প্রবেশ কালে তরবারি ব্যতীত অন্য কোনও 'হাতিয়ার' (যুদ্ধাস্ত্র) তাহাদের নিকট

থাকিবে না। তরবারিও 'নিয়াম' (কোষ—খাপ)-এর ভিতর থাকিবে। আগামী বর্ষে ও তাহারা ৩ দিনের অধিক কাল মক্কায় থাকিতে পারিবে না।

২। সন্ধির মেয়াদ ১০ বৎসর কাল স্থায়ী হইবে। এই (নির্দ্দিষ্ট) সময় মধ্যে কোনও 'ফরিক' (দল) অপর দলের 'জান ও মালের' (জীবনও অর্থ-সম্পত্তির) একেবারেই বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না। পরস্পর 'আমন' ও 'আমান' (নির্ব্বিরোধ ও শান্তি)-এর সহিত বাস করিবে।

৩। আরবের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 'এখ্‌তেয়ার' (অধিকার) থাকিবে, তাহারা এই উভয় দলের মধ্যে যে দলের সঙ্গে ইচ্ছা, সন্ধি-স্থাপন করিতে পারিবে। উক্ত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ জাতির শর্ত্ত সমূহ এই প্রকারেই (এই সন্ধি-পত্রের মতনই) লিপিবদ্ধ হইবে। উভয় 'ফরিক কবায়েল' (স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায়) আমাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইতে ও বন্ধু বানাইতে বা বন্ধুত্ব স্থাপনে স্বাধীন থাকিবে।

৪। যদি কোরেশ (বা মক্কাবাসী) দিগের মধ্য হইতে কোনও ব্যক্তি ওলীর (অভিভাবকের—মুরব্বির) বিনানুমতিতে (ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বা আশ্রয় লাভার্থ) মোসলমানদিগের নিকট চলিয়া যায়, তবে তাহাকে কোরেশদিগের হস্তে ফিরাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু যদি কোনও মোসলমান কোরেশদিগের নিকট আইসে (তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে), তবে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

এই সন্ধি পত্রের (শেষ—চতুর্থ) শর্ত্তটী ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগের নিকট বড়ই কঠোর ও 'নাগওয়ার' (অপ্রীতিকর) বোধ হইতেছিল। ঘটনা বশতঃ সন্ধি-পত্র লিখিবার সময়ই কোরেশ-পক্ষের প্রতিনিধি ছহিলের পুত্র আবু-জন্দল (রাজিঃ)—যিনি ইতিপূর্ব্বে মোসলমান হইয়াছিলেন, আর এই অপরাধে তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল—কোনও রূপে বন্দিত্ব হইতে পলায়ন পূর্ব্বক আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবু জন্দল (রাজিঃ) মোসলমান হইয়াছিলেন বলিয়া মক্কার কাফেরগণ তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার শারীরিক শাস্তি প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার দেহে নানাপ্রকার ক্ষত-চিহ্ন ও 'তাযা যখম' (টাট্‌কা ঘা) তখনও বিদ্যমান ছিল। তিনি সেই সকল ক্ষত ও ক্ষত-চিহ্ন সকল দেখাইয়া 'ফরিয়াদ' (প্রার্থনা) করিলেন যে, আমাকে অবশ্য অবশ্য সঙ্গে মদীনায় লইয়া চলুন। ছহিল বলিল, সন্ধি-পত্রের শর্ত্ত অনুযায়ী আমরা আবু-জন্দলকে ফেরত পাইতে চাই। আঁ হজরত (ছালঃ) ছহিল কে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু সে কিছুতেই পুত্রকে ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইল না। অবশেষে আবু-জন্দল (রাজিঃ)-কে তাঁহার পিতা ছহিলের হস্তে সমর্পণ করা হইল। ছহিল প্রহার করিতে করিতে আবু-জন্দল (রাজিঃ)-কে মক্কায় লইয়া চলিল। এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শনে ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল; কিন্তু হজরত ওমর (রাজিঃ) সর্ব্বাপেক্ষা 'বেতাব' (অধৈর্য্য) হইয়া পড়িলেন; এবং তৎক্ষণাৎ আঁ হজরতের (ছালঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া সন্ধি-পত্রের শেষ দফার প্রতিবাদ করিলেন। তদুত্তরে আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি আল্লার রছুল, সুতরাং আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীতাচরণ ও সন্ধি-ভঙ্গ করিতে পারি না। তিনি আমাকে কখনও 'যলিল' (অবমানিত ও অপদস্থ) করিবেন না। ইহার পর হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর ক্রোধ যখন প্রশমিত হইল, তখন এইরূপ 'গোস্তাখীর (অশিষ্টতার—'বে-আদবীর) জন্য তিনি বড়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। এই অপ্রীতিকর কার্য্যের জন্য তিনি আজীবন 'তওবা' ও 'আস্তাগ্‌ফার' করিয়া গিয়াছেন।

সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরীত হওয়ার পর আঁ হজরত (ছালঃ) ও মোসলমানগণ হোদিবিয়ায়ই কোরবাণী কার্য্য সম্পাদন করিলেন, এবং এহ্‌রাম খুলিলেন,

'হাজামত' বানাইলেন (ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিলেন)। আঁ হজরত (ছালঃ) যখন হোদিবিয়াঃ হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে "ছুরা ফত্‌হ" 'নাযেল' (অবতীর্ণ) হইল। আর খোদা তা-লা এই সন্ধিকে—ছাহাবাঃ কারাম রাজিঃ)-গণ যাহাকে আপনাদের এক প্রকার পরাভব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন—প্রকৃত 'ফতেহ্‌' (বিজয় লাভ) বলিয়া প্রকাশ করিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা জানা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে কোরেশদিগের সঙ্গে এই সন্ধি-স্থাপন, মোসলমানদিগের পক্ষে গৌরব-জনক বিজয় লাভেই পরিণত হইয়াছিল। এস্‌লামের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিজয় লাভ এই হইয়াছিল যে, ধারাবাহিক যুদ্ধের গতিরোধ হইয়া, শান্তি ও নিশ্চিন্ততার যুগ আসিয়াছিল। এস্‌লামের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ পৃথিবীতে নির্ব্বিরোধে, সুখ-শান্তির সঙ্গে বাস করিতে পারে; সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকে। ফলতঃ দুনিয়াতে সত্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও শান্তি স্থাপনের জন্য নিতান্ত বাধ্য হইয়া মোসলমানদিগকে নানা যুদ্ধ-হাঙ্গামায় ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। হোদিবিয়ার সন্ধি-পত্র দ্বারা ভবিষ্যতে যে সুফল ফলিয়াছিল, উহা দ্বারাই বেশ অনুমান করা যাইতে পারে যে, উক্ত সন্ধি-স্থাপনের মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে, মোসলমানদিগের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছিল। সন্ধি-পত্রের চতুর্থ শর্ত্ত ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগের নিকট বড়ই কঠোর ও কষ্টদায়ক বোধ হইতেছিল; এক্ষণে সেই সর্ত্তটার ফল একবার দেখুন:—সন্ধি-বন্ধনের কিছু দিন পরেই আবু-বছির (রাজিঃ) নামক একজন নব-দীক্ষিত মোসলমান—যিনি মক্কায় এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; মক্কার কাফেরগণের দারুণ উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া, সেখান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক মদীনায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই কোরেশগণ আপনা-দের দুইজন লোককে এই উদ্দেশ্যে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে

পাঠাইল যে, সন্ধি-শর্ত্ত অনুসারে আবু-বছির (রাজিঃ)-কে যেন তাহাদের হস্তে সমর্পণ করা হয়। আবু-বছির (রাজিঃ) মক্কায় ফিরিয়া যাওয়া আপনার পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও 'বদতর' ('খারাব' ঘৃণিত ও কষ্টকর) বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু কি করিবেন, নিরূপায়! আঁ হজরত (ছালঃ) আবু-বছিরের ইচ্ছা অপেক্ষা সন্ধি-পত্রের শর্ত্ত পালন অধিকতর গুরুতর ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন, এবং তদনুসারে তাঁহাকে কোরেশদিগের প্রেরিত লোকদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আবু-বছির (রাজিঃ) "যিল-হলিফাঃ" নামক 'মঞ্জেল' পর্য্যন্ত বন্দী রূপে ঐ লোক দ্বয়ের সঙ্গে গমন করিলেন। এই স্থলে তিনি একজন প্রহরীর তরবারি খানির খুব প্রশংসা করাতে, দ্বিতীয় প্রহরী তরবারি খানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিবামাত্র তিনি অতি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত একজন প্রহরীর মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া, দ্বিতীয় প্রহরীর পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক, মদীনা শরীফে আঁ হজরতের (ছালঃ) সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন; আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহার কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করাতে, তিনি মদীনা হইতে প্রস্থান করিলেন। কোরেশদিগের প্রেরিত অপর লোকটী মক্কায় গমন পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা কোরেশদিগের নিকট বর্ণনা করিল। আবু-বছির (রাজিঃ) মদীনা হইতে গমন পূর্ব্বক লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী "আয়িছ" নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। আবু-জন্দল (রাজিঃ) বিন্-ছহিল, আবু-বছির (রাজিঃ)-এর ঘটনা শ্রবণ পূর্ব্বক, সুযোগক্রমে মক্কা হইতে পলায়ন করিলেন, এবং সোজা-সুজি আবু-বছির (রাজিঃ)-এর নিকট গিয়া পঁহুছিলেন। ইহার পর ব্যাপার এইরূপ দাঁড়াইল যে, মক্কায় যাঁহারা মোসলমান হইতেন, তাঁহারা সেখান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত "আয়িছ" নামক স্থানে আবু-বছির (রাজিঃ) ও আবু-জন্দল (রাজিঃ)-এর সঙ্গে গিয়া সম্মিলিত হইতেন। ক্রমে আয়িছে এই নব-দীক্ষিত

মোসলমানদিগের একটী প্রবল সঙ্ঘ সংগঠিত হইল। এইক্ষণে এই দলের লোকেরা কোরেশদিগের শামের (সিরিয়ার) বাণিজ্য-যাত্রী 'কাফেলা' সকল আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদের বাণিজ্য-দ্রব্য গুলি কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। মক্কার কোরেশদিগের পক্ষে এই নব-গঠিত মোস্‌লেম-দলটী এমন ভয়াবহ ও ভীতি-প্রদ হইয়া দাঁড়াইলেন যে, তাহারা (কোরেশগণ) নিতান্ত নিরূপায় হইয়া অতি কাতরভাবে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল যে, সন্ধি-পত্রের ৪র্থ শর্ত্তটী আমরা 'মন্‌ছুখ' ('বাতেল'—অগ্রাহ্য—'রদ') করিয়া দিতেছি। এক্ষণে যাহারা মক্কায় মোসলমান হইয়া মদীনায় চলিয়া যাইবে, আমরা তাহাদিগকে আর কখনও ফিরাইয়া আনিব না। আর দয়া করিয়া আয়িছস্থ মোসলমানদিগকে মদীনায় আপনার নিকট ডাকাইয়া লউন। আঁ হজরত (ছালঃ) কোরেশদিগের এই 'দরখাস্ত' (প্রার্থনা—আবেদন) 'মঞ্জুর' করিলেন। ওদিকে আবু-বছির (রাজিঃ)-কে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তুমি সত্বরে সদলবলে মদীনায় চলিয়া আইস। যখন আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এই আদেশ আবু-বছির (রাজিঃ)-এর নিকট পঁহুছিল, তখন তিনি মৃত্যু-শয্যায় শায়ীত ; তিনি সেই অবস্থায় আবু-জন্দল (রাজিঃ)-কে ডাকাইয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ! আমার ত আসন্ন সময় উপস্থিত। তুমি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আদেশ কার্য্যে পরিণত কর। ইহার অব্যবহিত কাল পরেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপর আবু-জন্দল (রাজিঃ) স্বীয় দল বল লইয়া মদীনা-মন্থুওরায় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হোদিবিয়াঃ সন্ধির 'ছেলছেলায়' (ধারাবাহিক বর্ণনায়) এই ঘটনা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল বটে, কিন্তু এই ঘটনা ৬ষ্ঠ হিজরীতেই ঘটিয়াছিল। হোদিবিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আঁ হজরত (ছালঃ) ওমর-বিন্‌-ওম্মিয়া জমরী (রাজিঃ)-কে একখানি পত্র লিখিয়া হাবশের

বাদশাহ্ নজ্জাশীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উদ্দেশ্য, যে সকল মহাজেরিন তথায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, জাফর-বিন্-আবিতালেব (রাজিঃ)-এর নেতৃত্বাধীনে সেই সকল মোসলমানকে যেন মদীনায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই পত্রে তিনি বাদশাহ নজ্জাশীকে পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ জন্য 'দাওত' দিয়াছিলেন। হাবশ-পতি এই পত্র পাইবামাত্র পরম ভক্তি সহকারে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন; আর নানাপ্রকার 'তহফা' ও 'হাদিয়া' (নযর এবং উপঢৌকন) সঙ্গে দিয়া আশ্রিত মোসলমানদিগকে মদীনায় রওয়ানা করিয়া দিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) হোদিবিয়াঃ হইতে-রওয়ানা হইয়া যেলহজ্জ মাসে মদীনায় পঁহুছিয়াছিলেন। ৭ম হিজরীর শেষ পর্য্যন্ত তিনি মদীনায়ই অবস্থান করিলেন। ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকার (রাঃ—আঃ) ওয়ালেদাঃ মাজেদা (গর্ব্তধারিণী—মাতা) এই বৎসর এন্তেকাল করিয়াছিলেন। আর প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী মহাপণ্ডিত হজরত আবু-হোরেরাঃ (রাজিঃ) এই বৎসরেই ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

৭ম হিজরীর ঘটনাবলী

হোদিবিয়াঃ সন্ধির পর আঁ হজরত (ছালঃ) মক্কার মোশরেকদিগের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু মদীনায় আগমন পূর্ব্বক জানিতে পারিলেন, খয়বরের য়িহুদিগণ মোসলমানদিগের মূলোৎপাটন জন্য, ও মদীনা আক্রমণার্থ মহা ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিতেছে। এমন কি, তাহাদের যুদ্ধায়োজন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মদীনা হইতে বনু-নজীর ও বনু-করিযাঃ নামক য়িহুদী সম্প্রদায় দ্বয়কে 'জালাওতন' (নির্ব্বাসিত) করা হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ নির্ব্বাসিত হইয়া

খয়বরেই আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করে। এই য়িহুদিগণের মধ্যে মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে ভীষণ বিদ্বেষানল অতীব প্রবলভাবে প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল। মক্কার পরে, মোসলমানদিগের শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচরণ করিবার কেন্দ্র স্থান ছিল য়িহুদী অধিবাসী পূর্ণ এই খয়বর। য়িহুদীদিগের সমুদয় শক্তিশালী 'কবায়েল' (গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়) খয়বরে একত্র সম্মিলিত হইয়া, প্রথমতঃ মক্কার 'মোশরেক' (অংশীবাদী বা পৌত্তলিক)-গণ, এবং আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষমতাশালী দল সমূহকে মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-পরায়ণ ও উত্তেজিত করিতে বিশেষভাবে চেষ্টা পাইতেছিল। সমুদয় যোগাড়-যন্ত্র ঠিক হইলে, তাহারা মোসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্ত প্রকাশ্যভাবে—মহাড়ম্বরে সমরসজ্জ করিতে লাগিল। আরবের 'গৎফান' নামক সম্প্রদায়কে এই বলিয়া স্বপক্ষাবলম্বী করিল যে, যুদ্ধে জয়ী হইলে মদীনায় যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার অর্দ্ধাংশ তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। কেবল তাহাই নহে, তাহারা মদীনার মোনাফেক দিগকেও আপনাদের গুপ্ত সাহায্যকারী রূপে দাঁড় করিয়াছিল। এই মোনাফেক গুপ্তচরদিগের সাহায্যে তাহারা মদীনার দুই মাইল দূরবর্ত্তী খয়বরে বসিয়া, মদীনাস্থ মোসলমানদিগের ছোট বড় সকল সংবাদই গ্রহণ করিতেছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) য়িহুদীদিগের এই সমর-সজ্জার সঠিক সংবাদ জানিতে পারিয়া, ৭ম হিজরীর মহর্‌রম মাসে ১৫০০ পনর শত ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ—যাঁহাদিগের মধ্যে ২০০ দুই শত অশ্বারোহী ছিলেন)—সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে খয়বরাভিমুখে 'কুচ্' (যাত্রা) করিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) খয়বরের নিকটে পঁহুছিয়া খয়বর ও বনি-গৎফান সম্প্রদায়ের বাস পল্লীর মধ্যস্থলবর্ত্তী 'রজিয়' নামক স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন; তদ্দর্শনে বনি-গৎফান সম্প্রদায়ের মনে এই আশঙ্কার উদ্রেক হইল যে, মোসলমানগণ আমাদের বাস-পল্লী আক্রমণ করিবে। এই মনে করিয়া তাহারা আপনাদের

পল্লী সমূহে সুসজ্জিত অবস্থায় থাকিয়া, মোসলমানদিগের আক্রমণের গতি-রোধ করিতে প্রস্তুত রহিল; সুতরাং খয়বরের য়িহুদিগণের সাহায্যার্থ গমন করিতে পারিল না। খয়বরের এলাকায় য়িহুদীদিগের পরস্পর নিকটবর্ত্তী ৬টী বৃহৎ, সুদৃঢ় ও অজেয় কেল্লা ছিল। এস্লামী সেনাদল খয়বরে পঁহুছিলে য়িহুদিগণ বিপুল উৎসাহে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিল, এবং গর্ব্বের সহিত প্রতিদ্বন্দী যোদ্ধা আহ্বান করিতে লাগিল। যাহারা প্রতিদ্বন্দী যোদ্ধা চাহিতেছিল, তাহাদের মধ্যে মরহব ও এয়াছর—এই দুই ব্যক্তি দেশ-বিখ্যাত বীরপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তাহাদের দর্প-পূর্ণ আহ্বানে মোসলমান পক্ষ হইতে মহ্মুদ-বিন্-মোছলেমাঃ (রাজিঃ) ও যোবের বিন্-আল্-য়োয়াম (রাজিঃ) স্বদল হইতে বাহির হইলেন; এবং মোহাম্মদ-বিন্-মোছলেমাঃ (রাজিঃ) মরহবকে ও হজরত যোবের বিন্-আল্ য়োয়াম (রাজিঃ) এয়াছরকে 'কতল' (নিহত) করিলেন। ময়দানী ও সম্মুখ যুদ্ধে মোসলমানদিগের সঙ্গে পারিয়া উঠা অসম্ভব দেখিয়া, য়িহুদিগণ 'কেল্লাবন্দ' হইয়া যুদ্ধ করা ফল-দায়ক বলিয়া মনে করিল। খয়বরের য়িহুদী কেল্লা গুলির মধ্যে ছয়ব্-বিন্-ময়ায্ এর কেল্লা (দুর্গ) টী সর্ব্বাপেক্ষা 'মজবুৎ' (সুদৃঢ়) অজেয় এবং এমন উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত ছিল যে, তথা হইতে অন্যান্য কেল্লা গুলির 'মদদ' (সাহায্য) করা যাইতে পারিত। মোসলমান যোদ্ধপুরুষগণ সর্ব্ব প্রথমে "নায়ম" নামক কেল্লাটী আক্রমণ পূর্ব্বক ঘোর যুদ্ধের পর উহা অধিকার করিয়া লইলেন। এই কেল্লাটী আক্রমণ কালে কেল্লাস্থ য়িহুদিগণ কেল্লার উপর হইতে একটা পাথরের চাকি হজরত মহ্মুদ-বিন্-মোস্লেমাঃ (রাজিঃ)-এর উপর নিক্ষেপ করাতে তিনি শহীদ হইলেন (ইন্না লিল্লাহে—)। অতঃপর আবুল হকিক্ য়িহুদীর কেল্লা "কমুছ" ও ভীষণ যুদ্ধের পর মোসলমানদিগের অধিকৃত হইল। এই দুর্গে সফিয়াঃ-বিন্তে হাই-এব্নে-আখ্তব এবং আরও অন্যান্য বহু

সংখ্যক য়িহুদী মোসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইল। সফিয়াঃ-বিন্তে-হাই এর বিবাহ কেনানাঃ-বিন্-আল যিয়-বিন্-আবিল হকিকের সঙ্গে হইয়াছিল। বন্দী হওয়ার পর যখন কয়েদিগণকে মোসলমানদিগের মধ্যে ভাগ-বন্টন করিয়া দেওয়া হইল, তখন তিনি হজরত ওহিয়াঃ (রাজিঃ)-এর অংশে পড়িয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে ক্রয় করিয়া 'আযাদ' (স্বাধীন—মুক্ত) করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া মোসলেম-মাতার গৌরব প্রদান করেন। কমুছের পর ছয়ব-বিন্-ময়াযের কেল্লা মোসলমানদিগের দ্বারা জয় ও অধিকৃত হইল। ইহার পর খয়বরের চতুর্থ কেল্লা ও মোসলমানগণ বাহুবলে অধিকার করিয়া লইলেন। এক্ষণে " ওতিহ " ও " ছলালম " নামক দুইটী কেল্লা মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এই দুইটী কেল্লা মোসলমানগণ ১০ দিন পর্য্যন্ত " মহাছেরাঃ " (অবরোধ) করিয়া রহিলেন। " মহছুর " (অবরুদ্ধ) য়িহুদিগণ যখন অবরোধের দৃঢ়তা ও খাদ্য দ্রব্যাদির অভাবে নিরুপায় হইয়া পড়িল, তখন আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট 'পয়গাম' (সংবাদ) পাঠাইল যে, যদি উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক গ্রহণে আমাদিগকে আমাদের যমিনের (বাগান ও শস্যক্ষেত্রের) উপর 'কাবেজ' (অধিকারী) থাকিতে দেন, তবে আমরা আপনার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য আছি। দয়ার সাগর আঁ হজরত (ছালঃ) তাহাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন,—বাগান ও শস্য-ক্ষেত্রের অর্দ্ধেক ফসল গ্রহণের শর্ত্তে অর্থাৎ; তাহাদিগকে প্রজা রূপে রাখিয়া ঐ সকল বাগান ও কৃষিক্ষেত্র তাহাদিগকে ভোগ দখল করিতে দিলেন। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কাল পর্য্যন্ত তাহারা ঐ শর্ত্তে খয়বরের বাগ-বাগিচা ও শস্যক্ষেত্র সকল ভোগ দখল করিয়া আসিয়াছিল।

খয়বরের এই যুদ্ধে ১৫ জন মাত্র মোসলমান শহীদ হইয়াছিলেন;

আর য়িহুদিদিগের পক্ষে ৯৩ জন যোদ্ধা সমরশায়ী হইয়াছিল। মোসলমান-দিগের মধ্যে ৪ জন মহাজেরিন ও ১১ জন আন্ছার ছিলেন। এই যুদ্ধের সময় 'হেমার আহ্লির (গাধার) 'গোশ্ত্' (মাংস) মোসলমানদিগের জন্য হারাম হয়। আর এই যুদ্ধে 'মোতয়া' (মেয়াদী নেকাহ) চিরদিনের জন্য হারাম করা হইয়াছিল।

আঁ হজরত (ছালঃ) খয়বর হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিতে ছিলেন, এই সময় হাবশ্ (আবিশিনিয়া) রাজ্য হইতে মহাজেরিণ (রাজিঃ) দল, হাবশ্-পতির পত্র এবং তৎপ্রদত্ত 'তহ্ফা' (উপঢৌকন) সহ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের সাক্ষাৎ লাভে এবং সম্মিলনে হুজুর (ছালঃ) এবং মহাজেরিন ও আন্ছার (রাজিঃ)-গণ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এই দূরদেশস্থ মহাজেরিন (রাজিঃ) গণের জন্য আঁ হজরত (ছালঃ) বিশেষ চিন্তাযুক্ত ছিলেন; ইঁহাদের আগমনে মোসলমানদিগের শক্তি ও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইল। খয়বর হইতে প্রত্যাগমন কালে "ফদক্" নামক স্থানের য়িহুদিগণ, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে প্রার্থনা জানাইল যে, আমাদের কেবলমাত্র প্রাণরক্ষা করা হউক, 'মাল-আস্বাবে' আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই। হুজুর (ছালঃ) তাহাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। সুতরাং 'বেলা-তক্ছিম (ভাগ বণ্টন ব্যতিরেকে)— যেরূপ খোদা তা-লার আদেশ ছিল,—উহা খোদা ও তাঁহার রছুলের 'মাল' (সম্পত্তি) বলিয়া পরিগণিত হইল। ফদক্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোস্লেম সেনাদল "ওয়াদি-অল্-কোরা" এর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা সেখানে পঁহুছিলে তত্রত্য য়িহুদিগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিল। কিন্তু অত্যল্প কাল মধ্যেই তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া খয়বরস্থ য়িহুদিগণের ন্যায় উৎপন্ন ফল-শস্যের অর্দ্ধাংশ দিতে রাজী এবং আঁ হজরত

(ছালঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করিল। ওয়াদি-অল্-কোরার যুদ্ধে হজরত মদয়ম (রাজিঃ) নামক একজন ছাহাবায় কারাম মাত্র শহীদ হইয়াছিলেন। ওয়াদি-অল্-কোরার নিকটস্থ "তিমা" নামক য়িহুদী পল্লীর অধিবাসিগণ ও ওয়াদি-অল্ কোরার য়িহুদিগণের পদানুসরণ করিয়া, তাঁহাদের শর্ত্তানুযায়ী আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করিল। ফলতঃ খয়বর হইতে মদীনা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের য়িহুদিগণ, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর অধীনতা-সূত্রে আবদ্ধ হইল।

খয়বর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে এক মঞ্জেলের পথে একটী বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। রাত্রিকালে সকলে শিবিরে নিদ্রিত ছিলেন; কিন্তু প্রত্যুষে আঁ হজরত (ছালঃ), কিংবা ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ) গণের মধ্যে কাহারও নিদ্রা-ভঙ্গ হইল না। এমন কি, পূর্ব্ব গগনে সূর্য্য উদয় হইল। সর্ব্ব প্রথমে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি উঠিয়া সকলকে জাগাইলেন; তাড়াতাড়ি ঐ স্থান হইতে যাত্রা করিয়া কিছু দূরে গিয়া, সমুদয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগকে লইয়া ফজরের নমাজ আদায় করিলেন; নমাজ শেষ করিয়া তিনি ফরমাইলেন, আর কখনও যদি এইরূপ ঘটনা ঘটে,—ঘুম না ভাঙ্গে, তবে জাগরিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ নমাজ আদায় করিবে।

য়িহুদিগণ বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ও সুদখোর থাকাতে, প্রায় সকলেই 'মাল-দার' (ধনী বা অর্থশালী) ছিল। আজকালও পৃথিবীর নানাদেশে—বিশেষতঃ ইউরোপ ও আমেরিকায়—এদেশে ও বোম্বাই এবং কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে বহু বড় বড় ধনী ও ক্রোড়পতি য়িহুদী রহিয়াছেন; খয়বরের য়িহুদিদিগের অধিকার ভুক্ত 'যমিন' (ভু-সম্পত্তি) অত্যন্ত উর্ব্বরা ও শস্য-শালিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। খয়বর বিজয়ের পর, বিজয় লব্ধ-প্রচুর সামগ্রী-সম্ভার, আর কৃষির-যমিন ও বাগ-বাগিচা যাহা ভাগে

পাইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা এতকাল পরে মহাজের (রাজিঃ) গণের অর্থাভাব একেবারে দূর হইল। এক্ষণে নিরূপায় মহাজেরগণ 'ছাহেবে-জায়দাদ' (ভূ-সম্পত্তির অধিকারী) হইলেন। খয়বর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের যমি সমূহের মধ্যে ফেদকের জায়দাদ (ভূ-সম্পত্তি—চাষের যমিন ও বাগ-বাগিচাঃ) আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ভাগে পড়িয়াছিল। উহার উপস্বত্ব হইতে একদিকে তিনি স্বীয় সাংসারিক ও পারিবারিক খরচ-পত্র নির্ব্বাহ করিতেন, পক্ষান্তরে দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করিতেন; তদ্ব্যতীত 'এতিম' (অনাথ) বালক বালিকা ও নিঃস্ব-নিরূপায় মহতায্' (পর মুখাপেক্ষী) লোকদিগের ভরণ-পোষণ ও তদ্দ্বারা নির্ব্বাহ করিতেন।

মক্কার মোশ্‌রেক (অংশিবাদি) গণ যখন খয়বরের উপর মোসলমান-দিগের 'চড়্‌হাই' (অভিযান ও অবরোধ)-এর সংবাদ পাইল, তখন তাহারা বড়ই উৎকণ্ঠার সহিত এই যুদ্ধের পরিণাম-ফল জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। হোজাজ-বিন্-আলাত ছলমী নামক একজন অর্থ-সম্পদ শালী লোক 'ছফর' (প্রবাস-যাত্রা)-এর নাম করিয়া, মক্কা হইতে বাহির হইয়া, মদীনা-মনুওরায় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়া-ছিলেন; খয়বরের যুদ্ধে তিনি আঁ হজরতের (ছালঃ) সঙ্গী ছিলেন। যুদ্ধজয়ের পর তিনি, 'হুজুর' (ছালঃ)-এর আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক মক্কায় গিয়া দেখিলেন, মক্কাবাসী—বিশেষতঃ কোরেশগণ খয়বরের 'খবর' (সংবাদ) জানিবার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। তিনি খয়বরের প্রকৃত অবস্থা তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিলেন না; বরং নিজের পাওনা টাকা কড়ি আদায় কার্য্যে সকলের সহায়তা গ্রহণ করিলেন। সমুদয় টাকা-কড়ি আদায় করিয়া লইয়া, মক্কা পরিত্যাগ কালে তিনি কেবল-মাত্র আব্বাছ বিন্-আবদুল মোত্তালেব কে খয়বর-বিজয়ের সংবাদ বলিয়া

গেলেন। ইহার পর মক্কার কাফেরগণ হোজাজের ইস্‌লাম ধর্ম্ম-গ্রহণ, এবং মোসলমানদিগের দ্বারা খয়বর 'ফতেহ্' (জয়) হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইল। এই সংবাদ শ্রবণে তাহারা বড়ই মর্ম্ম-পীড়িত হইয়াছিল।

আঁ হজরত (ছালঃ) খয়বর হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, যে সকল সম্প্রদায় মোসলমানদিগের মূলোৎপাটন করার জন্য চেষ্টা পাইতেছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে এক এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য, যাহাতে তাহারা ভয় পায়, এবং তাহাদের উপর ইস্‌লামের 'রোয়ব' (প্রভাব) প্রতিষ্ঠিত হয়; আর ভবিষ্যতে তাহাদের দ্বারা কোনও ভীষণ ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ-বিপ্লবের আশঙ্কা না থাকে। তদনুসারে নজদের ফযারাঃ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-কে একদল সৈন্য সহ প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছালমাঃ-বিন্-আলা কোয় (রাজিঃ) এবং অন্যান্য কতিপয় ছাহাবাঃ রওয়ানা হইলেন। হওয়াযেন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হজরত ওমর-বিন্-খাত্তাব (রাজিঃ)-এর অধিনায়কতায় ৩০ জন অশ্বারোহী যোদ্ধপুরুষ গমন করিলেন। হজরত আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ (রাজিঃ), ৩০ জন উষ্ট্রারোহী সৈন্যের সঙ্গে, বশির-বিন্-দারাম নামক য়িহুদীকে 'গেরেফ্‌তার' (ধৃত) করিবার জন্য রওয়ানা হইলেন। এই লোকটী খয়বরের য়িহুদীদিগকে বিদ্রোহী হইবার জন্য উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতেছিল। বশির বিন্-ছায়াদ আন্‌ছারি (রাজিঃ) ৩০ জন অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া বনি-মব্‌রাহ সম্প্রদায়কে দমন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। হজরত ওছামাঃ বিন্-যয়েদ (রাজিঃ)-কে এক প্রবল বাহিনীর সঙ্গে, জহনিয়া সম্প্রদায়ের এক শাখা কবীলার (গোষ্ঠীর) বাসস্থান হরক্কার দিকে পাঠাইলেন। হজরত গালেব (রাজিঃ) বিন্-আবদুল্লা কলিনী, একদল যোদ্ধপুরুষের সঙ্গে, বনি-আল্-মলুহ্ সম্প্রদায়কে 'শায়েস্তা' (সোজা) করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। হজরত আবু-হদরু আছলমী

(রাজিঃ)-কে মাত্র ৩ জন ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-এর সঙ্গে, জশম-বিন্-মোয়াবিয়া সম্প্রদায়ের ছরদার (দলপতি বা নেতা) রফার-বিন্-কয়েস কে দমন করিবার জন্য পাঠাইলেন। হজরত আবু-কেতাদাহ্ (রাজিঃ) ও মহলম (রাজিঃ) বিন্-জছামকে, মকাম " আজম " (আদম)-এর দিকে রওয়ানা করিলেন। এই সকল সামরিক অভিযান সম্পূর্ণ সাফল্য-মণ্ডিত অবস্থায় মদীনা-তৈয়বায়, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে ফিরিয়া আসিল। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মোসলমানগণ সম্পূর্ণ বিজয় ও সাফল্য লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন

আঁ হজরত (ছালঃ) এই বৎসরেই আরব দেশের বিভিন্ন রাজ্যে, এবং আরবের বাহিরে ও কতিপয় সাম্রাজ্য ও রাজ্যের অধিপতি ও সম্রাট্ দিগের নিকট পত্র সহ 'এল্‌চি' (দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ জন্য অনুরোধ ও আহ্বান করা হয়। আবিশিনিয়ার (হাবশের) বাদশাহ নজ্জাশার নিকট যে পত্র লেখা হইয়াছিল, তাহা ইতি- পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। আবিশিনিয়াধিপতি আনন্দের সহিত পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে আঁ হজরত (ছালঃ) রুমের বাদশাহ (কনষ্টান্টিনোপলস্থ গ্রীক্-সম্রাট্) হরকল্, মেছেরের বাদশাহ্ লহকুকশ্, বাহ্‌রায়নের অধিপতি মন্‌যর-বিন্-ছাওবী, ওমানের বাদশাহ, এমামার অধিপতি হোযাঃ-বিন্ আলী, দেমেশ্‌কের ঈসায়ী শাসনকর্ত্তা হারেস্-বিন্- আল্ শমর গচ্ছানী, জবুলাঃ-বিন্-আরিহম, এমনের বাদশাহ হরছ-বিন্- আবদ কালান হমিরী ও ফারেছের বাদশাহ (পারস্য-সম্রাট্)-কেছরী (কেছরাঃ)-এর নিকট চিঠি-পত্র দিয়া, উপযুক্ত দূতগণকে রওয়ানা করিলেন। কনষ্টান্টিনোপলস্থ গ্রীক্ সম্রাট্ হরকল, আঁ হজরতের (ছালঃ) প্রেরিত দূতের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন ; কিন্তু রাজত্বের লোভে ও খৃষ্টীয়ানদিগের ভয়ে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না। মেসেরের

শাসনকর্ত্তা লহকুকশ্, আঁ হজরতের পত্র ও তাঁহার এল্‌চির প্রতি খুব ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন; তিনি আদরের সহিত পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন; আর একটী খেলয়ত, একটী বহুমূল্য অশ্বতর (খচ্চর) এবং দুইজন ক্রীত দাসী 'হাদিয়া' (নযর) স্বরূপ পত্রের সঙ্গে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে রওয়ানা করিয়াছিলেন। ওখানের নরপতি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পত্র পাইয়া পরম ভক্তি সহকারে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মন্‌যর বিন্-সাওনী, আঁ হজরতের (ছালঃ) পত্রখানি পাইয়া, প্রেরিত এল্‌চি ও পবিত্র পত্রখানির প্রতি পরম ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করেন। ফারেছের বাদশাহ (পারস্য-সম্রাট্) কছরী, (কেছরাঃ) আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পত্রখানি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন; আর আঁ হজরত (ছালঃ) এর এল্‌চি হজরত আবদুল্লা-বিন্-হযাফাঃ (রাজিঃ) এর সঙ্গে 'গোস্তাখানা' (অভদ্রতা ও অশিষ্ট জনক) ব্যবহার করিয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) এই সংবাদ শ্রবণে বলিয়াছিলেন, কছরীর 'ছোলতানৎ' (রাজ্য বা সাম্রাজ্য) ঐরূপ (ছিন্ন পত্রখানির ন্যায়) টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। ফলতঃ কিছুকাল (কয়েক বৎসর) পরেই, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। মহামান্য দ্বিতীয় খোল্‌ফায়ে রাশেদীন হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ-কালে বিশাল পারস্য-সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ইস্‌লামী খেলাফতের (সাম্রাজ্য বা গণতন্ত্রের) অন্তর্ভুক্ত হয়।

৭ম হিজরীর শওয়াল মাসের শেষ পর্য্যন্ত আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনা-তৈয়বায়ই তশরিফ্ রাখিয়াছিলেন। ৭ম হিজরীর জেল্কদ মাসের প্রারম্ভে তিনি ঐ সকল ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-কে 'ছফর' (প্রবাস বা মোছাফেরী)-এর জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন—যাঁহারা গত বৎসর হোদিবিয়ার সন্ধির সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তদনুসারে ঐ সকল ছাহাবাঃ (রাজিঃ) এবং আরও বহুসংখ্যক ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ছফরের জন্য

প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ২০০০ দুই হাজার ছাহাবাঃ (রাজিঃ), হুজুর (ছালঃ)-এর সঙ্গে য়োম্‌রা-অনুষ্ঠান আদায় করিবার জন্য মক্কা হইতে মদীনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গতবার হোদিবিয়ায় যে সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরীত হইয়াছিল, তাহাতে এই শর্ত্ত ছিল যে, এ বৎসর য়োমরা আদায় করা ব্যতীত আঁ হজরত (ছালঃ) সদলবলে চলিয়া যাইবেন, আর আগামী বৎসর আসিয়া য়োমরা-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন। সুতরাং এই শর্ত্ত অনুযায়ী আঁ হজরত (ছালঃ) সশিষ্যে সদলবলে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মক্কার খুব নিকটে পঁহুছিয়া কোষবদ্ধ তরবারি এবং হেমায়েল মাত্র সঙ্গে রাখিলেন; অবশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার 'হাতিয়ার' (অস্ত্র-শস্ত্র) খুলিয়া রাখিয়া দিয়া, তৎপর মক্কায় প্রবেশ করিলেন। বয়তোল্লার সম্মুখে পঁহুছিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) মোসলমানদিগকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা স্কন্ধদেশ 'বর্-আহ্‌নাঃ' (অনাবৃত—অনাচ্ছাদিত) কর, আর এহ্‌রামের কাপড় বগলের নীচে দিয়া বাহির করিয়া, 'গরদানের' (ঘাড়ের) 'গের্দ্দ' (চতুর্দ্দিক) লেপ্টাইয়া লইয়া 'মস্তয়দীর' (দৃঢ়তার) সঙ্গে দৌড়িয়া 'ছর্‌গরমীর' (মহোৎসাহের) সঙ্গে 'বায়তোল্লার' (পবিত্র কাবা-গৃহের) 'তওয়াফ্' (প্রদক্ষিণ) কার্য্য সম্পন্ন কর। মোসলমানদিগের এই আড়ম্বর পূর্ণ তওয়াফ্ঃ কঠোর পরিশ্রম, অসাধারণ শক্তি ও ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা দর্শনে বিধর্ম্মিগণ স্তম্ভিত হইল; অনেকে মনের দুঃখে নিকটস্থ ওয়াদী ও পাহাড় অঞ্চলে চলিয়া গেল।

আঁ হজরত (ছালঃ) এবং ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-গণ গত বর্ষের সন্ধি-শর্ত্তানুসারে ৩ দিবস মাত্র মক্কা-মোয়াজ্জমায় অবস্থিতি করিলেন। 'আরকানে-ওমরা' কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক আঁ হজরত (ছালঃ), স্বীয় পিতৃব্য আব্বাস-বিন্-আবদুল-মোত্তালেবের বিবী (পত্নী) ওম্মে-ফজলের ভগিনী ময়মুনাঃ বিন্তে হারেসের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা

ছিল 'ওলিমার যেয়াফৎ' (বিবাহের পর বরপক্ষ হইতে যে ভোজ দেওয়া হয়) করিয়া মক্কাবাসীদিগকে আহার করান ; কিন্তু কোরেশগণ ৩ দিনের বেশী কিছুতেই মোসলমানদিগকে মক্কায় থাকিতে দিতে রাজী না হওয়াতে, অগত্যা তিনি ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে, সদলবলে মক্কা পরিত্যাগ করিলেন। ওয়াদি ছরফের মধ্যস্থিত ময়দানে মোসলমানদিগের শিবির সন্নিবেশিত হইল। এই স্থানে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নব-পরিণীতা পত্নী হজরত ময়মুনাঃ (রাঃ—আঃ) তাঁহার 'খেদমতে' আসিয়া উপস্থিত এবং সম্মিলিত হইলেন। যখন তিনি মক্কা হইতে রওয়ানা হইতেছিলেন, ঐ সময় বীরেন্দ্র কেশরী হজরত আমীর হামযাঃ শহীদ (রাজিঃ)-এর অতি অল্পবয়স্কা কন্যা এমারাঃ দৌড়িতে দৌড়িতে আসিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, আমাকেও মদীনায় লইয়া চলুন। হজরত আলী (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া স্বীয় 'হোদজে' (উষ্ট্রের পৃষ্ঠোপরিস্থ হাওদায়) তুলিয়া লইলেন। হজরত জাফর-বিন্-আবি-তালেব (রাজিঃ) ও হজরত জয়েদ-বিন্-হারেছ (রাজিঃ), ঐ বালিকার অভিভাবকত্ব গ্রহণ জন্য দাবীদার হইলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাদের দাবী-দাওয়ার কথা শুনিয়া, এমারাঃ কে হজরত জাফর (রাজিঃ)-এর হস্তে এই বলিয়া অর্পণ করিলেন যে, তাঁহার পত্নী এই বালিকার আপন খালা ; খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত ; সুতরাং ইহার 'পরওরেশ' (লালন পালন) জাফর (রাজিঃ)-এর গৃহেই হওয়া চাই। আর সকলকে তিনি বুঝাইয়া সুঝাইয়া নিরস্ত করিলেন।

মদীনা-মমুওরায় প্রত্যাবর্ত্তনের কয়েক দিন পরেই ওমরু-বিন্-অল্-আস, ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে, এবং মক্কা হইতে মদীনায় হেজরত করিতে ইচ্ছুক হইলেন। নানা কারণে ওমরু-বিন্-অল-আসের হৃদয় ইস্লামের দিকে এমন সবলে আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তিনি সে আকর্ষণ হইতে কিছুতেই অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেন না। মহাবীর খালেদ-বিন্-অলিদ

তাঁহার অকপট বন্ধু ছিলেন। হোদিবিয়ার 'ছফরে' (প্রবাসে) "গজবান" নামক স্থানে, রাত্রিকালে এশার নামাজের সময় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর মুখে কোরআন মজীদের সুমধুর কেরয়াত শুনিয়া খালেদ-বিন্-অলিদের হৃদয় একান্ত বিচলিত ও দ্রবীভূত হইয়াছিল। ঐ দিন হইতে তাঁহার ইস্লামের প্রতি 'মোহব্বত' (ভালবাসা) জন্মিয়াছিল।

ওমরু-বিন্-অল্-আস, খালেদ-বিন্-অলিদের নিকট স্বীয় এরাদাঃ সঙ্কল্প) প্রকাশ করিলেন, অর্থাৎ ইস্লাম গ্রহণ সম্বন্ধে স্বীয় অনুকূল অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। তচ্ছ্রবণে খালেদ বিন্-অলিদ তাঁহার 'হামরাহী' (সঙ্গী—প্রবাসের সাথী) হইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। অতঃপর ইহারা উভয়ে আপনাদের অন্যতম বন্ধু ওস্মান-বিন্-তাল্হাকে আপনাদের অভিমত জানাইলেন। তিনিও বিনা আপত্তিতে—বরং ভক্তি-ভরে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সঙ্গী হইতে প্রস্তুত হইলেন। তদনুসারে এই ৩ জন প্রসিদ্ধ কোরেশ ছরদার ও দেশ-বিখ্যাত বীরপুরুষ মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়া মদীনা তৈয়বায়, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন; এবং ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে আঁ হজরত (ছালঃ) অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন; পক্ষান্তরে ইঁহাদের ইস্লাম গ্রহণে ইস্লামের শক্তি অজেয় হইল।

হেজরতের অষ্টম বৎসর।

এক্ষণে আরব দেশে প্রকাশ্যতঃ ইস্লামের কোনও 'খৎরাঃ' (আশঙ্কা) ছিল না। ইস্লাম গ্রহণ করিলে 'জান' (প্রাণ) ও 'মালের' (আর্থিক) ক্ষতির কোনও ভয় ছিল না। আরব দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তি সমূহ একে একে আপনাদের শক্তি ইস্লামের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া অকৃতকার্য্যও

'মায়ুছ' (নিরাশ) হইয়াছিল। ইস্‌লাম এক্ষণে বিশাল আরব দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি-সম্পন্ন ও জয়যুক্ত হইয়াছিল। ইস্‌লাম আরবে যেমন শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল ; তেমনই তথাকার সর্ব্বপ্রকার বিদ্রোহ-বিপ্লব, বাদ-বিসম্বাদ দূর হইতে আরম্ভ হইল। এতদ্‌ স্বত্বেও মক্কার কোরেশগণ—যাহারা আরবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী এবং সম্মানিত ছিল—এখন পর্য্যন্ত কোফর ও শেরকীতে 'কায়েম' (অবিচলিত) এবং মোসলমানদিগের শক্রতাচরণে পূর্ব্ববৎ অটল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। খয়বরের য়িহুদিগণ নিস্তেজ হইবার পর মদীনার মোনাফেক দল এবং মক্কার কোরেশ দল,—মোসলমানদিগের এই ঘোরশত্রু সম্প্রদায় দ্বয়, আরবের আভ্যন্তরীণ 'কবায়েল' (জাতি এবং উপজাতি) দিগকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিয়া যখন তাহার ফল অকৃতকার্য্য ও অসাফল্য দর্শন করিল, তখন তাহারা ইরান (পারস্য) ও রুমের 'শাহান্‌ শাহ' (সম্রাট্‌), এবং ইরাণী ও রোমীয় 'ছরদার' (দলপতি এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা) দিগকে মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবার নিমিত্ত বিশেষ 'কোশেশ্‌' ও 'শাজেশ্‌' (চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র) আরম্ভ করিল। আঁ হজরত (ছালঃ) এই সকল ভাবী বিপদের বিষয় অবিদিত ছিলেন না। তিনি আরবদেশের অভ্যন্তরস্থ এবং ইহার আশে পাশে অবস্থিত ও সংলগ্ন রাজ্য সমূহের নৃপতি ও শাসনকর্ত্তা দিগের নামে 'দাওতি খৎ' (নিমন্ত্রণ-বা আহ্বান পত্র) রওয়ানা করিয়াছিলেন, ঐ সকল দাওতি-পত্রে, অনেক রাজ দরবারে বেশ সুফল প্রসব করিয়াছিল। তদ্দরুণ শত্রুদলের দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র এবং দুষ্ট কল্পনা-জল্পনা অনেক পরিমাণে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোনও কোনও সম্রাট্‌ বা শাসনকর্ত্তা, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পত্র প্রাপ্তিতে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইবে দূরে থাকুক, বরং মোস্‌লেম শত্রুদলের প্ররোচনায় মোসলমানদিগের মূলোৎপাটন করিবার জন্য বদ্ধ-

পরিকর হইলেন। কেহ কেহ মদীনা আক্রমণ করিবার জন্য যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতে ও উৎসাহ সহকারে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে বহিরাক্রমণ হইতে আরব দেশ—বিশেষতঃ মদীনা-তৈয়বা নগরীকে রক্ষা করা—আঁ হজরত (ছালঃ) এবং মোসলমানদিগের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িল। এই সময় কোনও বৈদেশিক শক্তি মদীনা আক্রমণ করিলে, সমগ্র আরবের বিভিন্ন জাতি সমূহ আবার মস্তকোত্তোলন করিয়া, মোসলমানদিগের মূলোৎপাটন করিতে পূর্ণোদ্যমে প্রবৃত্ত হইত।

আঁ হজরত (ছালঃ) যে সকল তব্‌লিগী দাওত পত্র বিভিন্ন সম্রাট্, বাদশাহ ও শাসনকর্ত্তাদিগের নামে লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একখানি পত্র হজরত হারেছ (রাজিঃ) বিন্ য়মির আয্‌দীর হস্তে, শাম (সিরিয়া) দেশের অন্তর্গত বোছরার (বজ্‌রা) শাসনকর্ত্তার নামে রওয়ানা করিয়াছিলেন। হারেছ (রাজিঃ) বিন্-য়মির-আয্‌দি মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া বোছরায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে, শামের সীমান্তবর্ত্তী 'মূতা' নামক স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, তথাকার খৃষ্টীয়ান শাসনকর্ত্তা শরজিল-বিন্ য়মর গাচ্ছানী তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার (ধৃত) করিয়া বন্দী, এবং পরে তাঁহার হত্যা সাধন (শহীদ) করিল। হারেছ-বিন্-য়মির (রাজিঃ)-এর বিনা কারণে—অন্যায় ভাবে কত্‌ল হইবার সংবাদ যখন মদীনা-মনুওরায় পঁহুছিল, সহযোগী ভ্রাতা ও বন্ধুর অতি শোচনীয় ভাবে শাহাদৎ প্রাপ্তিতে ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। আঁ হজরত (ছালঃ) ও এই শোচনীয় ব্যাপারে নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন।

মুতার অভিযান ও তথায় ভীষণ যুদ্ধ।

মুতার শাসনকর্ত্তার অন্যায় ও অবৈধ আচরণের প্রতিকার-কল্পে-কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ জন্য অনতিবিলম্বে এক পরামর্শ-সভা আহূত হইল। আঁ হজরত (ছালঃ) এই ব্যাপারের ভীষণ পরিণাম ছাহাবাঃ (রাজিঃ) মণ্ডলীকে এই বলিয়া বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, এই অত্যাচারী বিধর্ম্মী শাসনকর্ত্তাকে দমন না করিলে, সে সাহসী হইয়া মদীনা আক্রমণ করিতে পারে; এবং অন্যান্য শত্রুগণও সেই সুযোগে মস্তকোত্তোলন করিয়া, মোসলমানদিগের অস্তিত্ব ধরা-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ব্যাপারের গুরুত্ব সকলেই বুঝিতে পারিলেন। মুতার শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য; তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন; তদনুসারে সকলেই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন।

আঁ হজরত (ছালঃ) অনতিবিলম্বে এক 'মহম' (অভিযান) মুতার মদ-গর্ব্বিত শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে রওয়ানা করিলেন। যদি 'মহম' প্রেরণে কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটিত, তবে শামের (শিরিয়ার) দিক্ হইতে মদীনা আক্রান্ত হওয়া 'একিনী' (সুনিশ্চিত) ছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) যয়েদ-বিন্ হারছাঃ (রাজিঃ)-কে এই সেনাদলের সেনাপতি পদে বরিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ফরমাইলেন যে, যদি যয়েদ-বিন্-হারছাঃ (রাজিঃ) যুদ্ধে শহীদ হয়, তবে জাফর-বিন্-আবিতালেব (রাজিঃ) সেনাপতির পদ গ্রহণ করিবে; যদি জাফর (রাজিঃ) ও শহীদ হইয়া যায়, তবে আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ (রাজিঃ) সেনাপতি পদে বরিত হইবে; যদি সেও শহীদ হইয়া যায়, তবে উপস্থিত মোসলমানগণ যাহাকে উপযুক্ত মনে করে, তাহাকেই সেনাপতি পদে বরণ করিবে। এই সেনাদল

রওয়ানা করিয়া, আঁ হজরত (ছালঃ) কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন; পরে তাঁহাদিগকে জয়ী হওয়ার জন্য দোওয়া করিয়া মদীনা-মনুওরায় ফিরিয়া আসিলেন। হজরত যয়েদ-বিন্-হারছাঃ (রাজিঃ) স্বীয় সেনাদল লইয়া 'মায়ান' নামক স্থান পর্য্যন্ত গমন করিলেন। মায়ানে পঁহুছিয়া সংবাদ পাইলেন, মুতার শাসনকর্ত্তা শরজিল-বিন্-ওমরু, মোসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য এক লক্ষ বিক্রান্ত সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে; আর এক লক্ষ মহাপরাক্রান্ত সুশিক্ষিত রোমক সৈন্য লইয়া মুতার কিছু দূরে—ওয়াদি বলক্কায়, স্বয়ং রুমের কায়ছর (কনষ্টান্টিনোপলস্থ রোমক সম্রাট্ হরকল) শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। এই সংবাদ শ্রবণে মুষ্টিমেয় মোসলমান সৈন্যের মনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাও ভীতির সঞ্চার হইল। তাঁহারা ২ দিন পর্য্যন্ত মায়ানে অবস্থান পূর্ব্বক কর্ত্তব্য অবধারণে ব্যাপৃত রহিলেন। কিন্তু এযাবৎ কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন না। অবশেষে আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ (রাজিঃ) অগ্নিময়ী জ্বলন্ত ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক, মোসলমানদিগের হৃদয়ে বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করিয়া দিলেন।

হজরত আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহার এই ইস্লাম-ধর্ম্ম-সম্মত বীরত্ব-ব্যঞ্জক বক্তৃতা শ্রবণে হজরত যয়েদ-বিন্-হারেছ (রাজিঃ), এক হস্তে নেযাঃ (বড়শা বিশেষ) ও অপর হস্তে পবিত্র যুদ্ধ-পতাকা লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সমগ্র মোসলমান সেনাদলে 'জোশ্' (উত্তেজনা) ও 'শাহাদতের শওক' (শহীদ হইবার আকাঙ্ক্ষা) বিশেষ রূপে আত্ম-প্রকাশ করিল। অতঃপর মোসলমান সৈন্যগণ মহোৎসাহে 'মায়ান' হইতে রওয়ানা হইলেন। "মাশ্রর্ফ্" নামক এক গ্রামের নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত ময়দানে বিপক্ষের বিশাল সেনাদলকে যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত দৃষ্ট হইল। কিন্তু মোসলমানগণ ঐ স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না; তাঁহরা সেখান হইতে পাশ কাটিয়া

মূতা নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত প্রশস্ত ময়দান হস্তগত করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল; তদনুসারে তাঁহারা মূতায় উপস্থিত হইলে, কোফ্‌ফার সেনাদল সেই ময়দানের দিকে অগ্রগমন করিয়া মোসলমানদিগের সম্মুখীন হইল। দেখিতে দেখিতে উভয় প্রতিপক্ষ সেনাদলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। উপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত সিরীয় ও রোমক সৈন্যের সংখ্যা এক লক্ষ ছিল, আর মোসলমান যোদ্ধ পুরুষের সংখ্যা ছিল ৩ সহস্র—তেত্রিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই মোস্‌লেম সেনা দলের সঙ্গে মক্কার সুপ্রসিদ্ধ বীর, নব-দীক্ষিত মোসলমান বীরেন্দ্র কেশরী হজরত খালেদ-বিন্‌-অলিদও ছিলেন। মোসলমান হওয়ার পর, স্বীয় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের পক্ষে তাঁহার এই প্রথম সুযোগ ছিল। আবার মোসলমান ও খৃষ্টীয়ান দিগের মধ্যে ইহাই সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান যুদ্ধ। হজরত যয়েদ-বিন্‌-হারেছ (রাজিঃ) যুদ্ধ-পতাকা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক মোসলমান সেনাদলের মধ্যস্থলে—সকলের অগ্রে অগ্রে অগ্রসর হইতেছিলেন। দক্ষিণ বাহুর সেনাপতি পদে কৎবাঃ (রাজিঃ) বিন্‌-কেতাদাহ্‌ আযরী, এবং বাম বাহুর সেনাপতি পদে আবাইয়া (রাজিঃ) বিন্‌-মালেক আন্‌ছারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হজরত যয়েদ-বিন্‌-হারেছ (রাজিঃ) মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে মূল সৈন্যদল হইতে অনেকটা অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সুযোগে শত্রু-সেনাদল তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া, অজস্র ধারায় অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে শহীদ হইলেন। অতঃপর হজরত জাফর-বিন্‌-আবিতালেব (রাজিঃ) দৌড়িয়া অগ্রসর হইলেন, এবং পবিত্র রণ-পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাণিত তরবারি, মুখে শতশত কোফ্‌ফার, ঝড়ে নিপতিত কদলী গাছের ন্যায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হইতে লাগিল।

প্রত্যেক মোসলমান বীরপুরুষ "আল্লাহ আকবর" বলিয়া তক্‌বির ধ্বনি করত কোফ্‌ফারের মুণ্ডপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর মোসলেম সেনাপতির অশ্ব আহত হওয়াতে, তিনি অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদাতি রূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শত্রুদল তাঁহাকেও বেষ্টন করিয়া লইল। শত্রুর তরবারির আঘাতে তাঁহার ডান হাতখানি ছিন্ন হইল; তিনি বাম হাতে রণ-পতাকা ধারণ করিলেন। যখন বাম হাতও কর্ত্তিত হইয়া ভূপতিত হইল, তখন তিনি 'গরদানের' (ঘাড়ের) সঙ্গে পতাকা ঠেকাইয়া বুকের আশ্রয়ে পতাকা খাড়া রাখিলেন। এই অবস্থায়ই তিনি অল্পকাল পরে শহীদ হইয়া গেলেন। তাঁহার শাহাদতের পর হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-রওয়াহাঃ (রাজিঃ) ভূ-পতিত রণ-পতাকা তুলিয়া লইলেন। অল্পকাল মাত্র যুদ্ধ করিয়া ইঁনিও শাহাদতের শরবৎ পান করিলেন। হজরত ছাবেত-বিন্‌-আকরম (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া রণ-পতাকা তুলিয়া লইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন :— "মোসলমান ভ্রাতৃগণ! আমাদের মধ্যে কাহাকেও আমীর (প্রধান সেনাপতি) নির্ব্বাচনে সকলে এক মতাবলম্বী হও।"

মোসলমানগণ চতুর্দ্দিক হইতে 'আওয়ায্‌ বলন্দ' করিলেন (উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন), আমরা তোমাকে নেতৃত্ব প্রদানে রাজী আছি। তচ্ছ্রবণে হজরত ছাবেত-বিন্‌-আকরম (রাজিঃ) বলিয়া উঠিলেন, "আমার দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে না, তোমরা খালেদ-বিন্‌-অলিদ (রাজিঃ)-কে 'ছরদার' (সেনাপতি) বলিয়া মানিয়া লও।" সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দ্দিক হইতে 'আওয়ায্‌' উত্থিত হইল, আমরা খালেদ-বিন্‌-অলিদ (রাজিঃ)-কে প্রধান সেনাপতি বলিয়া গ্রহণ করিতে সর্ব্বতোভাবে রাজী আছি। এই কথা শুনিবামাত্র হজরত খালেদ-বিন্‌-অলিদ (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া, হজরত ছাবেত-বিন্‌-আকরম (রাজিঃ)-এর হস্ত হইতে পবিত্র

পতাকা গ্রহণ পূর্ব্বক, ভীমতেজে শিরীয় ও রোমক সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। হজরত খালেদ-বিন্ অলিদ (রাজিঃ) যুদ্ধ-পতাকা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক, গভীর নিনাদে মোসলমানদিগকে নব বলে—পূর্ণ সাহসে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে "আল্লাহ আক্‌বর" ধ্বনি উত্থিত হইয়া, রণস্থলের সর্ব্বত্র উহা প্রতিধ্বনিত হইল। নব-নির্ব্বাচিত প্রধান সেনাপতি এমন সুশৃঙ্খল ভাবে, ভীষণরূপে বিশাল রোমক সেনাদলকে আক্রমণ করিলেন, যেন ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র ছাগ বা মেষদলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মুণ্ডপাত করিয়া থাকে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধের অবস্থা ফিরিয়া গেল। বিশাল রোমক বাহিনী বিক্ষুব্ধ, বিত্রাসিত এবং ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) স্বীয় ভীত, সন্ত্রস্ত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র সেনাদলকে অত্যল্প কাল মধ্যে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইলেন; এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক বৈদ্যুতিক শক্তি আনয়ন করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দলে উপযুক্ত সেনাপতি সকল নির্ব্বাচিত হইলেন। মোসলমানদিগের দুর্ব্বার পরাক্রমে সিরীয় ও রোমীয় বিশাল সেনাদল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) এমন যোগ্যতার সহিত স্বীয় সেনাদল পরিচালিত করিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষ দলের সৈন্য ও সেনাপতিগণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহাদের জাঁক-জনক পূর্ণ সামরিক পরিচ্ছদে ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্রে কোনও ফলোদয় হইল না। মোস্‌লেম সেনাপতি একবার স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইতেন, আবার নিজের বিভিন্ন দলকে বিভিন্ন দিক্ দিয়া অগ্রসর করিতেন। তিনি বিদ্যুতের ন্যায় সমরাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন। স্বীয় বাহিনীর প্রত্যেক দলের সম্মুখে তিনি বিজলীর ন্যায় আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাদের সাহস ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। প্রত্যেক বিভিন্ন সেনাদল মনে করিতেন, প্রধান সেনাপতি আমাদের

দলেই বিদ্যমান আছেন। শত্রু-সৈন্য অগণিত, অসংখ্য ; সে তুলনায় মোসলমান সৈন্য মুষ্টিমেয় মাত্র। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় সৈন্য ইস্‌লামের পবিত্র শক্তিতে শক্তি-সম্পন্ন। হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) স্বীয় তিন সহস্র সৈন্য লইয়া, একলক্ষ সিরীয় ও রোমক সৈন্যের সঙ্গে অসম সাহসে—বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। বেলা অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিশাল রোমক ও সিরীয় বাহিনী যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। বিজয়ী মোসলমানগণ কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে মাত্র ১২ জন মোসলমান শহীদ হইয়াছিলেন, কিন্তু শত্রুপক্ষের সহস্র সহস্র সৈন্য হত এবং আহত হইয়াছিল। অতঃপর শাহাদৎ প্রাপ্ত মোসলমান বীরপুরুষদিগকে যথানিয়মে সসম্মানে সমাধিস্থ করা হইল। হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ)-এর অসাধারণ বীরত্ব, সামরিক যোগ্যতা ও সেনাপতির উপযুক্ত সর্ব্বপ্রকার গুণ-গ্রাম সম্বন্ধে সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব ও সম্মানের বিষয় ইহাই ছিল যে, স্বয়ং খোদা তায়ালা ও তাঁহার রছুল (ছালঃ)-এর পক্ষ হইতে তিনি 'ছয়েফ-আল্লাহ্' (আল্লাহ্ তা-লার তরবারি)—এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। যখন হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ), স্বীয় বিজয়ী সেনাদল লইয়া মদীনার নিকটে আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনা হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। আর হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ)-কে "সয়ফোল্লাহ্" উপাধী লাভের সুসংবাদ শুনাইলেন। এই সময় এক ছাহাবাঃ (রাজিঃ) স্বপ্নে দেখিলেন যে, হজরত জাফর (রাজিঃ) জন্নতে (মোস্‌লেম-স্বর্গে) দুই বাযু (বাহু বা হস্ত) দ্বারা উড়িতেছেন। সেই দিন হইতে তাঁহার নাম 'জাফর তইয়্যার'

বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মূতার স্বনাম-প্রসিদ্ধ যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর জমাদিয়ল-আউওল মাসে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

মূতায়-যুদ্ধের একমাস পরে মদীনা শরীফে সংবাদ পঁহুছিল যে, শামের সীমান্তস্থিত " কুজায়্যা " নামক সম্প্রদায় মদীনা আক্রমণের জন্য অনেক সৈন্য সমবেত করিয়াছে। আঁ হজরত (ছালঃ) এই সংবাদ শ্রবণে হজরত ওমরু-বিনল্-আছ (রাজিঃ)-এর নেতৃত্বাধীনে ৩০০০ তিন হাজার মোহাজের ও আন্‌ছার সৈন্য তথায় প্রেরণ করিলেন ; তিনি শত্রুদলের নিকটবর্ত্তী হইয়া জানিতে পারিলেন, তাহাদের সংখ্যা অনেক অধিক। তৎক্ষণাৎ তিনি এই সংবাদ লইয়া মদীনায় একজন দূত প্রেরণ করিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত আবু ওবায়দাঃ-বিন্-জার্‌রাহ (রাজিঃ)-এর অধিনায়কতায় একদল যোদ্ধা পূর্ব্বোক্ত গাজীদিগের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। তিনি শাম-সীমান্তে পঁহুছিবামাত্র শত্রু সেনা দলকে আক্রমণ করা হইল। বিপক্ষ দল মোসলমানদিগের সে ভীষণ আক্রমণের গতিরোধ করিতে পারিল না ; তাহারা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভাবে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। মোসলমান বীরপুরুষগণ বিজয়ী বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মদীনার পশ্চিম দিকে, ৫ মঞ্জেল দূরে, লোহিত-সমুদ্র তটের অধিবাসী " জোহনিয়া " সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া মদীনা আক্রমণের জন্য যুদ্ধ-সামগ্রী জমা করিয়াছে ; এই সংবাদ শুনিবামাত্র আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত আবু-ওবেদাঃ-বিন্-জার্‌রাহ (রাজিঃ)-এর নেতৃত্বাধীনে ৩০০ তিন শত মোহাজের ও আন্‌ছার বীরপুরুষকে ঐ বিদ্রোহীদিগের দমন জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এই অভিযানকারী দিগকে শত্রু-দলের সম্মুখীন হইতে বা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয় নাই। শত্রুদল এই অভিযানের সংবাদ পাইয়াই ভয়ে একান্ত জড়সড় হইয়া

পড়িয়াছিল; এবং আপনাদের হুরভিসন্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিল।

অষ্টম হিজরীর শা'বান মাসে মক্কা নগরে একটী নূতন ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। মক্কা নগরস্থ "বনু-খযায়্যা ও "বনু-বকর" নামক দুইটী সম্প্রদায় হোদেবিয়ার "ছোলেহ্ নামা" (সন্ধি-পত্র) অনুযায়ী আপনাদের চিরন্তন শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া, আঁ হজরত (ছালঃ) ও কোরেশদিগের আশ্রিত বা বশীভূত হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তাহাদের একদল, অন্য দলের বিরুদ্ধাচরণ বা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে পারিত না। কিন্তু বনু-বকর সম্প্রদায়ের 'ছরদার' (নেতা বা দলপতি) নওফল-বিন্-মোয়াবিয়া, বনু-খযয়্যা দলের নিকট হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের 'বদলা' (প্রতিশোধ) গ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। ওদিকে হোদেবিয়ার সন্ধি দশ বৎসরের জন্য হইয়াছিল, এরূপ অবস্থায় কোরেশ দল, বনু-বকর সম্প্রদায়কে তাহাদের অন্যায় কার্য্যে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, বরং অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া তাহাদের সাহায্য করিল। কেবল তাহাই নহে, কোরেশদিগের মধ্য হইতে ছফ্ওয়ান-বিন্-ওম্মিয়া, আক্‌রমা-বিন্-আবুজহল, ছহিল-বিন্-ওমরু প্রভৃতি কোরেশ যোদ্ধদল বনু-বকর দলের সঙ্গে, আক্রমণে তাহাদের সঙ্গী হইয়াছিল বনু-বকর, কোরেশ ছরদারদিগের সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়া একদা রাত্রিকালে অকস্মাৎ বনু-খযায়্যা দলকে আক্রমণ পূর্ব্বক নৃশংসভাবে বধ করিতে লাগিল। বনু-খযায়্যা দল রাজনীতে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, বনু-বকর সম্প্রদায়ের এরূপ অতর্কিত নৈশ-আক্রমণের গতিরোধ করিতে অসমর্থ ও নিরূপায় হইয়া তাঁহারা অনেকে পবিত্র কাবা-গৃহে গিয়া আশ্রয় লইল। 'জালেম' (অত্যাচারি) গণ সে অবস্থায় ও তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিল না; সেই পবিত্র গৃহ মধ্যেই অনেককে হত্যা করিল। এই অতর্কিত নৈশ-আক্রমণে বনু খযয়্যার ২০।২৫ জন লোক নৃশংসভাবে নিহত

হয়; তন্মধ্যে কয়েক জন পবিত্র কাবা-গৃহ মধ্যে নিহত হইয়াছিল। বাদিল-বিন্-ওরক্কাও ওমরু-বিন-ছালেম, খবায়্যা সম্প্রদায়ের কতিপয় লোককে সঙ্গে লইয়া অনতিবিলম্বে এই উদ্দেশ্যে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইল যে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে বন্থ-বকর ও কোরেশদিগের এই সন্ধি-ভঙ্গ ও নির্ম্মম অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করিবে। যে রাত্রিতে সন্ধি-পত্রের এইরূপ শোচনীয় অবমাননা করা হইতেছিল, সেই সময় বন্থ-খযায়্যার কতিপয় লোক আঁ হজরতের (ছালঃ)-এর নাম লইয়া ফরিয়াদ (প্রার্থনা বা আবেদন) করিল যে, হে খাতেমুন্নবীয়ীন! আমাদিগকে সাহায্য করুন, আর আমাদের 'ফরিয়াদ' (প্রার্থনা) শ্রবণ করুন—বন্থ-বকর আমাদের প্রতি কি 'জোলম' (অত্যাচার) করিয়াছে। ঐ সময় আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনা তৈয়বায় ওম্মোল-মুমেনিন হজরত মায়মুনাঃ (রাঃ—আঃ)-এর হুজরায় বসিয়া ওজু করিতেছিলেন। বন্থ-খযায়্যার লোকেরা মক্কায় বসিয়া যে 'ফরিয়াদ' করিতেছিল, আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনায় বসিয়া তাহা শুনিতে পাইলেন, এবং উত্তরে "লাব্বায়েক—লাব্বায়েক" শব্দ ফরমাইলেন। হজরত মায়মুনাঃ (রাঃ—আঃ) 'আরজ' করিলেন, হজরত! আপনি কাহার কথার উত্তরে "লাব্বায়েক" বলিতেছেন? উত্তরে আঁ হজরত (ছালঃ) বলিলেন, এ সময় মক্কার বন্থ-খযায়্যা সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের 'ফরিয়াদ' আমার কাণ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে; উহারই উত্তর আমি দিয়াছি। পরদিন সকাল বেলা আঁ হজরত (ছালঃ), ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-কে ফরমাইলেন, গত রাত্রিতে বন্থ-বকর ও কোরেশ দল মিলিয়া বন্থ-খযয়্যাদিগকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছে; ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) বলিলেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন, কোরেশগণ সন্ধি-শর্ত্ত ভঙ্গ করিবে? উত্তরে আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, কোরেশগণ নিশ্চয়ই সন্ধি-শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছে, আর আল্লাহ্ তা-লা

শীঘ্রই উহাদের সম্বন্ধে আদেশ প্রচার করিবেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে বদিল-বিন্ ওরকা ও ওমরু-বিন্-ছালেম খযয়ী প্রমুখ-বনু-খযয়্যার প্রতিনিধিগণ মদীনায় পঁহুছিল; এবং আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হুজুরে কোরেশদিগের সন্ধি-শর্ত্ত ভঙ্গ ও তাহাদের প্রতি যে বনু-বকর দল, কোরেশ-দিগের সঙ্গে মিলিয়া ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছে, তাহা আনুপুর্ব্বিক বর্ণনা করিল।

আঁ হজরত (ছালঃ) বনু-খযায়্যার ঐ সকল প্রতিনিধিকে নানাপ্রকার প্রবোধ, সান্ত্বনা এবং সাহস প্রদান করিলেন, আর ইহাও ফরমাইলেন যে, আমি তোমাদের সাহায্যার্থ অতি শীঘ্রই মক্কায় পঁহুছিব। তাহাদিগের প্রতি যথোচিত রূপ অতিথি-সৎকার করিয়া, তাহাদিগকে মদীনা হইতে মক্কায় রওয়ানা করিয়া দিলেন। ওদিকে মক্কাবাসী কোরেশগণ যখন আপনা-দের অবৈধ, অসঙ্গত ও নির্ম্মম কার্য্য সম্বন্ধে চিন্তা এবং বিবেচনা করিবার অবসর পাইল, তখন তাহারা এই অপকার্য্যের পরিণাম ফল ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও ভীত হইল। অনেক আলোচনা ও বিতর্কের পর তাহারা আপনাদের প্রবীণ দলপতি আবু-ছুফিয়ানকে এই বলিয়া মদীনায় পাঠাইল যে, সে সেখানে গিয়া সন্ধি-পত্রের শর্ত্ত সমূহ যেন নূতন ভাবে কায়েম (স্থির) করে। এদিকে আঁ হজরত (ছালঃ) মোসলমানদিগকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধ-সজ্জার বিষয় গোপন রাখিতেও বলিয়া দিলেন।

আবু-ছুফিয়ান মদীনায় পঁহুছিয়া আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর সঙ্গে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সাক্ষাৎ করিল; এবং সন্ধি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিল; কিন্তু তাহার কথায় কেহই উত্তর দিলেন না, তদ্দর্শনে সে নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িল। অবশেষে হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহু তাহাকে পরিহাস-

চ্ছলে বলিলেন তুমি বনু-কানানার 'ছরদার' (নেতা); অতএব তুমি মসজেদ-নববীতে স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর যে, আমি 'সোলেহ'-এর (সন্ধির 'মেয়াদ' (সময়) বৃদ্ধি করিতেছি, এবং সন্ধি-পত্রের প্রতিশ্রুতি 'মজবুৎ' দৃঢ় করিয়া যাইতেছি। আবু-ছুফিয়ান তদনুযায়ী মসজেদ-নববীতে দাঁড়াইয়া ঠিক্ ঐরূপ ঘোষণা করিল, এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া, সঙ্গে সঙ্গেই মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে প্রস্থান করিল যখন সে মক্কায় পঁহুছিল, এবং সকল ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল; তচ্ছ্রবণে কোরেশগণ তাহাকে খুব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিল। তাহারা ইহাও বলিল, (হজরত) আলী (রাজিঃ) তোমার সঙ্গে পরিহাস করিয়াছে, তুমি তাহা বুঝিতে পারিলে না, সন্ধি-বন্ধন কি কথনও এইরূপে হইয়া থাকে? আবু-ছুফিয়ান স্বীয় কৃত কার্য্যের জন্য বড়ই লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইল।

আবু-ছুফিয়ান মক্কায় প্রস্থান করিলে, আঁ হজরত (ছালঃ), ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ)-দিগকে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এই সময় পর্য্যন্ত ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ জানিতেন না যে, ইস্‌লামী সেনাদল কোন্ দিকে অভিযান করিবেন, এবং কোন্ দেশ বা কোন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করা হইবে। এইরূপ গোপন ভাবে যুদ্ধ-সজ্জা করা সম্বন্ধে, আঁ হজরত (ছালঃ) এর এই উদ্দেশ্য ছিল যে, কোরেশগণ যেন পূর্ব্ব হইতে এই অভিযানের সংবাদ জানিতে না পারে।

৮ম হিজরীর ১১ই রমজানুল-মবারক—আঁ হজরত (ছালঃ) দশ হাজার ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। আবু-ছুফিয়ান বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আইসাতে কোরেশগণ বড়ই 'পেরেশান' (চিন্তাকুল) ছিল। তাহাদের 'জাছুছ'

(গুপ্তচর) গণ, বা তাহাদের পক্ষাবলম্বী জাতি সমুহ ও তাহাদিগকে এই আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে কোনও সংবাদ প্রদান করিয়া ছিল না। আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া দ্রুতগতি মক্কার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি যখন সসৈন্যে " জহফাঃ " নামক স্থানে পঁহুছিলেন, তখন তাঁহার পিতৃব্য আব্বাস-বিন্-আবদুল মোত্তালেব (রাজিঃ) মোসলমান হইয়া, স্বীয় পরিবার বর্গ সহ হেজরত করিয়া মদীনায় যাইতেছেন, দেখিতে পাইলেন। তিনি পিতৃব্যের 'আহ্লে ও আয়াল' (পরিবার বর্গ) কে ত মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন ; কিন্তু হজরত আব্বাস (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। এস্লামী সেনাদল দ্রুতগমনে অগ্রসর হইয়া মক্কার নিকটবর্ত্তী " ওয়াদী-মর্‌রাজ-জহরান " নামক স্থানে (যাহা মক্কা-মোয়াজ্জমা হইতে ৪ ক্রোশ—৮ মাইল মাত্র দূরবর্ত্তী) পঁহুছিলেন। এ পর্য্যন্তও মক্কাবাসিগণ 'বে-খবর' ছিল ; তাহারা ইহাও অবগত ছিল না যে, মোসলমানগণ তাহাদের আহদ-শকনীর' (সন্ধি-শর্ত্ত-ভঙ্গের) জন্য কিরূপ শাস্তি প্রদান করিবেন, এবং তাহাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবেন। বিরাট মোসলমান বাহিনী সন্ধ্যার সময় " মর্‌রাজ-জহরানে' পঁহুছিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। রাত্রিকালে ঐ স্থানের পশুপালকদিগের দ্বারা মক্কায় সংবাদ পঁহুছিল যে, " ওয়াদী মর্‌রাজ-জহরানে " এক বিরাট সৈন্যদল আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে (ডেরা-তাম্বু ফেলিয়াছে)। এই সংবাদ শ্রবণে মক্কার অধিবাসী—বিশেষতঃ কোরেশগণ বড়ই উৎকন্ঠিত ও চিন্তাকুল হইয়া পড়িল ; আর তাহাদিগের নেতা আবু-ছুফিয়ান প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্য নগর হইতে বাহির হইল। ও দিকে আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-কে এক 'দস্তাঃ' (দল) সৈন্যসহ শত্রুগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ জন্য সম্মুখের দিকে (মক্কাভিমুখে) পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, শত্রুপক্ষ যেন 'শবখুন' মারিতে (অতর্কিতভাবে নৈশ-আক্রমণ করিতে) না পারে ।

হজরত আব্বাস (রাজিঃ) এর মন স্বীয় 'কওমের' (স্বজাতি বা স্ব সম্প্রদায়ের) জন্য 'বেচয়েন' (বিশেষ উৎকণ্ঠাযুক্ত) ছিল। তিনি জানিতেন যে, 'ছোবেহ্' সময় (প্রাতঃকালে) যখন বিরাট এস্লামী সেনাদল মক্কা আক্রমণ করিবে, তখন হয় ত কোরেশ জাতি এবং মক্কা নগরের চিহ্নও অবশিষ্ট থাকিবে না। তাঁহার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, 'আহ্লে মক্কা' (মক্কার অধিবাসিগণ) কোনও রূপে মোসলমান হইয়া যায়, এবং উপস্থিত ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা পায়। অগত্যা তিনি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর স্বনামখ্যাত অশ্বতর (খচ্চর) 'দুল্-দুল্' এর উপর আরোহণ করিয়া 'লশ্করগাহ্' (সেনা-নিবাস) হইতে গোপনে বাহির হইলেন, এবং মক্কার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে রাত্রির অন্ধকারে হজরত আব্বাস (রাজিঃ), আবু-ছুফিয়ানকে দেখিতে না পাইলেও, তাহার গলার আওয়াযে তদীয় উপস্থিতি অনুভব করিতে পারিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে 'আওয়ায্' দিলেন (ডাকিলেন); সে নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, সম্মুখে এই যে বিশাল সেনাদলের শিবির শ্রেণী দেখিতেছ, ইহা হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর সৈন্যদল। রাত্রি অবসান হইবামাত্র তাঁহারা মক্কা আক্রমণ করিবেন। এই সংবাদ শ্রবণে আবু-ছুফিয়ানের 'হোশ ও হাওয়াছ' উড়িয়া গেল (বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাইল)। তখন সে হজরত আব্বাস (রাজিঃ)-এর খুব নিকটে আসিয়া বলিল—বল, এখন কোন্ উপায় অবলম্বন করি? হজরত আব্বাস (রাজিঃ) বলিলেন, তুমি আমার পশ্চাদ্ভাগে এই অশ্বতরে আরোহণ কর; আমি তোমাকে হজরত রছুলোল্লার (ছালঃ) খেদমতে লইয়া যাইব। তাঁহার নিকটেই তুমি 'আমান' (শান্তি) পাইবে। আবু-ছুফিয়ান বিনা বাক্য-ব্যয়ে তৎক্ষণাৎ হজরত আব্বাস (রাজিঃ)-এর পশ্চাদ্ভাগে দুল্দুলে আরোহণ করিল; তিনি আবু-ছুফিয়ান:কে স্বীয় অশ্বতরের পশ্চাদ্ভাগে

বসাইয়া, যখন 'এস্‌লামী লশ্‌করগাহের' (মোসলেম-সেনা নিবাসের) দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ঐ সময় পথিমধ্যে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল ; তিনি আবু-ছুফিয়ানকে চিনিতে পারিলেন, এবং তাহাকে 'কতল্‌' (হত্যা) করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু হজরত আব্বাস (রাজিঃ) স্বীয় অশ্বতর অতি দ্রুতগতি এস্‌লামী সেনা-নিবাসের দিকে চালাইয়া দিলেন ; হজরত ওমর (রাজিঃ) 'পায়দল' (পদাতি) ছিলেন, এজন্য দ্রুতগামী অশ্বতর-আরোহী আবু-ছুফিয়ানকে ধরিতে পারিলেন না ; কিন্তু উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। হজরত আব্বাস (রাজিঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে পূর্ব্বেই পঁহুছিয়া গেলেন ; তাঁহার একটু পরে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ও সেখানে পঁহুছিলেন। আবু-ছুফিয়ান ইস্‌লামের ধর্ম্ম গ্রহণে কৃত সঙ্কল্প হইলেন; এবং তদনুসারে তিনি আঁ হজরত (ছালঃ)-কে সম্বোধন করিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রছুলোল্লাহ্‌ (রাজিঃ), এই কাফের (আবু-ছুফিয়ান) বিনা শর্ত্তে আমাদের 'কাবু'তে (হাতে) আসিয়া গিয়াছে ; আপনি অনুমতি প্রদান করুন, আমি এখনই উহার গর্দ্দান উড়াইয়া দি। হজরত আব্বাস (রাজিঃ) বলিলেন, আমি আবু-ছুফিয়ানকে 'আমান' (প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি) দিয়াছি ; এই বিষয় লইয়া হজরত আব্বাছ (রাজিঃ) ও হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হইবার পর, আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আচ্ছা, আবু-ছুফিয়ানকে এক রাত্রির অবসর দেওয়া গেল। আবু-ছুফিয়ানকে অদ্য রাত্রে আপনিই স্বীয় 'খিমায়' (তাম্বুতে) লইয়া গিয়া রাখুন। তদনুসারে হজরত আব্বাছ (রাজিঃ) অবশিষ্ট রাত্রি তাহাকে নিজের খিমায় রাখিলেন, ঐ সময় মধ্যে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইল, তাহার ফলে আবু-ছুফিয়ান ইস্‌লাম ধর্ম্ম-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প

হইলেন, এবং প্রাতঃকালে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'খেদমতে' উপস্থিত হইয়া পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। অতঃপর হজরত আব্বাছ (রাজিঃ) আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে আরজ করিলেন, আবু-ছুফিয়ান একজন 'জা-পছন্দ্‌' (উচ্চ সম্মানিত বা উচ্চপদস্থ) ব্যক্তি, আপনি ইহাকে কোনও 'খাছ এম্‌যত্‌' বখ্‌শুন' (বিশেষ সম্মান দান করুন)। তচ্ছ্‌বণে আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আচ্ছা, যেমন যাহারা 'খানাঃ কাবায়' (পবিত্র কাবা-গৃহে) 'পানা' (আশ্রয়) লইবে, তাহাদিগকে 'আমান' (নিরাপদতা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি) দেওয়া যাইবে; সেইরূপ যাহারা আবু-ছুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকেও আমান দেওয়া হইবে। আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ) ঈদৃশ সম্মান লাভ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। ঐ সময়ই ইস্‌লামী সৈন্যদল সজ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া মহা উল্লাসের সহিত মক্কার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইস্‌লামী সৈন্যদলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (জাতি বা গোষ্ঠীর) ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পতাকা ছিল; আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ) ওয়াদীর প্রবেশ-দ্বারে, এক উচ্চ টিলার উপর দাঁড়াইয়া ইস্‌লামী সেনাদলের অগ্রগমন কালীন আড়ম্বর পূর্ণ অনুপম দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন; পরে সর্ব্ব-প্রথমে মক্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক এই বলিয়া ঘোষণা প্রচার করাইয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি খানা কাবায় কিংবা আমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, সে 'মহ্‌ফুয্‌' (নিরাপদ) থাকিবে।

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এই 'খাহেশ' (বাসনা বা ইচ্ছা) ছিল যে, মক্কায় যেন কোনও ক্রমেই শোণিতপাত না হয়। অন্য এক বিজয়ী সম্রাট বেশে বিশাল সেনাদল লইয়া মক্কা প্রবেশের এই মহা আড়ম্বর পূর্ণ ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হওয়াতে, তিনি পুনঃ পুনঃ আল্লাহ্‌ তা-লার মহাদরবারে 'শোকরিয়া আদায়' (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করিতে লাগিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) বিনা বাধায়—মহা জাঁক-জমকে পবিত্র মক্কা নগরে

প্রবেশ পূর্ব্বক খানাঃ কাবার দিকে 'তশরিফ্' লইয়া গেলেন। 'ছওয়ারির' (আরোহিত উষ্ট্রের) উপর থাকিয়া সপ্তবার পবিত্র কাবা-গৃহের 'তওয়াফ্' (প্রদক্ষিণ) করিলেন। ঐ পবিত্র গৃহে যতগুলি 'বোত' (দেব-প্রতিমা) ছিল, সেগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়াইলেন। পরে ওস্মান-বিন্-তাল্‌হার নিকট হইতে 'কা-বা' গৃহের 'কুঞ্জি' (চাবি) গ্রহণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং চাশ্‌তের নামাজ (প্রহরেক বেলার সময় এক বিশেষ উপাসনা) পড়িলেন। পরে কাবা-গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া ওজস্বিনী ভাষায় একটী সুমধুর বক্তৃতা প্রদান করিলেন; তাঁহার ঐ খোত্‌বার (বক্তৃতার) কতক উক্তি এইরূপ ছিল; যথা :—

"আল্লাহ্ এক, যাঁহার কোনও শরীক (অংশী) নাই; তিনি নিজের 'ওয়াদা' (প্রতিশ্রুতি) সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি নিজের 'বান্দাঃ' (দাস)-এর 'মদদ' (সাহায্য) করিয়াছেন; আর সমস্ত বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়কে 'শেকস্ত দিয়াছেন (পরাজিত করিয়াছেন)। যে সকল লোক খোদা ও রছুলের উপর ইমান আনিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহারও পক্ষে 'জায়েয্' (সিদ্ধ) নহে যে, মক্কা নগরে 'খুনরেযি' (শোণিতপাত) করে। কোনও 'ছব্‌ছ-বয্ দরখত্' (সবুজ পত্র, বিশিষ্ট সজীব বৃক্ষ) কাটাও এখানে সিদ্ধ নহে। আমি 'যমানাঃ জাহেলিয়াতের (অন্ধকার যুগের বা অসভ্যতা-মূলক প্রাচীন কালের) সমুদয় 'রছম' (ক্রিয়া-কলাপ) পদতলে মর্দ্দিত করিয়াছি, কিন্তু কাবার 'যেয়ারত' ও হাজী দিগকে 'আবে-যম্-যম্' (যম্‌যম্ নামক পবিত্র কূপের পানী) পান করাইবার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা হইলে। হে কোরেশগণ! তোমাদিগকে আল্লাহ্ তা'লা 'জাহেলিয়ত' (অসভ্যতা বা বর্ব্বরতা) এর প্রতি অহঙ্কার প্রকাশ ও 'ফখর' (গর্ব্বানুভব) করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সমুদয় মনুষ্য আদম (আলাঃ) হইতে, এবং আদম (আলাঃ) মাটী হইতে 'পয়দা' হইয়াছেন (জন্মিয়াছেন)। খোদা তা-লা

ফরমাইয়াছেন :—ইয়া আইয়োহান্নাছো আনা খালাক না কম – (আয়াত শেষ পর্য্যন্ত)। তৎপর আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন :—" হে কোরেশ গণ! তোমরা কি অবগত আছ, আমি তোমাদের সঙ্গে কিরূপ 'ছলুক' (ব্যবহার) করিব ? "

এই প্রশ্ন-বোধক পবিত্র উক্তি শুনিয়া কোরেশ—অর্থাৎ মক্কার অধিবাসিগণ বলিয়া উঠিল, " আমরা আপনার নিকট ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার পাইতে আশা করি ; কেন না, আপনি আমাদের 'বোযর্গ' (সম্মানিত) ও ভক্তি-ভাজন ভ্রাতা এবং 'বোযর্গ' ভ্রাতার পুত্র।" তচ্ছ্রবণে আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন :—

'আচ্ছা, আমিও আজ তোমাদিগকে ঐ কথাই বলিতেছি,—যাহা হজরত ইউছফ (আলাঃ) স্বীয় ভ্রাতাদিগকে বলিয়াছিলেন :—" আজ তোমাদের উপর কোনও 'মালামত' (নিগ্রহ বা নিগ্রহ-সূচক বাক্য) নাই, তোমরা সকলেই 'আযাদ' (সম্পূর্ণ স্বাধীন)। "

এই বক্তৃতা প্রদানের পর আঁ হজরত (ছালঃ) 'কোহ্-ছফাঃ' (ছফাঃ পাহাড়)-এর উপর গিয়া বসিলেন। আর লোকদিগের নিকট হইতে খোদা ও রছুলের 'য়েতায়াত' (আদেশ পালন—অধীনতা স্বীকার) সম্বন্ধে 'বয়্য়ত্' লইতে লাগিলেন। পুরুষদিগের নিকট হইতে বয়্য়ত্ গ্রহণের পর, তিনি হজরত ওমর (রাজিঃ)-কে স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে বয়্য়ত্ গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন ; আর স্বয়ং উহাদিগের জন্য 'আস্তাগ্ফার' (খোদার দরগায় ক্ষমা প্রার্থনা) করিতে লাগিলেন।

পবিত্র কাবা-গৃহের 'বোত' (প্রতিমা—পুতুল) গুলি চূর্ণীকৃত হওয়াতে, সমগ্র আরবের প্রতিমা (মূর্ত্তি) গুলিই যেন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গেল। এইরূপে মক্কার কোরেশদিগের পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া যেন সমগ্র আরব জাতিরই ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া ছিল। কারণ, মক্কার

পবিত্র কাবা-গৃহ প্রধান 'বোতখানায়' (পৌত্তলিক মন্দিরে) পরিণত হইয়াছিল। আর হজরত ইস্‌মাইল (আলাঃ)-এর বংশধর বলিয়া আরব দেশের মধ্যে কোরেশদিগের একটা বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং সমগ্র আরব জাতি কোরেশদিগের মতিগতির প্রতি—তাহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। তাহারা কোন ধর্ম্মানুশাসনের অধীন হয়, তাহাই সকলে অভিনিবেশ সহকারে দেখিতেছিল। মক্কা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বহুসংখ্যক কোরেশ মোসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও বহু মক্কাবাসী 'বোত-পরস্ত' (প্রতিমাপূজক) রহিয়া গিয়াছিল। অবশ্য এক্ষণে মক্কায় অশান্তি-উপদ্রবের আশঙ্কা আর ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে আপাততঃ মক্কাবাসীদিগের 'মযহবি-আযাদি' (ধর্ম্ম-বিষয়ে স্বাধীনতা) লাভ হইল। এই ধর্ম্ম-বিষয়ক 'আযাদী' (স্বাধীনতা) প্রভাবে 'বোত্-পরস্ত্' (অংশীবাদী—পৌত্তলিক)-দিগের, ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিবার এবং উহার গূঢ়তত্ত্ব ও প্রকাশ্য সৌন্দর্য্য বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা ঘটিল। তদনুসারে অল্প দিনের মধ্যেই পৌত্তলিকগণ দলে দলে ইস্‌লামের পবিত্র শীতলচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এমন কি, অতি অল্প দিনের মধ্যেই মক্কার সমুদয় অধিবাসী (নানা-সম্প্রদায় ও নানা বংশীয়) পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন; তথায় পৌত্তলিকের অস্তিত্ব একেবারেই রহিল না।

মক্কা-বিজয়ের কার্য্য হইতে অবসর লাভ করিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যাহারা মোসলমান (ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত) হইয়াছে, তাহারা স্ব স্ব গৃহে কোনও 'বোত' (দেব-প্রতিমা) রাখিতে পারিবে না। অতঃপর তিনি মক্কার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বিখ্যাত দেব-মন্দির গুলি ধ্বংস করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন।

হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ)-কে ৩০০০ তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ বনু-কানানার উপাস্য দেবতা 'আয্‌বনী' কে ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। উহার মন্দির মরুভূমির মধ্যস্থ এক 'নখলস্তানে' (ওয়েশিশ্‌ বা মরুস্থানে) অবস্থিত ছিল। হুজুর (ছালঃ)-এর আদেশানুসারে হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) সসৈন্যে ঐ স্থানে গিয়া উক্ত দেবতা এবং দেব-মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেন। মন্দিরটীকে ভাঙ্গিয়া একেবারে সমভূমি করিয়া ফেলিলেন; উহার কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট রহিল না। হজরত ওমরু-বিনল্-আছ (রাজিঃ) কে বনি হযিলের উপাস্য দেবতা ছওয়াঃ এর প্রতিমা ও মন্দির ধ্বংস করিবার জন্য পাঠাইলেন, তিনি উক্ত মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক উক্ত উপাস্য বিগ্রহ (দেবমূর্ত্তি) টীকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উহার পূজারীও পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। হজরত ছায়াদ-বিন্-যয়েদ আষ্‌হলি (রাজিঃ), " মনাত " নামক প্রসিদ্ধ 'বোত' (দেব-বিগ্রহ) চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য " কদিদ " নামক স্থানে প্রেরিত হইলেন, তিনি তথায় পঁহুছিয়াই দেব বিগ্রহ ও দেব মন্দির ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে আরও বহুতর 'বোতখানা' (দেব-মন্দির) চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধূলিসাৎ করিয়া উহার অস্তিত্ব একেবারে মুছিয়া ফেলা হইল। মক্কার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের দেবমূর্ত্তি ও দেব মন্দির গুলি ধ্বংস করিবার পর, আঁ হজরত (ছালঃ) কতিপয় জাতির মধ্যে ইস্‌লাম প্রচারের জন্য 'ওফুদ' (প্রচারক-প্রতিনিধি) প্রেরণ করিলেন। হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) 'বনু-খযিমাঃ' সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হইলেন। সেখানে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

মক্কা-বিজয়ের পর আঁ হজরত (ছালঃ), ১৫ দিবস পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থিতি করিলেন।

হনিন বা হোনায়নের ভীষণ যুদ্ধ।

মক্কা-বিজয় এবং মক্কার অধিকাংশ কোরেশ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন শুনিয়া, আরবের ঐ সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে একটা 'খল্‌বলি' (হুলস্থুল) পড়িয়া গেল—যাহারা ইতিপূর্ব্বে মোসলমানদিগের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল না—বরং তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাব পোষণ করিত। উহাদের মধ্যে 'হওয়াযন' ও 'ছকিফ্‌' সম্প্রদায়ের লোক—যাহারা মক্কা ও তায়েফের মধ্যে বাস করিত, বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা না কোরেশদিগের প্রতি অনুরক্ত, না মোসলমানদিগের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল। ইহারা কতকটা নিরপেক্ষভাবেই এযাবৎ কাল কাটাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদিগকে কিয়ৎ-পরিমাণে কোরেশদিগেরই পক্ষপাতী বলিয়া মনে করা হইত। মক্কা-বিজয়ের পর তাহারা মনে করিত, এইবার মোসলমানগণ আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। তদনুসারে বনু-হওয়াযনের 'ছরদার' (নেতা) মালেক-বিন্‌-য়্যোফ্‌, বনি-হওয়াযন ও বনি ছকিফ্‌ এবং সমগ্র জাতি অর্থাৎ ঐ উভয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখাকে যুদ্ধের জন্য 'আমাদাঃ' (আগ্রহান্বিত) করিয়া, স্বীয় পতাকা-মূলে সমবেত করিল। নছর, জছম, ছায়াদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরাও উপরোক্ত দলে যোগদান করিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিল। এই বিরাট বাহিনী "আওতাপ" নামক স্থানে সমবেত হইল। আঁ হজরত (ছালঃ) যখন মক্কায় থাকিয়া এই বিরাট শত্রু-বাহিনীর একত্র সমবেত হইবার সংবাদ পাইলেন, তখন আবদুল্লা-বিন্‌-আবি হদরু আছলমীকে 'জাছুছ' (গুপ্তচর) রূপে এই বিষয়ের সঠিক সংবাদ আনয়ন জন্য প্রেরণ করিলেন ; তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, শত্রুদল যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণভাবে সজ্জিত ও প্রস্তুত হইয়া

আছে। তচ্ছ্রবণে হুজুর (ছালঃ) ছাহাবাঃ রাজিঃ) দিগকে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ-সজ্জার আদেশ দিলেন ; ১০ হাজার মহাজেরিন ও আন্ছার (রাজিঃ) তাঁহার সঙ্গে মদীনা হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এবং ২ হাজার ইস্লাম ধর্ম্মে নব-দীক্ষিত মক্কাবাসী মোসলমান সেই সঙ্গে যোগদান করাতে, মোসলমান যোদ্ধপুরুষদিগের সংখ্যা ১২ হাজার হইল। এই বিরাট 'জানবায্' (জীবনোৎসর্গকারী) সেনাদল লইয়া তিনি মহাড়ম্বরে মক্কা হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু শেষোক্ত দুই সহস্র সৈন্যের মধ্যে এমন লোকও অনেক ছিল, যাহারা পৌত্তলিকতার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়াছিল না। ৮ম হিজরীর ১লা শওয়াল তারিখে এই বিরাট মোস্লেম-বাহিনী থামার " ওয়াদী " (বনভূমি বা ময়দান) সমূহ অতিক্রম পূর্ব্বক, 'ওয়াদী হনিন' বা "হোনায়নে' পঁহুছিলেন। শত্রুগণ মোসলমান বাহিনীর যাত্রা করিবার সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়া, ওয়াদী হোনায়নের উত্তর দিকে একটী 'ঘাতের' জায়গায় (সুবিধাজনক স্থানে) গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে ছিল ; মোসলমান বাহিনী ঐ স্থানে পঁহুছিলে, তাহারা নৈশ-অন্ধকারের সুযোগ লাভ করিয়া হঠাৎ ঐ গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদিগকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিল ; অকস্মাৎ এইরূপ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া মোস্লেম সেনাদল বিষম বিপন্ন ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সুতরাং এই নৈশ-আক্রমণ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল। অন্ধকার রজনীতে অপ্রস্তুত মোসলমানগণ চতুর্দ্দিকে ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া পড়িলেন। এই যুদ্ধে আঁ হজরত (ছালঃ) যে অপূর্ব্ব সামরিক নৈপুণ্য, অসাধারণ সাহস ও অমানুষিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা এক অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার। যাহা হউক, পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার দয়া ও অনুগ্রহে মোসলমানগণ অবশেষে মহা গৌরবজনক বিজয়-লাভ করিলেন।

হওয়াযনের যুদ্ধক্ষেত্রে বহু শত্রু-সৈন্যের নিপাত সাধন হইয়াছিল। উহারা (হওয়াযন সম্প্রদায়) ত প্রথমেই পরাজিত হইয়া পলায়ন-পর হইয়াছিল, সকিফ্ সম্প্রদায়ের যোদ্ধপুরুষগণ আরও কিছুকাল যুদ্ধক্ষেত্রে তিষ্ঠিয়া যুদ্ধ চালাইয়াছিল; কিন্তু অবশেষে উহারাও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্ব্বক পলায়ন করিল। এই ভীষণ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বড় বড় ছরদার এবং খ্যাতনামা বীরপুরুষগণ সমরশায়ী হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রধান সেনাপতি মালেক-বিন্-য়য়োফ, কতিপয় যোদ্ধপুরুষ সহ তায়েফ্ অভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। তায়েফ্বাসিগণ এই পলায়িত লোকদিগকে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক নগরের প্রবেশ-দ্বার (ফটক) বন্ধ করিয়া দিল। এই পলায়মানও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সেনাদলের একাংশ "আওতাস" নামক স্থানে, এবং আর এক দল " নখ্লাঃ " এজ মা (সমবেত) হইল। আঁ হজরত (ছালঃ) ঐ দুইস্থানে বিভিন্ন সেনাদল প্রেরণ করিলেন, ভীষণ যুদ্ধের পর উভয় স্থানে মোসলমানগণ জয় ও শত্রুদল সম্পূর্ণরূপে 'শেকস্ত্' (পরাজিত) হইল; বহুসংখ্যক শত্রু রণক্ষেত্রে পতিত ও হতাবশিষ্টগণ অতি শোচনীয় ভাবে—উর্দ্ধেশ্বাসে পলায়ন করিল। তাহাদের বিপুল সমগ্রী-সম্ভার হস্তগত করিয়া মোসলমানগণ বিজয়োল্লাসে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই যুদ্ধে বহুতর শত্রু মোসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) 'মালে-গনিমৎ' (যুদ্ধ-জয়লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার) ও বন্দীদিগকে 'জয়র আতা' নামক, স্থানে হজরত মসঊদ-বিন্-ওমরু-গফ্ফারি (রাজিঃ)-এর তত্বাবধানে রাখিয়া, একদল যোদ্ধপুরুষ উহাদের প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন; এবং হুজুর (ছালঃ) স্বয়ং বিপুল সৈন্যদল লইয়া তায়েফ্ অভিমুখে অভিযান করিলেন। এই যুদ্ধে ৪৪ হাজার উষ্ট্র এবং তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছাগল ও মেষ (দোম্বা) মোসলমানদিগের হস্তগত হইয়া-ছিল। এই যুদ্ধ " হোনায়নের যুদ্ধ " নামে প্রসিদ্ধ।

তায়েফ্ অবরোধ।

ছকিফ্ সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকেরা পলায়ন পূর্ব্বক তায়েফে গিয়া সমবেত হয়; তায়েফ বাসিগণ তাহাদের প্রতি হামদর্দ্দ্ (সহানুভূতি সম্পন্ন) ছিল; এজন্য তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে ও সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) ওয়াদি-হনিন হইতে তায়েফে যাইবার পথে মালেক-বিন্-য়য়োফের 'কেল্লা' (দুর্গ) টী একেবারে ভূমিসাৎ ও বিধ্বস্ত করাইলেন। পরে বিপ্লববাদীদিগের 'আতম' নামক কেল্লাটী পথে পড়িলে উহাও ধ্বংস করাইয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি তায়েফের নিকট পঁহুছিয়া তায়েফ্ বাসিদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে তিনি তায়েফ্ নগর দৃঢ়ভাবে অবরোধ করিলেন; ২০ দিন পর্য্যন্ত এই অবরোধ কার্য্য চলিয়াছিল; এই সময় মধ্যে তায়েফের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বহু সম্প্রদায়ের লোক দলে দলে আসিয়া পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন; আর কোনও কোনও সম্প্রদায় 'ওফুদ' (প্রতিনিধি বা ডেলিগেট্) পাঠাইয়া মোসলমান হইলেন। হনিনের ভীষণ যুদ্ধে মাত্র ৪ জন মোসলমান শহীদ হইয়াছিলেন; কিন্তু তায়েফের অবরোধ কালীন যুদ্ধে ১২ জন মোসলমান শহীদ হন। নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগে তাঁহাদিগকে কবরস্থ করা হয়। তায়েফের অবরোধ কার্য্যে বড় সুফল ফলিয়াছিল; ঐ অবরোধ কাল মধ্যেই উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বহুজনপদের বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ অধিবাসিগণ, অতীব আগ্রহের সহিত পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) আপাততঃ তায়েফ্ জয় করা তত প্রয়োজনীয় মনে করিলেন না, উহা ভবিষ্যতের জন্য 'মুলতবি' (স্থগিত) রাখিয়া, অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক " হজর আনায় " প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং তথায় বন্দী ও যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার মোসলমানদিগের মধ্যে যথাযোগ্য

ভাবে ভাগ-বণ্টন করিয়া দিলেন। ঐ স্থানে হওয়াযন সম্প্রদায়ের একদল প্রতিনিধি আঁ হজরত:(ছালঃ)-এর খেদমতে 'হাজের' (উপস্থিত) হইল ; এবং তাঁহার ধাত্রী হালিমা ছায়া-দিয়ার 'ওয়াস্তাঃ' (সম্বন্ধ) প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষমার জন্য 'দরখাস্ত' (আবেদন) করিল ; তিনি উহাদিগকে বলিলেন, তোমরা জোহরের নমাজের সময়—যখন সমুদয় মোসলমান নমাজের জন্য সমবেত হইবে—আমার নিকট দরখাস্ত 'পেশ' করিও ; তদনুসারে প্রতিনিধিগণ তাহাই করিল। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, তোমাদের যে পরিমাণ কয়েদী আমার এবং বনু-আবদুল মোত্তালেবের অংশে পড়িয়াছে ; তাহাদিগকে 'আযাদ' (স্বাধীন—মুক্ত) বলিয়া মনে কর। তচ্ছ্রবণে সমুদয় মহাজোরন ও আন্‌ছার (রাজিঃ)-গণ বলিয়া উঠিলেন, " যাহা আমাদের অংশ, উহা রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর ও অংশ। " এই কথা বলিয়া তাঁহারা হওয়াযন সম্প্রদায়ের সমুদয় কয়েদীকেই ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপে প্রায় ৬০০০ 'কয়েদী' এই অল্প সময় মধ্যে মুক্তি লাভ করিল। এই বন্দীদিগের মধ্যে শিমা-বিন্তে হালিমা ছায়া দিয়া :—আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'রেজায়ী হামশিরাঃ (দুগ্ধ-ভগিনী) ও ছিলেন। ঐ মহিলা যখন বলিলেন, আমি আপনার দুগ্ধ-ভগিনী ; তখন হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন ; তোমার নিকট ইহার কি 'ছবুত' (প্রমাণ) আছে ? শিমাঃ বলিলেন, আমার কোমরে আপনার দাঁতের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে ; আপনি বাল্যকালে একদা আমাকে দাঁত দিয়া কাটিয়া ছিলেন। ইহা শুনিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) বলিলেন, তুমি একথা ঠিকই বলিতেছ। ইহা বলিয়া তিনি নিজের চাদর বিছাইয়া দিয়া, তদুপরি তাঁহাকে বসাইলেন। তৎপর তিনি বলিলেন, তুমি যদি আমার নিকট থাকিতে চাও, তবে আমি তোমাকে 'য়েয্‌যতের' (সম্মানের) সঙ্গে—স্নেহ ও সহানুভূতির সহিত আমার কাছে রাখিব ; আর যদি স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট যাইতে

চাও, তবে তাহা তোমার ইচ্ছা। শিমা শেষোক্ত প্রস্তাবই 'পছন্দ' করিলেন—নিজের দেশে, স্বজাতির মধ্যেই থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে বহু অর্থ, পরিচর্য্যার জন্য একটী দাস এবং একটী দাসী দিয়া বিদায় করিলেন। শিমাঃ ঐ দাস-দাসীর পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন করিয়া দিলেন। শুনা যায়, উহাদের দ্বারা তাঁহার 'নছল' এখনও হওয়াযন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

আঁ হজরতের (ছালঃ)-এর মক্কা হইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন।

অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) হজরআনা হইতে মক্কার য়োমরার নিয়েত করিলেন, এবং তিনি সদলবলে-মক্কায় পঁহুছিলেন। মক্কায় 'দাখেল' হইয়া (প্রবেশ করিয়া) য়োমরার আরকান হইতে 'ফারেগ' হইলেন (অবসর লাভ করিলেন)। তৎপর য়েতাব-বিন্-আছিদ (রাজিঃ) নামক বিংশতি বৎসর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক এক তরুণ যুবক কে মক্কার 'আমেল' (শাসনকর্ত্তা) নিযুক্ত করিলেন। আর হজরত মায়ায্-বিন্-জবল (রাজিঃ)-কে কোরআন শিক্ষা এবং আহ্কামে দীন (ধর্ম্ম-বিষয়ক আদেশ)—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দানাদি কার্য্যের জন্য শাসনকর্ত্তার নিকটে থাকিতে আদেশ করিলেন। হজরত মায়ায্-বিন্-জবল (রাজিঃ) একজন বিখ্যাত আলেম এবং ইস্লাম ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত ছিলেন। অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) মহাজেরিন (রাজিঃ) ও আন্ছার (রাজিঃ) দিগকে সঙ্গে লইয়া মক্কা হইতে মদীনায় রওয়ানা হইলেন। মক্কার নব নিযুক্ত

শাসনকর্ত্তা য়েত্তাব-বিন্-আছিদ (রাজিঃ)-এর জন্য দৈনিক এক দরম 'ওজিফাঃ' (বৃত্তি বা বেতন) নির্দ্ধারিত করিলেন। ৮ম হিজরীর ২৪শে জেকদ তারিখে আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় প্রিয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগকে সঙ্গে লইয়া মদীনা-মনুওরায় প্রবেশ করিলেন। এই বৎসর মোসলমানগণ এস্‌লামী নিয়মে ও পৌত্তলিকগণ আপনাদের নিয়মানুযায়ী হজ্ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ছিলেন; ইহাতে না মোসলমানগণ পৌত্তলিকদিগকে কিছু বলিয়াছিলেন, না পৌত্তলিকগণ মোসলমানগণ দিগের কার্য্যে কোনও রূপ বাদ-প্রতিবাদ করিয়াছিল। এই 'মিল-জুলে' (মেলা-মেশায়) এই সুফল ফলিল যে, মক্কার পৌত্তলিকদিগের পক্ষে, মোসলমানদিগের আদর্শ ধর্ম্মানুষ্ঠান, আদর্শ কার্য্য-কলাপ ও উৎকৃষ্ট 'আখ্‌লাক্' (সুনীতি-পরায়ণতা বা শিষ্টতা) সম্বন্ধে সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়ার বিশেষ সুযোগ ঘটিল; ইহার ফলে পৌত্তলিকগণের মুখে মোসলমানদিগের প্রশংসাবাদ বিঘোষিত হইতে লাগিল।

৮ম হিজরীর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, আঁ হজরত (ছালঃ) যখন মক্কা হইতে মদীনায় রওয়ানা হইলেন, তখন তায়েফের য়রূহ-বিন্-মছউদ নামক একজন ছরদার পথিমধ্যে তাঁহার নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ঘটনার বিবরণ এই যে, যখন আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নেতৃত্বে মোসলমানগণ তায়েফ্ অবরোধ করেন, তখন য়রূহ-বিন্-মছউদ তথায় উপস্থিত ছিলেন না, কোনও কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিলেন; আর অবরোধ পরিত্যাগের পর তায়েফে আসিয়া সকল ব্যাপার অবগত হইয়াছিলেন। তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, আঁ হজরত (ছালঃ) সদলবলে মক্কা হইতে মদীনাভিমুখে যাইতেছেন; তখন তিনি তায়েফ্ হইতে দ্রুতগতি মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। তদনুসারে পথিমধ্যে আঁ হজরত (ছালঃ)-কে পাইয়া ভক্তি-প্রবণ হৃদয়ে তাঁহার হস্তে পবিত্র

ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরজ করিলেন, আমাকে 'এজাযত' (অনুমতি) প্রদান করুন, আমি তায়েফে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ইস্‌লাম প্রচার করি। আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহার জীবন নাশের আশঙ্কায় প্রথমে এ প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিলেন না; পরে তাঁহার ঐকান্তিক অনুরোধে, তাঁহাকে তায়েফে ইস্‌লাম-প্রচারের অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুসারে তিনি তায়েফে পঁহুছিয়া, এক উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, তায়েফ বাসিদিগকে ইস্‌লামের দিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। দুর্দ্দান্ত তায়েফ বাসিগণ তাঁহার এই কথা শুনিয়াই ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। এই তীর বর্ষণে জর্জ্জরিত হইয়া তিনি সেই স্থানেই শহীদ হইলেন। মুমূর্ষ অবস্থায় তিনি তাঁহার স্ববংশীয় লোকদিগকে বলিলেন, আমার এই একমাত্র কামনা যে, আমাকে হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর ঐ 'রফিক' (বন্ধু) দিগের কবরের নিকট দফন করিবে, যাঁহারা তায়েফ্ অবরোধ কালে এখানে শহীদ হইয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহার অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করা হইল। আঁ হজরত (ছালঃ) যখন য়রুহ-বিন্-মসঊদ (রাজিঃ)-এর শাহাদত-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি ফরমাইলেন, য়রুহ আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐরূপই ছিল,— যেমন 'ছাহেবে ইয়াছিন' আপনার 'কওমের' (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর) মধ্যে ছিলেন।

এই বৎসরেই হুজুর (ছালঃ)-এর ছাহেবযাদাঃ এব্রাহিম জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ওম্মোল মুমেনিন (বিশ্বাসীদিগের মাতা বা মোস্‌লেম-মাতা) হজরত মারিয়াঃ কতবাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। আবার এই বৎসরেই হুজুর (ছালঃ)-এর ছাহেবযাদী হজরত যয়নব (রাঃ—আঃ) পরলোক গমন করেন। এই বৎসরের শেষভাগে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর জন্য মছজেদে ব্যবহারার্থ কাষ্ঠ নির্ম্মিত 'মিম্বর'

তৈয়ার করা হয়—যাহার উপর বসিয়া তিনি খোত্‌বাঃ 'এরশাদ ফরমাই-তেন'। এই বৎসরেই বাহ্‌রায়েনের শাসনকর্ত্তা মনযর-বিন্ ছারী পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে ইস্‌লামের দিকে আহ্বান পূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিয়া ছিলেন; পত্রখানি পাইয়াই তিনি ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। হুজুর (ছালঃ) এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকট একখানি অনুজ্ঞাপত্র পাঠাইলেন, তদনুসারে ঐ শাসনকর্ত্তা য়িহুদী ও আতশ-পরস্ত্' (অগ্ন্যুপাসক) দিগের নিকট হইতে 'জজিয়া' নামক কর আদায় করিতে লাগিলেন।

হেজরতের নবম বৎসর।

মক্কা-বিজয় ও হনিনের যুদ্ধের পর যখন আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনা-মনওরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন আরবের বিভিন্ন প্রদেশের লোক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া দলে দলে মদীনায় আসিয়া পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। ৯ম হিজরী আরম্ভ হইবামাত্র বিশাল আরব দেশস্থ বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্ন জনপদ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাদের নির্ব্বাচিত উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্ব্বক, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করিতে লাগিলেন; এবং 'দায়েরায়-এছলামে' (এছলাম ধর্ম্মের গণ্ডী বা আবেষ্টনীর মধ্যে) 'দাখেল' হইতে লাগিলেন। এই জন্য এই পবিত্র ৯ম হিজরী 'আম-আল্-ওফুদ' নামে অভিহিত হইয়াছিল; এবং এখনও ঐ নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এই সময় পর্য্যন্ত যাহারা ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল না, তাহাদের নিকট হইতে অতি অল্পমাত্রায় 'জজিয়াঃ' নামক কর আদায় করা হইত। এই "জজিয়া" ও "যাকাত" ই 'খেরাজ' (খাজানা বা রাজকর) ছিল—যাহা আঁ হজরত (ছালঃ)-এর

শাহান্ শাহীতে জন-সাধারণের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইত। যাকাত আদায় করিবার জন্য আঁ হজরত (ছালঃ) বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 'আমেল' (শাসনকর্ত্তা) নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম যাকাত আদায়ের পক্ষে নানাপ্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতা জন্মিয়াছিল। কোনও কোনও আমেল—(যাকাত আদায়কারী শাসনকর্ত্তা, দেশবাসী কর্ত্তৃক শহীদও হইয়াছিলেন। নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্নের পর, অবশেষে আরবের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইল।

মুতাযুদ্ধে পরাজয়-জনিত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য শামের ঈসায়ী বাদশাহ (খৃষ্টীয়ান শাসনকর্ত্তা) বিরাট সেনাদল গঠন করিয়া, কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ গ্রীক্ সম্রাট্ হরকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল। তদনুসারে সম্রাট্ হরকল (হিরাক্লিয়স্) ৪০ সহস্র সুশিক্ষিত ও বিক্রান্ত সৈন্য শামের (সিরিয়া বা সুরিয়ার) শাসনকর্ত্তার সাহায্যার্থ পাঠাইলেন। আর নিজেও এক বিরাট বাহিনী লইয়া প্রেরিত সেনাদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রওয়ানা হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আবু-আমের নামক যে খৃষ্টীয়ান 'রাহেবের (সন্ন্যাসীর) কথা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সে মোসলমানদিগকে সমূলে উৎসন্ন দিবার সঙ্কল্পে, রুমের কায়সরের নিকট কনষ্টাণ্টিনোপলে গমন করিয়াছিল। সে এই উদ্দেশ্যে তথায় গিয়াছিল যে, কায়সারকে উত্তেজিত করিয়া তাহার দ্বারা মদীনা আক্রমণ করাইবে, এবং ইস্লাম ধর্ম্ম ও মোসলমান জাতির 'বনিয়াদ' (ভিত্তি-মূল) পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া ফেলিবে। ওদিকে মদীনার মোনাফেকদিগের সঙ্গে তাহার গুপ্ত ষড়যন্ত্র-মূলক পত্র ব্যবহার এবং গুপ্তচর আইসা যাওয়া চলিতেছিল। স্থূলকথা, শাম-সীমান্তে ঈসায়ী (খৃষ্টীয়ান) সৈন্যদলের সমবেত হওয়া, ও কায়সরের মদীনা আক্রমণের জন্য আগমনের 'গরমা-গরম' সংবাদ অনবরত পঁহুছিতে লাগিল। আঁ হজরত (ছালঃ) ব্যাপারের

গুরুত্ব বুঝিয়া এই খৃষ্টীয়ানী আক্রমণ শামের (সিরিয়ার) সীমায়ই রোধ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। কারণ, গ্রীক সম্রাট্ হরকলের বিরাট ঈসায়ী বাহিনী আরবের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলে, সমগ্র আরবে এক 'বদ-আমনির' (অশান্তির) সৃষ্টি হইবে; বিশেষতঃ আরবের সীমান্ত-প্রদেশে এক বিরাট শত্রু সৈন্যদলের সমাবেশ এমন একটী 'মামুলী' (সাধারণ) ব্যাপার ছিল না যে, আঁ হজরত (ছালঃ) এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় চুপ করিয়া থাকিতে পারেন। তিনি সকল সম্প্রদায়ের আরব দিগের মধ্যে সাধারণ ভাবে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, কায়সারের আক্রমণের গতিরোধ জন্য সকলে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মদীনায় উপস্থিত এবং আমার পতাকা-মূলে সমবেত হও। ঘোষণা প্রচারিত হওয়ামাত্র মোসলমানগণ চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে আসিয়া মদীনায় সমবেত হইতে লাগিলেন। মোনাফেকদিগের যে দলটী মদীনায় 'মওজুদ' (বিদ্যমান) ছিল, উহারা সর্ব্বদাই মোসলমানদিগকে ভড়্কাইত, কায়সারের মদীনা আক্রমণ সম্বন্ধে বিষম ভীতি প্রদর্শন করিত, এবং মোসলমানদিগকে সর্ব্ব-প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইত। ইতিপূর্ব্বে আঁ হজরত (ছালঃ) যখন কোনও যুদ্ধে গমন করিতেন, মোনাফেকদিগকে তৎ-সম্বন্ধে কোনও সংবাদ প্রদান করিতেন না; অতি সতর্কতার সহিত গোপনে যুদ্ধ-সজ্জা করিতেন। উদ্দেশ্য, মোনাফেকগণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে 'য়েত্রাজ' (প্রতিবাদ) করিতে, এবং মোসলমানদিগকে 'বদদেল' (ভগ্নমনাঃ বা উৎসাহ হীন) করিতে না পারে। ঠিক যুদ্ধযাত্রা করিবার সময়ই মোসল-মানগণ বুঝিতে ও জানিতে পারিতেন যে, তাঁহারা কোন্ দিকে—কোন্ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন। এবার অতি বৃহৎ সেনাদল সমবেত করিবার প্রয়োজন ছিল, আর উহার সাজ-সজ্জা, রসদ-পত্র সংগ্রহ করাও সহজ ব্যাপার ছিল না; এজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই ঘোষণা করিয়া দিয়া-

ছিলেন যে, সম্রাট্ হরকলের সেনাদলের গতিরোধ করিবার জন্য মোসলমানদিগকে যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া শামের সীমান্ত প্রদেশে গমন করিতে হইবে। গত বৎসর 'খোশক্-ছালী': (অনাবৃষ্টি জনিত শস্যাভাব) ছিল, এজন্য লোকের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না—আংশিক দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব ছিল। এ বৎসর যথা সময়ে সুবৃষ্টি হওয়াতে ফসল বেশ ভাল জন্মিয়াছিল, আবার শস্য কাটিবার সময় ও উপস্থিত হইয়াছিল। এজন্য শস্য চ্ছেদনের কার্য্য ফেলিয়া যুদ্ধে গমন করা অনেকের পক্ষেই কষ্টকর ও অসুবিধাজনক বোধ হইতেছিল।

গ্রীক্-সম্রাট্ হরকল ও তাঁহার মন্ত্রিগণ পূর্ব্ব হইতেই মোনাফেকদিগকে মদীনা আক্রমণের সম্বন্ধে আপনাদের সাহায্যকারী ও সহানুভূতি-সম্পন্ন করিয়া লইয়াছিল। মদীনার মোনাফেকগণ যখন দেখিল, মোসলমানগণ যুদ্ধ-সজ্জা ও 'ছফরের' (প্রবাসের) যোগাড়-যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং ঐ কার্য্যে বিশেষভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, তখন 'হেম্মত শকন' (সাহস ও উৎসাহ নাশক) কথা-বার্ত্তা তাঁহাদের মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। আর ভীষণ গ্রীষ্মকালের এই প্রাণান্তকর 'সফরের' (প্রবাসের) ভীষণতা মোসলমানদিগের মধ্যে বর্ণনা করিয়া, তাঁহাদিগকে ভীতি-প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহাদের (মোনাফেকদিগের) এই উদ্দেশ্য ছিল যে, মোসলমানগণের শামের দিকে অভিযান করিবার পূর্ব্বেই যেন গ্রীক্ সম্রাট্ হরকল দ্রুতগতি আসিয়া মদীনা আক্রমণ করিতে পারেন। আঁ হজরত (ছালঃ) ইতিপূর্ব্বেই মদীনার সমুদয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-কে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে, এবং স্বীয় অনুগামী হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রসদ, ছওয়ারি ও ভারবাহী পশুদল, উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। এজন্য মোসলমানদিগের মধ্যে সাধারণ ভাবে চাঁদা প্রদানের ও

আদেশ ফরমাইয়া ছিলেন। এই সুযোগে দুর্ম্মতি মোনাফেকগণ মোসল-মানদিগকে ভীতি-প্রদর্শন করিতে, ভড়্কাইতে, তাঁহাদের মধ্যে নানা বিপদ ও বিঘ্ন উৎপাদন করিতে কোনও রূপ চেষ্টা, উদেযাগ এবং যোগাড়-যন্ত্রের ত্রুটি করিতেছিল না। হজরত ওস্মান গণী (রাজিঃ) স্বীয় বিপুল বাণিজ্য-দ্রব্য শামের দিকে রওয়ানা করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সেই সকল মাল-পত্র যুদ্ধের চাঁদা স্বরূপ দান করিলেন। উহার 'মেক্দার' (পরিমাণ) ৯০০ নয় শত উষ্ট্র, ১০০ শত ঘোড়া—মায় উহাদের সাজ-সজ্জা এবং ১০০ এক হাজার 'তালায়ী' (স্ববর্ণ) 'দিনার' (স্বর্ণ মুদ্রা) ছিল। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) স্বীয় গৃহের সমস্ত মাল-আসবাব, নগদ টাকা কড়ি চাঁদা স্বরূপ প্রদান করিয়া বলিলেন, 'বাল-বাচ্চাঃ' (পুত্র কন্যা ইত্যাদি সন্তান-সন্ততি) দিগকে খোদাতা-লার নিকট 'ছোপর্দ্দ' (সমর্পণ) করিয়া আসিলাম। হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), স্বীয় অর্দ্ধেক 'মাল-আছবাব' (জিনিষ-পত্র ও টাকা-কড়ি) আল্লার নামে চাঁদা স্বরূপ প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ পরিবারবর্গের জন্য রাখিলেন। যাঁহারা নিতান্ত গরীব, 'মেহনত-মযদুরী' (শ্রমজীবির কার্য্য) করিয়া দিনাতিপাত করিতেন, তাঁহারাও নিতান্ত 'দেলেরীর' (উচ্চ হৃদয়তার—সৎসাহসের) সঙ্গে যতদূর সাধ্য চাঁদা প্রদান করিলেন। অনতিবিলম্বে ৩০০০ তিন হাজার এছলামী সৈন্য মদীনায় সমবেত হইলেন। অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) ৯ই রজব তারিখে ৩০০০ তিন হাজার 'লশ্কর' (সৈন্য) লইয়া পূর্ণ উৎসাহে মদীনা হইতে তবুকাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

তবুকের বিরাট অভিযান।

তবুক, আরব ও শামের সীমান্তে অবস্থিত। অধুনা উহা একটী ক্ষুদ্র শহরে পরিণত হইয়াছে। শাম (সিরিয়া) হইতে মদীনা-মনুওরা পর্য্যন্ত যে 'হেজায্-হামিদিয়া' (ওস্মানীয় খেলাফৎ- ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই রেল ওয়ে লাইনের পূর্ব্ব নামও মিটিয়া গিয়াছে) রেল-লাইন আছে, তবুক উহার একটী প্রধান ষ্টেসন। হুজুর (ছালঃ) মদীনা হইতে যাত্রা করিয়া, 'ছনিয়াতুল-ভেদা' নামক অনুচ্চ পাহাড়ের উপর শিবির সন্নিবেশ করিলেন। আর মোহাম্মদ ছলমাঃ আন্ছারী (রাজিঃ)-কে মদীনার 'আমেল' (শাসন-কর্ত্তা বা স্বীয় প্রতিনিধি) নিযুক্ত করিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় পরিবার-বর্গের 'হেফাজত' (তত্বাবধান) করার জন্য হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে মদীনায় রাখিয়া গেলেন। মদীনার দুর্ব্বৃত্ত মোনাফেকগণ হজরত আলী (রাজিঃ) সম্বন্ধে এরূপ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল যে, আঁ হজরত (ছালঃ) হজরত আলী (রাজিঃ) সম্বন্ধে কোনও 'পরেওয়া' করেন না; বরং তাঁহাকে 'খত্রা'-জনক (ক্ষতি-কারক—ভীতিপ্রদ) বলিয়াই মনে করেন; এজন্য তাঁহাকে সঙ্গে না লইয়া মদীনায় রাখিয়া গিয়াছেন। হজরত আলী (রাজিঃ) এই সকল কথা শুনিয়া 'বর্দাশ্ত্' (সহ্য) করিতে পারিলেন না। তিনি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মদীনা হইতে যাত্রা করিলেন। আর মদীনা হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী 'আল-জরফ্' নামক স্থানে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার হুজুরে আরজ করিলেন, মোনাফেকগণ এই সকল কথা বলিয়া থাকে; এজন্য আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিবার উদ্দেশ্যে 'খেদমতে হাজের' হইয়াছি। আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, উহারা 'ঝুটা' (মিথ্যাবাদী); আমি আমার বাড়ী ঘর ও পরিবার বর্গের

তত্ত্বাবধান জন্য তোমাকে মদীনায় রাখিয়া আসিয়াছি; তুমি মদীনায় ফিরিয়া যাও। আর তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য ইহাও ফরমাইলেন যে, তোমার সঙ্গে আমার সেই 'নেছ্‌বত্‌' (সম্বন্ধ)—হজরত মুছা (আলাঃ)-এর সঙ্গে হজরত হারুণ (আলাঃ)-এর যে সম্বন্ধে ছিল। কেবল 'ফরক' (পার্থক্য) এই মাত্র যে, আমার পরে আর কোনও পয়গম্বর (নবী, রছুল—তত্ত্ববাহক) হইবেন না। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর উক্তি ও আদেশ শ্রবণে হজরত আলী (রাজিঃ) বিনা বাক্যব্যয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কোনও কোনও ছাহাবাঃ (রাজিঃ) কোনও বিশেষ কারণে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে মদীনা হইতে একত্রে যাত্রা করিতে পারিয়াছিলেন না, তাঁহারা পরে মদীনা হইতে দ্রুতগতি যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে ক্রমশঃ ইস্‌লামী সেনা-দলে যোগ দিতে লাগিলেন। মোনাফেকদিগের প্রতিবন্ধকতা, দুরভিসন্ধি ও শত্রুতাচরণে এই অভিযানে কোনও বাধা জন্মিল না। আঁ হজরত (ছালঃ) সসৈন্যে দ্রুতগতি সিরিয়াভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অভিযান-পথে, খোদা তা-লার 'গযবে' (ক্রোধাগ্নিতে) ধ্বংসপ্রাপ্ত " সমুদ " জাতির নগর ও পল্লী সমূহ পতিত হইল; ঐ এলাকা—বিধ্বস্তীকৃত জনপদ তৎকালে " হজর " নামে অভিহিত হইত। যখন এস্‌লামী সৈন্যদল ঐ এলাকায় প্রবেশ করিলেন, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, তোমরা 'আস্তাগ্‌ফার' পড়িতে পড়িতে অতি দ্রুতগতি খোদা তা-লার গযবে নিপতিত এই জনপদ অতিক্রম কর; এখানকার কোনও কূপের পানী ও তোমরা পান করিও না। এই হজরের এলাকায় মোস্‌লেম সেনাদলকে একরাত্রি বাস করিতে হইয়াছিল; আঁ হজরত (ছালঃ) মোসল-মানদিগকে আদেশ করিলেন, কেহ যেন রাত্রিকালে শিবির হইতে বাহির না হয়। যখন তিনি ধ্বংস প্রাপ্ত নগর ও পল্লী সমূহ, এবং বিধ্বস্তী-কৃত গৃহাবলীর নিকট দিয়া গমন করিতে ছিলেন, তখন চাঁদর দ্বারা স্বীয়

পবিত্র বদন মণ্ডল ঢাকিয়া ছিলেন; আর ছওয়ারির উষ্ট্র খুব দ্রুতগতি চালাইয়া গিয়াছিলেন। যখন মোস্‌লেম সেনাদল এই এলাকা অতিক্রম পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে হইতে 'চশমাঃ' তবুকে—শামের (সিরিয়ার) সীমায় পঁহুছিলেন, তখন সেই স্থানে 'কায়াম' (শিবির সন্নিবেশ) করিলেন।

কনষ্টান্টিনোপলের গ্রীক্ সম্রাট্ হরকল, আঁ হজরত (ছালঃ)-কে "পয়গম্বর বরহক্" (সত্য নবী বা রছুল) বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সম্রাট্ যখন আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আগমন সংবাদ শুনিতে পাইলেন, তখন ভয়ে সসৈন্যে পশ্চাতে হঠিয়া গেলেন। ঈসায়ী সেনাদলও ঈসায়ী 'শাহান্‌শাহ্' (সম্রাট্), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পরিচালনাধীনে ইস্‌লামী সেনাদলের দ্রুত আগমন-সংবাদে এমন আতঙ্কিত ও ভীতি-বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, মোসলমান সৈন্যগণের সম্মুখীন হইতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না। তাহারা ময়দান শূন্য করিয়া চলিয়া গেল। "তবুক" মদীনা-মনওয়রা হইতে ১৪।১৫ মঞ্জেলের পথ; শত্রুদল ভয়ে পলায়ন করাতে আঁ হজরত (ছালঃ) তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে তবুকে প্রায় ২০ দিন অবস্থিতি করিলেন। ইত্যবসরে আয়েলার (শাম অর্থাৎ সিরিয়ার একটী সুবা) শাসনকর্ত্তা ইয়াহিনাঃ-বিন্-রোবতাঃ, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর অধীনতা স্বীকার জন্য তাঁহার 'খেদমতে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) জযিয়াঃ প্রদানের শর্ত্তে তাঁহার সঙ্গে সন্ধি-বন্ধন করিলেন। আয়েলার শাসনকর্ত্তা তখন তখনই জযিয়াঃ আদায় করিয়া দিলেন। ইহার পর 'জরবা' এর অধিবাসিদিগের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিগণ আসিল; তাহারা ও জযিয়াঃ প্রদানে প্রতিশ্রুত হইল; আঁ হজরত (ছালঃ) তাহাদিগকে 'ছোলেহ-নামা' (সন্ধি-পত্র) লিখিয়া দিলেন। ইহার পর 'আয্‌রুহ' এর প্রতিনিধিগণ হুজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল; তাহারাও জযিয়াঃ প্রদানের শর্ত্তে সন্ধি-পত্র লাভ করিল। তবুকের নিকটেই

"দোমতল জন্দল" এর এলাকা অবস্থিত ছিল। তথাকার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা (গবর্ণর) আকিদর-বিন্-আবদুল মলক, বনু-কন্দাঃ 'কবিলার' (সম্প্রদায়ের) লোক এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। সে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল না। উহার কার্য্য-কলাপে 'ছরকশি' (অবাধ্যতা) প্রকাশ পাইল। তদ্দর্শনে আঁ হজরত (ছালঃ) হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ)-এর অধিনায়কতায় তাহার বিরুদ্ধে এক 'দস্তাঃ' (দল) সৈন্য পাঠাইলেন। হজরত (ছালঃ), খালেদ (রাজিঃ)-কে ইহাও ফরমাইলেন যে, তুমি আকিদরকে নীল গাই শিকার করিতে দেখিতে পাইবে ; উহাকে 'গেরেফ্‌তার' (বন্দী) করিয়া আনয়ন কর। মহাবীর হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ), আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে স্বীয় সমভিব্যাহারী অশ্বারোহী সেনাদল সহ দ্রুতগতি অগ্রসর হইলেন। যাহা হউক, ঠিক নীল গাই শিকার কালেই আকিদর ও তাহার ভ্রাতা, মহাবীর সায়ফোল্লাঃ (রাজিঃ) কর্ত্তৃক ধৃত হইল। হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) তাহাকে বন্দী করিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে 'হাজের' করিলেন। আকিদর, হুজুর (ছালঃ)-এর বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক, জযিয়া প্রদানে প্রতিশ্রুত হওয়াতে, তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়া স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা হইল। পরে সে নিজের রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দুই হাজার উষ্ট্র, আটশত ঘোড়া, চারি শত 'যরাঃ' (বর্ম্ম), চারি শত 'নেযাঃ' (বড়শা বা বল্লম বিশেষ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে 'পেশ্‌কশ্‌' (নজরানা) স্বরূপ পাঠাইয়া দিল, এবং সন্ধি-পত্র স্বাক্ষর করাইয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইল। শামের সীমান্তবর্ত্তী স্থানের সমুদয় শাসনকর্ত্তা, রইস্, সাম্প্রদায়িক নেতা অর্থাৎ দলপতি দিগকে বশতাপন্ন করিয়া আঁ হজরত (ছালঃ), ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, অতঃপর কি করা উচিত। সকলে এক মতাবলম্বী হইয়া

বলিলেন যে, অতঃপর আমাদের পক্ষে এখানে বেশী দিন অবস্থান করা উচিত নহে। কায়সার ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, স্থানীয় শাসনকর্ত্তা, সামন্ত নরপতি ও সাম্প্রদায়িক ছরদার (নেতা) গণ বশ্যতা স্বীকার ও জজিয়া প্রদানে প্রতিশ্রুতি দান পূর্ব্বক সন্ধি-বন্ধন করিয়াছে, এবং কেহ কেহ উহা দিয়াও দিয়াছে, সিরিয়া-সীমান্তে আর কোনও আশঙ্কা বা ভয়ের কারণ নাই; সুতরাং আমাদিগের সত্বরে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিত। যদি কায়সারের যুদ্ধ করিবার 'হেম্মত' (সাহস) ও 'তাকত' (শক্তি) থাকিত, তবে তিনি তাঁহার বিরাট সেনাদল লইয়া অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেন। সুতরাং এখানে আর কোনও আশঙ্কার কারণই বিদ্যমান নাই। আঁ হজরত (ছালঃ) ও এই মত সমীচীন বোধ করিলেন; এবং তদনুসারে শিবির তুলিয়া লইয়া তবুক হইতে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। কয়েক দিন ক্রমাগত গমন এবং 'মঞ্জেলে-মঞ্জেলে' অবস্থান পূর্ব্বক, ৯ম হিজরীর পবিত্র রমজান মাসে, সদল বলে, মহাসমারোহে মদীনায় প্রবেশ করিলেন। এই অভিযানে—তবুক যাতায়াতে ও তথায় অবস্থানে সর্ব্বশুদ্ধ দুই মাস সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

আঁ হজরত (ছালঃ) যখন তবুকের 'গয্ওয়া' (যুদ্ধ বা অভিযান) হইতে বিজয়ী বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, সেই সংবাদ তায়েফ্-বাসিগণ শুনিতে পাইল, এবং তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আমাদের এমন শক্তি নাই যে, মোসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারি। হজরত য়রুহ-বিন্-মস্‌উদ (রাজিঃ) ইতিপূর্ব্বে যে তায়েফ্‌বাসীদিগের হস্তে অতি নির্দ্দয় ভাবে শহীদ হইয়াছিলেন, তদীয় পুত্র আবুল মলিহ্, ইতিপূর্ব্বেই তায়েফ্ হইতে মদীনায় আসিয়া পবিত্র ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; আঁ হজরত (ছালঃ) তবুক হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তায়েফ্‌বাসিদিগের পক্ষ হইতে আব্দ্ এয়া লয়েল-

বিন্-ওমরু উকীল নিযুক্ত হইয়া, আরও কতিপয় সম্ভ্রান্ত তায়েফ্ বাসীর সঙ্গে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল। হুজুর (ছালঃ) এই নবাগত লোকদিগের জন্য মছজেদে একটী 'খিমা নছব' করাইয়া (তাম্বু খাটাইয়া) দেওয়াইলেন। আবদ্-এয়া-লয়েল ও তাঁহার সঙ্গীয় লোকেরা সকলেই ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। আর আপনাদের 'কওমের' (সম্প্রদায় বা জাতির) পক্ষ হইতে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'দস্ত-মবারকে' (পবিত্র হস্তে) 'বয়্য়েত' করিলেন। তদনুসারে আঁ হজরত (ছালঃ), ওস্মান-বিন্-আবিল আছ (রাজিঃ)-কে তায়েফের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। আর মগিরা-বিন্-শয়বাঃ (রাজিঃ)-কে, তায়েফ্ নগরস্থ "লাত" দেবের মুর্ত্তি ও মন্দির ভগ্ন এবং নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তিনি তায়েফে পঁহুছিয়া লাতের 'বোত' (প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমা) এবং উহার মন্দির ভাঙ্গিয়া চুর্ণ-বিচুর্ণ ও ধুলিসাৎ করিলেন। উহার সুদৃঢ় ভিত্তি পর্য্যন্ত উপাড়িয়া ফেলিলেন। মন্দিরের ধনাগার হইতে যে অর্থ বাহির হইল, উহার কিয়দংশ দ্বারা হজরত য়রুহ-বিন্-মছউদ শহীদ (রাজিঃ)-এর ঋণ পরিশোধ করা হইল। অবশিষ্ট অর্থ মোসলমানদিগের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। যে তায়েফ্ হইতে আঁ হজরত (ছালঃ) একদিন নিতান্ত উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; যে তায়েফের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া "হুজুর ছারওয়ারে কায়েনাত" (ছালঃ) একদিন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; যে তায়েফ্ বাসিগণ, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-কে গ্রাহ্যই করিত না; আজ তাঁহার একজন 'ছাহাবাঃ' (শিষ্য)— (রাজিঃ) যাইয়া তাহাদের উপাস্য দেবতা লাত ও উহার মন্দির চুর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া মাটীতে মিশাইয়া দিলেন; তায়েফ বাসিগণ তাহাতে টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত করিল না।

আঁ হজরত (ছালঃ) তবুক হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর, আরবের চতুর্দ্দিকস্থ বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে 'ওফদ' (ডেপুটেশন—প্রতিনিধি) সকল আসিতে লাগিল। এক এক প্রদেশ, এক এক জনপদ, এক এক নগর এবং এক এক জাতি বা সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে উকীল বা প্রতিনিধি আসিতেন, ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে ইস্‌লাম গ্রহণ করিতেন, এবং আপন আপন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা দেশবাসীর পক্ষ হইতে 'বয়্‌য়েত' করিতেন, এবং পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিধান শিক্ষার্থে উপযুক্ত শিক্ষাদাতা সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) একদল যোদ্ধপুরুষ সহকারে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে 'বেলাদ তয়' (তয় প্রদেশ) অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তয় প্রদেশে পঁহুছিয়া, ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। তয় সম্প্রদায়ের প্রধান 'ছরদার' (নেতা বা দলপতি) আদি-বিন্‌-হাতেম-তায়ী (প্রসিদ্ধ দাতা ও পরোপকারী হাতেম তায়ীর পুত্র) 'ফরার' (পলায়ন-পর) হইয়া শাম প্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যুদ্ধে জয়ী হইয়া বহুসংখ্যক বন্দীসহ মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বন্দী দলের মধ্যে হাতেম তায়ী এর কন্যা ও ছিলেন। হাতেমের কন্যা আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'খেদমতে' 'আরজ' করিলেন যে, আপনি আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন—আমাকে মুক্তি দিন। হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি তোমার প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করিতেছি—অর্থাৎ তোমাকে বন্দিত্ব হইতে 'আযাদ' (স্বাধীনতা ও মুক্তি প্রদান) করিলাম। ইতিমধ্যে শাম দেশ হইতে কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক আগমন করিলে, আঁ হজরত (ছালঃ) হাতেমের কন্যাকে ঐ সঙ্গে তাঁহার স্বদেশে প্রেরণ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাকে উপযুক্ত বস্ত্র ও প্রচুর প্রচুর অর্থও দিলেন এই হাতেম-দুহিতা যখন তাঁহার

ভ্রাতা আদি-বিন্-হাতেম তায়ী এর নিকট পঁহুছিলেন, তখন ভ্রাতা ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ঐ ব্যক্তিকে (আঁ হজরত [ছালঃ] কে) কেমন পাইলে এবং কেমন দেখিলে? হাতেম-দুহিতা হুজুর (ছালঃ)-এর বিস্তর প্রশংসাবাদ ও গুণ-কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন, ঐ মহান্ ব্যক্তি সাক্ষাৎ-করিবার উপযুক্ত পাত্র। তিনি নিতান্ত 'খলিক' ('খোশ্-আখ্‌লাক্'—বিনয়ী) এবং 'আলা দর্‌জার মহছেন' (উচ্চ শ্রেণীর পরোপকারী ও জন-হিতৈষী)। আদি এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর উদ্দেশে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের (গোষ্ঠী বা গোত্রের) প্রতিনিধি স্বরূপ হুজুর (ছালঃ)-এর 'খেদমতে 'হাজের' হইলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহার প্রতি খুব সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন; আর মছজেদ-নববী হইতে সঙ্গে লইয়া স্বীয় গৃহে আগমন করিলেন। গৃহে আনিয়া তাঁহাকে সমাদর পুর্ব্বক বিছানায় বসাইলেন। আদি-বিন্-হাতেম, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর বিনয় ও সৌজন্য দর্শনে মোহিত হইলেন। গৃহে বসাইয়া হুজুর (ছালঃ) তাঁহাকে কতিপয় সারগর্ভ উপদেশ প্রদান কারলেন। অতঃপর আদি-বিন্-হাতেম তায়ী হাত বাড়াইয়া দিলেন—আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তে বয়্‌য়েত করিলেন—অতীব ভক্তি সহকারে মোছলমান হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা (তয় প্রদেশ বাসিগণ) সকলেই পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে-দীক্ষিত হইলেন।

তবুক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর 'ওফুদের' (ডেপুটেশনের—বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতি বা প্রদেশের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিবর্গ আগমনের) স্রোত এমন ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল যে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর মদীনা হইতে কিছুকালের জন্যও 'জুদা' হওয়া (অনুপস্থিত থাকা) অসম্ভব

ব্যাপার ছিল। সুবিশাল আরব দেশের বিভিন্ন প্রদেশস্থ, বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত লোক দলে দলে আসিয়া পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে-দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। যখন হজ্জের সময়—জেলহজ্জ মাস আসিল; হুজুর (ছালঃ) হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-কে স্বীয় প্রতিনিধি ও হজ্জের 'আমীর' নিযুক্ত করিয়া মক্কাভিমুখে রওয়ানাঃ করিলেন। নিজের পক্ষ হইতে কোরবানী দেওয়ার জন্য ২০টী উট তাঁহার সঙ্গে পাঠাইলেন। ৩০০ তিন শত হজ্জ্‌যাত্রীর 'কাফেলা' হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর হজ্জ্‌ যাত্রার পরই ছুরা-বরআতের ৪০টী আয়াত এককালীন অবতীর্ণ হইয়াছিল; উহাতে এই আদেশ ছিল যে, 'মোশ্‌রেকিন' (পৌত্তলিক বা অংশিবাদী) গণ এ বৎসরের পর যেন মস্‌জেদ হরামের নিকটে না যায়, এবং 'বর্‌আহ্‌না' (উলঙ্গ) হইয়া যেন বয়তোল্লার তওয়াফ্‌ (প্রদক্ষিণ কার্য্য) না করে। আর যাহাদের সঙ্গে (হজরত) রছুলোল্লাহ্‌ (ছালঃ) কোনও 'আহদ' (সন্ধি বন্ধন) করিয়াছেন, উহা ঐ 'মুদ্দত' (সময়) পর্য্যন্ত পূরা করিয়া দেওয়া হউক। স্থূলকথা, এরূপ 'য়েলান' (ঘোষণা) হজ্জের সময় প্রচার করা অতি প্রয়োজনীয় ছিল। তদনুসারেআঁ হজরত (ছালঃ) অবতরিত আয়াত সমূহ সহ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে, স্বীয় দ্রুতগামিনী উষ্ট্রের পৃষ্ঠে মক্কাভিমুখে রওয়ানা করিলেন, এবং তাঁহাকে আদেশ দিলেন যে, হজ্জ্‌ পরিসমাপ্তির পর দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে কোরআনের এই আদেশ শুনাইয়া দিবে। তদনুসারে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) দ্রুতগতি গমন করিয়া 'যোল-হালিফা' নামক স্থানে হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর কাফেলার সঙ্গে গিয়া সম্মিলিত হইলেন। অতঃপর তাঁহারা তথা হইতে রওয়ানা হইয়া মক্কা-মোয়াজ্জমায় উপস্থিত হইলেন। হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) হজ্জের আমীর ছিলেন বলিয়া তিনি 'আরকানে হজ্জ'

আদায় করিলেন। তৎপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ছুরা বর্আতের আয়াত সমূহ, সমবেত জনমণ্ডলীকে শুনাইয়া ছিলেন।

এই বৎসরেই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ছাহেবযাদীঃ ওম্মে-কুল্ছুম (রাঃ—আঃ) পরলোক গমন করিলেন। এই বৎসরেই হজ্জ্ ফরজ বলিয়া আল্লাহ্ তা-লার আদেশ অবতীর্ণ হয়। এই বৎসর হজ্জ্ মোসল-মানদিগের 'যের্-এহ্তেমামে' (তত্ত্বাবধানে) সম্পন্ন হইয়াছিল, বিধর্ম্মী দিগের তাহাতে আর কোনও রূপ কর্ত্তৃত্ব ছিল না। অবশ্য এ সময় মক্কায় পৌত্তলিকদিগের সংখ্যা একেবারে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) মোসলমানদিগকে হজ্জের 'আরকান' (নিয়মাবলী) শিক্ষা দিলেন। এই হজ্জ্-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পরে সমুদয় 'মোশ্রেকিন' (পৌত্তলিক—অংশীবাদী)-কে 'ছেরেফ্' (কেবলমাত্র) ৪ মাসের 'মহলৎ' (অবকাশ বা সময়) দেওয়া গেল, এবং ঘোষণা প্রচার করা হইল যে, ৪ মাস পরে খোদা ও তাঁহার রছুল 'মোশ্রেক' দিগের আর 'জিম্মাদার' থাকিবেন না—অর্থাৎ তাহাদের জীবন-মরণের জন্য কোনওরূপ দায়ী হইবেন না। এই ঘোষণা শুনিয়া মক্কার যে সকল অধিবাসী এ যাবৎ পৌত্তলিকতা (অংশিবাদিত্ব) পরিত্যাগ করিয়া মোসলমান হইয়াছিল না, তাঁহারাও পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে-দীক্ষিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্ন জনপদও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আরব অধিবাসিগণ দলে দলে আসিয়া পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন।

হেজরতের দশম বৎসর।

দশম হিজরীর মহর্‌রম মাস হইতে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণের আগমন এবং আরবের বিভিন্ন জনপদ, বিভিন্ন

জাতি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগের ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণার্থ মদীনায় আগমনের 'ছেলছেলাঃ' (স্রোত) বরাবর জারী ছিল। রবিয়স্‌-সানী মাসে আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত খালেদ-বিন্‌-অলিদ (রাজিঃ)-কে ৪০০ চারি শত ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-এর নেতৃত্ব পদ প্রদান পূর্ব্বক "নজরান" প্রদেশাভিমুখে রওয়ানা করিলেন; তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, তত্রত্য লোকদিগকেও ৩ বার ইস্‌লামের দিকে আহ্বান করিবে। যখন তাহারা ইস্‌লাম ধর্ম্মে-দীক্ষিত হইবে, তখন তাহাদিগকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে যথোচিত শিক্ষা দিবে, তাহাদের সঙ্গে পার্য্যমাণে যুদ্ধ করিবে না। নজরান প্রদেশের লোকেরা হজরত খালেদ-বিন্‌-অলিদ (রাজিঃ)-এর পঁহুছার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই নব-ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী দিগের মধ্যে বন্থ-হরছ-বিন্‌-কায়াব সম্প্রদায়ের (গোষ্ঠীর) লোকেরাও ছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত খালেদ-বিন্‌-অলিদ (রাজিঃ) ও তাঁহার সঙ্গীয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগকে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন, তদনুসারে তাঁহারা মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর ওমরু-বিন্‌-খরম (রাজিঃ)-কে, নব-দীক্ষিত মোসলমানদিগকে ইস্‌লামী শিক্ষা প্রদানার্থ 'নকীব' (ছরদার বা নেতা) নিযুক্ত করিয়া তথায় পাঠাইলেন। ঐ বৎসর রমজান মাসে গাছ্‌ছান জাতির "ওফদ" (ডেপুটেশন বা প্রতিনিধি দল), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে আগমন করিলেন। এই প্রতিনিধি দলে ৩ ব্যক্তি আসিয়াছিলেন; তাঁহারা হুজুর (ছালঃ)-এর 'খেদমত-আক্‌দছে' (পবিত্র খেদমতে) উপস্থিত হইয়াই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন; এবং তৎপর স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকেরা ঐ সময় পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। শওয়াল মাসে ছলামান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ৭ জন প্রতিনিধি আগমন করিলেন।

ঐ ৭ জনের মধ্যে উক্ত সম্প্রদায়ের 'ছরদার' (দলপতি) হবিব-বিন্-ওমরুও ছিলেন; ইঁহারা সকলেই প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, এবং ইস্লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অতি প্রয়োজনীয় মোটামুটি শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এক দিবস হবিব-বিন্-ওমরু (রাজিঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আফজালল-আমাল' (সর্ব্বোন্নত ধর্ম্মানুষ্ঠান) কি? উত্তরে হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, "ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নমায্ আদায় করা।" ঐ সময়ই "আযদ" হইতে ১০ জন প্রতিনিধির এক 'ওফদ' আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। ওফদের প্রতিনিধিগণ সকলেই ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইঁহারা ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে সমগ্র 'কবীলা' (জাতি বা সম্প্রদায়) ইস্লামের পবিত্র আশ্রয়চ্ছায়ায় আগমন করিলেন। ইহার পর তাঁহাদের প্রতিবাসী জরশ্ সম্প্রদায়ও পরম ভক্তি সহকারে পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। হুজুর (ছালঃ) এই বৎসরেই হজরত আলী (রাজিঃ)-কে এমন (ইমন) প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। উদ্দেশ্য, তদ্দেশ বাসীকে 'বোত-পরস্তির' (পৌত্তলিকতার) দোষ-প্রদর্শন এবং 'তওহিদের' (একেশ্বরবাদিতার) সৌন্দর্য্য, বৈশিষ্ট ও উপকারিতা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। স্থূলকথা, তিনি যেন সেখানে ইস্লামের 'তব্লীগ্' (প্রচার কার্য্য) করেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রচার কার্য্যের এই ফল হইল যে, এমনের সুবিখ্যাত ও সুনাম-প্রসিদ্ধ 'হমদান' জাতির সকলেই পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই এমনের অন্যান্য জাতিও দলে দলে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাহাদের প্রতিনিধিগণ মদীনা-মনুওরায় আসিয়া, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া চরিতার্থ হইতে লাগিলেন। এই বৎসরই মোরাদ সম্প্রদায়, মুলুক কন্দাঃ জাতি হইতে 'আলাহেদা' (স্বতন্ত্র) হইয়া আঁ হজরত

(ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং সকলেই পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আবার এই বৎসরেই আব্দে কয়েসের ওফদ, জারুদ-বিন্-ওমরুর নেতৃত্বে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, ইহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; ইহারা সকলেই পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহারা স্বদেশে গিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের সকল লোককেই ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এই বৎসরেই "এমামাঃ" প্রদেশ হইতে বনু-হানিফাঃ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ, আঁ: হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন। এই প্রতিনিধি দলে মোস্লেমাঃ-বিন্-হবিব—(যে ব্যক্তি হজরত আবুবকর ছিদ্দিক [রাজিঃ]-এর খেলাফৎ কালে নবুয়তের দাবী করিয়াছিল; পরে মহামান্য খলিফা প্রেরিত সেনাপতি "খোদা তা-লার তরবারি" নামে অভিহিত হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ [রাজিঃ] কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও হজরত হামযার (রাজিঃ) শহীদকারী ওহশী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল), জরজান-বিন্-আন্ কন্হম, তলক্-বিন্-আলী, ছলমান বিন্ হনজলাঃ শামেল ছিল। ইহারা মদীনা-মনুওরায় পঁহুছিয়াই পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম কবুল করিলেন। তৎপরে কিয়দ্দিবস তথায় বাস করিলেন; এবং ওবি-বিন্-কায়াব (রাজিঃ)-এর নিকট কোর-আন শরীফের শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। এই বৎসরেই ১০ কিম্বা ১২ জন লোকের এক ডেপুটেশন 'বন্দুকন্দাঃ' সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আসিল। আবার এই বৎসরেই বনু-কনানার ওফদের সঙ্গে বিখ্যাত "হজরত মুত" (দক্ষিণ-পূর্ব্ব আরবের অন্তর্গত বিশাল জনপদের অধিবাসী) সম্প্রদায়ের 'ওফদ' ও আগমন করিল। এই সকল দলের প্রতিনিধিবর্গ সকলেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই 'যমানায়' (সময়) প্রসিদ্ধ জন-নেতা ওয়ায়েল-বিন্ হজর, আঁ হজরত

(ছালঃ)-এর খেদমতে 'হাজের' (উপস্থিত) হইয়া, পরম ভক্তি সহকারে ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইঁহার ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণে আঁ হজরত (ছালঃ) বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আবার এই বৎসরেই মহারব এর দশজন লোকের, আর নদহজের ১৫ জন লোকের 'ওফদ' আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে আগমন করিল। ইহারা সকলেই ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন; ইঁহারা মদীনা-মনুওরায় থাকিয়া কোরআন শরীফ পাঠ শিক্ষা করিলেন, এবং 'ফরায়েজে ইস্‌লামের তালিম' (ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ শিক্ষা) প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এই বৎসরেই " নজরান " প্রদেশস্থ অবশিষ্ট খৃষ্টীয়ান দিগের পক্ষ হইতে এক " ওফদ " আসিল—যাহাতে ৭০ জন, কাহারও কাহারও মতে ১৪ জন প্রতিনিধি ছিল; এই সম্প্রদায়ের ছরদার আবুল মসীহ এবং তাহার সহযোগী আবুল হারছাঃ ছিল। ইহারা :মছজেদ নববীতে প্রবেশ পূর্ব্বক ধর্ম্ম সম্বন্ধে "বাহাছ-মবাহেছাঃ" (তর্ক-বিতর্ক) আরম্ভ করিল ; এই সময়েই ছুরে 'আল-এম্‌রান' এর শুরুস্থ আয়াত ও আয়াত 'মোবাহেলা' নাযেল হইল। আঁ হজরত (ছালঃ) উহাদিগকে ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু উহারা নিতান্ত 'গোস্তাখীর' (বে-আদবীর—অশিষ্টতার) সঙ্গে 'পেশ' আসিল ; আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, (হজরত) ঈছা (আলাঃ) খোদা তায়ালার নিকট এইরূপই ছিলেন—যেমন (হজরত) আদম (আলাঃ) ; কারণ তাঁহাকেও খোদা তায়ালা মাটী দ্বারাই বানাইয়া ছিলেন। ঈছায়ী (খৃষ্টীয়ান) গণ বলিল, না—তা নয় ; বরং ঈছা (আলাঃ) খোদার 'বেটা' (পুত্র) ছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, যদি তোমরা আপনাদের 'কওলে ছাচ্চা' (উক্তিতে সত্যবাদী) হও, তবে আমার সঙ্গে ময়দানে চল। আর আমার প্রিয় 'আকারেব' (রেশ্‌তাদার—সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন) ও আমার সঙ্গে থাকিবে, উভয় সম্প্রদায়

(পক্ষ) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে বসিয়া বলিবে, "যে ঝুটা' (মিথ্যাবাদী) হয়, তাহার উপর আল্লাহ্‌র 'আযাব' (শাস্তি) অবতীর্ণ হউক। এই কথা শুনিয়া খৃষ্টীয়ানগণ চুপ হইয়া রহিল। পর দিবস 'ছোবে্‌হ' (প্রভাত) কালে আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত আলী (রাজি), হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) হজরত এমাম হাছেন (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছায়েন (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন; এবং পূর্ব্বোক্ত 'ঈছায়ী' (খৃষ্টীয়ান) দিগকে গিয়া বলিলেন, আমি যখন এই 'দোওয়া' (প্রার্থনা) করিব যে, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, উহার উপর খোদা তা-য়ালার 'আযাব' (শাস্তি) অবতীর্ণ হউক; তখন তোমরা ও "আমিন" বলিও। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এইরূপ দৃঢ়তা দর্শনে খৃষ্টীয়ানগণ 'খওফ্‌ যাদাঃ' (ভীত ও আতঙ্কিত) হইয়া বলিতে লাগিল, আমরা 'মবাহেলা' করিতেছি না। আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, যদি 'মবা হেলাঃ' করিতে না চাও, তবে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হও; এবং অন্য মোসলমানদিগের মতন হইয়া যাও। তাহারা বলিল, আমাদের ইহাও 'মঞ্জুর' নয় (আমরা ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেও ইচ্ছুক নহি); তচ্ছ্রবণে আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, তবে তোমরা আমাকে 'জযিয়া' দাও, কিংবা আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। তখন তাহারা বলিল, আমরা জজিয়া দিতে সম্মত আছি। এই খৃষ্টীয়ানগণ বিদায় গ্রহণ কালে আপনাদের জন্য একজন 'আমীন' (বিচারক) প্রার্থনা করিল; তদনুসারে আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত আবু-ওবেদাঃ (রাজিঃ)-কে তাহাদের আমীন নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কিছু দিনের মধ্যে নজরান প্রদেশের প্রায় সমুদয় খৃষ্টীয়ানই পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে "এমন" প্রদেশের সমুদয় অধিবাসী এবং তথাকার বাদশাহ পারস্য-সম্রাটের সর্ব্ব ক্ষমতাপন্ন ভুতপূর্ব্ব প্রতিনিধি বাযান পবিত্র ইস্‌লাম

ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; আঁ হজরত (ছালঃ) বিশাল এমন প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে বাযানকেই বহাল রাখিয়াছিলেন। এই বৎসরে (হিজরী দশম সালে) বাযান পরলোক গমন করেন। এক্ষণে আঁ হজরত (ছালঃ) বিশাল এমন প্রদেশটীকে কতিপয় ভিন্ন ভিন্ন সুবায় বিভক্ত করিয়া শহর-বিন্-বাযান, আমের-বিন্-শহর হামদানী, হজরত আবুমুসা আশয়ারী-(রাজিঃ), আলী-বিন্-ওম্মিয়া, হজরত মায়ায-বিন্-জবল (রাজিঃ) প্রভৃতি খ্যাতনামা ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ও ব্যক্তিদিগকে ঐ সকল সুবায় শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিলেন। আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং আরও কতিপয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-কে ও এমনে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, যে পর্য্যন্ত কেহ তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত তোমরা কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিও না। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে প্রধানতঃ এমন প্রদেশের 'যাকাত' ও 'ছাদকাঃ' ইত্যাদি আদায় করিবার জন্য পাঠাইয়া ছিলেন।

হজ্জতল্-ভেদা বা হজ্জ্-অল্-বালাগ্।

এই সকল ঘটনার পর যেল্কদ মাস আসিল; আঁ হজরত (ছালঃ) ১০ম হিজরীর ২৫শে যেল্কদ, হজ্জ্ বায়তোল্লার জন্য মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন; তাঁহার সহিত মহাজেরিন ও আন্ছার এবং আরবের বিভিন্ন প্রদেশের এক বিরাট জন-সঙ্ঘ হজ্জে গমন করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কোরবানীর জন্য ১০০ এক শত উষ্ট্র লইয়া ছিলেন। ৪ঠা যেলহজ্জ রবিবার দিন তাঁহারা মহাড়ম্বরে মক্কা-মোয়াজ্জমায় প্রবেশ করিলেন। হজরত আলী (রাজিঃ) ও এমন হইতে আসিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন; এবং তাঁহার সঙ্গেই পবিত্র হজ্জ্

কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) এই বৎসর লোকদিগকে "মনাছক" হজ্জের 'তালিম' (শিক্ষা) দিয়াছিলেন। উহার 'তরিকাঃ' (নিয়মাবলী) বিশেষ রূপে 'বাতাইয়াছিলেন' (শিক্ষা দিয়াছিলেন)। তৎপর আরফাতে দাঁড়াইয়া একটী হৃদয়াকর্ষিণী ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি ফরমাইলেন, "হে জন-মণ্ডলি! আমার কথা (নিবিষ্ট মনে) শ্রবণ কর! কারণ আমি 'আয়েন্দাঃ' (আগামী) সালে (বৎসরে) এই স্থানে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইবার 'একিন' (ভরসা—বিশ্বাস) রাখিনা। হে লোক সকল! যেমন এই দিন, এই মাস 'হারাম' মাস; সেইরূপে অন্যের 'জান' ও 'মাল' (জীবন এবং সম্পত্তি) তোমাদের পক্ষে হারাম—অর্থাৎ মোসলমানদিগের জান ও মালের হেফাযৎ করা প্রত্যেক মোসলমানের পক্ষে উচিত। 'আমানত' অর্থাৎ গচ্ছিত ধন উহার 'মালেক' (অধিকারী) দিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। অন্যের প্রতি 'যোলম' (অত্যাচার) করিও না—যাহার পরিবর্ত্তে যেন তোমার প্রতি 'যোলম' (শাস্তি প্রদান) না করা হয়। **সুদ হারাম**; শয়তান 'মায়ুছ' (নিরাশ) হইয়া গিয়াছে; কারণ তাহার 'পরস্তশ্' (পুজা) এই 'ছরযমিনে' (আরব দেশে—মক্কায়) আর করা হইবে না। কিন্তু এই টুকু হইবে—ছোট ছোট ব্যাপারে উহার (শয়তানের) 'এতায়ত' (অধীনতা স্বীকার) লোকেরা করিবে; সুতরাং তোমরা শয়তানের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা কর। হে লোক সকল! তোমাদের উপর স্ত্রীলোকদিগের (দাবী—প্রাপ্য) আছে—যেমন তোমাদের হক্ তাহাদের উপর রহিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে 'ভালাই' (সদ্ব্যবহার) কর। আমি তোমাদের মধ্যে ২টি 'চিয্' (জিনিষ) ছাড়িয়া যাইতেছি; এক (প্রথম) আল্লাহর কেতাব (পবিত্র কোরআন মজীদ); দ্বিতীয়—তাঁহার নবীর (আমার) ছোন্নত। যে পর্য্যন্ত তোমরা আল্লাহর কেতাব ও ছোন্নতের প্রতি 'আমল' করিবে (এতদুভয়ের আদেশ

ও উপদেশ মতে চলিবে), তত্তাবৎ কাল 'গোমরাহ' (পথভ্রষ্ট—বিপথগামী) হইবে না ; প্রত্যেক মোসলমান অপর মোসলমানের ভ্রাতা ; কোনও মোসলমানের পক্ষে 'জায়েষ্' (সিদ্ধ) নহে যে, সে অন্য মোসলমানের মালের (ধন-সম্পত্তির) উপর তাহার বিনানুমতিতে 'দখল' (আধিপত্য বিস্তার) করে ; তোমরা একে অন্যের উপর 'জোলম' (অত্যাচার) করিও না।" পরে লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল, আমি আল্লাহর আদেশ তোমাদের মধ্যে পঁহুছাইয়াছি কিনা?" সকলে সম্মিলিত ভাবে—সমস্বরে উত্তর করিলেন, হাঁ! নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর আদেশ আমাদিগের মধ্যে পঁহুছাইয়াছেন। তৎপর আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন "হে খোদা! তুমি (এ বিষয়ের) 'গাওয়াহ্' (সাক্ষী) থাক।"

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এই 'খোত্বাঃ' (বক্তৃতা) টী এই ভাবের ছিল, এবং ইহাতে এইরূপ উক্তি সকলের উল্লেখ ছিল—যদ্দ্বারা বোধ হইয়াছিল, যেমন কেহ কাহারও নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, কিংবা কাহাকেও বিদায় প্রদান করিতেছেন। এজন্য এই হজ্জের নাম "হজ্জতল ভেদা" বলিয়া 'মশ্হুর' (প্রসিদ্ধ)। আর এই বক্তৃতায় আঁ হজরত (ছালঃ) ইস্লামের 'খছুছি-তব্লীগ' (বিশেষ-প্রচার কার্য্যের বিষয়) বর্ণনা করিয়াছিলেন, এজন্য ইহা "হজ্জ-আল্-বালাগ্" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই খোত্বা শেষ হইবামাত্র, হজরত আবহুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) এর 'ওয়ালেদা' (জননী) এক পেয়ালা দুগ্ধ পাঠাইলেন ; আঁ হজরত (ছালঃ) ঐ দুগ্ধ পান করিলেন। এই হজ্জে একলক্ষ অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক মোসলমান যোগদান করিয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) ঐ দিন ফরমাইয়াছিলেন যে, "আমি এবং আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় পয়গম্বর (আলাঃ) যাহা কিছু বলিয়াছেন, এবং বলিয়াছি, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আচ্ছা কালাম' (উৎকৃষ্ট বাক্য বা বাণী) "লায়েলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহ্দাহু লাশরীকালাহু লাঃ

মোল্‌ক্ ও লাহুল হাম্‌দ ও হুয়া আলা-কুল্লে শায়েন কাদীর।" আরফার দিন যখন আঁ হজরত (ছালঃ) মক্কায় উপস্থিত ছিলেন, তখন কোরআনের যে পবিত্র আয়েতটী নাযেল হয়, তৎশ্রবণে বহু ছাহাবাঃ (রাজিঃ) এই বলিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন যে, আজ ইস্‌লাম ধর্ম্ম পূর্ণতা লাভ করিল। কিন্তু কোনও কোনও ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)—বিশেষতঃ হজরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)—যিনি প্রত্যেক বিষয়ের গভীর তত্ত্ব উদ্ঘাটনে অভ্যস্ত ছিলেন—উপরোক্ত আয়াত শ্রবণে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। এই আয়াতে 'ফরাকের' (পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবার) গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল। কারণ, যখন 'দীন' (ধর্ম্ম) পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, তখন পৃথিবীতে নবীর জীবিত থাকার আবশ্যকতা রহিল না।

'আরকানে হজ্জ্' আদায় করিবার পর আঁ হজরত (ছালঃ) ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগকে সঙ্গে লইয়া মদীনা-মনুওরায় রওয়ানা হইলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর, তদীয় ছাহেব যাদাঃ (পুত্ররত্ন) এব্‌রাহিম পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

হিজরীর একাদশ সাল।

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পরলোক গমন।

১১শ হিজরীর মহর্‌রম মাসে আঁ হজরত (ছাল)-এর জ্বর হইল; এবং সেই জ্বর ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। হুজুর (ছালঃ)-এর অসুস্থতার সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল; ইহাতে তাঁহার পরম ভক্ত ও অনুরক্ত, তাঁহার নামে জীবনোৎসর্গকারী ছাহাবাঃ কারাম (রাজি) দিগের মনে কিরূপ চিন্তা ও উদ্বেগের আবির্ভাব হইল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সুযোগে কোনও কোনও 'মোফ্‌ছেদ' (বিপ্লব-

বাদী) মস্তকোত্তোলন করিল। মোছলেমাঃ, তলিয়াঃ, খোয়েলদ, আছুদ, সজাহ-বিন্তে হারেস্— স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নবুয়তের (পয়গম্বরীর) দাওয়া করিল। তাহারা মনে করিয়াছিল, যেরূপে (হজরত) মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম) পয়গম্বরীর নামে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, আমরাও তদ্বিষয়ে সেইরূপ সাফল্য মণ্ডিত হইব। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লা, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'ছদাকতের' (সত্যতার) আর এক 'মোহর' করিয়া দিলেন; তদ্দরুণ উপরোক্ত ভণ্ড ও প্রতারক লোকগুলি পরিণামে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য, নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইল। ইহাদের মধ্যে মোছলেমাঃতুল কায্যাব এমামায়, আছুদ বিন্-কায়াব এমনে অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) পীড়িত অবস্থায় একদিন 'হুজ্রা' হইতে বাহিরে তশ্রিফ্ আনিলেন। তিনি 'এরশাদ ফরমাইলেন', আমি গত রাত্রে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, আমার দুই 'বাজু'তে (বাহুতে—হস্তে) দুইগাছি সোণার 'কাঙ্গণ' (বলয়) রহিয়াছে। আমি উহা 'নামত্বুর' (অশুভকর—'মন্হুছ') মনে করিয়া-খুলিয়া ফেলিয়া দিলাম। আমি ঐ স্বপ্নের এইরূপ 'তাব়বির' করিয়াছি (অর্থ বা ফল নির্দ্দেশ করিয়াছি) যে, এই উভয় স্বুবর্ণ নির্ম্মিত 'কাঙ্গণ' (বলয়), ঐ উভয় 'কায্যাব' (ভণ্ড)—অর্থাৎ এমামাঃ নিবাসী মোছলেমাঃ কায্যাব', আর এমনের আছুদ কায্যাব; স্বপ্নের 'তাবুবির' যে ঠিক ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আছুদ কায্যাব আঁ হজরত (ছালঃ)-এর জীবিত কালেই, ফিরোয্ নামক এক বীরপুরুষের হস্তে নিহত হয়; আর মোছলেমাতুল কায্যাব, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে, হজরত হামযাঃ (রাজিঃ)-এর হত্যাকারী ওহশী কর্ত্তৃক মৃত্যু-পথের পথিক হইয়াছিল। ওহশা বলিতেন, আমি কোফরের অবস্থায় একজন 'বেহ্তরিন' (উত্তম—আদর্শ) পুরুষকে শহীদ, এবং

মোসলমান অবস্থায় একজন 'বদতরিন' (দুষ্ট-দুরাচার) লোককে হত্যা করিয়াছি।

একাদশ হিজরীর ২৬শে ছফর তারিখে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ব্যারাম একটু হ্রাস বোধ হইল ; তখন তিনি 'সিরিয়া' (শাম) ও 'ফলস্তিন' (প্যালেষ্টাইন)-এর সীমান্ত প্রদেশে অশান্তির সংবাদ পাইয়া, মোসলমান দিগকে 'জঙ্গে-রুম' (রোমক সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ) করিবার জন্য প্রস্তুত ও সজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। কারণ, এমামাঃ ও এমনের অন্তবিপ্লবে এবং আরব দেশস্থ খৃষ্টীয়ানদিগের ষড়যন্ত্র প্রভাবে, রোমক জাতি এবং সিরীয়গণ আবার আরব দেশের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। হুজুর (ছালঃ) দ্বিতীয় দিবস হজরত ওসামা-বিন্-জয়েদ (রাজিঃ) কে প্রধান সেনাপতি পদ প্রদান পূর্ব্বক ফরমাইলেন যে, তুমি স্বীয় পিতার ন্যায় এমন দ্রুতগতি (এখানে মুতা যুদ্ধে হজরত যয়েদ-বিন্-হারেছ [রাজিঃ] এর দ্রুত গমন সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে) গমন কর, যেন তথাকার (শামের) লোকেরা তোমার গমন সংবাদ পূর্ব্বাহ্নে জানিতে না পারে। ইন্‌শাল্লাহ্ তা-লা তুমি জয়লাভ করিবে। একাদশ হিজরীর ২৮শে ছফর তারিখে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পীড়া আবার বৃদ্ধি পাইল। এই পীড়িত অবস্থায়ই তিনি হজরত ওসামাঃ (রাজিঃ)-এর যুদ্ধ-পতাকা স্বহস্তে 'দোরস্ত' করিয়া, সেনাদল যুদ্ধার্থ রওয়ানা করিলেন। আর সমুদয় 'জলিলল্-ক্বদর' (মহা-সম্মানিত) ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগকে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), হজরত ওস্‌মান জিন্নুরায়েণ (রাজিঃ), হজরত আলী মরতুজা (রাজিঃ)—ভাবীকালের খোল্‌কায়ে রাশেদিনগণ, আশ্‌রায়-মোবাশ্‌শরাগণ ও অন্যান্য সমুদয় ছাহাবাঃমণ্ডলীকেই তরুণ যুবক হজরত ওসামাঃ (রাজিঃ)-এর অধীনে

যুদ্ধ-যাত্রা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু নিজের অসুস্থতা নিবন্ধন হজরত ওসামাঃ (রাজিঃ)-এর সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং হজরত আব্বাস (রাজিঃ)-কে আপনার নিকটে রাখিয়া দিলেন। কারণ, নিকট আত্মীয়ের মধ্যে তখন এই দুই জনই প্রধান ছিলেন; একজন পিতৃব্য এবং একজন পিতৃব্যপুত্র ও জামাতা। যাহা হউক, উপরোক্ত দুই মহাত্মা ব্যতীত আর সকল ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ই মদীনা হইতে শামের দিকে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। হজরত ওসামাঃ (রাজিঃ) মদীনা-মনুওরা হইতে রওয়ানা হইয়া, এক ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক "জরফ্" নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। সেখান হইতে হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), প্রধান সেনাপতির অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রত্যহ মদীনায় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইতেন, এবং তাঁহাকে দেখিয়া পুনরায় সেনানিবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। হজরত ওসামাঃ (রাজিঃ) স্বীয় বিশাল সেনাদল লইয়া জরফেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পীড়ার আক্রমণ ক্রমশঃ গুরুতর হইতে দেখিয়া, তিনি আর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। হুজুর (ছালঃ) ও এ অবস্থায় তাঁহাকে 'কুচ' (যাত্রা) করিতে অনুমতি দিতেছিলেন না; অবশেষে প্রধান সেনাপতিকে তাঁহার সৈন্যদল সহ জরফে 'মকীম' থাকা সম্বন্ধে তিনি অনুমোদন করিলেন।

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এজন্য 'আয্ওয়াজ মত্হরাত্' (অন্যান্য ওম্মোল-মুমেনিন) দিগের নিকট, হজরত আয়েশা (রাঃ—আঃ) এর গৃহে অবস্থান করিবার জন্য 'এজাযত তলব' করিলেন (অনুমতি চাহিলেন); তাঁহারা সকলেই স্বেচ্ছানুসারে এই প্রস্তাবে অনুমোদন করাতে, হুজুর (ছালঃ) তাঁহার গৃহে আগমন

করিলেন। অন্যান্য মোস্‌লেম-মাতাগণ সেই গৃহে আসিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই পীড়ার অবস্থায়ই তিনি অন্দর হইতে বাহিরে আসিয়া সমবেত মোসলমানদিগের মধ্যে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ঐ পবিত্র বক্তৃতার মর্ম্ম এই :—" আমি তোমাদিগকে, আল্লাহকে ভয় করিবার জন্য 'হেদাএত' (উপদেশ দান) করিতেছি। আল্লাহ্ তা-লা তোমাদিগকে 'হেদাএত' করুন। আমি তোমাদিগকে তাঁহার (আল্লাহ্ তা-লার) নিকট ছাড়িয়া যাইতেছি, আর তোমাদিগকে তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিতেছি। আমি তোমাদিগকে 'দোযখ' হইতে 'ডরানেওয়ালা' (ভীতি-প্রদর্শনকারী), এবং 'জন্নতের' (বেহেশ্‌ত্ বা মোছলেম-স্বর্গের) সুসংবাদ প্রদানকারী ছিলাম। আল্লাহর 'বান্দাঃ' (দাস বা সৃষ্ট মনুষ্য) দিগের নিকট 'তকব্বর' (গর্ব্ব বা অহঙ্কার) প্রকাশ করিও না। 'জন্নত' (বেহেশ্‌ত্) ঐ সকল লোকের জন্য—যাহারা অহঙ্কার প্রকাশ ও 'ফছাদ' (বিবাদ-বিসম্বাদ—বিপ্লব) উপস্থিত না করে। পরকালের 'ভালাই' (মঙ্গল) 'মুত্তকি' ('পরহেজগার'—মন্দ কার্য্য হইতে বিরত—ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী) দিগের জন্য। অহঙ্কারী ও গর্ব্ব প্রকাশকারী দিগের 'ঠেকানা' (স্থান) জাহান্নমে (দোযখ্ বা নরকে)।" পুনরায় ফরমাইলেন, "(আমার মৃত্যু হইলে) আমার 'করীবি রেশ্‌তাদার' (ঘনিষ্ট আত্মীয়) গণ যেন আমাকে 'গোছল' দেয় (শবদেহ ধৌত করে—স্নান করায়); আমার 'জানাযাঃ' (জানাযার নমাজ পড়ান্তে) আমার কবরের নিকট রাখিয়া, সকলে এক 'ছায়েত' (অতি অল্পমাত্র সময়)-এর জন্য 'আলগ্' (স্বতন্ত্র) হইয়া যাইবে—কারণ 'মালায়েক' (ফেরেশ্‌তা) গণ আমার জানাযার নমাজ যেন পড়িয়া লইতে পারে। পরে সকলে দলে দলে আমার জানাযার নামাজ পড়িবে। প্রথমে আমার 'খান্দান' (বংশ)-এর—বনি-হাশেমী পুরুষগণ নমাজ পড়িবে; তৎপর তাহাদের স্ত্রীলোকগণ—

তদনন্তর আর আর সকলে জানাযার নমাজ আদায় করিবে।" তাঁহার এই শেষ বিদায়-সূচক বাণী শ্রবণে পরম ভক্ত, অনুরক্ত ও তাঁহার নামে জীবনোৎসর্গকারী ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

ব্যারামের সময় শেষ ৩ দিন তিনি 'ছাহেবে ফরাশ' (শয্যাশায়ী) ছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-কে মছজেদে তাঁহার নিজের জায়গায় এমামতি করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তচ্ছ্রবণে হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) 'আরজ' করিলেন, এয়া রছুলোল্লাহ (ছালঃ)! আমার পিতা এই 'খেদমত' (আপনার স্থানে এমামতি) 'আঞ্জাম' দিতে পারিবেন না। কারণ তিনি একজন অত্যন্ত 'রফিকুল-কল্‌ব্' (নরম দেল—কোমল হৃদয়) মানুষ। আপনি হজরত ওমর (রাজিঃ)-কে এমাম 'মকরর' (নিযুক্ত) করুন। আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, না, আবুবকর (রাজিঃ) ই এমামতি করিবেন। সেই দিন হইতে হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) এমাম হইয়া, যথা-নিয়মে নমায্ পড়াইতে লাগিলেন। এই অবসরে আঁ হজরত (ছালঃ) একটু 'এফাকাঃ' (সুস্থতা) বোধ করিলেন; এবং ঐ অবস্থায় মছজেদে 'তশ্‌রিফ্' আনিলেন।

নমাযের অবস্থায়ই, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আগমনে, হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), এমামের স্থান তাঁহার জন্য খালি করিয়া, স্বয়ং পশ্চাতে হটিয়া আসিবার উদ্যোগ করিলে, তিনি তাঁহাকে ধরিয়া এমামের জায়গায় 'কায়েম' রাখিলেন, এবং তাঁহার 'এক্তেদায়' (মোক্তাদি হইয়া) নমায্ শেষ করিলেন। হাদীছ ছহিহ্ বোখারী ও ছহিহ্ মোছলেমে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (ছালঃ) হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-কে একদা ফরমাইলেন, তুমি তোমার পিতা ও ভ্রাতাকে ডাকাইয়া আনাও, আমি তোমার পিতার জন্য খেলাফৎ-নামা লিখিয়া দি; পরক্ষণেই ফরমাই-

-লেন, ইহার আবশ্যকতা নাই, কেননা—মোসলমানগণ তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহাকেও আপনাদের 'ছরদার' (নেতা—খলিফা) মনোনীত করিবে না; আর খোদা তা-লার ও ইহাই ইচ্ছা। এইরূপ 'ছহীহীনে' উল্লেখ আছে যে, আঁ হজরত (ছালঃ) একদা জীবিত অবস্থায় কাগজ, কলম ও দোয়াত আনিতে আদেশ করিলেন; তখন পীড়ার প্রকোপ খুব বেশী ছিল; হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ফরমাইলেন, এ সময় আপনাকে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে, আমাদের জন্য কোরআন মজীদই 'কাফি' (যথেষ্ট),—আপনি ইতিপুর্ব্বে ইহা ফরমাইয়াছেন। কোনও কোনও ছাহাবাঃ (রাজিঃ) বলিলেন, তা নয়, হুজুর (ছালঃ)-কে 'মতওজ্জা' (মনোযোগ আকর্ষণ) করা হউক, এবং জিজ্ঞাসা করা যাউক, আপনি কি লিখাইতে চাহিতেছেন। লোকদিগের কথার 'আওয়ায্' আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট 'না-গওয়াব' (বিরক্তি-জনক) বোধ হইল। লোকেরা আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর কি লিখাইতে চান, বলুন। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, তোমরা আমাকে এই অবস্থায়ই থাকিতে দাও—যে অবস্থায় আমি এক্ষণে রহিয়াছি। আর তোমরা ক্ষণকালের জন্য একটু বাহিরে যাও। এই সময় তাঁহার বেদনার ভয়ানক প্রকোপ ছিল, এবং তিনি তজ্জন্য অত্যন্ত কষ্টবোধ করিতেছিলেন। এজন্যই হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) চাহিতেছিলেন যে, এই কষ্টজনক অবস্থায় তাঁহাকে কোনও প্রকার 'তক্‌লিফ্' (ক্লেশ) দেওয়া না হয়। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সেই ভীষণ যাতনা-প্রদ বেদনার কিছু উপশম হইল, তিনি আবার সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; তাঁহারা উপস্থিত হইলে হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, " যখন কোনও 'ওফুদ' (প্রতিনিধিদল—ডেপুটেশন) কোনও স্থান হইতে আসিবে, তখন তাহাদিগকে সদ্ব্যবহার দ্বারা ও 'এনাম' (পুরস্কার) প্রদানে অবশ্যই সন্তুষ্ট করিবে। 'মোশরেক' (অংশীবাদী)

দিগকে 'জজিবাতল আরব' (আরব উপদ্বীপ) হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইবে। ওসামাঃ (রাজিঃ)-এর সেনাদলকে যুদ্ধার্থ শামের (সিরিয়ার) দিকে অবশ্য রওয়ানা করিয়া দিবে। আন্‌ছার দিগের সঙ্গে 'নেক-ছলুক' (সদ্ব্যবহার) করিবে। তাহারা যদি কোনও রূপ ভুল-ভ্রান্তি করে, তবে তাহাতে 'দর-গোযর' করিবে (সেদিকে লক্ষ্য করিবে না—সে বিষয় ধর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবে না)। আপনাদের মধ্যে আবু-বক্কর (রাজিঃ) অপেক্ষা আর কাহাকেও 'আফ্‌জল' (শ্রেষ্ঠ—উত্তম) বলিয়া মনে করিও না।"

ইহার পরেই আবার বেদনা প্রবল আকার ধারণ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে হজুর (ছালঃ) 'বেহোশ্‌' (অচৈতন্য) হইয়া পড়িলেন। হজরত আলী (রাজিঃ), হজরত আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত ফজল বিন্‌-আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)—আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এই ব্যারামের অবস্থায় সর্ব্বদা তাঁহার খেদমতে উপস্থিত থাকিতেন। পাঁচটী কি ছয়টী দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকটে ছিল। উহা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর তহবিলে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি তাহা "ছদকা" দিবার জন্য আদেশ করিলেন। উদ্দেশ্য, তিনি নিজের বলিয়া কোনও অর্থ-সম্পদ্‌ দুনিয়াতে রাখিয়া না যান। হুজুর (ছালঃ)-এর আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল; পূর্ব্বোক্ত ৫।৬টী দীনার ফকীর ও 'মহতাজ' (মিছকিন—দীন-দরিদ্র-পরমুখপেক্ষী) লোকদিগের মধ্যে ছদকা স্বরূপ বিতরণ করা হইল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে তিনি এই বলিয়া 'ওছিয়ত' করিলেন, "নমাজ ও 'মোতোয়াল্লেকীন' (আত্মীয়-স্বজন) সম্বন্ধে 'গাফেল' (অমনোযোগী) থাকিও না।"

হজরত আবু-বক্কর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজুর (ছালঃ)-এর পীড়িত

অবস্থায় ক্রমান্বয় ১৩ তের ওয়াক্তের নমাজে এমামতি করিয়াছিলেন। একাদশ হিজরীর ১২ই রবিওল-আউওল সোমবার ফজরের নমাজের সময় আঁ হজরত (ছালঃ) মাথায় পটি বাঁধিয়া মছজেদে গমন করিলেন, তখন হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) এমাম হইয়া নমাজ পড়াইতেছিলেন। আজও তিনি পশ্চাতে হটিয়া আসিতে চেষ্টা পাইলেন ; কিন্তু আঁ হজরত (ছালঃ) হাত দিয়া তাঁহাকে বাধা দিলেন—অর্থাৎ যথা নিয়মে এমামতি করিয়া নমাজ পড়াইতে ইঙ্গিত করিলেন ; এবার তিনি জামাতের ডান দিকে বসিয়া নমাজ পড়িলেন। নমাজ পড়া শেষ হইলে আঁ হজরত (ছালঃ) উপস্থিত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মধ্যে সংক্ষেপে কিছু 'ওয়াজ' ফরমাইলেন। আহা ! ইহাই হুজুর (ছালঃ)-এর শেষ মছজেদে আগমন ও শেষ উপদেশ দান ছিল। তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শেষ হইলে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) বলিলেন, আমি দেখিতেছি, খোদা তা'লার ফজলে আপনি আজ 'খোশ্'ও 'খোর্‌রম' (আনন্দিত ও স্ফূর্ত্তি সম্পন্ন) আছেন। ইহার পরেই হুজুর (ছালঃ) মছজেদ হইতে 'হুজরায়' (গৃহে) প্রবেশ করিলেন ; এবং ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিলেন। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), আজ আঁ হজরত (ছালঃ)-কে একটু সুস্থ দেখিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি এই অবসরে স্বীয় গৃহে—পরিবার বর্গের নিকটে গমন করিলেন। ইত্যবসরে হজরত আব-দুর রহমান-বিন্-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), একখানি 'তর্' (আর্দ্র) ও নরম 'মেছওয়াক' (দাঁতন) হাতে লইয়া হুজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনি যেন কতকটা আগ্রহের সহিত সেই 'মেছওয়াক' খানি দেখিতে ছিলেন। হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ - আঃ) বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি মেছওয়াক খানি চাহিতেছেন। তিনি ভ্রাতার হস্ত

হইতে মেছওয়াক খানি গ্রহণ পূর্ব্বক উহা দাঁত দিয়া চিবাইয়া খুব নরম করিলেন, এবং হুজুর (ছালঃ)-এর হাতে দিলেন। তিনি উহা স্বীয় পবিত্র হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক যথানিয়মে দাঁতন করিলেন। পরে উহা রাখিয়া দিয়া স্বীয় 'ছের মবারক' (পবিত্র মস্তক), ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকার (রাঃ—আঃ) বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক পবিত্র পা দুখানি বিস্তৃত (প্রসারিত) করিয়া দিলেন। হুজুর (ছালঃ)-এর সম্মুখে পানী পূর্ণ একটী পেয়ালা ছিল, স্বীয় পবিত্র হস্ত ঐ পানীতে দিয়া (হাত খানি পানীতে ভিজাইয়া), পবিত্র 'চেহ্‌রা মবারকে' (বদন মণ্ডলে) ফিরাইতে (ভিজা হাতে মুছিতে) লাগিলেন, এবং 'ফরমাইলেন,' " আল্লাহুম্মা আলী আলা ছাকরাতিল মওতে " (হে আল্লাহ্, ছাকরাতিল মওত হইতে আমাকে 'মদদ' (সাহায্য) কর। হজরত ওম্মোল মুমেনিন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) পুনঃ পুনঃ তাঁহার চেহেরা মবারকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; অকস্মাৎ হুজুর (ছালঃ)-এর পবিত্র চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিল। তাঁহার পবিত্র 'যবান-মবারকে' (মুখে) তখন কেবল " আর্ রফিকুল আলা মিনাল্ জান্নাতে " শব্দ উচ্চারিত হইতে ছিল। একাদশ হিজরীর ১২ই রবিওল-আউওল সোমবার, বেলা দ্বি-প্রহরের সময় হুজুরের পবিত্র অমর আত্মা দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'জন্নতল-ফেরদওছে' (স্বর্গ-রাজ্যে বা আল্লাহ সদনে) চলিয়া গেলেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায় হে রাযেউন)। সঙ্গে সঙ্গেই হুজুর (ছালঃ)-এর পরিবার বর্গের মধ্যে, ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের মধ্যে এবং সমগ্র মদীনা নগরীতে শোকের প্রচণ্ড বাত্যা প্রবাহিত হইল। মোসলমানদিগের—মদীনা বাসিগণের মধ্যে সে দিনটী কেয়ামত বলিয়া অনুমিত হইতেছিল। শোকাশ্রুতে সকলেরই গণ্ডদেশ ও বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। নর-নারী, বালক-বালিকা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, যুবক—সকলের হৃদয়েই বিষম শোক-শেল বিদ্ধ হইল। পরবর্ত্তী দিবস—মঙ্গলবার প্রায় বেলা

দ্বি-প্রহরের সময় তাঁহার পবিত্র দফন কার্য্য সম্পন্ন হইল। হুজুর (ছালঃ)-এর এন্তেকাল-কালে (দেহত্যাগের সময়ে), হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না ; আঁ হজরত (ছালঃ)-এর গৃহ ও মছজেদ নববী হইতে কিছু দূরবর্ত্তী "ছবথ্" নামক মহাল্লার, স্বীয় বাস-গৃহে—পরিবার বর্গের মধ্যে ছিলেন। হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) এই ভীষণ সংবাদে এরূপ স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন যে, তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "কতিপয় মোনাফেক ব্যক্তি এরূপ মনে করিতেছে যে, জনাব হজরত রছুল মকবুল (ছালঃ) এন্তেকাল ফরমাইয়াছেন ; বাস্তবিক কিন্তু তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হন নাই। তিনি আপন 'রবের' (প্রভুর) নিকট ঐ ভাবে গিয়াছেন—যে প্রকারে হজরত মুছা (আলাঃ) 'কোহ্‌তুরে' গিয়াছিলেন। তিনি অবশ্যই ফিরিয়া আসিবেন, এবং লোকদিগের হস্ত ও পদ কাটিয়া ফেলিবেন।" হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) শোকাতিশয্যে, উত্তেজনা বশে, হৃদয়ের ব্যাকুলতায় এইরূপ প্রলাপ পূর্ণ কথা বলিতে ছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার অব্যবহিত কাল পরেই হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) সেখানে আসিয়া পঁহুছিলেন, এবং সোজা-সুজি 'হুজরা মবারকে' প্রবেশ করিলেন। তিনি হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র মস্তক, ওম্মোল-মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকার (রাঃ—আঃ) ক্রোড় হইতে তুলিলেন এবং 'গওর' করিয়া (অভিনিবেশ সহকারে) দেখিয়া বলিলেন, আমার পিতা মাতা আপনার উপর 'কোরবান' হউক ; 'বেশক' (নিশ্চয়—নিঃসন্দেহ) আপনি ঐ মৃত্যুর 'যায়েকা চিখিয়াছেন (স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন)—যাহা—আল্লাহ্‌ তা-লা আপনার জন্য 'মকরর' (নির্দ্দিষ্ট) করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই কথা বলিয়াই "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাযেউন" পড়িতে পড়িতে 'হুজরা' হইতে বাহির হইয়া

আসিলেন। বাহিরে আসিয়া হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-কে যখন উপরোক্ত রূপ প্রলাপোক্তি বলিতে শুনিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, চুপ থাক। কিন্তু শোকে একান্ত অভিভূত, বাহ্য-জ্ঞান বিরহিত, হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) সে কথার কোনও 'পরওয়া' করিলেন না। তদ্দর্শনে হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) তাঁহার নিকট হইতে একটু দূরে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন ; তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে একাকী রাখিয়া আসিয়া হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-কে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের সকলের হৃদয়ই তখন শোকে একান্ত অভিভূত। তাঁহাদের উপর যেন বজ্রাঘাত হইয়াছে ; কিংবা আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) 'হাম্‌দো' ও 'ছানাঃ' (আল্লহ্‌ তা-লার প্রশংসা ও রছুলের গুণ-কীর্ত্তন) করিয়া 'ফরমাইলেন'—হে উপস্থিত জন-মণ্ডলি ! (মোসলমান ভ্রাতৃগণ !)—যদি তোমরা হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর উপাসনা (পূজা) করিতে, তবে তিনি ত 'ফওত' হইয়া গিয়াছেন (দেহত্যাগ করিয়াছেন) ; আর যদি সর্ব্বশক্তিমান্‌ আল্লাহ তা-লার পূজা ('বন্দেগী'—উপাসনা) করিতে, তবে আল্লাহ্‌ তা-লা 'বেশক' (নিঃসন্দেহ) 'যেন্দা' (জীবিত) আছেন ; আর তাঁহার কখনও মৃত্যু হইবে না। অতঃপর তিনি কোরআন মজীদের যে আয়াতটী পাঠ করিলেন, তাহা এই :—" ওমা মোহাম্মাদান ইল্লা রছুল ক্বাদখালাৎ মিন্‌ ক্বাব লিহির রোছুলে আফা ইম্‌ মাতা আও ক্বোতেলান্‌ কালাবতুম আলা আকাবেকুম ওমা ইয়ান্‌ ক্বালেব আলা আকে বায়হে ফালাই ইয়া দোর রোল্লাহা শায়্‌আন ও ছায়াজ্‌ যিল্লা হোশ্‌ শাকেরীন।" ইহার মর্ম্মানুবাদ—" আর মোহাম্মদ (ছালঃ), (সৃষ্টিকর্ত্তা) আল্লাহ্‌ ছিল না, কিন্তু (তাঁহার রছুল) ছিল। তাহার পূর্ব্বে আরও (বহু) রছুল গত হইয়া গিয়াছে" এরূপ ক্ষেত্রে

যদি হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) মৃত্যু-মুখে পতিত হন, কিংবা (কাহার ও হস্তে) 'শহীদ' হন (মারা যান), তবে কি তোমরা আপনাদের পুরাতন অবস্থা কাফেরের দিকে ফিরিয়া যাইবে ? গেলে উহার দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা কোনও রূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। আর যাহারা ইস্লামে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে; আল্লাহ্ তা'লা, উহাদিগকে তাহার প্রতিদান (প্রতিফল) প্রদান করিবেন। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর মুখ হইতে এই পবিত্র আয়াত উচ্চারিত হইবামাত্র সমবেত জন-মণ্ডলী চমকিত হইয়া উঠিলেন—তাঁহারা যেন হঠাৎ সুপ্তোত্থিত হইলেন, তাঁহাদের যেন চৈতন্যোদয় হইল। হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) পরে বলিয়াছেন যে, আমি হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর পূর্ব্বকথিত বাক্যে কিছুমাত্র 'ভ্রুক্ষেপ' করি নাই—সেদিকে আমার মাত্রই মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু যখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন, সে সময় আমার বোধ হইল, এই আয়াত যেন এখনই 'নাযেল' (অবতীর্ণ) হইয়াছে। (আল্লাহর) ভয়ে আমার পদদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। তখন যেন আমার চমক ভাঙ্গিল;—আমি বুঝিতে পারিলাম, সত্য সত্যই আঁ হজরত (ছালঃ) এর 'এন্তেকাল' (মৃত্যু) হইয়াছে।

এখানে মছজেদ নববীতে এই সকল ব্যাপার ঘটিতেছিল, ঐ সময়েই সংবাদ আসিল যে, "ছকিফাঃ-বনু-ছায়েদাঃ" নামক স্থানে আন্ছারগণ সমবেত হইয়াছেন, এবং তাঁহারা হজরত ছায়াদ-বিন্-য়েবাদাঃ (রাজিঃ)-এর হস্তে বায়্য়েত করিতে (তাঁহাকে খলিফার পদে অভিষিক্ত করিতে) চান। আবার কোনও কোনও আন্ছার বলিতেছেন, "মনা আমীর ওয়া মন কোরেশ আমীর"—(আমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবেন, এবং কোরেশদিগের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবেন)। এই সংবাদ শুনিবামাত্র হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর

ফারুক (রাজিঃ) ও হজরত আবু-ওবায়দাঃ-বিন্-জার্‌রাহ্ (রাজিঃ)—আর একদল প্রধান প্রধান মহাজেরিন (রাজিঃ) এই 'না-মোনাছের (অপ্রীতিকর) অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং 'রোখ্-থাম' (গতিরোধ) করণার্থ "ছকিফাঃ বনু-ছায়েদাঃ" অভিমুখে ধাবিত হইলেন। আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত আব্বাস (রাজিঃ) ও হজরত ওসামাঃ (রাজিঃ) এবং হজরত ফজল-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ)-কে, আঁ হজরত (ছাল)-এর 'ওছিয়ত' (অন্তিম-নির্দ্দেশ) অনুযায়ী, তাঁহার 'তজ্‌হিয্' ও 'তকফিন' (স্নান ও কাফনাদি শেষ অনুষ্ঠান) এর জন্য, হুজুর (ছালঃ)-এর গৃহে রাখিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর গোছল দেওয়ান আরম্ভ হইল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত আব্বাস (রাজিঃ) ও তাঁহার দুই পুত্র (হজরত ফজল-বিন্-আব্বাছ ও হজরত আবদুল্লা বিন্-আব্বাছ [রাজিঃ]) 'করওট' ফিরাইতে (পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করাইতে) ও গাত্র মার্জ্জনাদি করাইতে, আর হজরত ওসামাঃ (রাজিঃ) পানী ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। যখন গোছল দেওয়াইয়া তাঁহার 'তজহিয্' কার্য্য সমাধা করিলেন, তখন উপস্থিত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মধ্যে এই বলিয়া 'এখ্‌তেলাফ্' (মতভেদ) উপস্থিত হইল যে, তাঁহাকে কোথায় দফন (কবরস্থ) করা যায়। কেহ কেহ বলিতে ছিলেন, মছজেদেই তাঁহাকে দফন করা হউক; কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, তাঁহার গৃহ বা হুজরায় (অর্থাৎ হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাজি আল্লাহ আন্‌হার ঘরে—যে স্থানে তিনি এন্তেকাল ফরমাইয়াছিলেন) ই হুজুর (ছালঃ)-এর দফন কার্য্য সমাধা করা হউক। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) "ছকিফাঃ বনি-ছায়েদাঃ" হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমি হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর মুখে শুনিয়াছি, প্রত্যেক নবী (রছুল—পয়গম্বর)-কে ঐ স্থানে দফন করা হইয়াছে—যেস্থানে তাঁহারা 'এন্তেকাল' (দেহত্যাগ) করিয়াছেন।

উপস্থিত ছাহাবাঃ গণ এই কথা শুনিবামাত্র হুজুর (ছালঃ)-এর সেই শয্যা তুলিয়া দিলেন যে শয্যায় তিনি শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ঐ স্থানে কবর খনন করা আরম্ভ হইল। 'বগলী' কবর (কবরের ভিতর হইতে পার্শ্ব দেশ খনন করিয়া শব সেই স্থানে রাখা হয়) 'খোদা' (খনন করা) হইয়াছিল। যখন কবর খনন কার্য্য সমাধা হইল, তখন জানাযার নমাজ পড়া আরম্ভ হইয়া গেল। প্রথমতঃ পুরুষগণ, পরে মহিলাগণ, অবশেষে বালকগণ জানাযার নমাজ আদায় করিলেন; কেহ কাহারও এমামতি করিলেন না। হুজুরের (ছালঃ) পীড়ার আধিক্য, পরে পরলোক গমন সংবাদ শ্রবণ মাত্র হজরত ওসামাঃ (রাজিঃ) ও তাঁহার বিশাল সেনাদল মদীনায় চলিয়া আসিয়াছিলেন; আর পবিত্র রণ-পতাকা আঁ হজরত (ছালঃ)-এর গৃহের দ্বারদেশে খাড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

জানাযার নমাজ হজরত আয়েশা ছিদ্দিকার (রাঃ—আঃ) হুজরায়—যেস্থানে আঁ হজরত (ছালঃ) 'এন্তেকাল ফরমাইয়া ছিলেন', সেই স্থানেই পড়া হইয়াছিল; এজন্য একবারে কিংবা দুই চারি বারে এই জানাযার নমাজ পড়া শেষ হয় নাই, বরং বহুবারে—বহু জমায়াতে জানাযার নমাজ পড়া হইয়াছিল। হুজরায় বেশী স্থান ছিল না; অথচ মদীনা তৈয়বায় তখন লোকসংখ্যাও বহু সহস্র ছিল; আর পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক প্রভৃতি সকলেই জানাযার নমাজ পড়িয়াছিলেন; সুতরাং কতবারে—কত সময় মধ্যে এই জানাযার নমাজ পড়ার কার্য্য সমাধা হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এই জানাযার নমাজ পড়ার কার্য্য পরদিন (মঙ্গলবার) পর্য্যন্ত জারী থাকা সম্পূর্ণ সম্ভবপর। কম পক্ষে ২৫ হাজার লোক জানাযার নমাজ পড়িলে, গড়ে ১০০ করিয়া লোক ২৫০ বারে কিংবা তাহার কিছু কম বা বেশী বারে এই জানাযার নমাজ আদায় করিয়া থাকিবেন। ৫ মিনিটে এক এক জমাত শেষ হইলেও কেবলমাত্র জানাযার নমাজ পড়িতে ১৫।১৬

ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবপর। সোমবার দিন বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় আঁ হজরত (ছালঃ) এন্তেকাল ফরমাইয়াছিলেন ; মঙ্গলবার ও প্রায় ঐরূপ সময়ে দফন কার্য্য সমাধা হয় ; সুতরাং এন্তেকাল করিবার ২৪ ঘণ্টা পরে দফন হওয়ার বিষয় বিশ্বস্ত ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে। হয় ত সোমবার দিবাগত রাত্রি হইতে মঙ্গলবার বেলা ৯৷১০টা পর্য্যন্ত লোক জানাযার নমাজ পড়িয়াছিলেন।

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর "হুলিয়া মবারক" অর্থাৎ আকৃতি এবং শারীরিক গঠন।

আঁ হজরত (ছালঃ) না 'তবিলল-কামৎ' (দীর্ঘাকার) না 'পস্ত্ কদ্' (খর্ব্বাকার—বেঁটে) ছিলেন ; তাঁহার কদ্ "মিয়ানা" (মধ্যমাকার) ছিল ; কিন্তু বিপুল জন-সঙ্ঘের মধ্যে দাঁড়াইলে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা 'বালা' (উচ্চ) বলিয়া বোধ হইত। শরীরের বর্ণ 'গন্দমী' (গোধূমের রং বিশিষ্ট), কিন্তু তাহা 'ছোরখী মায়েল' (লাল বর্ণ আভা বিশিষ্ট) এবং চাকচিক্যশালী ছিল। 'ছের-মবারক' (পবিত্র মস্তক) বৃহৎ এবং দাড়ি ঘন সন্নিবিষ্ট ও ভরপুর ছিল। কেশ রাজি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ—কিন্তু কিঞ্চিৎ 'পেঁচিদা' (তরঙ্গ বিশিষ্ট বা ঢেউ তোলা) ; অক্ষিদ্বয় গোলাকার, বৃহৎ, কৃষ্ণবর্ণ, 'পোর-রওনক্' (সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট) ছিল, এবং কেশগুচ্ছ কাণের 'লো' (নতি) পর্য্যন্ত বিরাজ করিত। কখন কখন স্কন্ধ দেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইত ; আবার কখনও বা কাণের 'নতি' (লতি) হইতে উপর পর্য্যন্তও থাকিত। ভ্রূদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত, একটী 'বারিক' (সরু) 'রগ্' (শিরা) উভয় ভ্রূর ঠিক মধ্যস্থলে দৃষ্ট হইত। আঁ হজরত (ছালঃ) যখন কিঞ্চিৎ ক্রোধাবিষ্ট

হইতেন, তখন এই শিরাটী সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। চক্ষের শ্বেতাংশের মধ্যে 'ছোর্‌খ্‌' (লালবর্ণ) ডোরা বিরাজিত ছিল। 'রোখে্‌ছারে' (গণ্ডদ্বয়) মাংসলও কোমল ছিল। মস্তকে তেল এবং চক্ষে 'ছোরমাঃ' (সুর্ম্মা) ব্যবহার করিতেন। দন্ত সমূহ মুক্তার ন্যায় 'ছফেদ', সাদ ও 'চমকদার' (চক্‌চকে—উজ্জ্বল) ছিল। মুচ্‌কি হাসি ব্যতীত তাঁহার পবিত্র মুখে উচ্চহাস্য কখনও প্রকটিত হইত না,—অর্থাৎ তিনি কখনও খল্‌ খল্‌ করিয়া হাসিতেন না। কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বদাই প্রসন্ন বদন (প্রফুল্ল আনন) দৃষ্ট হইত। হজুর (ছালঃ)-এর 'কালাম শিরিন' (বাক্য সুমধুর), এবং বক্তৃতা অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী ছিল। পক্ষান্তরে আদর্শ সাহসী আদর্শ বীর, আদর্শ রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ এবং সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণে বিভুষিত আদর্শ মনুষ্য ছিলেন। হজরত (ছালঃ)-এর উভয় শানের (পৃষ্ঠদেশস্থ বাহু-মুলের) ঠিক মধ্যস্থলে 'মোহর-নবুয়ত' বিরাজমান ছিল। তিনি নিজের কাজকর্ম্ম স্বহস্তেই সম্পাদন করিতেন; দাস-দাসী এবং শিষ্য-সেবক থাকিলেও, তাঁহাদিগকে নিজের কোনও কাজের জন্য 'হুকুম' (আদেশ) দিতেন না। তিনি কোনও প্রার্থীর 'ছওয়াল' (প্রার্থনা) 'রদ' করিতেন না (অপূর্ণ রাখিতেন না)। কোনও ভিক্ষা-প্রার্থী, তাঁহার নিকট হইতে কখনও রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায় নাই।

হজরত এব্‌রাহিম (যিনি মোস্‌লেম-মাতা-মারিয়া কব্‌তিয়া [রাঃ—আঃ]-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) ব্যতীত, আর সকল পুত্র কন্যাই মহামাননীয়া মোস্‌লেম মাতা হজরত খদিজাতুল কোব্‌রার (রা—আঃ) গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে হজরত কাছেম জন্মগ্রহণ করেন; চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি মক্কায়ই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'কুনিয়তে' " আবুল কাছেম " হইয়াছে। ইহার পর হজরত যয়নব (রাঃ—আঃ), তৎপর হজরত

আবদুল্লাহ্—যাঁহার 'লকব' (উপাধী) তৈয়ব ও তাহের ছিল—জন্মগ্রহণ করেন। হজরত আবদুল্লা অতি শৈশবেই প্রাণত্যাগ করেন। অতঃপর হজরত রকিয়া (রাঃ— আঃ) তৎপর হজরত ওম্মে-কুলছুম (রাঃ—আঃ) এবং সর্ব্বশেষে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ব্যতীত, হুজুর (ছালঃ)-এর আর সকল (হজরত এব্রাহিম ভিন্ন) সকল সন্তানই তাঁহার পয়গম্বরী লাভের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পুত্রগণ শৈশবেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন ; কিন্তু কন্যাগণ সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। সকলেরই শাদী (বিবাহ) হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠা হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ব্যতীত, আর কাহারও 'নছল' চলে নাই, অর্থাৎ আর কাহারও বংশ বর্ত্তমান থাকে নাই। হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরার (রাঃ—আঃ) গর্ভে ৩টী পুত্র-রত্ন ও ২টী কন্যা জন্মিয়াছিলেন ; কনিষ্ঠ পুত্র মহছেন শৈশবকালেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন ; প্রথম পুত্র হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ও দ্বিতীয় পুত্র হজরত এমাম হোছায়েন (রাজিঃ)-এর বংশধরগণই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর বংশ-তরু জীবিত রাখিয়াছেন। কারবালার ভীষণ সংগ্রামে এমাম বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত না হইলে, পবিত্র সৈয়দ বংশ পৃথিবীতে আরও অধিক পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিত। হজরত বড় এমাম ছাহেব (রাজিঃ) এর পুত্র সৈয়দ হাছান মোসন্না (রাজিঃ) ও কনিষ্ঠ এমাম (রাজিঃ) ছাহেবের পুত্র হজরত এমাম জয়নাল আবেদীন (রাজিঃ) হইতে জগতে, খাঁটি ছৈয়দের খান্দান চলিয়া আসিতেছে। আবার হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর অন্যান্য পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণের বংশধরগণ " উলভী ছৈয়দ " নামে জগতে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু এক্ষণে ছৈয়দদিগের " কুরছি নামার " অভাবে, অনেক খান্দানেরই প্রকৃত বংশ-পরিচয় পাওয়া যায়

না। সর্ব্ব শ্রেণীর মীরগণই আজকাল ছৈয়দ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকেন।

অ। হজরত (ছালঃ) সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর জীবন-চরিত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, তিনি মাতৃ-গর্ভেই 'এতিম' (পিতৃহীন) হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন 'এতিমি' (অনাথ) ও 'বেকছি' (নিরাশ্রয়) অবস্থায় আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যখন পরলোক গমন করেন, তখন সমগ্র আরবদেশের 'শাহান্‌শাহ্' (সম্রাট্) ছিলেন। আরবের এমন কোনও ছুবা, কোনও প্রদেশ এবং কোনও জনপদ এমন ছিল না, যেখানে তাঁহার 'দিন্নী হুকুমৎ' (ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রাধান্য বা ধর্ম্ম-বিষয়ক রাজত্ব) স্থাপিত হইয়াছিল না। আরবের শত শত বিভিন্ন জাতির মধ্যে এমন কোনও জাতি বা সম্প্রদায় ছিলেন না—যাঁহারা সেই সময় পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের স্নিগ্ধ শীতলচ্ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন না। উত্তরে সিরিয়া ও এরাকের সীমান্ত প্রদেশ হইতে দক্ষিণে আরব সাগর, আর পূর্ব্বে পারস্য ও ওমান উপসাগর হইতে পশ্চিমে 'বাহ্‌রে আছওয়াদ' (রেড্‌সী বা লোহিত সাগর) এবং মিছরের সীমান্ত-রেখা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ইস্‌লামের জয়ডঙ্কা বাজিয়াছিল—প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছিল; লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের আত্মা ইস্‌লামের সংস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। ইস্‌লামের পবিত্র জোতিঃতে উপরোক্ত বিশাল ভূভাগ সম্পূর্ণরূপে জ্যোতিষ্মাণ হইয়াছিল; এমন কি, লোহিত সাগর পার হইয়া আফ্রিকার আবিশিনিয়া বা হাবেশ রাজ্যেও ইস্‌লামের পবিত্র জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়াছিল।

আরব দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী (পৌত্তলিক, য়িহুদী, খৃষ্টীয়ান) ও বিভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া একটী মহাবল পরাক্রান্ত মহাজাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। যে আরব জাতি শত শত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ও শত শত বিভিন্ন শাখায় (উপজাতিতে) বিভক্ত ছিল ; তাঁহারা সকলে একমতাবলম্বী হইয়া ইস্‌লামের পবিত্র পতাকা-মূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আরবের সর্ব্বত্রেই পবিত্র 'তওহিদ' এর (একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের) জয় নিনাদ শ্রুত ও প্রাধান্য বিঘোষিত হইতে ছিল।

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর জীবনে এরূপ অদ্ভুত ও বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল সত্য ; একজন নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় পুরুষ কেবলমাত্র পরম করুণাময় আল্লাহ্ তালার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তাঁহারই আদেশ ও ইঙ্গিতক্রমে, সর্ব্ব প্রকার ভীষণ বিপদ আপদের সঙ্গে যুঝিয়া, জীবনের সায়াহ্নকালে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন ; নিতান্ত দীন-দরিদ্র ও অসহায় অবস্থা হইতে একজন মহাশক্তি শালী সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ; দীনি উন্নতির কথা—পয়গম্বরীর মহা গৌরবান্বিত পদ-মর্য্যাদার কথা ছাড়িয়া দিলেও, তিনি পার্থিব জীবনেও অসাধারণ এবং অতুলনীয় সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। একদিন যাঁহারা তাঁহার প্রাণবধ করিতে সমুৎসুক ছিলেন, দুনিয়া হইতে তাঁহার অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, আজ তাঁহারা একান্ত অনুগত, একান্ত আজ্ঞাবহ দাসের ন্যায় তাঁহার আদেশ পালনে তৎপরে হইয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) সৌভাগ্যের এরূপ উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াও অতি 'সাদা-সিদে' ভাবেই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। বিলাসিতা ও আড়ম্বর-প্রিয়তার নাম গন্ধ ও তাঁহার মধ্যে ছিল না। যবের মোটা রুটি ও খেজুর আহার এবং সাধারণ মোটা বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ পূর্ব্বক আল্লাহ্ তালার 'শোকর-গোজার' হইতেন। পরিবার বর্গের মধ্যেও

কোনও রূপ বিলাসিতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইত না। যে অর্থ তাঁহার হাতে আসিত, তাঁহার অধিকাংশই (প্রায় সমস্তই) দীন-দরিদ্রের দুঃখ-বিমোচনে পর্য্যবসিত হইত। বিপুল " বয়তুল-মাল " তহবিল হইতে তিনি অতি সামান্য মাত্র অংশ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গ্রহণ করিতেন, দান-খায়রাত করিয়া উহার অল্পমাত্র অংশ যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তদ্দ্বারাই কষ্টে-সৃষ্টে তাঁহার ও তদীয় পরিবারবর্গের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার পরিবারে লোক সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিলেন না ; কিন্তু তিনি সে অবস্থায় ও কখন আর্থিক অভাব অনুভব করেন নাই। " শোকর " ও " ছবর " তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষা—তাহাদের ইহকাল পরকালের মঙ্গল কামনা, মানুষকে সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ্ তা-লার আদেশ পালনে তৎপর করা ইত্যাদি কার্য্যেই তিনি বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন। 'তওহীদের' বাণী শুনাইতে তিনি দুনিয়ায় আসিয়াছিলেন ; সেই বাণী তিনি বজ্র-নির্ঘোষে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এবং স্বীয় জীবনেই তাহা সাফল্য-মণ্ডিত দেখিয়া গিয়াছেন—যাহা অপর কোনও পয়গম্বরের ভাগ্যে ঘটে নাই। প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সহীহ্-বোখারীতে বর্ণিত আছে, মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ফরমাইয়াছেন, আঁ হজরত (ছালঃ) কখনও 'দুনিয়াবী' (পার্থিব—সাংসারিক) কাজ কর্ম্মে অন্যের উপর আপনার 'ফজিলত' দেন নাই—অর্থাৎ ক্রীতদাস, ভৃত্য বা অনুগত শিষ্য-সেবকগণ তাঁহার ব্যক্তিগত কাজ কর্ম্ম করিয়া দিতে বাধ্য, একথা তিনি কখনও মনে স্থান দান করেন নাই। বরং তোমরা যেমন নিজ নিজ গৃহে আপনাপন কাজ কর্ম্ম স্বহস্তে সম্পাদন কর, তিনিও ঠিক সেইরূপই করিতেন। তিনি নিজেই নিজের 'বকরী' (ছাগী) গুলির দুগ্ধ দোহন করিতেন, আর নিজের 'নালাইন' (পাদুকা—জুতা) নিজেই সেলাই করিয়া লইতেন। মদীনা-মনুওরায় যখন মছজেদ নির্ম্মিত হইতেছিল, সেই সময় তিনি মছজেদ-নির্মাণ

সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। এমন কি, 'মামুলী' (সাধারণ) 'মজুর' (কুলি) দিগের ন্যায় তিনিও ইষ্টকগুলি বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। 'জঙ্গ আখরাব'এ (খন্দক অর্থাৎ পরিখার যুদ্ধে) তিনিও পরিখা খননকারীদের সঙ্গে মিলিয়া পরিখা খনন কার্য্য সম্পাদন করিয়া ছিলেন। ঐ কার্য্যে তিনি নিজে মাটী উঠাইতেন, এবং প্রস্তর ভগ্ন করিতেন। তাঁহার খাদ্য সাধারণ যও (যব)-এর রুটি ছিল। তাঁহার গৃহে আটা চালিবার জন্য চালুনী পর্য্যন্ত ছিল না; ফুৎকার দিয়া আটার ভুষি উড়াইয়া দেওয়া হইত। কখনও কখনও ক্রমাগত ২।৩ দিন পর্য্যন্ত এই জও এর রুটি ও তাঁহার এবং তদীয় পরিবার বর্গের পেট ভরিয়া মিলিত না। এমনও অনেক সময় গিয়াছে, একমাস পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে উনান জ্বলে নাই। কেবলমাত্র পানীও গৃহে অল্প বিস্তর খেজুর যাহা 'মওজুদ' থাকিত, তদ্দ্বারাই জঠরানল নির্ব্বাপিত করিতেন। ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ-আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার গৃহে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর কিসের বিছানা ছিল? তিনি বলিলেন, উধুরির বিছানা হইত—যাহার ভিতর খেজুরের ছাল পরিপূর্ণ থাকিত। এই প্রশ্ন হজরত হাফ্‌সা (রাঃ—আঃ) কেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল; তিনি ফরমাইয়াছিলেন, একখানি টাটের (চটের) টুকরা ছিল, যাহা আমি তাঁহার জন্য দুই ভাঁজ করিয়া লইতাম। একরাত্রে আমি মনে করিলাম, উহা যদি চার ভাঁজ করিয়া দি, তাহা হইলে তিনি শুইয়া একটু আরাম পাইবেন। তদনুসারে চটখানি ৪ ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দেওয়া হইল। যখন 'ছোবেহ' (রাত্রি প্রভাত) হইল, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি গত রাত্রে আমার জন্য কি বিছাইয়া দিয়াছিলে? আমি বলিলাম, আপনার সেই চটখানিই ছিল, কেবলমাত্র উহা ২ ভাঁজ স্থলে ৪ ভাঁজ করিয়া দিয়াছিলাম; উদ্দেশ্য, যাহাতে আপনি শুইয়া একটু আরাম পান। হুজুর (ছালঃ)

ফরমাইলেন—না, উহার যেমন দুই ভাঁজ ছিল, তুমি তাহাই করিয়া দাও; ৪ ভাঁজ করার দরুণ উহা আমাকে রাত্রির নমাজ (শেষ-রাত্রির উপাসনা—সম্ভবতঃ তাহাজ্জদের নমাজ) হইতে 'বায্' রাখিয়াছে (বাধা জন্মাইয়াছে)—অর্থাৎ চটখানি ৪ ভাঁজ করাতে আরামে নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, এজন্য শেষ রাত্রির উপাসনার জন্য যথা সময়ে জাগরিত হইতে পারিয়াছিলেন না। 'ওফাতের' (পরলোক গমনের) পূর্ব্বে তিনি ফরমাইয়াছিলেন, আমার 'ওরছা' (উত্তরাধিকারী) দিগকে 'তরকা' (উত্তরাধিকারী-সূত্রে ত্যজ্য বিষয় প্রাপ্ত) তে নগদ যেন কিছু দেওয়া না হয়। এক য়িহুদীর নিকট তাঁহার 'যরাঃ' (বর্ম্ম) ত্রিশ দরহমে বন্ধক ছিল; হুজুর (ছালঃ)-এর নিকট এ পরিমাণ নগদ টাকা ছিল না যে, সেই বন্ধকী বর্ম্মটী টাকা দিয়া ছাড়াইয়া লইতে পারেন। আঁ হজরত (ছালঃ) 'তরকার' (ত্যজ্য-সম্পত্তির) মধ্যে স্বীয় হাতিয়ার (যুদ্ধাস্ত্র), একটী 'খচ্চর' (অশ্বতর) ও অল্প পরিমাণ 'যমিন' (ভূ-সম্পত্তি—সম্ভবতঃ 'বাগে-ফদক') মাত্র ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। উহার সম্বন্ধে ও 'ওছিয়ত' (অন্তিম নির্দ্দেশ) করিয়া গিয়াছিলেন যে, (ভূ-সম্পত্তি ব্যতীত) ঐ সকল জিনিষ 'খায়রাত' করিয়া দিও। ফলতঃ তিনি পার্থিব ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন নাই, এবং উহাতে একেবারেই লিপ্ত হন নাই। হজরত আনস্ (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন আমি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন আমার বয়স ৮ বৎসর মাত্র ছিল। তৎপরে দশ বৎসর কাল বরাবর হুজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে 'হাজের' (উপস্থিত) ছিলাম। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি আমাকে স্বীয় পরিচর্য্যা সম্বন্ধে কখন একটী কথাও বলেন নাই, কিংবা ইহাও বলেন নাই যে, তুমি এই কার্য্য কেন করিলে, বা এই কার্য্য কেন করিলে না? সারা জীবনে তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে কোনও 'ফোশ্-কালাম' (অশ্লীল বাক্য) বা অন্যায় অসঙ্গত কথা

প্রকাশ পায় নাই। প্রসিদ্ধ হাদীসবিদ পণ্ডিত হজরত আবু-হোরেরাঃ (রাজিঃ) ফরমাইয়াছেন, এক সময় লোকেরা হুজুর (ছালঃ)-কে বলিলেন, আপনি 'মোশ্‌রেকীন' (অংশীবাদী—পৌত্তলিক) দিগের জন্য আল্লাহ্‌ তোলার দরবারে 'বদ-দোওয়া' (অভিসম্পাত) করুন। তাঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি 'লায়নত' (অভিসম্পাত) করিবার জন্য আসি নাই; বরং আল্লাহ্‌ তালা আমাকে 'রহমত' (দয়া-প্রদর্শন) জন্য পাঠাইয়াছেন। হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ফরমাইয়াছেন, তাঁ হজরত (ছালঃ) এর 'তবিয়তে' 'বেহুদগী' (বৃথা কার্য্য-কলাপের প্রবৃত্তি) এবং 'লগোয়িয়ত' (মিথ্যা কথা-বার্ত্তার অস্তিত্ব) আদৌ ছিল না। জীবনে তিনি এ সকল কখনও করেন নাই। তিনি যে কোনও 'বাচ্চা' (ছোট ছোট বালক বালিকা)-কে স্নেহের সহিত স্বীয় ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেন, এবং তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতেন। রোগীদিগের 'খবরগিরী' (তথ্য গ্রহণ) জন্য তিনি শহরের দূরবর্ত্তী মহাল্লা সমূহে ও গমন করিতেন—সাধ্যানুসারে রোগীদিগের ঔষধ-পথ্যাদির যোগাড় করিয়া দিতেন; তাহাদিগকে সাহস ও সান্ত্বনা প্রদান করিতেন, তাঁহাদিগকে পরম করুণাময় খোদা তালার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি যাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে যাইতেন, প্রথমেই তাঁহাকে 'ছালাম' (অভিবাদন) করিতেন। এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই যে, তাঁহার সঙ্গে কেহ 'মোছাফাঃ' (করমর্দ্দন) করিয়াছেন, আর সেই ব্যক্তি হস্ত পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, তিনি নিজের হাত 'খিঁচিয়া' (টানিয়া) লইয়াছেন; অর্থাৎ 'মোছাফাঃ'কারী ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত হুজুর (ছালঃ)-এর হাত না ছাড়িতেন, সে পর্য্যন্ত তিনি স্বীয় হস্ত ছাড়াইয়া লইতেন না। হুজুর (ছালঃ) সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় 'ছাহাবাঃ' (শিষ্য) দিগের নাম সাধারণ ভাবে উচ্চারণ করিতেন না; বরং কোনও 'কুনিয়েত' (উপাধি) দ্বারা সম্বোধন করিতেন।

আর 'মোহাব্বত-আমেয্' (স্নেহভাব-ব্যঞ্জক) 'পছন্দিদাঃ' (মনঃপূত) নাম দ্বারা তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেন। হুজুর (ছালঃ) কাহারও 'কেতায়ে-কালাম' (কথা বলিবার সময় তাঁহার [কথকের] কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে নিজে কথা বলা বা তাঁহার কথার স্রোত বন্ধ করা) করিতেন না। 'আল্‌বত্তা' (অবশ্য) যদি কেহ 'নাযেবাঃ (অন্যায়—অসঙ্গত) কথা বলিত, তবে তাহাকে ঐরূপ কথা বলিতে নিষেধ করিতেন; কিংবা এই জন্য দণ্ডায়মান হইতেন—যাহাতে ঐ ব্যক্তি নিজেই বাক্যস্রোত বন্ধ করে। হজরত আবদুল্লা-বিন্-হারেছ (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি কোনও ব্যক্তিকেই হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) হইতে (বা তাঁহার ন্যায়) 'যেয়াদাঃ খোশ-খল্‌ক' (অধিকতর নম্র গুণ বিশিষ্ট) দেখি নাই। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর উক্তি এই যে, ঐ ব্যক্তি 'পাহালওয়ান' (মল্ল বা বীরপুরুষ নহে)—যে ব্যক্তি লোককে 'পাছড়ায়' (ভূপাতিত করে)—বরং 'পাহালওয়ান' (মল্ল বা কুস্তিগীর) ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি 'গোশ্বার' (ক্রোধের) সময় স্বীয় 'নফ্‌ছ্' এর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে। হজরত আনছ (রাজিঃ) এর একটী বর্ণনা এই যে, হুজুর (ছালঃ) 'আসজয়ন্নাছ' ছিলেন। একেবারের একটী ঘটনা এই যে, একদা মদীনা বাসিগণ একাএক বিষম ঘাব্‌রাইয়া উঠিলেন—যেমন কোনও 'দোস্মণ' (শত্রু) দল অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এইরূপ একটা 'শোর-গোল' উঠিল। নগরের অধিবাসিগণ যে দিক্ হইতে 'শোর-গোল' উঠিতেছিল, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই দিকে ধাবিত হইলেন; পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, আঁ হজরত (ছালঃ) সেই দিক্ হইতে চলিয়া আসিতেছেন। হুজুর (ছালঃ) 'শোর-গোল' শুনিবামাত্র অশ্বের খালি পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক ঐ দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ভয়-ত্রস্ত লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা ঘাব্‌রাইও না, কোনও আশঙ্কা বা ভয়ের কারণ নাই।

বরা-বিন্-আযবের বয়ান এই যে, হোনায়নের যুদ্ধের দিন রাত্রিকালে অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া মোছলমানগণ পলায়ন করিতেছিলেন ; ঐ সময় আঁ হজরত (ছালঃ) এই 'রজয্' পড়িতেছিলেন " আনা আন্-নবী লা কব্র আনা এব্নে আবদুল মোত্তালেব।" ঐ দিবস আঁ হজরত (ছালঃ) অপেক্ষা 'যেয়াদাঃ' (শ্রেষ্ঠ) বাহাদুর ও 'শোযাঃ' (অসাধারণ বীরপুরুষ) আর কাহাকেও দৃষ্ট হয় নাই। যখন যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছিল, ভীষণভাবে শোণিতপাত হইতেছিল, বহু লোক হত এবং আহত হইতেছিল, তখন আমরা হুজুর (ছালঃ)-এর 'পানাঃ (আশ্রয়) অনুসন্ধান করিতেছিলাম। আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ তাঁহাকেই মনে করা হইতেছিল—এই ভীষণ সঙ্কট কালে যিনি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'বরাবর' (নিকটে) স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন। হজরত আনছ (রাজিঃ) 'বয়ান' করিয়াছেন, একদা আমি হুজুর (ছালঃ)-এর 'হামরেকাব' (পাশাপাশি) যাইতেছিলাম, তখন একখানি মোটা কেনার (পুরু-পাড়) ওয়ালা চাদর তাঁহার গায় ছিল। একজন 'বদবী' (বদ্দু—যাযাবর) অকস্মাৎ তাঁহার সেই চাদরের কেনার (এক প্রান্ত) ধরিয়া এমন জোরে ঝট্কা (হেঁচকা টান) দিল যে, চাদরের সেই মোটা কেনারের রগ্ড়ানীতে (ঘর্ষণ বা ঘসায়), 'হুজুর' (ছালঃ)-এর 'গরদানে' (ঘাড়ে) দাগ বসিয়া গেল। তিনি যখন তাহার দিকে 'মতওজ্জ' হইলেন (তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন), তখন সে বলিল, হে (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) ! আল্লার যে মাল তোমার নিকট আছে, আমার উষ্ট্র দুইটীর উপর ও তাহার কিয়দংশ 'লাদ' (তুলিয়া দাও)। কেননা, ঐ মাল হইতে তুমি আমাকে যাহা দিবে, তাহা তোমার কিংবা আমার বাপের মাল নহে। এইরূপ অশিষ্ট জনক রূঢ় বাক্য শুনিয়া তিনি প্রথমে স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমা গুণে চুপ হইয়া থাকিলেন ; একটু পরে ঐ বদবীকে লক্ষ্য

করিয়া বলিলেন, 'বেশক' (নিঃসন্দেহ) মাল ত খোদারই বটে, আমি তাঁহার বান্দাঃ ; কিন্তু তুমি আমাকে একথা বলিয়া দাও যে, তুমি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলে, আমিও কি তোমার সঙ্গে ঐরূপ ব্যবহার করিব ? সে বলিল, না, তা নয়। হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, তা নয় কেন ? সে বলিল, তুমি 'বুরাইর' (মন্দের) পরিবর্ত্তে মন্দ করনা। এই কথা শুনিয়া তিনি মৃচ্‌কি হাসি হাসিয়া বলিলেন, উহার এক উষ্ট্রে জও (যব) আর এক উষ্ট্রে খেজুর বোঝাই করিয়া দাও। একদা যয়দ বিন্ ছয়নাঃ নামক য়িহুদী (ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে) আঁ হজরত (ছালঃ) এর নিকট তাঁহার কর্জ্জা টাকার (যাহা হুজুর [ছালঃ] ধার লইয়া ছিলেন), 'তাকাদার' জন্য আসিল,—সে বড়ই 'বক্‌বক্' করিতে লাগিল, এবং অবশেষে বলিল, তোমরা—বনি আবদুল মোত্তালেব বড়ই 'নাদেহেন্দাঃ' (ঋণ শোধ করিতে অপারক বা অনিচ্ছুক), এবং 'ওয়াদার খেলাফ্'কারী (প্রতিশ্রুতি পালনে অনভ্যস্ত)। উহার এইরূপ অশিষ্ট পূর্ণ বাক্য আঁ হজরত (ছালঃ) ত নীরবে শুনিতে ছিলেন ; কিন্তু হজরত ওমর (রাজিঃ) তাহা সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, তিনি য়িহুদী যয়েদকে ধমক দিয়া ঐরূপ অশিষ্টাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন ; তখন আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত ওমর (রাজিঃ)-কে বলিলেন, হে ওমর ! তুমি আমাদের উভয়ের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কর নাই, যাহা করা তোমার পক্ষে উচিত ছিল ; তোমার কর্ত্তব্য এই ছিল যে, তুমি উহাকে 'ঝড়ক' (ধমক) না দিয়া বরং শিষ্টতা ও নম্রতার সহিত 'তাকাজা' করিতে উপদেশ প্রদান করিতে, আর আমাকে স্বীয় 'ওয়াদা' (প্রতিশ্রুতি) অনুসারে ঋণ শোধ করিতে বলিতে। অতঃপর হুজুর (ছালঃ) আদেশ করিলেন, উহার কর্জ্জা টাকা আদায় করিয়া দাও। আর উহার 'ঝড়্‌কানীর' (ঝিবুকি দেওয়া ও কট্‌-কাটব্য বলার) দরুণ আর ২০ ছায় (১।০/

ঋণ) জব প্রদান কর—যদিও কর্জ্জ পরিশোধের সময় মধ্যে এখনও ৩ দিন বাকী আছে। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ঈদৃশ ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, নম্রতা, শিষ্টতা, সৌজন্য ও ক্ষমা গুণের এই ফল হইল যে, সেই য়িহুদী তৎক্ষণাৎ পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। আবু ছয়ীদ খোদরী (রাজিঃ) ফরমাইয়াছেন যে, একদা কতিপয় আন্‌ছার, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হুজুরে কোনও জিনিষের প্রার্থনা করিলে; তিনি তাঁহাদিগকে উহা প্রদান করিলেন; তাঁহারা আরও চাহিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে আরও প্রদান করিলেন। তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায়, হুজুর (ছালঃ)-এর নিকট যাহা ছিল, তাহা সমস্তই দিয়া ফেলিলেন। তৎপর তিনি ফরমাইলেন, আমার নিকট যাহা কিছু আইসে, তাহা তোমাদিগকে না দিয়া আমার ঘরে জমা করিয়া রাখি না। একথা নিঃসন্দেহ যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই প্রার্থনা করে—আমাকে 'ছওয়াল' (ভিক্ষা—প্রার্থনা) হইতে বাঁচাও, তিনি (আল্লাহ্ তা'লা) ঐ ব্যক্তিকে ভিক্ষা রূপ 'যেল্লত' (অপমান—অপদস্থতা) হইতে বাঁচাইয়া লয়েন; আর যে ব্যক্তি ধনী হইতে চায়, আল্লাহ্ তা'লা তাহাকে 'গণী' (ধনবান্—অর্থশালী) করিয়া দেন। যে ব্যক্তি 'ছবর' (ধৈর্য্য—অল্পে সন্তুষ্ট) 'এখ্‌তেয়ার' (অবলম্বন) করে, আল্লাহ্ তাহাকে 'ছাবের' (ধৈর্য্যশীল—অল্পে সন্তুষ্ট) করিয়া দেন। হজরত আবু হোরেরা (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আঁ হজরত (ছালঃ) বারংবার ফরমাইয়াছেন যে, যদি আমার নিকট " ওহদ " পাহাড়ের সমান সোণা হয়, তবুও আমাকে ঐ সময় 'খুশি' (আনন্দ লাভ) হইবে যে, ৩ দিন গত হইবার পূর্ব্বেই উহা সকলের মধ্যে 'তক্‌ছিম' (ভাগ—বণ্টন) করিয়া দিতে পারি! আর আমার নিকট ঐ পরিমাণ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, যাহা কেবল আমার ঋণ পরিশোধার্থ আবশ্যক। অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটিয়াছে, যখন আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তে কিছুই থাকিত না; অথচ

যদি কোনও লোক আসিয়া ভিক্ষা চাহিত, তখন তিনি ঋণ গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। আর তাঁহার ধার কর্জ্জ যাহা হইত, তাহা ঐ দানাদি কার্য্যের জন্যই হইত। জাবের-বিন্-আবদুল্লা (রাজিঃ) বলিয়াছেন, আমি এক 'গেয্ওয়ায়' (ধর্ম্মযুদ্ধে) আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম, প্রত্যাবর্ত্তন কালে আমার উষ্ট্র একটু অবসন্ন হইয়া পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছিল। এমন সময় আঁ হজরত (ছালঃ) সেখানে আসিয়া পঁহুছিলেন; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জাবের! বল তোমার কি অবস্থা? আমি আরজ করিলাম, হুজুর! আমার উট 'থকিয়া' গিয়াছে (অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে); তচ্ছ্রবণে তিনি আমার উষ্ট্রকে এক 'তছমা' (চর্ম্ম-রজ্জু) মারিবামাত্র উষ্ট্র দ্রুতগতি চলিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর আমরা পরস্পর বাক্যালাপ করিতে করিতে চলিলাম। কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, জাবের! তুমি তোমার এই উটটি কি বিক্রয় করিবে? আমি বলিলাম, হাঁ হুজুর, বিক্রয় করিব। তখন তিনি উচিত মূল্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দানে আমার উষ্ট্রটী ক্রয় করিলেন, পরে তিনি আমার অগ্রেই চলিয়া গেলেন; আমি একটু বেলা হইলে মদীনায় পঁহুছিলাম; মছজেদ-নববীতে গিয়া দেখিলাম, হুজুর (ছালঃ) উষ্ট্রটী মছজেদের 'দরওয়াযায়' (দ্বারদেশে) বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, জাবের তুমি উটটী ছাড়িয়া যাও, এবং মছজেদে আসিয়া দুই 'রাকায়াত' নমাজ পড়। তদনুসারে আমি যখন নমাজ পড়িয়া অবসর হইলাম, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) বেলাল (রাজিঃ)-কে বলিলেন, জাবেরের ঐ উষ্ট্রটীর মূল্য আদায় করিয়া দাও। আমি যখন উষ্ট্রের মূল্য লইয়া যাইতে লাগিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকিলেন; আমি মনে করিলাম, আমাকে বুঝি উষ্ট্রটী ফেরত দিয়া উহার মূল্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আমি যখন হুজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি ফরমাইলেন, তুমি

উষ্ট্রীও লইয়া যাও। আর যে মূল্য তোমাকে দেওয়া হইয়াছে, উহা তোমারই হইয়াছে; উষ্ট্রীও তুমি গ্রহণ কর। একদা তিনি কোথাও আরণ্য প্রদেশে (জঙ্গলে) গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আর একজন লোক ছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) 'যমিন' খুদিয়া (মৃত্তিকা খনন করিয়া) দুইখানি 'মেছওয়াক' (দাঁতন) টানিয়া বাহির করিলেন; তন্মধ্যে একখানি 'সিধা' (সোজা) ও একখানি 'টেড়্হী' (বক্র—বাঁকা) ছিল। হুজুর (ছালঃ) বাঁকা (বক্র) দাঁতন খানি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, এবং সোজা খানি সঙ্গীয় লোককে দিলেন। সেই লোক আরজ করিলেন, হুজুর এই সোজা মেছওয়াক খানি আপনি গ্রহণ করুন। কিন্তু আঁ হজরত (ছালঃ) তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না; আর তিনি ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি কাহারও 'ছহবতে' (সঙ্গে—সংসর্গে) থাকে,—সেই ছহবত 'ঘড়িভর' (এক দণ্ড কাল)-এর জন্যই হউক না কেন? কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হইবে, 'ছহবতের' (একত্র থাকার) হক্ পালন করিয়াছ কিনা?

হজরত আবদুল্লা এব্‌নে আব্বাছ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন য়িহুদীও বশর নামক একজন মোনাফেক মোসলমানের মধ্যে কোনও বিষয় লইয়া কিছু ঝগড়া ছিল; তাহারা উভয়ে বিচার-প্রার্থী হইয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল। হুজুর (ছালঃ) উভয়ের 'যবানবন্দী' গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া, য়িহুদীকে 'হক্-বজানেব' (ন্যায় পথাবলম্বী) পাইলেন, তদনুসারে য়িহুদীর অনুকূলেই বিচার-মীমাংসা করিলেন। য়িহুদীর পক্ষে ডিক্রি দেওয়াতে মোনাফেক মোছলমান বশর এই বিচারে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। যখন উভয়ে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর বিচারালয় হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন বশর য়িহুদীকে বলিল, এ ফয়ছলাঃ ঠিক হয় নাই। চল আমরা হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর নিকট যাই। য়িহুদী তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে, উভয়ে

হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর নিকট গমন করিল। য়িহুদী সেখানে পঁহুছিয়াই হজরত ওমর (রাজিঃ)-কে বলিল, আমরা উভয়ে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট বিচার-প্রার্থী হইয়া গমন করিয়াছিলাম, তিনি আমার অনুকূলে 'ফয়ছলা ছাদের' (বিচার-ফলের 'হুকুম' প্রচার) করিয়াছেন। কিন্তু এ ব্যক্তি সে 'ফয়ছলা' মানে না, আর আপনার নিকট (পুনর্ব্বিচারের জন্য) আমাকে লইয়া আসিয়াছে। উহার উদ্দেশ্য, আপনি যে বিচার-মীমাংসা করিবেন, তাহাই মানিয়া লইবে। হজরত ওমর (রাজিঃ) বশরকে জিজ্ঞাসা করাতে সেও বলিল, হাঁ, এ ব্যক্তি (উক্ত য়িহুদী) সত্যই বলিতেছে। আমরা উভয়ে বিচার-প্রার্থী হইয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সমীপে গিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তাঁহার ফয়ছলার উপর আপনার ফয়ছলার 'তরজিহ্' দিতেছি (প্রাধান্য স্বীকার করিতেছি) ; তচ্ছ্রবণে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) বলিলেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই ইহার বিচার-মীমাংসা করিয়া দিতেছি। এই কথা বলিয়া তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ; আর তরবারি আনয়ন পূর্ব্বক মোনাফেক বশরের 'গর্দ্দান' উড়াইয়া দিলেন (মুণ্ডপাত করিলেন)। তৎপর বলিলেন, যে ব্যক্তি মোছলমান হইয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুলের 'ফয়ছলা' না মানে, আমি তাহার ফয়ছলা এইরূপেই করিয়া থাকি। ইহাতে বশরের সঙ্গীয় মোনাফেক গণ মহা 'শোর-গোল' উপস্থিত করিল ; কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'লা ওহি দ্বারা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর কার্য্যের অনুমোদন করিলেন ; আর ঐ দিন হইতেই তিনি "ফারুক" উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

মক্কা-বিজয়ের পরের একটী ঘটনা এই :—ফাতেমাঃ-বিন্-আল্-আছুদ নাম্নী বনি-মখ্‌যুমের একটী স্ত্রীলোক চুরির অভিযোগে ধৃত হয়। বিচারে তাহার দোষ প্রমাণিত হইলে, আঁ হজরত (ছালঃ) শরিয়তের বিধানানুযায়ী

তাহার হাত কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। শরীফ্ কোরেশগণের পক্ষে এই আদেশ বড়ই 'নাগওয়ার' (অপ্রীতিকর—আপত্তি জনক) বোধ হইল। তাহারা ইচ্ছা করিল যে, 'ছোফারেশ' (অনুরোধ) করিয়া স্ত্রী-লোকটীকে হাত কাটার শাস্তি হইতে মুক্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট এ বিষয়ের অনুরোধ করিতে তাহাদের সাহসে কুলাইল না। অবশেষে হজরত ওছামাঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ)-কে বলিয়া কহিয়া ছোফারেশ করাইতে বাধ্য করিলেন; তদনুসারে ওছামাঃ (রাজিঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া, স্ত্রীলোকটীকে হাত কাটার কঠোর শাস্তি হইতে মুক্তি প্রদান জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধ বাক্য শুনিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) বলিলেন, হে ওছামাঃ, তুমি আল্লাহ্ তা-লার নির্দ্দেশিত শাস্তি প্রদান কার্য্যে দখল দিতেছ (নির্দ্দিষ্ট শাস্তি যাহাতে করা না হয়, তজ্জন্য 'ছোফারেশ করিতেছ)? তৎপর তিনি দণ্ডায়মান হইয়া উপস্থিত জন-মণ্ডলীর সম্মুখে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিলেন, ঐ বক্তৃতার স্থুল মর্ম্ম এই:——'আয় লোগো'! (হে লোক সকল!) তোমাদের পুর্ব্ববর্ত্তী জাতি সকল (কিয়ৎ পরিমাণে), এই কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে যে, যখন উহাদের মধ্যে কোনও উচ্চ বংশীয় লোক চুরির অভিযোগে ধৃত হইত, লোকেরা বড় লোক বলিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিত; আর যখন কোনও গরীব—দুর্ব্বল লোক চুরি করিত, তখন উহাকে শাস্ত প্রদান করিত। খোদা সাক্ষী, যদি ফাতেমাঃ বিন্তে-মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম) চুরি করিত, তবে 'এন্নিনান্' (নিশ্চয়ই) আমি তাহারও হাত কাটিয়া ফেলিতাম।"

এক সময় আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, তোমরা আমার প্রশংসায় 'যেয়াদাঃ' (অধিক) 'মোবালেগাঃ' (অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি) করিও না—যেমন নাছারা (ঈছায়ী বা খৃষ্টীয়ান) গণ (হজরত) ঈছা বিন্-মরিয়ম

(আলা)-কে সীমাতীত রূপ বাড়াইয়াছে। আমি ত আল্লাহর বান্দাঃ দিগের মধ্যে একজন ; এজন্য আমাকে আবদুল্লাহ্ ও রছুলোল্লাহ (ছালঃ) বলিবে। একদা তিনি অন্তঃপুর বা 'হুজরা' হইতে বাহিরে আগমন করাতে, উপস্থিত ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ সকলেই 'তায়াজিমান' (সম্মান-প্রদর্শনার্থে) দণ্ডায়মান হইলেন, ইহাতে আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, যেমন 'আজমী' (পারস্য বা আরবের বহিঃস্থ দেশের অধিবাসী)-গণ একজন অপর জনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান হয়, সেইরূপ আমাকে দেখিয়া তোমাদের দণ্ডায়মান হওয়া উচিত নহে (শফা কাজী আয়াজী)। আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেন ; আর 'মজলেছে' (সভায়) যেখানে 'জায়গা' (স্থান) পাইতেন, সেই স্থানেই বসিয়া যাইতেন। তিনি 'চাকর-নওকর' দিগের সঙ্গে কাজ কর্ম্মে 'শরীক' হইয়া যাইতেন ; এবং তাহাদিগকে আপনার নিকটে বসাই-তেন। 'বারহা' (পুনঃ পুনঃ—অনেকবার) এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যে, কোনও লোক য়িহুদী মহাজনের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন ; আর য়িহুদীর কড়া তাকাদায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাঁহারা আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট আসিয়াছেন, ; যদি তাঁহার নিকট টাকা-কড়ি কিছু থাকিত, তবে তিনি নিজেই তাঁহার দেনা শোধ করিয়া দিতেন ; যদি হুজুর (ছালঃ)-এর হস্তে কিছু না থাকিত, তবে স্বয়ং য়িহুদী মহাজনের নিকট গমন পূর্ব্বক, উহাকে আরও কিছু সময় দিতে (কিছু দিন অপেক্ষা করিতে) অনুরোধ করিতেন ; যদি য়িহুদী সে অনুরোধ পালন করিত, তবে ত কোন কথাই ছিল না, অন্যথা হুজুর (ছালঃ) অন্য কোনও স্থান হইতে যোগাড় করিয়া বা ধার করিয়া ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত করিয়া দিতেন। কোনও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিই তাঁহার নিকট হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যান নাই।

আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, ক্ষুধার্ত্ত ও 'মিছকিন' অর্তি

দরিদ্র) লোকদিগের সাহায্যার্থ যাহারা 'কোশেশ্' (চেষ্টা) করে, তাহারা "মজাহেদ ফি ছবিলিল্লাহ্", "কায়েমল-লায়েল" এবং "দায়েমল্লাহার" এর 'বরাবর' (সমান) 'দর্জাঃ' লাভ করে।

একদা এক ব্যক্তি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, 'এয়া রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)! 'জন্নত' (বেহেশ্ত্—মোছলেম-স্বর্গ) লাভের উপায় কি? তদুত্তরে হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, 'ছদ্কে্' (সত্যবাদিতা), কেননা, মানুষ যখন সত্যবাদী হয়, তখন 'নেকী' (পুণ্যানুষ্ঠান) করিয়া থাকে। আর মানুষ যখন পুণ্যানুষ্ঠান করে, তখন তাহার মধ্যে 'নূরে ইমান' (ধর্ম্মের জ্যোতিঃ) উৎপন্ন হয়; (সেই লোক) 'ইমানদার' (ধার্ম্মিক) হয়, তখন সে 'জন্নতের' (বেহেশ্ত্ বা মোছলেম-স্বর্গের) অধিকারী হইয়া থাকে। আর এক 'মওকায়' (স্থলে—বিশেষ ঘটনায়) তিনি ফরমাইয়াছিলেন, 'খবরদার! তোমরা 'ছাচ্চা' (সত্যবাদী) থাক—সেই সত্যবাদিতার জন্য তোমাদের প্রাণের আশঙ্কাই হউক না কেন? কারণ, 'বেলা শোবাহ্' (নিঃসন্দেহ) 'নাজাত' (মুক্তি) উহাতেই আছে।

মক্কা হইতে বদরে আগমন কালে (বদরের যুদ্ধ-যাত্রায়) পথিমধ্যে আখ্নছ-বিন্-শরিক্, আবুজহলকে বলিল, হে আবুল হকম! আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। এস্থানে তুমিও আমি ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি কেহই উপস্থিত নাই যে, আমাদের কথোপকথন শুনিবে। তুমি আমাকে সত্য করিয়া বল ত (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) 'ছাচ্চা' (সত্যবাদী) না 'ঝুটা' (মিথ্যাবাদী)? উত্তরে আবুজহল বলিল 'ও আল্লাহ্' (আল্লার কছম—আল্লার শপথ) 'বেশক' (নিঃসন্দেহ) (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) সর্ব্বদাই সত্য কথা বলিয়া থাকেন; আর তিনি কখনও 'গলৎ-বয়ানী' (মিথ্যা কথা) বলেন নাই। আঁ হজরত (ছালঃ) এর অমন ভীষণ ও

চিরশত্রু আবুজহল ও তাঁহার সত্যবাদিতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

হজরত আবু ছয়ীদ খদরি (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আঁ হজরত (ছালঃ) 'শরীফ' (সম্ভ্রান্ত) 'পরদা নিশিন' (পর্দ্দা-প্রথা পালন কারিণী—অবরোধ বাসিনী) কুমারী বালিকা হইতেও অধিক 'হায়াদার' (সলজ্জ ভাব সম্পন্ন—শরমেন্দাঃ—লজ্জাশীল) ছিলেন। আর যখন কাহারও কোন কথা তাঁহার 'না-পছন্দ' (অমনোনীত—মত-বিরুদ্ধ) হইত, আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার 'চেহেরাঃ' (বদন মণ্ডল) দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিতাম। যদি হুজুর (ছালঃ)-কে কাহারও কোন কথা ভাল বোধ না হইত, তবে 'এশারা-কেনায়ায়' (ইঙ্গিত ক্রমে) উহা তাহার গোচরীভূত করিতেন,—যেন সে ব্যক্তি লজ্জিত ও অপ্রস্তুত না হয় ; কিন্তু 'কালাম এলাহী' (আল্লাহ্ তা-লার বাক্য, ও 'আলা কালামাতুল হক্কে' তিনি কাহারও 'রেয়ায়েত' (ক্ষমা) করিতেন না। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে অসঙ্কুচিত চিত্তে—স্পষ্ট ভাবে—গুরু-গম্ভীর ভাষায় সে অন্যায় ও অসঙ্গত বাক্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন।

ওম্মোল-মুমেন্নিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ফরমাইয়াছেন, আঁ হজরত (ছালঃ) যদি কাহারও 'না-পছন্দিদাঃ' (অমনোনীত—মত-বিরুদ্ধ) কার্য্যের বিষয় জানিতে পারিতেন, তবে তিনি তাহার নাম লইয়া 'তখ্ছিছ্' এর সঙ্গে (নাম উল্লেখ করিয়া বা অন্যে বুঝিতে পারে যে অমুক লোককে এই কথা বলিয়াছেন) এরূপ কোন কথা ফরমাইতেন না, (বলিতেন না) ; বরং এইরূপ বলিতেন, ঐ ব্যক্তি কেমন মানুষ যে এমন কথা বলে ? আঁ হজরত (ছালঃ) অধিকাংশ সময় 'খামুশ' (নীরব) থাকিতেন ; আর বিনা প্রয়োজনে কোনও কথা বলিতেন না। হুজুর (ছালঃ)-এর কথা 'ছাফ্' (পরিষ্কার—প্রকাশ্য) ছিল ; কথা এত 'লম্বা-চওড়া' হইত না, যাহাতে নিরর্থক বাজে কথা থাকিতে পারে, এবং লোকের কিছুমাত্র

ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে ; কিংবা এমন সংক্ষিপ্ত হইত না, যাহাতে প্রয়োজনীয় কথার কিয়দংশ থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা, বা সে কথার অর্থবোধে বা মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে লোকের অসুবিধা হইতে পারে।

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'চাল' (গমনাগমন) 'ময়তদল' (মধ্যম রকম) ছিল ; না তিনি খুব দ্রুতগতি চলিতেন—যাহাতে সঙ্গীয় লোকদিগের পক্ষে অসুবিধা হয় ; না এমন ধীর-মন্থর গতিতে চলিতেন, যাহাতে অলসতাও দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। এক এক সময় তিনি 'খোশ-তবয়ী' (আমোদ-জনক) বাক্য ও 'ফরমাইতেন'। উদাহরণ :—একদা তিনি এক ব্যক্তিকে একটী উষ্ট্র দিতে চাহিয়াছিলেন ; যখন সেই ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উষ্ট্র লইতে আসিলেন, তখন 'হুজুর' (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি তোমাকে একটী উষ্ট্রীর 'বাচ্চাঃ' (ছানা—শাবক) দিতেছি। এই কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি বলিলেন, হুজুর ! আমি উষ্ট্রের শাবক দিয়া কি করিব ? আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, উষ্ট্রীর বাচ্চা উট হয় না ত কিসের বাচ্চা উট হয় ? হুজুর (ছালঃ) 'খোশ-তবয়ী' প্রভাবে (নির্দ্দোষ পরিহাসচ্ছলে) উটকে উট্‌নীর বাচ্চাঃ বলিয়াছিলেন। উষ্ট্র-প্রার্থী মনে করিয়াছিলেন, উষ্ট্রীর বাচ্চা অর্থে উটের অল্প বয়স্ক ছানা আমাকে প্রদানে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। হুজুর (ছালঃ) নির্দ্দোষ পরিহাস করিলেও তাহা সত্যতা-বর্জ্জিত হইত না। সত্যতা ও 'রাস্তি' ব্যতীত তিনি ভুল বা মিথ্যা কথা কখনও বলিতেন না। ব্যায়াম-চর্চ্চায় তিনি উৎসাহ দিতেন। বীরত্ব-ব্যঞ্জক অনুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। তিনি যখন শিষ্য-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া বসি-তেন, তখন সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এমন ভাবে থাকিতেন যে, নবাগত কোনও লোক তাঁহাকে সহজে চিনিতে পারিত না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইত, আপনাদের মধ্যে 'নবী' (রছুল—পয়গম্বর) কে ? যে জিনিষ খাইলে মুখে দুর্গন্ধ হয় (যথা—কাঁচা পেঁয়ায্‌), উহা তিনি

'পছন্দ' করিতেন না। তিনি 'পয়ওন্দ' (তালি দেওয়া) কাপড় পরিধান করিতেন, কিন্তু ভাল কাপড় পাইলে তাহারও সদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। উহা নিজে কখনও পরিধান করিতেন, কখনও বা পরিবার বর্গের মধ্যে বিলি করিয়া দিতেন। আর যদি কোনও গরীব লোক আসিয়া প্রার্থনা করিত, তাহাকে তৎক্ষণাৎ উহা প্রদান করিতেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'লেবাছ' (পরিচ্ছদ) আড়ম্বর শূন্য—সম্পূর্ণ সাদা-সিদে রকমের হইলেও, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল।

আঁ হজরত (ছালঃ) দিবা রাত্রির মধ্যে কয়েকবার 'মেছওয়াক' (দাঁতন) করিয়া দন্ত পরিষ্কার করিতেন। প্রত্যেক বার অজু করিবার সময়ই দাঁতন করার অভ্যাস ছিল। 'গোছল' (স্নান)-এর সময় যে মেছওয়াক করিতেন, সে কথা ত বলাই বাহুল্য। যে সকল ছাহাবাঃ (রাজিঃ) সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে উঠা-বসা করিতেন, তাঁহাদের উক্তিতে প্রকাশ, হুজুর (ছালঃ)-এর শরীর, পোষাক ও মুখ হইতে কখনও কোন রূপ গন্ধ বাহির বাহির হয় নাই। যে স্থলে 'আফু' (ক্ষমা) প্রদর্শন করিলে সুফল ফলিত, সে স্থলে তিনি ক্ষমা করিতেন; কিন্তু যে ক্ষেত্রে 'ছাযা' (শাস্তি) দেওয়ার প্রয়োজন হইত, সে স্থলে অপরাধীকে শরিয়ত অনুযায়ী শাস্তিই প্রদান করিতেন। কারণ, যে সকল লোক মন্দ চরিত্রের ছিল, তাহাদিগকে উপযুক্ত রূপ শাস্তি প্রদান না করিলে অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইত। মোছলমানদিগের 'খয়রাত' (দান কার্য্য) কেবল মোছলমানদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া ছিলেন না—য়িহুদী, খৃষ্টীয়ান, 'বোত-পরস্ত' (পৌত্তলিক) প্রভৃতি সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী লোককেই দান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যত বড় ভীষণ বিপদই হউক না কেন, তিনি তাহাতে অণুমাত্রও বিচলিত হইতেন না। অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে অকাতরে—নির্ভয়ে সেই বিপদের সম্মুখীন হইতেন। কিন্তু অন্যের বিপদ দেখিলে তিনি 'বে-চয়েন' (অস্থির—

বিচলিত) হইয়া পড়িতেন। তিনি 'আছবাব' হইতে 'কাম' (কাজ) লইতেন এবং উহার 'নতিজাঃ' (ফলাফল) খোদার উপর ছাড়িয়া দিতেন—অর্থাৎ আল্লাহ্ তালার প্রতিই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। কার্য্যের ফল, আশাও ইচ্ছার বিপরীত হইলেও 'ঘাব্ড়াইতেন না' (বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ-চিত্ত হইতেন না)। তাঁহার মধ্যে 'হয়বত' (ভীতি-ব্যঞ্জকতা) ছিল, কিন্তু কঠোরতা ছিল না ; 'ছাখাওয়াত' (দানশীলতা) ছিল, কিন্তু 'এছরাফ্' (অপব্যয়িতা) ছিল না। যে ব্যক্তি হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িত, সে 'হয়বত্-যদাঃ' (আতঙ্কিত—ভীত) হইয়া যাইত, কিন্তু সেই লোকই যখন তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিত (বাক্যালাপ করিত), তখন 'ফেদারী' (পরম ভক্ত বা তাঁহার জন্য জীবনোৎসর্গকারী) হইয়া যাইত। 'এম্রায্' (ব্যাধি সমূহ) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 'তন্দোরস্ত' (সুস্থকায়—স্বাস্থ্য-সম্পদ সম্পন্ন) থাকিবার নিমিত্ত লোকদিগকে 'হোসিয়ার' (সতর্ক) করিতেন। আর 'নাদান' (মূর্খ) 'তবিবের' (চিকিৎসকের) দ্বারা রোগের চিকিৎসা করাইতে নিষেধ করিতেন। হারাম জিনিষ ঔষধ রূপে ব্যবহার করিতেও 'না-পছন্দ' করিতেন। যখন কোন 'মোয়ামেলায়' (বৈষয়িক ব্যাপারে—পার্থিব কার্য্যে) দুই 'ছুরত' (দুই প্রকার অবস্থা) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইত, সেরূপ ক্ষেত্রে যে পন্থা সহজ, তাহাই তিনি অবলম্বন করিতেন। 'আছিরানে জঙ্গ্' (যুদ্ধে বন্দী—সামরিক কয়েদী) দিগের 'খবরগিরী' (তত্ত্বাবধান)—'মেহমান' (অতিথি) দিগের ন্যায় যত্নে করাইতেন। 'তীর-আন্দাযী', লক্ষ্য ভেদ, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি বীরত্ব-ব্যঞ্জক ব্যাপারে ও 'শরীক' হইতেন (যোগদান করিতেন)।

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর কার্য্য-কলাপ, ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াই এই গ্রন্থের উপসংহার করিলাম। হে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তালা ! হে অদ্বিতীয় দয়ার সাগর ! তুমি তোমার এই দীন-হীন অধম

দাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, তাহার দুর্ব্বল লেখনী-প্রসূত, তোমার প্রিয় নবী—প্রিয় বন্ধু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশেষ পয়গম্বর আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এই ক্ষুদ্র জীবনীখানি 'কবুল' (গ্রহণ) কর। আর হুজুর (ছালঃ)-এর পবিত্র চরণ-তরীর আশ্রয় প্রদানে, তোমার অতি দীন-হীন অধম বান্দাকে মুক্তি পথের পান্থ কর। সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সমস্ত মোছলমানের প্রতি 'রহমৎ-বারি' বর্ষণ কর, এবং তাঁহাদের 'দীনি' ও 'দুনিয়াবী' সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধন কর—তাহাদের ইহকাল এবং পরকালের সর্ব্বপ্রকার সুপথ পরিষ্কার কারিয়া দাও। আমিন—ছুম্মা আমিন ! !

দ্বিতীয় ভাগ।

হজরত আলী মরতুজা
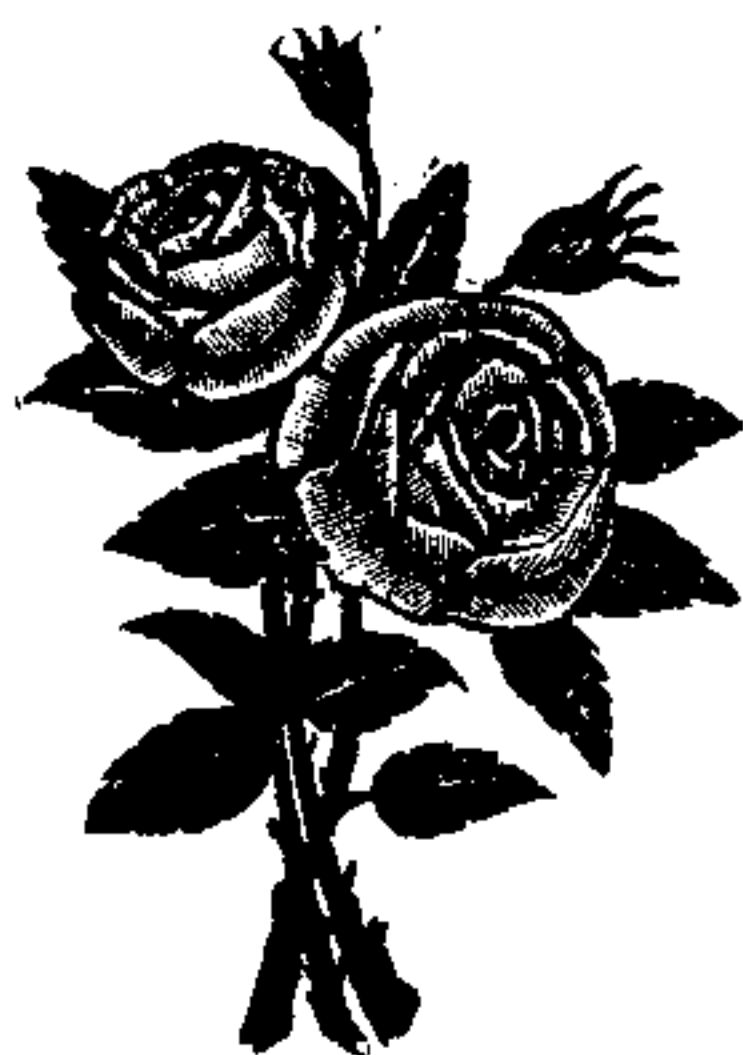
(কঃ ওঃ) এর জীবন চরিত।

সর্ব্বশক্তিমান্ পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা য়ালা স্বীয় অপার মহিমা বলে, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এক অতুলনীয় ও অনির্ব্বচনীয় পবিত্র নূরের (জ্যোতির) সৃষ্টি করেন। সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আদিম, কিন্তু অনাদি নহে। এই পবিত্র নূর হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, উল্কা-পিণ্ড, ধুমকেতু, আর্শ, কুরছি, লওহ্-কলম, বেহেশ্ত্, দোজখ, পৃথিবী, পৃথিবীস্থ সাগর-মহাসাগর, পর্ব্বত, নদ-নদী, মরুভূমি, বন-জঙ্গল, এবং সর্ব্ব-প্রকার জীব জন্তু ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর ইচ্ছাময় আল্লাহ্ তা-লা মানব জাতি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া, আদি পুরুষ বা মানব জাতির আদি পিতা হজরত আদম (আলাঃ) এবং মানব জাতির আদি মাতা হজরত হাওয়া কে সৃজন করেন। প্রস্তুমতঃ তাঁহাদিগকে জন্নতে (বেহেশ্তে) রাখিয়া-ছিলেন, পরে তাহারা শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ্ তা-লার নিষিদ্ধ গন্দম খাইয়া স্বর্গভ্রষ্ট এবং পৃথিবীতে নিপতিত হন। হজরত আদম (আলাঃ) 'ছরন্দীপে' (সিংহল, সিলন বা লঙ্কাদ্বীপে) এবং হজরত মা হাওয়া আরব দেশে পতিত হইয়াছিলেন। হজরত আদম (আলাঃ), আল্লাহ্ তা-লার আদেশ অমান্য করিয়া, নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ এবং তজ্জন্য স্বর্গভ্রষ্ট হন, এবং

স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইয়া বহুকাল 'তওবা' (অনুতাপ) করেন। অবশেষে আরবের হেজাজ প্রদেশে উভয়ে সম্মিলিত হন, কালক্রমে তাঁহাদের বহু সন্তান-সন্ততি জন্মে। ঐ সময়ের ইতিহাস অত্যন্ত অস্পষ্ট। তওরাত গ্রন্থে ইহা অনেক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিল গ্রন্থ য়িহুদী এবং খৃষ্টীয়ান দিগের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হওয়াতে, আসল ও নকলের পার্থক্য করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, হজরত আদম (আলাঃ) একজন পয়গম্বর ছিলেন। তিনি যেমন আদি পুরুষ (প্রথম মানব), তেমনই প্রথম পয়গম্বর। তিনি একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম-প্রচার করেন। তাঁহার পুত্র হজরত শিশ্ (আলাঃ) একজন শ্রেষ্ঠতমঃ পয়গম্বর ছিলেন। বহুপুরুষ পরে হজরত নুহ্ (আলাঃ) একজন শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হন; তাঁহার সময়ে মানব জাতি পৌত্তলিকতা ও নানাপ্রকার ভীষণ পাপাচারে লিপ্ত হওয়াতে, আল্লাহ্ তা-লা মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাজল-প্লাবন দ্বারা পৃথিবীর মনুষ্যাদি জীব জন্তু সমস্ত ধ্বংস করেন। কেবল আল্লাহ তা-লার আদেশে হজরত নূহঃ (আলাঃ) এক প্রকাণ্ড জাহাজ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে খোদা তা-লার ভক্ত ও আদেশ-পালক (এছলাম ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ একেশ্বরবাদী) কতিপয় মানুষ ও সর্ব্বপ্রকার জীব জন্তুর এক এক জোড়া সঙ্গে লইয়া তাহাতে আরোহণ করেন। তৎপর এই ভীষণ জল-প্লাবনে সমগ্র পৃথিবী—এমন কি বড় বড় পাহাড় পর্ব্বত পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। মনুষ্যাদি সমস্ত জীব জন্তু সেই মহাজলপ্লাবনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে পানী শুকাইয়া যায়, জাহাজ খানি রক্ষা পাইয়া উহাতে অবস্থিত মনুষ্য এবং জীব জন্তু দ্বারা আবার ক্রমশঃ পৃথিবী পরিপূর্ণ হইতে থাকে। এই ঘটনার পরেও মনুষ্যেরা একমাত্র অদ্বিতীয় খোদা তা-লার অস্তিত্ব ও উপাসনা-আরাধনা ভুলিয়া কল্পিত দেব দেবী এবং মানুষ বা পশুপক্ষীর উপাসনা-আরাধনা আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে বহু পয়গম্বরের—

আবির্ভাব হইলেও, মানুষের 'গোমরাহী' (সত্যপথ-ভ্রষ্টতা) দূর হয় না। 'দুনিয়া' আবার অনাচার ও পাপাচারে পরিপূর্ণ হয়। মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হইতেই দেখা গিয়াছে যে, পৌত্তলিকতার দিকে তাহারা অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। অসার আমোদ-প্রমোদ, আরাম-'আয়েশ', নানাপ্রকার অসৎ কার্য্য ও অসদনুষ্ঠানের দিকেই মানুষের মন প্রধানতঃ গড়াইয়া পড়ে। সহস্র সহস্র পয়গম্বর (নবী—রছুল—প্রেরিত মহাপুরুষ), প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও মানুষকে একমাত্র খোদা তা-লার অস্তিত্ব স্বীকারে বা তাঁহার এবাদৎ-বন্দেগীতে বাধ্য করিতে পারেন নাই। অতি অল্পসংখ্যক লোকের হৃদয়ই 'তওহিদের' পুত রশ্মিতে আলোকিত হইয়াছিল। অবশেষে আল্লাহ্ তা-লা একজন মহা-শক্তিশালী পয়গম্বর (আলাঃ) কে 'তওহিদ' প্রচারের জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। তাঁহার নাম হজরত এব্রাহিম (আলাঃ)। তিনি "খলিলুল্লাহ্" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় বেবিলন (বাবুল) সাম্রাজ্যের পূর্ণ প্রতাপ। বেবিলনের সম্রাট্ নমরুদ (কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে কায়াণী বংশীয় কায়-কাউদসই নমরু্) একজন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ ছিল, সে স্বয়ং খোদাই দাবী, এবং প্রজাদিগকে তাহার পূজা করিতে বাধ্য করিত। হজরত এব্রাহিম (আলাঃ) যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া 'তওহিদের'—একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদের ঘোষণা করিতে লাগিলেন, তখন এই খোদা-দ্রোহী সম্রাট্ তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। অবশেষে তাঁহাকে জ্বলন্ত অনল-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। পরম করুণাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ তা-লা তাঁহাকে সেই ভীষণ অগ্নির মধ্য হইতে আশ্চর্য্য রূপে রক্ষা করিলেন। অবশেষে খোদা তা-লার 'গযবে' নমরুদের বিনাশ সাধন হইল। হজরত এব্রাহিম (আলাঃ) প্যালেষ্টাইন, কেনয়ান প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক মেছের দেশে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কেন-

স্থানে আসিলেন—দুইটী বিবাহ করিলেন। প্রথমা স্ত্রী হজরত ছারার গর্ভে প্রথমে কোন সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন না; দ্বিতীয় পত্নী হজরত হাজেরার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম ইছ্‌মাইল (আলাঃ)। হজরত ছারার ইচ্ছানুসারে, এবং আল্লাহ্‌ তা-লার আদেশে সপুত্র বিবী হাজেরাকে তিনি মরুময় আরব দেশের হেজাজ প্রদেশে বর্ত্তমান সময়ে মক্কা নগর যে স্থানে অবস্থিত,—নির্ব্বাসিত করিতে বাধ্য হন। ইহার পর হজরত ছারার গর্ভে ও তাঁহার অতি বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্র-রত্ন জন্মগ্রহণ করেন; ইহার নাম এছহাক (আলাঃ) রাখা হয়। এই নবীর বংশই কালক্রমে 'বনি ইস্রাইল" নামে অভিহিত হইয়াছিল। হজরত এছ্‌হাক (আলাঃ)-এর পুত্র হজরত ইয়াকুব (আলাঃ), তাঁহার পুত্র হজরত ইউছক্‌ (আলাঃ) মেছের দেশে রাজত্ব লাভ করেন। ইহার পর মেছেরের ফেরাউন বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং তাহারা বনি-এস্রাইলের প্রতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে। ইহারই এক ফেরাউন খোদা-দ্রোহী হইয়া নিজে খোদাই দাবী করে। এই সময় আল্লাহ্‌ তা-লা বনি-এছরাইলের মধ্যে মহাশক্তিশালী পয়গম্বর হজরত মুছা (আলাঃ)-কে আবির্ভূত করেন; তাঁহার ভ্রাতা হারুণ (আলাঃ) ও পয়গম্বর ছিলেন। হজরত মুছা (আলাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্‌ তা-লা জল্লশানহু 'তওরাত' গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। ইহাই আছমানী প্রধান কেতাব চতুষ্টয়ের প্রথম কেতাব। এই বনি-এছরাইলের মধ্যে (এছরাইল বংশে) অসংখ্য নবী আবির্ভূত হইয়া, ক্রমাগত তওহিদের মহাবাণী ঘোষণা করেন। তন্মধ্যে হজরত দাউদ (আলাঃ) একজন প্রধান পয়গম্বর। তাঁহার নিকট জব্বুর গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়—ইহা আছমানী দ্বিতীয় কেতাব। হজরত দাউদ (আলাঃ)-এর পুত্র হজরত ছোলেমান (আলাঃ) একজন বিশ্ব-বিশ্রুত দিগ্বিজয়ী সম্রাট্‌ ও পয়গম্বর ছিলেন; তিনিও প্রাণপণে তওহিদের বাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

অবশেষে এই বংশে হজরত ঈছা-মছীহ্ (আলাঃ) জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার নিকট "ইঞ্জিল" গ্রন্থ নাজেল হয়; ইহা আছমানী তৃতীয় কেতাব। ইনি এছরাইল বংশের শেষ পয়গম্বর। হজরত এছমাইল (আলাঃ)-এর বংশে ইতিপূর্ব্বে কোনও পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু এই বংশে এমন এক নবী (পয়গম্বর—তত্ত্ববাহক—রছুল) শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিলেন যে, যাঁহার তুলনা নাই। তাঁহার পবিত্র নাম হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্মদ মোজতবা (ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম)। তিনি দুনিয়াতে তওহিদের যে বিজয় ডঙ্কা বাজাইয়া গিয়াছেন, কেয়ামত পর্য্যন্ত তাহা 'জারী' থাকিবে। পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষাধিক পয়গম্বর (আলাঃ) যাহা করিতে পারেন নাই—তওহিদের (একেশ্বরবাদিত্বের পূতবাণী:অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হন নাই; আঁ হজরত (ছালঃ) ও তাহার মহাশক্তিশালী শিষ্য মণ্ডলী তাহা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থধারী প্রধান পয়গম্বরগণের প্রতি অবতারিত গ্রন্থ সমূহ ঐ মতাবলম্বী লোকেরা পরিবর্ত্তিত, পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত এবং বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে—সুতরাং খাঁটি একখানিও তওরাত, জব্বুর ও ইঞ্জিল পৃথিবীতে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। পরবর্ত্তী কালের য়িহুদীও ঈছায়ী পণ্ডিতগণ স্ব স্ব বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে উহা বাড়াইয়া ও ঘাটাইয়া সম্পূর্ণ বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন; সুতরাং ঐ দুইটী কেতাবী (গ্রন্থধারী) জাতির মধ্যেও একেশ্বরবাদিতার পূর্ণ অস্তিত্ব খুজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রায় ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বে জনাব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্মদ মোজ্তবা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম আবির্ভূত হইয়া তওহিদের যে পবিত্র বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আজ দুনিয়ার ৪০ কোটি মনুষ্য তাহা উচ্চারণ ও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক আত্মা-চরিতার্থ করিতেছেন। তওহিদের—একেশ্বরবাদিতার প্রবল স্রোত পৃথিবীতে সজোরে প্রবাহিত হইতেছে। আর আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি পবিত্র গ্রন্থ "কোরআন মজীদ"—

"কোরকান হামিদ" অবতীর্ণ হইয়াছিল, এই চৌদ্দ শত বৎসরের মধ্যে তাহার একটী শব্দ, একটী অক্ষর, এমন কি—একটী 'যের-যবর' ও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আবার লক্ষ লক্ষ হাফেজ উহা এমন বিশুদ্ধ ভাবে কণ্ঠস্থ (মুখস্থ) করিয়া রাখিয়াছেন যে, কোনও ঘটনায় দুনিয়ার লিখিত বা মুদ্রিত সমুদয় কোরআন পাক নষ্ট হইয়া গেলেও, উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না। লক্ষ লক্ষ হাফেজ দ্বারা তাহা আবার অবিকল ভাবে বর্ণিত ও লিখিত হইতে পারিবে। স্বয়ং খোদা তা-লা কোরআন শরীফের 'মহাফেজ' (সংরক্ষক)। এছলাম যে সত্য ধর্ম্ম, ইহা তাহার একটী জাজ্জ্বল্যমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কোরআনের এক একটী শব্দ কোটি কোটি কোহেনুর অপেক্ষা মূল্যবান্। কোরআনের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য ও এছলাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শনে আজ ইউরোপ ও আমেরিকার শত শত উচ্চ শিক্ষিত খৃষ্টীয়ানও নাস্তিক এই পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন। মোছলমানদিগের মধ্যে নিয়মিত প্রচার কার্য্য নাই। খৃষ্টীয়ান পাদরীদিগের দ্বারা কোটি কোটি টাকা মূলধন, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্যয় হইলেও, তদ্দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিতেছে না; লক্ষ লক্ষ পাদ্রী যেমন নানাদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন; মোছলমানদিগের মধ্যে কোন ব্যবস্থা তাহার শতাংশের একাংশও নাই; অথচ সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের কোটি কোটি পৌত্তলিক ও জড়োপাসক অধিবাসী দলে দলে এছলামের পবিত্র ছায়াতলে আগমন করিতেছেন। সুবিশাল চীন সাম্রাজ্যে ও জাপানে পর্য্যন্ত দিন দিন এছলাম ধর্ম্ম আশাতীত রূপে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

এই এছলামের বাণী যিনি সর্ব্বশেষে—সকল নবীর পরে ঘোষণা করিয়া সর্ব্বতোভাবে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছেন, পাক-পাঞ্জতন প্রথম ভাগে তাঁহার জীবনী লিখিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় ভাগে তাঁহার সুযোগ্য পিতৃব্যপুত্র ও জামাতা, প্রথম এছলাম ধর্ম্ম গ্রহণকারীদিগের

মধ্যে অন্যতম প্রধান পুরুষ, ৪র্থ খোলফায়ে রাশেদিন, জগতের অদ্বিতীয় বীরপুরুষ এবং তাপস অর্থাৎ সাধক ছুফী (দরবেশ) দলের প্রধান পথ-প্রদর্শক হজরত আলী মরতুজা করমুল্লাহ ওয়াজহুর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করা হইল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হজরত এব্রাহিম (আলাঃ) স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত এছমাইল (আলাঃ)-কে, তাঁহার জননী বিবী হজরত হাজেরার সঙ্গে আরবের বর্ত্তমান পবিত্র নগরী মক্কা যেখানে অবস্থিত, ঐ স্থানে নির্ব্বাসিত করিয়া ছিলেন। কালক্রমে জম্জম্ কূপের নিকটে লোকের বসবাস হইতে লাগিল; এবং খোদা তা'লার আদেশে পিতা-পুত্র মিলিয়া এই স্থানে একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা-লার উপাসনার জন্য কাবা-গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন; এই স্থানেই হজরত এছমাইল (আলাঃ) এর বংশ-তরু রোপিত হয়। মক্কা একটী সুন্দর নগর রূপে গড়িয়া উঠে।

হজরত আদম (আলাঃ) হইতে হজরত এবরাহিম খলিলোল্লাহ্ পর্য্যন্ত অধঃস্তন ১৮ পুরুষ ধরা হয়। হজরত এছমাইল (আলাঃ) পর্য্যন্ত ১৯ পুরুষ। তাঁহার পুত্র কেদর। হজরত আদম (আলাঃ) হইতে অধঃস্তন ৭৮ পুরুষ, এবং হজরত এছমাইল যবিহোল্লাহ্ (আলাঃ) হইতে ৬৯ পুরুষ নিম্নে ফহর (ফেহের) বা কোরেশ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইতে মক্কার কোরেশ বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখান হইতে নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ৮৫ তম অধঃস্তন পুরুষে আব্দে মনাফ্ জন্মগ্রহণ করেন। এখান হইতে আবার দুইটী শাখা বাহির হয়, আব্দে মনাফের পুত্র হাশেম হইতে " বনি-হাশেম " এর উৎপত্তি। আর আব্দে মনাফের দ্বিতীয় পুত্র আবদছ্ ছমদ বা আব্দে শমছ; তাঁহার পুত্র ওম্মিয়া হইতে বনি-ওম্মিয়া বা ওম্মিয়া বংশের সৃষ্টি। হাশেমের পুত্র (হজরত আদম [আলাঃ] হইতে ৮৭ তম অধঃস্তন পুরুষ) আবদুল মোত্তালেব।

আবদুল মোত্তালেবের বহুসংখ্যক পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে আবুতালেব, মহাত্মা আবদুল্লা, হজরত আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত হামজা (রাজিঃ) বিশেষ রূপে প্রসিদ্ধ। আর অন্যতম পুত্র কাট্টা কাফের আবুলাহাব নবী-বিদ্বেষের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কোরআনের তাব্বাৎ এদা ছুরায় ইহার বিষয় বর্ণিত আছে।

হজরত আদম (আলাঃ) হইতে ৮৮তম অধঃস্তন পুরুষে মহাত্মা আবদুল্লা ও আবুতালেব। মহাত্মা আবদুল্লার ঔরসে (৮৯তম অধঃস্তন পুরুষে) হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত রছুলে আকরম হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্‌মদ মোজতাবা (ছালঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে ৮৮তম অধঃস্তন পুরুষ আবু-তালেব হইতে ৮৯ তম নিম্নতম পুরুষে হজরত আলী মরতুজা করমুল্লাহ-ওয়াজহু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত মহাজ্যোতিঃ হজরত আদম (আলাঃ) হইতে পুরুষ পরম্পরায় মহাত্মা আবদুল্লার ললাটে স্থাপিত হয়; হজরত রছুল করিম (ছালঃ) সেই পবিত্র জ্যোতির পূর্ণ বিকাশ মাত্র।

হজরত আলী মরতুজার (কঃ—ওঃ)

জন্মকথা।

হজরত আলী মরতুজা (কঃ—ওঃ)-এর 'ওয়ালেদ মাজেদ' (পিতা) আবুতালেব, ইহা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। আর তাঁহার মাতা হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) বিন্তে-আসদ বিন্-হাশেম-বিন্-আব্‌দে মনাফ্। হাশেম বংশীয়া মহিলাদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম—যিনি খাঁটি হাশেমী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ইঁহার সন্তানগণের পিতৃ ও মাতৃ উভয় কুলই হাশেমী ছিলেন। এই গৌরবান্বিতা মহিলা মক্কায় জন্মগ্রহণ ও মদীনায়

পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ৪র্থ হিজরীতে, ৭০ বৎসর বয়সে ইনি মদীনা-তৈয়বায়ই পরলোক গমন করেন; মৃত্যুকালে ইহার ৩ পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন, ১। হজরত ওয়াকিল (রাজিঃ), ২। হজরত জাফর তইয়্যার (রাজিঃ), ৩। হজরত আলী মরতুজা করমুল্লাহ্ ওয়াজহু। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তালেব, কোরেশদিগের সঙ্গী হইয়া বদরের যুদ্ধে আসিয়াছিল, সে সেই যুদ্ধেই মারা পড়ে।

আবুতালেবের প্রকৃত নাম আব্‌দে মনাফ্ ছিল, আবু-তালেব তাঁহার কুনিয়েত নাম; অর্থাৎ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তালেবের পিতা বলিয়া এই নামে অভিহিত হইতেন; এবং এই নামেই সাধারণতঃ তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ওয়ালেদ মাজেদ মহাত্মা আব্‌তুল্লার জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা ছিলেন; এজন্য 'এতিম' ও 'এছির' (পিতৃ মাতৃ-হীন) হজরত রছুল আকরম (ছালঃ)-এর 'জদ্দে-আমজদ' (পিতামহ) আবদুল মোত্তালেব, তাঁহার প্রতিপালনের ভার আবু-তালেবের প্রতি অর্পণ করিয়া যান। আবু-তালেবও তাঁহার সে কর্ত্তব্য যথাযথ রূপে পালন করিয়াছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্রদিগের অপেক্ষাও যত্নে লালন পালন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আঁ হজরত (ছালঃ)-কে বিপক্ষের শত্রুতাচরণ হইতে প্রাণপণে রক্ষা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই।

হজরত আলী মরতুজা করমুল্লাহ ওয়াজহুর ভ্রাতাদিগের কথা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত তাঁহার দুইটী ভগিনীও ছিলেন; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম ওম্মেহানী (রাঃ—আঃ) ও কনিষ্ঠার নাম জমানাঃ। জ্যেষ্ঠা ভগিনী পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জমানাঃ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে।

হজরত আলী (রাজিঃ)-এর নাম ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে এবং পরে—উভয় সময়েই আলী (রাজিঃ) ছিল। তাঁহার কয়েকটী 'কুনিয়েত'

ছিল; যথা:—আবুল হাসান, আবু তোরাব, আবুল আম্মা, আবুল কছম ও আবু রায়হান। আবু রায়হানের অর্থ দুই ফুলের পিতা—অর্থাৎ হজরত এমাম হাছান (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছায়েন (রাজিঃ)-এর জনক।

হজরত আলী (রাজিঃ)-কে "আবু-তোরাব" উপাধী, হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) ই প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ উপাধী প্রদানের ২টী কারণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে; ঐতিহাসিক এব্‌নে এছহাক (রহঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত আছে, প্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ হজরত এমার-ইব্‌নে-এয়াছর (রাজিঃ) এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি এবং হজরত আলী (রাজিঃ) আছিরের 'গয্‌ওয়ায়' (যেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধে), হজরত রছুল করিম (ছালঃ) এর সঙ্গে একই স্থানে অবস্থিত ছিলাম; তখন 'মদলজ' সম্প্রদায়ের একদল লোক এক 'চশ্‌মায়' (ঝরণায়) কাজ করিতেছিল; হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আমাকে বলিলেন, চল দেখি, এই সকল লোকেরা চশ্‌মায় কিরূপে কাজ করিতেছে। তদনুসারে আমরা উভয়ে চশ্‌মার নিকটে গিয়া দেখিতে লাগিলাম, লোকেরা সেখানে কি ভাবে কাজ কর্ম্ম করে। চশ্‌মার নিকটেই ছোট ছোট খেজুর গাছ পূর্ণ একটী বাগান ছিল, আমরা সেই বাগানে ভূ-শয্যায় শয়ন করিয়া অল্প কাল মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইলাম। একটু জোরে বাতাস বহিতেছিল; সুতরাং বালুকা রাশি উড়িয়া আসিয়া আমাদের বস্ত্রাদি ঢাকিয়া ফেলিল। অল্পকাল পরে জনাব হজরত রছুল করিম (ছালঃ) সেখানে আসিয়া আমাদিগকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন; এবং আমাদের উভয়কে জাগাইলেন। যখন আমরা নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলাম, তখন তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে আবু তোরাব (মৃত্তিকার পিতা)! আমি তোমাকে এমন দুই ব্যক্তির সন্ধান দিতেছি, যাহারা দুনিয়ার সমস্ত লোকের মধ্যে 'বদ-বখ্‌ত্‌' (হতভাগ্য); তন্মধ্যে একব্যক্তি আহ্‌মির ছমুদ—যে ব্যক্তি

(হজরত) ছালেহ নবী (আলাঃ)-এর উষ্ট্রীকে হত্যা করিয়াছিল, ২য় ঐ ব্যক্তি—যে তোমাকে শহীদ করিবে।"

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, একদা হজরত রছুল করিম (ছালঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরা (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে তশরিফ্ আনিলেন। তিনি স্বীয় দুহিতা-রত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! আলী (কঃ—ওঃ) কোথায়? উত্তরে তিনি বলিলেন, তিনি আমার সঙ্গে রাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। আঁ হজরত (ছালঃ) একথা শুনিয়া সেখান হইতে উঠিলেন; এবং হজরত আলী (রাজিঃ)-এর সন্ধান করিতে করিতে মছজেদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মছজেদ—প্রাচীরের গা ঘেসিয়া ভূতলে শুইয়া আছেন; তাঁহার বস্ত্রে ও শরীরে ধূলা বালি আসিয়া উড়িয়া পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর গায়ের ধূলা বালি ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন "কুম এয়া আবা তোরাব' (উঠ হে মৃত্তিকার বাপ উঠ)!" এই সময় হইতেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর কুনিয়েত "আবু-তোরাব" হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর যে সকল 'লকব' (উপাধী) ছিল, তাহা এই:—বদয়াতল বলদ, ২। আমীন শরীফ, ৩। হাদী, ৪। মহতদি, ৫। খিল-আওয়লন-ওয়াবিয়া, ৬। হায়দার কার্রার, ৭। লায়ীবরল আমাতা, ৮। যোল-কারনিন, ৯। ছিদ্দিক।

এমাম আহ্মদ (রহঃ) মছনদ গ্রন্থে, বাবুল মোনাকাবে, আবু-লায়লাঃ (রহঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত রছুলে করিম (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, ছিদ্দিক ৩ জন; তন্মধ্যে প্রথম ছিদ্দিক ফেরাউনের বংশীয় খরক্কিল নামক ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী (একেশ্বরবাদী—তৌহিদ-পন্থী) মোমেন ব্যক্তি। যখন খোদা-দ্রোহী মেছের-রাজ দুরাচার ফেরাউন ও তাহার স্বজাতীয় লোকেরা হজরত মুছা (আলাঃ) কে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল,

তখন এই খরকিল দুর্দ্দান্ত ফেরাউনের ভয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, কি, তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করিবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ কে আপনার 'পরওয়ার দেগার' (সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু) বলিয়া অভিহিত করেন? দ্বিতীয় ছিদ্দিক আল ইয়াছিনে হবিব-বিন্ মরি আলনেজার ছিলেন; পবিত্র কোরআন শরীফে ছুরে ইয়াছিনে ইহার উল্লেখ আছে। আর তৃতীয় ছিদ্দিক আলী (রাজিঃ) বিন্-আবিতালেব। ইনি পূর্ব্বোক্ত দুইজন ছিদ্দিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আছহাবে ফিল ঘটনার ৭ বৎসর পরে, ১২ই রজব তারিখে, পবিত্র মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণের সময় হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর বয়স কত ছিল, তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এব্‌নে জওযি (রহঃ) লিখিয়াছেন, ৭ বৎসর, ৯ বৎসর, ১০ বৎসর কিংবা ১৫ বৎসর বয়সে তিনি ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তিনি চৌদ্দ বৎসর বয়সেই ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

এ বিষয়েও মতভেদ দৃষ্ট হয় যে, কে প্রথমে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোনও কোনও ইতিহাস-বেত্তা বলেন, হজরত রেছালত মাব (ছালঃ)-এর 'আহ্‌লিয়া' (সহধর্ম্মিণী) হজরত খোদায়জাতুন-কোব্‌রা (রাঃ—আঃ) সর্ব্ব প্রথমে পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন। কাহারও কাহারও মতে হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) আর কাহারও কাহারও মতে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সর্ব্ব প্রথমে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বালকদিগের মধ্যে হজরত আলী (কঃ—ওঃ), বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগের মধ্যে হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মোস্‌লেম-মাতা হজরত (খোদায়জাতুল

কোব্‌রা (রাঃ—আঃ), আর ক্রীত দাসদিগের মধ্যে হজরত জয়েদ-বিন্‌-হারছাঃ (রাজিঃ) সর্ব্ব প্রথমে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। একমাত্র তবুকের যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধে (জেহাদে)ই হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, এবং শত্রুদলের সঙ্গে মহা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নামযাদাঃ বহু বড় বড় বিধর্ম্মী বীরপুরুষ তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছিল।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) একজন অদ্বিতীয় বীরপুরুষ ছিলেন; তাঁহার দেহ সুগঠিত ও সুডৌল সম্পন্ন এবং মস্তক বৃহৎ ছিল। তিনি মস্তক মুণ্ডন করাইতেন। দাড়ি ঘন এবং সুদীর্ঘ ও কেশরাশি ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিনি খেজাব ব্যবহার করিতেন, কিন্তু ইহার রেওয়ায়েত খুব দুর্ব্বল। হয় ত জীবনে একবার খেজাব ব্যবহার করিয়াছিলেন, আর কখনও খেজাব লাগান নাই। সমুদয় 'রাবি (বর্ণনা-কারী) রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, তাঁহার দাড়ি সুদীর্ঘ, ঘন সন্নিবিষ্ট এবং 'ছফেদ' (শ্বেতবর্ণ অর্থাৎ সাদা) ছিল; এই দাড়ির বর্ণনা বোধ হয় তাঁহার বার্দ্ধক্যের (শেষ জীবনের)। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তাঁহার উদরদেশ বৃহৎ এবং তাহাতে ও বক্ষঃস্থলে এবং সর্ব্বাবয়বে প্রভুত লোমরাজি বিরাজ করিত।

আবু-সয়ীদ তেমিমি (রাজিঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, বাল্যকালে একদা আমরা মক্কা শরীফের বাজারে কাপড় বিক্রয় করিতেছিলাম; ঐ সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ঐ বাজার দিয়া গমন করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার বৃহৎ পেট দেখিয়া "বোযর্গ শেকম—বোযর্গ শেকম" (বৃহৎ উদর, বৃহৎ উদর) বলিয়া লাফাইতে ছিলাম। তচ্ছ্রবণে তিনি আমাদিগকে বলিলেন, "তোমরা ইহা কি কথা বলিতেছ?" তদুত্তরে আমরা বলিলাম, আমরা বলিতেছি যে আপনি বৃহৎ পেট-ওয়ালা। আমাদের কথা শুনিয়া তিনি

ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, উহার উপরে 'এলেম' (বিদ্যা) ও ভিতরে খাদ্য দ্রব্য আছে। তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ও উভয় 'শানের' (স্কন্ধদেশের) মধ্যস্থলে ব্যবধান বেশী ছিল। গ্রীবাদেশ লম্বা ছুরাইয়ের আকার বিশিষ্ট ও 'হাথলী' মাংসল ছিল। তিনি একটু, 'পস্ত্ কদ' (বেঁটে আকারের) ছিলেন ; চেহেরা হাস্যোন্মুখ এবং শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল (চাকচিক্য বিশিষ্ট) ছিল।

জনৈক আরবীয় ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, ১লা রজব শুক্রবারে আবুতালেবের সহধর্ম্মিণী বিবী ফাতেমা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। শুভ দিনে শুভক্ষণে অনুপম রূপ-লাবণ্য বিশিষ্ট পুত্ররত্ন লাভ করিয়া প্রসূতি অসীম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তিন পুত্রের পর ইহা তাঁহার শেষ বা চতুর্থ পুত্র। প্রিয় দর্শন হজরত আলী (রাজিঃ) মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই একজন পরিচারিকা গিয়া আবুতালেবকে এই শুভ সংবাদ দিল। আবুতালেব এই শুভ সংবাদ শ্রবণে উৎফুল্ল-চিত্তে নবজাত শিশুর বদন কমল দর্শনাভিলাষে প্রসব গৃহে আগমন পূর্ব্বক, পুত্রের অলোক সামান্য রূপ-লাবণ্য দর্শনে স্নেহরসে পরিপ্লুত হইলেন। পরে যথাসময়ে তাঁহার নাম আলী (রাজিঃ) রাখা হইল। অনেক ঐতিহাসিকের মতে আঁ হজরত (ছালঃ) ই এই শিশুর " আলী " (রাজিঃ) নাম রাখিয়া ছিলেন।

আবুতালেবের পরিবারে লোক সংখ্যা অনেক, কিন্তু তদনুযায়ী আয়ের পরিমাণ কম ছিল, কাজেই সচ্ছলতার সহিত তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত না। আঁ হজরত (ছালঃ) এই সময় বিবাহ করিয়া মোছলেম-মাতা হজরত খোদায়জাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে বাস করিতেছিলেন। ঐ সময় মক্কায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে মহামতি আবুতালেব আরও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় অন্যতম পিতৃব্য হজরত আব্বাছ (রাজিঃ) কে বলিলেন, দেখুন, বড় পিতৃব্য ছাহেব বিরাট সংসারের

ব্যয়-ভার বহন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন ; আসুন আমরা উভয়ে তাঁহার দুইটী পুত্রের প্রতিপালন-ভার গ্রহণ করি। পিতৃব্য সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, উভয়ে গিয়া আবুতালেবের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন। তিনি দ্বিতীয় পুত্র আকিল ব্যতীত আর যাহাকে যাহার লইতে ইচ্ছা, তাহা-দিগকে প্রতিপালন করিবার জন্ম লইতে সম্মতি দান করিলেন। তদনুসারে হজরত আব্বাছ (রাজিঃ) তৃতীয় পুত্র হজরত জাফর তইয়্যারকে, এবং আঁ হজরত (ছালঃ) সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র হজরত আলী (রাজিঃ) কে প্রতিপালন-জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই সময় হইতে হজরত আলী (রাজিঃ) আঁ হজরত (ছালঃ) কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। মোসলেম-মাতা হজরত খোদায়জাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ) ও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহে পালন করিয়াছিলেন। এই সময় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর বয়স ৩৫ বৎসর ও হজরত আলী (রাজিঃ)-এর বয়স ৫ বৎসর মাত্র ছিল। সুতরাং এই হিসাবে হজরত আলী (কঃ—ওঃ), আঁ হজরত (ছালঃ) হইতে ৩০ বৎসর বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। আর আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পয়গম্বরী লাভের ৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি হজরত আলী (কঃ ওঃ)-এর প্রতি-পালন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং এই হিসাবে ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যখন আঁ হজরত (ছালঃ) পয়গম্বরী লাভ করিয়া-ছিলেন, তখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বয়স ১০ বৎসর ছিল ; এবং ইহার প্রায় ১৩ বৎসর পরে যখন আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনা তৈয়বায় হেজরত করেন, তখন হজরত আলী (রাজিঃ)-এর বয়ঃক্রম ২২ বৎসরের উপর—অর্থাৎ প্রায় ২৩ বৎসর হইয়াছিল। এই বয়সেই তিনি আরব দেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠতম বীরপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

হজরত আলী (রাজিঃ)-এর জীবনকাল ৪ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা :—আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হেজরত পর্য্যন্ত প্রথম অংশ ;

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'এন্তেকাল' পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অংশ; তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ)-এর শহীদ হওয়া পর্য্যন্ত তৃতীয় অংশ; এবং স্বীয় খেলাফৎ কাল, অর্থাৎ শাহাদৎ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত চতুর্থ বা শেষ অংশ। তাঁহার জীবনের প্রথম অংশ শৈশবে ও যৌবনের প্রারম্ভ কালে অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময় মধ্যে তিনি প্রথমতঃ মামুলী শিক্ষা লাভ, যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা এবং আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সাহচর্য্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; হজরত (ছালঃ)-এর পদানুসরণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার গুণ-গ্রামে বিভূষিত হইয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়; এবং তাঁহার মাতৃ-সমা মোস্‌লেম-মাতা হজরত খোদায়জাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ) পর-লোক গমন করিয়াছিলেন; তিনি স্বয়ং পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইস্‌লামী রীতি-নীতি বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করেন। সেই সময় আঁ হজরত (ছালঃ) মক্কার কোরেশ এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ও তায়েক বাসীদিগের দ্বারা নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হন। এই সকল ঘটনা তাঁহার চক্ষের উপর ঘটিয়া-ছিল। তাঁহার পবিত্র জীবনী সম্বন্ধে এই সময়ের বিস্তৃত বিবরণ তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু বেশ জানা যায় যে, তিনি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত ও সম্পূর্ণ পদানুসরণ কারী ছিলেন, এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মোটের উপর ২২।২৩ বৎসর বয়সেই তিনি একজন আদর্শ পুরুষ হইয়াছিলেন; আল্লাহ্‌তা-লার পরম ভক্ত মহাসাধকের পদলাভ করিয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) যে 'হেরা' নামক নির্জ্জন গিরি-গুহায় একাগ্রচিত্তে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তা-লার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, এবং সুদীর্ঘ ৯।১০ বৎসর কাল সেই অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, উহাও হজরত আলী (রাজিঃ)-এর হৃদয়ে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয়েও আল্লাহ তালার পবিত্র প্রেম বিশেষভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। পিতার

জীবিত অবস্থায় ও তিনি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর কাছ-ছাড়া হইতেন না।

আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় প্রতিপালিত ভ্রাতাকে কেবল সাধারণ ভাবে শিক্ষা দিয়াই নিরস্ত ছিলেন না; স্বীয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য প্রাথমিক মোছলমান, নানাবিদ্যা ও নানাগুণের আধার হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) কে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর শিক্ষা দানের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ওরূপ উপযুক্ত ও আদেশ শিক্ষা-গুরু তৎকালে আর কেহ ছিলেন না। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) পবিত্র কোরআনের তফ্‌ছির, কোরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় অতি উন্নত ধরণে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আবার হজরত আলী (রাজিঃ)-এর নিকট পূর্ণভাবে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার 'চাচাযাদ' ভাই (পিতৃব্য-পুত্র) হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-আব্বাছ (রাজিঃ), মোস্‌লেম-জগতে তদানীন্তন কালের বিদ্বান্‌ মণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার কারয়াছিলেন। আমরা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সমগ্র জীবন কাল ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি; তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার জীবনের প্রথম অংশ—আঁ হজরত (ছালঃ)-এর মদানা শরীফে হেজরত করা পর্য্যন্ত প্রধানতঃ বিদ্যা শিক্ষা ও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষায়ই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর স্নেহ ও ভালবাসায় তিনি পিতার অভাব ও অনুভব করিতে পারেন নাই। মাতা জীবিত থাকিলেও মাতৃ সম স্নেহ-কারিণী ভ্রাতৃ-জায়ার স্নেহের একান্ত বশীভূত ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে তিনি হৃদয়ে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা ত্রয়ের ও ইতিমধ্যে পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। হজরত আলী (রাজিঃ) আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পরিবারেরই একজন ছিলেন। মোছলেম-মাতা হজরত খোদায়জাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ)-এর মৃত্যুতে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সোণার সংসার কিরূপ

অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কন্যা ত্রয়স্বামী গৃহে গমন করাতে একমাত্র কনিষ্ঠা কন্যা হজরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ—আঃ)ই তাঁহার সংসারের 'চেরাগ' (প্রদীপ) স্বরূপ ছিলেন। আর স্নেহের ভ্রাতা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও পরম ভক্ত ক্রীতদাস হজরত জয়েদ (রাজিঃ) বিন্-হারেছা (রাজিঃ) তাঁহার সহকারী স্বরূপ ছিলেন। অবশ্য অন্য শিষ্য-সেবক অনেকেই ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেন ; তন্মধ্যে হাব্‌শী ক্রীতদাস হজরত বেলাল (রাজিঃ)-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হজরত জয়েদ (রাজিঃ) বিন্ হারেছ ও হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে একত্রে, হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

আঁ হজরত (ছালঃ) ও অন্যান্য ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের মদীনায় হেজরত করিবার সময় হইতে হজরত আলী (রাজিঃ) কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্ব প্রথমে আবির্ভূত হন। আঁ হজরত (ছালঃ) যে দিন পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'লা কর্ত্তৃক অহিযোগে মদীনায় হেজরত করিতে আদিষ্ট হইলেন, সেই দিনই তিনি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ ইতিপূর্ব্বেই ক্রমশঃ মদীনায় চলিয়া গিয়াছিলেন। হজরত ছারওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ), হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া যাওয়া স্থির করিয়াছিলেন, এদিকে মক্কার কোরেশগণ ঐ দিবাগত রাত্রেই তাঁহাকে হত্যা করিবার সমস্ত যোগাড়-যন্ত্র করিয়াছিল। কিন্তু খোদা তা'লা যাঁহার সহায়, কাহার সাধ্য তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করে ? কাফেরগণ তাঁহার গৃহের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া থাকিলেও, তিনি রাত্রিযোগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন, তাহা তাহারা কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। হুজুর (ছালঃ) হজরত আলী (রাজিঃ) কে গৃহে রাখিয়া গেলেন ; কাফেরগণ মনে করিল, তিনি গৃহেই

আছেন ; অতি প্রত্যুষে গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র তাঁহাকে বধ করিবে। যখন রাত্রি অবসান হইল, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফজরের নমাজ পড়িবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন, এবং 'রফায় হাজত' ও ওজু করিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইলেন, তখন গৃহাবরোধকারী কাফেরগণ তাঁহাকে রূঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) কোথায়? হজরত শেরে খোদা (কঃ—ওঃ) বলিলেন, আমি তাঁহার সংবাদ জানি না। সে সংবাদ ত তোমাদেরই জানা থাকা উচিত, কারণ তোমরা সারারাত্রি এই গৃহের পাহারায় নিযুক্ত ছিলে। এইস্থলে অন্য রূপ রেওয়ায়েত ও দৃষ্ট হয়। সেই বর্ণনা এই যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, কাফেরগণ ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে জাগাইয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর কথা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি পূর্ব্বোক্ত রূপ উত্তর করাতে দুর্ব্বৃত্ত কাফেরগণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া প্রহার করিল; এবং কিয়ৎকাল বন্দী অবস্থায় রাখিয়া পরে ছাড়িয়া দিল।

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি কোরেশ এবং মক্কা বাসিগণ ভীষণ শক্রতাও অমানুষিক অত্যাচার করিলেও, তাঁহাকে "আল-আমীন" বলিয়া ডাকিত, এবং তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত 'আমানতদার' বলিয়া জানিত; তদনুসারে বহু লোকের অর্থ ও মূল্যবান্ দ্রব্য-সামগ্রী তাঁহার নিকট 'আমানত' (গচ্ছিত) ছিল। সেই সকল আমানতকারী লোক দিগকে তাহাদের টাকাকড়ি ও জিনিষ-পত্র বুঝাইয়া দেওয়ার জন্যই তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে স্বীয় গৃহে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নচেৎ হয় ত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইতেন; কিংবা অন্যান্য ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের সঙ্গে পূর্ব্বেই মদীনায় পাঠাইয়া দিতেন। যাহা হউক, অতঃপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সমুদয় 'আমানতি' (গচ্ছিত) অর্থ ও দ্রব্য-সামগ্রী উহার মালেক (স্বত্বাধিকারী) দিগকে বুঝাইয়া বা পঁহুছাইয়া দিলেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেব তাঁহার প্রণীত " মোস্তফা চরিত " গ্রন্থে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সম্বন্ধে এই ব্যাপার এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, " ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা প্রথমে হজরত আলীকে গ্রেপ্তার করিয়া কাবায় লইয়া যায় এবং তাঁহাকে নানাপ্রকার 'পুছিদ' করিয়া জিজ্ঞাসা করে,—'বল, মোহাম্মদ কোথায় ?' আলী কঠোর স্বরে উত্তর করিলেন, 'তাঁহার গতি বিধির উপর নজর রাখিবার জন্য তোমরা আমাকে চাকর রাখিয়াছিলে নাকি ?—যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ।' যাহা হউক, কতকক্ষণ উৎপীড়ন করার পর, তাহারা সকল দিক্ চিন্তা করিয়া আলী কে ছাড়িয়া দিল। "

আঁ হজরত (ছালঃ) মক্কা হইতে মদীনায় রওয়ানা হইয়া, হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর সঙ্গে, প্রথমে মদীনার শহরতলি " কোবা " নামক স্থানে রবিবার দিন পঁহুছিয়াছিলেন ; পরবর্ত্তী জুমার দিন (শুক্রবার) পর্য্যন্ত তিনি কোবায় অবস্থান করিলেন। হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ) কোবায় থাকিতে থাকিতেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মক্কা হইতে কোবায়—আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে আসিয়া পঁহুছিলেন। এই সুদীর্ঘ এবং দুরতিক্রম্য পথ তিনি পদব্রজেই অতিক্রম করেন। তিনি শত্রুদল কর্ত্তৃক ধৃত বা নিহত হওয়ার আশঙ্কায় দিবাভাগে কোনও গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত থাকিতেন, এবং রাত্রিকালে যথাসাধ্য দ্রুতগতি পথ অতিক্রম করিতেন। এই কয়েক দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে একাকী গমন পূর্ব্বক তিনি কোবায় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) যে কয় দিন ছুর বা ছওর গিরি-গহ্বরে গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সেই কয় দিনে, হুজুর (ছালঃ)-এর নিকট গচ্ছিত দ্রব্য-সামগ্রী উহার 'মালেক' (স্বত্বাধিকারী) দিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আবার ঘটনার সামঞ্জস্য এমনই বিস্ময়কর যে,

যে দিন আঁ হজরত (ছালঃ) এবং ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) সুর (ছওর) গিরি-গহ্বর হইতে মদীনাভিমুখে যাত্রা করেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও সেই দিনই মক্কা হইতে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) ও হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) উষ্ট্রারোহণে গমন করিয়া ছিলেন বলিয়া ৮ দিনে কোবায় পঁহুছিয়াছিলেন। অনুসরণকারী শত্রুর ভয়ে তাঁহারা অনেক স্থলেই সাধারণ পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সাধারণ পথের দক্ষিণ কিংবা বামদিকে সরিয়া গমন করিয়া ছিলেন ; আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) 'পায়দল' (পদব্রজে) গমন করাতে, ৩।৪ দিন পরে কোবায় উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পাঠক ! এই স্থলেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জীবনের প্রথম পর্ব্ব শেষ হইল। হিজরীর প্রথম সাল হইতে তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব্ব বা দ্বিতীয় 'দওড়' আরম্ভ হইয়াছিল।

হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ)-এর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব্ব।

(তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ, আঁ হজরত (ছাল)-এর সঙ্গে বিভিন্ন জেহাদে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রকাশ)।

এইবার তাপস শ্রেষ্ঠ বীরেন্দ্র কেশরী হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জীবনের ২য় পর্ব্ব আরম্ভ হইল। ইহার স্থিতিকাল একাদশ বৎসরের কিছু উপর। এ সময় তিনি তরুণ যুবক, তখনও বিবাহ হয় নাই। আঁ হেজরত (ছালঃ)-এর সর্ব্ববিধ আদেশ পালনই তাঁহার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। আঁ হজরত (ছালঃ) সদলবলে সুদূরবর্ত্তী মদীনায় আসিয়াও খোদা-দ্রোহী

পৌত্তলিক কোরেশদিগের বৈরাচরণ হইতে অব্যাহতি পান নাই। উহারা তাঁহাকে এবং মুষ্টিমেয় মোছলমানকে বিধ্বস্ত করিতেও তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে বদ্ধপরিকর। তাহারা গায়ে পড়িয়া ঝগড়া বাঁধাইতে সম্পূর্ণ ভাবে সমুৎসুক। কত ষড়যন্ত্র, কত কূটীলতা, কত দাগা-ফেরেব তাহারা করিতেছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) কে হত্যা (শহীদ) করা তাহাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। এতৎ সম্বন্ধে মদীনার পৌত্তলিক, য়িহুদী ও মোনাফেক (কপট) গণ মোছলমানদিগের সঙ্গে তাহারা অতি গোপনে ষড়যন্ত্র পাকাইত।

বদরের মহাযুদ্ধ।

যাহা হউক, কোরেশ দলের অন্যতম নেতা, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রচণ্ড শত্রু দুর্বৃত্ত আবুজহল এক প্রবল সেনাদল লইয়া মোছলমানদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য মদীনাভিমুখে আগমন করিল। তাহাদের দলে নিম্ন-লিখিত খ্যাতনামা কোরেশ এবং মক্কার অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছরদার (দলপতি) গণ ছিল ; যথা :—আবুজহল, ওকবাঃ, শয়বাঃ, অলিদ, হনযলাঃ, ঔবিদা, আছি, হরছ, তায়েমাঃ, যমআঃ, আবুল নজতরি, মসউদ, আবু-কায়েস, মনবীয়াঃ, মনবাঃ, নওফল, ছায়েব, রফায়্যা প্রভৃতি। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পিতৃব্য আব্বাস্-বিন্-আবদুল মোত্তালেব, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর পুত্র আবদুর রহমান, আবু তালেবের দুই পুত্র তালেব ও আকিল ও এই কোরেশ সেনা দলের সঙ্গে ছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) যথাসময়ে এই প্রবল অভিযানের বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি আত্মরক্ষা এবং শত্রুদলের আক্রমণ প্রতিরোধার্থ ৩১০ হইতে ৩১২ বা ৩১৩ জন যোদ্ধপুরুষ মাত্র সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে

বদরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আবার ইহাদের মধ্যে কয়েকজন অতি অল্প বয়স্ক বালক ছিল বলিয়া তাহাদিগকে গৃহে বিদায় দেওয়া হইল। এই সৈন্যদলে দুইজন মাত্র অশ্বারোহী ছিলেন; হজরত যোবের (রাজিঃ) ও হজরত মেকদাদ (রাজিঃ)। আর উষ্ট্র সংখ্যা ছিল ৭০টী, তন্মধ্যে ৩।৪ জন করিয়া যোদ্ধ পুরুষ প্রত্যেক উষ্ট্রে আরোহণ করিয়াছিলেন। যে উষ্ট্রে স্বয়ং আঁ হজরত (ছালঃ) আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও আরও দুই জন আরোহী ছিলেন; তদ্ব্যতীত কতিপয় যোদ্ধা পদব্রজেও গমন করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র সৈন্যদল "বদরে" উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন; মক্কার "কোফ্ফার" গণ প্রথম হইতেই এক উচ্চ ভূ-খণ্ড অধিকার করিয়া, তাহাতে তাম্বু খাটাইয়া বাস করিতেছে। সুতরাং মোছলমানদিগকে বালুকাময় নিম্নভূমিতেই আপনাদের "ডেরা-তাম্বু" ফেলিতে হইল। কিন্তু বদরের পাহাড় হইতে যে সকল ক্ষুদ্র 'চশ্মাঃ' (নির্ঝরিণী বা ঝরণা) বাহির হইয়া নিম্নদিকে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা মোছলমানদিগের আয়ত্তে আসিয়া গেল। আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মধ্যে আদেশ প্রচার করিলেন, শত্রু পক্ষীয় লোকেরা চশমাঃ হইতে পানী লইতে আসিলে তোমরা তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিবে না। ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর অবস্থান জন্য একটী ঝুপড়ি (পর্ণ-শালা বা পাতার কুটীর) নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন; তিনি তাহাতে বসিয়া 'এবাদত' ও প্রার্থনা করিতেন। শত্রুসৈন্য এক সহস্র এবং মোছলমান যোদ্ধ পুরুষ ৩০০ তিন শত (এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষাও কম) ছিলেন। আবার তাঁহাদের যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম কোরেশদিগের একশত ভাগের একভাগও ছিল না। কোফ্ফারদিগের সকলে মক্কার বাছা বাছা যোদ্ধপুরুষ, দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ, যুদ্ধ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এবং 'যরাঃপোষ' (বর্ম্মাবৃত) ছিল। মোছলমানগণ সাধারণতঃ 'ফাকা যাদাঃ' (ক্ষুধাতুর), 'নাতোয়ান' জীর্ণ-শীর্ণ ও

দুর্ব্বল ছিলেন। আবার তাঁহাদের মধ্যে মহাজের সংখ্যা খুব অল্প ও আন্ছার সংখ্যা বেশী ছিল। মক্কাবাসীর তুলনায় মদীনাবাসিগণ শৌর্য্য-বীর্য্য ও পরাক্রমে অনেক হীন ছিলেন। সাধারণ যুদ্ধাস্ত্রও নিয়মিত রকম সকলের নিকট ছিল না। কাহারও নিকট কেবল তরবারি ছিল, 'নেযাঃ' (বল্লম বা বড়শা বিশেষ) কিংবা তীর ধনুক ছিল না ; কাহারও নিকট কেবল তীর-ধনুক ছিল, তরবারি বা নেযাঃ ছিল না। পক্ষান্তরে কোরেশ কোফ্ফারগণ সর্ব্ব-প্রকার উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল ; তাহাদের কোনও অস্ত্রেরই অভাব ছিল না। আরবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাতীয় বিশ্ব-বিশ্রুত অশ্বই তাহাদের সঙ্গে ছিল।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) অসম সাহসী ও যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলেও, এতাবৎ কাল তিনি সেই বীরত্ব প্রকাশের কোনও সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন না। কারণ ইতিপূর্ব্বে মোছলমানদিগের সঙ্গে কাফের-দিগের কোনও যুদ্ধ-বিগ্রহ সঙ্ঘটিত হয় নাই। এই সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বয়ঃক্রম ১৭।১৮ বৎসর হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে ছিল। যাহা হউক, ২য় হিজরীর ১৭ই রমজানুল মবারক প্রাতঃকালে এই পবিত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আঁ হজরত (ছালঃ) যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে, স্বীয় সেই ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীরে প্রবেশ করিলেন ; আর করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে আল্লাহ্ তা-লার মহাদরবারে এই বলিয়া ' দোওয়া' (প্রার্থনা) করিতে লাগিলেন, হে করুণা সিন্ধু আল্লাহ্ তালা, যদি তুমি এই ক্ষুদ্র দলটীর ধ্বংস সাধন কর, তবে পৃথিবীতে তোমার 'এবাদত' (পূজা—উপাসনা) করিবার জন্য আর কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না। তৎপর তিনি দুই রেকায়াত নমাজ পড়িলেন। অতঃপর অল্প সময়ের জন্য তাঁহার ভাবাবেশ হইল। ইহার পর তিনি মুচ্কি হাসির সঙ্গে সেই কুটীর হইতে বাহিরে আসিলেন, এবং প্রফুল্ল বদনে ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের নিকট ফরমাইলেন, এই যুদ্ধে কোফ্ফার সৈন্যদিগের পরাজয়

ঘটিবে; আর তাহারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে।

মোছলমান সৈন্য দলে ৮০ জন মহাজেরিন, অবশিষ্ট সকলেই আন্‌ছার (মদীনাবাসী) ছিলেন। আবার আন্‌ছার দিগের মধ্যে আওস্ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন ৬০ জন; আর খজ্‌রয্ বংশীয় ছিলেন ১৭০ জন। এক্ষণে দুই প্রতিপক্ষ সৈন্যদল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তে একটী তীর ছিল; তিনি তদ্দ্বারা 'এশারা' (ইঙ্গিত) করিয়া সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে ছিলেন। ইহার পর তদানীন্তন আরবীয় যুদ্ধের নিয়মানুসারে কোফ্‌ফার দলের পক্ষ হইতে রবিয়ার পুত্র ওতবাঃ ও তদীয় ভ্রাতা শয়িবোঃ এবং অলিদ-বিন্-ওতবাঃ সর্ব্ব প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিল; আর অতি দর্প সহকারে মোছলমান যোদ্ধপুরুষদিগের মধ্য হইতে ৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বী-যোদ্ধা তলব করিল। ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আন্‌ছার দল হইতে মুয়োফ্ (রাজিঃ), ও ময়োজ (রাজিঃ) নামক আদরাআর দুই পুত্র এবং আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ (রাজিঃ) যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন; তদ্দর্শনে ওত্‌বাঃ বলিল, "মান্-আন্‌তুম" তোমরা কে হও। তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন, "দাহতুন্ মিনাল্ আন্‌ছারে" আমরা আন্‌ছার অর্থাৎ মদীনাবাসী। ওত্‌বা নিতান্ত গর্ব্বিত ও তাচ্ছিল্য ভাবে বলিল, "মাল্‌না বেকুম মান হাজতাঃ" তোমাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। পরে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "এয়া মোহাম্মদ (ছালঃ) আখ্‌রজালেনা আক্‌ফা আনা মিন্ কওমেনা" হে মোহাম্মদ (ছালঃ) আমাদের সঙ্গে দ্বন্দযুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের 'যাত-বেরাদরি' (স্বজাতীয় ও স্ব-বংশীয়) অর্থাৎ কোরেশদিগের মধ্য হইতে মোহাজেরিনদিগকে পাঠাও। তচ্ছ্‌বণে আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, ওত্‌বার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার জন্য

হামযাঃ-বিন্-আবদুল মোত্তালেব (রাজিঃ), ওত্বার ভ্রাতা শায়িয়েবার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য যোবায়দা-বিন্-আল্ হরছ (রাজিঃ), আর ওত্বার পুত্র অলিদের বিরুদ্ধে আলী-বিন্-আবিতালেব (রাজিঃ) গমন করুক। এই আদেশ প্রাপ্তি মাত্র উপরোক্ত ৩ জন ছাহাবাঃ—বিখ্যাত বীরপুরুষ মহোৎসাহে ও মহোল্লাসে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন, আর পূর্ব্বোক্ত আন্ছার (রাজিঃ)-ত্রয় ফিরিয়া চলিয়া আসিলেন। ওত্বাঃ ইঁহাদের ৩ জনের নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল—যদিও সে ইঁহাদিগকে বিশেষভাবেই চিনিত। তাঁহারা স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করিলে সে বলিল, হাঁ, তোমাদের সঙ্গে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করিব। অতঃপর উভয় প্রতিপক্ষ দলের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) ও হজরত আলী (রাজিঃ), তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা ওত্বা ও অলিদ—পিতা-পুত্র উভয়কেই তরবারির এক এক আঘাতে 'কতল' (নিহত) করিয়া ফেলিলেন। শয়ীয়েবার সঙ্গে যুদ্ধে হজরত যোবেদাঃ (রাজিঃ) এমন ভীষণ ভাবে আহত হইলেন যে, সে আঘাতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল না; তিনি অল্পকাল মধ্যেই সেই স্থলে শাহাদত প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে শেরে খোদা—আল্লাহ্ তা'লার শার্দ্দুল হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাতে শায়ীয়েবার মুণ্ডপাত করিলেন; এবং হজরত যোবেদাঃ (রাজিঃ)-এর মৃতদেহ আনিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) এর খেদমতে উপস্থিত করিলেন, ইহার পর কোফ্ফার শ্রেণী বদ্ধভাবে মোছলেম যোদ্ধপুরুষদিগকে আক্রমণ করিল। পক্ষান্তরে

মোছলমানগণ ও তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে "আল্লাহ আক্‌বর" ধ্বনিতে রণক্ষেত্র কাঁপাইয়া, তাহাদিগকে :ভীম তেজে আক্রমণ করিলেন। এক্ষণে উভয় দলে ভাষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় সৈন্য দল পরস্পর মিশিয়া গিয়া, পরস্পরকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। উভয় প্রতিপক্ষ দলই বীরত্বের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর কোফ্‌ফার আপনাদের ৭০ জন বীরপুরুষকে নিহত ও ৯০ জনকে বন্দী হইবার সুযোগ প্রদান পূর্ব্বক, যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অতি দুর্দ্দশার সহিত পলায়ন করিল। এই পবিত্র যুদ্ধে মোছলমানগণ সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়াছিলেন। মক্কার কোফ্‌ফারদিগের বড় বড় 'ছরদার' (দলপতি), বড় বড় 'নামযাদাঃ' বীরপুরুষ নিহত হইয়াছিল। আর মোছলমানদিগের পক্ষে মাত্র ১৪ জন ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) শহীদ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৬ জন মোহাজেরিন ও ৮ জন আন্‌ছার। ৯০ জন মক্কাবাসী বন্দী হইয়াছিল; তদানীন্তন যুদ্ধ-নীতি অনুসারে ইহাদিগকে বধ করাই সাধারণ প্রথা ছিল; কিন্তু আঁ হজরত (ছালঃ) দয়া-পরবশ পূর্ব্বক 'ফিদিয়া (মুক্ত্য-পণ) গ্রহণ পূর্ব্বক উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। অন্যূন ২ লক্ষ দরহম মুক্তিপণ মোছলমানগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত পলায়ীত কোরেশদিগের বিপুল রণ-সম্ভার, অশ্ব, উষ্ট্র, ডেরা-তাম্বু, রসদ প্রভৃতি মোছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। বন্দীদিগের মধ্যে দুই ব্যক্তিকে 'কতল' (হত্যা) করিবার জন্য আঁ হজরত (ছালঃ) আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে একজন বনু-আব্‌দে-দার বংশীয় নযর বিন্-আল্-হারছ-বিন্-কালাহ, আর একজন ওকবাঃ-বিন্-আবি মায়ত, বিন্-আবি ওমরু-বিন্-লয়িয়াঃ। ইহারা উভয়ে আবুজহলের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি বিশেষ রূপ শত্রুতাচরণে ও তাঁহার প্রাণবধ জন্য

বিশেষ উদ্যোগী এবং কাট্টা কাফের ছিল। তন্মধ্যে নযর-বিন্-অা'ল হারেছকে হত্যা করিবার ভার হজরত আলী (রাজিঃ)-এর প্রতি অর্পিত হয়; তিনি উহার মুণ্ডপাত করেন। এই যুদ্ধে তরুণ বয়স্ক হজরত আলী (রাজিঃ) যে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক ছিল। কোরেশ দলের অতি প্রসিদ্ধ বীর ওতবার পুত্র অলিদ ও ওত্‌বার ভ্রাতা শায়েবা কে অতি অল্প আয়াসেই হজরত আলী (রাজিঃ) নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বদরের যুদ্ধেই হজরত আলী (রাজিঃ) বীরেন্দ্র সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর শুভ-বিবাহ।

দ্বিতীয় হিজরীতে—বদর যুদ্ধের পরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রিয়তমা সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা, হজরত ফাতেমাঃ জোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পবিত্র বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও, ইহা নিশ্চিত যে, পবিত্র রমজান মাসে এই শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রথমে হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-কে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন; হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার ওহীর অপেক্ষা করিতেছি। পরে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) বিবাহের প্রস্তাব করেন, তাঁহাকেও আঁ হজরত [ছালঃ] ঐ উত্তরই দেন। অবশেষে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) হুজুরের খেদমতে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত আদরের সঙ্গে বিবাহের 'পয়গাম' দেন (প্রস্তাব

করেন)। এক রওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, এই প্রস্তাব শ্রবণে আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় দুহিতা-রত্ন হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে আসিয়া বলিলেন, মা ফাতেমাঃ! আলী তোমাকে বিবাহ করিতে চায়। জনাব ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) এই কথা শুনিয়া চুপ হইয়া রহিলেন।

যাহা হউক, আঁ হজরত (ছালঃ) হজরত আলী (রাজিঃ)-এর প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন—বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে রমজান মাসে বিবাহ ও ছফর মাসে 'খলুত্' হইল। জাফর-বিন্-মোহাম্মদ (রহঃ) হইতে রওয়ায়েত হইয়াছে যে, রজব মাসের শেষভাগে বিবাহ ও যেলহজ্জ্ মাসে 'খলুত' হয়। ৪৮০ দরহম মোহর (দেন-মোহর) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বিবাহের সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বয়ঃক্রম ২১ বৎসর ও হজরত ফাতেমাঃ জোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বয়স ১৫ বৎসর ৬ মাস—মতান্তরে ১৮ বৎসর ছিল; এই বিবাহ সম্বন্ধে মৌলবী মোহাম্মদ আকরম খান ছাহেব স্ব-প্রণীত "মোস্তফা-চরিতে" যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"বদর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, হজরত তাঁহার প্রাণ প্রতীম কন্যা বিবি ফাতেমাকে হজরত আলীর সহিত বিবাহিত করিলেন। হজরত আলীর সম্বলের মধ্যে ছিল একটা বর্ম্ম—বদর যুদ্ধের 'গণিমত' হইতে এই বর্ম্মটী তাঁহার ভাগে পড়িয়াছিল। এইটি বিক্রয় করিয়া যে কয়টী টাকা পাওয়া গেল—তাহাই-মোহররূপে প্রদত্ত হইল। স্বয়ং হজরত খোৎবা পড়িয়া আলি ও ফাতেমাকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। এই দম্পতি যুগলের বিশেষত্ব ও মহিমা বর্ণনা করিতে হইলে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করার আবশ্যক। এখানে ঐতিহাসিক হিসাবে কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহারাই ছৈয়দ বংশের

আদি জনক জননী, এবং এমাম হাছন ও এমাম হোছেন ইহাদিগেরই দুলাল। (১)

মদীনার উপকণ্ঠে—শহরতলিতে প্রধানতঃ ৩ সম্প্রদায়ের য়িহুদী বিশেষ প্রতিপত্তিশালী এবং প্রভাব-সম্পন্ন ছিল। উহাদের নাম এই—(১) বনি-ক্বিনকায়, (২) বনি-নযির, (৩) বনি-ক্বরিয়াঃ। আবদুল্লা-বিন্-আবি ইহাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল। একদা বনি-ক্বিন্‌কায় বস্তিতে একটী মেলা উপলক্ষে, একটী মোছলমান মহিলাকে অপমান করার দরুণ মোছলমানদিগের সঙ্গে তাহাদের বিবাদ ও মারামারি আরম্ভ হইয়া, পরে উহা একটী যুদ্ধের আকার ধারণ করে। অল্পসংখ্যক মোছলমানকে য়িহুদিগণ খুব নির্য্যাতিত করাতে, সেই সংবাদ আঁ হজরত (ছালঃ) প্রাপ্ত হইয়া সশিষ্যে সেই মহাল্লায় উপস্থিত হন; এবং অত্যাচারী য়িহুদীদিগকে ভীম বিক্রমে আক্রমণ করেন। বনি-ক্বিন্‌কায় য়িহুদীদিগের মধ্যে যোদ্ধ পুরুষের সংখ্যা ৭০০ শত ছিল, কিন্তু মোছলমানদিগের ভীষণ আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা আপনাদের কেল্লায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। মোছলমানগণ দুর্গ অবরোধ করিলেন। অবশেষে তাহারা নিরুপায় হইয়া আত্ম-সমর্পণে বাধ্য হইল। ৭০০ য়িহুদী যোদ্ধ পুরুষকে বন্দী করা হইল। তৎকালীন সামরিক প্রথা অনুসারে তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করাই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু দয়ার সাগর আঁ হজরত (ছালঃ) তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। তদনুসারে হজরত এবাদাঃ বিন্-ছামত (রাজিঃ) তাহাদিগকে খয়বর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসিলেন। এই যুদ্ধে ও তরুণ বীর **হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যোগদান করিয়াছিলেন।**

---

(১) মোছনাদ, এছাবা, আবুদাউদ প্রভৃতি।

আবু-ছুফিয়ানের বিরুদ্ধে আঁ। হজরত (ছালঃ)-এর অভিযান।

বদরের মহাযুদ্ধের পর, আবু-ছুফিয়ানের উগ্রচণ্ডা স্ত্রী হেন্দাঃ, স্বীয় পিতা, পিতৃব্য ও ভ্রাতার বদর যুদ্ধে নিহত হওয়া-ব্যাপারে একান্ত শোকাকুলিতা হইয়াছিল। তাহার হৃদয়ে ভীষণ বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহা প্রচণ্ড নরকাগ্নির ন্যায় প্রবলভাবে প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল। সে স্বীয় স্বামী আবু-ছুফিয়ানকে, হজরত হামজা (রাজিঃ) ও হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হত্যা সাধন জন্য বিশেষ ভাবে উত্তেজিত করিতে লাগিল। অগত্যা আবু-ছুফিয়ান এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, আমি যত দিন পর্য্যন্ত মদীনা নগর লুণ্ঠন ও বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে না পারিব, ততকাল সর্ব্বপ্রকার সুখ-ভোগ ও বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করিব।

অনন্তর আবু-ছুফিয়ান ২০০ দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, মদীনা আক্রমণার্থ মক্কা হইতে যাত্রা করিল। প্রথমে সে সৈন্যদল দূরে রাখিয়া, স্বয়ং মোছলমান-বিদ্বেষী বনি-নযির-দলস্থ হাই-বিন্-আখ্তব নামক য়িহুদীর গৃহ-পার্শ্বে গিয়া তাহাকে ডাকিল। হাই তাহার আহ্বানে সাড়া দিল না, কিংবা স্বীয় গৃহ হইতে বাহির ও হইল না। পরে সে ছালাম বিন্ মছকাম নামক য়িহুদীর গৃহে অতিথি রূপে রাত্রি যাপন করে। পর দিন প্রত্যূষে মদীনার শহরতলির একস্থানে সদলবলে উপস্থিত হইয়া, আন্ছারদিগের খর্জ্জুর বাগান গুলি অগ্নি-সংযোগে পোড়াইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে হজরত ছয়ীদ আন্ছারী (রাজিঃ) এবং তাঁহার সহযোগী আর একজন আন্ছার 'কাশ্ত্কার' (কৃষক)-কে শহীদ করে। এই সংবাদ পাইবামাত্র আঁ। হজরত (ছালঃ) ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগকে সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে

বাহির হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইবামাত্রই কাফের সৈন্যদল ভয়ে পলায়ন করিল; মোছলমানদিগের সম্মুখীন হইতে তাহাদের সাহসে কুলাইল না। তাহারা এরূপ ভীতি-বিহ্বল ও সন্ত্রস্ত হইয়া দ্রুতগতি পলায়ন করিল যে, সঙ্গের ভার হাল্‌কা (লঘু) করিবার জন্য রসদ স্বরূপ আনীত ছাতুর বস্তা গুলি পথে পথে ফেলিয়া গেল। মোছলমান সৈন্যগণ "কদর" নামক স্থান পর্য্যন্ত তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে কোরেশদিগের পরিত্যক্ত সেই ছাতুর বস্তা গুলি তাঁহারা পাইয়া-ছিলেন। অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) সশিষ্যে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই অভিযান "গয্‌ওয়ায় ছাবিক" নামে অভিহিত হইয়া-ছিল; দ্বিতীয় হিজরীর যেলহজ্জ মাসে এই অভিযান গিয়াছিল।

তৃতীয় হিজরীর ঘটনাবলী।

বনি-ক্বিন্‌কায়ের যুদ্ধ।

আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনায় এক প্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, এবং তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিলে, মদীনার য়িহুদী ও পৌত্তলিক-গণ প্রমাদ গণিল। তাহারা আঁ হজরত (ছালঃ) এবং মোছলমানদিগের উচ্ছেদ সাধন মানসে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। এই সময় তৃতীয় আর একটী দলের সৃষ্টি হয়। য়িহুদী ধর্ম্মাবলম্বী আবদুল্লা-বিন্‌-আবি-বিন্‌-ছলুল নামক একব্যক্তি মদীনার মধ্যে বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি-সম্পন্ন ছিল। সে অত্যন্ত সুচতুর, বুদ্ধিমান্, রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ ছিল বলিয়া, মদীনাবাসিগণ তাহাকে আপনাদের দলপতি বা রাজা করিতে মনস্থ করিয়া ছিল; কিন্তু আঁ হজরত (ছালঃ)-এর মদীনায় আগমনে তাহার প্রভাব

একেবারে মাটী হইল। ইতিপূর্ব্বে মদীনা বাসিগণ তাহার জন্য একটী রাজমুকুট ও তৈয়ার করিয়াছিল ; কিন্তু সে সবই ব্যর্থ হইল। উল্লিখিত কারণে সে আঁ হজরত (ছালঃ) ও মোছলমানগণের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া, একটী নূতন দল গঠন করিল। তাহার পরম ভক্ত কতকগুলি য়িহুদী ও পৌত্তলিককে লইয়া এই নূতন দলটী গঠিত হইল ; বদরের যুদ্ধে মোছলমানদিগের গৌরবান্বিত বিজয় লাভ দেখিয়া তাহার হৃদয় ঈর্ষানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। এইবার সে কপটতার সহিত নিজে মোছলমান হইয়া, নিজের দলভুক্ত লোকগুলিকেও ঐরূপ প্রকাশ্যভাবে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়া, গোপনে আঁ হজরত (ছালঃ) ও মোছলমানদিলের সর্ব্বনাশ সাধন জন্য ষড়যন্ত্র পাকাইতে লাগিল। এমন কি, মক্কার কোরেশদিগের সঙ্গেও ষড়যন্ত্র চালাইতে ত্রুটী করিল না। আঁ হজরত (ছালঃ) এবং মোছলমানদিগকে অপদস্থ করিবার——এমন কি, একেবারে উৎসন্ন দিবার জন্য সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল।

ওহদের ভীষণ যুদ্ধ।

বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য মক্কার কোরেশগণ—বিশেষতঃ আবু-ছুফিয়ান-প্রমুখ তাহাদের নেতাগণ নিতান্তই আগ্রহান্বিত ছিল। কারণ তাহা-দের প্রধান প্রধান দলপতি ও শ্রেষ্ঠতম বীরপুরুষগণ বদর যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল, বন্দীদিগকে 'ফিদিয়া' (মুক্তি-পণ) দিয়া ছাড়াইতে (মুক্ত করিতে) হইয়াছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) ও মোছলমানদিগের ক্রমোন্নতি ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া, ঈর্ষানলে তাহাদের হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছিল। তাহারা আর একটা ভীষণ যুদ্ধে মোছলমানদিগের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার জন্য 'মৎলব' আঁটিতে-

ছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহারা মদীনার য়িহুদী, মোনাফেক এবং আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৌত্তলিকদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রসিদ্ধ কবি, উত্তেজনাকারী বক্তা বাছিয়া বাছিয়া, আরবের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেরণ করিল; তদ্দ্বারা বিলক্ষণ সুফলও ফলিল। বহু সম্প্রদায়ের যোদ্ধাগণ যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। মদীনার য়িহুদী এবং মোনাফেকগণ ও তাহাদিগকে খুব উৎসাহিত করিল।

এই যুদ্ধে কোরেশদিগের যোদ্ধসংখ্যা ৩০০০ ছিল বলিয়া অধিকাংশ ইতিহাস-বেত্তার এক মত। কিন্তু কেহ কেহ কোরেশ সৈন্য-সংখ্যা ৫০০০ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রকৃত যোদ্ধ-সংখ্যা ৩০০০ এবং সঙ্গীয় স্ত্রীলোক, শিক্ষা-নবীস্ যুবক, সর্ব্ব শ্রেণীর ভৃত্য (পরিচারক বা চাকর-নওকর), উষ্ট্র চালক, ঘোড়ার সহিস, 'বেহেশ্‌তি' (ভিস্তি), রসদ সংগ্রাহক ক্রীতদাস প্রভৃতি ২০০০ দুই হাজার, এই সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০০ লোক ছিল। তাহাদের মধ্যে উৎসাহ, উত্তেজনা ও উন্মাদনার কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

আঁ হজরত (ছালঃ) ১০০০ এক হাজার মাত্র শিষ্য (যোদ্ধা) লইয়া মদীনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। আবদুল্লা-বিন্-আবির নেতৃত্বাধীনে মোনাফেক যোদ্ধাগণ ও তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিল, কিন্তু মদীনা হইতে দেড় কিংবা দুই মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর, মোনাফেক দলের নেতা আবদুল্লা-বিন্-আবি স্বীয় অধীনস্থ ৩০০ যোদ্ধপুরুষ সহ মদীনায় ফিরিয়া গেল। সে বলিতে লাগিল, আমার মতানুযায়ী যখন মদীনা নগরের মধ্যে থাকিয়া প্রতিপক্ষের গতিরোধ করা হইল না, এরূপ অবস্থায় আমি মদীনার বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহি। ১০০০ মোছলেম যোদ্ধার মধ্যে ৩০০ চলিয়া যাওয়াতে, ৭০০ মাত্র যোদ্ধা অবশিষ্ট রহিলেন; আঁ হজরত (ছালঃ) ইহাদের মধ্য হইতেও একেবারে তরুণ বয়স্ক বালকদিগকে মদীনায়

ফিরাইয়া পাঠাইলেন ; সুতরাং মোছলমান যোদ্ধপুরুষের সংখ্যা ৬০০ শতের কিছু উপর ছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) এই অল্পসংখ্যক ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগকে সঙ্গে লইয়া দিবা অবসান কালে, মদীনা হইতে ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী " ওহদ " নামক পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। তৎপূর্ব্বেই বিরাট কাফের সেনাদল ঐ প্রান্তরের একদিকে শিবির সন্নিবিষ্ট করিয়াছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) ওহদ পাহাড় পশ্চাতে রাখিয়া ছাউনী ফেলিলেন। তৃতীয় হিজরীর ১৫ই শ'ওয়াল শনিবার দিন উভয় প্রতিপক্ষ দলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোছলেম সেনাদলের পশ্চাদ্ভাগে একটী অতি প্রয়োজনীয় গিরি--বর্ত্ম ছিল ; আঁ হজরত (ছালঃ) উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ করিয়া,হজরত আবদুল্লা-বিন্-জবির আন্ছারী (রাজিঃ)-এর অধিনায়ক তায় ৫০ জন সুদক্ষ 'তীরন্দায্' (ধনুর্ধারী) যোদ্ধা সেখানে স্থাপন করিলেন। তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, দ্বিতীয় আদেশ প্রাপ্তির পূর্ব্বে তোমরা এই গিরি বর্ত্ম (ঘাটি) কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। যুদ্ধে জয় কিংবা পরাজয় যাহাই হউক না কেন ? তোমরা এই গিরি-বর্ত্ম অতি সতর্কতার সহিত অবরোধ করিয়া থাকিবে ; শত্রুদলের কাহাকেও এই গিরি-বর্ত্ম অতিক্রম করিতে দিবে না। এই গিরিবর্ত্মটী এমন ভাবে অবস্থিত ছিল যে, শত্রুদল বহুদূর ঘুরিয়া মোছলমান সৈন্যদলের 'আকবে' (পশ্চাদ্ভাগে) গিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত। ৫০ জন ধনুর্ধরের পক্ষে এই সঙ্কীর্ণ ঘাটিটী রক্ষা করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল। তাঁহারা অতি বড় প্রবল সৈন্য দলের গতিও অবাধে রোধ করিতে পারিতেন। আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় সেনাদল অতি সুশৃঙ্খল ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ ভাগে হজরত যোবের-বিন্-আওয়াম (রাজিঃ)-কে এবং বামভাগে হজরত মন্যর-বিন্-ওমরু (রাজিঃ)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন ; আর মহাবীর হজরত হামযাঃ (রাজিঃ)-কে 'মকদ্দমাতুল জয়েশ্' এর (অগ্রবর্ত্তী

সেনা দলের) সেনাপতি 'মকারর' (নিয়োগ) ফরমাইলেন। হজরত মমছর-বিন্-য়মির (রাজিঃ)-এর হস্তে পবিত্র যুদ্ধ-পতাকা প্রদান করিলেন। হজরত আবু দজানাঃ (রাজিঃ) কে হুজুর (ছালঃ) স্বীয় তরবারি খানি প্রদান করিলেন। তিনি সেই পবিত্র তরবারি গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্রান্ত সিংহের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। কোরেশ পক্ষ ও ১০০ শত অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া মহাবীর খালেদ বিন্-অলিদকে দক্ষিণ বাহুর, এবং ১০০ অশ্বারোহীর নেতৃত্ব প্রদান পূর্ব্বক আকুরমাঃ-বিন্-আবুজহলকে বাম বাহুর সেনাপতি পদে বরিত করিল। আর আবদুল দার বংশীয় বীরপুরুষগণ চিরন্তন প্রথানুসারে কোরেশগণের পতাকা-বাহী নিযুক্ত হইল। অনতিবিলম্বে উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রণ-চণ্ডী রূপিনী হেন্দাঃ, স্বীয় দলস্থ রণরঙ্গিণী নারীগণ সহ কোরেশ সেনাদলের সঙ্গে থাকিয়া রণ-সঙ্গীত গাহিয়া, যোদ্ধপুরুষদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। উভয় প্রতিপক্ষ দল ভীম পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কোরেশদিগের ১২ জন রণ-পতাকাধারী একাধিক্রমে এই যুদ্ধে নিহত হয়; তন্মধ্যে একা খোদাতালার শার্দ্দূল হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ৮ জনকে নিহত করেন। ১২শ তম পতাকাধারী নিহত হওয়াতে, কোরেশদিগের মধ্য হইতে আর কেইই সাহসী হইয়া সেই পতাকা তুলিয়া লইল না, সুতরাং সেই পতাকা ভূতলে গড়াইতে লাগিল। বেলা দ্বি-প্রহরের সময় কোরেশগণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিতে লাগিল। যে সকল কোরেশ বীরাঙ্গণা সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া 'দফ্' বাজাইতে, এবং রণ-সঙ্গীত গাহিয়া পুরুষদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছিল, পলায়মান সৈন্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে, প্রবল জলস্রোতের পশ্চাদ্বর্ত্তী তৃণখণ্ডের ন্যায় তাহারা ও ভাসিয়া চলিল। নারী দলের সেনাপত্নী উগ্রচণ্ডাঃ হেন্দাঃ ও আতঙ্কিত হৃদয়ে—ঊর্দ্ধশ্বাসে

পলায়ন করিতে লাগিল, এবং নিজের সমস্ত 'আছবাব' (সামগ্রী-সম্ভার) যুদ্ধক্ষেত্রে ছাড়িয়া গেল। সুতরাং যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় কোরেশদিগের সম্পূর্ণ পরাজয়ই ঘটিল। কোরেশদিগের ভীষণ পরাজয় এবং পলায়ন-ব্যাপার দর্শনে পূর্ব্বোক্ত গিরি-সঙ্কটে অবস্থিত ধনুর্দ্ধারিগণের মনে এই বাসনা ও 'জোশ্' (উত্তেজনা) উপস্থিত হইল যে, যুদ্ধ ত জয় হইয়াছেই, এক্ষণে আমরা ও শত্রুদলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, যুদ্ধ-বিজয়ের গৌরব লাভ করি। ঐ তীরান্দাথ্ দলের সেনাপতি হজরত আবদুল্লা-বিন্ জবীর (রাজিঃ) তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে বাধা প্রদান করিলেও, তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এই অবসরে মহাবীর খালেদ-বিন্-অলিদ স্বদলের শোচনীয় পরাজয় দর্শনে বহুদূর ঘুরিয়া, পূর্ব্বোক্ত গিরি-সঙ্কটের পশ্চাদ্দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন তত্রত্য ধনুর্ধারিগণের প্রায় সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছিলেন; মোস্লেম সেনাপতি কয়েকজন মাত্র সঙ্গীসহ সেই প্রবল শত্রুদলের সম্মুখীন হইয়া—বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইলেন। বিজয়ী মোছলমানগণ হঠাৎ পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পলায়ীত কোরেশদল ও ফিরিয়া দাঁড়াইল, আবার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে মহাবীর হজরত আমীর-হামযাঃ (রাজি)-কে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া, ওহসী নামক একজন ক্রীতদাস নেযার (বল্লম বিশেষ) অব্যর্থ সন্ধানে ভূপাতিত করিল; সঙ্গে সঙ্গে তিনি শহীদ হইলেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাযেউন)। তৎপর প্রতিহিংসা-পরায়ণা হেন্দাঃ রাক্ষসী মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার নাক কাণ কাটিয়া চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন ও বক্ষঃ বিদীর্ণ করিল, এবং হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া চর্ব্বণ পূর্ব্বক স্বীয় পৈশাচিক প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত করিল। অতঃপর বিভিন্ন স্থানে তখন খণ্ড যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হত্যা সাধন জন্য কোফ্ফার চতুর্দ্দিক হইতে পঙ্গপালের ন্যায় ছুটীয়া আসিতে

লাগিল। মহাবীর হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ) বিক্রান্ত সিংহের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া বহু শত্রুর বিনাশ সাধন করিলেন। এক দুর্দ্দান্ত পাষণ্ড আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করাতে, তাঁহার নীচের পাটির একটী পবিত্র দন্ত শহীদ হয়। এই সময় তাঁহার কদম মবারক এক গর্ত্তে পতিত হওয়াতে, তিনি ভূতলে পড়িয়া যান; তৎক্ষণাৎ হজরত আলী (কঃ -ওঃ) তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন; এবং হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত তাল্হা (রাজিঃ) তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। এই সময় বহু সংখ্যক ছাহাবাঃ (রাজিঃ) চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া সেখানে সমবেত হইলেন; হুজুর (ছালঃ) তাঁহাদিগকে লইয়া নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের এক টিলায় আরোহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোরেশদিগের আক্রমণের গতি ও মন্দীভূত হইয়া আসিল। অবশেষে তাহারা আপনা হইতেই রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। মোছলমানগণ যুদ্ধে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, তাঁহাদের পরাজয় ঘটে নাই। তাঁহারা রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন নাই; শত্রুগণ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিবার সুযোগ পায় নাই; কোনও মোছলমানকে তাহারা বন্দী করিতে পারে নাই; তাঁহাদের কোনও সামগ্রী-সম্ভার হস্তগত করিতে সমর্থ হয় নাই। এই ভীষণ যুদ্ধে ৪ জন মহাজেরিণ ও ৬৫ জন আন্ছার শহীদ হইয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের দফণ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আজিও (প্রায় ১৪ শত বৎসর পরেও) ওহদ ক্ষেত্রে সেই শহীদ মোছলমানদিগের কবর হাজিগণ ভক্তিভাবে যেয়ারত করিয়া থাকেন। আঁ হজরত (ছালঃ) ঐ দিনই মদীনায় পঁহুছিয়া, ৩য় হিজরীর ১৩ই শওয়াল রবিবার দিন ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যাহারা ওহদের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল, কেবল তাহারাই কোফ্ফারের সঙ্গে যুদ্ধ করণার্থ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। যাহারা

ওহদের যুদ্ধে যোগদান করে নাই, তাহারা এই যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিবে না। কোফ্‌ফার পুনরায় মদীনা আক্রমণ করিবে, এই আশঙ্কায় তিনি এই যুদ্ধযাত্রা করেন। তাঁহার আদেশে আহত যোদ্ধবৃন্দ ও মহোৎসাহে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। মদীনা তৈয়বা হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী "হামরায়ল-আছদ" নামক স্থানে গিয়া তিনি শিবির সন্নিবেশ, এবং ৩ দিন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিলেন; কিন্তু কোফ্‌ফারের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। কোরেশগণ মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে "রুহা" নামক স্থান পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া পরস্পর পরামর্শ দ্বারা স্থির করিল যে, এ যুদ্ধে ত আমাদের জয়লাভ ঘটে নাই; সুতরাং চল আমরা পুনরায় গিয়া মদীনা আক্রমণ করি। প্রধান সেনাপতি আবু-ছুফিয়ানও তাহাদের সঙ্গে এক মতাবলম্বী হইয়া পুনর্যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল; এই সময় মায়াবদ-বিন্-আবি মায়াবদ মদীনার দিক্ হইতে আসিয়া তাহাদিগকে সংবাদ দিল যে, (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) মদীনা হইতে সদলবলে বাহির হইয়া তোমাদের 'তায়ক্কব' (পশ্চাদ্ধাবন)-জন্য আসিতেছেন। আমি ঐ মোছলমান সৈন্যদলকে "হামরায়ল-আছদে" দেখিয়া আসিয়াছি; আর সম্ভবতঃ তাঁহারা অতি সত্বরেই তোমাদের নিকটে আসিয়া পঁহুছিবেন। এই সংবাদ শ্রবণে কোরেশ যোদ্ধপুরুষগণ ভয়ে একান্ত অভিভূত হইয়া দ্রুতগতি মক্কাভিমুখে পলায়ন করিল। আঁ হজরত (ছালঃ) যখন তাঁহাদের পলায়ন-সংবাদ বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিতে পারিলেন, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া সশিষ্য মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই অভিযান "গেয্‌ওয়া হামরায়ল আছদ" নামে প্রসিদ্ধ। **হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ) এই অভিযানেও গমন করিয়াছিলেন।** এই অভিযানের পর তৃতীয় হিজরীর যেলহজ্জ মাস পর্য্যন্ত আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনাই।

৪র্থ হিজরীর ঘটনাবলী।

৪র্থ হিজরীর ১লা মোহব্‌রম তারিখে আঁ হজরত (ছালঃ) সংবাদ পাইলেন, " কতন " নামক স্থানে তাল্‌হা-বিন্‌-খোয়েল্‌দ ও ছলমাঃ-বিন্‌-খোয়েল্‌দের নেতৃত্বাধীনে " বনি-আছদ " সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক বিপ্লববাদী সমবেত হইয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্তে আঁ হজরত (ছালঃ) তাহাদের দমনার্থ হজরত আবু-ছালমাঃ মখ্‌যোমী (রাজিঃ)-কে ১৫০ শত যোদ্ধ-পুরুষ (ছাহাবাঃ কারাম) সহ পাঠাইলেন। কিন্তু মোছলমানদিগের আগমন সংবাদ শুনিয়াই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। তাহাদের কতকগুলি পশু হস্তগত করিয়া মোছলমানগণ বিজয়োল্লাসে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ওয়াদি আরকাতের নিকটস্থ " আরনাঃ " নামক স্থানেছফিয়ান-বিন্‌-খালেদ হিয্‌লী নামক একজন কাট্টা কাফের বাস করিত; সে অন্যান্য কাফেরের সঙ্গে যোগ দিয়া মদীনা আক্রমণের যোগাড়-যন্ত্র করিয়াছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) এই সংবাদ পাইয়া, ৪র্থ হিজরীর ৫ই মোহব্‌রম তারিখে, আবদুল্লা বিন্‌ আনিছ (রাজিঃ)-কে একদল সৈন্যসহ উহাদিগের দমনার্থ পাঠাইলেন। আবদুল্লা-বিন্‌-আনিছ (রাজিঃ) তথায় গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ না করিয়া কোনও কৌশলে বিপ্লববাদীদিগের নেতা ছুফিয়ান-বিন্‌-খালেদের মুণ্ডপাত করিলেন; তিনি উহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া ২৩শে মোহব্‌রম মদীনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সালের ছফর মাসে মক্কার কোরেশগণ বনি-গযল ও কারা সম্প্রদায়ের ৭ ব্যক্তিকে 'ফেরেব' (চক্রান্ত—'দাগাবাজী') করিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট পাঠাইল; সেই কপটগণ মদীনায় পঁহুছিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'খেদমতে আরজ' করিল যে, আমাদের সমগ্র 'কওম' (সম্প্রদায়) ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে,

অতএব আপনি আমাদের সঙ্গে কতিপয় উপযুক্ত শিক্ষাদাতা মোছলমান পাঠাইয়া দেন—তাঁহারা আমাদিগকে ইছলামের সমুদয় নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিবেন। আঁ হজরত (ছালঃ) তাহাদের কথা সরল ভাবে বিশ্বাস করিয়া, ১০ জন শিক্ষা-দাতা উপযুক্ত মোছলমান তাহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। মরছদ-বিন্ আবি-মরছদ গন্থরী কিংবা আছেম-বিন্-ছাবেত্-বিন্-আবি আলা ফলহ (রাজিঃ) কে এই সম্মানিত দলের নেতা করিয়া পাঠাইলেন। আহা! ঐ বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ডগণ তাঁহাদিগকে আপনাদের সুবিধাজনক স্থানে লইয়া গিয়া, পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে ২০০ যোদ্ধ পুরুষ দ্বারা ঘেরাইয়া ফেলিল। তখন এই ১০ জন মাত্র মোছলমান ২০ গুণ অধিক সশস্ত্র যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ৮ জন শহীদ ও ২ জন তাঁহাদের হস্তে বন্দী হইলেন। যে দুইজন ধর্ম্মপ্রাণ জলন্ত বিশ্বাসী মোছলমান ধৃত ও বন্দী হইলেন, তাঁহাদের নাম খবিব-বিন্-আদি (রাজিঃ) এবং যয়েদ-বিনল্-দছনা (রাজিঃ); এই দুইজন ছাহাবাকে কাফেরগণ মক্কায় লইয়া গেল, এবং দুর্দ্দান্ত কোরেশগণ অতি নির্দ্দয় ভাবে তাঁহাদিগকে শহীদ (হত্যা) করিল। সেই অবস্থায় তাঁহারা যে জলন্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি অপূর্ব্ব ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাইয়া গিয়াছেন, ইছলামের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। তাঁহাদের অন্যায় রূপ নৃশংস হত্যা-কাণ্ডে আঁ হজরত (ছালঃ), এবং ছাহাবাঃ (রাজিঃ) মণ্ডলী অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এইরূপে নজদের অধিবাসিগণ হজরত মনযর্-বিন্-ওমরু (রাজিঃ) ও তৎ সঙ্গীয় ৬৮ জন ছাহাবাঃ কে অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়াছিল; ইঁহারা সকলেই হাফেজ এবং কারী ছিলেন। কেবল-মাত্র হজরত ওমরু-বিন্-ওম্মিয়া যমিরি (রাজিঃ) এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

ইহার পর আঁ হজরত (ছালঃ) কোনও কার্য্য-সূত্রে বনি-নজীর

সম্প্রদায়স্থ য়িহুদীদিগের মহাল্লায় গমন করিয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) এবং হজরত আলী (কঃ—ওঃ) গিয়াছিলেন। য়িহুদিগণ তাঁহাদিগকে আপনাদিগের কেল্লার প্রাচীরের নিকট বসাইয়া, একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর দুর্গ-শীর্ষ হইতে তাঁহাদের উপর গড়াইয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল; উদ্দেশ্য, যাহাতে তাঁহারা পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আল্লাহ তা'লা কর্ত্তৃক সতর্কতা-সূচক ওহী নাজেল হওয়াতে, আঁ হজরত (ছালঃ) ছাহাবাঃ ত্রয়কে সঙ্গে লইয়া মদীনায় প্রস্থান করিলেন; তৎপর আঁ হজরত (ছালঃ), ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগকে সঙ্গে লইয়া এই বিশ্বাসঘাতক বিপ্লববাদী সম্প্রয়াদকে, আক্রমণ করিলেন, তাহারা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আপনাদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মোছলমানগণ দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই অবরোধ কার্য্য ১৫ দিন কাল স্থায়ী ছিল; তৎপর য়িহুদিগণ নিরুপায় হইয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রস্তাবানুসারে স্বীয় জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইতে রাজী হওয়াতে, অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীত আর সমস্ত জিনিষ-পত্র সহ তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে আদেশ করা হইল; তদনুসারে তাহাদের অধিকাংশ খয়বরে এবং কতকাংশ সুদূর সিরিয়ায় চলিয়া গেল। এই ঘটনায় মদীনায় য়িহুদী-ষড়যন্ত্রের ভিত্তি অনেকটা শিথিল হইল। এই যুদ্ধ "গেয্ওয়া বনি-নযির" নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধকালেই কোরআন পাকের ছুরে "হশর" নাজেল হয়। এই যুদ্ধ ৪র্থ হিজরীর রবিওল-আউওল মাসে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। **হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া স্বীয় অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।** ইহার এক মাস কাল পরে বনু-মহাযেরও বনু-ছয়লবাঃ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আঁ হজরত (ছালঃ) সসৈন্যে অভিযান করেন; **এই অভিযানেও হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহার সঙ্গী**

হইয়াছিলেন। এই অভিযান " গয্ওয়া-যাতার রাকায়া " নামে প্রসিদ্ধ। বিপক্ষ দল যুদ্ধ না করিয়াই পলায়ন করিল। এই স্থানটি নজদের এলাকা ভুক্ত ছিল।

ওহদের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আবু-ছুফিয়ান মোছলমানদিগকে বলিয়া গিয়াছিল, আমরা আগামী বর্ষে আসিয়া তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর বিষম বিরুদ্ধাচারী ও মোছলমানদিগের পরম শত্রু মোনাফেকগণ ও মক্কার কোরেশদিগকে যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে উত্তেজিত করিতেছিল; তদনুসারে কোরেশগণ যুদ্ধের বিরাট আয়োজন করিয়া, মদীনাভিমুখে অগ্রসর হইল; আঁ হজরত (ছালঃ) ও এই সংবাদ শুনিয়া ১৫০০ যোদ্ধ পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। **এই যুদ্ধে তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তে যুদ্ধ-পতাকা প্রদান করিয়াছিলেন। উপযুক্ত হস্তেই যুদ্ধ পতাকা অর্পিত হইয়াছিল।** এই অভিযানে মোছলমানদিগের মধ্যে অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০ জন; অবশিষ্ট সকলেই পদাতিক ছিলেন। আবু-ছুফিয়ানের ত এ বৎসর যুদ্ধ করিবার ইচ্ছাই ছিল না; এক্ষণে যখন শুনিতে পাইল, আঁ হজরত (ছালঃ) সদলবলে বদরের দিকে রওয়ানা হইয়াছেন, তখন অগত্যা তাড়াতাড়ি যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া ২ হাজার 'জার্রার' (বিক্রান্ত) সৈন্য লইয়া মহাড়ম্বরে মক্কা হইতে যাত্রা করিল। মক্কায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ থাকাতে রসদের জন্য কেবলমাত্র ছাতুর বস্তা সঙ্গে লইয়াছিল; এজন্য এই অভিযান "জয়েশ্ছ ছাবিক" নামে অভিহিত হইয়াছে।

আবু-ছুফিয়ানের সৈনাদলে এবার ৫০ জন মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী যুদ্ধ সমূহে মোছলমান যোদ্ধার সংখ্যা কোফ্ফারের এক তৃতীয়াংশ ও এক চতুর্থাংশ হইলেও, যুদ্ধে মোছলমানগণ জয়ী কিংবা আংশিক জয়ী

হইয়াছিলেন। এবার মোছলমানদিগের সংখ্যা তাহাদের চারি ভাগের তিন ভাগ, সুতরাং এবারকার যুদ্ধে সাফল্য লাভের আশা একেবারেই নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের উৎসাহ ও উত্তেজনা একেবারে লয় প্রাপ্ত হইল। তাহারা "ম্যাছফান" নামক স্থানে হইতে লাঙ্গুল গুটাইয়া প্রস্থান করিল। এই রণ-বিমুখ সৈন্যগণ যখন মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন মক্কার বীর রমণীগণ তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিল, তোমরা ত কেবল ছাতু খাইবার জন্য গিয়াছিলে, যদি প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধের জন্য যাইতে, তবে কাপুরুষের ন্যায় বিনা যুদ্ধে চলিয়া আসিতে না।

আঁ হজরত (ছালঃ) আট দিন পর্য্যন্ত বদরে শিবির-সন্নিবেশ পূর্ব্বক কাফেরদিগের আগমন-প্রতীক্ষায় অবস্থান করিলেন ; কিন্তু যখন বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিতে পারিলেন, কোরেশগণ "ম্যাছফান" হইতে ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি বদর হইতে সশিষ্যে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহা ৪র্থ হিজরীর রজব মাসের ঘটনা। এই বৎসরই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। আর হজরত আবহুছ-ছালাম মখ্‌যুমী (রাজিঃ)-এর মৃত্যু হওয়াতে, তাঁহার বিধবা-পত্নী ওম্মে ছালমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে আঁ হজরত (ছালঃ) পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন। আবার এই বৎসরই হজরত ফাতেমাঃ-বিন্তে আছিদ (রাঃ—আঃ)—অর্থাৎ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর 'ওয়ালেদা-মাজেদাঃ' (গর্ভধারিণী)—এই চতুর্থ হিজরীতেই পরলোক গমন করেন। আঁ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং তাঁহার জানাযার নমাজ পড়িয়াছিলেন।

৫ম হিজরীর ঘটনাবলী।

দোমতল-জন্দলের অভিযান।

বদরের দ্বিতীয় অভিযানের ৬।৭ মাস পরে হ্জ্রা হজরত (ছাঃ) সংবাদ পাইলেন, সিরিয়া-সীমান্তস্থিত দোমতল-জন্দলের খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বী শাসনকর্ত্তা আকিদর-বিন্-আল্মালেক এক বিরাট বাহিনী, মদীনা-মনুওরা আক্রমণ করিবার জন্য সজ্জিত করিয়াছে ; আর আরবের—বিশেষতঃ মদীনা অঞ্চলের যে সকল তেজারতি কাফেলা সিরিয়ার দিকে যায়, সে পথিমধ্যে তাহাদের বাণিজ্য-দ্রব্যাদি লুঠিয়া লয়। এই নূতন শত্রুদল ক্রমে ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে, এবং উহারা সাহসী হইয়া মদীনা-তৈয়বা আক্রমণ করিলে য়িহুদী, মোনাফেক এবং মদীনার পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন জনপদের পৌত্তলিক প্রভৃতি জাতিগণ কর্ত্তৃক মোছলমানদিগের বিপদ আরও ঘনীভূত হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং পূর্ব্বাহ্লেই ইহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া আঁ হজরত (ছাঃ) স্বয়ং দোমতল জন্দলাভিমুখে অভিযান করিলেন ; তাঁহার সঙ্গে ১০০০ যোদ্ধপুরুষ গমন করিলেন। **এই অভিযানেও হজরত আলী (কঃ—ওঃ) গমন করিয়াছিলেন।** আঁ হজরত (ছাঃ)-এর আগমন সংবাদ শ্রবণেই দোমতল জন্দলের শাসনকর্ত্তা ও তাহার সেনাদল ভয়ে পলায়ন করিল। আঁ হজরত (ছাঃ) কয়েক দিন সেখানে থাকিয়া, শামের সীমায় সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপন পূর্ব্বক মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরবর্ত্তী ৫ মাস কাল আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। ৫ম হিজরীর শা'বান মাসে সংবাদ পঁহুছিল যে, বনু-মস্তালক সম্প্রদায়ের দলপতি হারেছ-বিন্-জরার বিপুল আয়োজনের সঙ্গে যুদ্ধ-সজ্জা করিতেছে ; আর সে আরবের বিভিন্ন বহু সম্প্রদায়কে স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে। অনুসন্ধানে সংবাদ সঠিক বলিয়া জানিয়া

আঁ হজরত (ছালঃ) অনতিবিলম্বে এই বিপ্লববাদীদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। চশমাঃ মরছিয়ির তটে শত্রুদলের সঙ্গে যুদ্ধ হইল ; যুদ্ধে কাফেরগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। বহুসংখ্যক কাফের নিহত ও বন্দী হইল ; তন্মধ্যে বনু-মছতালকের ছরদার হারেছের এক কন্যাও ছিলেন। বনু-মছতালক সম্প্রদায়ের য়িহুদীদিগের বাসস্থান মদীনা হইতে ৮ মঞ্জেলের পথ দূরে অবস্থিত ছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বন্দী ও যুদ্ধ-জয়লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার লইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। **এই যুদ্ধেও হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বিশেষ শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।**

ইহার পর অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযান নানা দিকে প্রেরিত হয় ; সেই সমুদয় অভিযানেই শত্রুদল পর্য্যুদস্ত ও দমিত হইয়াছিল। বনি-নযির দলস্থ য়িহুদিদিগের দলপতি হাই বিন্-আকতব সর্ব্বাপেক্ষা বড় 'মোফ্ছেদ' (বিপ্লববাদী) ছিল ; সে এবং বনি-নযিরের প্রধান অংশ খয়বরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল ; ইহাদের সমুদয় প্রধান প্রধান দলপতি এবং আরও কতিপয় সম্প্রদায়ের নেতা মক্কায় কোরেশদিগের নিকট গমন করিল ; সেখানে গিয়া কোরেশদিগকে যুদ্ধের জন্য খুব উত্তেজিত করিয়া তুলিল। কোরেশগণও তাহাদের প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি দান পূর্ব্বক, যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ আপনাদের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহের বন্দোবস্ত করিল।

খন্দক অর্থাৎ পরিখার যুদ্ধ।

মক্কার কোরেশ এবং খয়বরের য়িহুদীদিগের যোগাড়-যন্ত্রে আরবের আরও বহু সম্প্রদায়ের লোক মোছলমানদিগকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন দিবার

অস্ত্র বদ্ধ-পরিকর হইল। তদনুসারে আবু-ছুফিয়ান ৪০০০ চারি হাজার সৈন্য লইয়া মদীনাভিমুখে অগ্রসর হইল; পথিমধ্যে আরও বহু সম্প্রদায়ের যোদ্ধদল আসিয়া কোরেশ সেনাদলে যোগদান করিতে লাগিল। বনি-নযির ও বনি-গৎফান সম্প্রদায়—অর্থাৎ খয়বরের য়িহুদী এবং অপর পরাক্রান্ত য়িহুদী সম্প্রদায় এই বিরাট সেনাদলে যোগদান করাতে, মদীনার নিকটবর্ত্তী হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদের সংখ্যা ১০ বা ১৫।১৬ হাজার হইয়াছিল। কোরেশ দলপতি আবু ছুফিয়ান ছিল এই বিরাট সেনাদলের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি। ইহাদের সঙ্গে ৪॥০ সাড়ে চারি হাজার উষ্ট্র ও ৩০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। আঁ হজরত (ছালঃ)-এই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া অত বড় প্রচণ্ড সৈন্য-দলের সঙ্গে নগরের বাহিরে গিয়া, কিরূপে তাহাদের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধ ও তাহাদের গতিরোধ করিবেন, তৎসম্বন্ধে একটী পরামর্শ-সভায় কর্ত্তব্য স্থির হইল। হজরত ছলমন ফারছী (রাজিঃ) পারস্য দেশ-বাসী ছিলেন, তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আমাদের দেশে এইরূপ অবস্থায় 'খন্দক' (পরিখা) খনন করিয়া, তাহার বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া আত্মরক্ষা করা হয়। আঁ হজরত (ছালঃ) এবং প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। তদনুসারে তাড়াতাড়ি পরিখা খনন কার্য্য আরম্ভ হইল। আঁ হজরত (ছালঃ) স্বয়ংও খন্দক খননে প্রবৃত্ত হইলেন। অবিশ্রান্ত ভাবে খনন কার্য্য করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে পরিখা খনন শেষ করা হইল। কোফ্‌ফার পরিখার তটে উপস্থিত হইয়া অবাক্ হইয়া গেল। আরব দেশে পরিখা খনন দ্বারা আক্রমণকারী দিগের গতিরোধ ব্যাপার, তাহারা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখিয়াছিল না। কোফ্‌ফারের পঙ্গপাল সদৃশ অগণিত সেনাদল মদীনা-তৈয়বা অবরোধ পূর্ব্বক কয়েক বার বিপুল বিক্রমে পরিখা পার হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু একবার ও তাহাতে কৃতকার্য্য হয় নাই। একবার ২।৩ জন মহা পরাক্রান্তশালী

খ্যাতনামা বীরপুরুষ, সর্ব্বাপেক্ষা কম চওড়া স্থান দিয়া পরিখা পার হইবার মানসে অশ্বারোহণে পরিখা মধ্যে অবতরণ করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে ওমর-বিন্-আবদ নামক আরবের একজন প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ, দুই হাজার অশ্বারোহী বীরের সমান বলিয়া গণ্য হইত; **বীরেন্দ্র কেশরী হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ) তাহাকে কতল (হত্যা) করিলেন ;** অপর দুইজন পলায়ন করিয়া কোনও রূপে রক্ষা করিল। এই অবরোধ কার্য্য প্রায় একমাস কাল 'জারী' ছিল। অবরোধকারী কাফের গণের সাহায্যার্থ অনবরত দলে দলে যোদ্ধপুরুষ ও প্রচুর পরিমাণ রসদ-পত্র আসিতেছিল ; কিন্তু অবরুদ্ধ মোছলমানদিগের কোনও দিক্ দিয়া কিছুমাত্র সাহায্য পাইবার আশা ছিল না। তাঁহাদিগকে অনেক সময় অনাহার বা অর্দ্ধাহারে কাটাইতে হইয়াছিল। অনেকে পেটে পাথর বাঁধিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। এক সময় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পেটে ২ খানি পাথর বাঁধা ছিল। অবরোধের ২৭ সাতাইশ দিন গত হইয়া গেলে, রাত্রিকালে এক প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত হইল ; বাতাসের জোরে কোফ্ফারের তাম্বুর খোটাগুলি খুলিয়া যাইতে লাগিল, 'চুল্হার' (উনানের) উপর হইতে দেগ্চি গুলি নীচে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ;—" ফারছালনা আলায়হিম রিহাও ওজনুদাকুম্ তরাওহা " আমি উহাদের উপর হাওয়া (বাতাস) পাঠাইলাম, আর এমন একদল সৈন্য পাঠাইলাম, যাহাদিগকে তুমি দেখিতে পাইতেছিলে না। উপরোক্ত প্রবল ঝড় ও অলক্ষিত সৈন্যদল দ্বারা মোছলমানদিগের অনুকূলে অনেক কাজ হইল ; তাম্বু সমূহের অনেক স্থলে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল। কোফ্ফার এই ঘটনা এবং অগ্নি-নির্ব্বাণ হওয়াকে একটা দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করিল। তদনুসারে তাহারা সেই রাত্রিকালেই ডেরা-ডাণ্ডা তুলিয়া (শিবির ও তাম্বুগুলি গুটাইয়া) সেখান হইতে 'ফেরার' (পলায়নপর) হইল।

কোফ্ফারের পলায়ন সংবাদ খোদা তা'লার পক্ষ হইতে আঁ হজরত (ছালঃ) কে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হজিফা-বিন্-আলিমান (রাজিঃ) কে 'খন্দকের' (পরিখার) পরপারে পাঠাইলেন; তিনি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন, কোফ্ফারের 'লশ্কর-গাহ্' (সেনাদলের অবস্থান-স্থান) খালি পড়িয়া আছে; তাহারা সকলেই পলায়ন করিয়াছে। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, অতঃপর কোফ্ফার কোরেশগণ আর কখনও আমাদিগকে আক্রমণ করিবে না। অতঃপর মোছলমানগণ নিশ্চিন্ত মনে পরিখার নিকট হইতে মদীনাস্থ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বনি কুরিজার সঙ্গে

আঁ হজরত (ছালঃ) অতি অল্পকাল মাত্র মদীনায় অবস্থান করিয়া ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগকে বনি-কুরিজার মহাল্লায় অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। পরিখার যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহাদিগকে শান্তির সহিত বসবাস করিবার জন্য, ইহাদিগের আত্মীয় ও বিশেষ হিতৈষী হজরত ছায়াদ-বিন্-মায়াষ্ (রাজিঃ), আঁ হজরত (ছালঃ) কর্ত্তৃক ইহাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এই গর্ব্বোন্মত্ত য়িহুদিগণ নানাপ্রকার বে-আদবী পূর্ণ কথা বলিয়া তাঁহাকে ফেরত পাঠাইয়াছিল। পরে কোরেশদিগের সহিত এই দুর্ব্বৃত্তগণ ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) এই অভিযানে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে 'আলম-বরদার (পতাকা-ধারী—সেনাপতি) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) উহাদের মহাল্লার নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন; ঐ পাষণ্ডগণ (নউজ বেল্লাহে মিনহা) আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি অকথ্যগালি বর্ষণ

করিতেছে। স্থূলকথা, এশার নমাজ পর্য্যন্ত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের আগমন-স্রোত চলিয়াছিল। মোছলমানগণ বনি-করিজার কেল্লা ২৫ দিন পর্য্যন্ত অবরোধ করিয়া থাকিলেন। অগত্যা তত্রত্য য়িহুদিগণ এই শর্ত্ত লইয়া একদল প্রতিনিধি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'খেদমতে' পাঠাইল যে, আমাদেব সম্বন্ধে মহাত্মা ছায়াদ-বিন্-মায়ায্ (রাজিঃ) যে দণ্ড বিধান করিবেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিব। আঁ হজরত (ছালঃ) তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আহত ও চিকিৎসাধীন হজরত ছায়াদ-বিন্-মায়াজ (রাজিঃ) কে শিবিকারোহণে মদীনা হইতে সেখানে আনাইলেন। তিনি আসিয়া আদেশ দিলেন, বনু-করিযার সমুদয় পুরুষকে 'কতল' (হত্যা) করা হউক ; এবং উহাদের স্ত্রী-পুত্রগণের সঙ্গে 'আছিরানে জঙ্গের' (যুদ্ধে বন্দী লোকদিগের) ন্যায় ব্যবহার করা যাউক ; আর তাহাদের সমুদয় ধন-সম্পত্তি মোছলমান দিগের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করিয়া দেওয়া হউক। তদনুসারে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া মদীনায় আনা হইল, উহাদিগের পুরুষদিগকে হত্যা করা হইল, আর তাহাদের গৃহাদি মোসলমানদিগের বস-বাস করিবার জন্য ভাগ-বণ্টন করিয়া দেওয়া গেল। এই দিন হইতে মদীনা-মনুওরায় অন্তর্ব্বিপ্লবের পথ কতকটা বন্ধ হইল। ইহার পর আঁ হজরত (ছালঃ) কয়েকটী অভিযান নানাদিকে পাঠাইলেন। ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ ঐ সকল অভিযানে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর ঘটনাবলী।

এই বৎসর আঁ হজরত (ছালঃ) সংবাদ পাইলেন যে, বনু-বকর সম্প্রদায় খয়বরের য়িহুদিগণের সঙ্গে 'ছাযশ্' (ষড়যন্ত্র) করিয়া, মদীনা-আক্রমণের যোগাড়-যন্ত্র করিতেছে। আঁ হজরত (ছালঃ) হজরত আলী

(রাজিঃ) কে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া দুইশত যোদ্ধৃ-পুরুষ, বনু-বকর সম্প্রদায়ের 'ছরকোবির' (দমন) জন্য পাঠাইলেন। পথিমধ্যে বনু-বকর সম্প্রদায়ের এক 'জাছুছ' (গুপ্তচর) মোছলমানদিগের হস্তে বন্দী হইল। গুপ্তচর ধৃত হইয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর হুজুরে আনীত হইলে সে বলিল, যদি আমার প্রাণ ভিক্ষা দেন, তবে আমি আপনাদিগকে বনু-বকর সম্প্রদায়ের সমবেত হওয়ার স্থান দেখাইয়া দিতে পারি। তদনুসারে হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ) তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন, এবং বনু-বকরের একত্র সমাবেশ হইবার স্থান জানিয়া লইয়া গুপ্তচরটীকে মুক্তি প্রদান করিলেন। এক্ষণে সেনাপতি অতি দ্রুত-পদে অগ্রসর হইয়া 'ফদক্' নামক স্থানে পঁহুছিলেন, এবং শত্রুদলকে অকস্মাৎ প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করিলেন; তাহারা যুদ্ধে শোচনীয় রূপে পরাজিত হইয়া বিশৃঙ্খল-ভাবে পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে ৫০০ উষ্ট্র ও ২০০০ ছাগ-মেষাদি পশু মোছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। 'মালে-গনিমৎ' (যুদ্ধে জয় লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার) লইয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বিজয়ী-বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর শওয়াল মাসে আঁ হজরত (ছাল) 'খাবে' (স্বপ্নে) দেখিলেন যে, তিনি ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের সঙ্গে পবিত্র কাবা-গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন; এই সময় আঁ হজরত (ছালঃ) এবং ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের, কাবার তওয়াফ্ করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল; এই

স্বপ্ন দর্শনের ফলে সেই ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা আরও অধিকতর বলবতী হইল। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) কাবাঃ যেয়ারত্ করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন। তদনুসারে ৬ষ্ঠ হিজরীর জেল্কদ মাসে তিনি ১ হাজার ৪ শত ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) কে সঙ্গে লইয়া মক্কা হইতে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন—য়োমরার 'এহরাম' বাঁধিলেন; এবং কোরবাণীর জন্য ৭০টী উষ্ট্র সঙ্গে লইলেন।

"যিল্-হুলিফাঃ" নামক স্থানে পঁহুছিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) কোরেশ-দিগের ভাব-গতিক জানিবার জন্য একটী লোককে 'জাছুছ' (গুপ্তচর) রূপে মক্কায় প্রেরণ করিলেন। সেই ব্যক্তি 'আছকান' নামক স্থানে আসিয়া হুজুর (ছালঃ) কে সংবাদ দিল যে, কোরেশগণ আপনার আগমন-সংবাদ পাইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য এক বিরাট বাহিনী সজ্জিত করিয়াছে; তাহারা আপনাকে মক্কায় এবং খানাঃ কাবায় প্রবেশ করিতে সাধ্যানুসারে বাধা দিবে। আঁ হজরত (ছালঃ) এই সংবাদ প্রাপ্তে ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাফেলাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। **এই কাফেলার সঙ্গে ও হজরত আলী (কঃ—ওঃ) গমন করিয়াছিলেন।** যাহা হউক, এতৎসম্বন্ধে উভয় পক্ষ হইতে কয়েকবার দূত যাতায়াত করিবার পর, উভয় পক্ষ হইতে নিম্ন-লিখিত শর্তে একটী সন্ধিপত্র স্বাক্ষরীত হইল :—

(১) মোছলমানগণ এ বৎসর মক্কায় প্রবেশ ও 'য়োমরাঃ' অনুষ্ঠান করিবেন না; আগামী বৎসর আসিয়া 'য়োমরা' কার্য্য সম্পাদন করিবেন। মক্কায় প্রবেশ কালে তরবারি ব্যতীত অন্য 'হাতিয়ার' (যুদ্ধাস্ত্র) তাহাদের নিকট থাকিবে না; তরবারি ও 'নিয়াম' (কোষ—খাপ্)-এর মধ্যে থাকিবে; আর আগামী বর্ষে ও তাহারা ৩ দিন অপেক্ষা বেশী সময় মক্কায় থাকিতে পারিবে না।

(২) সন্ধির 'মেয়াদ' (সময়) ১০ বৎসর হইবে। এই (নির্দ্দিষ্ট) সময় মধ্যে কোনও 'ফরিক' (দল) অপর দলের 'জান' ও 'মালের' (জীবন ও ধন-সম্পত্তির) কোনওরূপ বিপক্ষতাচরণ করিতে পারিবে না। পরস্পর 'আমন' 'আমান' (নির্ব্বিরোধ ও শান্তি)-এর সহিত বাস করিবে।

(৩) আরব দেশের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 'এখ্তেয়ার' (অধিকার) থাকিবে, তাহারা এই উভয় দলের মধ্যে যে দলের সঙ্গে ইচ্ছা সন্ধি-স্থাপন করিতে পারিবে। উক্ত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ জাতির শর্ত্ত সমূহ এই প্রকারেরই (এই সন্ধি-পত্রের অনুরূপই) লিপিবদ্ধ হইবে। উভয় 'ফরিক-ক্ববায়েল' (উভয় দল বা সম্প্রদায়) আপনাদের সন্ধিবদ্ধ ও 'হলিফ্' ('হাম মহদ'—বন্ধু) বানাইতে স্বাধীন থাকিবে।

(৪) যদি কোরেশদিগের মধ্যে হইতে কোনও ব্যক্তি 'ওলীর' (অভিভাবকের) বিনানুমতিতে মোছলমানদিগের নিকট চলিয়া যায়, তবে তাহাকে কোরেশদিগের হস্তে ফিরাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু যদি কোনও মোছলমান কোরেশদিগের নিকট আইসে (তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে বা মোরতেদ হয়), তবে তাহাকে মোছলমানদিগের হস্তে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

স্থূল দৃষ্টিতে এই সন্ধির শর্ত্ত (বিশেষতঃ ৪র্থ শর্ত্ত) মোসলমানদিগের পক্ষে নিতান্তই প্রতিকূল ছিল; কিন্তু পরিণামে এই সন্ধি-বন্ধন মোছলমানদিগের পক্ষে বিশেষরূপ ফলপ্রদ হইয়াছিল; এবং ৪র্থ শর্ত্তটী দ্বারা কোরেশগণ মহা বিপন্ন হইয়া, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে প্রার্থনা করিয়া, আপনা হইতে উহা 'বাতেল' করাইয়া লইয়া ছিল। সন্ধি-বন্ধনের পর আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কোরবাণী সম্পাদন, এহ্রাম ভঙ্গ, ক্ষৌর কার্য্য সম্পন্ন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে হোদায়বিয়ায়ই সম্পন্ন করিয়াছিলেন;

এই সন্ধি " হোদায়বিয়ার সন্ধি " নামে প্রসিদ্ধ। আঁ হজরত (ছালঃ) যখন হোদায়বিয়া হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন ; সেই সময় পথি-মধ্যে " ছুরে ফৎহ " নাযেল (অবতীর্ণ) হয়।

এই ৬ষ্ঠ হিজরীতে আঁ হজরত (ছালঃ) আবিশিনিয়াধিপতি বাদশাহ নজ্জাশীর নিকট পত্রসহ দূত প্রেরণ করিয়া, তাঁহাকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে, এবং তাঁহার রাজ্যে যে সকল মোছলমান হেজরত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে হাবেশ-পতি-ভক্তি-প্রবণ হৃদয়ে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে নানাপ্রকার 'তহফাঃ' ও 'হাদিয়া' (নজর এবং উপঢৌকন) পাঠাইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে হেজরতকারী মোছলমানদিগকেও মদীনায় রওয়ানা করিয়া দিলেন। ওম্মোল মুমেমিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকার (রাঃ—আঃ) ওয়ালেদাঃ মাজেদাঃ এই ৬ষ্ঠ হিজরীতেই 'এন্তেকাল' (পরলোক গমন) করিয়াছিলেন ; আর হাদিছ বর্ণনাকারী মহাপণ্ডিত হজরত আবু-হোরেরাঃ (রাজিঃ) এই বৎসরে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

৭ম হিজরীর ঘটনাবলী।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর আঁ হজরত (ছালঃ) কিছুদিন শান্তির সহিত অবস্থান করিয়া, পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের সম্প্রসারণ এবং নব-দীক্ষিত মোছলমানদিগের শিক্ষাদি কার্য্যের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু ইত্যবসরে সংবাদ পাইলেন, খয়বরের য়িহুদিগণ মোছলমানদিগের মূলোৎ-পাটন, এবং মদীনা আক্রমণ জন্য মহাষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের আয়োজন প্রবৃত্ত হইয়াছে। এমন কি, তাহাদের যুদ্ধায়োজন সম্পূর্ণতা লাভ

করিয়াছে। ইতিপুর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মদীনা হইতে বনু-নজীর ও বনু-করিযাঃ নামধেয় য়িহুদী সম্প্রদায় দ্বয়কে 'জালাওতন' (নির্ব্বাসিত) করা হইয়াছিল; তাহাদের অধিকাংশই খয়বরে গিয়া বসতি স্থাপন করে। এই য়িহুদিগণের মধ্যে মোছলেম-বিদ্বেষানল পূর্ণ ভাবেই প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল। মক্কার পরে মোছলমানদিগের শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচরণ করিবার কেন্দ্রস্থল ছিল য়িহুদী অধিবাসী পূর্ণ এই খয়বর। তাহারা চতুর্দ্দিকবর্ত্তী আরও বহু সম্প্রদায়কে আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিল; সুতরাং তাহাদের যোগাড়-যন্ত্রটা মামুলী রকমের ছিল না। য়িহুদী ও পৌত্তলিক ব্যতীত মদীনার মোনাফেক সম্প্রদায়ও তাহাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাহারা খয়বরে ৬টী অজেয় কেল্লা (দুর্গ) নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতেছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) ৭ম হিজরীর মহর্‌রম মাসে ১৫০০ শত ছাহাবাঃ কারাম (যাঁহাদের মধ্যে ২০০ অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন) কে সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে 'কুচ' (যাত্রা) করিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) খয়বরে পঁহুছিলেই উভয় প্রতিপক্ষ দলে যুদ্ধারম্ভ হইল। কয়েক দিনের যুদ্ধে খয়বরের সকল দুর্গই মোছলমানদিগের হস্তগত হইল; কিন্তু সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য "কমূস্" দুর্গ সহজে অধিকৃত হইল না; হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ও অন্যান্য প্রথিতনামা বীর-পুরুষগণ মহাপরাক্রমের সহিত দুর্গ আক্রমণ করিয়াও উহা অধিকার করিতে পারিলেন না; তখন আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আগামী কল্য যাহার হস্তে যুদ্ধ-পতাকা প্রদান করিব, তাহার হস্তে দুর্গ জয় হইবে।

বীরেন্দ্র-কেশরী হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ) চক্ষের পীড়ায় আক্রান্ত হওয়াতে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে খয়বর-যুদ্ধে আগমন করিতে পারিয়াছিলেন না। কিন্তু তিনি যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য বড়ই

'বে-চয়েন' (উদ্বিগ্ন) ছিলেন। অগত্যা সেই পীড়িত অবস্থায়ই কয়েক দিন পরে খয়বরে গিয়া পঁহুছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) সেই রাত্রিতেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর আগমন-সংবাদ জানিতে পারিলেন। তিনি পরদিন প্রাতঃকালেই তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ) চক্ষের যন্ত্রণায় এত কাতর ছিলেন যে, ছালাম-বিন্ ওক্‌বা (রাজিঃ) তাঁহার হাত ধরিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে লইয়া আসিলেন। আর সেই মুহূর্ত্তেই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর দোওয়া বা পবিত্র করস্পর্শে তাঁহার চক্ষের যন্ত্রণা দূর হইল—রোগ নিরাময় হইয়া গেল। তৎপর আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহার হস্তে "যোলফোক্কার" নামক তরবারি এবং পবিত্র পতাকা প্রদান করিয়া বলিলেন, "অদ্য তোমার হস্তে 'কমুস্' দুর্গ জয় হইবে।

হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ), মোছলেম-সৈন্যগণ সহ কমুস্ দুর্গের নিকটে পবিত্র পতাকা স্থাপন পূর্ব্বক, প্রবল পরাক্রমের সহিত য়িহূদীদিগকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। য়িহূদী সেনাপতি হারেছ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, বীরেন্দ্র কেশরী হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর তরবারির এক আঘাতেই শমন সদনে গমন করিল। হারেছের পতনে তদীয় ভ্রাতা বিপুল বল-বিক্রমশালী দীর্ঘকায় মারহাব ভ্রাতৃ-হন্তার প্রাণ বিনাশার্থ ডবল শিরস্ত্রাণও ডবল উরস্ত্রাণ পরিধান পূর্ব্বক প্রত্যেক যুদ্ধাস্ত্র দুই দুইখানি লইয়া, বীরশ্রেষ্ঠ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অতি আস্পর্দ্ধার সহিত হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে বলিতে লাগিল "আমার নাম মারহাব, আমি শত্রু দমনে সিদ্ধহস্ত, আমি

সর্ববিধ যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি।" তচ্ছ্রবণে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, "আমার নাম আলী, আমি ভূমিষ্ঠ হইলে আমার জননী আমার নাম " আলী-অল্-হায়দার " অর্থাৎ সিংহ রাখিয়াছিলেন।

অতঃপর মারহাব প্রচণ্ড বিক্রমে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি 'নেযাঃ' (বল্লম বা বড়শা বিশেষ) নিক্ষেপ করিল। কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বীয় হস্তস্থিত জোলফোকার নামক তরবারির এক ভীষণ আঘাতে তাহার অভেদ্য লৌহ মুকুট ভেদ করিয়া মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। বিরাট তালতরুবৎ তাহার উন্নত দেহ ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এইরূপে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) শত্রু পক্ষীয় ৭ জন নামযাদাঃ বীরপুরুষকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। তখন য়িহুদিগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর অমানুষিক বীরত্ব দর্শনে ভয়ে একান্ত জড়সড় হইয়া দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অতঃপর কমূস্ ও অন্যান্য দুর্গের য়িহুদীগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকটে প্রতিনিধি পাঠাইয়া তাঁহার খেদমতে প্রস্তাব করিল যে, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আদেশ গ্রহণান্তর তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা নিজেদের সমুদয় সামগ্রী-সম্ভার সহ দুর্গ পরিত্যাগ কর। য়িহুদিগণ বিনা বাক্য-ব্যয়ে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিল। ঐ সময় আত্ম-সমর্পণ ব্যতিরেকে য়িহুদিদিগের আর গত্যন্তর ছিল না। আঁ হজরত (ছালঃ) কমূস্ দুর্গ জয়ের সংবাদ পাইয়া খোদাতায়ালাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন, এবং হজরত আলী (রাজিঃ)-কে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

কানানা-বিন্-আবি হকিক কমূস্ দুর্গের অধিপতি ছিল। মোছলমানগণ সেই বিজিত দুর্গে ১০০ বর্ম্ম, ৪০০ তরবারি, ১০০০ নেযাঃ (বল্লম বা

বড়শা বিশেষ), ৫০০ ধনুক ও অন্যান্য বহু সামগ্রী-সম্ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে আঁ হজরত (ছালঃ) কানানাকে বলিলেন, তোমার আর অর্থ কোথায় আছে, বলিয়া দাও।" সে বলিল, "আমার সমুদয় অর্থ খরচ হইয়া গিয়াছে।" হজুর (ছালঃ) বলিলেন, "যদি তুমি আর কোন ধন-সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়া থাক, তবে 'আমান' (শান্তি—রক্ষা) পাইবে না। অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে তাহার গুপ্ত-ধনের সন্ধান পাইয়া, হজরত জোবায়ের (রাজিঃ)-কে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিতে আদেশ করিলেন। সেই যায়গা খোড়া হইলে তথায় প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হওয়া গেল। ইহাতে য়িহুদিদিগের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাইলেও, আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় ঔদার্য্য গুণে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। অবশেষে "নাতাত" দুর্গে সমুদয় সামগ্রী-সম্ভার একত্রিত করা হইলে, তিনি উহার এক পঞ্চমাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, অবশিষ্টাংশ শিষ্যদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধে ১৫ জন মোছলমান শহীদ হন ; য়িহুদিদিগের মধ্যে ৯৩ জন নিহত হইয়াছিল। শাহাদত-প্রাপ্ত মোছলমানদিগের মধ্যে ৪ জন মহাজেরিন ও ১১ জন আন্ছার ছিলেন। উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক প্রদানের বন্দোবস্তে য়িহুদীদিগকে খয়বরে বসবাস করিতে দেওয়া হইল। কিন্তু তাহাদের কেল্লাগুলি সমভূমি করিয়া ফেলা গেল।

যখন আঁ হজরত (ছালঃ) খয়বর হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিতে ছিলেন, ঐ সময় আবিশিনিয়া (হাবশ্) রাজ্য হইতে তত্রত্য মহাজেরিন দল, হাবশ-পতির প্রদত্ত পত্র ও 'তহ্ফা' (উপঢৌকন বা নযরানা) লইয়া হজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে আসিয়া পঁহুছিলেন। সুদীর্ঘ কাল পরে ইহাদের আগমন এবং সম্মিলনে আঁ হজরত (ছালঃ), এবং ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাজেরিন দিগের জন্য আঁ হজরত (ছালঃ) অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ছিলেন।

ইঁহাদিগের আগমনে মোছলমানদিগের শক্তিও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইল। অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) সশিষ্যে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। হজুরের প্রত্যাবর্ত্তন কালে খয়বরের নিকটস্থ "ফদক" নামক স্থানের য়িহুদিগণ তাঁহার খেদমতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া এই প্রার্থনা জানাইল যে, আমাদিগের কেবলমাত্র প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হউক, মাল-আসবাবেরও কোন প্রয়োজন নাই। আঁ হজরত (ছালঃ) তাহাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন; ফেদক বাসিগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া গেল। এই স্থানে কোনও রূপ যুদ্ধ-হাঙ্গামা হইয়াছিল না; সুতরাং 'বেলা-তক্‌ছিম' (ভাগ-বণ্টন না করিয়া) যেরূপ খোদাতা'লার আদেশ ছিল; উহা খোদা ও তাঁহার রছুলের 'মাল' (সম্পত্তি) বলিয়া পরিগণিত হইল। ফদক হইতে মোছলেম-বাহিনী "ওয়াদি-অল্-কোরা" নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য য়িহুদিগণ আপনাদের 'বস্তি' (গ্রাম বা বাসস্থান) হইতে বাহির হইয়া মোছলমানদিদের প্রতি 'নেযাঃ' (লেযাঃ—বড়শা বা বল্লম বিশেষ) বর্ষণ আরম্ভ করিল। মোছলমানগণ ঐ স্থান দৃঢ়ভাবে অবরোধ করিলে, তাহারা নিরূপায় হইয়া খয়বরস্থ য়িহুদিগণের ন্যায় উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধাংশ দিতে রাজী হইল; আঁ হজরত (ছালঃ) তাহাদের সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। ওয়াদি-অল্-কোরার যুদ্ধে একজন মাত্র ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। ওয়াদি অল্-কোরার নিকটস্থ তিমা নামক য়িহুদী পল্লীর অধিবাসিগণ ও পূর্ব্বোক্ত রূপ ব্যবস্থায় আবদ্ধ হইয়া তথায় বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল। ফলতঃ মদীনা হইতে খয়বর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের অধিবাসিগণই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর বশ্যতা স্বীকার করিল।

আরবের য়িহুদিগণ খুব ধনী ছিল; ইহারা বাণিজ্য-ব্যবসায় এবং সুদের কারবার চালাইত। অদ্যাপি ও পৃথিবীর নানাদেশে ইহারা খুব ধনী—ক্রোড়পতি। খয়বরের য়িহুদিদিগের অধিকারভুক্ত যমিন গুলি খুব

উর্ব্বর ও শস্য-শালিনী ছিল। খয়বর-বিজয়ের পর, বিজয়-লব্ধ প্রচুর সামগ্রী-সম্ভার, আর চাষের যমিন ও বাগ-বাগিচা যাহা ভাগে পাইয়া ছিলেন, তদ্দ্বারা এতকাল পরে মহাজের (রাজিঃ) দিগের অর্থাভাব দূর হইল। এক্ষণে নিঃস্ব মহাজেরগণ 'ছাহেবে জায়দাদ' (ভূ-সম্পত্তির অধিকারী) ও হইলেন।

মক্কার কোরেশ ও অন্যান্য মোশ্‌রেক (অংশিবাদি) গণ যখন খয়বরের উপর মোছলমানদিগের 'চড়্‌হাই' (অভিযান বা অবরোধ)-এর সংবাদ পাইল, তখন তাহারা নিতান্ত উৎকণ্ঠার সহিত যুদ্ধের ফলাফল জানিবার জন্য উৎগ্রীব রহিল। আঁ হজরত (ছালঃ) যে খয়বরের যুদ্ধে জয়ী হইলেন, মক্কাবাসী বিধর্ম্মিগণ সে সংবাদ অনেকটা বিলম্বে পাইয়াছিল; পরে তাহারা যখন এই সংবাদ প্রাপ্ত হইল, তখন তাহাদের উৎকণ্ঠা ও দুঃখের সীমা পরিসীমা রহিল না। মদীনার অতি নিকটেই খয়বরে য়িহুদীদিগের একটা প্রধান আড্‌ডা ছিল; খয়বরের ও নবাগত য়িহুদি অধিবাসিগণ, এবং আশপাশের য়িহুদি অধিবাসিগণ মিলিয়া এক অতি প্রবল শক্তিশালী দল ছিল; মক্কার কোরেশগণের ধারণা ছিল যে, উহারা মোছলমানদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারিবে; কিন্তু ফল তাহার বিপরীত হইল।

আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের যে সকল জাতি বা সম্প্রদায় মোছলমানদিগের উচ্ছেদ সাধন জন্য চেষ্টা পাইতেছিল, তাহাদের বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যোদ্ধদল দ্বারা গঠিত অভিযান পাঠাইলেন। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-রওয়াহাঃ (রাজিঃ), হজরত বশির-বিন্‌-ছায়াদ আন্‌ছারী (রাজিঃ), হজরত ওছামাঃ-বিন্‌-যয়েদ (রাজিঃ), হজরত গালেব-বিন্‌-আবদুল্লা-কলিনী (রাজিঃ), হজরত আবু

বদক আছলমী (রাজিঃ), হজরত আবু কেতাদাহ্ (রাজিঃ)-প্রমুখ প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ কারাম ও বিখ্যাত বীরপুরুষগণ ঐ সকল অভিযানে সেনাপতি রূপে গমন করিয়াছিলেন ; আর প্রত্যেক অভিযানই সাফল্য মণ্ডিত হইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

হুজুর (ছালঃ) এই বৎসরেই আরব দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং আরবের বাহিরেও কতিপয় সাম্রাজ্য এবং রাজ্যের অধিপতিদিগের নিকট পত্র সহ দূত প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগকে পবিত্র ইস্লাম (একেশ্বরবাদ) ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্ম অনুরোধ ও আহ্বান করা হয়। আবিশিনিয়াধিপতি নজ্জাশীর নিকট তিনি যে পত্র লিখিয়া ছিলেন, সে বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থানের অধিপতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ মোছলমান হইয়াছিলেন, কেহ কেহ মোছলমান না হইলেও, ভক্তি এবং সহানুভূতি-সূচক পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার খেদমতে 'হাদীয়া' (উপঢৌকন) পাঠাইয়াছিলেন ; কেবলমাত্র গর্ব্বোন্মত্ত পারস্য সম্রাট্ খছরু পরবেজ, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রেরিত দূত মনযর-বিন্-সাওনীর প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার এবং তাঁহার প্রেরিত পত্রখানির অবমাননা করিয়াছিলেন ; আঁ হজরত (ছালঃ) এই সংবাদ শুনিয়া ফরমাইয়াছিলেন ; কছরী (কেছরাঃ) যেমন আমার পত্রখানি ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়াছে, তাহার ছোলতানৎ ও ঐরূপ টুকরা টুকরা (খণ্ড-বিখণ্ড) হইয়া যাইবে। ফলতঃ কয়েক বৎসর পরেই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। দ্বিতীয় খোলফায়ে রাশেদীন মহামান্য খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ইস্লামী সাধারণতন্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই অর্দ্ধ চন্দ্রবিখচিত মোছলেম-বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল।

৭ম হিজরীর শওয়াল মাসের শেষ পর্য্যন্ত আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনা-তৈয়বায়ই 'তশ্‌রিফ্‌' রাখিয়াছিলেন। ঐ সালের জেকদ মাসের প্রারম্ভে তিনি ঐ সকল ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-কে—যাঁহারা গত বৎসর হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন—'ছফরের' মোছার্কেরির) জন্য প্রস্তুত হইতে : আদেশ দিলেন। তদনুসারে ঐ সকল ছাহাবাঃ (রাজিঃ) এবং আরও অনেকে হজ্জ্‌-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ২০০০ দুই হাজার ছাহাবাঃ (রাজিঃ) তাঁহার সঙ্গে 'য়োমরাঃ' আদায় করিবার জন্য মদীনা হইতে মহোতৎসাহে ও মহোল্লাসে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গত বৎসর হোদায়বিয়ায়যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরীত হইয়াছিল, তাহাতে এই শর্ত্ত ছিল যে, মোছলমানগণ এ বৎসর য়োমরাঃ আদায় না করিয়া চলিয়া যাইবেন, আর আগামী বৎসর আসিয়া য়োমরা-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন। সুতরাং সন্ধি-পত্রের এই শর্ত্ত অনুযায়ী আঁ হজরত (ছালঃ) সদলবলে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মক্কার নিকটে যাইয়া হেমায়েল (কোরআন পাক) ও তরবারি মাত্র সঙ্গে রাখিলেন, অবশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার 'হাতিয়ার' (অস্ত্র-শস্ত্র) তথায় খুলিয়া রাখিয়া দিলেন; তৎপর সকলে পরম ভক্তি-সহকারে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। 'বায়তোল্লার' (কাবা-গৃহের) সম্মুখে পঁহুছিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) মোছলমানদিগকে যথা-নিয়মে কাবার তওয়াফ্‌ করিতে আদেশ দিলেন। যথানিয়মে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। আঁ হজরত (ছালঃ) এবং ছাহাবাঃ কারাম (রাজি)গণ গত বর্ষের হোদায়বিয়া সন্ধির শর্ত্তানুসারে ৩ দিবস মাত্র মক্কা-মোয়াজ্জমায় অবস্থিতি করিলেন। 'আরকানে য়োমরাঃ' সম্পাদন পূর্ব্বক আঁ হজরত (ছালঃ), আব্বাস-বিন্‌-আবদুল মোত্তালেবের বিবী (স্ত্রী) ওম্মে-ফজলের ভগিনী ময়মুনা বিন্তে-হারেছ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে পবিত্র পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তৎপর তিনি সশিষ্যে মক্কা হইতে বাহির

হইয়া 'ওয়াদী ছরফ' এ শিবির সন্নিবেশিত করিলেন, সেই স্থানে তাঁহার নব-পরিণীতা 'আহ্লিয়াম' (পত্নী) মোছলেম-মাতা হজরত ময়মুনাঃ (রাঃ—আঃ) তাঁহার খেদমতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ঐ সময়ে বীরেন্দ্র-কেশরী হজরত হামযাঃ শহীদ (রাজিঃ)-এর বালিকা কন্যাটী তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহাকে স্বীয় উষ্ট্রের হাওদায় তুলিয়া লইলেন, পরে ঐ বালিকাকে তাঁহার খালু হজরত জাফর (রাজিঃ) বিন্-আবি তালেবের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

আঁ হজরত (ছালঃ) মক্কা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তনের কয়েক দিন পরে ওমরু-বিনল্-আছ (রাজিঃ), মহাবীর খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) এবং অন্যতম কোরেশ বীর ওছমান-বিন্-তাল্হা (রাজিঃ), পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইঁহাদের ইস্লাম গ্রহণে আঁ হজরত (ছালঃ) ও ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ যেমন আনন্দ লাভ করিলেন, তেমনই তদ্দ্বারা মোছলমানদিগের শক্তি ও অনেক বৃদ্ধি হইল। উত্তরকালে ইঁহাদের বাহুবলে বহু রাজ্যে ও বহুদেশে মোছলমানদিগের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল।

হেজরতের ৮ম বৎসর।

এক্ষণে আরবদেশের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে ইস্লাম ধর্ম্ম-প্রচারে আর কোনও বাধা-বিঘ্ন ছিল না। ইস্লামের বড় বড় শত্রুগণ আঁ হজরত (ছালঃ) এবং মোছলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, একে একে অকৃতকার্য্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। মোছলমানদিগের শত্রুতাচরণ করিতে এ সময় আর তাহাদের সাহসে কুলাইতে ছিল না। পক্ষান্তরে দিন দিন বহুজাতি, বহু সম্প্রদায়, বহু জনপদবাসী ইস্লামের শান্তিময় পবিত্র শীতল-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন। মক্কার কোরেশও অন্যান্য সম্প্রদায়ের

পৌত্তলিকগণ পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়া, একপ্রকার 'মায়ুছ' (নিরাশ) হইয়া পড়িয়াছিল; মদীনা ও উহার আশ-পাশ এবং খয়বরের য়িহুদিগণ সম্পূর্ণ-রূপে দমিত হইয়াছিল। শাম (সিরিয়া)-সীমার খৃষ্টীয়ানগণ আর মস্তকোত্তোলন করিতে সাহসী হইতে ছিল না। মদীনার মোনাফেকগণ ও শত চেষ্টা করিয়া আপনাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে পারিতেছিল না। ইহা স্বত্বেও পৌত্তলিক কোরেশ, য়িহুদী, মোনাফেক এবং খৃষ্টীয়ানগণ মোছলেম-বিদ্বেষ প্রকাশে ও মোছলমানদিগের মূলোৎপাটন সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ও নিরস্ত ছিল না। এইবার তাহারা আরবের নিকটবর্ত্তী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি-সম্পন্ন রোমক সম্রাট্ ও পারস্য সম্রাট্ দ্বারা মোছলমানদিগের মূলোৎপাটন করাইবার জন্য একটা বিরাট ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে আঁ হজরত (ছালঃ) যে সকল সম্রাট্, বাদশাহ ও শাসনকর্ত্তা গণের নিকট ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য দাওত-পত্র পাঠাইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে একখানি পত্র হারেছ (রাজিঃ) বিন্-য়মির আয্দির হস্তে, শাম (সিরিয়া) দেশের অন্তর্গত বোছরার শাসনকর্ত্তার নামে রওয়ানা করিয়াছিলেন। তিনি মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া বোছরায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে, শামের সীমান্তবর্ত্তী "মূতা" নামক স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, তথাকার খৃষ্টীয়ান শাসনকর্ত্তা শরজিল-বিন-য়মর গাচ্ছানী (কনষ্টান্টিনোপলস্থ রোমক সম্রাটের অধীনস্থ শাসন-কর্ত্তা), হারেছ (রাজিঃ)-কে 'গেরেফ্তার' করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে বন্দী, পরে শহীদ (হত্যা) করিল। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে, আঁ হজরত (ছালঃ) এবং ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ অত্যন্ত শোকাকুলিত হইয়াছিলেন।

মূতার অভিযান ও তথায় ভীষণ যুদ্ধ।

মূতার শাসনকর্ত্তার বর্ব্বরোচিত অবৈধ আচরণের প্রতিকার-কল্পে, কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ জন্য অনতিবিলম্বে এক পরামর্শ-সভা আহূত হইল। সর্ব্ববাদিসম্মতি ক্রমে মূতার শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠান স্থির হইয়া গেল। কারণ তাহাকে দমন না করিলে, সিরীয় এবং গ্রীক্ সৈন্য কর্ত্তৃক আরব দেশ—বিশেষতঃ মদীনা নগরী আক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত যয়েদ-বিন্-হারেছ (রাজিঃ)-কে সেনাপতি করিয়া, হজরত জাফর বিন্-আবিতালেব (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ (রাজিঃ), হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) প্রভৃতি মহারথিগণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট, ৩০০০ তিন সহস্র বিক্রান্ত সৈন্য দ্বারা গঠিত এক অভিযান মূতার প্রেরণ করিলেন। তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, যুদ্ধে (হজরত) যয়েদ (রাজিঃ) শহীদ হইলে (হজরত) জাফর (রাজিঃ), তিনি শহীদ হইবে (হজরত) আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ (রাজিঃ) সেনাপতির পদ গ্রহণ করিবেন; তিনি শহীদ হইলে মোছলমান-গণ সমবেত হইয়া আপনাদের মধ্য হইতে একজন সেনাপতি নির্ব্বাচন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন। তদনুসারে এই সৈন্যগণ মূতায় পঁহুছিয়া জানিতে পারিলেন, ১ লক্ষ সিরীয় সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছে; আবার মূতার অদূরে ওয়াদি বল্‌কায় স্বয়ং রোমক সম্রাট্ হরকল লক্ষাধিক সুশিক্ষিত ও পরাক্রান্ত সৈন্যসহ অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্মে অনুপ্রাণিত ধর্ম্ম-প্রাণ মোছলমানগণ আপনাদের অপেক্ষা ৩৩ গুণ অধিক সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত এবং কুণ্ঠিত হইলেন না। যুদ্ধ আরম্ভ হইল, প্রথমোক্ত সেনাপতিত্রয় একে একে শহীদ হইলেন। অবশেষে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে মহাবীর খালেদ বিন্-অলিদ (রাজিঃ) পবিত্র

রণ-পতাকা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক রণ-সাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। তিনি এমন যোগ্যতা এবং এমন বীরত্বের সহিত শত্রু সৈন্যদলকে, স্বীয় মুষ্টিমেয় সৈন্যদল সহকারে আক্রমণ করিলেন যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুশিক্ষিত ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত সিরীয় সৈন্যদল ভীষণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। অসংখ্য সিরীয় সৈন্যের দেহ-পরম্পরায় রণক্ষেত্র আচ্ছাদিত হইল। পক্ষান্তরে মোছলমানদিগের মধ্যে ১২ জন মাত্র যোদ্ধপুরুষ শহীদ হইয়াছিলেন। যখন মূতার ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনায় মছজেদ-নববীর মিম্বরে দাঁড়াইয়া যুদ্ধের অবস্থা ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের নিকট বর্ণনা করিতে ছিলেন। তিনি "এল্‌হাম এলাহী" দ্বারা যুদ্ধের অবস্থা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে হজরত খালেদ-বিন্‌-অলিদ (রাজিঃ) যেরূপ যোগ্যতার সহিত সেনাপতির কর্ত্তব্য পালন, এবং অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত সৈন্য পরিচালন করিয়াছিলেন, এবং অমানুষিক বীরত্ব-প্রদর্শন করিয়াছিলেন, জগতে তাহার তুলনা নাই; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে ছয়েফ্-আল্লাহ, (আল্লাহ্ তায়ালার তরবারি) উপাধী প্রদান করিয়াছিলেন। হজরত খালেদ-বিন্‌-অলিদ (রাজিঃ) যখন মূতার যুদ্ধে জয়ী হইয়া সসৈন্যে মদীনার নিকটে আসিয়া পঁহুছিলেন, ঐ সময় আঁ হজরত (ছালঃ) প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগকে সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে বাহির হইলেন, এবং বিজয়ী যোদ্ধপুরুষদিগের অভ্যর্থনার্থ নগর হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। বিজয়ী সেনাদল যখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া হজরত খালেদ-বিন্‌-অলিদ (রাজিঃ)-কে "সয়ফোল্লাহ্" উপাধী লাভের "খোশ্-খবরী" (সুসংবাদ) শুনাইলেন। এক ছাহাবাঃ (রাজিঃ) স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, মূতা-যুদ্ধে শাহাদত-প্রাপ্ত

হজরত জাফর (রাজিঃ) 'জন্নতে' (মোস্‌লেম—স্বর্গে) দুই 'বাযু' (বাহু বা হস্ত) বিস্তার পূর্ব্বক উড়িতেছেন (মুতা-যুদ্ধে তাঁহার দুই বাহুই কাটা গিয়াছিল)। সেই দিন হইতে তাঁহার নাম "জাফর-তইয়্যার" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; আঁ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং ও এবিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন।

মুতা যুদ্ধের পর শামের সীমান্ত বাসী কজায়া সম্প্রদায় মদীনা আক্রমণের আয়োজন করিতেছে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট এই সংবাদ পঁহুছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে ৩০০০ মহাজেরিন ও আন্‌ছার বীরপুরুষ সহ প্রথমে হজরত ওমরু-বিনল্ আছ (রাজিঃ)-কে, পরে শত্রু সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া সংবাদ পাইবামাত্র আর একদল সৈন্যসহ হজরত আবু ওবায়দাঃ-বিন্-জার্‌রাহ (রাজিঃ)-কে পাঠাইলেন। এই সম্মিলিত সৈন্যদল ঐ বিপ্লববাদী দিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া বিজয়ীবেশে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর আরও ১টী অভিযান হজরত আবু ওবায়দাঃ-বিন্-জার্‌রাহ (রাজিঃ)-এর অধীনে সমুদ্র তটবর্ত্তী "জোহ্‌নিয়াঃ" সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, ৩০০ যোদ্ধ পুরুষ সহ গমন করিলেন। তাঁহাদের আগমন সংবাদে ঐ বিপ্লববাদীর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

অষ্টম হিজরীর শা'বান মাসে মক্কা নগরে একটী অভিনব ঘটনা ঘটিল। কোরেশদিগের সঙ্গে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর যে সন্ধি-বন্ধন হইয়াছিল, তাহাতে মক্কার বনু-বকর ও বনু-খযায়্যা নামক দুইটী সম্প্রদায় পূর্ব্বতন বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া, বনু-বকর কোরেশদিগের ও বনু-খযায়্যা আঁ হজরত (ছালঃ)-এর দলভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বনু-বকর দলের মতি-গতি বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল; তাহাদের দলপতি নওফেল বিন্-মোয়াবিয়া, বনু-খযায়্যা সম্প্রদায়কে উৎসন্ন দিবার জন্য কতিপয় কোরেশ নেতার সঙ্গে

ষড়যন্ত্র পাকাইল, এবং একদা রাত্রিকালে হঠাৎ বন্থ-খযায়া সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়া নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করিতে লাগিল। তাহারা অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া একেবারে কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল, অনেকে পবিত্র কাবা-গৃহে গিয়া আশ্রয় লইল; দুর্ব্বৃত্তগণ সেখানেও তাহাদিগকে হত্যা করিল। এই বিপন্ন ও ভীষণভাবে উৎপীড়িত বন্থ-খযায়্যাগণ মক্কায় থাকিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নামে যে 'ফরিয়াদ' করিয়াছিল, তিনি তাহা মদীনায় থাকিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর বন্থ-খযায়্যার কতিপয় প্রতিনিধি মদীনায় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে পঁহুছিলে, তিনি তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আমি শীঘ্রই ইহার প্রতিকার করিতেছি।

কোরেশ প্রধানগণ বুঝিতে পারিল, এই সন্ধি-ভঙ্গের একটা বিষময় ফল ফলিবে; তদনুসারে তাহারা আপনাদের প্রবীণ নেতা আবু-ছুফিয়ানকে মদীনায় পাঠাইল; কিন্তু সে অকৃতকার্য্য হইয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিল। আঁ হজরত (ছালঃ) মক্কা আক্রমণ জন্য গোপন ভাবে যুদ্ধ-সজ্জা করিতে লাগিলেন। কোরেশগণ যাহাতে পূর্ব্বাহ্নে যুদ্ধ-সজ্জার বিষয় জানিতে না পারেন, তজ্জন্য খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এমন কি, ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণও জানিতেন না যে, কোন্ দিকে অভিযান করিতে হইবে। হাতেব-বিন্-আবি বলতয়া (রাজিঃ) নামক একজন ছাহাবাঃ, স্বজাতিকে ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একজন স্ত্রীলোকের হস্তে একখানি পত্র দিয়া এই যুদ্ধ-সজ্জার সংবাদ মক্কায় পাঠাইলেন। কিন্তু আঁ হজরত (ছালঃ) "এলহাম-এলাহী" দ্বারা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, হজরত জোবের-বিন্-আওয়াম (রাজিঃ) কে, ঐ স্ত্রীলোককে ধৃত করিবার জন্য পাঠাইলেন; স্ত্রীলোকটী ধৃত হইল, তাহার নিকট পত্র পাওয়া গেল, হাতেব্ (রাজিঃ) আহূত হইয়া অপরাধ স্বীকার করাতে, আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন।

অতঃপর ৮ম হিজরীর ১১ই রমযানুল মবারক আঁ হজরত (ছালঃ) ১০ হাজার ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) কে সঙ্গে লইয়া মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। এছলামী সেনাদল দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া মক্কার ৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী "ওয়াদী-মর্‌রাজ্‌-জহরান" নামক স্থানে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন; তখন পর্য্যন্তও মক্কাবাসিগণ এই অভিযানের বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছিল না। পরে ঐ স্থানের পশু-পালকদিগের দ্বারা এক বিরাট সেনা-দলের আগমন-সংবাদ কোরেশগণ প্রাপ্ত হইল। কোরেশ দলপতি আবু-ছুফিয়াদ তৎক্ষণাৎ তথ্যানুসন্ধানার্থ বাহির হইয়া, হজরত আব্বাছ (রাজিঃ) কর্ত্তৃক আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সম্মুখে নীত, এবং ঐ রাত্রেই পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। পরদিন আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পরিচালনাধীনে এই বিরাট এছলামী সৈন্যদল মহাড়ম্বরে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। যাহারা কাবা-গৃহে কিংবা হজরত আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, কিংবা যাহারা নিরস্ত্র অবস্থায় থাকিবে, তাহাদিগের নিরাপদতা সম্বন্ধে আঁ হজরত (ছালঃ) ইতিপূর্ব্বেই হজরত আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর নিকট প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। মক্কায় কোনও রূপ শোণিত-পাত না হয়, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ইহাই ঐকান্তিক কামনা ছিল; ফলতঃ তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল; তাঁহার বিরুদ্ধে কেহই অস্ত্রধারণ করিল না। তিনি আল্লাহ তা-লার দরগায় শোকরিয়া আদায় করিয়া খানাঃ-কাবায় প্রবেশ করিলেন, এবং তত্রত্য 'বোত' (দেব-প্রতিমা) গুলি ঐ পবিত্র গৃহ হইতে বাহির করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেওয়াইলেন। অতঃপর একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। আজ অধর্ম্মের উপর পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইল। অতঃপর দলে দলে পৌত্তলিক মক্কাবাসী পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তে বায়্‌য়েত হইতে লাগিলেন। এই বায়্‌য়েত এর অর্থ সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্

তায়ালা ও তাঁহার রছুলের 'য়েতায়াত' অর্থাৎ অধীনতা স্বীকার। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আদেশে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), স্ত্রীলোক-দিগের নিকট হইতে বায়্‌য়েত গ্রহণ করিতে লাগিলেন; আর তিনি স্বয়ং এই নব-দীক্ষিত মোছলমান নরনারীর মঙ্গলের জন্য খোদা তায়ালার দরগায় প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মক্কার কোরেশগণ সম্মান ও সম্ভ্রমে আরবদেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। আবার মক্কাস্থ পবিত্র কাবা-গৃহকে অধিকাংশ আরববাসী মহা-সম্মানের চক্ষে দেখিত। মক্কার কোরেশগণ নব-প্রচারিত ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন পন্থা অবলম্বন করে, আরব দেশের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায় সেই দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। এই মক্কা-বিজয়ের পর মক্কার কোরেশগণ প্রায় সকলেই পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়াতে, আরবের অন্যান্য জাতিগণ ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী ও আকৃষ্ট হইল। অতঃপর মক্কার নিকটস্থ অন্যান্য স্থানের বিখ্যাত দেব মন্দির ও দেবমূর্ত্তিগুলিও আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রেরিত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ কর্ত্তৃক ধ্বংসও চুর্ণীকৃত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিকতার ভিত্তি পর্য্যন্ত উৎসাদিত হইয়া গেল।

মক্কার অনতিদূরবর্ত্তী তায়েফের নিকটস্থ "হওয়াযন" ও "ছকিফ্‌" সম্প্রদায়ের প্রবল পরাক্রান্ত অধিবাসিগণ, আঁ হজরত (ছালঃ) ও মোছলমানগণের সাফল্য দর্শনে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্যদল সজ্জিত করিতে লাগিল। তদনুসারে বনু-হওয়াযনের 'ছর্দ্দার' (নেতা বা দলপতি) মালেক-বিন্‌-য়য়োফ্‌, উপরোক্ত উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব বা সেনাপতির পদ গ্রহণ করিল। নিকটবর্ত্তী আরও বহু সম্প্রদায়ের লোক তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। আঁ হজরত (ছালঃ) লোক পাঠাইয়া প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইলেন; তাঁহার প্রেরিত আবদুল্লা-বিন্‌-আবি

হদরু আছলমী আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, এই বিরাট বাহিনী "আওতাস্" নামক স্থানে সমবেত হইয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্তে তিনি স্বীয় সঙ্গীয় ১০ হাজার মহাজেরিন ও আন্ছার, এবং ২ হাজার নব-দীক্ষিত মক্কাবাসী মোছলমানকে সঙ্গে লইয়া, এই বিপ্লববাদিগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। **শূরশ্রেষ্ঠ হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ) ও এই সৈন্যদলে ছিলেন।** এই বিরাট বাহিনী "ওয়াদী হোনায়নে" পঁহুছিলে, বিপ্লববাদিগণ পূর্ব্ব হইতে এই অভিযানের সংবাদ জানিতে পাইয়া, হঠাৎ তাঁহাদিগকে নৈশ-আক্রমণ করিল। রাত্রিকালে অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া, অপ্রস্তুত মোছলমান বীরগণ মহা বিভ্রাটে পতিত হইলেন। আবার মক্কার নব-দীক্ষিত মোছলমানগণ সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করাতে, মোছলমানদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। কিন্তু এই দিন আঁ হজরত (ছালঃ)-এর অনুপম সাহস, বীরত্ব, রণ-পাণ্ডিত্য, দৃঢ়তা, অকুতোভয়তা পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। অবশেষে আল্লাহ্ তা-লার অসীম করুণাবলে বিধর্ম্মিগণ সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল; তাহাদের শত শত যোদ্ধা রণক্ষেত্রে নিপতিত হইল; কিন্তু মোছলমান পক্ষে মাত্র ৪ জন বীর-পুরুষ শহীদ হইয়াছিলেন। এই গৌরবান্বিত জয়লাভে ৪৪ হাজার উষ্ট্র ও তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছাগল ও মেষ (দোম্বা) এবং ৪০০০ আওকিয়া (প্রায় ১৭৴ মণ) চান্দি (রৌপ্য) বিজয়ী মোছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল।

শত্রুপক্ষের অধিকাংশ লোকও তাহাদের সেনাপতি মালেক-বিন্-য়রোফ্ তায়েফে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল; আঁ হজরত সসৈন্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক, মালেকের কেল্লা এবং "আতম" নামক আর একটী কেল্লা ধ্বংস করিয়া, তায়েফ্ নগর অবরোধ করিলেন। ২০ দিন কাল তায়েফ্ অবরোধের পর উহা জয় করা ভবিষ্যতের জন্য 'মুলতবি' (স্থগিত) রাখিয়া, সসৈন্যে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তায়েফের অবরোধ কালীন

যুদ্ধে ১২ জন মোছলমান শহীদ হইয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) যুদ্ধজয়-লব্ধ সামগ্রী সম্ভার মোছলমানদিগের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করিয়া দিয়া মক্কায় পঁহুছিলেন; এবং তথা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময় মধ্যে আরবের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন জনপদবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোক পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

৯ম হিজরীর ঘটনাবলী।

৯ম সালের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী এই :—

মক্কা-বিজয় ও হোনায়নের যুদ্ধের পর ৯ম হিজরীর প্রারম্ভ হইতে, বিশাল আরব দেশের প্রত্যেক প্রদেশ, প্রত্যেক জনপদ ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক দলে দলে মদীনায় আসিয়া পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। বহুস্থান হইতে 'ওফুদ' (প্রতিনিধি বা ডেলিগেট) গণ ও আগমন করিলেন। সমগ্র আরবে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে যাকাত ফরজ হইয়াছিল, সেই যাকাত "বায়তুল-মাল" তহবিলে জমা হইয়া, যথানিয়মে—উপযুক্ত ভাবে ব্যয়িত হইত; যাহারা এযাবৎ পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল না; তাহারা "জজিয়া" নামক একটী সামান্য কর (ট্যাক্স) মাত্র দিয়া অব্যাহতি লাভ করিত।

আরবের অন্তর্ব্বিপ্লব দূর হইলেও, বহিরাক্রমণের আশঙ্কা দূর হইয়াছিল না। মদীনার মোনাফেকগণ এবং আরবের খৃষ্টীয়ানগণ, প্রবল বহিঃশত্রুর দ্বারা মদীনা আক্রমণ করাইবার যোগাড়-যন্ত্র করিতেছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, সিরিয়া-সীমান্তে গমন পূর্ব্বক শত্রু সৈন্যদলকে আক্রমণ করিবার জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

তিনি কোথায় যুদ্ধযাত্রা করিবেন, সেই সংবাদ সম্পূর্ণ রূপে গোপন রাখিলেন। যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মোছলমানদিগের মধ্য হইতে চাঁদা সংগ্রহ হইতে লাগিল। সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক হইলে আঁ হজরত (ছালঃ) ৩০০০ তিন হাজার যোদ্ধপুরুষ সঙ্গে লইয়া সিরিয়ার সীমান্তবর্ত্তী "তবুক" অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই অভিযানে তিনি কেবলমাত্র হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে সঙ্গে লইয়া ছিলেন না; স্বীয় পরিবার বর্গের 'হেফাযত্' (তত্ত্বাবধান)-জন্য তাঁহাকে মদীনায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মদীনার মোনাফেকগণ তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রতিকুল সমালোচনা করাতে, তিনি মদীনা হইতে ১ ক্রোশ দূরবর্ত্তী "আল্-জরফ্" নামক স্থানে গিয়া, হুজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন; এবং অভিযানে সঙ্গী হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) মোনাফেক-দিগের মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করিয়া, তাঁহাকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া মদীনায় রাখিয়া গেলেন।

তবুক মদীনা-তৈয়বা হইতে ১৪।১৫ মঞ্জেলের পথ। এক্ষণে মদীনা মনুওরা হইতে তবুক পর্য্যন্ত রেল লাইন আছে। আঁ হজরত (ছালঃ) তবুকে গিয়া ২০ দিন অবস্থান করিলেন। সেখানে গিয়া শত্রুপক্ষের কোনও সাড়া পাইলেন না; তাঁহার দ্রুত আগমনে রোমক ও সিরীয়গণ ভীত হইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। বরং আয়লার শাসন-কর্ত্তা এবং অন্যান্য শাসনকর্ত্তা ও দলপতিগণ আসিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক, জজিয়া প্রদানে স্বীকৃত হইলেন, এবং অনেকেই জজিয়া নগদ আদায় করিয়া দিলেন। কেবল দোমতহল-জন্দলের শাসনকর্ত্তা খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী আকিদর-বিন্-আবদুল মলক, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত

হইলেন না। মহাবীর হজরত খালেদ-বিন্‌-অলিদ (রাজিঃ), কতিপয় বীরপুরুষের সঙ্গে প্রেরিত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন। আকিদর ও জজিয়া প্রদানে স্বীকৃত হইলেন; এবং নযরানা স্বরূপ বহু অস্ত্র-শস্ত্র, উষ্ট্র, অশ্ব হুজুরের খেদমতে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) তবুক হইতে সসৈন্যে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ৯ম হিজরীর পবিত্র রমজান মাসে তিনি সদল-বলে—মহাসমারোহে মদীনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আঁ হজরত (ছালঃ) তবুক হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, আরবের বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্ন জনপদ এবং বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে 'ওফুদ' (প্রতিনিধি দল—ডেপুটেশন) সকল অনবরত আসিতে লাগিল। এক এক প্রদেশের—জনপদের—জাতির—সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ আসিতেন; ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ইস্‌লাম গ্রহণ করিতেন, এবং দেশবাসী সকলের পক্ষ হইতে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তে 'বয়্‌য়েত' হইতেন। আর পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিধি পদ্ধতি শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদাতা সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে একদল যোদ্ধৃপুরুষ সহকারে 'বেলাদ তয়' (তয় প্রদেশ) অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তিনি তয় প্রদেশে পঁহুছিয়া ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। প্রসিদ্ধ দাতা ও পরোপকারী হাতেম তায়ীর পুত্র, তয় জাতির সর্ব্বপ্রধান ছরদার, আদি 'ফরার' (পলায়নপর) হইয়া শাম প্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যুদ্ধে জয়ী হইয়া যুদ্ধ-জয়-লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার ও বহু সংখ্যক বন্দী লইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বন্দী দলের মধ্যে প্রসিদ্ধ দাতা ও

পরোপকারী হাতেমের কন্যা (আদি-বিন্-হাতেম তায়ীর ভগিনী) ও ছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে বন্দিত্ব হইতে মুক্ত করিয়া উপযুক্ত অর্থ ও বস্ত্রাদি প্রদান পূর্ব্বক স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। ভগিনীর মুখে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রশংসা ও গুণ-কীর্ত্তন শুনিয়া আদি-বিন্-হাতেমতায়ীও মদীনায় আসিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ইস্লাম গ্রহণ করিলেন ; এবং স্বদেশে গিয়া স্বীয় অধীনস্থ সমস্ত জাতিকে ইস্লাম ধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতলে আনয়ন করিলেন। এই সময় এত অধিক সংখ্যক 'ওফুদ' (ডেপুটেশন) হুজুর (ছালঃ)-এর 'খেদমতে' আসিতে এবং পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন যে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পক্ষে এই সময় অল্পকালের জন্যও মদীনা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার উপায় ছিল না। হজ্জের সময় আসিলে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-কে স্বীয় প্রতিনিধি ও হজ্জের আমীর নিযুক্ত করিয়া মক্কাভিমুখে রওয়ানা করিলেন ; এবং নিজের পক্ষ হইতে কোরবানী দিবার জন্য ২০টী উট ঐ সঙ্গে দিলেন। ৩০০ হজ্জ্ যাত্রী মহোৎসাহে হজ্জ্-যাত্রা করিলেন। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর যাত্রার পর ছুরা বরআতের ৪০টী আয়াত এককালীন 'নাযেল' (অবতীর্ণ) হয়। উহাতে হজ্জ সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় আদেশ ছিল ; উহা হজ্জের সময় নানা দেশীয় মোছলমান-দিগের মধ্যে প্রচার করা একান্ত আবশ্যক ছিল বলিয়া, ঐ সকল নবাবতীর্ণ আয়াত সমূহ সহ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে স্বীয় দ্রুতগামিনী উষ্ট্রের পৃষ্ঠে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, হজ্জ্ পরিসমাপ্তির পর দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহ তায়ালার এই আদেশ সকলকে শুনাইয়া দিবে। 'যোল-হুলিফা' নামক স্থানে গিয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন। অতঃপর তাঁহারা

মক্কা-মোয়াজ্জমায় উপস্থিত হইয়া যথা সময়ে হজ্জ্ কার্য্য সম্পন্ন ও হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ছুরা বরআত সমবেত জনমণ্ডলীকে শুনাইয়া দিলেন ; পরে সকলে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই বৎসরেই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ছাহেবযাদী হজরত ওম্মে কুলছুম (রাঃ—আঃ) পরলোক গমন করেন। মক্কার যে সকল লোক (যদিও সংখ্যায় অতি অল্প) এ সময় পর্য্যন্ত ও পৌত্তলিক ছিল, এইবার তাহারা সকলেই পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই বৎসরেই 'মোনাফেক' (কপটাচারী) দলের নেতা আবহুল্লা-বিন্-আবি মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয় ; এই লোকটা আজীবন আঁ হজরত (ছালঃ) ও মোছলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মোনাফেক দলের অস্তিত্ব এক প্রকার বিলুপ্ত হয়।

দশম হিজরীর ঘটনাবলী।

দশম হিজরীর মহর্‌রম মাস হইতে এই বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণেব মদীনায় আগমন ও ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের " ছেল-ছেলাঃ' (স্রোত) পূর্ণভাবে চলিয়া ছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) এই বৎসর কয়েক স্থানে অভিযান প্রেরণ করেন। সেই সকল অভিযানও সাফল্য মণ্ডিত হইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। আরবের সকল প্রদেশ, সকল জনপদ এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকই দলে দলে আসিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। বিপুল জনস্রোত অনবরত মদীনার দিকে আসিতে লাগিল। আরবের প্রসিদ্ধ জন-নেতা ওয়ায়েল-বিন্-হুজর মদীনায় আসিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই শক্তিশালী পুরুষ ইস্‌লাম গ্রহণ করাতে, আঁ হজরত (ছালঃ) খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বৎসরেই " নজরান "

প্রদেশ হইতে খৃষ্টীয়ানদিগের এক "ওফুদ" (ডেপুটেশন) আসিল। ইহারা মছজেদ নববীতে প্রবেশ করিয়া, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে 'মহাছ-মবাহেছাঃ' (তর্ক-বিতর্ক) আরম্ভ করিল। এই দলের নেতা ছিল উপরোক্ত সম্প্রদায়ের দলপতি আবুল মছিহ্। এই সময়েই ছুরে "আল্-এমরান" এর শুরুস্থ আয়াত ও আয়াত 'মোহাহেলা' নাজেল হয়। আঁ হজরত (ছালঃ) উহাদিগকে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু উহারা নিতান্ত 'বে-আদবীর' (অশিষ্টতার) সহিত 'পেশ' আসিল। আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, (হজরত) ঈছা (আলাঃ), আল্লাহ তায়ালার নিকট ঐরূপ ছিলেন—যেমন (হজরত) আদম (আলাঃ)। কারণ তাঁহাকেও খোদা তা-লা মৃত্তিকা দ্বারাই বানাইয়া ছিলেন। ঈছায়ী (খৃষ্টীয়ান) গণ বলিল না, তা নয়, বরং ঈছা (আলাঃ) খোদার 'বেটা' (পুত্র) ছিলেন। উত্তরে আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, যদি তোমরা আপনাদের 'কওলে ছাচ্চাঃ' (উক্তিতে সত্যবাদী) হও, তবে আমার সঙ্গে ময়দানে চল। আর আমার প্রিয় 'আকারেব' (ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন) আমার সঙ্গে থাকিবে, উভয় পক্ষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে বসিয়া বলিবে, "যে ঝুটা (মিথ্যাবাদী), তাহার উপর খোদা তা-লার 'আযাব' (শাস্তি) অবতীর্ণ হউক।" এই কথা শুনিয়া খৃষ্টীয়ানগণ চুপ হইয়া রহিল। পরদিন প্রাতঃকালে আঁ হজরত (ছালঃ) হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত হাছন (রাজিঃ) ও হজরত হোছায়েন (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া স্বীয় গৃহ হইতে বাহির হইলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পূর্ব্বোক্ত ঈছায়ীদিগকে বলিলেন, আমি যখন এই প্রার্থনা করিব যে, আমাদের (উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি 'ঝুটা' (মিথ্যাবাদী) তাহাদের উপর খোদার 'আযাব' (শাস্তি) 'নাযেল' (অবতীর্ণ) হউক। তখন তোমরাও "আমিন" বলিও। আঁ হজরত

(ছালঃ)-এর এইরূপ দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য্য দর্শনে খৃষ্টীয়ানগণ ভীত হইয়া বলিতে লাগিল, আমরা 'মবাহেলা' করিতেছি না। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, যদি তোমরা 'মবাহেলা' করিতে না চাও, তবে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ কর; তাহারা বলিল, আমরা ইস্‌লাম গ্রহণে ও ইচ্ছুক নহি। তচ্ছ্রবণে আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, তবে তোমরা আমাকে 'জজিয়া' দাও—কিংবা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তখন তাহারা বলিল, আমরা 'জজিয়া' দিতে সম্মত আছি। হুজুর (ছালঃ) তাহাতেই রাজী হইলেন। তৎপর তাহারা আপনাদের জন্য একজন 'আমীন' (বিচারক—মীমাংসাকারী) চাহিল, তদনুসারে আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত আবু ওবায়দাঃ-বিন্-জার্'াহ (রাজিঃ)-কে তাহাদের আমীন নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কিছু দিনের মধ্যে "নজরান" প্রদেশের সমুদয় অধিবাসী ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল; খৃষ্টীয়ানের নাম নেশান ও সেখানে রহিল না।

ইতিপূর্ব্বে বিশাল এমন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, পারস্য-সম্রাটের সর্ব্ব-ক্ষমতাপন্ন রাজপ্রতিনিধি বাযান, ও ঐ প্রদেশের প্রায় সমুদয় অধিবাসী পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; এতাবৎ কাল তিনি সেই শাসন-কর্ত্তৃত্ব পদেই নিযুক্ত ছিলেন। এই বৎসর বাযান পরলোক গমন করেন। আঁ হজরত (ছালঃ) এমন প্রদেশটী কয় ভাগে বিভক্ত করিয়া তথায় ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন; এবং হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে এমন প্রদেশের 'যাকাত' ও 'ছাদকা' আদায় করিবার জন্য পাঠাইলেন। তিনি তথায় পঁহুছিয়া যাকাত ও ছাদকা যথানিয়মে আদায় করিতে লাগিলেন। অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) দশম হিজরীর ২৫শে জেকদ তারিখে মহাজের, আন্‌ছার এবং মোছলমানদিগের এক বিরাট দল লইয়া পবিত্র

হজ্জ-ক্রিয়া সম্পাদনার্থ মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। কোরবানীর জন্য ১০০টী উষ্ট্র সঙ্গে লইলেন। ৪ঠা জেলহজ্জ রবিবার দিন তাঁহারা মহাড়ম্বরে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও এমন হইতে আসিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে যোগদান করিলেন; এবং তাঁহার সঙ্গে পবিত্র হজ্জ্ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আঁ হজরত (ছাল) এই বৎসর মোছলমানদিগকে 'মনাছক' হজ্জের 'তৌলিম' (শিক্ষা) দিয়াছিলেন; উহার নিয়মাবলী বাতাইয়াছিলেন; তৎপর আরফাতে দাঁড়াইয়া ওজস্বিনী ভাষায় একটী হৃদয়াকর্ষণ কারিণী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সেই বক্তৃতায় বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও অমূল্য উপদেশাবলী নিহিত ছিল। ইহা আঁ হজরত (ছালঃ)-এর শেষ হজ্জ্ বলিয়া "হজ্জতল-বেদা" এবং "হজ্জ্ আল বালাগ্" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কথিত আছে, এই হজ্জে ১ লক্ষ অপেক্ষা ও অধিক সংখ্যক মোছলমান যোগদান করিয়াছিলেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে হাজীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার হইয়াছিল। আরবের সকল প্রদেশ বাসী, সকল সম্প্রদায়ের মোছলমানই অল্পাধিক পরিমাণে এই হজ্জে যোগদান করিয়াছিলেন।

'আরকানে হজ্জ' আদায় করিবার পরে আঁ হজরত (ছালঃ) ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ) দিগকে সঙ্গে লইয়া মক্কা হইতে মদীনা-মন্নওরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে যে সকল নবদীক্ষিত মোছলমান এমন প্রদেশ হইতে হজ্জে আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বিরুদ্ধে কিছু 'শেকায়েত' (দুর্ণাম) করিয়া ছিলেন—যাহা তাঁহারা বাস্তবিক ভুল বুঝিয়া ছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) এই

শেকায়েত শ্রবণে " আখিব হোম " নামক স্থানে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর অনেক প্রশংসাবাদ করেন ; কতিপয় এমন বাসীর সেই ভ্রমের বিষয় বুঝাইয়া দেন, এবং ইহাও 'এরশাদ ফরমান' যে, যে ব্যক্তি আমার 'দোস্ত' (বন্ধু), সে (হজরত) আলী (কঃ—ওঃ) এর ও দোস্ত ; আর যে লোক (হজরত) আলী (কঃ—ওঃ)-এর দোশ্‌মন (শত্রু), সে আমারও দোশ্মণ।" হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), আঁ। হজরত (ছালঃ) এর এই বক্ত তার পর, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে 'মবারকবাদ (ধন্যবাদ) দিলেন, আর বলিলেন, আজ হইতে আপনি আমার 'খাছ' (বিশেষ) বন্ধু হইলেন। আঁা হজরত (ছালঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর, তদীয় পুত্র-রত্ন এব্‌রাহিম পরলোক গমন করেন।

একাদশ হিজরীর ঘটনাবলী।

আঁা হজরত (ছালঃ)-এর পরলোক গমন।

১১শ হিজরীর মহর্‌রম মাস আসিল, সঙ্গে সঙ্গে আঁা হজরত (ছালঃ) জ্বরাক্রান্ত হইলেন ; এবং জ্বর ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। এই সংবাদ আরব দেশের চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া পড়িল। এই সংবাদ শ্রবণে কতিপয় 'মোফ্‌ছেদ' (বিপ্লব-পন্থী বা ধর্ম্মদ্রোহী) মস্তকোত্তোলন করিল। মোছলেমাঃ, খোয়েল্‌দ, আছুদ, এবং সজাহ-বিন্তে হারেছ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে 'নবুয়তের'

(পয়গম্বরী বা প্রেরিতত্বের) দাওয়া করিল। উহারা মনে করিয়াছিল, যেরূপ আঁ হজরত (ছালঃ) পয়গম্বরীর নামে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, আমাদের ভাগ্যেও সেইরূপ ঘটিবে। কিন্তু পরিণামে উহারা সকলেই অবমানিত, লাঞ্ছিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। ইহাদের মধ্যে মোছলেমাঃতুল কায্যাব এমামা প্রদেশে, ও আছুদ বিন্-কায়াব এমনে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আছুদ কায্যাব আঁ হজরত (ছালঃ) এর জীবিতাবস্থায়ই ফিরোয্ নামক এক বীরপুরুষের হস্তে 'কতল্' (নিহত) হয়। আর মোছলেমাঃতুল কায্যাব প্রথম খলিফা হজরত সিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ—কালে, সেনাপতি হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ ছয়ফোল্লাহ্ (রাজিঃ) কর্ত্তৃক ভীষণ যুদ্ধে পরাস্ত, ও হজরত হামযাঃ (রাজিঃ)-এর শাহাদৎকারী (হত্যাকারী) ওহসী কর্ত্তৃক নিহত হয়। ওহসী বলিতেন, আমি কোফ্ফারের অবস্থায় একজন 'বেহত্তরিণ' (উত্তম—আদর্শ) পুরুষকে শহীদ এবং মোছলমান অবস্থায় একজন 'বদতরিন' (দুষ্ট—দুরাচার) লোককে হত্যা করিয়াছি।

একাদশ হিজরীর ২৬শে ছফর তারিখে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পীড়া একটু হ্রাস বোধ হইল। ইতিপূর্ব্বে শাম ও ফলস্তিনের সীমান্ত প্রদেশ হইতে বিশেষ অশান্তির সংবাদ আসিয়াছিল। এই অপেক্ষাকৃত সুস্থ অবস্থায় তিনি মোছলমানদিগকে রুমের কায়ছারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। হুজুর (ছালঃ) দ্বিতীয় দিবসে (২৭শে ছফর), হজরত ওছামাঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ)-কে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান পূর্ব্বক, সমুদয় জলিলল্ কদর (মহাসম্মানিত) ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগকে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ ফরমাইলেন। হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক-প্রমুখ ভাবীকালের ৪ খলিফা, আশরায় (রাজিঃ) মোবাশ্বরাগণ প্রভৃতি কাহাকেও বাদ দিলেন না। ২৮শে ছফর তারিখে তাঁহার পীড়া

আবার বৃদ্ধি পাইল। এই পীড়িত অবস্থায়ই তিনি হজরত ওছামাঃ (রাজিঃ)-এর যুদ্ধ-পতাকা 'দোরস্ত' করিয়া দিয়া, গন্তব্য প্রদেশাভিমুখে সেনাদল রওয়ানা করিলেন; কেবল নিজের অসুস্থতা বৃদ্ধি দর্শনে প্রধান সেনাপতির মত গ্রহণ পূর্ব্বক পিতৃব্য হজরত আব্বাছ (রাজিঃ) ও প্রিয় জামাতা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে আপনার নিকটে রাখিয়া দিলেন। এই দুইজন ব্যতীত আর সকলেই মদীনা হইতে যুদ্ধযাত্রা করিয়া, শাম ও ফলস্তিন প্রদেশাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মদীনা হইতে একক্রোশ দূরবর্ত্তী "জরফ্" নামক স্থানে এছলামী সৈন্যদলের শিবির সন্নিবেশিত হইল। ঐ স্থান হইতে হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), প্রধান সেনাপতির অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যহ মদীনা-তৈয়বার হুজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইতেন, এবং তাঁহাকে দেখিয়া পুনরায় সেনানিবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। হজরত ওছামাঃ (রাজিঃ) স্বীয় বিশাল সেনাদল লইয়া জরফেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পীড়ার বৃদ্ধি দেখিয়া তিনি আর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। আঁ হজরত (ছালঃ) ও এই অবস্থায় তাঁহাকে 'কুচ্' (যাত্রা) করিতে অনুমতি দিতে ছিলেন না। হুজুর (ছালঃ) পীড়িত অবস্থায় যে কয়টি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শেষ বক্তৃতাটী এই :—(আমার মৃত্যু হইলে) "আমার 'করীব রেশ্তা-দার' (ঘনিষ্ট আত্মীয়) গণ যেন আমাকে গোছল দেওয়ায়; আমার 'জানাযাঃ' (কাফনাবৃত শব) আমার কবরের নিকট রাখিয়া, সকলে অতি অল্প সময়ের জন্য 'আলগ্' (স্বতন্ত্র) হইয়া যাইবে, কারণ 'মালায়েক' (ফেরেশ্তা) গণ যেন আমার জানাযার নমায্ পড়িয়া লইবার অবসর পায়। পরে সকলে দলে দলে আমার জানাযার নমায্ পড়িবে। প্রথমে

আমার 'খান্দানের' (বংশের) পুরুষগণ নমায্ পড়িবে, তাহাদের পর স্ত্রীলোকগণ—তদনন্তর আর আর সকলে জানাযার নমায্ আদায় করিবে।" পীড়ার শেষ ৩ দিন তিনি 'ছাহেবে ফরাশ' (শয্যাশায়ী) ছিলেন। এই পীড়ার অবস্থায় আঁ হজরত (ছাল), হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-কে মছজেদে তাঁহার নিজের জায়গায় এমামতি করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি, হুজুর (ছালঃ)-এর জীবিত অবস্থায় ১৩ ওয়াক্তের নমাযে এমামতি করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে আরও অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ব্যারাম অবস্থায হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত ফজল-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) এবং হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) সর্ব্বদাই তাঁহার খেদমতে উপস্থিত থাকিতেন।

তিনি এই সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে যে 'ওছিয়ত করিয়াছিলেন, তাহা এইঃ—" নমায্ ও 'মোতায়াল্লেকিন' (আত্মীয়-স্বজন বা সম্পর্কীত ব্যক্তি-গণ) সম্বন্ধে 'গাফেল' (অমনোযোগী) থাকিও না।"

১১শ হিজরীর ১২ই রবিওল-আউওল, সোমবার ফজরের নমাজের সময় আঁ হজরত (ছালঃ) মাথায় পটি বাঁধিয়া মছজেদে গমন করিলেন, এবং হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর এমামতিতে—জামাতের ডানদিকে বসিয়া নমায্ পড়িলেন; এই দিনও তিনি কিঞ্চিৎ ওয়াজ ফরমাইলেন। হুজুর (ছালঃ)-এর অবস্থা একটু ভাল দেখিয়া হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), মছজেদ হইতে কিছু দূরবর্ত্তী স্বীয় গৃহে গমন করিয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) মছজেদ হইতে হুজরায় প্রবেশ পূর্ব্বক, ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন

করিলেন। ইত্যবসরে হজরত আবদুর রহমান-বিন্-আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) একখানি মেছওয়াক (দাঁতন) লইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। মোছলেম-মাতা (রাঃ—আঃ), ভ্রাতার হস্ত হইতে দাঁতন খানি লইয়া চিবাইয়া খুব নরম করিলেন; এবং হুজুর (ছালঃ)-এর হস্তে দিলেন। তিনি উহা গ্রহণ পূর্ব্বক যথানিয়মে দাঁতন করিলেন। পরে মেছওয়াক খানি রাখিয়া দিয়া স্বীয় 'ছের-মবারক' (পবিত্র মস্তক), মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকার (রাঃ—আঃ) বক্ষঃদেশে স্থাপন পূর্ব্বক, পবিত্র পা দুখানি সম্প্রসারিত করিয়া দিলেন। হুজুর (ছালঃ)-এর সম্মুখে একটী পানী পূর্ণ পেয়ালা ছিল; তিনি স্বীয় পবিত্র হস্ত ঐ পানীতে ভিজাইয়া স্বীয় 'চেহ্‌রা মবারকে' (বদন মণ্ডলে) ফিরাইতে লাগিলেন; এবং ফরমাইলেন, "আল্লাহুম্মা আ'নি আলা ছাকরাতিল মওতে" (হে আল্লাহ্, ছাক্‌রাতিল মওত হইতে আমাকে 'মদদ' (সাহায্য) কর। ওম্মোল-মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা—আঃ) পুনঃ পুনঃ তাঁহার চেহ্‌রা মবারক দেখিতে ছিলেন; অকস্মাৎ তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত হইয়া গেল। একাদশ হিজরীর ১২ই রবিওল-আউওল সোমবার বেলা প্রায় দ্বি-প্রহরের সময় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর অমর ও পবিত্র আত্মা দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'জন্নতল ফেরদওছে' চলিয়া গেলেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাযেউন)।

ক্ষণকাল মধ্যে এই ভীষণ শোকাবহ সংবাদ মদীনা নগরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। শহরের সমস্ত নরনারী বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত ও শোকে একান্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সে দুর্ব্বহ শোকের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এন্তেকাল-সময়ে হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না—'ছবখ্' নামক মহাল্লায় স্বীয় গৃহে ছিলেন। হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) এই

শোচনীয় সংবাদ শ্রবণে শোকে এরূপ বিহ্বল ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন যে, তিনি বলিতে লাগিলেন, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'এন্তেকাল' (মৃত্যু) হয় নাই ; তিনি হজরত মুছা (আলাঃ)-এর ন্যায় স্বীয় প্রভুর নিকট গমন করিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। তরবারি কোষমুক্ত করিয়া তিনি আরও বলিতেছিলেন, যে ব্যক্তি বলিবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহাকে শমন সদনে পাঠাইব। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হুজুর (ছালঃ)-এর পরলোক গমন সংবাদ শুনিবামাত্র গৃহ হইতে ছুটিয়া আসিলেন। সোজা-সুজি হুজরায় প্রবেশ করিয়া, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রাণ শূন্য দেহের পবিত্র মস্তকটী মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর ক্রোড় হইতে তুলিয়া খুব 'গওর' করিয়া (অভিনিবেশ সহকারে) দেখিলেন, পরে বলিলেন, আমার পিতা মাতা আপনার উপর 'কোরবান' হউক ; 'বেশক' (নিঃসন্দেহ) আপনি ঐ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন,—যাহা আল্লাহ তালা আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন ; এই কথা বলিয়াই " ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাযেউন "পড়িতে পড়িতে হুজ্রা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এই সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং তাঁহার আহ্লিয়া' রছুল-নন্দিনী, স্বর্গের রাজ্ঞী হজরত ফাতেমা যোহরা (রাঃ—আঃ) ভীষণ শোকে কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব। এক্ষণে হুজুর (ছালঃ)-এর শেষানুষ্ঠান অর্থাৎ গোছল ও কাফন-দফন সম্বন্ধে যোগাড়-যন্ত্র আরম্ভ হইল।

মছজেদ-নববীতে এই সকল ব্যাপার ঘটিতেছিল—এই সকল কথা-বার্ত্তা এবং আলোচনা চলিতেছিল, ঐ সময়ই সেখানে সংবাদ পঁহুছিল যে, "ছকিফাঃ-বনু-ছায়েদা " নামক স্থানে আন্ছারগণ সমবেত হইয়া হজরত ছায়াদ-বিন্-য়েবাদাঃ (রাজিঃ)-এর হস্তে বায়্য়েত করিতে চান। আবার কোনও কোনও আন্ছার বলিতেছেন, মোহাজেরদিগের মধ্য হইতে এক

জন, এবং আমাদিগের মধ্য হইতে একজন আমীর মনোনীত করা হউক। এই অপ্রীতিকর সংবাদ শুনিবামাত্র হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ও হজরত আবু ওবায়দাঃ-বিন্-জার্‌রাহ্ (রাজিঃ), মায় একদল প্রধান প্রধান মহাজেরিন তথায় ধাবিত হইলেন। আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত ওছামাঃ (রাজিঃ) এবং হজরত ফজল-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ)-কে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'ওছিয়ত' (অন্তিম-নির্দ্দেশ) অনুযায়ী তাঁহার 'তজ্‌হিয্' ও 'তক্‌ফিন্' (মৃতদেহের কাফন-দফনের অনুষ্ঠান) জন্য রাখিয়া গেলেন। অতঃপর হুজুর (ছালঃ)-কে 'গোছল' (স্নান) করান আরম্ভ হইল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) গোছল করাইতে, হজরত আব্বাছ রাজিঃ ও তাঁহার দুই পুত্র 'করওট' ফিরাইতে (পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করাইতে), আর হজরত ওছামাঃ (রাজিঃ) পানী ঢালিয়া দিতেছিলেন। গোছল শেষ হইলে তাঁহাকে কোথায় সমাধিস্থ করা হইবে, তাহা লইয়া উপস্থিত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), ছকিফাঃ-বনি ছায়েদাঃ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমি হুজুর (ছালঃ)-এর বাচনিক শুনিয়াছি, প্রত্যেক নবী (পয়গম্বর—রছুল)-কে ঐ স্থানে দফন করা হইয়াছে—যে স্থানে তাঁহারা 'এন্তেকাল' (দেহত্যাগ) করিয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর বিছানাদি তুলিয়া ঐ স্থানেই কবর খনন আরম্ভ করিলেন। ওদিকে কাফন পরান কার্য্যও সমাধা হইয়াছিল। কবর খনন হইবার পর জানাযার নমায্ পড়া আরম্ভ হইয়া গেল। প্রথমতঃ পুরুষগণ, পরে স্ত্রীলোকগণ, অবশেষে বালকগণ জানাযার নমায্ আদায় করিলেন; কেহ কাহারও এমামতি করিলেন না। হজরত ওছামাঃ (রাজিঃ) তাঁহার হস্তস্থিত পবিত্র যুদ্ধ-পতাকা, হজরত আয়েশা

ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর দ্বারদেশে আনিয়া খাড়া করিয়া দিয়াছিলেন। সোমবার দিবাগত রাত্রি হইতে পরদিন মঙ্গলবার ৯৷১০টা পর্য্যন্ত দলে দলে মোছলমানগণ জানাযার নমাজ পড়িয়াছিলেন। অন্যূন ২৫৷৩০ হাজার লোক জানাযায় শরীক হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। হুজুর (ছালঃ)-এর এন্তেকালের ৬৪৷২৫ ঘণ্টা পরে তাঁহার দফন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া, ঐতিহাসিক দিগের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে।

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এন্তেকাল পর্য্যন্ত হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর জীবনের ২য় 'দওড়' বা দ্বিতীয় পর্ব্ব শেষ হইয়াছিল। এই সময় হইতে তাঁহার প্রবল উৎসাহাগ্নি, শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশের স্পৃহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জীবনের তৃতীয় পর্ব্ব।

(১১শ হিজরীর ১২ই রবিওল-আউওল হইতে ৩৫ হিজরীর ২৫শে, যেলহজ্জ্ পর্য্যন্ত প্রায় সুদীর্ঘ ২৪ বৎসরের ঘটনা)।

ছকিফাঃ-বনি-ছায়েদার ঘটনা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে আন্‌ছারগণ সমবেত হইয়া আপনাদের পক্ষ হইতে স্বতন্ত্র খলিফা নির্ব্বাচনের যে পরামর্শ ও যোগাড়-যন্ত্র করিয়াছিলেন, যদি ঐ সময় হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ও হজরত আবু ওবায়দাঃ (রাজিঃ)-প্রমুখ মোহাজের-প্রধানগণ তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত না হইতেন, তবে আন্‌ছারগণ স্বতন্ত্র খলিফা নির্ব্বাচন করিয়া ফেলিতেন, এবং তদ্দ্বারা ইস্‌লামের মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া যাইত। পরম করুণাময় আল্লাহ

তায়ালা তাঁহার প্রিয় 'মযহব' এছলামকে রক্ষা করিবেন, সুতরাং শত সহস্র বিপদ ও বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া তিনি এছলামকে জয়যুক্ত করিলেন। উপরোক্ত শ্রেষ্ঠতম ছাহাবাঃ ত্রয় সেখানে যাইয়া একাধিক খলিফা নির্ব্বাচনের অবৈধতা অনিষ্টকারিতা এবং আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র উক্তি দ্বারা আন্‌ছার হইতে মোহাজেরগণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করাতে, এবং হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর যুক্তিপূর্ণ সারগর্ব্ভে বক্তৃতা শ্রবণে, আন্‌ছার-গণ আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন; সঙ্গে সঙ্গেই হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ও হজরত আবু ওবায়দাঃ (রাজিঃ), হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর হস্তে বায়্‌য়েত করাতে, সমবেত জনমণ্ডলী ও মহোৎসাহে হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর হস্তে বায়্‌য়েত করিতে লাগিলেন। কেবল বনি-খয্‌রজ দলের রইছ (দলপতি—যাঁহাকে আন্‌ছারগণ খলিফা নির্ব্বাচন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন) হজরত ছায়াদ-বিন্ যেবাদাঃ (রাজিঃ) ঐ সময় বায়্‌য়েত করিলেন না; কিন্তু সেই দিনের মধ্যেই বায়্‌য়েত করিলেন। মোহাজেরিনদিগের মধ্যে হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত যোবায়ের (রাজিঃ) ও হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ৪০ দিন পর্য্যন্ত কেবলমাত্র এই কারণ দর্শাইয়া বায়্‌য়েত করিলেন না যে, ছকিফাঃ-বনু-ছায়েদার পরামর্শে ও বায়্‌য়েত গ্রহণকালে আমাদিগকে কেন 'শরীক' (সঙ্গী) করা হইল না? উপরোক্ত চল্লিশ দিন সময়ের মধ্যে একদা হজরত আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ), মদীনায় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, তুমি থাকিতে (হজরত) আবুবকর (ছিদ্দিক) কিরূপে খলিফার পদ গ্রহণ করিতে পারেন? তুমি হাত বাড়াইয়া দাও, আমি এখনই তোমার হস্তে বায়্‌য়েত করিতেছি। যদি তুমি চাও, তবে আমি অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যে মদীনার ময়দান পূর্ণ করিয়া দিব। আর ইহার দ্বারা (হজরত) আবুবকর ছিদ্দিক

(রাজিঃ)-এর 'যেন্দেগী তঙ্গ্' (আয়ুষ্কাল সঙ্কীর্ণ) হইয়া যাইবে। তচ্ছ্রবণে হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ)-কে কঠোরভাবে উত্তর দিলেন যে, তুমি 'ফেৎনাঃ' ও 'ফছাদ' (বিপ্লব ও বিবাদ-বিসম্বাদ) উপস্থিত করিতে চাও, তুমি চলিয়া যাও, আমি তোমার 'নছিহত' (উপদেশ) ও 'হামদর্দ্দী' (সহানুভূতি)-সূচক কথা শুনিতে চাই না। হজরত আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ) এই উক্তি শ্রবণে নিতান্ত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ) ও উঠিয়া সোজাসুজি হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, আপনার 'ফজিলত' (বোযর্গী—শ্রেষ্ঠত্ব) এবং খেলাফতের 'এস্তেহকাক্ক্' (ন্যায্য দাবীদার) হওয়া সম্বন্ধে আমি 'মোনকের' (অস্বীকৃত) নহি। কিন্তু আমার 'শেকায়েত' (অভিযোগ) এই যে, আমি জনাব হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর সর্ব্বাপেক্ষা 'করীবি রেশ্তাদার' (অতি নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়), আপনি ছকিফাঃ-বনি ছায়েদায় কেন আমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া, লোকের নিকট হইতে বায়্য়েত গ্রহণ করিলেন? যদি আপনি আমাকে সেখানে ডাকাইয়া লইতেন, তবে আমি সকলের অগ্রে আপনার হস্তে বায়্য়েত করিতাম। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ফরমাইলেন, জনাব হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর আত্মীয়-স্বজনগণের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, আমার নিজ আত্মীয়-স্বজনগণের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় কার্য্য বলিয়া আমি মনে করি। আমি ছকিফায় বায়্য়েত গ্রহণ করিবার জন্য গিয়াছিলাম না; বরং মহাজেরিণ ও আনছারদিগের 'নযায়া' (মনোবাদ—

ঝগড়া:) দূর করার উদ্দেশ্যেই সেখানে গিয়াছিলাম। যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, উভয় সম্প্রদায় যেন পরস্পর যুদ্ধ করিতে—মরিতে এবং মারিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আমি নিজের জন্য বায়্য়েত লইবার 'দরখাস্ত' (প্রার্থনা—অভিপ্রায় জ্ঞাপন) করি নাই; বরঞ্চ উপস্থিত জনমণ্ডলী স্বতঃপ্রবৃত্ত ও একমতাবলম্বী হইয়া আমার হস্তে বায়্য়েত করিয়াছিলেন। যদি আমি সেই সময় বায়্য়েত গ্রহণ কার্য্য 'মুলতবি' (স্থগিত) রাখিতাম, তবে আশঙ্কা ও বিপদ দ্বিতীয় বার অধিকতর প্রবল ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। আপনি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'তজ্‌হিয্' ও 'তক্‌ফিন্' (গোছল ও কাফন কার্য্য সম্পাদন) কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন আমি ঐ 'রজ্‌লতে' (ব্যস্ত-সমস্ততার মধ্যে) আপনাকে কিরূপে সেখানে ডাকাইয়া লইতাম? হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই সকল কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার 'শেকায়েত' (অভিযোগ) প্রত্যাহার করিলেন, এবং তৎপর দিন মছজেদ নববীতে, সর্ব্ব-সাধারণের উপস্থিতিতে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর হস্তে বায়্য়েত করিলেন।

বলিতে গেলে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রকৃত সুখ-শান্তির দিন প্রায় শেষ হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে পিতা, এবং পরম স্নেহে প্রতিপালন-কারিণী মোছলেম-মাতা হজরত খাদিজাতুল কোব্‌রা, এবং স্বীয় গর্ভধারিণী মাতা পরলোক গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পরলোক গমনে তিনি আপনাকে বড়ই অসহায় ও দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মনে করিলেন। যে বিরাট পর্ব্বত তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল, যে বিশাল আকাশবৎ চন্দ্রাতপ তাঁহার মস্তকোপরি বিদ্যমান থাকিয়া, সর্ব্বপ্রকার বিপদ আপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার অন্তর্ধানে তিনি চক্ষে

অন্ধকার দেখিলেন। অমন স্নেহ, অমন প্রাণের ভালবাসা, অমন সহানুভূতি আর কাহার নিকট পাইবেন ? তাঁহার দোওয়া এবং তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসায়ই তিনি জগজ্জয়ী বীর ছিলেন; ভীরুতা, সাহসহীনতা কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানিতেন না। খয়বরের যুদ্ধকালে তাঁহারই দোওয়ায়, তাঁহারই পবিত্র কর-স্পর্শে তিনি ভীষণ ভাবে চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়াও মুহূর্ত্ত মধ্যে নিরাময় হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে—পিতার পরলোক গমনে তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী খাতুনে জন্নত হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ভীষণ শোকে এমনই অভিভূতা হইয়া পড়িলেন যে, তিনি দিবানিশি পিতৃশোকে অবিরল ধারায় অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে ছিলেন। পিতার মৃত্যুতে তাঁহার পবিত্র বদনে কখনও হাস্য প্রকটিত হয় নাই। পিতার উপদেশে—পাপের ভয়ে তিনি শব্দ করিয়া কাঁদিতেন না, কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও নয়নাসারে বসন ভিজাইতেন। তাঁহার সুখ-শান্তি চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি অনেক সময়ই 'রওজা মবারকে' (আঁ হজরতের সমাধিস্থলে) গমন করিয়া বিলাপ করিতেন, অশ্রুরাজিতে কবর সিক্ত করিতেন, আর সত্বরে তাঁহার সমীপস্থ হইবার জন্য আকুল প্রাণে কামনা করিতেন—আল্লাহ্ তা-লার দরগায় প্রার্থনা জানাইতেন। গৃহে থাকাকালে নমাজ ও এবাদৎ-বন্দেগীতে 'মশ্‌গুল' (ব্যাপৃত) থাকিতেন, ক্ষুদ্র সংসারের গৃহ-কার্য্য সম্পন্ন ও স্বামী সেবা করিতেন, পুত্র ও কন্যাগণের লালন পালন ও শুশ্রূষা যথানিয়মে সম্পন্ন এবং মাত্র জীবন রক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন। হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ –আঃ)-এর সান্ত্বনার এই একটী বিষয় ছিল যে, আঁ হজরত (ছালঃ) রোগ-শয্যায় স্বীয় দুহিতা-রত্নকে বলিয়াছিলেন, "অয়ি মাতা ফাতেমা! তুমি সর্ব্বাগ্রে আমার সহিত সম্মিলিত হইবে" (মৃত্যুরূপ শরবৎ পান করিবে)।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) খেলাফৎ-দরবারে অন্যতম মন্ত্রী বা পারিষদ রূপে কার্য্য করিতেন; মহামান্য খলিফাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দানে সাহায্য করিতেন, কঠিন কঠিন মছলার মীমাংসা করিতেন; আর গৃহে থাকিয়া উপাসনায় ও এবাদত-বন্দেগীতে সারা দিবা নিশি কাটিয়া দিতেন। 'বয়তুলমাল' হইতে যে বৃত্তি পাইতেন, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাও কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু পতিপ্রাণা সতী-সহধর্ম্মিণীর শোচনীয় অবস্থা দর্শনে বড়ই কষ্ট বোধ করিতেন; স্বর্গের রাজ্ঞীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দর্শনে নিতান্তই নিরাশ হইয়া পড়িতেন। তিনি যেন শোকের একটী জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি রূপে প্রতিভাত হইতেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বীর হৃদয় যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। খ্যাতাপন্ন মোছলেম বীরগণ আরবের ভীষণ বিপ্লব প্রশমিত করিতেছিলেন; বিদ্রোহী ও বিপ্লবপন্থিদিগের বিরুদ্ধে বড় বড় বীরপুরুষগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ন্যায় অদ্বিতীয় বীর সে কার্য্যে যোগদান করেন নাই। খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর জীবিত কালে তাঁহার পক্ষে যুদ্ধাদি কার্য্যে যোগদান করা ও এবং মদীনা হইতে দূরে থাকাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

এদিকে হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) নিদারুণ পিতৃ-শোকে দিন দিন ক্ষীণ, জীর্ণ-শীর্ণ ও নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার আহার নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ হইল। যে পিতা, দুনিয়ার মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ, তাঁহাকে তিনি কিরূপে ভুলিবেন? তাঁহার অভাব জনিত দুর্ব্বিসহ শোক তিনি কিরূপে সহ্য করিবেন? পরম শ্রদ্ধেয় 'ওয়ালেদ-মাজেদ' এর পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গেই হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পবিত্র জীবন পার্থিব বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার

জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার প্রাণের শান্তি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। তিনি সহধর্ম্মিণী ও জননীর কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব খুবই জানিতেন এবং বুঝিতেন; সে কর্ত্তব্য সম্পাদনে তিনি আদর্শ স্থানীয়া ছিলেন। মৃত্যু-কামনা করা পবিত্র এছলাম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কার্য্য, সেই জন্য তিনি সেই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মৃত্যু-কামনা কখনও করিতেন না—সে খেয়াল ও মনে স্থান দিতেন না। সেই পিতৃ-স্নেহশীলা কন্যার, হজরত রেছালত মাব (ছালঃ)-এর প্রতি কিরূপ অসাধারণ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল, তাহা অন্যের ধারণাতীত। শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া পিতা এবং মাতা উভয়ের সমগ্র স্নেহ রাশি ও প্রাণের সহানুভূতি স্বীয় আদর্শ ওয়ালেদ-মাজেদের নিকট পাইয়াছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠা তনয়া বলিয়া, স্নেহের পরিমাণ আরও অগাধ, অপরিসীমও ধারণাতীত ছিল। যাঁ হজরত (ছালঃ) জ্যেষ্ঠা কন্যা ত্রয়কে যথাসময়ে বিবাহ দিয়াছিলেন, তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে পরলোক গমনও করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ (ছালঃ)-এর পুত্র সন্তান কেহ জীবিত ছিলেন না, সুতরাং তদীয় হৃদয়ের সমগ্র স্নেহ-রাশি তিনি এই সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা আদর্শ ও কনিষ্ঠা কন্যা-রত্নের প্রতি ঢালিয়া দিয়াছিলেন; সে স্নেহের কোনও সীমা-পরিসীমা ছিল না। উহা যেমন অগাধ তেমনই অপরিসীম ছিল। আবার সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র, সর্ব্বাগুণালঙ্কৃত পিতৃব্যপুত্র, শৈশবকাল হইতে যাঁহাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়াছিলেন, সেই পরম ধার্ম্মিক ও সাধু পুরুষ, অদ্বিতীয় বীরপুরুষ, মোস্তফা গত প্রাণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তেই সেই স্নেহের পুত্তলীকে সম্প্রদান করিয়া, হৃদয়ে অসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে এই স্নেহ-লতার সেবা ও পরিচর্য্যায় কতই না সুখ-শান্তি অনুভব করিতেন। এই কন্যা-রত্নই, পতিগতপ্রাণা আদর্শ পত্নী মোছলেম মাতা মহামাননীয়া হজরত খদিজাতুল কোব্‌রার স্মৃতি তাঁহার

পবিত্র হৃদয়ে জাগরুক রাখিত। সেই মহীয়সী আদর্শ সতীর স্মৃতি হৃদয়ে জাগরুক হইলে, তিনি আকুল প্রাণে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। ইহাতে কন্যা রত্নের প্রতি স্নেহের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। আজ সেই পিতৃ-ধনে বঞ্চিত হইয়া, স্বর্গের রাজ্ঞী হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) এ সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। মানুষের শোক-বহ্নি সাধারণতঃ ক্রমশঃ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে থাকে, কিন্তু হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সে ভীষণ শোক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগমের ন্যায় ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল; তিনি ক্রমে মৃত্যুর খুব নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরে কোনও রোগ-ব্যাধি ছিল না; একমাত্র পিতৃ-শোকে তাঁহার জীবনী শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় ও তিনি স্বামী সেবা, পুত্র কন্যাগণের তালাফি-তদ্বির বা গৃহ-কর্ম্মে কিছুমাত্র অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেন নাই। এই অবস্থায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যেমন গত হইতে চলিল, তাঁহার জীবন নাটকের পর্য্যবসান হইবার দিনও তেমনই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

এই অবস্থায় আর ৫।৬ দিন গত হইয়া গেল; এ সময় হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর আর চলিবার শক্তি ছিল না। পুত্র কন্যাগণ এ সময় তাঁহাকে জড়াইয়া থাকিতেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কার্য্য উপলক্ষে অনেক সময়ই বাহিরে থাকিতে বাধ্য হইতেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণে শান্তি ছিল না। সতী-সাধ্বী প্রিয় পত্নীর অবস্থা দর্শনে তাঁহার হৃদয় যেন চুরমার হইয়া যাইতেছিল। ছৈয়দাঃ পুত্র-কন্যাগণের ভবিষ্যৎ অবস্থা চিন্তা করিয়া একান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেন। একদিনের ঘটনা এই যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে তশরিফ্ লইয়া গিয়াছিলেন; গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, একখানি 'বর্‌তনের (বাসনের) নিকটে খানিক গোলা (মর্দ্দিত বা মথিত) মাটী রহিয়াছে; সদ্য ধোয়া কাপড়

'আল্‌গনির' (দড়ির) উপর রাখা আছে, আর ছৈয়দাঃ জাঁতায় আটা পিষিতেছেন ; এবং অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। প্রিয়তমার এই অবস্থা দর্শনে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না ; তাঁহার হৃৎপিণ্ড যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন, প্রিয়তমে ফাতেমা ! তোমার জীর্ণ-শীর্ণ ভগ্ন দেহ ত একাজের উপযুক্ত নহে। পরম ভক্তি-ভাজন ও পরম প্রণয়াস্পদ স্বামীর কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রবল তুফাণের সৃষ্টি হইল ; তিনি রোদন সম্বরণ করিবেন দূরে থাকুক, পূর্ব্বাপেক্ষা জোরে কাঁদিতে—অজস্র ধারে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহর পবিত্র মস্তক স্বীয় বক্ষেঃ ধারণ করিলেন। সৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রিয়তম স্বামি ! আমি গত রাত্রে আমার পরম শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ মাজেদ হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-কে স্বপ্নে দেখিয়াছি ; আমার বোধ হইতেছিল, তিনি যেন কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি বলিলাম, হে শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ মাজেদ ! হে রছুলোল্লাহ্ ! আপনার 'জুদায়ী' (বিচ্ছেদ) আমার পক্ষে কেয়ামত স্বরূপ বোধ হইতেছে। তদুত্তরে তিনি ফরমাইলেন, মাতঃ ফাতেমাঃ ! আমি তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। তুমি উঠ, চল, পুত্র-কন্যাদিগকে আল্লাহ তায়ালার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক 'জন্নতের' (বেহেশ্‌তের) ভ্রমণ-সুখ উপভোগ কর। স্বামিন্ ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছেন যে, আমার আসন্ন কাল উপস্থিত। মৃত্তিকা এই জন্য গুলিয়া রাখিয়াছি যে, ছেলে মেয়েদিগকে শেষবার স্বহস্তে 'গোছল' (স্নান) করাইব। কাপড় এই জন্য ধুইয়া রাখিয়াছি যে, স্বহস্তে ঐ কাপড় উহাদিগকে পরাইব। যব পিষিয়া এজন্য আটা প্রস্তুত করিতেছি যে, আমার মৃত্যু হইলে আপনি এবং আমার সন্তানগণ যেন অনাহারে না থাকেন। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) শিহরিয়া উঠিলেন—নিতান্ত ব্যস্ত-সমস্ত ও অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন, তুমি এ কি কথা বলিতেছ ? হজরত রছুলুল্লাহ্ (ছালঃ)-এর 'ছদমাঃ' (শোকের আঘাত) তোমার হৃদয়ে এখনও 'তাযাঃ' রহিয়াছে, এজন্য তুমি এরূপ কথা বলিতেছ।

এই সময়ের অন্যান্য ঘটনা হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর জীবনীতে লিপিবদ্ধ হইবে ; এস্থলে সংক্ষেপে ইহার উপসংহার করিতেছি। অন্যান্য কথোপকথনের পর হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে বলিলেন, স্বামিন্! আমি আপনার খেদমতে ৩টী প্রার্থনা করিতেছি ; আপনি ইহা 'মঞ্জুর' ফরমাইবেন। ১ম, আপনি আমার সমস্ত অপরাধ 'মায়াফ্' (মার্জ্জনা) করুন। ২য়, আমার জানাযাঃ রাত্রিকালে উঠাইবেন, আর রাত্রিকালেই দফন করিবেন, 'গয়ের মহরেম' ব্যক্তিকে আমার জানাযাঃ স্পর্শ করিতে দিবেন না। ৩য়, এই মাতৃহীন বালক-বালিকাদিগের 'দেল-দারিতে' (মন যোগাইতে) ত্রুটী করিবেন না। উহাদের মাথার উপর হইতে মায়ের স্নেহ-পূর্ণ ছায়া চলিয়া যাইতেছে। উহাদের 'দেল-কমজোর' (হৃদয় দুর্ব্বল), ইহাদের আশা ও উৎসাহ 'পস্ত্' (কমজোর), উহাদের আব্দার আপনি রক্ষা করিবেন। সৈয়দার এইরূপ নিদারুণ কথা শুনিয়া হজরত আমীর আলায় হেচ্ছালাম (হজরত আলী [ক—ওঃ]) রোদন করিতে লাগিলেন ; এবং বলিলেন, তুমিও আমার ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করিয়া দাও। তৎপর হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে বলিলেন, আপনি ছেলেদিগকে লইয়া একবার 'রওজাঃ মবারকে' গমন করুন। তদনুসারে তিনি এমাম ভ্রাতৃ-যুগলকে সঙ্গে লইয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'রওজা আক্দছে' (পবিত্র সমাধি স্থলে) চলিয়া গেলেন। সৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) এই অবসরে অজু করিলেন ; পরিধেয় কাপড় বদলাইলেন ;

পরিচারিকা-আছমাঃ কে বলিলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে বলিয়া দিও, তিনি যেন এই অবস্থায়ই আমাকে 'গোছল' দেন (মৃত-স্নান করান);—আমার দেহ যেন আবরণ শূন্য করা না হয়। এই সময় খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর অবস্থা একেবারেই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তদীয় পবিত্র মুখ কেবলাভিমুখে (কাবার দিকে) ছিল; তিনি ঐ অবস্থায়ই 'মনাজাত' (আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে প্রার্থনা) করিতেছিলেন। পবিত্র 'রমজানুল্ মবারকের ৩রা তারিখে, মঙ্গলবার দিবস মগ্‌রেব্ ও এশার নমাজের মধ্যবর্ত্তী সময়ে, স্বর্গের সম্রাজ্ঞী, নারী-কুলের আদর্শ, আদর্শ স্বামী-পরায়ণা, সতীকুল ভূষণ, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সর্ব্ববিধ গুণ ও ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি, হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর প্রিয়তমা দুহিতা-রত্ন, হজরত ফাতেমা যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), পবিত্র দেহ-ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোক আলোকিত করিলেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাযেউন)। মদীনায় আবার শোকের প্রবাহ ছুটিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্নেহাধার পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে হুজুর (ছালঃ)-এর রওজা মবারক হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া গেল। অতঃপর মরহুমার শেষ নির্দ্দেশানুসারে তাঁহাকে স্নান করাইয়া, কাফন পরাইয়া রাত্রিকালে সঙ্গোপনে কবরস্থানে লইয়া গেলেন। "জিন্নতল-বকি" নামক স্বনামখ্যাত কবরস্থানে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত হইয়াছিল। আজও মদীনা-তৈয়বায় গিয়া লক্ষ লক্ষ মোছলমান তাঁহার পবিত্র কবর যেয়ারত করিয়া থাকেন।

হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-এর এন্তেকাল (পরলোক গমন)-কাল হইতে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেলাফত কাল শুরু (আরম্ভ) হওয়া পর্য্যন্ত চান্দ্র মাসের হিসাবে ২৩ বৎসর ১০ মাস বা সাড়ে দশ মাস অতীত হইয়া গিয়াছিল; সৌর মাসের হিসাবে উহা কম-বেশ তেইশ

বৎসর। এই সুদীর্ঘ সময় মধ্যে হজরত ছিদ্দিক আক্‌বর (রাজিঃ), হজরত ফারুক আজম (রাজিঃ), হজরত ওস্‌মান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ)— এই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলিফার আধিপত্য কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের এই ২৩ বৎসরের ঘটনা তেমন বিস্তৃতভাবে জানা যায় না। তবে একথা বেশ জানাযায় যে, তাঁহার যৌবনের শেষ সীমা ও প্রৌঢ় বয়সের মধ্যে তিনি কোনও যেহাদ অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধে গমন করিয়া, স্বীয় প্রচণ্ড প্রতাপ ও অমানুষিক বীরত্ব প্রদর্শন করেন নাই। তিনি মহামান্য খলিফা দিগের মন্ত্রণা-সভার সদস্য, জটিল মছলার মীমাংসাকারী ও পরামর্শ-দাতারূপে মদীনা তৈয়বায়ই অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি কয়েকটী বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র-পৌত্রী প্রভৃতি লইয়া নূতন সংসার পাতিয়া ছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রধানতঃ কঠোর উপাসনা-আরাধনা এবং মোশাহেদা-মোরাকাবায় সময় অতিবাহিত করিতেন। হজরত ছিদ্দিক আক্‌বর (রাজিঃ) আঁ হজরত (ছালঃ)-এর শ্বশুর, সুতরাং সেই সম্পর্কে তিনি তাঁহার নানা শ্বশুর, হজরত ফারুক আজম একদিকে তাঁহার নানাশ্বশুর, অন্য দিকে তাঁহার জামাতা ছিলেন। আর তৃতীয় খলিফা—হজরত ওছমান জিন্নূরায়েন (রাজিঃ) ছিলেন তাঁহার ভায়রা-ভাই।

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পরলোক গমনের পর যখন হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) খলিফা-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, ঐ সময় কতিপয় ভণ্ড ব্যক্তি পয়গম্বরীর দাওয়া করিয়া বহু লোককে আপনাদের মতানুবর্ত্তী ও আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়াছিল। বহুলোক 'মোরতেদ' (ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট) হইয়া পড়িয়াছিল ; একদল লোক 'যাকাত' প্রদানের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সমগ্র আরবে একটা ভীষণ অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল ; এমন কি, পবিত্র মদীনা-তৈয়বা নগরীর চতুর্দ্দিকে ও বিপ্লব-বহ্নি জ্বলিয়া

উঠিয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, দৃঢ়চিত্ত, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী মহামান্য খলিফা হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) দৃঢ়-হস্তে শাসন দণ্ড ধারণ করিয়া, ১১শ জন বিখ্যাত সেনাপতিকে ভিন্ন ভিন্ন সেনাদল সহকারে বিদ্রোহ-দমনার্থ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। এদিকে তিনি মদীনা শরীফের 'হেফাযৎ' (তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ) জন্য একদল যোদ্ধপুরুষ মছজেদে নববীর সম্মুখে সুসজ্জিত রাখিলেন। **আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)**, হজরত যোবের (রাজিঃ), হজরত তালহা (রাজিঃ)-এবং হজরত আবদুল্লা-বিন্-মছউদ (রাজিঃ)-কে মদীনার চতুর্দ্দিকে পাহারা দিতে নিযুক্ত করিলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি কোনও বিদ্রোহী বা বিপ্লববাদী সম্প্রদায় মদীনা-তৈয়বাঃ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তবে যেন তৎক্ষণাৎ মহামান্য খলিফাকে সেই সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে। মদীনার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিপ্লববাদিগণ যখন জানিতে পারিল যে, মদীনা নগরে অতি অল্পসংখ্যক মাত্র মোছলমান যোদ্ধপুরুষ বিদ্যমান আছেন, আর যাকাৎ মাফ্ করা সম্বন্ধে মহামান্য খলিফা সম্পূর্ণ রূপে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তখন তাহারা একমতাবলম্বী হইয়া মদীনা-তৈয়বাঃ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। **কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ)**, হজরত তালহা (রাজিঃ), হজরত যোবের (রাজিঃ) ও হজরত আবদুল্লা-বিন্-মসউদ (রাজিঃ), মদীনার বাহিরেই তাহাদের গতিরোধ করিলেন; মহামান্য খলিফা সংবাদ পাইবামাত্র যতদূর পারিলেন, যোদ্ধপুরুষদিগকে সমবেত করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে সকলে সমবেত ভাবে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে 'যিখশব' নামক স্থানে পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিলেন। তাহারা অতি শোচনীয় রূপে পরাজিত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাহারা আবার দফ্ ও অন্যান্য বাজা বাজাইয়া নবোৎসাহে অগ্রসর হইল।

ঐ সকল বাদ্য-বাজনা শ্রবণে মোছলমানদিগের উট গুলি ভয় পাইয়া পলায়ন করিল, এবং মদীনা নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। এই স্থানে আমরা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে যোদ্ধৃবেশে দেখিতে পাই।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মহামান্য খলিফার শাসন পরিষদের ও ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য এবং অন্যতম মন্ত্রী স্বরূপ ছিলেন; তদ্ব্যতীত হজরত ওছমান (রাজিঃ) ও তাঁহার উপর চিঠি-পত্র ও সন্ধিপত্র ইত্যাদ লিখিবার ভারও অর্পিত ছিল। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর কাল খেলাফৎ করার পর, পরলোক গমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে, তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বড়ই চিন্তিত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কারণ তিনি বেশ জানিতেন, বিশাল মোছলেম জগতের খলিফা এমন উপযুক্ত ব্যক্তির হওয়া আবশ্যক, যিনি একদিকে আদর্শ ধার্ম্মিক ও পরহেজগার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পূর্ণ রাজনীতিক জ্ঞান-সম্পন্ন, আর দৃঢ়হস্তে শাসনদণ্ড পরিচালনা করার উপযুক্ত পাত্র হন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী ব্যক্তিই খলিফা হওয়ার উপযুক্ত পাত্র। তিনি এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ এবং পরামর্শ গ্রহণ জন্য সর্ব্বাগ্রে হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়য়োফ্ (রাজিঃ)-কে আহ্বান করিলেন, তিনি উপস্থিত হইলে মৃত্যু-শয্যায় শায়ীত মহামান্য খলিফা ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) বলিলেন, খেলাফত পদে ওমর (রাজিঃ) কে নির্ব্বাচন করা সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত? তিনি বলিলেন, হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর মেজাযে কঠোরতা বেশী দৃষ্ট হয়। মহামান্য খলিফা ফরমাইলেন, ওমর (রাজিঃ)-এর মেযাজে কঠোরতা থাকিবার

কারণ এই যে, আমি অতি নরমদেল ছিলাম। আমি বিশেষ ভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, আমি যে বিষয়ে খুব কোমল ব্যবহার করিতাম, ওমর (রাজিঃ) তাহাতে কঠোরতা প্রদর্শন করিতেন। আমার খুব বিশ্বাস, খেলাফতের ভার তাঁহার মস্তকে পতিত হইলে তিনি কোমল হৃদয় এবং কঠোরতা পরিহারকারী হইবেন। অতঃপর তিনি হজরত ওছমান (রাজিঃ)-কে ডাকিয়া খলিফা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর নাম উল্লেখ করিলেন ; তিনি বলিলেন, হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর প্রকাশ্য অবস্থা যাহা, তদপেক্ষা তদীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা অধিকতর উন্নত ও উজ্জ্বল। এ বিষয়ে আমরা কেহই 'মর্ত্তবায়' তাঁহার সমকক্ষ নাহি। অবশেষে হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহুকে ডাকিয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও ঠিক ঐরূপ অভিমতই প্রকাশ করিলেন।

মহামান্য খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) সম্বন্ধে হজরত আলী (কঃ— ওঃ) লোকদিগকে ফরমাইয়াছিলেন। তোমরা যখন 'ছালেহীন' দিগের নাম উল্লেখ করিবে, তখন হজরত ওমর (রাজিঃ) এর কথা ভুলিবে না। একদা শেরে খোদা হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ), হজরত ওমর (রাজিঃ)-কে বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি অপেক্ষা আর কেহই আমার অধিক প্রিয়পাত্র নহেন।"

এক ব্যক্তি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) সম্বন্ধে আপনি কি মত পোষণ করেন ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন ; "হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর

হৃদয় সঙ্কল্পের দৃঢ়তায়, বুদ্ধিমত্তায়, সাহসে এবং বীরত্বে পরিপূর্ণ।"

হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর খেলাফত কালে যখন পারস্যের যুদ্ধে একবার মোছলমানাদগের আংশিক পরাজয় ঘটিয়াছিল, পঙ্গপাল সদৃশ অগণ্য পারসিক সৈন্যের সঙ্গে মুষ্টিমেয় মোছলমান বীরগণ আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, তাহাদের কতিপয় সুযোগ্য সেনাপতি বিস্ময়কর বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে শায়ীত হইয়াছিলেন, তখন মহামান্য খলিফা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন ; এবং হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে মদীনায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং পারস্য দেশাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি মদীনা-তৈয়বাঃ হইতে কিয়দ্দূরে—চশমাঃ-যরাবে সসৈন্যে গমন করিলে, হজরত ওছমান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ) তাঁহাকে গিয়া বলিলেন, যুদ্ধার্থ এরাকে (পারস্যে) স্বয়ং আপনার গমন করা সঙ্গত বোধ হয় না। এতচ্ছ্রবণে মহামান্য খলিফা এক সমর-সভা আহ্বান করিলেন, এবং এতৎ সম্বন্ধে সকলের মতামত জানিতে চাহিলেন। অধিকাংশ ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ), সেনাপতি এবং সমর বিভাগীয় শ্রেষ্ঠতম পুরুষগণ, মহামান্য খলিফার স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পক্ষেই মত প্রকাশ করিলেন : কিন্তু হজরত আবদুর রহমান-বিন-য়য়োফ (রাজিঃ) এই মতের সমর্থন করিলেন না—প্রতিবাদ করিলেন ; তখন আমিরুল মুমেনিন—খলিফাতুল মোছলেমিন ; হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে মদীনা হইতে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া ও হজরত আবদুর রহমান-বিন্-রয়োফের মত সমর্থন করিলেন ; তদনুসারে মহামান্য খলিফা সমবেত জন-মণ্ডলীকে উপরোক্ত ৩ মহাত্মার অভিমত জ্ঞাপন পূর্ব্বক, নিজের যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রাখিলেন। এক্ষণে কাহাকে প্রধান

সেনাপতির পদে বরণ করা হইবে, এই প্রশ্ন উঠিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে অনুরোধ করাতে তিনি তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ফলতঃ মদীনায়, মহামান্য খলিফার দরবারে তাঁহার উপস্থিত থাকাও একান্ত আবশ্যক ছিল। অবশেষে মহাবীর হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওক্কাছ (রাজিঃ)-কে প্রধান সেনাপতি পদে বরিত করিয়া ইরাকে—পারস্য-সীমান্তে পাঠান হইল।

পারস্য সাম্রাজ্য জয়:করিয়া মোছলেম সৈন্যগণ সে সকল বহুমূল্য জিনিষ-পত্র মদীনায় পাঠাইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া মোছল-মানদিগের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। পারস্য-সম্রাটের এক খানি মণি-মুক্তা খচিত অপূর্ব্ব আসন ও সেই সঙ্গে আসিয়াছিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর মতানুসারে অন্যান্য সা২গ্রী-সম্ভারের সঙ্গে সেই বহুমূল্য আসন খানিও কাটিয়া ভাগ-বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। হজরত আলী (কঃ —ওঃ)-এর অংশে যে টুকরা টুকু পড়িয়াছিল, তাহা তেমন উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্ না হইলেও, ৩০ হাজার দিনার মূল্যে তিনি উহা বিক্রয় করিয়াছিলেন।

যখন 'বয়তুল মোকদ্দস্' (যিরুসালেম) মোছলেম সেনাপতিগণ অবরোধ করিলেন; নগরের খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক শাসনকর্ত্তা এবং প্রধান প্রধান লোকেরা, স্বয়ং খলিফা সেখানে পঁহুছিলে নগর তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবেন বলিয়া যে 'দরখাস্ত পেশ' করিয়াছিলেন, মহামান্য খলিফা তৎসম্বন্ধে·প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ কারাম এবং মন্ত্রণা-সভার সদস্যদিগকে এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলে, হজরত ওস্মান (রাজিঃ), তাঁহার যাওয়া আবশ্যক নয় বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন; কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ)

ফরমাইলেন, "আমার মতে আপনার সেখানে যাওয়া একান্ত আবশ্যক"; মহামান্য খলিফা তাঁহার এই অভিমত খুব পছন্দ করিলেন, এবং তদনুসারে বয়তুল-মোকদ্দসে গমন পূর্ব্বক স্বয়ং সেই পবিত্র নগরী খৃষ্টীয়ানদিগের হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন।

মহামান্য খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর শাহাদতের পর, নূতন খলিফা নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে একটী অপ্রত্যাশিত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছিল। মহামান্য খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র হজরত ওবায়দুল্লাহ্ (রাজিঃ) পিতৃ হত্যাকারী ক্রীতদাস ফিরোযের সাহায্য কারী বলিয়া পারস্য দেশবাসী ছরদার হরমযানকে হত্যা করিয়াছিলেন, ঐ অবস্থায় তিনি হজরত ছায়াদ বিন্-আবি ওক্কাছ (রাজিঃ) কর্ত্তৃক ধৃত এবং পরে বন্দী হন। ঐ সময় হজরত ছহিব (রাজিঃ) অস্থায়ী ভাবে খলিফার কার্য্য চালাইতেছিলেন। সুতরাং তিনি হজরত ওবায়দুল্লাহ্ (রাজিঃ)-কে তিনি বন্দী করিয়া রাখিলেন; নূতন খলিফা নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহার বিচার কার্য্য সম্পন্ন হইবে, এরূপ স্থির হইল। অতঃপর হজরত ওছমান (রাজিঃ) খলিফা নির্ব্বাচিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে এই মোকদ্দমা পেশ হইল। মহামান্য খলিফা, ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মত জিজ্ঞাসা করিলে, **হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন, ওবায়দুল্লাহ বিন্-ওমর (রাজিঃ) কে হরমযানের হত্যার পরিবর্ত্তে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত।** কিন্তু হজরত ওমরু-বিনল্-আছ (রাজিঃ)-প্রমুখ অনেকে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। মহামান্য খলিফা অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, এই ঘটনা খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে, কিংবা আমার খেলাফৎ সময়ে সঙ্ঘটিত হয় নাই; সুতরাং আমি এই বিচারের জিম্মাদার নহি। তিনি হজরত ওবায়দুল্লাহ্ (রাজিঃ)-কে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক হরমযানের হত্যার

'দয়িয়েত্' বা মৃত্যু-পণ আপনার নিকট হইতে, তদীয় উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদান করিলেন। এই ব্যবস্থায় উপস্থিত জনমণ্ডলী খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত ওবায়-দুল্লাহ্ (রাজিঃ)-এর অপরাধ সম্বন্ধে তাঁহার প্রাণদণ্ডের জন্য যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন; উত্তরকালে তাহার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। মহামান্য খলিফা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে হজরত আমীর মাবিয়াঃ (রাজিঃ)-এর ভীষণ যুদ্ধকালে, ছফিন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক মহাবীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; অবশেষে সেই যুদ্ধেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় খলিফা হজরত ফারুক আজম (রাজিঃ), মগিরাঃ-বিন্ শায়েবার আবুলুলু উপাধীধারী ক্রীতদাস কর্ত্তৃক ২৩ হিজরীর ২৭ শে যেলহজ্জ—মঙ্গলবারে, ফজরের নমাজের সময় ভীষণভাবে আহত হইয়া, ২৪ হিজরীর ১লা মোহর্‌রম শনিবার দিন দিন এন্তেকাল ফরমাইলেন; মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়য়োফ্ (রাজিঃ), হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওক্কাছ (রাজিঃ), হজরত যোবের বিনল্ য়াওয়াম (রাজিঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং হজরত ওছমান (রাজিঃ)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন; (হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ঐ সময় মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না); এই কয়েকজনকে আপনাদের মধ্য হইতে খলিফা নির্ব্বাচনের আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি উপস্থিত পাঁচ জন প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনারা হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ)-এর জন্য ৩ দিন অপেক্ষা করিবেন। যদি ৩ দিনের মধ্যে তিনি আইসেন, তবে খলিফা নির্ব্বাচনে তাঁহাকে ও সঙ্গী করিয়া লইবেন। আর ৩ দিনের মধ্যে তিনি না আসিলে আপনারা পাঁচ জনই আপনাদের

মধ্য হইতে একজন খলিফা নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন। তৎপর আবু-তাল্হা আন্ছারী (রাজিঃ) ও মেক্‌দার বিন্-আল্ আছুদ (রাজিঃ)-কে ডাকাইয়া আদেশ করিলেন, যখন ইঁহারা খলিফা নির্ব্বাচন জন্য পরামর্শ করিতে কোনও গৃহে সমবেত হইবেন, তখন তোমরা সেই গৃহের দ্বারদেশে প্রহরী স্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিবে; যে পর্য্যন্ত খলিফা নির্ব্বাচিত না হন, সে পর্য্যন্ত অপর কাহাকেও ইঁহাদের নিকটে যাইতে দিবে না। তৎপর উপরোক্ত পাঁচ জন মহাত্মাকে অন্যান্য উপদেশ প্রদান করিলেন। এই মহা পরাক্রান্ত ও আদর্শ ধার্ম্মিক খলিফা ১০৷৷০ সাড়ে দশ বৎসর কাল খেলাফৎ করিয়াছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে দুনিয়াতে কোনও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে, কোনও দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ দিগ্বিজয় কার্য্যে এরূপ সাফল্য মণ্ডিত হইতে পারেন নাই। ১ম খলিকা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর কবরের পার্শ্বে—আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সমাধি স্থলে তাঁহার দফন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। হজরত ছহিব (রাজিঃ) জানাযার নমায্ পড়াইয়াছিলেন। আর হজরত ওছলাম গণি (রাজিঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত যোবের (রাজিঃ), হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়য়োফ্ (রাজিঃ), এবং মরহুম খলিফার পুত্র হজরত আবদুল্লা (রাজিঃ) তাঁহার পবিত্র মৃতদেহ কবরে স্থাপন করিয়াছিলেন।

পরলোকগত মহামান্য খলিফা, খলিফা-নির্ব্বাচন জন্য পূর্ব্বোক্ত ছয় মহাত্মা ব্যতীত, স্বীয় স্বনামখ্যাত পুত্র আবদুল্লা (রাজিঃ) কেও খলিফা নির্ব্বাচনে স্বীয় মত প্রকাশের অনুমতি দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, খলিফা নির্ব্বাচনকারীর সংখ্যা "তাক্" অর্থাৎ 'বেজোড়' হয়। স্বীয় পরম ধার্ম্মিক ও মহা বিদ্বান্ পুত্র সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন কিছুতেই খলিফা নির্ব্বাচন করা না হয়।

হজরত মেকদাদ-বিনল্ আছুদ (রাজিঃ) ও হজরত আবু তাল্হা আন্ছারী (রাজিঃ), হজরত ফারুক আজম (রাজিঃ)-এর 'ওছিয়ত' (অন্তিম নির্দ্দেশ) অনুযায়ী তাঁহার 'তজ্হিয্' ও 'তকফিন' (কাফন পরান ও সমাধি কার্য্য) সমাধা করিয়া হজরত ছহিব (রাজিঃ)-কে ৩ দিনের জন্য অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। তৎপর পূর্ব্বোক্ত ছয় মহাত্মাকে হজরত ময়ছব-বিন্-মখ্যমাঃ (রাজিঃ)-এর গৃহে, মতান্তরে মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে সমবেত করিলেন; এবং হেফাযতের জন্য প্রহরী স্বরূপ তাঁহারা উভয়ে দ্বারদেশে বসিয়া রহিলেন। (হজরত তাল্হা (রাজিঃ) এই সময় মধ্যেও মদীনায় আসিয়া পঁহুছিয়া ছিলেন না)। অন্য কাহাকেও এই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল না। হজরত ওমরু-বিনল্ আছ (রাজিঃ) ও হজরত মগিরাঃ-বিন্ শয়বাঃ (রাজিঃ) উক্ত গৃহের দ্বারদেশে বসিয়া গিয়াছিলেন; হজরত ছায়াদ-বিন্-আবিওক্কাছ (রাজিঃ) ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাদিগকে দ্বারদেশে ও বসিতে দিলেন না। যখন সকলে আসিয়া গৃহে উপবিষ্ট হইলেন, তখন হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়োফ্ (রাজিঃ) দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, যাঁহারা খেলাফতের জন্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি কি আছেন, যিনি খেলাফতের দাবী পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত? ঐ ব্যক্তিকে এই ক্ষমতা দেওয়া যাইবে যে, আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, তাঁহাকে খলিফা নির্ব্বাচন করেন। হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়োফ্ (রাজিঃ)-এর এই উক্তির কেহই উত্তর দিলেন না; সকলেই চুপ করিয়া থাকিলেন। যখন এই প্রস্তাবের কেহ উত্তর প্রদান করিলেন না, তখন তিনি একটু অপেক্ষা করিয়া এইরূপ ঘোষণা করিলেন যে, আমি নিজেকে খেলাফত হইতে "দস্ত-বরদার" (দাবী পরিত্যাগকারী) বলিয়া প্রচার করিতেছি; এবং খলিফা নির্ব্বাচন করিবার

ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহার এই উক্তি শুনিয়া সকলেই তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন, এবং বলিলেন, আপনার যাহাকে ইচ্ছা হয়, খলিফা নির্ব্বাচন করুন। **কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 'খামুশ্' (নীরব) থাকিলেন। তিনি এ প্রস্তাবে "হাঁ" কিংবা "না" কিছুই বলিলেন না।** তখন হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়য়োফ্ (রাজিঃ) হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ)-এর দিকে 'মোখাতেব্' হইয়া (তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন, আপনিও নিজের মতামত প্রকাশ করুন। **তখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, আমিও এ বিষয়ে সকলের সঙ্গে একমতাবলম্বী। কিন্তু ইহাতে শর্ত্ত এই যে, আপনি এই প্রতিশ্রুতি দান করুন, আপনি যে 'ফয়ছলাঃ' (মীমাংসা) করিবেন, তাহাতে কোনও রূপ পক্ষপাতীত্ব ও 'নফ্ছানিয়েত্' (স্বার্থ পরতা—স্বেচ্ছাচারিতা)-এর দখল দিবেন না। কেবলমাত্র 'হক্ পরস্তি" (ন্যায়নিষ্ঠা) এবং ওম্মতের (আঁ হজরত [ছালঃ]-এর শিষ্য মণ্ডলীর) মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করিয়া এই কাজ করিবেন।** তচ্ছ্রবণে হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়য়োফ্ (রাজিঃ) বলিলেন, আমি 'বেলা-রেয়ায়েত' (অপক্ষপাতীতার সহিত), বিনা 'নফ্ছানিয়ত' (নিঃস্বার্থ ভাবে—বিবেকের সহিত) কেবলমাত্র ওম্মতের 'বেহ্তরি' (মঙ্গল) ও কল্যাণের জন্য 'হক্পরস্তি' (ন্যায়পরতা) সহকারে এ বিষয়ের মীমাংসা করিব। কিন্তু আপনারা এরূপ প্রতিশ্রুতি দান করুন, আমি যাঁহাকে 'মন্তখব' (নির্ব্বাচিত—মনোনীত) করিব, আপনারা সকলেই সেই নির্ব্বাচনে রাজী হইবেন। আর যিনি আমার মীমাংসার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, আপনারা

সকলে মিলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আমার পক্ষ সমর্থন করিবেন। ইহা শুনিয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং আর সকলে 'একরার' (প্রতিশ্রুতি দান) করিলেন যে, আমরা আপনার প্রস্তাবের 'তায়ীদ' (সাহায্য) ও সমর্থন করিব। এই কথা-বার্ত্তা স্থির হইলে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ; কারণ, খলিফা-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এখনও ৩ দিন সময় বাকী ছিল। এই অবসরে হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়োফ্ (রাজিঃ), অন্যান্য 'জলিলল্ কদর' (প্রধান প্রধান) ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের মতামত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নিজেও নিবিষ্ট মনে এই গুরুতর দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়োফ্ (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়াছিলাম ; এবং বলিয়াছিলাম, যদি আমি আপনার হস্তে বয়্য়েত্ না করি, তবে আপনি আমাকে কাহার হস্তে বয়্য়েত্ করিতে পরামর্শ দেন ? তিনি বলিলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তে আপনার বয়্য়েত করা কর্ত্তব্য। আবার হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর নিকট ও ঐভাবে নির্জ্জনে প্রশ্ন করাতে, তিনি হজরত ওছমান (রাজি) এর নাম করিলেন। পরে আমি হজরত যোবের (রাজিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কিংবা হজরত ওছমান (রাজিঃ) এই দুই জনের মধ্যে একজনের হস্তে বায়্য়েত করিতে পরামর্শ দিলেন। ঐরূপ হজরত ছায়াদ (রাজিঃ)-কে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর নাম করিলেন। মোটের উপর বেশীর ভাগ লোকের মত হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর দিকে ছিল। তৃতীয় দিবসে মছজেদ নববীতে সকলে সমবেত হইলে, হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়োফ্ স্বীয় নিরপেক্ষতা ও অপক্ষপাতিতা সম্বন্ধে স্বীয় বক্তব্য

প্রকাশ করিলেন; বিপুল জন-সঙ্ঘে মছজেদ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হজরত আবদুর রহমান-বিন্ য়য়োফ্ (রাজিঃ) স্বীয় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শেষ করিয়া, হজরত ওছমান (রাজিঃ)-কে নিজের কাছে আহ্বান করিলেন, এবং বলিলেন, আপনি খোদা ও রছুলের 'আহ্‌কাম' (আদেশ) পালন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফা দ্বয়ের ছোন্নত অনুযায়ী চলিবেন বলিয়া একরার করুন; তিনি সেইরূপ একরার করিলে, হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়য়োফ্ (রাজিঃ), সর্ব্বপ্রথমে হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হস্তে বায়্‌য়েত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁহার হস্তে বায়্‌য়েত করিতে লাগিলেন।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই দৃশ্য দর্শনে প্রথমে একটু মনঃক্ষুণ্ন হইয়া মছজেদ হইতে বাহিরে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে জনতা ঠেলিয়া হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর সমীপবর্ত্তী হইলেন, এবং নিতান্ত আগ্রহের সহিত তাঁহার হস্তে বয়্‌য়েত করিলেন।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জীবনের শেষ পর্ব্ব।

খেলাফৎ ও শাহাদৎ।

এইস্থলে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। মহামান্য প্রথম খলিফা ও ২য় খলিফার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ও ব্যক্তিগত প্রভাবে, নিঃস্বার্থপরতা এবং ইস্‌লাম ধর্ম্ম রক্ষাকার্য্যের আন্তরিকতায়, মোছলমানদিগের মধ্যে কোনও রূপ ভেদ-বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইতে পারে নাই।

সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতাপন্ন রাজনীতি বিশারদ হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর ব্যক্তিগত প্রভাব এতই বেশী ছিল যে, মোছলমানদিগের একতাও সঙ্ঘবদ্ধতায়, অমানুষিক শৌর্য্য বীর্য্যে, বিভিন্ন দেশ বিজয়ে ও ইস্‌লাম-প্রচারের যে প্রবল স্রোত বলিয়াছিল, ৩য় খলিফার খেলাফতের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত সেই স্রোতই প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু তৃতীয় খলিফা অতি নিরীহ ও নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন ; পক্ষান্তরে স্বীয় বংশ অর্থাৎ বনি-ওম্মিয়ার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন থাকায়, তাঁহাদিগকে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা এবং অন্যান্য উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহাদের উন্নতি ও সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা খুব বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা শাসনকর্ত্তৃত্ব, বিপুল সম্পত্তি ও অর্থ লাভ, সামরিক শক্তি সঞ্চয় প্রভৃতি ব্যাপারে ও খুব সুবিধা করিয়া লইয়া ছিলেন। বিশেষতঃ হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), দীর্ঘকাল যাবৎ সিরিয়ার (শামের) সর্ব্ব ক্ষমতা সম্পন্ন শাসনকর্ত্তা থাকাতে, আর প্রতিবেশী রোমক সম্রাটের সহিত অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকায়, তাঁহার সৈন্যদল খুব সুশিক্ষিত সুনিয়ন্ত্রিত ও পরাক্রমশালী ছিল ইহাদের মধ্যে ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-এর সংখ্যা খুব কম, পক্ষান্তরে কতক তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি ও অধিকাংশ আরব ও সিরিয়াবাসী নব-দীক্ষিত মোছলমান ছিলেন। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), খলিফা মহাত্মা ওছমান (রাজিঃ)-এর জ্ঞাতি ভ্রাতা (একই পিতামহে পৌত্র), এবং মক্কার কোরেশদিগের ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বপ্রধান নেতা হজরত আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর পুত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি খলিফার অসাধারণ স্নেহ ও সহানুভূতি ছিল। সুতরাং রোমক সম্রাটের নিকট হইতে গৃহীত নব-বিজিত প্রদেশ ও জনপদ গুলি সমস্ত তাঁহারই শাসনাধীন করিয়া দিয়াছিলেন। আর দামেস্কের ন্যায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একটী মনোরম প্রধান শহরে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, তাঁহার

দিগের প্রতি অতিরিক্ত করুণা বিতরণ, তাঁহার নিরীহ স্বভাব, বার্দ্ধক্য ও চিত্ত দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির সুযোগে এই কপটাচারী লোকটি আপনার একটী দল গঠন করিয়া লইল; বহুসংখ্যক লোককে মহামান্য খলিফার বিরুদ্ধাচারী করিয়া তুলিল। প্রকৃত বিশ্বাসী মোছলমানগণ তাহার কপটতা ও মনের কুটিল ভাব জানিতে পারিয়াছিলেন না; তাঁহারা সাধারণ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মহামান্য খলিফার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদ-বিন্-আবু-বকর (রাজিঃ) মেছেরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্তির ব্যাপারে মারওয়ান যে ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহাতে মেছের, কুফা, বস্রা ও মদীনা বাসী বহু লোক মহামান্য খলিফার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। ঐ সঙ্গে আবদুল্লা এব্‌নে ছাবার ষড়যন্ত্র মিলিত হইয়া মহামান্য খলিফার হত্যাকাণ্ড ঘটাইল। মহামান্য খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর কার্য্য-কলাপে ভুল-ত্রুটী থাকিলেও, তাঁহার ভক্ত সংখ্যা অল্প ছিলেন না। তিনি অতি নৃশংস ভাবে শহীদ হওয়াতে, প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের মধ্যে অধিকাংশ তাঁহার প্রতি অধিকতর সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়াছিলেন; তজ্জন্য হত্যাকারী বিপ্লববাদিদিগের প্রতি তাঁহাদের ক্রোধের সীমা পরিসীমা ছিল না। এব্‌নে ছাবা ও তাহার দলের লোকেরা সরল-চেতা মোছলমানদিগকে ভ্রান্ত-পথের পথিক করিয়াছিল। কুফা নিবাসী মহাবীর মালেক-বিন্ আস্তর পর্য্যন্ত তাহার ধাপ্‌পায় পড়িয়া গিয়াছিলেন; তিনি মহামান্য খলিফার হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত না থাকিলেও, এব্‌নে-ছাবা ও তাহার চেলাদিগের ধোকায় পড়িয়া হত্যাকারী দলের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তি অচলা ছিল। মহামান্য খলিফার হত্যাকাণ্ডের পর মদীনা-তৈয়্যবায় বিপ্লববাদী দিগের পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের দল খুব পুরু থাকাতে, মহামান্য ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ স্ব স্ব গৃহে চুপ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। একটা ভীষণ

বিপ্লবের মহাপ্লাবনে পবিত্র মদীনা নগরী যেন ভাসিয়া চলিয়াছিল। বিপ্লববাদিদিগের কুর্দ্দন ও আস্ফালন নগরের সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইত।

এই সময় "জলিলল্-কদর" (শ্রেষ্ঠতম) ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মধ্যে প্রধানতঃ এই কয়জন এবং আরও অনেকে জীবিত ছিলেন। ১। হজরত আলী (কঃ—ওঃ), ২। হজরত যোবের (রাজিঃ), ৩। হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ), ৪। হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি-ওক্কাছ (রাজিঃ), ৫। হজরত আবদুল্লা বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ), ৬। হজরত আবদুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ), ৭। হজরত আবদুর রহমান-বিন্-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), ৮। হজরত এমার্-বিন্-এয়াছর (রাজিঃ), ৯। হজরত ওমরু বিনল্ আছ (রাজিঃ), ১০। হজরত আবু মুছা আশয়ারি (রাজিঃ), ১১। হজরত কায়কায়-বিন্-ওমরু (রাজিঃ), ১২। হজরত মোহাম্মদ মোছলেমাঃ (রাজিঃ), ১৩। হজরত ওছামাঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ), ১৪। হজরত হেছান-বিন্-ছাবের (রাজিঃ), ১৫। হজরত কায়াব-বিন্-মালেক (রাজিঃ), ১৬। হজরত আবু ছয়ীদ খোদরী (রাজিঃ), ১৭। হজরত নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ), ১৮। হজরত যয়েদ-বিন্-ছাবেত (রাজিঃ), ১৯। হজরত মাবিয়া-বিন্-শায়াবাঃ (রাজিঃ), ২০। হজরত আবদুল্লা-বিন্-ছালাম (রাজিঃ), ২১। হজরত আবু হোরেরাঃ (রাজিঃ), ২২। হজরত আবু আইউব আন্‌ছারী (রাজিঃ), ২৩। হজরত মাবিয়া-বিন্-আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ), প্রভৃতি।

তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ)-এর শহীদ হওয়ার ১ সপ্তাহ পরে, ৩৫ হিজরীর ২৫শে জেলহজ্জ তারিখে, হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর হস্তে মদীনার কতিপয় প্রধান ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ), জন সাধারণ এবং বিপ্লববাদিগণ, সাধারণ ভাবে বয়্য়েত—অর্থাৎ তাঁহাকে ইস্‌লাম জগতের খলিফা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

দুঃখের বিষয়, এই বয়্‌য়ত গ্রহণ-ব্যাপার সর্ব্ববাদী সম্মত হইল না। একটা ভীষণ বিপ্লবের আশঙ্কায় অনেকে সহসা বয়্‌য়ত করিতে বিরত থাকিলেন। অবশ্য বিপ্লববাদিগণের একদল মোছলমান ভক্তির সহিত হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তে বয়্‌য়ত করিলেন; কিন্তু কপটাচারী আবদুল্লা এব্‌নে ছাবার দল মোছলমানদিগের ধ্বংস সাধন জন্য প্রকাশ্য ভাবে বয়্‌য়ত করিল; অথচ তাহাদের উদ্দেশ্য অতি ঘৃণিত ও মারাত্মক ছিল। মদীনার বহু মোছলমান ও বিপ্লববাদিগণ যখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে খেলাফৎ গ্রহণ জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন, তোমরা ত আমাকে খলিফা মনোনীত করিতেছ, কিন্তু যে পর্য্যন্ত 'আহ্‌লে বদর' (যাঁহারা বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন) আমাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার না করেন, সে পর্য্যন্ত তোমাদের নির্ব্বাচনে কি ফল হইবে? এই কথা শুনিয়া তাঁহারা 'আছহাবে-বদর' গণের নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে অনেককেই অনুনয় বিনয় করিয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকট লইয়া আসিলেন। সর্ব্বপ্রথমে মহাবীর মালেক বিন্‌-আশ্‌তর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তে বয়্‌য়ত করিলেন; ইহার পর অন্যান্য লোকেরাও বয়্‌য়ত জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন। ঐ সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন, (হজরত) তাল্‌হা (রাজিঃ) এবং (হজরত) যোবের (রাজিঃ)-এর ইচ্ছা এবং সঙ্কল্প ও জানা আবশ্যক। তখন মালেক বিন্‌-আশ্‌তর হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ)-এর নিকট, এবং হকিম বিন্‌-জাবলাহ হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর নিকট গমন করিলেন; এবং উভয়কে এক প্রকার বল পূর্ব্বক হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকটে লইয়া আসিলেন। তখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনাদের মধ্যে যিনি খেলাফৎ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা

করেন, আমি তাঁহার হস্তে বয়্য়ত করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা উভয়েই খেলাফতের পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। তাঁহাদের অভিমত শ্রবণে উপস্থিত জনসজ্ঘ বলিয়া উঠিলেন, যদি আপনারা উভয়ে খলিফার পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, তবে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তে বয়্য়ত করুন। তচ্ছ্রবণে তাঁহারা কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কিছুকাল ভাবা-গোনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে নীরব দেখিয়া মালেক আশ্তের হজরত তালহা (রাজিঃ)-কে বলিলেন, বয়্য়ত না করিলে এখনই আপনার দফা-রফা করিয়া দেওয়া যাইবে। বেগতিক দেখিয়া হজরত তালহা (রাজিঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে বলিলেন, আমি এই শর্ত্তে আপনার হস্তে বয়্য়ত করিতেছি যে, আপনি আল্লাহর কেতাব এবং হজরত রছুলুল্লাহ্ (ছালঃ)-এর ছোন্নত অনুযায়ী আদেশজারী এবং শরি-য়তের হুকুম 'মতাবেক' কার্য্য করিবেন—অর্থাৎ খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকারী দিগের প্রতি সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলে, হজরত তালহা (রাজিঃ) হাত বাড়াইয়া দিলেন। তথায় উপস্থিত কেহ কেহ ঐ কাটা হস্তখানি বাড়াইয়া বয়্য়ত গ্রহণ-ব্যাপারকে 'মন্‌ছুছ' (অশুভ জনক) বলিয়া মনে করিলেন। হজরত যোবের (রাজিঃ) ও ঐ শর্ত্তেই বয়্য়ত করিলেন। তৎপর হজরত ছায়াদ-বিন্‌-আবি ওক্কাছ (রাজিঃ)-কে বয়্য়ত করিতে বলা হইলে, তিনি স্বীয় গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন, যখন সকল লোকের বয়্য়ত শেষ হইয়া যাইবে, তখন আমি বয়্য়ত করিব। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। এই মহাত্মা সম্পর্কে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর মাতুল ছিলেন। হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-ওমর (রাজিঃ), হজরত ছায়াদ (রাজিঃ)-এর ন্যায় বয়্য়ত করিতে বিলম্ব করাতে,

মালেক আশ্‌তর তরবারি কোষমুক্ত করিয়া বলিলেন, ইহাকে এখনই 'কতল্‌' (হত্যা) করিয়া ফেলিতেছি। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, আমি স্বয়ং ইহার 'যামেন' (প্রতিভূ) হইতেছি ; তদনুসারে তিনি স্বস্থানে প্রস্থান পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে ওমরা-ব্রত উদ্‌যাপনার্থ মক্কা-মোয়াজ্জমায় চলিয়া গেলেন। লোকে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে বলিতে লাগিলেন, হজরত আবদুল্লা (রাজিঃ) আপনার বিরুদ্ধে কোনও রূপ দুরভিসন্ধিতে মক্কায় চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য লোক পাঠাইতে উদ্যত হইলে, তাঁহার কন্যা মহামান্য ২য় খলিফার আহ্‌লিয়া (পত্নী), হজরত আবদুল্লা (রাজিঃ)-এর বিমাতা হজরত ওম্মে কুলছুম (রাঃ—আঃ) পিতাকে বলিলেন, আবদুল্লা (রাঃ—আঃ) আপনার কোনও রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। তিনি কেবলমাত্র ওমরা কার্য্য সম্পাদন জন্যই মক্কায় গমন করিয়াছেন ; এই কথা শুনিয়া তিনি নিরস্ত ও নিশ্চিন্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বোল্লিখিত ১২ নং হইতে ২২ নং পর্য্যন্ত বিখ্যাত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণও বয়্‌য়ত করিলেন না। আবার ওম্মিয়া বংশীয় মারওয়ান-প্রমুখ ব্যক্তিগণ বয়্‌য়ত করিবেন দূরে থাকুক, তাঁহাদের কেহ কেহ মক্কায়, এবং কেহ কেহ শামে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট চলিয়া গেলেন। যাহারা মদীনা-তৈয়্যবায় উপস্থিত থাকিয়া বয়্‌য়ত করিয়াছিলেন না, তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-বয়্‌য়ত না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, এখনও এখানে মোছলমানদিগের মধ্যে শোণিত পাতের আশঙ্কা আছে, বিপ্লবের এখনও অবসান হয় নাই, এজন্য আমরা বয়্‌য়ত করিতেছি না। ইহার পর হজরত আলী (কঃ—ওঃ), মারওয়ান-বিন্‌-হকমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত তাল্‌হাঃ

(হজরত ওস্‌মান গণি রাজি আল্লাহ্ আন্‌হুর পত্নী)-এর নিকট হত্যাকারী-দিগের নাম জানিতে চাহিলেন ; তিনি তন্মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তির 'হুলিয়া' (আকার প্রকার) বলিলেন, কিন্তু আর কাহারও নাম বা আকার প্রকার বলিতে পারিলেন না। মোহাম্মদ-বিন্-আবিবকর (রাজিঃ) সম্বন্ধেও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি এই হত্যাকারীদিগের মধ্যে ছিলেন কিনা ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, খলিফাকে শহীদ করিবার পূর্ব্বে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ওম্মিয়া বংশের কোনও কোনও লোক মহামান্য খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর 'আহ্‌লিয়া' হজরত লায়লা* (রাঃ—আঃ)-এর কর্ত্তিক (ছিন্ন) অঙ্গুলী ও রক্ত রঞ্জিত কুরতা লইয়া দামেস্কে হজরত মাবিয়া-বিন্ আবু ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর নিকট গমন করিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেলাফৎ সম্বন্ধে ইহাও একটী গুরুতর প্রতিকূল ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) খেলাফতের দ্বিতীয় দিবস, হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ), খলিফার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, আমরা আপনার হস্তে এই শর্ত্তের উপর বয়্‌য়ত করিয়াছি যে, আপনি হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকারীদিগের প্রতি উপযুক্ত রূপ দণ্ডবিধান করিবেন। যদি আপনি হত্যাকারীদিগের দণ্ড-বিধানে বিলম্ব করেন, তবে আমাদের বয়্‌য়ত 'বাতেল' হইয়া যাইবে। তদুত্তরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন, আমি হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকারীদিগের উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিব ; কিন্তু এ সময় পর্য্যন্ত বিপ্লববাদীদিগের নগরে বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে ; আমার খেলাফৎ এযাবৎ মজবুৎ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; আমি সকল দিক্ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে এ বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হইব। এত

শীঘ্র এ সম্বন্ধে কিছুই করা যাইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন।

এদিকে খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকারী ও বিপ্লববাদিদিগের মনে এই আতঙ্ক উপস্থিত হইল যে, যদি 'কেছাছ' (হত্যার বদলা) লওয়া হয়, তবে আমরা বিষম বিপন্ন হইব। তাহারা আত্মরক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা ও পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে নিরপেক্ষ বা মহামান্য শহীদ খলিফার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন মোছলমানগণ এই হত্যাকাণ্ডকে ঘোরতর অন্যায় কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, আর ইহাও মনে ভাবিতেন, এই দুর্দ্দান্ত বিপ্লববাদী ও হত্যাকারী দল যদি তাহাদের অপরাধের উপযুক্ত রূপ শাস্তি ভোগ না করে, তবে তাহাদের বিকট তাণ্ডব নিতান্তই অসহনীয় হইবে, তাহাদের অত্যাচার চরমে উঠিবে ; লোকের এই ধারণা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেলাফতের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। আবার এ সময় ইহার প্রতিকার করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। একদল লোক হল্লা করিয়া মহামান্য খলিফাকে হত্যা করিয়াছিল, সুতরাং প্রকৃত হত্যাকারী স্থির করা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। হজরত নায়লা (রাঃ—আঃ) ব্যতীত অন্য সাক্ষীও কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। বিপ্লববাদী দল খুব প্রবল ছিল, প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ তাহাদের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়াছিলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে তাঁহাদের সাহসে কুলাইত না। আবার সকলে এক মতাবলম্বী হইয়া ও হজরত আলী (রাজিঃ) কে খলিফা নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন না ; বিশেষতঃ বনি-ওম্মিয়া ও তাঁহাদের পক্ষপাতী লোকেরা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। ওদিকে আবদুল্লা এবনে সাবার দল ভিতরে ভিতরে মোছলমানদিগের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিতেছিল। সুতরাং ব্যাপারটা কিরূপ 'পেচিদা' (জটিল)

হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার বিপ্লবাদীদিগের মধ্যে একদল খাঁটি মোছলমান, হজরত আলী (ক:—ও:)-এর পক্ষপাতী এবং পরম ভক্ত ছিলেন। ৩য় খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শাহাদৎ লাভের কিছুকাল পূর্ব্বেই খেলাফতের শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াছিল— অশান্তির আগুণ ভিতরে ভিতরে প্রধূমিত হইতেছিল; রাজধানী মদীনা-তৈয়বায় অশান্তি ও বিপ্লবের বিষাক্ত বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। আবদুল্লা এব্‌নে সাবার মোছলেম-বিদ্বেষী দলটী বিপ্লব-বহ্নিতে বাতাস দিতে—ইন্ধন যোগাইতে ছিল। ১ম এবং দ্বিতীয় খলিফার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি এ সময় কেহ ছিলেন না; হজরত আলী (ক:—ও:) এ সময় খলিফার সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য পাত্র হইলেও, উল্লিখিত নানাকারণে অনেক লোকই তাঁহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না। আবার বনি-হাশেমের মধ্যে উপযুক্ত লোকের একান্তই অভাব ছিল। হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) ব্যতীত ঐ বংশে উল্লেখযোগ্য লোক খুব কমই ছিলেন। এমন কি, হজরত আলী (ক:—ও:)-এর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা হজরত অকিল (রাজিঃ) ও তেমন প্রভাব সম্পন্ন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন না; উত্তরকালে তিনিও ভ্রাতার পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত যোবের (রাজিঃ) ফুফ্‌ফাতো (পিশ্‌তুতো) ভাই হইয়াও মহামান্য খলিফার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া গেলেন। সুতরাং মহামান্য খলিফা হজরত আলী (ক:—ও:) প্রকৃত সাহায্যকারী ও সুপরামর্শ দাতা—তাঁহার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি সম্পন্ন লোক খুব কমই পাইয়াছিলেন।

খেলাফতের ৩য় দিনে হজরত আলী (ক:—ও:) কুফা, বস্রা ও মেছের দেশ হইতে আগত লোকদিগকে স্ব স্ব দেশে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। এই আদেশ শ্রবণে কপটাচারী ও বিপ্লবকারী দলের প্রধান

নেতা আবদুল্লা-বিন্-সাবা ও উহার দলস্থ লোকেরা মদীনা-তৈয়বাঃ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইল। অন্যান্য বিপ্লব-বাদীরা ও তাহাদের পদানুসরণ করিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর খেলাফতের পক্ষে ইহা একটী অশুভজনক লক্ষণ ছিল যে, যে সকল লোক তাঁহার একান্ত বাধ্য, ভক্ত ও অনুবর্ত্তী বলিয়া দাবী করিত, তাহারাই তাঁহার আদেশ পালনে সর্ব্ব প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। অতঃপর হজরত যোবের (রাজিঃ) ও হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন যে, আপনি আমাদিগকে কুফা এবং বস্রায় পাঠাইয়া দিন, আমাদের ঐ দুই স্থানের ভক্ত ও অনুরক্ত বিভিন্ন খেয়ালের লোকদিগকে আমরা এক মতাবলম্বী করিব। তাঁহাদের কথা ও কার্য্য কলাপে সন্দেহ হওয়াতে, মহামান্য খলিফা তাঁহাদিগকে মদীনা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে নিষেধ করিলেন।

খেলাফতের ৪র্থ দিবসে হজরত আলী (কঃ—ওঃ), পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর আমলের সমুদয় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে 'বরখাস্ত' (পদচ্যুত) করিয়া, ঐ সকল স্থানে নূতন নূতন শাসনকর্ত্তা নিয়োগের পরওয়ানা বাহির করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে নব-নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা দিগকে স্ব স্ব শাসনাধীন প্রদেশ সমূহে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। হজরত মগিরা-বিন্ শয়বাঃ (রাজিঃ) হজরত আলী (রাজিঃ)-এর একজন ঘনিষ্ট আত্মীয়, পরম হিতৈষী এবং রাজনীতি জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি এবং পিতৃব্য পুত্র হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ), এত শীঘ্র পুরাতন শাসনকর্ত্তাদিগকে পদচ্যুত এবং নূতন শাসনকর্ত্তা নিয়োগ কার্য্যের অপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া, মহামান্য খলিফাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন ; কিন্তু তিনি তাঁহাদের সে পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) তাঁহাকে আরও অনেক প্রকার সুযুক্তি

দান করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না ; বরং তিনি বলিলেন, তুমি আমার মতের সমর্থন কর। তিনি ইহাও বলিলেন, আমি (হজরত) মাবিয়া (রাজিঃ)-এর স্থলে তোমাকে শামের শাসনকর্ত্তা করিতে চাই। তিনি বলিলেন, আমি সর্ব্বপ্রকারেই আপনার আদেশ পালনে বাধ্য, কিন্তু শামে (হজরত) মাবিয়া (রাজিঃ)-এর যেরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি, সেখানে আমি গেলে তিনি আমাকে হত্যা কিংবা বন্দী করিবেন। আপনি তাঁহার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিয়া দেখুন। আর যে কোনও রূপেই হউক, তাঁহার নিকট হইতে বায়্য়েত গ্রহণ করুন। হজরত আলী (রাজিঃ) যে সকল নূতন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, তন্মধ্যে এমনের পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা লায়লি-বিন্-মম্নিনা এমন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মক্কায় চলিয়া আইসাতে, হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) নির্ব্বিবাদে তথাকার শাসন-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। কুফার নব নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা এমারাঃ-বিন্-শাহাব (রাজিঃ), পথিমধ্যে তলিহাঃ-বিন্-খোয়েল্দ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। কয়েছ-বিন্-ছায়াদ মেছের পঁহুছিলে কতক লোক তাঁহাকে শাসনকর্ত্তা বলিয়া মানিয়া লইল ; কতক লোক নীরব থাকিল ; আর কতক লোক বলিল, আমাদের ভাই-বন্ধুগণ মদীনা হইতে ফিরিয়া আসিলে আমরা কর্ত্তব্য স্থির করিব। শামের নব-নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা ছহিল-বিন্-হানিফ্ "তবুক" নামক স্থানে একদল শামী অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। জরির-বিন্-আবদুল্লা আল্ জব্‌লী, হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে 'হমদান' (পারস্যের একটী বৃহৎ ছুবা)-এর শাসনকর্ত্তা ছিলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহাকে লিখিলেন, তুমি স্বীয় শাসনাধীন ছুবার লোকদিগের নিকট হইতে আমার নামে বয়্য়েত গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে মদীনায় চলিয়া আইস। তিনি সেই আদেশানুযায়ী বায়্য়েত গ্রহণ পূর্ব্বক

মদীনায় চলিয়া আসিলেন। কুফার শাসনকর্ত্তা হজরত আবু-মুছা আশয়ারি (রাজিঃ)-এর নিকট মায়বদ আছলমীর হস্তে মহামান্য খলিফা একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তদুত্তরে হজরত আবু-মুছা আশয়ারি (রাজিঃ) লিখিলেন, কুফার অধিবাসিগণ আমার হস্তে আপনার নামে বায়্য়েত করিয়াছে—কিন্তু কতক লোক কিছু অনিচ্ছার সঙ্গে। এই পত্র পাইয়া মহামান্য খলিফা কুফা সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। একই সময়ে অন্য একখানি পত্র জরির-বিন্-আবদুল্লা ও ছবরঃ জহনীর হস্তে দামেস্কে হজরত মাবিয়াঃ (রাজিঃ)-এর নামে পাঠান হইয়াছিল; ৩ মাসের মধ্যে তিনি সেই পত্রের কোন উত্তরই দিলেন না। অবশেষে স্বীয় কাছেদ (দূত) কবিছা ইছির হস্তে একখানি পত্র দিয়া, জরির-বিন্-আবদুল্লার সঙ্গে মদীনায় পাঠাইলেন। ঐ পত্রের উপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নাম ও প্রেরক হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর নাম মাত্র ছিল, ভিতরে কোন চিঠি-পত্র ছিল না। তদ্দর্শনে মহামান্য খলিফা দূতের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হওয়ায়, দূত বলিলেন, আমি দূত—সুতরাং অবধ্য। স্থূলকথা, শামে (সিরিয়ায়) কেহ আপনার বায়্য়েত করিবে না। আমি দেখিয়াছি, ৬০ হাজার শেখ, শহীদ খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর রক্ত-রঞ্জিত পিরাহান দেখিয়া উচ্চ ক্রন্দনে চতুর্দ্দিকে নিনাদিত করিতেছে। অতঃপর দূত দেমেস্কে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট ফিরিয়া চলিয়া গেল। বিপ্লববাদী ও এব্নে সাবার দল তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলে, মদীনার কতিপয় অধিবাসী তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে দিলেন না। বিপ্লববাদী দলের নেতাগণ মহামান্য খলিফার প্রেরিত দূত জরির-বিন্ আবদুল্লা সম্বন্ধে বলিতে লাগিল, এই লোকটীও (হজরত) মাবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, নচেৎ এই সুদীর্ঘকাল তাঁহার দামেস্কে বসিয়া থাকার কি প্রয়োজন ছিল? জরির এই অপবাদে মর্ম্ম-

পীড়িত হইয়া মদীনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক " করকিছাঃ" নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। কূট রাজনীতিজ্ঞ হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) তাঁহাকে সেখান হইতে সংবাদ দিয়া আপনার নিকট লইয়া গেলেন।

দামেস্কে দূত যাতায়াত প্রভৃতি ঘটনায় মদীনাবাসিগণ বুঝিতে পারিলেন, শীঘ্রই হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর যুদ্ধ বাঁধিবে। যুদ্ধের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ), মহামান্য খলিফার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমাদিগকে ওমরা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার জন্য মক্কা মোয়াজ্জমায় যাইতে অনুমতি দিন। তিনি তাঁহাদিগকে আর বাধা দেওয়া উচিত নয় মনে করিয়া তাঁহাদিগকে মক্কায় যাইতে অনুমতি দিলেন। অতঃপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মদীনাবাসীদিগের মধ্যে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে, শাম প্রদেশ আক্রমণ জন্য সৈন্য সংগ্রহ কর। সঙ্গে সঙ্গেই একখানি পত্র ওছমান বিন্‌-হানিফের নামে বস্রায়, একখানি পত্র হজরত আবুমুছা আশয়ারি (রাজিঃ)-এর নামে কুফায়, আর একখানি পত্র কয়েস্‌-বিন্‌-ছাদ (রাজিঃ)-এর নামে মেছেরে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, যতদূর সম্ভব, শক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য সংগ্রহ কর, আমি যখনই আদেশ করিব, ঐ সৈন্যদল আমার নিকট পাঠাইবে। যখন মদীনার অধিকাংশ অধিবাসী মহামান্য খলিফার আদেশে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন তিনি হজরত কছম বিন্‌-আব্বাছ (রাজিঃ)-কে মদীনায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন, এবং স্বীয় যুবক বীর পুত্র মোহাম্মদ বিন্‌-হানিফার হস্তে এই বিরাট সেনাদলের রণ-পতাকা প্রদান করিলেন। আর ডানদিকের সেনাপতি পদে হজরত আবদুল্লা বিন্‌-আব্বাছ (রাজিঃ), বামদিকের সেনাপতি পদে ওমর-বিন্‌-আবু ছলমাঃ, এবং মকদ্দমাতুল জয়েশের (অগ্রগামী-সেনাদলের) সেনাপতিপদে হজরত আবু লেয়লী-এব্‌নে-জার্‌রাহ্‌

(হজরত আবু-ওবায়দাঃ বিন্-জাররাহ্ [রাজিঃ]-এর ভ্রাতা) নিযুক্ত হইলেন।

বিপ্লববাদীদিগের একটা প্রকাণ্ড দল তখনও মদীনায় উপস্থিত ছিল; মহামান্য খলিফা তাহাদিগের নেতাগণের মধ্য হইতে কাহাকেও সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন না। তিনি সিরিয়াভিমুখে যাত্রা করিবেন, ইতিমধ্যে মক্কা-মোয়াজ্জমা হইতে সংবাদ আসিল যে, সেখানে আপনার বিরুদ্ধে রণ-সজ্জা হইতেছে! তচ্ছ্রবণে তিনি সিরিয়ার যুদ্ধযাত্রা আপাততঃ স্থগিত রাখিলেন।

যখন বিপ্লববাদিগণ ৩য় খলিফা হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ)-এর গৃহ অবরোধ করেন, তখন ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ), হজ্জ্-ক্রিয়া সম্পাদনার্থ অন্যান্য ওম্মোল-মুমেনিন (মোছলেম মাতা) গণ সহ মক্কা-মোয়াজ্জমায় গমন করিয়াছিলেন; হজ্জ্ সমাপনান্তে তিনি মদীনাভিমুখে যাত্রা করিয়া " ছরফ্ " নামক স্থানে মহামান্য খলিফার শহীদ হওয়ার সংবাদ পাইলেন। এই দুঃসংবাদ শুনিয়া তিনি সেখান হইতে মক্কায় ফিরিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ ও পাইলেন যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) খলিফার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তিনি মক্কার মোছলমানদিগের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, আল্লার শপথ, আমি নিরপরাধ (হজরত) ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।

মক্কা-মোয়াজ্জমায় হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে আবদুল্লা-বিন্-আমের হজরমী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন; তিনি ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ)-কে বলিলেন, খলিফার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রথম ব্যক্তি আমি। বনি-ওম্মিয়ার যে সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, একার্য্যে আমরা সকলেই আপনার

সঙ্গী। এই দলে সয়ীদ-বিন্-আল আছি ও অলিদ-বিন্-ওক্‌বাঃও ছিলেন। বস্রার পদচ্যুত শাসনকর্ত্তা আবদুল্লা-বিন্-আমের, ও এমনের পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা লায়লী বিন্-লিনিছাঃ ৬ শত উষ্ট্র ও রাজকোষের ৬ লক্ষ দিনার লইয়া আসিয়াছিলেন; এক্ষণে পরামর্শ স্থির হইল যে, হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইতে হইবে। এই সময় হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ) ও মক্কায় আসিয়া পঁহুছিলেন; ওম্মোল মুমেনিনের অনুরোধে তাঁহারাও তাঁহার সঙ্গী হইতে স্বীকৃত হইলেন। এই দুই মহাত্মা ও এমনের পদচ্যুত শাসনকর্ত্তা এবং বস্রার পদচ্যুত শাসনকর্ত্তা, এই চারিজন বিশেষ ক্ষমতাশালী, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ এবং খ্যাতনামা বীরপুরুষ ছিলেন। মক্কার প্রায় সমুদয় অধিবাসীই মোছলেম-মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন। এক্ষণে এই অভিযান প্রথমে কোথায় যাইবে, তাহা লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হইল, অবশেষে প্রথমে সকলে বস্রায় যাওয়া সম্বন্ধেই একমতাবলম্বী হইলেন।

পরামর্শ স্থির হইলে সকলেই বস্রা গমনের জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন। হজরত আবদুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ) ঐ সময় মক্কায় উপস্থিত ছিলেন; সকলে তাঁহাকে দলভুক্ত করিয়া আপনাদের নেতৃত্ব গ্রহণ জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে ওম্মোল-মুমেনিনের নিকটে ডাকিয়া আনাইয়া ঐ প্রস্তাব করা হইল; উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি মদীনাবাসীদিগের সঙ্গে আছি; তাঁহারা যে পন্থাবলম্বন করিবেন, আমি তাঁহাদেরই মতানুসরণ করিব; তাঁহার উক্তি শ্রবণে নেতৃগণ আর কোনও উচ্চ-বাচ্য করিলেন না। মহামাননীয়া ওম্মোল মুমেনিনদিগের সকলেই মক্কায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ও হজরত আয়েশা-ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে বস্রায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মহামাননীয়া ওম্মোল মুমেনিন হজরত ছাফ্‌সা (রাঃ—আঃ) ও ঐ সঙ্গে যাইতে ইচ্ছ ক

ছিলেন; কিন্তু তিনি ভ্রাতার (এব্‌নে ওমর [রাজিঃ]-এর) নিষেধে গমনে বিরত থাকিলেন। মগিরা-বিন্‌-শায়বাঃ মক্কায় আসিয়াছিলেন, তিনিও এই অভিযানকারীদিগের সঙ্গী হইলেন।

আবদুল্লা-বিন্‌-আমের ও লায়লী-বিন্‌-মনছিয়া, এমন ও বছ্রা হইতে বহু টাকা আনিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র এবং অভিযানোপযোগী অন্যান্য সামগ্রী-সম্ভার ক্রয় করা আরম্ভ হইল। পূর্ব্বোক্ত পদচ্যুত শাসনকর্ত্তা দ্বয় এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া, মক্কাবাসীদিগকে খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ অভিযানে যোগদান জন্য আহ্বান করিলেন। তদনুসারে মক্কার বহুসংখ্যক যোদ্ধা এই দলে আসিয়া যোগ দিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা ১৫০০ শত হইল। এই অভিযান যাত্রা করিবার সময়, মুল বিপ্লবের প্রধান নায়ক, কুটবুদ্ধিসম্পন্ন মারওয়ান বিন্‌-আল্‌ হাকম এবং ছয়ীদ বিন্‌-আল-আছ ও মক্কায় আসিয়া পঁহুছিলেন, এবং মহা উৎসাহের সহিত এই অভিযানে যোগদান করিলেন। ঘটনাক্রমে হজরত আবদুল্লা-বিন্‌-আব্বাছ (রাজিঃ)-এর জননী হজরত ওম্মে ফজল-বিন্তে আল হরছ (রাঃ—আঃ) এই সেনাদলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন; তিনি "জহনিয়া" সম্প্রদায়ের জফর নামক এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিয়া, তাড়াতাড়ি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকট মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন; একখানি পত্রে এই অভিযান সম্বন্ধীয় সমস্ত সংবাদ বিস্তৃতভাবে লিখিয়া পাঠাইলেন। দেখিতে দেখিতে যোদ্ধ-পুরুষের সংখ্যা ৩০০০ হইল; অভিযানের যাত্রা আরম্ভ হইল। "যাত আরক্‌" নামক স্থান হইতে অন্যান্য ওম্মোল মুমেনিনগণ বিচ্ছেদের জন্য দুঃখ প্রকাশ ও ক্রন্দনের সহিত বিদায় হইয়া মদীনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ধূর্ত্ত মারওয়ান পথিমধ্যেও নেতৃদিগের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; শেষে ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর

ধম্‌কানীতে নিরস্ত হন। এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলাতে, আঁ হজরত (ছালঃ) উহাকে মদীনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। মহামান্য খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ) এই ধূর্ত্ত লোকটীকে বিপ্লববাদীদিগের হস্তে অর্পণ করিলে তাঁহাকে এমন শোচনীয় ভাবে শহীদ হইতে হইত না। পথিমধ্যে ভাবী খলিফা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা সয়ীদ-বিন্-আল্ আছের মনঃপুত না হওয়াতে, তিনি অভিযানকারী দলের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লা-বিন্-খালেদ-বিন্-আছিদ এবং মগিরা-বিন্ শয়বাঃ, ও ছকিফ্ সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক লোক দল ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে জনরব উঠিল যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এক প্রবল সেনাদল লইয়া তোমাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন; এই সংবাদ শ্রবণে সৈন্যগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া শিবির উত্তোলন পূর্ব্বক বস্রার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই সেনাদল যখন বস্রার নিকটবর্ত্তী হইল, তখন ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ), আবদুল্লা-বিন্- আমেরকে বস্রাবাসীদিগের নিকট পাঠাইলেন। বস্রার নব-নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা ওস্‌মান-বিন্-হানিফ্ ও নগরবাসী দিগকে আহ্বান করিয়া, মহামান্য খলিফার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক সমাগত বিরুদ্ধবাদীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু বস্রায় হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর পক্ষ সমর্থনকারী লোকের অভাব ছিল না; সুতরাং তিনি দেখিলেন, গতিক বড় ভাল নহে।

ওদিকে মহামাননীয়া ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) সসৈন্যে " মদির " নামক স্থানে পঁহুছিলেন। শাসনকর্ত্তা ওস্‌মান-বিন্-হানিফ সসৈন্যে এই অভিযানকারী যোদ্ধপুরুষদিগের সম্মুখীন হইলেন; হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ) সেনাদলের সম্মুখে আসিয়া, খলিফা

হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করাতে, শাসনকর্ত্তার সেনাদলের মধ্যেই দুই দল হইয়া গেল। একদল তাঁহার পক্ষাবলম্বী, একদল হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর পক্ষপাতী। ওম্মোল মুমেনিনও এতৎ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করিলে, বস্রাবাসিগণের মাতগতি অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইল। এই সময়েই হানিফ-বিন্-ওছমানের সেনাপতি হাকীম-বিন্-জব্‌লাঃ, ওম্মোল মুমেনিনের সেনাদলকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিলেন; যুদ্ধে সেনাপতি নিহত, শাসনকর্ত্তা পরাজিত ও বন্দী হইয়া, মোছলেম-মাতার সমীপে আনীত হইলে, তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। অতঃপর ওছমান-বিন্-হানিফ্‌, মহামান্য খলিফা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকট চলিয়া গেলেন। সুতরাং বস্রায় ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ)-এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

মহামান্য খলিফার মদীনা হইতে বস্রাভিমুখে যাত্রা।

মহামাননীয়া ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ), হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ), যুদ্ধযাত্রা করিয়া বস্রাভিমুখে গমন করিতেছেন, এই সংবাদ শ্রবণে হজরত আমিরুল মুমেনিন খলিফাতুল মোছলেমিন আলী (কঃ—ওঃ) বড়ই ব্যথিত হইলেন। তিনি সমগ্র মদীনা বাসিদিগের নিকট সাহায্য চাহিয়া একটী হৃদয়োন্মাদিনী 'খোত্‌বা' পাঠ করিলেন। তিনি যুদ্ধযাত্রার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন। একদিকে মহামান্য খলিফার আহ্বান, অন্য দিকে মহা মাননীয়া ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ), পরম ভক্তিভাজন (আশরায় মোবাশ্বরা) হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করা, উভয় পক্ষই মোছলমান—ওম্মতে মোহাম্মদী, এই যুদ্ধে মোছলমান দিগেরই শোণিতপাত এবং মোছলমানদিগেরই শক্তি ক্ষয় হইবে, এজন্য তাঁহারা এ বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন ; এরূপ অবস্থায় যখন নামোয়ার ও জলিলল্ কদর ছাহাবাঃ কারাম হজরত আবুল হাশম বদরী (রাজিঃ), হজরত যেয়াদ-বিন্-খজলাঃ (রাজিঃ), হজরত খযিমাঃ-বিন্-ছাবেত (রাজিঃ), হজরত আবু কেতাদাঃ (রাজিঃ) যুদ্ধ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, তখন অন্যান্য লোকেরাও যুদ্ধসজ্জা করিয়া মহামান্য আমিরুল্-মুমেনিনের পতাকা-মূলে আসিয়া সমবেত হইলেন। তদনুসারে ৩৬ হিজরী, রবিওস্-সানী মাসের শেষ ভাগে, মহামান্য খলিফা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মদীনা তৈয়বাঃ হইতে বস্রাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মদীনায় উপস্থিত কুফা ও মেছের বাসী বিপ্লববাদিগণ ও তাঁহার অনুগামী হইল। বিপ্লববাদী দিগের অগ্রণী, মোছলমানদিগের গুপ্ত শত্রু আবদুল্লা-বিন্-ছাবা ও সদল বলে যোগদান করিয়াছিল। পথিমধ্যে হজরত আবদুল্লা-বিন্-ছালাম (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে, তিনি মহামান্য খলিফার অশ্বের লাগাম ধরিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, হে আমিরুল মুমেনিন! আপনি মদীনা ত্যাগ করিয়া যাইবেন না ; আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনি মদীনা হইতে চলিয়া গেলে মোছলমানদিগের আমীর আর এখানে ফিরিয়া আসিবেন না। উগ্র-প্রকৃতির (বিশেষতঃ ছাবায়ী দলের) লোকেরা এই মহাসম্মানিত ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-কে গালি দিয়া প্রহার পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইলে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, তোমরা ইঁহাকে ছাড়িয়া দাও ; আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ছাহাবাঃ গণের মধ্যে ইনি একজন সাধু লোক। অতঃপর এই বিরাট সেনাদল বস্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। "রিযাঃ" নামক স্থানে পঁহুছিয়া মহামান্য আমিরুল মুমেনিন সংবাদ পাইলেন যে, হজরত তাল্হা (রাজিঃ) ও হজরত

যোবের (রাজিঃ) বিজয়ীবেশে বস্রায় প্রবেশ করিয়াছেন ; অগত্যা তিনি ঐ স্থানেই শিবির স্থাপন করিলেন। তিনি এখান হইতে বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান লোকদিগের নিকট উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া সৈন্য-সংগ্রহের যোগাড় করিলেন। রয়যার চতুর্দ্দিকে ও সৈন্য সংগ্রহ করা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মদীনা হইতে স্বীয় জিনিষপত্র ও পরিবার বর্গ আনাইয়া, মহামান্য আমিরুল মুমেনিন বস্রার দিকে অগ্রসর হইতে উদ্যোগ করিলেন। হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনেকেই অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়া, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন, যে পর্য্যন্ত তাঁহারা আমাকে আক্রমণ করিতে বাধ্য না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আমি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিব না। যতদূর সম্ভব, তাঁহাদিগকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিব। রয়বাঃ হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই তয়বংশীয় একদল যোদ্ধপুরুষ আসিয়া তাঁহার সৈন্যদলে যোগদান করিলেন। মহামান্য খলিফা এই স্থানে ওমরু-বিন্-আল জাররাহ (হজরত আবু ওবেদাঃ-বিন্-জাররাহ [রাজিঃ]-এর ভ্রাতা) কে অগ্রগামী সৈন্যদলের সেনাপতি পদে বরিত করিলেন। কুফা হইতে আগত একজন লোকের নিকট তথাকার শাসনকর্ত্তা হজরত আবু মুছা আশয়ারী (রাজিঃ) এর ভাব গতিক ও মতিগতির বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সেই ব্যক্তি বলিল, যদি আপনি 'ছোলেহ্' (সন্ধি বা আপস)-এর উদ্দেশে আসিয়া থাকেন, তবে তিনি আপনার মতানুবর্ত্তী ; আর যদি হজরত তাল্‌হা ও যোবের (রাজিঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়া থাকেন, তবে তিনি আপনার সে মতের পোষকতা করিবেন না। মহামান্য খলিফা ফরমাইলেন, যে পর্য্যন্ত কেহ আমাকে আক্রমণ না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আমার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই। তিনি রয়যাঃ হইতে রওয়ানা হইয়া "তয়বলিয়ঃ" নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করার পর জানিতে পারিলেন, বস্রার শাসন-

কর্ত্তা যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দী, আর তাঁহার সেনাপতি হকিম-বিন্-জলবাঃ নিহত হইয়াছেন। সেথান হইতে রওয়ানা হইয়া যখন " যেক্কার " নামক স্থানে আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন ওছমান-বিন্-হানিফ্ তাঁহার খেদমতে আসিয়া হাজের হইলেন। হজরত তাল্হা (রাজিঃ) ও যোবের (রাজিঃ) তাঁহার হাতে বায়্য়েত করিয়া এক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এজন্য হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহাদিগকে " বদ দোওয়া " (অভিসম্পাত) করিতে লাগিলেন।

এই সময় মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ) ও মোহাম্মদ-বিন্ জাফর (রাজিঃ) কুফাবাসীদিগকে হজরত আলী (রাজিঃ)-এর পক্ষ সমর্থন পুর্ব্বক যুদ্ধে যোগদান জন্য প্ররোচিত করিতে গমন করিলেন। কিন্তু তথাকার শাসনকর্ত্তা হজরত আবুমুছা আশয়ারি (রাজিঃ) এর বিরুদ্ধাচরণে ও তাল্হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে তিনি অনিচ্ছুক বলিয়া তাঁহারা বিফল মনোরথ হইলেন; এবং হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেদমতে ফিরিয়া গেলেন। তখন মহামান্য খলিফা হজরত এব্নে আব্বাছ (রাজিঃ) ও মহাবীর মালেক আশ্তর কে কুফায় পাঠাইলেন। তাঁহারা অনেক বুঝাইয়া তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না; অবশেষে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র হজরত এমাম হাছান (রাজিঃ) ও জলিলল ক্কদর ছাহাবাঃ এমার-বিন্-এয়াছের (রাজিঃ) কে কুফায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহারাও অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু হজরত আবুমুছা আশয়ারী (রাজিঃ) স্বীয় মতে অটল থাকিলেন। এই সময় ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর পক্ষ হইতেও কুফার বড় বড় লোকদিগের নামে পত্র আসিল, সেইপত্র মছজেদে পড়িয়া সকলকে শুনান হইল। তখন পক্ষ প্রতিপক্ষ দুই দল মহা কোলাহল আরম্ভ করিলেন। যয়েদ-বিন্-ছওহান এবং কুফার আরও কতিপয় যোগ্য ব্যক্তি মহামান্য

আমিরুল মুমেনিনের সাপক্ষে বক্তৃতা প্রদান করিলেন; হজরত এমার-বিন্ এয়াছর (রাজিঃ) এবং হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) এই সময় অনল-বর্ষিণী ভাষায় বক্তৃতা করাতে জনমত মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় আবার মহামান্য খলিফা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মহাবীর মালেক আশ্তর তথায় পঁহুছিলেন; তাঁহার চেষ্টায় জনতা সম্পূর্ণরূপে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর অনুকূল হইল; হজরত আবুমুছা আশয়ারী (রাজিঃ)-এর বাধায় আর কোন ফল ফলিল না। তখন তাঁহাকে বলা হইল, আপনি আগামী কল্যই রাজপ্রাসাদ এবং রাজ-ধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া যান। তৎপর ৯০০০ বিক্রান্ত যোদ্ধপুরুষ সঙ্গে লইয়া ইঁহারা মহামান্য আমিরুল-মুমেনিনের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) "যিকার" নামক স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া এই নবাগত সৈন্যদলের অভ্যর্থনা করিলেন। তৎপর তিনি কুফাবাসী যোদ্ধগণকে লক্ষ্য করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় একটী বক্ততা প্রদান করিলেন; সেই বক্তৃতায় তিনি কেবল শান্তির বাণীই শুনাইলেন। কুফার বীর সন্তানগণ তাহাতে খুবই আনন্দিত হইলেন। দ্বিতীয় দিবস মহামান্য খলিফা, হজরত ক্বায়ক্বায়-বিন্-ওমরু (রাজিঃ)-কে বস্রায় ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) ও হজরত তাল্হা (রাজিঃ) এবং হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর নিকট পাঠাইলেন। এই "যিকার" নামক স্থানেই বিখ্যাত তাবেয়ী ও তাপস কুল শিরোমণি হজরত আবিস্ করণী (রাজিঃ) আসিয়া আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তে বায়্য়েত করিলেন। হজরত ক্বায়ক্বায়-বিন্-ওমরু (রাজিঃ) একজন শ্রেষ্ঠতম ছাহাবাঃ এবং বিখ্যাত বক্তা ছিলেন। তিনি জলন্ত ভাষায় হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর উদ্দেশ্য ও সদিচ্ছা এমন ভাবে জ্ঞাপন করিলেন যে, হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ), হজরত তাল্হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের

(রাজিঃ) তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্টি লাভ করিলেন ; মহামান্য খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যার বদলা গ্রহণ এবং মোছলমানদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপনই তাঁহাদের দাবী ছিল, সেই দাবী পূরণ হইবে শুনিয়া তাঁহাদের আপত্তির আর কোনও কারণ রহিল না। সুতরাং হজরত কায়কায়-বিন্-ওমরু (রাজিঃ) উদ্দেশ্য সাফল্য-মণ্ডিত হইল মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে মহামান্য খলিফা সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে বস্রার একদল প্রধান লোকও ডেলিগেট রূপে তথায় গমন করিলেন। বস্রাবাসিগণ জনরবে শুনিয়াছিলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বস্রা জয় করিয়া, তত্রত্য সমুদয় অধিবাসীকে তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত করিবেন ; এবং স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে দাসদাসী রূপে গ্রহণ করিবেন। কপট-চূড়ামণি এব্নে ছাবার অনুচরগণই এই মিথ্যা জনরব রটাইয়া ছিল। বস্রার প্রতিনিধিগণ মহামান্য খলিফার বাচনিক এবং সেনাপতিদিগের মৌখিক শান্তির বাণী ও জনরবের অমূলকতা শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে বস্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং সমগ্র বস্রাবাসীকে সন্ধি ও শান্তির সুসংবাদ শুনাইয়া নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত করিলেন।

সন্ধির প্রাথমিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে, মহামান্য আমিরুল্ মুমেনিন সমগ্র সেনাদলকে একস্থানে সমবেত করিয়া একটী অনলবর্ষিণী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিলেন, এবং অবশেষে বলিলেন, আগামী কল্য আমাদিগকে বস্রাভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। এই যাত্রা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নহে—বরং সন্ধি স্থাপনের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, যে সকল লোক খলিফা হজরত ওছমান (রাজি)-এর গৃহাবরোধ কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তাহারা যেন আমার সেনাদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মহামান্য খলিফার এই বক্তৃতা শ্রবণে আবদুল্লা-বিন ছাবা ও মেছের দেশীয় বিপ্লববাদী দিগের মনে বিষম ভীতি ও দুশ্চিন্তার উদ্রেক হইল। হজরত

আলী (রাজিঃ)-এর সৈন্তদলে, এই বিপ্লববাদী দিগের সংখ্যা দুই হাজার হইতে আড়াই হাজার পর্য্যন্ত ছিল।

এই দলের মধ্যেও অনেক ক্ষমতাশালী বুদ্ধিমান্ ও সুচতুর লোক ছিল। এই দলের নেতা ধূর্ত্ত চূড়ামণি মোছলেম-বিদ্বেষী এব্‌নে ছাবা, এক গুপ্ত সভায় স্বীয় দলস্থ প্রধান প্রধান লোকদিগকে আহ্বান করিল। এই খাস গুপ্ত সভায় স্বয়ং আবদুল্লা-বিন্-ছাবা, এব্‌নে মলজম, মালেক আশ্‌তর, তদীয় বিশিষ্ট বন্ধুগণ, আলিয়া-বিন্-আল হতিম, ছালেম-বিন্-ছয়লাবাঃ, সতরিহ্-বিন্-আওনী প্রভৃতি বিপ্লববাদী দিগের প্রধান প্রধান নেতাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, এতদিন ত (হজরত) তাল্‌হাঃ (রাজিঃ) ও (হজরত) যোবের (রাজিঃ), তৃয় খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর কাছাছ (হত্যার প্রতিশোধ)-এর দাবী করিতেন, এক্ষণে ত স্বয়ং আমিরুল মুমেনিনকেও তাঁহাদের 'হাম-খেয়াল' (এক মতাবলম্বী) দেখা যাইতেছে। যদি আপসে ইঁহাদের মধ্যে সন্ধি-বন্ধন হয়, তবে উভয় দল মিলিয়া আমাদের নিকট হইতে 'কেছাছ' (হত্যার প্রতিশোধ) অবশ্য গ্রহণ করিবেন। এই সভায় অনেক বাক্-বিতণ্ডা হইল; অনেকেই অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিলেন; আবদুল্লা-বিন্-ছাবা এই সভার সভাপতি ছিল; অবশেষে সকলে তাহাকে স্বীয় মত প্রকাশ করিতে বলিলেন। তখন সেই মোস্‌লেম-বিদ্বেষী ধূর্ত্ত-চূড়ামণি বলিল, আমার মতে আমাদের পক্ষে ইহাই মঙ্গলজনক যে, আমরা সকলেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সেনাদলে মিলিয়া মিশিয়া থাকি; তাঁহার সেনাদল হইতে কোনও ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নহে। একান্ত পক্ষে তিনি আমাদিগকে স্বীয় সেনা দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেও, আমরা তাঁহার সেনাদলের কাছে কাছেই অবস্থান করি, এবং তাঁহাকে একথাও বলিয়া দেওয়া যাইবে,

যদি আপনাদের মধ্যে প্রস্তাবিত সন্ধি-বন্ধন না হয়, এবং পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়, তখন আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার সাহায্য করিব। স্থূলকথা, এই উভয় দলে যাহাতে যুদ্ধ বাঁধে, তজ্জন্য আমাদিগকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। আবদুল্লা-বিন্-ছাবার এই কথা সকলের মনঃপুত হওয়াতে, উপরোক্ত পরামর্শ-সভায় এই প্রস্তাবই গৃহীত হইল। মোছলমান দিগের সর্ব্বনাশের বিষবৃক্ষ এখানেই রোপিত হইল।

জঙ্গে-জমল অর্থাৎ জমল যুদ্ধ।

পূর্ব্ব : নির্দ্দেশানুসারে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বীয় সেনাদলকে বস্রাভিমুখে "কুচ্" করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে তদীয় বিশাল বাহিনী অগ্রসর হইয়া বস্রার নিকটস্থ "কছর আবদুল্লা" নামক ময়দানে শিবির সন্নিবেশ করিল। বিপ্লববাদিগণ স্বতন্ত্র ভাবে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঐ ময়দানেরই এক প্রান্তে ডেরা-তাম্বু স্থাপন করিল। ওদিকে হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ), হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর বিরাট সেনাদলও ময়দানের অপর পার্শ্বে শিবির শ্রেণী স্থাপন করিল। ৩ দিন পর্য্যন্ত এই উভয় সেনাদল পরস্পরের: সম্মুখীন অবস্থায় নীরবে অবস্থান করিল ; ইতিমধ্যে হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর সঙ্গীয় কোনও কোনও নেতা বলিলেন, আমাদিগের পক্ষে অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত। তদুত্তরে হজরত যোবের (রাজিঃ) বলিলেন, (হজরত) কাক্কা বিন্-ওমরু (রাজিঃ) দ্বারা সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ করা কিছুতেই উচিত নহে। পক্ষান্তরে হজরত আলী (রাজিঃ)-কেও তাঁহার দলের কোনও কোনও প্রধান ব্যক্তি সত্বরে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন ; আরও অনেকে

অনেক প্রকার প্রশ্ন করিলেন; তিনি সেই সকল প্রশ্নের যথা-বিহিত উত্তর প্রদান করিলেন, এবং স্বয়ং প্রথমেই যুদ্ধারম্ভ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর আমিরুল-মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর নিকট এই বলিয়া দুইজন দূত প্রেরণ করিলেন যে, যদি আপনারা (হজরত) কায় কায়-বিন্-ওমরু (রাজিঃ)-এর প্রস্তাবে রাজী থাকেন, তবে শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে বিরত থাকুন। তদুত্তরে তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন, আমরা আমাদের কথায় অটল আছি, আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। অতঃপর তাঁহারা ৩ জন ময়দানে একত্র মিলিত হইয়া বন্ধুভাবে পরস্পর অনেক কথাবার্ত্তা বলিলেন। হজরত যোবের (রাজিঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর একটী ভবিষ্যদ্বাণী (হাদীছ) শুনিয়া, আর যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন; তৎপর তাঁহারা পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিলেন। হজরত যোবের (রাজিঃ) স্বীয় সেনাদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, আজ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আমাকে আঁ হজরত (ছালঃ) এর একটী ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, সেই জন্য আমি কোনও অবস্থায়ই তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব না। আমার সঙ্কল্প এই যে, আমি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। ইহার পর উভয় পক্ষ হইতে দূত যাতায়াতে সন্ধির শর্ত্ত ঠিক হইয়া গেল; এবং আগামী কল্য সন্ধিপত্র স্বাক্ষরীত হইবে বলিয়াও উভয় পক্ষ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। আবদুল্লা-বিন্-ছাবার দল ও বিপ্লববাদিগণ যখন জানিতে পারিলেন যে, আগামী কল্য সন্ধিপত্র স্বাক্ষরীত হইবে, তখন তাঁহারা আপনাদের বিপদ আসন্ন

ভাবিয়া সারারাত্রি যুক্তি-পরামর্শ আঁটিলেন, এবং রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে—অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই উহারা হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর সেনাদল—অর্থাৎ 'আহ্‌লে-জমল' কে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিলেন। বস্রার বিশাল সৈন্য দলের যে অংশ এই বিপ্লববাদী দল আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারাও তাড়াতাড়ি সুসজ্জিত হইয়া প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে উভয় সৈন্যদলের বিপুল বাহিনীর সর্ব্বত্রই ভীষণ ভাবে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। একদিকে হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-কে তাঁহার সৈন্যগণ বলিল, হজরত আলী (রাজিঃ)-এর সৈন্যগণ অকস্মাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে; তখন তাঁহারা বলিলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কিছুতেই মোছলমানদিগের শোণিতপাতে বিরত হইবেন না? ওদিকে ভীষণ রণ-কোলাহল শুনিয়া হজরত আমিরুল মুমেনিনও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া স্বীয় শিবির হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন; ধূর্ত এব্‌নে ছাবা পূর্ব্ব হইতেই স্বীয় কতিপয় চর সেখানে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা বলিয়া উঠিল, হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর সৈন্যগণ হঠাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, আক্ষেপ, হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ) কিছুতেই শোণিতপাত হইতে বিরত হইলেন না? এই বলিয়াই সমগ্র সেনাদলকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। প্রকৃত ব্যাপার তখন কিছুতেই প্রকাশ পাইল না। উভয় কর্ত্তৃপক্ষ দলই প্রতিপক্ষের প্রতি দোষারোপ করিয়া সমর সাগরে ঝম্প দিলেন। কিন্তু উভয় পক্ষীয় সমগ্র সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর, একদিকে মহামান্য আমিরুল মুমেনিন (কঃ—ওঃ) ও অন্য দিকে হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের

(রাজিঃ) ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, কেহ পলায়নমান যোদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিবে না; কেহ প্রতিপক্ষের 'মাল-আসসাব' গ্রহণ করিতে পারিবে না; ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উভয় দলের দলপতিদিগের মধ্যে কিছুমত্রে মনোবাদ বিদ্যমান ছিল না; তাঁহারা যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। উভয় দলের কর্ত্তৃপক্ষই সরলভাবে সন্ধি-বন্ধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কপট ও ধূর্ত্ত কুল-চূড়ামণি আবদুল্লা-বিন্-ছাবা ও তাহার দলের লোকেরাই এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছিল। অনেক সরল বিশ্বাসী খাঁটি মোছলমান ও তাহাদের ধোকায় পড়িয়া বিপথে পরিচালিত হইয়াছিলেন। ছাবায়ী দল মোছলমানদিগের মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। তাহারা মহামান্য খলিফাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার আশে-পাশে থাকিয়া খুব বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময় কুটিল চূড়ামণি মারওয়ান বিন্-হকম, হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ)-এর যুদ্ধে অনিচ্ছা দর্শনে, কাপড়ে স্বীয় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া তাঁহার প্রতি একটী বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করিলেন; সেই তীর তাঁহার পায়ে বিদ্ধ হওয়াতে অজস্র ধারে শোণিতপাত হইতে লাগিল। হজরত কায় কায় বিন্-ওমরু (রাজিঃ)-এর অনুরোধে তিনি তাড়াতাড়ি বস্রায় গমন পূর্ব্বক অত্যল্প কাল পরেই প্রাণত্যাগ করিলেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাযেউন)। হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) আহত অবস্থায় হজরত কায় কায়-বিন্-ওমরু (রাজিঃ)—মতান্তরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর এক গোলামের (ক্রীতদাসের) হস্তে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নামে বয়্য়েত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) অত্যন্ত ব্যথিত ও শোকার্ত্ত হইলেন। কারণ তিনি একজন ক্ষমতাশালী প্রধানতম ছাহাবাঃ ও তাঁহার একজন সহযোগী এবং বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তিনি

তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনায় খোদা তায়ালার দরগায় প্রার্থনা করিলেন। যুদ্ধারম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে কায়াব-বিন্-ছুর, মহামাননীয়া হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ— আঃ)-কে বলিলেন, আপনি একটি উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করুন, আপনাকে দেখিয়া হয় ত উভয় দলের যোদ্ধপুরুষগণই যুদ্ধে বিরত হইবে। মোছলেম-মাতা এই প্রস্তাব মনোনীত করিয়া তৎক্ষণাৎ উষ্ট্রে আরোহণ করিলেন। তাঁহাকে উষ্ট্র পৃষ্ঠে দেখিয়া কোথায় লোকেরা যুদ্ধে বিরত হইবে, তাহা না হইয়া তাঁহার স্বপক্ষীয় যোদ্ধদল মহাপরাক্রমের সহিত তাঁহার উষ্ট্রের চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রতিপক্ষ দল মনে করিলেন, মোছলেম-মাতা স্বয়ং সেনা পরিচালনা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহারা ও বিপুল বিক্রমে যুদ্ধে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। মোছলেম-মাতার উষ্ট্রের চতুর্দ্দিকে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ভ্রমের উপর ভ্রম হইয়া মোছলমানগণের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিল। হজরত যোবের (রাজিঃ) যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পালন পূর্ব্বক যুদ্ধে বিরত থাকিলেন। এই অবস্থায় হজরত এমার-বিন্-এয়াছর (রাজিঃ) তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও, তিনি কেবলমাত্র আত্ম-রক্ষাই করিতে লাগিলেন। পরে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বস্রাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে ওমরু-বিন্-আল্-জরমুয্ নামক এক দুরাত্মা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। তিনি এক স্থানে নমাজে প্রবৃত্ত হইয়া ছেজদা দিলে, সেই পাষণ্ড তাঁহাকে তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাত করিল। তৎপর সে দৌড়িয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া এই দুষ্কার্য্যের বিষয় বর্ণনা করিল ; তখন ও হজরত যোবের (রাজিঃ) এর সেই সর্ব্বজন পরিচিত তরবারি খানি উহার হস্তে ছিল ; হজরত আলী (কঃ—ওঃ)

উহাকে জাহান্নমের সুসংবাদ (?) দিয়া, ভ্রাতার শোকে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তিনি সেই হত্যাকারী পাষণ্ডকে বলিলেন, রে জালেম, ইহা সেই পবিত্র তরবারি, যাহা সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর 'হেফাযত' করিয়াছিল। হত্যাকারী ওমরু-বিন্-আল জারমুয্ তাঁহার কথা শুনিয়া এরূপ মনঃক্ষুণ্ণ ও ভীষণভাবে উত্তেজিত হইল যে, সে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি কতকগুলি অসংযত বাক্য প্রয়োগ করিয়া, সেই তরবারি খানি স্বীয় উদরে প্রবিষ্ট করিয়া দিল, এবং তন্মুহূর্ত্তেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া জাহান্নাম-বাসী হইল।

হজরত তাল্হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ) প্রথম হইতেই যুদ্ধে যোগ না দিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন ; ওম্মোল-মুমেনিনের পক্ষে প্রধান সেনাপতি কেহ ছিলেন না ; ছোট ছোট দলপতি-গণ স্ব স্ব অধীনস্থ সেনাদল লইয়া মহা-মাননীয়া ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ)-এর পক্ষ হইতে যুদ্ধ করিতে ছিলেন ; তাঁহারা ইহাও জানিতেন না যে, এই যুদ্ধে মোছলেম-মাতার সম্মতি আছে কিংবা নাই। যাহা হউক, এই কপটতা মুলক ভীষণ যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় ১০ হাজার মোছলমান বীর-পুরুষ শহীদ হইলেন। মোছলমান এই সর্ব্ব প্রথমে মোছলমানের শোণিত-পাত করিয়া, মোছলেম শক্তিকে দুর্ব্বল করিল। একদিকে ফেরেব, চাল-বাজী, দাগাবাজী, মোছলেম-বিদ্বেষ—অন্য দিকে সরল বিশ্বাস, ভ্রম-ধারণা, অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন একত্রিত হইয়া এই মহা অনর্থের সূত্রপাত করিল। একদিকে আবদুল্লা-বিন্-ছাবা, অন্য দিকে মারওয়ান-বিন্-হকম—এই অনর্থ-পাতের সর্ব্ব প্রধান পাণ্ডা ছিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বয়ং সেনাপতির পদ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় বিক্রান্ত সেনাদল পরিচালিত করিতে ছিলেন। তদীয় ভীষণ আক্রমণে "আহ্লে-জমল" পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। ওম্মোল মুমেনিনের উষ্ট্রের 'মহার' (লাগাম স্বরূপ দড়ি) হজরত কাবার

(রাজিঃ)-এর হস্তে ছিল; তিনি সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া মোছলেম-মাতাকে উষ্ট্র-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া ছিলেন, কিন্তু ইহার ফল বিপরীত হইল। অবস্থা সাংঘাতিক দেখিয়া ওম্মোল মুমেনিন, (রাঃ—আঃ), হজরত কায়াব (রাজিঃ)-কে বলিলেন, তুমি উষ্ট্রের রজ্জু ছাড়িয়া দিয়া, লোকদিগকে কোরআন মজীদের আদেশ পালন এবং এই অন্যায় শোণিতপাত বন্ধ করিবার জন্য আহ্বান কর। হজরত কায়াব (রাজিঃ) ঐ আদেশানুযায়ী কার্য করিলে, এব্‌নে ছাবার দল তাঁহার প্রতি এমন অজস্র ধারায় তীর বর্ষণ করিতে লাগিল যে, তিনি সেই স্থানেই শহীদ হইলেন। অতঃপর যুদ্ধ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল। বস্রার বীরগণ ওম্মোল মুমেনিনের উষ্ট্র রক্ষার্থ মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; ঐ উষ্ট্রই যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চতুর্দ্দিক হইতে ঐ উষ্ট্রের উপর অজস্র ধারায় তীর বর্ষণ হইতেছিল; মোছলেম-মাতা (রাঃ—আঃ), হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকারীদিগকে 'বদ দোওয়া' (অভিসম্পাত করিতে ছিলেন। উষ্ট্রের চতুর্দ্দিকে মৃতদেহের ঢেড়ি লাগিয়া গিয়াছিল। হজরত আবদুল্লা-বিন্-যোবের (রাজিঃ) ও ধূর্ত্ত চূড়ামণি মারওয়ান বিন্-হকম সাংঘাতিক রূপে আহত হইলেন। আবদুর রহমান-বিন্-য়েতাব, জযব-বিন্-যহর, আবদুল্লা-বিন্-হকীম (রাজিঃ) প্রভৃতি খ্যাতনামা বীরপুরুষগণ জমল রক্ষা করিতে গিয়া শহীদ হইলেন। উভয় প্রতিপক্ষ দল এমন তীব্র তেজে পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছিলেন যে, সে বীরত্বের তুলনা হয় না। উভয় পক্ষের এই ৫০ হাজার মহাপরাক্রান্ত যোদ্ধপুরুষ সমগ্র পৃথিবী জয় করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অবশেষে ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) এর এই উষ্ট্রটিকেই সকল অনর্থের মূল জানিয়া, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর পক্ষ হইতে এক ব্যক্তি উহার পায়ে ভীষণ তরবারির আঘাত করাতে,

উষ্ট্রটী বুকের উপর ভর করিয়া আর্ত্তনাদের সহিত ভূতলে পতিত হইল। আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর আদেশে মোহাম্মদ বিন্‌-আবিবকর (রাজিঃ) তাঁহার ভগিনীকে পরদা করিয়া হেফাযতের জন্য অগ্রসর হইলেন; হজরত এমার-বিন্‌-এয়াছর (রাজিঃ), হজরত কায় কায় বিন্‌-ওমরু (রাজিঃ), 'কাজোয়া' (উষ্ট্রের হাওদাঃ) উঠাইয়া, শব-স্তূপের নিকট হইতে সরাইয়া দূরে লইয়া গেলেন। ইহার কিঞ্চিৎকাল পরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আসিয়া ওম্মোল-মুমেনিন (রাঃ—আঃ)-কে ছালাম জানাইলেন। উভয়ে উভয়কে " খোদা আপনার ভুল-ভ্রান্তি মার্জ্জনা করুন " বলিয়া দোওয়া করিলেন। অতঃপর বিভিন্ন সেনাপতি ও দলপতিগণ আসিয়া ওম্মোল-মুমেনিন কে ছালাম করিলেন; তিনি বলিলেন, এই ঘটনার ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমার মৃত্যু ঘটিলেই ভাল হইত। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও এই কথার পুনরুক্তি বা প্রতিধ্বনি করিলেন।

এই যুদ্ধ " জঙ্গে-জমল " বা " উষ্ট্রের যুদ্ধ " বলিয়া অভিহিত হইবার কারণ এই যে, মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) যে উটটীর উপর 'ছওয়ার' (আরূঢ়) ছিলেন, ঐ উষ্ট্রই যুদ্ধের কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে হজরত মোছলেম-মাতার পক্ষে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০ হাজার; তাঁহাদের অধিকাংশ বস্রাবাসী; ইহাদের মধ্যে ৯ হাজার সৈন্য এই ভীষণ আহবে শহীদ হন। আর খলিফা মহামান্য হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০ হাজার, তন্মধ্যে ১ হাজার ৭০ জন শহীদ হইয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে মহামান্য আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ), উভয় পক্ষের শহীদ বীরপুরুষ দিগের জানাযার নমাজ পড়িয়া, যথা-নিয়মে তাঁহাদিগের দফন কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। শিবির সমূহে ও যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল 'মাল-আছবাব' পড়িয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যে যে ব্যক্তি স্ব স্ব মাল-আছবাব চিনিতে পারে,

তাহারা তাহা লইয়া যাউক। মহামাননীয়া ওম্মোল মুমেনিনকে প্রথমে বস্রায়, পরে মোহাম্মদ-বিন-আবুবকর (রাজিঃ)-এর সঙ্গে, ৪০ জন বস্রা বাসিনী সম্ভ্রান্ত মহিলাকে সঙ্গিনী করিয়া মক্কা-মোয়াজ্জমায় পাঠাইয়া দিলেন। তিনি স্বীয় ভগিনী-পুত্র, গুরুতর রূপে আহত হজরত আবদুল্লা-বিন-যোবের (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। মহামান্য খলিফা তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তদীয় গন্তব্য স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বস্রা নগরে প্রবেশ করিলে বস্রাবাসিগণ পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার হস্তে বায়্য়েত করিলেন। বস্রার "বয়তুল মাল" ভাণ্ডারে যে অর্থ পাইলেন, তাহা স্বদলস্থ যোদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন; প্রত্যেক সৈনিক পুরুষ ৫০০ পাঁচ শত দরম করিয়া পাইয়াছিল। এই সময় তিনি ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, যদি তোমরা শাম (সিরিয়া) জয় করিতে পার, তবে নির্দ্দিষ্ট বেতন ব্যতীত আরও ঐ পরিমাণ অর্থ তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে। আবদুল্লা-বিন্-ছাবার দল এত দিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জন্য 'জান-নেছার' (উৎসর্গীত প্রাণ) বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিত; কিন্তু এক্ষণে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি প্রকাশ্যভাবে নানাপ্রকার দোষারোপ করিতে লাগিল। ইহাদের প্রকট মূর্ত্তি এই সময় প্রকাশ হইয়া পড়িল। বস্রাবাসীদিগের মাল-আসবাব লুণ্ঠন করিতে নিষেধ করাতে, মহামান্য খলিফার প্রতি তাহাদের আরও রাগের কারণ হইল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ইহাদিগকে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিয়াও সুপথে আনয়ন করিতে পারিলেন না, ইহাদের বাড়াবাড়ি চরমে উঠিল। উহারা মহামান্য খলিফার বিশাল সেনাদলকে নানাপ্রকার মিথ্যা কথা দ্বারা প্ররোচিত করিয়া বিগ্ড়াইতে লাগিল। অবশেষে একদা নিশীথ কালে এই দুর্ব্বৃত্ত দল গোপনে বস্রা

হইতে চলিয়া গেল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ইহাদের পলায়ন সংবাদ জানিতে পারিয়া, উহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য একদল যোদ্ধপুরুষ পাঠাইলেন ; কিন্তু তাহারা ধরা পড়িল না। এই দলের ভগ্নাবশেষ হইতে উত্তরকালে "খারেজী", "ফেদায়ী", "এছমাইলী" প্রভৃতি বিপ্লববাদী দলের সৃষ্টি হয়। যাহা হউক, ছাবায়ী দল পারস্যের সুবা ছবস্তানে গিয়া আড্ডা জমাইল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ইহাদের দমন জন্য প্রথমতঃ আবদুর রহমান-বিন্-যয়েদ তায়ীর অধীনে ক্ষুদ্র একদল সৈন্য পাঠাইলেন ; ছাবায়িগণের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও শহীদ হইলেন ; ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া মহামান্য খলিফা রবিয়-বিন্-কাস নামক সেনাপতির অধীনে ৪ হাজার বিক্রান্ত সৈন্য প্রেরণ করিলেন ; ইহারা এই দুর্ব্বৃত্ত ভবঘুরে দলকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। এদিকে মহামান্য খলিফা শামের শাসনকর্ত্তা হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য মহাড়ম্বরে সমর-সজ্জা করিতে লাগিলেন ; এই য়িহুদী সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন ভণ্ডদল, মোছলমানদিগের সর্ব্বনাশ সাধন জন্য গুপ্তভাবে—ছদ্মবেশে মহামান্য খলিফার সেনাদলে প্রবেশ করিতে লাগিল।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর কুফায় রাজধানী স্থাপন।

জমল যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, মহামান্য আমিরুল মুমেনিন, হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-কে দমন পূর্ব্বক শামে (সিরিয়ায়) স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় মোছলেম-খেলাফতাধীন ৪ স্থানে;

মোছলমান সামরিক পুরুষদিগের প্রধান আড্ডা ছিল; ১ম শাম; ২। কুফা, ৩। বস্রা, ৪ মেছের। শেষোক্ত ৩ স্থানের উপর মহামান্ত আমিরুল মুমেনিনের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মোটের উপর সমগ্র আরব, এরাক, পারস্ত ও মেছের হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেলাফতের অধীন হইয়াছিল; ওদিকে এসিয়া মাইনরের সীমা পর্য্যন্ত বিশাল শাম দেশ আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর প্রাধান্ত স্বীকার করিত। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), সুদক্ষ রাজনীতিক ও কুট বুদ্ধি সম্পন্ন সুচতুর ও সুদক্ষ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সামরিক শক্তি প্রবল হইলেও, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সম্মুখে দাঁড়াইতে সক্ষম ছিলেন না। কুফা নগরী বিশাল খেলাফৎ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। উহার উত্তরে সমগ্র আরব দেশ, পূর্ব্বদিকে পারস্য দেশ, উত্তর দিকে শাম (সিরিয়া) ও পশ্চিমে মেছের ও আফ্রিকার অন্যান্য নব-বিজিত প্রদেশ; আর কুফা পরাক্রান্ত যোদ্ধপুরুষদিগের লীলা-নিকেতন, সুতরাং হজরতআলী (কঃ—ওঃ) এই মহানগরীতেই স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই রাজধানী নির্ব্বাচনে তিনি যে বিশেষ দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তিনি স্বীয় পিতৃব্য-পুত্র ও পরম হিতৈষী, মহা বিদ্বান্ হাদীছ-বিদ হজরত আবদুল্লা-বিন্ আব্বাছ (রাজিঃ)-কে বস্রার শাসনকর্ত্তা—রাজপ্রতিনিধি বা গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত করিলেন।

মোনাফেক বা কপটাচারী ছাবায়ী দল ত ছিলই, তদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক সাদা-সিদে খাঁটি মোছলমান ও তাহাদের ধোকয়ে প'ড়িয়া ছিলেন; সুতরাং তাহাদের বেশ দলপুষ্টি হইয়াছিল। সরল বিশ্বাসী মোছলমানগণ ছাবায়ী দলের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতেন না; তাহারা তাহা তাঁহাদিগকে জানিতেও দিত না। কিন্তু তাহারা ইস্‌লামের ভিত্তি খুঁড়িয়া

কেড়িবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিত। দুঃখের বিষয়, মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের পরম ভক্ত ও অনুরক্ত মহাবীর মালেক আশ্‌তর ও তাহাদের ধোকায় পড়িয়া গিয়াছিলেন।

হজরত মোহাম্মাদ-বিন্‌-আবিবকর (রাজিঃ)-এর মেছেরের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) খলিফা-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই অতি সুচতুর এবং ধুরন্ধর বীরপুরুষ কয়েছ-বিন্‌-ছায়াদ (রাজিঃ)-কে মেছেরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তিনি ৭ জন মাত্র বীরপুরুষ সঙ্গে লইয়া মেছেরে গমন পূর্ব্বক, মোহাম্মদ-বিন্‌-আবি হোযায়ফাঃ কে পদচ্যুত করিয়া, তথাকার শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেছেরে এযিদ-বিন্‌-আল ইয়ছ, মোছলেমা-বিন্‌- খলদ-প্রমুখ কতিপয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, হজরত ওছমান (রাজিঃ) এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী করিতেন। তাঁহারা কয়েছ-বিন্‌-ছাদ (রাজিঃ)-এর হস্তে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নামে বায়্‌য়েত করিতে এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, আপনি অপেক্ষা করুন, আমরা দেখি, ৩য় খলিফার অন্যায় হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কি মীমাংসা হয়। যখন এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা হইয়া যাইবে, তখন আমরা বায়্‌য়েত করিব। অথচ যে পর্য্যন্ত বায়্‌য়েত না করি, চুপ করিয়া থাকিব, আপনার কোনও রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিব না। কয়েস্‌-বিন্‌ ছায়াদ (রাজিঃ) এ জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে বায়্‌য়েত গ্রহণার্থ কোনও রূপ বাড়াবাড়ি করিলেন না; কিন্তু স্বীয় 'আখ্‌লাক্‌' (সৌজন্য) ও যোগ্যতা প্রভাবে মেছেরে বিশেষ রূপ শক্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার প্রভাব ও শাসন-কর্ত্তৃত্ব সেখানে বেশ বদ্ধমূল হইল।

জমল যুদ্ধ শেষ হইলে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ; তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এইবার আমাকে আক্রমণ করিবেন। তাঁহার অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্য ও অমানুষিক বীরত্বের বিষয় তাঁহার অবিদিত ছিল না। আবার কয়েছ-বিন্ ছায়াদ (রাজিঃ)-এর ন্যায় একজন উপযুক্ত ও শক্তিশালী শাসনকর্ত্তা এবং অসাধারণ বীরপুরুষ মেছেরে বিদ্যমান থাকাতে, ভয়ের কারণ আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কতকগুলি ঘটনা এমন ঘটিল, যাহাতে লোকের মন্ত্রণায় ও সন্দেহ-বশে হজরত আলী (কঃ—ওঃ), কয়েছ-বিন্-ছায়াদে প্রতি সন্দীহান হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত, ও সেই স্থলে মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ)-কে মেছেরের মহাদায়িত্বপূর্ণ শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন। এই কার্য্যের এমন শোচনীয় ফল হইল যে, মহামান্য আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর মহা সুযোগ নষ্ট হইল—যদ্দ্বারা হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) বিশেষ রূপে আপনার সুবিধা করিয়া লইলেন। মেছেরের দিক হইতে আক্রমণের যে ভয় ছিল, তাহা দূর হইল। হজরত কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ)-কে হস্তগত করিবার জন্য হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না ; তিনি মদীনায় উপস্থিত হইলে শঠ-চূড়ামণি মারওয়ান-বিন্-হকম নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষাবলম্বী করিতে চেষ্টা পাইলেন ; তিনি অবশেষে বিরক্ত হইয়া কুফায় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকটে চলিয়া গেলেন ; এবং মেছের সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা তাঁহার গোচরীভূত করিলে তিনি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, এবং তাঁহাকে স্বীয় পারিষদ বা মন্ত্রণা-দাতা রূপে নিজের কাছে রাখিলেন। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এই সংবাদ শুনিয়া মারওয়ান-বিন্-হকমকে লিখিলেন " তুমি একলক্ষ সৈন্য দ্বারা (হজরত) আলী (রাজিঃ)-এর

সাহায্য করিলে যে ক্ষতি হইত না, (হজরত) কয়েস্-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ) তাঁহার নিকট চলিয়া যাওয়াতে সেই ক্ষতি হইল। *

হজরত মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) মেছেরের শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াই, যে সকল লোক এতাবৎ কাল হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নামে বায়্য়েত করিয়াছিল না ; তাহাদিগকে বায়্য়েত করিবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন ; তিনি তরুণ বয়স্ক যুবক ছিলেন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পরিণামদর্শী ছিলেন না। তাঁহার এইরূপ রূঢ় ব্যবহারে নিরপেক্ষ লোকেরা বিরক্ত হইয়া দলবদ্ধ হইল। তাহারা শাসনকর্তার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহাদের সংখ্যা এবং প্রভাব ও মেছেরে বড় কম ছিল না। যাহা হউক, হজরত মোহাম্মদ (রাজিঃ) ছিফিন যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের উপর খুব নারাজ থাকিলেন।

হজরত ওমরু বিনল্ আছ (রাজিঃ) দামেস্কে।

হজরত ওমরু বিনল্ আছ (রাজিঃ) একজন প্রধান ছাহাবাঃ, মহাবীর পুরুষ এবং মেছের-বিজেতা বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি যেমন বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, দূরদর্শী—তেমনই রাজনীতি বিশারদ ছিলেন। যখন বিপ্লব-বাদিগণ খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর গৃহ অবরোধ করে, তখন তিনি মদীনায় উপস্থিত ছিলেন ; তিনি মদীনার অবস্থা বিপ্লবব্যঞ্জক ও বিপদজনক দেখিয়া, দুই পুত্র আবদুল্লা ও মোহাম্মদ কে সঙ্গে লইয়া বয়তুল-মোকদ্দছে চলিয়া গেলেন। তিনি সেখানে থাকিয়াই খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শাহাদত-সংবাদ পাইলেন ; তৎপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেলাফৎ গ্রহণের সংবাদ, কিছুদিন পরে জঙ্গে-জমল,

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কর্ত্তৃক বস্রা অধিকার, তথায় হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) কে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত, হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) কর্ত্তৃক হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী, হজরত আলী (রাজিঃ)-এর নামে বায়্য়েত করিতে অস্বীকৃতি প্রভৃতি ঘটনার সংবাদ ক্রমান্বয়ে পাইলেন। এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে পুত্রদিগের মত জিজ্ঞাসা করিলেন; পুত্র আবদুল্লা বলিলেন, এই আপনি গোলযোগের সময় নিরপেক্ষ ভাবে এই স্থানেই অবস্থান করুন। শেষে সর্ব্ববাদী সম্মত রূপে যখন কেহ খলিফা নিযুক্ত হইবেন, তখন আপনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই ঠিক কার্য্য হইবে; অন্য পুত্র মোহাম্মদ বলিলেন, আপনি একজন ক্ষমতাশালী, বিচক্ষণ, মহাবীরপুরুষ এবং প্রধানতম ছাহাবাঃ, আপনি এই বিপ্লবের সময় নীরব থাকিলে চলিবে কেন? তিনি উভয় পুত্রের বক্তব্য ও যুক্তিবাদ শুনিয়া বলিলেন, আবদুল্লার পরামর্শ পরকালের জন্য মঙ্গল জনক, আর মোহাম্মদের পরামর্শ ইহকালের জন্য হিতকর। ইহার পর তিনি আরও কিছুকাল চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিলেন; দীনের উপর দুনিয়ার জয় হইল; এত বড় একজন ছাহাবাঃ লৌভ এবং পার্থিব মায়া-জালে আবদ্ধ হইলেন। পার্থিব 'শান-শওকত' ও দুনিয়ার উন্নতির দিকেই তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল; তিনি হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষাবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন; তদনুসারে অবিলম্বে বয়তুল মোকদ্দছের নির্জ্জন বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া দামেস্কে—হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন; তিনি মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন ক্ষমতাশালী, রাজনীতিজ্ঞ মহাবীর পুরুষকে লাভ করিয়া হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) খুব আনন্দিত হইলেন। সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীত্ব

প্রদান পূর্ব্বক গৌরবান্বিত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শোণিতাক্ত কামিজ ও হজরত নায়েলাঃ (রাঃ—আঃ)-এর কর্ত্তিত অঙ্গুলী প্রত্যহ সাধারণকে দেখান হইতে; হজরত ওমরু-বিনল্ আছ (রাজিঃ) বলিলেন, ওরূপ করিলে লোকের উত্তেজনা ক্রমশঃ হ্রাস হইবে, সুতরাং উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত; তাহাই হইল। তিনি হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-কে একথাও বুঝাইয়া দিলেন যে, জঙ্গে-জমলের পরে হজরত আলী (রাজিঃ)-এর সামরিক শক্তি হ্রাস পাইয়াছে; কারণ, ঐ যুদ্ধে প্রায় ১০ হাজার যোদ্ধ্ পুরুষ নিহত হইয়াছে; তন্মধ্যে অনেক বড় বড় দলপতি, নেতা এবং খ্যাতনামা বীর পুরুষও ছিলেন। তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে সকলে একমতাবলম্বী ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন নহে।

ছফিন যুদ্ধ।

আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কুফায় আগমন পূর্ব্বক, সিরিয়া আক্রমণের জন্য বিরাট আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। হজরত আবদুল্লা-বিন্ আব্বাছ (রাজিঃ)-কে বস্রার শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ প্রদান পূর্ব্বক বলিয়া আসিয়াছিলেন, তুমি বস্রায় একজন যোগ্য প্রতিনিধি নিয়োজিত করিয়া, উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক সত্বরে আমার নিকট উপস্থিত হইবে। তদনুসারে তিনি বস্রায় উপযুক্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া সসৈন্যে কুফাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)

ও পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়া আবু মস্‌উদ আন্‌ছারী (রাজিঃ)-কে কুফায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, স্বকীয় বিক্রান্ত সৈন্যদল লইয়া "তথ্‌লিয়া" অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উভয় সেনাদল তথায় উপস্থিত হইলে, সৈন্য-দিগকে গণনা করা হইল, এবং মহাবীর যেয়াদ-বিন্‌-নছর হারসিকে ৮০০০ সৈন্যসহ "মকদ্দমাতুল-জয়েশ্‌" (অগ্রগামী সেনাদল) রূপে সিরিয়াভিমুখে রওয়ানা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই অন্যতম বীরপুরুষ সরিহ-বিন্‌-হানিফ্‌কে ৪০০০ সৈন্যসহ অগ্রগামী হইতে আদেশ করিলেন। আর স্বয়ং পারস্য সম্রাটের রাজধানী মদায়েনে পঁহুছিয়া, মীকল-বিন্‌-ক্বয়েছকে ৩০০০ সৈন্যসহ সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা করিলেন। আমিরুল মুমেনিন রোক্কার নিকট "ফোরাত" (ইউফ্রেটেস্‌) নদী পার হইলেন। এই স্থানে পূর্ব্ব প্রেরিত সেনাপতি ত্রয় সসৈন্যে একত্রিত হইয়াছিলেন। ওদিকে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) যখন সংবাদ পাইলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বিরাট সেনাদল লইয়া সিরিয়াভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন তিনি আবু-আলা য়োর ছলমির নেতৃত্বাধীনে একদল সৈন্য, অগ্রগামী সৈন্যরূপে পাঠাইলেন। অতঃপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ), মহাবীর মালেক আশ্‌তর কে অগ্রগামী সেনাদলের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া সিরিয়া-ভিমুখে পাঠাইলেন। তাঁহারা যেস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন, আবু-আলা য়োর ছলমিও সসৈন্যে তাঁহাদের সম্মুখে ডেরা-তাম্বু ফেলিলেন।

মহামান্য আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মালেক আশ্‌তর-প্রমুখ সেনাপতিগণকে অগ্রে শত্রু সৈন্যদলকে আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সেই উপদেশানুসারেই শত্রুদলকে প্রথমে আক্রমণ করেন নাই; কিন্তু হজরত মাবিয়ার অগ্রগামী সেনাদলের সেনাপতি আবু আলা য়োর ছলমি ঐ দিন সন্ধ্যার সময়ই কুফা ও বস্রার সম্মিলিত সেনাদলকে আক্রমণ করিলেন। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই উভয়

পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিল। দ্বিতীয় দিবস সিরীয় সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা আহ্বান করিলেন ; তদনুসারে মহামান্য খলিফার সেনাদল হইতে হাশেম-বিন্-য়োতবাঃ তাঁহার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আছরের নমাজের সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে বীর-বিক্রমে আক্রমণ করিয়া, কেহ কাহাকে হারাইতে পারিলেন না। অগত্য উভয়ে স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময় মহাবীর মালেক আশ্‌তর, স্বীয় সৈন্য দলকে শত্রু সেনাদল আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন ; তদনুসারে উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাত্রি সমাগত হইলে উভয় সৈন্য দল যুদ্ধে বিরত হইল। পরদিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ] মূল সৈন্যদল লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ; ওদিকে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) ও তাঁহার বিশাল সেনাদল লইয়া অগ্রগমন পূর্ব্বক ফোরাত নদীর তট অবরোধ করিলেন ; সুতরাং মহামান্য খলিফার সৈন্যগণের পক্ষে মহাবিপদ উপস্থিত হইল। অনেক কথা কাটাকাটির পর, হজরত ওমরু-বিনল্-আছ (রাজিঃ)-এর পরামর্শানুসারে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে নদী তটের অবরোধ তুলিয়া লওয়া হইল। অতঃপর ৩৬ হিজরীর ১লা যেলহজ্জ্ তারিখে হজরত আলী (কঃ—ওঃ), বশির্-বিন্-ওমরু (রাজিঃ), রয়ীন মহছেন আন্‌ছারী, ছয়ীদ-বিন্-কয়েছ এবং শবত্-বিন্-রবয়ী এতিমি দ্বারা গঠিত এক 'ওফদ' হজরত মাবিয়াঃ (রাজিঃ) সমীপে প্রেরণ করিলেন ; তাঁহারা গিয়া হজরত মাবিয়াঃ (রাজিঃ)-কে অনেক বুঝাইলেন ; কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে এই দূত দলের খুব বচসা হইল ; অগত্যা তাঁহারা বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ছফিন যুদ্ধের প্রথম ভাগ।

যখন সন্ধি ও মীমাংসার কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না, তখন উভয় দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম প্রথম যুদ্ধ তেমন প্রবল আকার ধারণ করিল না। ইহা কাফেরের সঙ্গে মোছলমানের যুদ্ধ নয় যে, মোছলমানগণ বীরত্বের পূর্ণ 'জওহর' দেখাইবেন। উভয় দলেই ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ বিগুমান ছিলেন; কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে তাঁহাদের সংখ্যা অনেক অধিক ছিল।

বুধবার দিন প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয়; এই দিন মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের পক্ষে মহাবীর মালেক আশ্‌তর এক দল পরাক্রান্ত সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে জয়েব-বিন্-মোছলেমাঃ কে রণক্ষেত্রে পাঠান হইল; সারাদিন উভয় দলে যুদ্ধ হইল; সন্ধ্যার সময় উভয় প্রতিপক্ষ সেনাদল স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

দ্বিতীয় দিন (বৃহস্পতিবারে) মহামান্য খলিফা, হজরত হাশেম-বিন্-ওতবাঃ যহরী (রাজিঃ)-কে প্রধান সেনাপতি রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলেন, ইঁনি পারস্য-বিজেতা হজরত ছাআদ-বিন্-আবি ওক্কাছ (রাজিঃ)-এর ভ্রাতা। ইঁনিও একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন। এরমুকের ভীষণ যুদ্ধে ইঁহার একটী চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), তাঁহার বিরুদ্ধে ছোফিয়ান-বিন্-অওফ্‌কে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। দিবা অবসান কাল পর্য্যন্ত উভয় দলে যুদ্ধ চলিল।

তৃতীয় দিবস (জুমার দিন) প্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ হজরত এমার-বিন্-এয়াছর (রাজিঃ)-কে বদর যুদ্ধে উপস্থিত মহাজেরিন ও আন্‌ছারদিগের সেনাপতি পদে বরিত করিয়া রণক্ষেত্রে পাঠাইলেন; তাঁহার বিরুদ্ধে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), হজরত ওমরু-বিনল্‌-আছ (রাজিঃ)-কে সেনাপতি

করিয়া রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। জুমার নমাজের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল ; পরে উভয় পক্ষীয় সেনাদল স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিল।

চতুর্থ দিন (শনিবার) মহামান্য আমিরুল মুমেনিন স্বীয় বীরপুত্র তরুণ যুবক মোহাম্মদ-বিনল্-হানিফা কে সেনাপতি করিয়া বিপুল সেনাদলসহ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পাঠাইলেন ; তাঁহার বিরুদ্ধে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), ওবায়দুল্লাহ-বিন্-ওমর (রাজিঃ)-কে সেনাপতি করিয়া বহু সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন, সারাদিন ভীষণ যুদ্ধের পর সন্ধ্যার সময় উভয় সেনাদল শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

৫ম দিন (রবিবারে) মহামান্য খলিফা স্বীয় পিতৃব্যপুত্র হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ)-কে যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে পাঠাইলেন ; তাঁহার বিরুদ্ধে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), অলিদ-বিন্-ওক্‌বাকে প্রধান সেনাপতিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন ; এই বেআদব লোকটা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বনি-হাশেম ও ছায়দাত (ছৈয়দ) দিগকে গালি দিতে লাগিল ; তখন হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাজিঃ) উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, রে ছফ্‌ওয়ান! এস, একবার আমার সম্মুখে আসিয়া বনি-হাশেমের বীরত্ব স্বচক্ষে দেখ। ওত্‌বা ভয়ে তাঁহার সম্মুখে আসিল না ; সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিল।

৬ষ্ঠ দিবস (সোমবারে) হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষ হইতে সয়ীদ-বিন্-কয়েস্ হামদানী প্রধান সেনাপতি রূপে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার বিরুদ্ধে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), মহাবীর যোলকালাহ হামিরীকে পাঠাইলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে তীব্রভাবে যুদ্ধ চলিল ; এই দিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছিল ; সন্ধ্যা সমাগমে উভয় সেনাদল রণক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

৭ম দিবস (মঙ্গলবারে) মহামান্য আমিরুল মুমেনিন, মহাবীর মালেক আশ্‌তরকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতি রূপে প্রেরণ করিলেন। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) তাঁহার বিরুদ্ধে জনদীব-বিন্-ছলনাঃ ফহরীকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন ; উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ হইয়া সন্ধ্যার সময় এই যুদ্ধের বিরাম হইল।

৮ম দিবস (বুধবারে) এমামুল মোছলেমিন হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু, স্বয়ং আছহাবে বদর (যে সকল মহামাননীয় ছাহাবাঃ বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন), মহাজের ও আনছার বীরপুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া ভীম পরাক্রমের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ওদিকে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) ও স্বীয় পরাক্রান্ত সিরীয় বীরদিগকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আগমন করিলেন। সন্ধ্যার সময় উভয় পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধে বিরত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অদ্যকার মহাযুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু বীরপুরুষ হত এবং আহত হইয়াছিল।

৯ম দিবসে (বৃহস্পতিবারে) একদিকে মহামান্য আমিরুল মুমেনিন ও অন্যদিকে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) স্ব স্ব পক্ষীয় বীরপুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। উভয় পক্ষে বহু মোছলমান হত এবং আহত হইলেন। অদ্যকার যুদ্ধে মহামান্য খলিফার পক্ষে ঋষিকল্প প্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ ও বীর-পুরুষ হজরত এমার-বিন্-এয়াছের (রাজিঃ) শহীদ হইলেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাযেঊন)। তাঁহার বয়স ৯৩ বৎসর হইয়াছিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) শোকার্ত্ত হৃদয়ে তাঁহার জানাযার নমাজ পড়িলেন। হজরত বেলাল (রাজিঃ) তাঁহাকে গোছল দেওয়াইয়াছিলেন। ৩৭ হিজরীতে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল।

হজরত এমার বিন্-এয়াছের (রাজিঃ) প্রাথমিক ছাহবাঃ দিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠতম ছাহাবাঃ ও "আহ্‌লে বদরের" মধ্যে একজন ছিলেন।

আঁ হজরত (ছাল:) একদা তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, " হে ছমিতার পুত্র ! তোমাকে এক বিদ্রোহী সম্প্রদায় 'ক্বতল্' (হত্যা) করিবে।" এই হাদীস ও ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) হক্ পথে ছিলেন ; আর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) অন্যায় ভাবে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন হয় ; এই সঙ্কীর্ণ স্থানে তাহার সমাবেশ হইতে পারে না। ৩৬ হিজরীর জেলহজ্জ মাস শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের বিরাম হইল। ৩৭ হিজরীর মোহর্‌রম মাসে যুদ্ধ স্থগিত হইল। এই যুদ্ধ বিরামের অবস্থায় উভয় দলের সৈন্য ও সেনাপতি এবং ছরদারগণ যুদ্ধের অপকারিতা বুঝিয়া সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ধূর্ত্ত-কপট ও মোস্‌লেম-বিদ্বেষী ছাবায়ী দল যুদ্ধ জারী রাখিবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত ছিল বলিয়া, উভয় দলে গুপ্তচর প্রেরণ পূর্ব্বক লোকদিগকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতে লাগিল। যাহা হউক, এই মোহর্‌রম মাসেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ) একদল উপযুক্ত দূত, হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি যে লম্বা-চওড়া বোল ও দাবী উপস্থিত করিলেন, এবং দূত দলের সঙ্গে অসঙ্গত তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিলেন, তাহাতে তাঁহারা বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) একদল দূত পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিয়া যেরূপ দাম্ভিকতার সঙ্গে অসঙ্গত দাবী উত্থাপিত করিলেন, তাহাতে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ওজস্বিনী ভাষায় খেলাফতের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস বর্ণনা পূর্ব্বক, একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। দূত দলের প্রধান দাবী ছিল, যাহারা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন, তাহাদিগকে আমাদের হস্তে অর্পণ করিতে

হইবে, আর আপনি খেলাফৎ পরিত্যাগ করিবেন; মোছলমানগণ আপনাদের পক্ষ হইতে নুতন ভাবে খলিফা নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। অবশেষে মহামান্ত আমিরুল মুমেনিন স্বীয় বন্ধু ও পারিষদদিগকে বলিলেন, ইহাদিগকে উপদেশ দান করা ও না করা উভয়ই সমান। ইহাদের উপর তাহাতে কোনও ক্রিয়া হইবে না। সন্ধি সম্বন্ধে ইহাই শেষ প্রচেষ্টা ছিল।

ছফিন যুদ্ধের আর এক সপ্তাহ।

৩৭ হিজরী, মোহার্‌রম মাসের শেষ তারিখে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বীয় সেনাদলের প্রতি এই হুকুম জারী করিলেন যে, আগামী কল্য উভয় দলে শেষ মীমাংসা-সূচক যুদ্ধারম্ভ হইবে। তদনুসারে ১লা ছফর তারিখ প্রাতঃকাল হইতে উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ ৭ দিন-কাল স্থায়ী ছিল। প্রত্যেক দিন উভয় পক্ষের বিভিন্ন সেনাপতি সৈন্য পরিচালন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষে ৯০ হাজার ও হজরত মাবিয়ার পক্ষে ৮০ হাজার সৈন্য ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী যুদ্ধ সমূহে এবং এই এক সপ্তাহের যুদ্ধে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর শামী সৈন্যদলই অধিক পরিমাণে সমরশায়ী হইয়াছিল। যদি এই সময় মেছেরে কয়েছ-বিন্‌-ছায়াদ (রাজিঃ) কিংবা ঐরূপ কোনও উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত থাকিতেন, এবং একদল প্রবল মেছেরী সৈন্যসহ হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-কে পশ্চাদ্দিক্ হইতে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিতেন, কিংবা উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য-সামন্ত শূন্য রাজধানী দামেস্কই আক্রমণ করিয়া বসিতেন, তবে অতি সহজেই এই মহা যুদ্ধের অবসান হইত। কিন্তু মোহাম্মদ-বিন্‌-আবুবকর (রাজিঃ)-এর ন্যায় তরুণ বয়স্ক অপরিণামদর্শী যুবক শাসনকর্ত্তার নিকট সেরূপ হইবার কোন আশাই ছিল না। তিনি

পূর্ব্ব হইতেই প্রবল এক দল মেছেরবাসীকে বিগ্‌ড়াইয়া লইয়াছিলেন; এ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে মেছের হইতে স্থানান্তরে যাওয়াও সম্ভবপর ছিল না।

ছফিন যুদ্ধের শেষ দুই দিন মহাসংহার কার্য্য।

পূর্ব্বোক্ত ৭ দিন যুদ্ধ চলিবার পর ৩৭ হিজরীর ৮ই ছফর বৃহস্পতিবার দিবস উভয় প্রতিপক্ষ সেনাদল একটা শেষ মীমাংসা-সূচক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। তদনুসারে বুধবার দিবাগত বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল যুদ্ধ-সজ্জায় প্রস্তুত হইতেছিল। বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে ফজরের নমাজ পড়িয়া আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) অতি ভীষণ ভাবে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর শামী (সিরীয়) সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধ এমন ভীষণ ভাবে চলিতে লাগিল যে, যাহার কোন তুলনা হয় না। উভয় পক্ষের ফেদায়ী (জীবনোৎসর্গার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ) সৈন্য ও সেনাপতিগণ এমন ভীষণ ভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন যে, প্রাণের মায়া কেহই করিলেন না। উভয় পক্ষেই জয় পরাজয় পর্য্যায়ক্রমে ঘটিতে লাগিল। লায়লাতুল হরির যুদ্ধের একটী স্মরণীয় ঘটনা এই যে, একদা ১০ হাজার বিক্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ) হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর শিবির পর্য্যন্ত পঁহুছিলেন, এবং হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মাবিয়া (রাজিঃ), অনর্থক মোছলমানদিগকে ধ্বংস করিয়া কোন ফল নাই; তুমি শিবির হইতে বাহির হইয়া আইস, আমরা পরস্পর দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, যে

যুদ্ধে জয়ী হইবে, খেলাফৎ তাহারই হইবে। ইহাই মীমাংসার অতি সহজ পন্থা। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর এই উক্তি শুনিয়া হজরত ওমর বিনল্ আছ (রাজিঃ), হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-কে বলিলেন, এই প্রস্তাবই ত ন্যায়সঙ্গত ও উত্তম। অসংখ্য মোছলমানের নিপাত সাধন, তাহাদের শোণিতে ধরাতল কৰ্দ্দমিত করা অপেক্ষা, আপনার পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করিয়া খেলাফৎ সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা করা উচিত। কিন্তু হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ রূপে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সুতরাং হজরত আলী (রাজিঃ)-এর কথার কেহই উত্তর দিলেন না; অগত্যা তিনি স্বীয় মূল সেনাদলের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জুমার দিন বেলা দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত পূর্ণতেজে এই ভয়ঙ্কর ও মহা সংহারক যুদ্ধ চলিল। এই যুদ্ধ প্রায় ৩০ ঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত ভাবে চলিয়াছিল; এই ৩০ ঘণ্টার ভীষণ যুদ্ধে অন্যূন ৭০ হাজার মোছলমানের উত্তপ্ত শোণিতে ছফিনের বিশাল ময়দান কৰ্দ্দমিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও যুদ্ধে মোছলমান-দিগের ইহার সিকি পরিমাণ সৈন্য ও ক্ষয় নাই। এই ৭০ হাজার মোছলমান সৈন্য সমগ্র এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জয় করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বৃহস্পতিবারের যুদ্ধে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষে দুই জন শ্রেষ্ঠতম বীরপুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হন; ১। হজরত ওবায়দুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ); ২। যোল কালাহ হামিরী।

যুদ্ধের শেষ ভাগে এই যুদ্ধ পরিসমাপ্তির জন্য হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর সেনাপতি মালেক আশ্‌তর, স্বীয় পরিচালনাধীন সৈন্য দিগকে সহকারী সেনাপতি হায়ান্-বিন্-হোব্‌দাঃ নামক সেনাপতির অধীনে স্থাপন পূর্ব্বক, স্বয়ং একদল হেজাযী ও এরাকী বিক্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্যকে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন যে, “হয় যুদ্ধে জয়লাভ করিব; নচেৎ

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করিব।" তদনুসারে অসম সাহসী মদীনাবাসী, বস্রাবাসী ও কুফাবাসী অশ্বারোহী বীরপুরুষগণ ঐরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট অশ্বারোহী সৈন্যগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর "হামরেকাব" (সঙ্গে) থাকিল। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে লইয়া মহাবীর মালেক আশ্ তর কোনও উপযুক্ত স্থান হইতে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় শামী সৈন্যদলের উপর নিপতিত হইলেন। এই সময় হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এর সৈন্য সংখ্যা ৮০ হাজার হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ৩৫ হাজারে পরিণত হয়; অর্থাৎ তাঁহার ৪৫ হাজার সৈন্য সমরশায়ী হইয়াছিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষে ২৫ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হইয়া তখনও ৬৫ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং শামীদিগের চূড়ান্ত বলক্ষয় হইয়াছিল। মহাবীর মালেক আশ্ তরের ভীষণ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং আমিরুল মুমেনিন এবং অন্যান্য সেনাপতিগণ এমন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন যে, শামী সেনাদল ক্রমে বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সঙ্কুচিত হইয়া, অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল; সুতরাং তাহাদের বিধ্বস্ত হইবার আর একঘণ্টা কালও অবশিষ্ট ছিল না। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্য অতল সলিলে নিমজ্জিত হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে শঠতা, ধোকা ও চালবাজী, প্রকৃত ন্যায়পরতা ও বীরত্বের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী হইল। হজরত ওমরু-বিনল্ আছ (রাজিঃ) এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবি এক্ষেত্রে ঠিকই বলিয়াছেন ঃ—

এদিক হইতে ফিরে বাতাসের গতি, ব হিল বিরুদ্ধ পথে হায়রে নিয়তি!

হজরত আলী (কঃ—ওঃ), মহাবীর মালেক আশ্ তরের সাফল্য-মণ্ডিত আক্রমণ দর্শনে যেমন হর্ষোৎফুল্ল ও আশান্বিত হইতেছিলেন, হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর অন্তঃকরণ সেইরূপ দুশ্চিন্তা ও ঘোর নৈরাশ্যের তমসায় আচ্ছন্ন হইতেছিল। পরাজয়ের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দর্শনে হজরত

ওমরু-বিনল্ আছ (রাজিঃ), হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-কে বলিলেন, আর কি দেখিতেছেন, আমাদের পরাজয় ত অনিবার্য্য। এই সময় কৌশল অবলম্বন না করিলে আর রক্ষা নাই। সৈন্যদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করুন, এই মুহূর্ত্তেই কোরআন শরীফ বড়শাগ্রে বাঁধিয়া উর্দ্ধদিকে উত্তোলন করে, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে " হাযা কেতাবাল্লাহ বায়েনানা ওবায়েনাকুম " (আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কেতাব " কোরআন মজীদ " রহিয়াছে)। দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ ঐরূপ আদেশ প্রদান করিলেন ; আদেশ পাইবামাত্র শামী সেনাদল নেযার উপরিভাগে কোরআন শরীফ উঁচু করিয়া ধরিল ; এবং উচ্চ চীৎকারের সহিত বলিতে লাগিল, " আমরা কোরআন শরীফের ফয়ছলা মান্য করিতে প্রস্তুত। " সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সত্য ধর্ম্মবিশ্বাস ও অসাধারণ বীরত্ব এবং শৌর্য্য বীর্য্য স্থলে ধোকাবাজী, কৌশল, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সাফল্য লাভ করিল।

আর কি লিখিব, লেখনী অগ্রসর হইতে চায় না। হঠাৎ যাদু মন্ত্র প্রভাবে যেন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ থামিয়া গেল। মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে যে বিজয়োন্মুখ হেজাজী ও এরাকী সেনাদল, শত্রুদলকে দলিত ও মথিত করিয়া, তাহাদিগকে একেবারে " নেস্তে-নাবুদ " করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তাহারা হঠাৎ একেবারে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। আর কেহ অস্ত্র উত্তোলন করিল না। প্রধানতঃ এরাকী ও এব্‌নে ছাবার দলই এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিল। কোরআন পাক বড়শাগ্রে উত্তোলিত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রকৃত যুদ্ধ ছিল ; এক্ষণে ফেরেব ও দাগাবাজী সেই স্থান অধিকার করিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বপক্ষীয় যোদ্ধা-দলকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা এ সময় যুদ্ধে বিরত হইও না। অতি শীঘ্রই আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিব। কিন্তু তাঁহার উপদেশ কার্য্যকরী

হইল না। আর এই সুদীর্ঘকালের যুদ্ধে বহু সহস্র মোছলমানের দেহপাত হওয়ায়, এই সর্ব্ব সংহারক যুদ্ধের প্রতি অনেকেরই বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল; সাবায়ী দল এ সুযোগ পরিত্যাগ করিল না; তাহারা ত চাহিতেছিল মোছলমানদিগের ধ্বংস সাধন; সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পতন; সুতরাং তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে গোল তুলিল যে, আপনি মালেক আশ্‌তর কে এখনই যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য করুন। মহাবীর মালেক আশ্‌তর দিব্য চক্ষে দেখিতেছিলেন যে, আমাদের বিজয় লাভের আর বিলম্ব নাই; আমরা কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই শত্রুদলকে একেবারে পিষ্ট করিয়া ফেলিব; কিন্তু দলপতিগণ ও সেনানায়ক গণ মালেক আশ্‌তরকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া আসিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের প্রতি এতদূর 'গোস্তাখানা' (অশিষ্টতা-সূচক) বাক্য বলিতে লাগিল, যাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ঐ সকল কর্ত্তব্য এবং দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হঠকারী লোকদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, আপনি যদি মালেক আশ্‌তরকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিতে হুকুম না পাঠান, তবে আমরা (হজরত) ওছমান (রাজিঃ)-এর সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছি, আপনার সঙ্গে ও সেইরূপ ব্যবহারই করিব। এই ভীষণ মারাত্মক অবস্থা দর্শনে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তৎক্ষণাৎ মহাবীর মালেক আশ্‌তরের নিকট এই সংবাদ লইয়া লোক পাঠাইলেন যে, এখানে বিপ্লবের দরওয়াযাঃ খুলিয়া গিয়াছে, আমাদের সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা মাটী হইয়াছে, তুমি যুদ্ধ ক্ষান্ত দিয়া সত্বরে আমার নিকট চলিয়া আইস। প্রভু ভক্ত মহাবীর মালেক আশ্‌তর নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষান্ত করিয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেদমতে ফিরিয়া আসিলেন। মালেক আশ্‌তর, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকটে

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা ও সাফল্যের কথা আনুপূর্ব্বিক তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। মালেক আশ্‌তর নিতান্ত আক্ষেপ ও মর্ম্ম বেদনার সহিত বলিতে লাগিলেন হে এরাকবাসিগণ! যে সময়ে তোমরা শামবাসীর উপর সম্পূর্ণ বিজয়ী হইতেছিলে, সেই সময় তোমরা কপটতা-জালে জড়িত হইয়া সব মাটী করিলে? বিশৃঙ্খল প্রকৃতির লোকগুলি এমনই উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা মালেক আশ্‌তরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাহাদের ঐরূপ অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করাতে তাহারা নিরস্ত হইল। তৎপর আশয়ছ-বিন্-কয়ছ মীমাংসার প্রস্তাব লইয়া হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট গমন করিলেন, হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), হজরত ওমরু-বিন্‌ল্ আছ (রাজিঃ)-প্রমুখ মন্ত্রণাকারী দলের পরামর্শানুসারে নিজের সুবিধানুযায়ী যে শর্ত্ত্ পেশ করিলেন, স্বদলস্থ ছাবায়ী এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাচারী দলপতি ও ছরদারগণ সেই প্রস্তাবেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে সম্মতি দান করিতে বাধ্য করিলেন। দুই পক্ষ হইতে দুই জন মধ্যস্থ নিযুক্ত করিবার যে প্রস্তাব হইল, শামী (সিরীয়)-গণ হজরত মাবিয়াঃ (রাজিঃ)-এর প্রধান মন্ত্রী, সর্ব্ব প্রকার মন্ত্রণা দাতা, প্রভু বা বন্ধুর সম্পূর্ণ 'খাএরখাহ' (মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী) হজরত ওমরু বিনল্ আছ (রাজিঃ)-কে মনোনীত করিল; হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বপক্ষে স্বীয় পিতৃব্যপুত্র হজরত আবদুল্লা বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ)-কে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিতে চাহিলে, তাঁহার স্বদলস্থ লোকেরাই হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) তাঁহার ঘনিষ্ট আত্মীয় বা ভ্রাতা বলিয়া তাহাতে আপত্তি করিল; তৎপর তিনি স্বীয় প্রধান সেনাপতি মালেক আশ্‌তরের নাম করাতে, তিনি ছাহাবাঃ কারাম নন বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হইল; তাহারা হজরত আবুমুছা আশয়ারী (রাজিঃ)-কে মনোনীত করিল।

কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর, তাঁহার প্রতি আস্থা ছিল না; তিনি একজন বড়দরের ছাহাবাঃ হইলেও, একদিকে যেমন সাদা-সিদে ও সরল বিশ্বাসী ছিলেন; তেমনই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষে অনুকূল ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাকে নিজের দলের লোকের বাড়াবাড়িতেই এই অন্যায় প্রস্তাবে সম্মিতি দান করিতে হইল। অতঃপর হজরত ওমরু বিনল্ আছ (রাজিঃ) একরার নামা লিখাইবার জন্য হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সুবিধানুযায়ী একরার নাম লেখা পড়া হইল; হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর এ বিষয়ে স্বাধীন-ভাবে কিছু করিবার বা বলিবার উপায় ছিল না; এরাকী অর্থাৎ " কুফি " এবং " বস্রাবাসি " গণ আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী সকল কার্য্যই করিলেন। আগামী রমজান শরীফ্ পর্য্যন্ত ছয়মাস কাল, মধ্যস্থ দ্বয়ের মীমাংসার সময় দেওয়া গেল। তদনন্তর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) হতাবশিষ্ট সেনাদল সহ প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে দামেস্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর দলস্থ ছাবায়ী, বিপ্লবপন্থী, তাঁহার মতের বিরুদ্ধাচারী মোছলেম-শত্রুদল এক বিষম হট্টগোল উপস্থিত করিল।

এই স্থান হইতে একটী নূতন বিপ্লববাদের দরওয়াজা খুলিয়া গেল। এই সকল বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদ, কলহ, কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল। মহামান্য খলিফার প্রতি সম্মান প্রদর্শন দূরে থাকুক, অনেকেই তাঁহার প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। যে সেনাদল কুফা হইতে ছফিনে* যাওয়া * কালীন একমতাবলম্বী ছিল, তাহাদের মধ্যে কত উৎসাহ ও উত্তেজনা ছিল; প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাহাদের সে শৃঙ্খলা, সে একতা, সে ভ্রাতৃভাব, মহামান্য খলিফার প্রতি সে ভক্তি শ্রদ্ধা কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। মহামান্য আমিরুল মুমেনিন বহু চেষ্টা

করিয়াও তাহাদিগকে সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি মহাবিপদে পতিত হইলেন।

এই সময় দুইটী নূতন দলের সৃষ্টি হইল। সাবায়ী দল ও তাহাদের মতানুবর্ত্তী অপর কতকগুলি লোক হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর অনেক কার্য্যে দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাকে কাফেরের দর্জ্জায় পর্য্যন্ত পঁহুছাইল; ইহারা "খারেজী" নামে অভিহিত হইল। আর একদল তাঁহার অতিরিক্ত প্রশংসা কীর্ত্তনকারী,—তাঁহার অস্বাভাবিক গৌরব বর্দ্ধনকারী রূপে অবির্ভূত হইল; উহারা তাঁহার তাবেদারী করা, খোদা ও রছুলের তাবেদারী করা অপেক্ষাও গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত, ইহারা "রাফেজী" বা "শিয়া" নামে পরিচিত। যাঁহারা এই উভয় দলের কোনও দলভুক্ত নহেন, তাঁহারাই প্রকৃত "ছোন্নত জামাত।" যাহা হউক, মহামান্য খলিফা কুফায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুফাবাসী ও বস্রাবাসী বিপ্লবপন্থিগণ আপনাদের বিপ্লববাদ খুব ছড়াইতে লাগিল। হতাবশিষ্ট ছাহাবাঃ (কারাম)-দিগের অধিকাংশ মদীনায় চলিয়া গেলেন, কতকাংশ মহামান্য খলিফার সঙ্গে কুফায় রহিলেন।

আয্‌রাহে মীমাংসাকারী (ছালেছ) দ্বয়ের ঘোষণা।

গোলমালে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। প্রত্যেক এক পক্ষ হইতে ৪০০ শত করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। হজরত আবুমুছা আশয়ারি (রাজিঃ), ও হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) উপরোক্ত ৪০০ প্রতিনিধি সহ আয্‌রাহ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। ওদিকে

হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে ৪০০ প্রতিনিধি সঙ্গে লইয়া হজরত ওমরু বিনল্ আছ (রাজিঃ) ও তদভিমুখে যাত্রা করিলেন; মক্কা ও মদীনাবাসী কতিপয় প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ ও এই মীমাংসা-সভায় যোগদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; তাঁহারা ও তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হজরত আবদুর রহমান-বিন্-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা-বিন্-যোবায়ের (রাজিঃ), হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওক্কাস্ (রাজিঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মীমাংসাকারী দ্বয় কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা প্রথমে কেহই প্রকাশ করিলেন না; পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করিবে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপর একটী বিশেষ সভা আহূত হইল, কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজনীতি-বিশারদ হজরত ওমরু বিনল্-আছ (রাজিঃ) প্রথমেই কতকগুলি জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া, হজরত আবুমুছা আশয়ারী (রাজিঃ)-কে নিজের অনুকূলে মত প্রকাশ করিতে বাধ্য করিলেন; খেলাফৎ সম্বন্ধে অনেক কথা কাটাকাটির পর হজরত আবুমুছা আশয়ারী (রাজিঃ) বলিলেন, আমার মতে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এই দুইজনকেই পদচ্যুত করিয়া, হজরত আবদুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ)-কে খলিফা নির্ব্বাচিত করা উচিত। হজরত আবদুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ) এই প্রস্তাব শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, আমি এই প্রস্তাবে রাজি নহি। আবার অনেক তর্ক-বিতর্ক ও কথা কাটাকাটির পর হজরত ওমরু-বিনল্ আছ (রাজিঃ) গোপনে হজরত আবুমুছা আশয়ারি (রাজিঃ)-এর নিকট নিম্ন-লিখিত রূপ মত প্রকাশ করিলেন— (হজরত) আলী (কঃ—ওঃ) এবং হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এই দুইজনের বিবাদে এবং লড়া'য়ে সমগ্র মোছলমান জাতি বিপন্ন

হইয়া পড়িয়াছেঁ, অসংখ্য মোছলমানের উত্তপ্ত শোণিতে ভূপৃষ্ঠ রঞ্জিত হইতেছে; এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের উভয়ের পক্ষে ইহাই কর্ত্তব্য মনে করিতেছি যে, খেলাফতের 'দাবীদার' উভয়কেই পদচ্যুত করি। তৎপর মোছলমানদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া হউক যে, তাহারা আপনাদের জন্য খলিফা নির্ব্বাচন করিয়া লয়। সরল বিশ্বাসী হজরত আবুমুছা আশয়ারী (রাজিঃ) তাঁহার এই প্রস্তাব সমীচীন বলিয়া মানিয়া লইলেন। অতঃপর সাধারণ সভায় এই মত ঘোষণা করা হইবে বলিয়া প্রচার করা হইল। তদনুসারে জন-সাধারণ ও উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণ সেখানে উপস্থিত হইলেন; একটী মিম্বর স্থাপন করা হইল। উভয় 'ছালেছ' (মীমাংসাকারী) এবং মক্কা ও মদীনার প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ), নির্ব্বাচিত সদস্য প্রধান প্রধান দলপতি ও নেতাগণ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন ওমর-বিনল্-আছ (রাজিঃ) হজরত আবুমুছা আশয়ারী (রাজিঃ)-কে বলিলেন, আমাদের উভয়ের যে মত স্থির হইয়াছে, তাহা আপনি উপস্থিত জন-মণ্ডলীর সম্মুখে ঘোষণা করুন। এক্ষেত্রেও হজরত ওমর-বিনল্-আছ (রাজিঃ) চালাকী খেলিলেন; হজরত আবুমুছা আশয়ারাকে প্রবীণ বয়স্ক, বোযর্গ ব্যক্তি বলিয়া তাঁহাকেই প্রথমে মত প্রকাশ করিতে বাধ্য করিলেন। সাদা-সিদে ভাল মানুষ হজরত আবু-মুছা আশয়ারী (রাজিঃ) সে চালবাজী বুঝিতে না পারিয়া, প্রথমেই মিম্বরে দণ্ডায়মান হইয়া এই ঘোষণা প্রচার করিলেন:—

"হে উপস্থিত মোছলমানগণ! আমরা 'ছালেছ' (মীমাংসাকারী) দ্বয় অনেক চিন্তা ও আলোচনা করিয়া দেখিলাম, একটী ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোনও ব্যবস্থায়ই আমরা একমতাবলম্বী হইতে পারিতেছি না। এক্ষণে আমরা তোমাদিগকে সেই মতবাদের বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। আমরা আশা করি, তোমরা আমাদের এই মীমাংসা গ্রহণ

করিয়া, মোছলমানদিগের মধ্যে একতা ও শান্তির প্রতিষ্ঠা করিবে। ঐ মীমাংসা——যাহার উপর আমিও ওমরু-বিনল্-আছ (রাজিঃ), উভয়ে "মত্তফক" (একমতাবলম্বী)—তাহা এই যে, আমরা এ সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এবং হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এই উভয়কেই পদচ্যুত করিতেছি; আর তোমাদিগকে এই 'এখ্তেয়ার' (ক্ষমতা) দিতেছি যে, তোমরা এক মতাবলম্বী হইয়া যাহাকে ইচ্ছা, তাঁহাকে আপনাদের খলিফা নির্ব্বাচন কর।"

সমবেত মোছলমানগণ হজরত আবু মুছা আশয়ারী (রাজিঃ)-এর এই বক্তৃতা শুনিলেন; তিনি মিম্বর হইতে অবতরণ করিলে হজরত ওমরু বিনল্-আছ (রাজিঃ) মিম্বরে আরোহণ পূর্ব্বক সমবেত মোছলমান জনসঙ্ঘকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন :—

" আপনারা সাক্ষী থাকুন, (হজরত) আবু মুছা আশয়ারী (রাজিঃ), তাঁহার বন্ধু হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে খেলাফতের পদ হইতে 'মাযুল' (পদচ্যুত) করিলেন; আমিও তাঁহার সঙ্গে এ বিষয়ে এক মতাবলম্বী; এবং তদনুসারে হজরত আলী (রাজিঃ)-কে খেলাফৎ হইতে 'মাযুল' (পদচ্যুত) করিতেছি; কিন্তু আমি হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-কে পদচ্যুত করিতেছি না; তাঁহাকে আমি খলিফা পদে 'বহাল' রাখিতেছি। কারণ, তিনি 'মজলুম' (অত্যাচারগ্রস্ত) খলিফার অলি (উত্তরাধিকারী) এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবার অধিকারী।"

এই বলিয়া ওমরু-বিনল্ আছ (রাজিঃ) মিম্বর হইতে অবতরণ করিলেন। সভাক্ষেত্রে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হজরত আবু মুছা আশয়ারি (রাজিঃ) যে ধোকায় পড়িয়াছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। তাঁহার উক্তি তেমন দূষণীয় ছিল না; কিন্তু হজরত ওমরু বিনল্-আছ (রাজিঃ) চতুরতা প্রকাশ পূর্ব্বক এই কাণ্ড করিলেন। ফলতঃ ইহা

দ্বারা কোন মীমাংসা বা শেষ সিদ্ধান্ত হইল না। হজরত আবু মুছা আশয়ারি (রাজিঃ), হজরত ওমরু বিনল্ আছ (রাজিঃ)-কে বদ-দোওয়া করিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষপাতী অধিকাংশ মেম্বর এই মীমাংসা অগ্রাহ্য করিলেন ; কিন্তু শামী দল ইহা দ্বারা বেশ ফললাভ করিল ; হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষে ইহা বেশ অনুকূল হইল ; এতকাল তাঁহার দলের লোকেরাও তাঁহাকে খলিফা বলিয়া সম্বোধন করিতেন না ; এখন হইতে তাঁহারা তাঁহাকে "আমিরুল মুমেনিন" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষীয় ছাবায়ী ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোকগুলি এই ব্যাপারে অনর্থক হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। অথচ এই গুপ্তশত্রু ও মোনাফেকের দলই 'যবরদস্তী' করিয়া "ছফিন" এর জয়যুক্ত যুদ্ধ বন্ধ করিয়াছিল। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর প্রতিনিধি দল সানন্দ চিত্তে দামেস্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন ; আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতিনিধিগণ বিবাদ-বিসম্বাদ ও নানা অসংলগ্ন তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে কুফাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হজরত আবু মুছা আশয়ারী (রাজিঃ) লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

বিপ্লব-পন্থী খারেজী দল।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যখন ৩৭ হিজরীর ১৩ই ছফর তারিখে ছফিন রণক্ষেত্র হইতে কুফাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কতকগুলি ছাবায়ী-মন্ত্রে দীক্ষিত ক্রূঢ়মতি কপটাচারী বিপ্লব-পন্থী দলপতি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হজরত! আপনি কুফায় প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক শামীদিগকে পশ্চাদ্দিক হইতে

আক্রমণ করুন। তদুত্তরে মহাত্মা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন, আমি একরারনামা লিখিয়া দেওয়ার পর কি এই অসঙ্গত কাজ (সন্ধি-ভঙ্গ) করিতে পারি ? এক্ষণে আমাকে বাধ্য হইয়া আগামী রমজান মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে ; ইতিমধ্যে যুদ্ধের কল্পনাও মনে স্থান দিতে পারি না। এই কথা শুনিয়া লোকগুলি চলিয়া গেল, এবং সেনা দলের মধ্যে বিপ্লব-বীজ ছড়াইতে লাগিল। ক্রমে সৈন্যদলের মধ্যে বিষম বাদানুবাদ, বচসা ও ঝগড়া-কলহ আরম্ভ হইল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ও এই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক-দিগকে সংযত ও নিয়মাধীন করিতে পারিলেন না। সেনাদল কুফার নিকট পঁহুছিলে, তন্মধ্য হইতে ১২ হাজার লোক দল বাঁধিয়া স্বতন্ত্র হইয়া গেল। তাহারা আবদুল্লা-বিন্-আল কুয়াকে আপনাদের এমাম ও ছবত্-বিন্-রবয়ী কে সেনাপতি মনোনীত করিল। এই ব্যক্তি সেই ছবত্-বিন্-রবয়ী—যাঁহাকে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ছফিন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দুইবার দূত নিযুক্ত করিয়া হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আর দুইবারেই হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ইঁহার রূঢ়ভাবে কথাবার্ত্তা ও বাক্-বিতণ্ডা হইয়াছিল ; এবং দুইবারেই দূত প্রেরণ কার্য্য বিফল হইয়াছিল। এই দলের নেতৃগণ একমতাবলম্বী হইয়া নিম্নলিখিত রূপ ঘোষণা প্রচার করিল।

"বায়্য়েত একমাত্র খোদাতালার। আল্লাহর কেতাব এবং রছুল (ছালঃ)-এর ছোন্নত অনুযায়ী সৎকার্য্যাবলীর 'হুকুম' করা ও মন্দ কার্য্যের জন্য 'মানা' (নিষেধ) করা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য। আমাদের মধ্যে কোনও খলিফা ও কোন আমীর নাই। যুদ্ধে জয়ী হইবার পর সমুদয় কার্য্য, সমগ্র মোছলমানদিগের মতানুযায়ী এবং অধিকাংশ মোছলমানের ভোটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। আমীর মাবিয়া (রাজিঃ)

ও হজরত আলী (কঃ—ওঃ)—ইঁহারা উভয়েই সমান অপরাধে অপরাধী।”

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) খারেজী দিগের ব্যবহারে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন; পরে কুফা নগরে প্রবেশ করিয়া, যাহাদের স্বামী-পুত্র, পিতা-ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজন ছফিন যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন, এবং ছফিনের যুদ্ধে যাঁহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শহীদ হইয়াছেন, এই কথা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে তিনি হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ)-কে খারেজীদিগের নিকট পাঠাইলেন, তাহারা তাঁহার সঙ্গে ঘোর তর্ক-বিতর্ক ও বাক্-বিতণ্ডা আরম্ভ করিল। পরে তিনি স্বয়ং সেখানে গমন পূর্ব্বক এই দলের সর্ব্বপ্রধান নেতা এযিদ-বিন্-কয়েছের শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, দুই রেকায়াত নফল নমায্ আদায় করিলেন। তিনি এযিদ-বিন্-কয়েছকে এস্ফাহানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। খারেজী দলের এমান আবদুল্লা বিন্-আল্‌কুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে, সে মহামান্য খলিফার সঙ্গে ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিয়া দিল। যাহা হউক, বিপ্লবপন্থী খারেজিগণ কোনও ক্রমেই সুপথে আসিল না। তাহারা অবশেষে নহরওয়ানের দিকে চলিয়া গেল। নহরওয়ানে পঁহুছিতে পঁহুছিতে তাহাদের সংখ্যা ২৫ হাজারে দাঁড়াইল। সেখানে তাহারা আপনাদের সেনা-নিবাস খুব সুরক্ষিত করিয়া লইল।

এই সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আবার সিরিয়া আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; তদনুসারে স্বীয় পিতৃব্যপুত্র, এবং সর্ব্বপ্রধান প্রতিনিধি বস্রার শাসনকর্ত্তা হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ)-কে বস্রা হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আদেশ পত্র পাঠাইলেন। তখন বস্রায় ৬০ হাজার বিক্রান্ত যোদ্ধৃ পুরুষ বিদ্যমান থাকিলেও, মাত্র ৩ হাজার

১ শত যোদ্ধা যুদ্ধে যাইতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। এই সৈন্য দল কুফায় পঁহুছিলে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কুফাবাসীদিগের সম্মুখে এমন একটী অনল-বর্ষিণী হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিলেন যে, কুফার ৪০ সহস্র বীরপুরুষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। অতঃপর তিনি খারেজীদিগকে স্বদলভুক্ত করিবার জন্য আর একবার বিশেষ চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহাদের মতিগতি কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না। এই সময় এই পাষণ্ডদল আর একটী গর্হিত কার্য্য করিল। হজরত আবদুল্লা-বিন্-জনাব (রাজিঃ) নহরওয়ানের নিকট দিয়া সপরিবারে 'ছফরে' যাইতে ছিলেন, উহারা তাঁহাকে প্রথম দুই খলিফা এবং হজরত আলী সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল; তিনি তাঁহাদের সকলেরই প্রশংসা-বাদ করাতে উহারা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সেই নিরীহ ছাহাবাঃ (রাজিঃ), তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি এবং সঙ্গীয় লোক জনকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিল। আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই সংবাদ পাইবামাত্র ঘটনার সভ্যতা অনুসন্ধানার্থ হরছ-বিন্-মর্‌রাহকে নহরওয়ানে—খারেজীদিগের আড্ডায় প্রেরণ করিলেন; দুর্ব্বৃত্তগণ তাঁহাকে ও হত্যা করিল; সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদ ও পঁহুছিল যে, যে সকল মোছলমান খারেজী দিগের মতানুবর্ত্তী নয়, তাহারা সেই সকল মোছলমানকেই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিতেছে।

এক্ষণে যে বিক্রান্ত কুফাবাসী ও এরাকী যোদ্ধ্‌পুরুষগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সৈন্যদল ভুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের মনে এই দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল যে, আমরা শামদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিলে, এই খারেজিগণ হয় ত সেই সুযোগে কুফা ও বস্রা সংবলিত সমগ্র এরাক প্রদেশ অধিকার করিয়া লইতে পারে, সেরূপ ক্ষেত্রে তাহারা আমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে অতি নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করিয়া,

আমাদের যথা-সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইবে। তাহাদের এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ও ভিত্তিহীন ছিল না; পক্ষান্তরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মনে করিলেন, যদি খারেজিগণ কুফা ও বস্রা অধিকার করিয়া লইতে পারে, তবে আমার পক্ষে সিরিয়া আক্রমণ লাভের পরিবর্ত্তে বিশেষ ক্ষতিজনক হইয়া দাঁড়াইবে। তদনুসারে তিনি শামের যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রাখিয়া খারেজিদিগের নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং কতিপয় ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-কে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া, এবং তাহাদের কতিপয় প্রধান প্রধান নেতাকে ডাকাইয়া আনাইয়া অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" এই অবস্থা দাঁড়াইল; তাহারা তাঁহাকে কাফের বলিয়া প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। যখন কোনও চেষ্টাই কার্য্যকরী হইল না, তখন তিনি স্বীয় সেনাদলকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন; এবং ভিন্ন ভিন্ন বীরপুরুষদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সেনাদলের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন; আর হজরত আবু আইউব আন্ছারী (রাজিঃ)-এর হস্তে 'আমানের ঝাণ্ডা' (শান্তি-পতাকা) প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, আপনি এই শান্তি-পতাকা এক উচ্চস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে এই ঘোষণা-প্রচার করুণ যে, যে সকল লোক যুদ্ধ না করিয়া আমাদের দিকে চলিয়া আসিবে, তাহাদিগকে 'আমান' (শান্তি) দেওয়া হইবে; এবং যে সকল লোক কুফা ও মদায়নের দিকে চলিয়া যাইবে, তাহারাও নিরাপদে থাকিবে। তদনুসারে শান্তি-পতাকা খাড়া করা হইল, হজরত আবু আইউব আন্ছারী (রাজিঃ) উচ্চৈঃস্বরে ঐরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন। ঘোষণা শ্রবণ মাত্রে লশ্‌কর এব্‌নে নওফল আশ্‌জয়ী ৫০০ যোদ্ধৃপুরুষ সহ স্বতন্ত্র হইয়া চলিয়া গেল। কতক খারেজী যোদ্ধা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সেনাদলে আসিয়া যোগদান করিল। এই প্রকারে দুই তৃতীয়াংশ লোক স্বতন্ত্র হইয়া যাওয়াতে,

এক তৃতীয়াংশ মাত্র লোক মূলদলে রহিয়া গেল। অতঃপর মহামান্য খলিফার সেনাদল খারেজী দিগকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। তাহারা খারেজীদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে এমন ভাবে বেষ্টন করিয়া লইল যে, তাহাদের পলায়ন করিবার পথ রহিল না। তাহাদের প্রধান প্রধান নেতৃদল সহ ৯।১০ হাজার খারেজী সমরশায়ী হইল; মাত্র ৯ জন খারেজী জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। রণক্ষেত্রে নিপতিত মৃতদেহ গুলি কবরস্থ করা হইল না; উহা শৃগাল, কুকুর, গৃধিনী, শকুনী প্রভৃতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হইল; এবং তাহাদের দুষ্কার্য্যের শোচনীয় পরিণামের নিদর্শন স্বরূপ অস্থিপুঞ্জ সেই ময়দানে পড়িয়া রহিল। খারেজিদলের নিপাত সাধন হইলে মহামান্য আমিরুল মুমেনিন এক দিক্ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এইবার তিনি শাম আক্রমণের জন্য মহা উৎসাহের সহিত রণ-সজ্জা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুফাবাসী যোদ্ধৃপুরুষগণ যুদ্ধের জন্য কিছুমাত্র উৎসাহ প্রদর্শন করিল না। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কত বুঝাইলেন, কত আশা ও উৎসাহের বাণী শুনাইলেন, জ্বলন্ত ভাষায় কত বক্তৃতা প্রদান করিলেন; কত ওয়াজ ফরমাইলেন; কিছুতেই কুফাবাসীদিগের উৎসাহাগ্নি প্রদীপ্ত হইল না। তিনি কুফাবাসীর এই নিরুৎসাহ ভাব, মৌনাবলম্বন ও নীরবতা দর্শনে কিরূপ মর্ম্ম-পীড়িত হইলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ইহা দ্বারা এরাকবাসী—বিশেষতঃ কুফার ও বস্রার অধিবাসীদিগের চঞ্চল মতিত্ব, মানসিক দুর্ব্বলতা, ধর্ম্ম-ভাবের শিথিলতা, কাপুরুষতা, মহামান্য খলিফার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব ও স্বার্থপরতা প্রভৃতি মারাত্মক দোষের পরিমাণ বুঝা যাইতে পারে। এ সময় কেবলমাত্র কুফা ও বস্রা হইতে একলক্ষ বিক্রান্ত যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিত। আরব ও পারস্যের অন্যান্য অংশ হইতে ও ৪০।৫০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ হইবার খুব সম্ভাবনা ছিল।

এই বিপুল সেনাদল লইয়া বীরেন্দ্র কেশরী হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও তদীয় অজেয় সেনাপতি মালেক আশ্‌তর যদি খুব সত্বরতায় সহিত শামদেশ আক্রমণ করিতে পারিতেন, তবে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) নিশ্চয় পরাস্ত হইয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেলাফৎ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন; কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ ছিল।

হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে মেছের অধিকার।

ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত মোহাম্মদ-বিন্‌-আবিবকর (রাজিঃ), ছফিন যুদ্ধের সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর কোন সাহায্য,: বা হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারিয়াছিলেন না; কারণ তিনি সেখানে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তাহারা তাঁহার সঙ্গে বা-কায়দা (নিয়মিত রূপে) যুদ্ধ করিতে লাগিল; ইহা হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষে বেশ সুযোগ হইয়া দাঁড়াইল। মেছেরে একজন শক্তিশালী বহুদর্শী শাসনকর্ত্তার আবশ্যক বলিয়া, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বীয় প্রধান সেনাপতি মহাবীর মালেক আশ্‌তর কে মেছেরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এ সংবাদে মোহাম্মদ-বিন্‌-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) মর্ম্মাহত হইলেন। পক্ষান্তরে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এই সংবাদে নিতান্ত চিন্তাকুল ও ভীত হইয়া পড়িলেন। মালেক আশ্‌তরের বীরত্ব, যোগ্যতা, রাজনীতি-জ্ঞান, জন-প্রিয়তা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণ তাঁহার অবিদিত ছিল না। মহাবীর মালেক আশ্‌তর মেছের দেশে পঁহুছিবার

পূর্ব্বেই পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর গুপ্তচরগণ কর্ত্তৃক বিষ-প্রয়োগে ইঁহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। ইঁহার অকাল মৃত্যুতে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বাহু ভাঙ্গিয়া গেল। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর কূট রাজনীতি চক্রে তাঁহার সকল বাধা-বিঘ্নই ক্রমশঃ কাটিতে আরম্ভ হইল; পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, মেছেরে মহামান্য খলিফা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বিরূদ্ধবাদী একদল লোক ছিল; মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ)-এর অদূরদর্শিতা ও কঠোর ব্যবহারে তাহারা ক্রমে এমন প্রবল হইয়াছিল যে, শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিলেন না। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), মেছেরের বিদ্রোহী দলের নেতা মাবিয়া-বিন্-খদিজের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করাতে, সে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল। তদনুসারে দামেস্কাধিপতি আমীর মাবিয়া (রাজিঃ), হজরত ওমরু-বিনল্ আছকে ৮০০০ সৈন্যসহ মেছেরে পাঠাইলেন। মোহাম্মদ বিন্-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), মহামান্য খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলে, তিনি অতি কষ্টে মাত্র ২০০০ সৈন্য কুফা হইতে মালেক-বিন্-কায়বের সৈন্যাপত্যে মেছেরে রওয়ানা করিলেন। ওদিকে হজরত ওমরু বিনল্-আছ (রাজিঃ)-এর গতি রোধার্থ মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), কেনানাঃ-বিন্- বশরের নেতৃত্বাধীনে মাত্র ২০০০ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। শামী সেনাদলের সহিত কেনানার যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে কেনানাঃ মহাবীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সৈন্য সংখ্যার অল্পতা বশতঃ পরাজিত ও নিহত হইলেন। অতঃপর মোহাম্মদ-বিন্ আবুবকর (রাজিঃ) স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধ করিবে দূরে থাকুক, চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল; নিরূপায় হইয়া তিনি রাজধানীতে

প্রস্থান করিলেন; শত্রুদল তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া বন্দী হইলেন; বিদ্রোহী দলপতি মাবিয়া-বিন্-খদিজ তাঁহাকে 'কতল্' (শহীদ) করিয়া, একটী মৃত অশ্বের চর্ম্মের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ পূরিয়া আগুণ দিয়া পুড়াইয়া ফেলিল। মোছলমানের পক্ষে ইহা কি নির্দ্দয় পৈশাচিক ব্যবহার! এই ঘটনার পর বিশাল মেছের দেশ অতি সহজেই হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর হস্তগত হইল। হজরত ওমরু-বিনল্ আছ (রাজিঃ) মেছের দেশ জয় করিয়া বহুকাল উহা দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন; সুতরাং অতি সত্বরেই সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন।

অতঃপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কুফাবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন, এবং তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিলেন, তোমাদেরই অমনোযোগ, দৌর্ব্বল্য, কাপুরুষতা ও সহানুভূতির অভাবে বিশাল মেছের দেশ আমার হস্তচ্যুত ও শত্রু পক্ষের করতলগত হইল। কিন্তু সেই ক্রূঢ়মতি, চঞ্চল চিত্ত, হৃদয়হীন, কর্ত্তব্য-বিমুখ কুফাবাসিগণ চুপ করিয়া রহিল। মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের অনলবর্ষিণী বক্তৃতায় ও তাহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইল না। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ক্ষোভে ও দুঃখে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ৩৮ হিজরীতে মেছেরে অতি নৃশংসভাবে শহীদ হইয়াছিলেন।

ইহার পর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর কৌশলে, পুরস্কারের লোভে, ক্রমে হেজাজ, এমন ফলস্তিন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশই তাঁহার খেলাফৎ স্বীকার করিল; এক্ষণে কেবলমাত্র এরাক প্রদেশ (প্রধানতঃ বস্রা ও কুফা) এবং বিশাল পারস্য দেশ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর শাসনাধীন রহিল। এরাকের ও একদল প্রবল আরব তাঁহার বিরুদ্ধাচারী

ছিল। কুফা ও বস্রার বহু লোকই অস্থির মতি, চঞ্চল চিত্ত এবং দুর্ব্বল হৃদয় থাকাতে, তাহাদের উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা যাইত না। তাহারা লোভী এবং স্বার্থপর ছিল। যুদ্ধে মহাপরাক্রমশালী হইলেও তাহাদের হৃদয় কাপুরুষোচিত ছিল।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ, আদর্শ মোছলমান, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী, মহা বিদ্বান্, অসাধারণ বক্তা, তাপস কুলের শিরোমণি, ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মধ্যে তখন আর একজনও জীবিত ছিলেন না। খলিফার উপযুক্ত পাত্র সে সময় তিনি ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না। প্রথম, দ্বিতীয় খলিফার সম্পূর্ণ এবং তৃতীয় খলিফার (আংশিক) পদানুসরণকারী একমাত্র এই মহাপুরুষই তখন বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, বহুসংখ্যক প্রধান ছাহাবাঃ, মোছলমানদিগের, বহু দলপতি, বহু সাধারণ জন-মণ্ডলী তাঁহার সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর স্নেহময় পিতৃব্য পুত্র, প্রতিপালিত অন্তরঙ্গ, জামাতা ও প্রথম ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ-কারীদিগের মধ্যে অন্যতম, মহাত্মা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সর্ব্ব প্রকারেই খলিফার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত হইবার যোগ্যপাত্র ছিলেন ; কিন্তু তবু তিনি সর্ব্বজন-প্রিয় হইতে পারেন নাই, ইহা খোদা-তালার মরজী ব্যতীত আর কিছুই নহে। তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শোচনীয় হত্যাকাণ্ড, মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে হজরত তাল্হাঃ (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ) মিলিয়া যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত, জমল যুদ্ধে ১০।১২ হাজার মোছলমানের জীবন নাশ, কপটাচারী আবদুল্লা-বিন্-ছাবা ও তাহার মতানুবর্ত্তী দুরাচার লোকদিগের শয়তানী চক্র, হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পূর্ব্ব হইতে বিশাল শাম দেশের উপর আধিপত্য, কূট

রাজনীতিক চাল, কুফা ও বস্রাবাসী একদল মোছলমানের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির অভাব, তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন, অবশেষে তাঁহাকে কাফের পর্য্যন্ত বলিয়া ঘোষণা প্রচার ও প্রকাশ্যে বিদ্রোহাচরণ অর্থাৎ খারেজী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব, উপযুক্ত সাহায্যকারী ও পরামর্শ দাতার অভাব, অত্যন্ত সরলতা ও ধর্ম্মভীরুতা জন্য মোছলমান মাত্রেরই উপর বিশ্বাস স্থাপন, হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) কর্ত্তৃক ছাহাবাঃ (রাজিঃ) এবং জন নায়কদিগকে উচ্চ পুরস্কার এবং বৃত্তিদান ইত্যাদি বিষয় গুলি মহামান্য আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেলাফতের বিরুদ্ধ ছিল। তদুপরি কুফা ও বস্রার পরাক্রমশালী অধিবাসীদিগের অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল। আবার পারস্যবাসী অগ্ন্যুপাসক জাতির বহুসংখ্যক লোক ভয়ে মোছলমান হইলেও, তাহাদের মধ্যে সেই পূর্ব্ববর্ত্তী অসার ধর্ম্মের বীজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছিল না; একটু সুযোগ পাইলেই তাহারা মোছলমান শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিত; এতগুলি প্রতিকূল বাধা-বিঘ্ন থাকা স্বত্বেও, মহাবীর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ধর্ম্ম-বিশ্বাসে পরিপূর্ণ বীর হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইয়াছিল না; তাঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাস, অতুলনীয় সাহস ও অনুপম বীরত্ব, অকপট জন-হিতৈষণা তাঁহার পদ-মর্য্যাদাকে এত উচ্চ স্থান দিয়াছিল যে, হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) সর্ব্ব প্রকারে সুবিধা লাভ করিয়াও, আপনাকে তাঁহার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য ও হীনপ্রভঃ দেখিতে পাইতেন। এজন্য এত দেশ, প্রদেশ, জনপদ স্বাধিকার ভুক্ত করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইতে পারিয়াছিলেন না। তিনি তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদাই বিভীষিকাগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত থাকিতেন। তিনি একথা খুব জানিতেন যে, যদি কেবলমাত্র এরাক বাসিগণ (নূতন উপনিবেশ কুফা ও বস্রার অধিবাসিগণ) হজরত

আলী (কঃ—ওঃ)-এর পতাকা-মূলে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হয়, তবেও আমার পরাজয় অনিবার্য্য। আদর্শ ধর্ম্ম প্রাণ, আল্লাহ তা'লার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরকারী, তাপস কুলের শিরোভূষণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সর্ব্বপ্রকার সাহায্য-সহানুভূতি এবং প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু-বান্ধবগণকে হারাইয়া ও অটল পর্ব্বতের ন্যায় রাজধানী কুফায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

বিপদের উপর বিপদ, তাঁহার একমাত্র পিতৃব্যপুত্র, মহাবীর, মহাধীর, মহা-বিদ্বান্, রাজনীতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) ও একটী ঘটনায় অসন্তুষ্ট হইয়া বস্রার রাজপ্রতিনিধিত্ব বা গবর্ণর জেনারলের পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মক্কায় চলিয়া গেলেন। এই একমাত্র ভ্রাতা, বন্ধু, সাহায্যকারী, ছায়ার ন্যায় অনুসরণকারী পিতৃব্য-পুত্রের প্রস্থানে তাঁহার শক্তি আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। বস্রা হইতে সমগ্র পারস্য সাম্রাজের বিশাল এলাকা তাঁহার শাসনাধীন ছিল। হজরত আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর অন্যতম পুত্র মহাবীর যেয়াদ পরে বস্রার সর্ব্বক্ষমতাপন্ন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর একান্ত অনুগত ও 'ফরমাবরদার' দিলেন।

হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহুর শাহাদত প্রাপ্তি।

একদিকে হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) বস্রার শাসনকর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মক্কা-মোয়াজ্জমায় প্রস্থান করিলেন, পক্ষান্তরে জ্যেষ্ঠ সহোদর হজরত আকিল-বিন্-আবি তালেব ও মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের প্রতি নারাজ হইয়া দামেস্কে——হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকটে

চলিয়া গেলেন। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহার উচ্চ বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলেন ; তিনি তদীয় সভাসদগণ মধ্যে গণ্য হইলেন। ভ্রাতার এইরূপ ব্যবহারে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বীর এর হৃদয় নিতান্তই বিচলিত হইল ; তিনি পদে পদে অপ্রতিভ হইয়া হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর বিরুদ্ধে একবার শেষ যুদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি কুফাবাসীদিগের নিকট হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহার অনল বর্ষিণী বক্তৃতায় এবার কুফাবাসীর প্রস্তরবৎ কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তদনুসারে ৬০ হাজার কুফাবাসী যোদ্ধৃপুরুষ এই বলিয়া তাঁহার হস্তে 'বায়্য়েত' করিল যে, আমরা প্রাণ থাকিতে আপনার আদেশ প্রতিপালনে বিমুখ হইব না ; এবং মরিতে কিংবা শত্রুদলের নিপাত সাধন করিতে সম্পুর্ণ রূপে প্রস্তুত থাকিব। মহামান্য আমিরুল মুমেনিন এই ৬০ হাজার সৈন্য ব্যতীত এরাক এবং পারস্যের বিভিন্ন সুবায় আরও সৈন্য সংগ্রহ, অস্ত্র-শস্ত্র এবং যুদ্ধোপকরণ রসদ-পত্রাদির বিশেষ যোগাড়ে প্রবৃত্ত হইলেন। চতুর্দ্দিকে সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নহরওয়ানের যুদ্ধে খারেজি দল সম্পূর্ণ রূপে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল। তথাকার বিশাল প্রান্তরে তখনও তাহাদের পুঞ্জীকৃত অস্থিরাজি, তাহাদের ধ্বংসের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছিল। কিন্তু নহরওয়ানের যুদ্ধ হইতে ৯ জন খারেজী যে প্রাণরক্ষা করিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এ সংবাদ ও অবশ্য পাঠকগণের স্মরণ আছে। উত্তরকালে এই ৯ ব্যক্তি খারেজী দলের এমাম বা দলপতির পদলাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহারা নহরওয়ানের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন পূর্ব্বক পারস্য দেশের বিভিন্ন অংশে খারেজী মতের বিষাক্ত বীজ বপন ও হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বিরুদ্ধে বিপ্লববাদ প্রচার

এবং বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার প্রয়াসে পাইয়া যখন বিফল মনোরথ হইল, তখন হেজায্ ও এরাক প্রদেশে গুপ্তভাবে প্রবেশ করিয়া ভবঘুরের ন্যায় ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিল।

অবশেষে ইহাদের মধ্য হইতে আবদুর রহমান-বিন্-বলজম মোরাদী, বরক্-বিন্-আবদুল্লা এতিমি ও ওমরু-বিন্-বকর এতিমি—এই ৩ ব্যক্তি মক্কা-মোয়াজ্জমায় গিয়া একত্রিত হইল। তাহারা সেখানে নহরওয়ানের যুদ্ধে নিহত লোক ও বন্ধু-বান্ধবদিগের জন্য খুব দুঃখ ও শোক প্রকাশ করিল। অবশেষে তাহারা একামতাবলম্বী হইয়া এই পরামর্শ স্থির করিল যে, যে তিনজন লোকের জন্য এছলাম জগতে মহা অশান্তির উদ্রেক হইয়াছে, ঐ তিন ব্যক্তি—অর্থাৎ হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এবং হজরত ওমরু বিনল্ আছ (রাজিঃ) এই তিনজনকে মৃত্যু-পথের পথিক করিতে হইবে। তাহারা পরস্পরের মধ্যে একথারও মীমাংসা করিয়া লইল যে, কে কাহাকে হত্যা (শহীদ) করিবে। দুরাত্মা আবদুর রহমান-বিন্-বলজম, মহাপ্রাণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে, বরক্-বিন্-আবদুল্লা এতিমি হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-কে, ওমরু-বিন্-বকর এতিমি হজরত ওমরু-বিনল্ আছ (রাজিঃ) কে হত্যা করিবার ভার গ্রহণ করিল। ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, এই হত্যাকার্য্য একই দিনে—ঠিক একই সময়ে সম্পন্ন করিতে হইবে। তদনুসারে ১৬ই রমজানুল মবারক—জুমার দিন ফজরের সময় (অতি প্রত্যুষে) এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবে বলিয়া উহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিল। অতঃপর এই ৩টা দুর্ব্বৃত্ত মক্কা-মোয়াজ্জমা হইতে কুফা, দামেশ্ক্ ও মেছেরাভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেল ; এবং যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থান ত্রয়ে গিয়া পঁহুছিল। যখন রমজান শরীফের সেই নির্দ্দিষ্ট তারিখ আসিল, সেই দিন (জুমার দিন ফজরের নমাজের সময়) যখন হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) দামেস্কের জামে-মছজেদে

ফজরের নমাজে এমামতি করিতেছিলেন, ঐ সময় বরক্-বিন্ আবত্নল্লাহ্ এতিমি তাঁহাকে তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাত করিল; সে মনে করিল, এই ভীষণ আঘাতে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর নিশ্চয়ই দফা-রফা হইয়াছে। সে তরবারির আঘাত করিয়াই দ্রুতগতি পলায়ন করিতে ছিল, কিন্তু অনতিবিলম্বে ধরা পড়িল। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর গায় সামান্য মাত্র আঘাত লাগিয়াছিল, সুচিকিৎসার ফলে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিলেন। বরক্ এর দণ্ড-বিধান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে; কেহ কেহ লিখিয়াছেন, উহাকে তৎক্ষণাৎ 'কতল্' (হত্যা) করা হয়; আর কাহারও কাহারও মতে তাহাকে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ রাখিয়া, পরে তাঁহার শিরশ্ছেদন করা হইয়াছিল। মেছেরে হজরত ওমরু-বিনল্-আছ (রাজিঃ) অসুস্থতা নিবন্ধন ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখে জামে-মছজেদে ফজরের নমাজ পড়িতে গিয়াছিলেন না, তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সেনাপতি আবি জয়বাঃ-বিন্-আমের, ফজরের নমাজের এমামতি করিতেছিলেন; হজরত ওমরু বিনল্-আছ (রাজিঃ)-কে মনে করিয়া, ওমরু-বিন্-বকর এতিমি, তাঁহাকে তরবারির এক ভীষণ আঘাতে হত্যা করিল। আবার ঐ দিনই ঠিক ঐ সময় কুফার জামে-মছজেদে, আবত্নর রহমান বিন্ বলজম, ফজরের নমাজের সময়, মছজেদের দ্বারদেশে, আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে ভীষণ ভাবে তরবারির আঘাত করিল। সেই দারুণ আঘাত তাঁহার মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল; সেই আঘাতে অজস্র শোণিতপাত হইয়া ২ দিন পরে, ৪০ হিজরীর ১৭ই রমজানুল মবারক—আদর্শ ধার্ম্মিক, আদর্শ তাপস, আদর্শ খলিফা, আদর্শ ছাহাবাঃ কারাম, অদ্বিতীয় বীরপুরুষ, আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী করমুল্লাহু ওয়াজহু শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাযেঊন)। এই শাহাদৎ-ঘটনার বিবরণ এই যে, পাষণ্ড আবত্নর

রহমান-বিন্-বলজম কুফা নগরে পঁহুছিয়া প্রথমে স্বীয় বন্ধু-বান্ধবদিগের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছিল; কিন্তু কাহারও নিকট স্বীয় দুরভিসন্ধির বিষয় প্রকাশ করিয়াছিল না; অবশেষে অনেক ভাবা-চিন্তার পর স্বীয় অকৃত্রিম 'দোস্ত্' (বন্ধু) শবিত্-বিন্-নজরাহ্ আশ্জয়ীর নিকট স্বীয় পাপ-অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল; এবং তাহার নিকট সাহায্য চাহিল। শবিত্ প্রথমে তাহাকে এই ভীষণ সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু অবশেষে অনেক আলোচনা ও বিতর্কের পর সে তাঁহার এই ভীষণ দুষ্কার্য্যের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। এতিমি সম্প্রদায়ের যে ১০ জন লোক খারেজী দলভুক্ত হইয়া নহরওয়ানের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা সকলেই সেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। তাহাদের যে সকল আত্মীয়-স্বজন কুফা নগরে বাস করিত, তাহারা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি নিতান্ত 'নারাজ' (বিরূপ) এবং বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছিল। এব্নে বলজম ঐ সকল লোকের গৃহে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া তাহাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করিত। উহাদেরই এক গৃহে কতাম নাম্নী এক পরমা সুন্দরী রমণীকে সে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল। ঐ নারীর পিতা ও ভ্রাতা নহরওয়ানের যুদ্ধে শমন সদনে প্রেরিত হইয়াছিল; এব্নে বলজম এই সুন্দরীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইল। রমণী বলিল, যদি বিবাহের পূর্ব্বে তুমি আমার দেন-মোহর আদায় করিয়া দাও, তবে আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে রাজী আছি। যখন এব্নে বলজম মোহরের পরিমাণ জানিতে চাহিল, তখন সেই প্রতিহিংসা-পরায়ণা নারী কহিল, আমার মোহরের পরিমাণ ৩ হাজার দরহম, একটী দাস, একটী দাসী এবং হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ছিন্ন মস্তক। এব্নে বলজম ত হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হত্যা সাধন জন্যই আসিয়াছিল; সুতরাং সে বলিল, আমি কেবলমাত্র শেষোক্ত

শর্ত্ত পালন করিতে পারি, অন্যান্য শর্ত্ত পালন—অর্থাৎ নগদ দেন-মোহরাদি আদায় করিতে আপাততঃ অক্ষম। প্রতিহিংসা-বিষে জর্জ্জরিতা কতাম বলিল, তুমি যদি দেন-মোহর সম্বন্ধে শেষ শর্ত্ত-পালন করিতে পার, তবে আমি অন্যান্য দাবী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য আছি। কতাম দরদান নামক তাহার এক আত্মীয়কেও এব্‌নে বলজমের সাহায্যকারী রূপে নিযুক্ত করিল। অবশেষে ১৬ই রমজানুল মবারক জুমার দিন অতি প্রত্যুষে (শেষ রাত্রিতে) পূর্ব্বোক্ত শবিত্‌-বিন্‌-শজরাহ, এব্‌নে বলজম ও দরদান কুফার জামে-মছজেদের দরজার পার্শ্বে লুকাইয়া রহিল। ধর্ম্মপ্রাণ মহামান্য আমিরুল মুমেনিন যথানিয়মে নমাজীদিগকে মছজেদে আগমন জন্য আহ্বান করিতে করিতে, মছজেদের দিকে অগ্রসর হইতে-ছিলেন; সেই সময় দরদান অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে তরবারির আঘাত করিল। কিন্তু এই আঘাত মছজেদের দরওয়াজার চৌকাঠে কিংবা প্রাচীরে লাগিয়া ব্যর্থ হইল। হজরত আলী মরতুজা (কঃ—ওঃ যখন দরওয়াজাঃ হইতে দ্রুতগতি মছজেদের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন আবদুর রহমান-বিন্‌-বলজম তীব্র গতিতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার 'গরদানে' (ঘাড়ে) সবলে তরবারির ভীষণ আঘাত করিল। সে আঘাত বড়ই সাংঘাতিক ছিল। তিনি মছজেদে সমাগত মুছল্লি-দিগকে আদেশ করিলেন, উহাদিগকে ধরিয়া ফেল; তৎক্ষণাৎ লোকেরা উহাদিগকে ধরিবার জন্য পাষণ্ডদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। দরদান ও শবিত্‌ দ্রুতবেগে ছুটিয়া পলাইল; কিন্তু ইব্‌নে বলজম পলায়নের অবসর পাইল না; লোকেরা মছজেদের পার্শ্বেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। হছ্‌যমী নামক একব্যক্তি দুরাত্মা শবিত্‌কে ধরিয়াছিল; কিন্তু সে তাহার হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইল। দরদান পলায়ন করিয়া তাহার গৃহের নিকট পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল, অনুসরণকারী লোকেরা সেই

স্থানেই তাহাকে কুকুরের ন্যায় হত্যা করিয়া ফেলিল। পাপীষ্ঠ এব্‌নে বলজম ধৃত হইয়া মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের সম্মুখে আনীত হইলে তিনি বলিলেন, উহাকে আপাততঃ বন্দী করিয়া রাখ, যদি এ 'যখমে' আমার মৃত্যু হয়, তবে উহার গরদান উড়াইয়া দিবে; আর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে তখন যাহা কর্ত্তব্য বোধ হইবে, উহার সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই করিব। অতঃপর তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে ডাকিয়া বলিলেন; যদি আমি এই আঘাতে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হই, তবে এব্‌নে বলজমকে তরবারির একই আঘাতে "কতল" করিবে। দুর্ব্বৃত্ত এব্‌নে বলজমের তরবারির সেই প্রচণ্ড আঘাত, আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর 'কাণপটি' (কর্ণ-মূল) পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। আর তরবারির ধার মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে ১৭ই রমজান শনিবার দিন তাঁহার পবিত্র অমর আত্মা, দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'জন্নতল ফেরদওছ' এ (স্বর্গরাজ্যে) চলিয়া গেল। মোছলমানদিগের প্রতি যেন ভীষণ অশনি সম্পাত হইল। তৎ-সময়ের সর্ব্ব প্রধান মোছলমান পুরুষ,—খোদাতালার শার্দ্দূল নামে অভিহিত অদ্বিতীয় বীরপুরুষ পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে হবযব বিন্-আবদুল্লা আসিয়া আরজ করিলেন, হে আমিরুল মুমেনিন! আপনি যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তবে কি আমরা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর হস্তে বায়্‌য়েত করিব? তদুত্তরে হজরত আমিরুল মুমেনিন—খলিফাতুল মুছলেমিন (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন, আমি এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিব না; তোমরা যাহা কর্ত্তব্য মনে কর, তাহাই করিবে। তৎপর তিনি পুত্রদিগকে বহুমূল্য-বান্ উপদেশ প্রদান করিলেন। পরে একটী সাধারণ অছিয়ত-নামা লিপিবদ্ধ করাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাহা পূর্ণ করিবার অবসর পাইলেন না;

"লায়েলাহা ইল্লাল্লাহো"—এই পবিত্র তওহিদ-বাণী উচ্চারণ করিতে করিতেই তাঁহার পবিত্র জীবনের অবসান হইল। ইস্‌লামের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অকালে অস্তমিত হইয়া গেল; তাঁহার পবিত্র গৃহ শোক-পুরীতে পরিণত হইল। কুফা নগরীতে শোকের প্রচণ্ড ঝড় বহিল। হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী, কোর-আনের প্রকৃত আদেশ পালক, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি, সত্য ও ন্যায়ের পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষাকারী, অদ্বিতীয় বীর, মহা বিদ্বান্, বিশ্বাসিগণের নেতা পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত খেলাফতেরও অবসান হইল।

হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহুর শাহাদতের অব্যবহিত পরে পাপীষ্ঠ আবতুর রহমান এব্‌নে বলজম, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর সমীপে বন্দী অবস্থায় আনীত হইল; তিনি তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাতে তাহার পাপ দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। পাপাচারীর সুন্দরী নারী বিবাহের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ (?) হইল! অবশ্য পৈশাচিক প্রতিহিংসা-পরায়ণা কতাম নাম্নী শয়তানী নারীর দেন-মোহর আদায় হইল। এই পিশাচ ও পিশাচিনী মোছলমান সমাজের কি সর্ব্বনাশ করিল, তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মৃত্যুকালে আমিরুল মুমেনিন খলিফাতুল মুছলেমিন হজরত আলী মরতুজাঃ (কঃ—ওঃ)-এর বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দুর্জ্জয় সাহস ও অমানুষিক বীরত্বের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল না। মাত্র পৌণে পাঁচ বৎসর কাল খেলাফত করিবার পর তিনি শহীদ হইলেন। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), হজরত এমাম হোছায়েন (রাজিঃ) এবং হজরত আবদুল্লা-বিন্-জাফর (রাজিঃ) তাঁহার গোছল দেওয়াইলেন। ৩ খানি বস্ত্র দ্বারা কাফন দেওয়া হইল; কিন্তু তাহাতে কামিজ দেওয়া হইয়াছিল না। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) তাঁহার জানাযার নমাজ পড়াইলেন। তাঁহার পবিত্র কবর কোথায় হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ

আছে। সত্যপথ-ভ্রষ্ট দুরাচার খারেজিগণ তাঁহার প্রতি যেরূপ বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিল, তাহাতে উত্তরকালে তাঁহার কবর খুঁড়িয়া তদীয় পবিত্র দেহের অবমাননা করা তাহাদের পক্ষে কিছুতেই অসম্ভব ছিল না; এজন্য তাঁহার দফন কার্য্য রাত্রিকালে গোপনে, কুফা হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী একস্থানে সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রগণ ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং পরম ভক্তগণ ব্যতীত সে স্থানের সন্ধান আর কেহই জানিতেন না। এজন্য তাঁহার পবিত্র "কবর শরীফ্" সাধারণের অজানিত ছিল। পরে আব্বাছ-বংশীয় মহাপরাক্রান্ত, ভুবন বিদিত ও স্বনামখ্যাত খলিফা হারুণর রশিদ, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পবিত্র কবরের সন্ধান পান; এবং সেই পবিত্র কবর শরীফের উপর এক সুদৃশ্য সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ক্রমে উহা মহাতীর্থে পরিণত হইয়া একটী সুন্দর নগর রূপে গড়িয়া উঠে। বর্ত্তমানে উহা "নজফ্-আশ্রফ্" নামক একটী সুদৃশ্য এবং সমৃদ্ধি সম্পন্ন নগরে পরিণত হইয়াছে। কারবালার ন্যায় এই নগর ও শিয়াদিগের একটী প্রধানতম তীর্থ স্থান। ছুন্নি সম্প্রদায়ের মোছলমানগণ ও মহাভক্তি সহকারে ঐ কবর শরীফ্ জেয়ারত করিয়া থাকেন।

আমিরুল মুমেনিন-খলিফাতুল মুছলেমিন হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু 'যাহেরী' ও 'বাতেনী' (প্রকাশ্য ও আধ্যাত্মিক) বিদ্যায় যে কিরূপ পারদর্শী ছিলেন, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা অসাধারণ ছিল। অতি জটিল ও কঠিন মছলায় তিনি অতি সহজে মীমাংসা করিতেন। এজন্য পূর্ব্ববর্ত্তী মহামান্য খলিফাগণ জটিল মছলা-মছায়েল মীমাংসার ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিতেন। তিনি এমন সুন্দর রূপে—যুক্তি-সঙ্গত ভাবে তাহার মীমাংসা করিতেন যে, সকলে তাহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইতেন। তাঁহার বক্তৃতা শক্তি অসাধারণ ছিল। এ শক্তি তিনি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট হইতেই লাভ

করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় লোক মোহিত হইত; কুফার কঠোরপ্রাণ অধিবাসীদিগের হৃদয় ও তাঁহার বক্তৃতায় এক এক সময় এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিত যে, তাহারা তাঁহার জন্য জীবনোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইত। তিনি সরল চিত্ত, খাঁটি মোছলমানদিগের ভক্তি-শ্রদ্ধা বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা সংসারের মায়ায় মুগ্ধ, দুনিয়াবী স্বার্থ লাভ যাহাদের জীবনের লক্ষ্য, তাঁহারা তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অবশ্য অধিকাংশ খ্যাতনামা ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ও 'আহ্‌লে বদর' (যাঁহারা স্বনামখ্যাত বদর যুদ্ধে আঁ হজরত [ছালঃ]-এর সঙ্গী ও সহযোগী ছিলেন) তাঁহার পক্ষপাতী, সাহায্যকারী এবং তাঁহার জন্য জীবনোৎসর্গকারী ছিলেন। জমল যুদ্ধে ও ছফিন যুদ্ধে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শহীদও হইয়াছিলেন। তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান জিন্নূরায়েন (রাজিঃ)-এর শাহাদতের পর, খলিফা হইবার দাবী তাঁহারই অগ্রগণ্য ছিল। তিনি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পিতৃব্য-পুত্র, জামাতা ও বনি-হাশেমের প্রচণ্ড ভাস্কর স্বরূপ ছিলেন। তিনি অতি শৈশবকাল হইতে আঁ হজরত (ছালঃ) কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; তিনি বালকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে পবিত্র এছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সহবাসে থাকিয়া, তাঁহার আদর্শ সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক, তিনি একজন আদর্শ মহাপুরুষ হইয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) যেমন পয়গম্বরী লাভের পূর্ব্বে " ছুর " গিরি-গহ্বরে অবস্থান পূর্ব্বক পরম করুণাময় আল্লাহ তা-লার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া অদ্বিতীয় আধ্যাত্ম-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তখন বালক হইলেও, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তদ্রূপ ধ্যান-ধারণায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। শরিয়তের সকল বিধানই তিনি দৃঢ়তার সহিত পালন করিতেন। নমায্ কখন ও " কাজা "

করিতেন না। ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নমায্ আদায় করিতেন। রোজা কখনও ত্যাগ করেন নাই, জীবনে বহু হজ্জ্ করিয়াছিলেন ; যখন অর্থ-সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন, তখন নিয়মিত রূপে জাকাৎ আদায় করিতেন। তদ্ব্যতীত " ছাদকা ", দান, খায়রাত এত অধিক পরিমাণে আদায় করিতেন যে, কোনও প্রার্থীই তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইত না।

একদিনের ঘটনা এই যে, তিনি যখন খলিফা, কুফায় যখন তাঁহার রাজধানী, সমগ্র আরব, পারস্য, এরাক ও মেছের যখন তাঁহার শাসনাধীন, বয়তুল মাল তহবিল অর্থে-পরিপূর্ণ, তখন একজন বিদেশী 'মোছাফের' (প্রবাসী) কুফায় আগমন করিলেন। ঐ সময় এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের " দস্তরখান " এমন 'কোশাদা' ছিল যে, স্থানীয় এবং বিদেশীয় অসংখ্য 'মেহমান' (অতিথি) তাঁহাদের সঙ্গে দুই বেলা খানায় 'শরীক' (সঙ্গী) হইতেন। নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী দ্বারা অতিথি সৎকার করা হইত। মোছাফের মগরেবের নমাযের সময় কুফার জামে-মছজেদে গমন করিলেন। দেখিলেন, মছজেদের একটি থামের নিকট একজন লোক বসিয়া একটি ক্ষুদ্র পুটুলী হইতে কি জিনিষ বাহির করিতেছেন। উহা ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডে (ন্যাকড়ায়) বাঁধা ছিল। এফ্তারের সময় হইলে তিনি ঐ পুটুলীস্থ খানিক চূর্ণ মুখে দিলেন। মোছাফেরকে নিকটে দেখিয়া বলিলেন, "মিঞা! একটু খাইবে, এই লও " বলিয়া খানিকটা চূর্ণ বা গুঁড়া তাঁহার হাতে দিলেন। মোছাফের তাহা গলাধঃ করিয়া জানিলেন উহা শুষ্ক খোরমা-চূর্ণ ; কিন্তু অনেক দিনের পুরাতন বলিয়া তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট। তিনি অতি কষ্টে উহা উদরস্থ করিয়া ভাবিলেন, আহা! এই লোকটি কি গরীব। দরিদ্রতা বশতঃ এই পুরাতন খোরমা-চূর্ণ দ্বারা এফ্তার করিলেন। আমরা এমাম ছাহেবদিগের দস্তরখানে কত উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য উদরস্থ করিতেছি, যদি এই গরীব ব্যক্তিকে সেই দস্তরখানে লইয়া

গিয়া কিছু খাওয়ান যাইত, তবে বড় ভাল কাজ হইত। আমি মহামান্য এমাম ছাহেবদিগকে এই কথা বলিব। তদনুসারে নমায্ শেষ করিয়া তিনি মোছাফের খানায় গমন করিলেন; এবং নৈশ-আহারকালীন এমাম ভ্রাতৃ-যুগলকে বলিলেন, হুজুর! আজ এই স্থানীয় জুমা-মছজেদে মগ্রেবের নমাযের সময় দেখিলাম, একজন অতি দীন-দরিদ্র মোছলমান পুরাতন ও তিক্ত খোরমা-চূর্ণ দ্বারা এফ্তার করিতেছেন, তিনি আমাকে ঐ চূর্ণ খানিকটা খাইতে দিয়াছিলেন; তিক্ত ও বিস্বাদ বলিয়া আমি অতি কষ্টে তাহা গলাধঃ করিয়াছিলাম। আমরা এত উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যে রসনা পরিতৃপ্ত ও উদর পূর্ণ করিতেছি; ঐ গরীব লোকটিকে ডাকিয়া আমাদের সঙ্গে আহার করাইলে হয় না? তখন এমাম ছাহেবদ্বয় ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, হে ভদ্র আগন্তুক! আপনি কি সেই ব্যক্তিকে চিনিতে পারেন নাই? তিনিই যে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতা আমিরুল মুমেনিন খলিফাতুল মোছলেমিন শেরে খোদা হজরত আলী মরতুজা (কঃ—ওঃ)। তিনি সর্ব্বদা রোজা পালন করেন, ঐরূপ সামান্য খোরমার ছাতু বা অন্য সামান্য জিনিষ দ্বারা এফ্তার করেন, এবং অতি মামুলী খাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন। এই সকল রসনা-তৃপ্তিকর উপাদেয় খাদ্য, বিশেষ কোনও ঘটনা বশতঃ তিনি ক্বচিৎ খাইয়া থাকেন। দূরদেশী প্রবাসী এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; আর মহামান্য খলিফার প্রতি তাঁহার বিমল ভক্তি-স্রোত প্রবল ভাবে উছলিয়া উঠিল।

মহামান্য হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ), হেজরতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মক্কা-মোয়াজ্জমায় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পরিবার ভুক্ত ছিলেন; তাঁহার অন্ন-বস্ত্র আঁ হজরত (ছালঃ)ই যোগাইতেন। তিনি নিজেও কিছু উপার্জ্জন করিয়া, নিজের অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ-পত্র চালাইতেন। যতদিন তাঁহার পিতা জীবিত ছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি স্বীয় স্নেহময় সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রকে কিছু

কিছু আর্থিক সাহায্যও করিতেন। ওম্মোল মুমেনিন হজরত খদিজা (রাঃ—আঃ) বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইলেও, তৎ সমস্ত আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং মাতৃস্বরূপিণী ওম্মোল-মুমেনিন ও তাঁহাকে অবশ্য পকেট খরচ বাবদ কিছু টাকাকড়ি দিতেন। স্থূলকথা, তাঁহার সে সময় কোনও রূপ অর্থকষ্ট হয় নাই। মহা-মাননীয়া মোছলেম-মাতা (রাঃ—আঃ) এর শেষ জীবনে কিছু অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হইয়া ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, আঁ হজরত (ছালঃ)-মোছলেম-মাতার বিপুল ঐশ্বর্য্য রাশি এছলাম ধর্ম্ম-প্রচারে ও দীন-দরিদ্রের অভাব মোচনে প্রায় নিঃশেষিত করিয়া ছিলেন। মোছলেম-মাতা (রাঃ—আঃ)-এর মৃত্যুর পর আঁ হজরত (ছালঃ)-এর অবস্থা যে সচ্ছল ছিল না, তাহা তদীয় জীবন চরিত পাঠে জানা যায়। তবে সাংসারিক খরচ-পত্র নির্ব্বাহের জন্য অর্থের অভাব ও হয় নাই। হেজরতের পর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যখন মদীনায় গমন করিলেন, তখন তাঁহার অর্থাভাব হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। সময় সময় বয়তুল মাল হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাই-তেন। তখনও বয়তুলমালে বেশী অর্থ সঞ্চিত হইত না। বিবাহের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত তাঁহার এই অবস্থা ছিল। বিবাহের পরেও সচ্ছল অবস্থা ছিল না। সময় সময় কায়িক পরিশ্রম করিয়াও অর্থোপার্জ্জন এবং তদ্দারা কষ্টে-সৃষ্টে জীমনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। আঁ হজরত (ছালঃ) এবং স্বর্গ-রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরা (রাঃ—আঃ)-এর জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পরিবারে লোক সংখ্যা ও বেশী ছিল না। স্বামী-স্ত্রী, দুই পুত্র এবং দুই কন্যা। সময় সময় একটি পরিচারিকা থাকিত। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পরলোক গমনের পর, যখন খেলাফতের 'যমানাঃ' (সময়) আসিল; মোছলমান বীর-বৃন্দের দ্বারা নূতন নূতন দেশ জয় এবং বয়তুল মালে বিপুল অর্থরাশি আসিতে লাগিল, তখন মহামান্য খলিফার মন্ত্রণা-সভার সভ্যগণ এবং মদীনাস্থ অন্যান্য

ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) গণ বয়তুলমাল হইতে যে পরিমাণ অর্থ পাইতে লাগিলেন, তদ্বারা তাঁহাদের আর অর্থাভাব রহিল না। অধিকাংশ ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ই যুদ্ধোপলক্ষে শাম, এরাক, পারস্য ও মেছেরে চলিয়া গিয়াছিলেন ; তাঁহারাও যুদ্ধ-জয়-লব্ধ অর্থ ও সামগ্রী-সম্ভার হইতে যে পরিমাণ অংশ প্রাপ্ত হইতেন, তাহাও প্রচুর ছিল। স্বর্গের মহারাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাজিঃ)-এর পরলোক গমনের পর এমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাহ হইল, মহামান্য আমিরুল মুমেনিন অন্যান্য বিবাহ করিলেন ; পুত্র, পৌত্র, পৌত্রী প্রভৃতিতে তাঁহার সংসার ভরপূর হইল, লোক-সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল, দাস-দাসীর ও অভাব রহিল না ; সুতরাং সেই পরিমাণে খরচ-পত্র ও অনেক বাড়িয়া ছিল ; কিন্তু তাই বলিয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ), অতিরিক্ত খরচ-পত্র করিতেন না। 'মামুলী' ভাবেই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বিলাসিতার কোন চিহ্ন তাঁহার গৃহে দৃষ্ট হইত না। দান-দাতব্যে তাঁহার বহু অর্থ ব্যয়িত হইত। দরিদ্রের দুঃখ মোচনে তাঁহার হস্ত সর্ব্বদা মুক্ত ছিল। সে বিষয়ে তিনি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ পদানুসরণ করিতেন। পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। তাঁহার পুত্র-কন্যাগণের মধ্যেও সেই গুণ পূর্ণভাবে বিরাজ করিত।

তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শাহাদতের পর তিনিই খলিফা পদের সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম পুরুষ ছিলেন। কি প্রাথমিক এছলাম গ্রহণে, কি হজরতের পিতৃব্যপুত্র ও তাঁহার প্রিয়তম জামাতা বলিয়া, কি ধর্ম্মানুরাগে, কি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আদর্শ চরিত্রে, কি অসাধারণ জ্ঞান-গরিমা ও এবাদৎ-বন্দেগীতে, কি অসাধারণ বীরত্ব ও শৌর্য্য বীর্য্যে—সকল দিক্ দিয়াই তিনি ৪র্থ খলিফার স্থান অধিকার করিবার যোগ্যপাত্র ছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সর্ব্ব প্রধান ছাহাবাঃ (ইয়ার) চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনি অন্যতম। সুতরাং খেলাফতের দাবী তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য

ছিল। 'আশরায় মোবাশ্বরা' দিগের মধ্যে হজরত আবু ওবেদা-বিন্-জার্রাহ (রাজিঃ), হজরত আবতুর রহমান-বিন্-য়য়োফ (রাজিঃ), হজরত ছয়ীদ (রাজিঃ) এবং ১ম, ২য় ও ৩য় খলিফা ইতিপূর্ব্বেই পরলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন; ১০ জনের: মধ্যে ৬ জন জীবনের পরপারে চলিয়া গিয়াছিলেন; বাকী ছিলেন (১) হজরত আলী (কঃ—ওঃ), (২) হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ), (৩) হজরত যোবের (রাজিঃ) ও (৪) হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওক্কাছ (রাজিঃ)। কিন্তু সকল দিক্ দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনিই সেই সময় খলিফা-পদের সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য পাত্র ছিলেন। হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-কে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যখন খলিফার পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; তখন তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে আপনাদের অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যে খলিফার প্রকৃত হক্‌দার ছিলেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর তাঁহার খেলাফৎ কালও প্রকৃত খেলাফৎ এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তৎপরেই ব্যক্তিগত খেলাফৎ বা রাজতন্ত্রের আবির্ভাব। এছলামী গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব কাল ছিল ৩০ বৎসর। তন্মধ্যে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ ৬ মাস ধরা হয়।

হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহুর আহ্‌লিয়া (স্ত্রী) ও সন্তান-সন্ততিগণ।

ঐতিহাসিকদিগের মতে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সর্ব্বশুদ্ধ ৯টি বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের গর্ভে ১৪টী পুত্র সন্তান ও ১৭টি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।

১। তাঁহার প্রথমা পত্নী হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর সর্ব্ব কনিষ্ঠা দুহিতা-রত্ন, স্বর্গের মহারাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ জোহরাঃ রাজিঃ আল্লাহ আন্‌হার গর্ভে ২টী আদর্শ ধর্ম্মপ্রাণ " এমাম " উপাধিধারী পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছায়েন (রাজিঃ)। আর কন্যা দ্বয়ের নাম হজরত জয়নব (রাঃ—আঃ) ও হজরত কুলছুম (রাঃ—আঃ)। হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ জোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবিত কালে তিনি অন্য বিবাহ করেন নাই।

২। ওম্মোল বনিন বিন্তে হরাম কলাবিয়া। ইঁনি নর-পিশাচ শেমর যিল যোশনের ভগিনী ছিলেন। ইহার গর্ভে হজরত আব্বাছ, হজরত জাফর, হজরত আবদুল্লা ও হজরত ওছমান এই চারিটি ধুরন্ধর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩। লায়লী-বিন্তে-মছউদ-বিন্‌-খালেদ (রাঃ—আঃ); ইহার গর্ভে হজরত ওবায়দুল্লাহ্‌ ও হজরত আবুবকর নামক দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

৪। আছমাঃ-বিন্তে-য়্যামিছ (রাঃ—আঃ); ইঁহার গর্ভে হজরত মোহাম্মদন আল্‌ আছগর ও হজরত ইয়াহ্‌ইয়ার জন্ম হয়। উপরোক্ত ৮ ভ্রাতা কারবালার মহাযুদ্ধে, আপনাদের পরম শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হজরত এমাম হোছায়েন রাজি আল্লাহ আন্‌হুর সঙ্গে শহীদ হইয়াছিলেন।

৫। এমামাঃ-বিন্তে-আবিল আছ-বিন্‌-আর-রবিয় (রাঃ—আঃ)। ইঁহার মাতা হজরত জয়নব (রাঃ—আঃ) বিন্তে-হজরত রছুলোল্লাহ্‌ (ছালঃ) অর্থাৎ—ইঁনি হজরত নবী করিম (ছালঃ)-এর দৌহিত্রী ছিলেন। ইঁহার গর্ভে মোহাম্মদনল্‌ আওছত নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৬। খুলা-বিন্তে-জাফর (রাঃ—আঃ); ইঁহার সঙ্গে 'হান্‌ফিয়া' বংশের সম্বন্ধ ছিল। ইঁহার গর্ভে একটি মাত্র মহাপরাক্রান্ত বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার নাম মোহাম্মদনল্‌ আকবর—সাধারণতঃ

ইঁনি মোহাম্মদ বিনল্ হানাফিয়া (হানিফাঃ) নামে অভিহিত হইতেন। কারবালার যুদ্ধে ইঁনি উপস্থিত ছিলেন না।

৭। ছহবাঃ বিন্তে রবিয়া তগ্‌লবিয়াঃ (রাঃ—আঃ)। ইঁহার গর্ভে ওম্মোল হাছন কোব্‌রা নামক পুত্র ও ওম্মে কোলছুম ছোগ্‌রা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়।

৮। বিন্তে ওমরা-আল্ কয়েছ-বিন্-আদি কল্‌বি (রাঃ—আঃ)। ইঁহার গর্ভে একটী কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশব কালেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন।

৯। একটী পত্নী ক্রীতদাসী বলিয়া কথিত। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে ইঁহার একমাত্র পুত্র মোহাম্মদ আছগর কারবালার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন।

হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর আরও কয়েকটি কন্যা সন্তান ছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, কিন্তু তাঁহাদের নাম জানা যায় না। অওন-বিন্-আলী নামক তাঁহার একটী পুত্রের নাম জানা যায়; তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি আছমাঃ-বিন্তে য়্যামিছ (রাঃ—আঃ)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪র্থ খলিফা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বংশ-তরু কেবলমাত্র নিম্ন-লিখিত ৫টি পুত্র হইতে এযাবৎ দুনিয়াতে বিদ্যমান আছে। (১) হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), (২) হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ), (৩) হজরত মোহাম্মদ-বিন্-হানিফাঃ, (৪) হজরত আব্বাছ (৫) হজরত ওমর। পূর্ব্বোক্ত ৫টি পুত্রের সন্তান-সন্ততি হইতে পৃথিবীতে মহা সম্মানিত ছৈয়দগণ বিদ্যমান আছেন। তন্মধ্যে এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের বংশধরগণই খাঁটি ছৈয়দ, ইঁহারা হাছনী ও হোছায়নী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অকৃত্রিম ‘কুর্ছীনামা’ (বংশ-তালিকা)

ব্যতীত ছৈয়দ বংশ স্থির করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইঁহাদের বংশ বৃদ্ধি ও অসাধারণ রূপে হইয়াছিল। কারবালার যুদ্ধে এবং তৎপর অন্যান্য ঘটনায় অধিকাংশ ছৈয়দ শহীদ না হইলে, আজ ইঁহাদের বংশ আরও অধিক পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিত। পৃথিবীর সকল অংশেই এই বংশের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। অথচ হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) ও বনি-ওম্মিয়ার অন্যান্য খলিফার বংশধরগণের অস্তিত্ব প্রায়ই দেখা যায় না। খাঁটি ও আদর্শ ছৈয়দ বংশের উপর আল্লাহ তা-লার অপার করুণা সর্ব্বদাই বর্ষিত হইয়া থাকে; কারণ তাঁহারাই মহামান্য মহানবীর প্রকৃত বংশধর।

প্রার্থনা

হে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তালা! তুমি নবী-বংশের—হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ-যোহরা (রাঃ—আঃ) ও হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর শুভ দোওয়া, সকল মোছলমানের উপর বর্ষণ কর। শাহাদৎ-প্রাপ্ত মহাপুরুষদিগের পবিত্র শোণিতের পরিবর্ত্তে, ছুনিয়ার সকল মোছলমানকে মুক্তি-পথের পান্থ কর।

তৃতীয় ভাগ।

খাতুনে জন্নত

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ

(রাঃ—আঃ)-এর জীবনী।

এই স্থানে যাঁহার জীবনী লিখিত হইতেছে, তিনি দুনিয়ার সমুদয় নারীর শিরোভূষণ, বেহেশ্‌তের রাজ্ঞী, হজরত রছুলোল্লাহ্‌ (ছালঃ)-এর পরম স্নেহের আঁধার কনিষ্ঠা নন্দিনী, আদর্শ ধর্ম্ম-পরায়ণা, আদর্শ কন্যা, আদর্শ পত্নী ও আদর্শ জননী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)। তাঁহার সঙ্গে দুনিয়ার কোনও নারীর তুলনা হয় না। তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ, পিতৃ-ভক্তি ও স্বামী সেবা-অতুলনীয় ছিল। তিনি যেমন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের ঔরসে ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন।

ওম্মোল মুমেনিন হজরত খদিজাতুল কোব্‌রাঃ-(রাঃ—আঃ) বিন্তে খোয়েল্‌দ বিন্‌-আসদ, বিন্‌-আবদুল গরে, বিন্‌-কুচ্ছি, খাতুনে জন্নতের মহা-माননীয়া গর্ব্ভ-ধারিণী। এই কুচ্ছি আঁ হজরতের (ছালঃ)-এর 'মওরছে

আলা' (ঊর্দ্ধতন পূর্ব্ব পুরুষ)। সুতরাং আঁ হজরত (ছালঃ) ও তাঁহার সর্ব্ব গুণালঙ্কৃতা আদর্শ পত্নী একই পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ওম্মোল মুমেনিন হজরত খদিজাতুল কোব্‌রাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পূর্ব্ব পুরুষের সঙ্গে একত্র মিলিয়া গিয়াছে। আবার ওম্মোল মুমেনিন হজরত খদিজাতুল কোব্‌রাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'শেজরাঃ-নছব' (বংশ-তালিকা) মায়ের দিক্ দিয়া এইরূপ—হজরত খদিজাঃ, (রাঃ—আঃ) বিন্তে ফাতেমাঃ, বিন্তে-যায়েদাঃ-বিন্ আলা ছলয়ম বিন্ হরম বিন্-রওয়াজাঃ-বিন্-মজর-বিন্ আবদ্-বিন্-ময়য়িছ-বিন্-আমের তোলি। সুতরাং তাঁহার মাতৃপক্ষ ও অতি শরীফ্ ছিলেন। মায়ের দিক্ দিয়া দশম পুরুষ, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পূর্ব্ব পুরুষের সঙ্গে যাইয়া মিলিত হইয়াছে। সুতরাং মহামাননীয়া ওম্মোল মুমেনিন হজরত খদিজাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ)-এর পিতৃ-মাতৃ উভয় দিকই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর একই বংশ; অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই স্বনামখ্যাত পয়গম্বর হজরত এছমাইল (আলাঃ)-এর বংশ হইতে উৎপন্ন। এই বংশ-তালিকা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হজরত খদিজাতুন কোব্‌রাঃ (রাঃ—আঃ) 'নজিবত্ তোরফায়েন' ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলই মহা সম্মানিত সম্ভ্রান্ত বংশ হইতে উদ্ভূত।

হজরত খদিজাঃতুল কোব্‌রার জন্ম ৫৫৫ খৃঃ অব্দ এবং ৫৭ কছরবী সনে হইয়াছিল। তিনি প্রথম হইতেই সচ্চরিত্রা ও সর্ব্বগুণের আধার ছিলেন। ঐ অন্ধকার যুগেও তিনি "তাহেরাঃ" (পাক—পবিত্রা) নামে অভিহিতা হইতেন। 'ছেয়াদত' (বোযর্গী—সম্মান) ও 'শরাফত' (সৌজন্য—ভদ্র ব্যবহার)-এর জন্য তাঁহাকে কোরেশদিগের "ছৈয়দতন্নেছা"—এই গৌরব জনক উপাধী প্রদান করা হইয়াছিল। তাঁহার পিতা খোয়েলদ্ ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত ধন উপার্জ্জনা করিয়াছিলেম; এজন্য

মক্কা নগরীতে তিনি "আমিরুল-ওমরা" বলিয়া অভিহিত হইতেন। এছলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে—অন্ধকার-যুগে এই আদর্শ মহিলার বিবাহ যরারাঃ এতিমির পুত্র নেয়াশের সঙ্গে সম্পন্ন হইয়াছিল; এই ব্যক্তি আবু হালাঃ নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। ইহার ঔরসে বিবী খদিজার দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে; তন্মধ্যে একটীর নাম হালাঃ; এই বালক 'যামানাঃ-জাহেলিয়তে' (অন্ধকার যুগে)ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; দ্বিতীয় পুত্র হেন্দ্ হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর নবুয়ত কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া, ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের পর্য্যায়ভুক্ত হন। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর, আতিক্-বিন্-আয়েদ মখ্‌রুমির সঙ্গে হজরত বিবী খদিজাঃ (রাঃ—আঃ)-এর দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়। এই পক্ষে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আতিকের মৃত্যুর পর এই পবিত্র চরিত্রা মহিলা কিয়ংকাল বৈধব্য দশায় ছিলেন। এই সময় তাঁহার পিতা খোয়েলদ্ অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; এজন্য ব্যবসা-বাণিজ্য কার্য্য নিজে সম্পাদন করিতে পারিতেন না; সুতরাং তাঁহার সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা ও বিশেষ বুদ্ধি-সম্পন্না কন্যা-রত্নই সেই বিরাট বাণিজ্য কার্য্যের সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধান ও সমাধান করিতেন। তাঁহার বাণিজ্য দ্রব্য বোঝাই হইয়া উষ্ট্র সকল নানা দূরদেশে গমন করিত। আবার সেই সকল স্থানের বাণিজ্য দ্রব্য মক্কায় আনিয়া বিক্রয় করা হইত। সুতরাং তাঁহার এই বাণিজ্য কার্য্য পরিচালন জন্য উপযুক্ত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর প্রয়োজন ছিল। এই বুদ্ধিমতী মহিলা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ)-এর বিশ্বস্ততা ও গুণ-গরিমার বিষয় বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন; সুতরাং তিনি তাঁহাকেই স্বীয় প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। একাধিক বার বাণিজ্য যাত্রায় পাঠাইয়া, হজরত খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) দেখিতে পাইলেন যে, এই চরিত্রবান্, সুযোগ্য বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে—যেরূপ উন্নতি

অন্যান্য কর্ম্মচারীর পরিচালনাধীনে ইতিপূর্ব্বে হয় নাই। তিনি স্ত্রীলোক, এবং বিধবা; সুতরাং পুনঃ স্বামী গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য; তবেই তাঁহার নিজের যেমন একটা আশ্রয় হইবে, তেমনই এই বিরাট কারবারেরও ক্রমোন্নতি সাধন হইতে থাকিবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি এই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, সচ্চরিত্র ও বিশ্বস্ত তরুণ যুবক কর্ম্মচারীকেই স্বামীত্বে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তদনুসারে তিনি নিজের পক্ষ হইতে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট বিবাহের 'পয়গাম' (প্রস্তাব) পাঠাইলেন। সেই প্রস্তাবে ইহাও বলা হইল যে, আপনার ধর্ম্মভীরুতা, বিশ্বস্ততা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও যোগ্যতা, আমার মন আপনার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে; বিশেষতঃ আমাদের পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে আত্মীয়তার সম্বন্ধ ও রহিয়াছে। অর্থাৎ আমি আপনার জদ্দে-আলা (ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষ) কাছির (কোসাই এর) পৌত্র আছদের পৌত্রী ও খোয়েলদের পুত্রী। পয়গম্বর খোদা (ছালঃ) এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া স্বীয় প্রতিপালক ও পিতৃস্থানীয় পিতৃব্য-আবুতালেবের নিকট এ সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিবী খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) অতি সঙ্গতিপন্ন, অতি উচ্চ কোরেশ বংশীয়া বুদ্ধিমতী সদগুণ সম্পন্না এবং আদর্শ সুন্দরী নারী ছিলেন। আবুতালেব মনে মনে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখিলেন, স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত পাত্রী পাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। এই বিবাহ সকল দিক্ দিয়াই সুবিধাজনক; এবং সর্ব্ববিধ স্বার্থ ও সুযোগের অনুকূল। তদনুসারে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, এ বিবাহ করা তোমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এই বিবাহে তোমার সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়িবে, অর্থাভাব দূর হইবে, সর্ব্বপ্রকারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। এই বিবাহ দ্বারা তোমার সর্ব্ব প্রকার পার্থিব মঙ্গল সাধিত হইবে। (হজরত) খদিজাঃ (রাঃ—আঃ)

নিজেও একজন অতি বুদ্ধিমতী ও সর্ব্ব গুণালঙ্কৃতা মহিলা। মক্কার সর্ব্বত্র তাঁহার প্রশংসাবাদ শ্রুত হওয়া যায়। পিতৃব্যের যুক্তিপূর্ণ পরামর্শানুসারে আঁ হজরত (ছালঃ) এই বিবাহে সম্মতি দান করিলেন। অবিলম্বে বিবাহের কথাবার্ত্তা ও দিন তারিখ স্থির হইয়া গেল। তদনুসারে আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় পিতৃব্য আবুতালেব, হজরত হামযাঃ এবং অন্যান্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত কোরেশ বরযাত্রী সহ বিবী খদিজাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হইলেন। বিবী ছাহেবার অতি বৃদ্ধ পিতা খোয়েলদ্ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই স্থানে ঐতিহাসিক দিগের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই বলেন, এই বিবাহের সময় খোয়েলদ্ জীবিত ছিলেন না; তৎপূর্ব্বেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল্লামা ইব্নে আছির (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, বিবী খদিজাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পিতৃব্য ওমরু বিন্-আছদ ওলী হইয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার পিতা খোয়েল্দের ইতিপূর্ব্বেই পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। " ছিরাতুন্নবুইয়া " গ্রন্থে এই বিবাহের বিবরণ এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, যখন হজরত রছুল করিম (ছালঃ) শামের বাণিজ্য যাত্রা হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন বিবী খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) স্বীয় একজন 'লওণ্ডি' (ক্রীতদাসী) তাঁহার নিকট এই উদ্দেশ্যে পাঠাইলেন যে, সে যেন হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-কে বিবাহ সম্বন্ধে 'তরগিব্' দেয় (উৎসাহিত করে)। তদনুসারে পরিচারিকা আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনি কি আমাদের কর্ত্রীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমার নিকট এই বিবাহের উপযুক্ত অর্থ কোথায়? দ্বিতীয়তঃ বিবী খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) একজন প্রভূত অর্থশালিনী মহিলা, হয় ত আমার দরিদ্রতা নিবন্ধন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে। দাসী বলিল,

আপনি এ সকল বিষয়ের জন্য চিন্তা করিবেন না। বিবী ছাহেবার পক্ষ হইতে বিবাহের সম্মতি গ্রহণ করা আমার 'যেম্মায়' রহিল, আমি এ বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অতঃপর দাসী হজরত খদিজা (রাঃ—আঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। তচ্ছ্রবণে তিনি বলিলেন, তুমি তাঁহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। দাসী তদনুসারে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে গিয়া, তাঁহাকে বিবী ছাহেবার নিকট ডাকিয়া আনিল। তিনি হজরত খদিজাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলে, বিবী ছাহেবা বলিলেন, আপনার সহিত আমার বিবাহের এই জন্য 'রগ্‌বত্‌' (ইচ্ছা—আকাঙ্ক্ষা) হইয়াছে যে, আপনার অতুলনীয় 'আখ্‌লাকে' (সৌজন্যে—শিষ্টতায়—ভদ্রতায়) আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আপনার আদর্শ কার্য্য-কলাপ ও সততায় আমাকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে; মোয়ামেলাত (বৈষয়িক কার্য্যে—বাণিজ্য-ব্যবসা সম্বন্ধীয় বিশ্বস্ততা গুণ)-এর 'ছাফাই' (হিসাব-পত্রের বিশুদ্ধতা) আমার অত্যন্ত সন্তুষ্টি বিধান করিয়াছে। হজরত খদিজাঃ (রাঃ—আঃ)-এর এই সকল কথা, আঁ হজরত (ছালঃ) আসিয়া স্বীয় পিতৃব্য আবুতালেবকে বলিলেন। তিনি এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ওদিকে হজরত খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) স্বীয় চাচ্চা ওমরু-বিন্‌-আছদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্ববংশ ও স্বগোত্রের প্রধান প্রধান লোকদিগকেও আহ্বান করিলেন। আবুতালের ওমরু-বিন্‌-আছদের নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; ওমরু তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। ২০টি উষ্ট্র মোহর নির্দ্দিষ্ট হইল। আবুতালেব বিবাহের খোতবাঃ পড়িলেন। খোত্‌বার পরে বিবী-খদিজা (রাঃ—আঃ)-এর 'চাচ্চাযাদ ভাই' (পিতৃব্যপুত্র) ওরক্কা-বিন্‌-নওফল একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ইজাব ও কবুলের

পরে এই পবিত্র বিবাহের সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইল। ঐ সময় ওম্মোল মুমেনিন (বিশ্বাসীদিগের মাতা বা মোছলমানদিগের মাতা)-এর বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর, এবং আমাদের হজরত রছুল মকবুল (ছালঃ)-এর বয়স কম ও বেশ ২৫ বৎসর ছিল। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে প্রথম বিবাহের গৌরব এই মহামহিমান্বিতা মহিলাই লাভ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে হজরত রছুল আকরম (ছালঃ) অপর কোনও মহিলার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন না। নিঃসন্দেহ এই বিশেষ সম্মান ও গৌরব তাঁহার জন্য খাছ (বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট) ছিল। এই বিশেষ সম্মান ও গৌরব 'আয্‌ওয়াজ মতহরাত' (আঁ হজরতের সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ মোছলেম-মাতা) দিগের মধ্যে কাহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই। ওম্মোল মুমেনিন হজরত খদিজাতুল কোব্‌রার গর্ভে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ৭টি পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৩টি ছাহেবা যাদাঃ (পুত্র) ও ৪টি ছাহেব যাদী (কন্যা)। তাঁহাদের নাম এই :—

১। যয়নব, ২। রক্কিয়া, ৩। ওম্মে-কলছুম, ৪। ফতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) এই ৪টি কন্যা ; আর ১। কাছেম, ২। তাহেরও, ৩। আবদুল্লা—এই ৩টি পুত্র। হজরত রছুল মকবুল (ছালঃ), ছাহেব যাদাঃ কাছেমের নামে স্বীয় 'কুনিয়াত' আবুল কাছেম (কাছেমের পিতা) রাখিয়াছিলেন। ছাহেবযাদাঃ দিগের মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ কাছেম, এবং ছাহেবযাদী দিগের মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা যয়নব ছিলেন। ৩ ছাহেবযাদাঃ ও ৩ ছাহেবযাদী, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'যমানাঃ বয়ছত (পয়গম্বরী লাভ)-এর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; আর তিন ছাহেবযাদাই হুজুর আনওর (ছালঃ)-এর পয়গম্বরী লাভের পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। অবশ্য ছাহেবযাদিগণ নবুয়তের পবিত্র 'যমানাঃ' (কাল) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন ; এবং সকলের ভাগ্যেই পবিত্র ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ

ঘটিয়াছিল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠা বিবী যয়নব, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র বিবাহের ৫ বৎসর পরে, অর্থাৎ হুজুর (ছালঃ)-এর ৩০ বৎসর বয়সের সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবুল আছ-বিন্-আর রবিয় এর সঙ্গে ইঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এই যুবক হজরত খদিজাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'হকিকী' (সাক্ষাৎ) "ভাঞ্জে" (ভগিনী-পুত্র) ছিলেন। বিবী যয়নবের গর্ভে আবুল আছের একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে; পুত্রের নাম আলী ও কন্যার নাম এমামাঃ ছিল। আলী বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পুর্ব্বেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়; আর মহামাননীয়া ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর এন্তেকালের পর হজরত আলী (কঃ—ওঃ), বিবী এমামাঃ (রাঃ—আঃ)-কে বিবাহ করেন। কিন্তু যখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) শহীদ হইলেন, তখন মগিরাঃ-বিন্-নওফল-বিন্ হারেছের সঙ্গে ইঁহার 'নেকাহ্ ছানী' (দ্বিতীয় বিবাহ) হইয়াছিল। আর তাঁহার ঔরসে ইয়াহ্ইয়া নামক এক সুপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবী রক্কিয়া (রাঃ—আঃ) ও বিবী ওম্মে কলছুম (রাঃ—আঃ)-এর প্রথমবার বিবাহ হজরত পয়গম্বর (ছালঃ)-এর চাচ্চা আবুলহবের দুই পুত্রের সঙ্গে সম্পাদিত হইয়াছিল; পরে উভয় ছাহেবযাদির বিবাহ 'একে বাদ দিগর' (একজনের মৃত্যুতে অপরের) হজরত ওছমান-বিন্-আফ্ফান (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সম্পন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রথমে হজরত রক্কিয়া (রাঃ—আঃ)-কে হজরত ওছমান জিন্নূরায়েন (রাজিঃ) বিবাহ করেন; তাঁহার মৃত্যু হইলে—হজরত ওম্মে কলছুম (রাঃ—আঃ)-কে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন। হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর ঔরসে হজরত রক্কিয়া (রাঃ—আঃ)-এর আবদুল্লা নামক একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই বালক ৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। এই পুত্রের জন্যই হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ)-এর 'কুনিয়েত' ছিল আবি-আবদুল্লাহ্।

হজরত ওম্মে কলছুম (রাঃ—আঃ)-এর গর্ভে কোন সন্তান জন্মিয়াছিল না। আঁ হজরতের ৪র্থ অর্থাৎ সর্ব্বকনিষ্ঠা ছাহেবযাদীঃ ফাতেমাতয্ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ছিলেন ; তাঁহারই জীবনী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইল। ইঁনি ব্যতীত আঁ হজরত (ছালঃ)-এর কোনও ছাহেবযাদীর 'নছল' (বংশ-তরু) দুনিয়াতে অবশিষ্ট থাকে নাই। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নবুয়তের ১০ম বৎসর—অর্থাৎ হেজরতের ৩ বৎসর পূর্ব্বে, পবিত্র রমজান মাসে, হজরত খদিজাঃ রাজিঃ আল্লাহ আন্‌হার পবিত্র জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছিল (ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না এলায়হে রাযেঊন)।

স্বর্গের সম্রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)।

অতঃপর যাঁহার পবিত্র জীবনী লেখা হইতেছে, তিনি দুনিয়াতে মহিলা কুলের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য নারী কুলের আদর্শ। তাঁহার পবিত্র জীবন অতি পবিত্র ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার মহা-মাননীয় ওয়ালেদ মাজেদ যেমন মনুষ্যদিগের মধ্যে—এমন কি, ফেরেশ্‌তা, জ্বেন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দৃশ্য ও অদৃশ্য জীবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ; মহামান্য পয়গম্বর (আলাঃ) গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন ; তাপস কুলের শিরোভূষণ ছিলেন ; পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁলার একত্ববাদ প্রচারে, তাঁহার মহান্ গুণকীর্ত্তনে সর্ব্বশ্রেণী ছিলেন ; যাঁহার সঙ্গে তুলনা করিবার কেহই—কিছুই জগতে নাই ; তাঁহার প্রিয়তমা চতুর্থা কন্যা, তাঁহারই সম্পূর্ণ পদাঙ্কানুসরণকারিণী, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি, সর্ব্বগুণের আধার হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ও নারীকুলে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা

ছিলেন। তিনি উপাসনা আরাধনায় শ্রেষ্ঠতমা তাপসী, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণে তুলনা রহিত, পরম শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ মাজেদ এবং গুরুজনের আদেশ পালনে তৎপর, স্বামী সেবায় আদর্শ পতিব্রতা, সাংসারিক কার্য্যে আদর্শ গৃহিণী, সন্তান পালনে আদর্শ জননী, সকলের প্রতি স্নেহ-করুণ ব্যবহারে অতুলনীয়া, দীন-দুঃখীর প্রতি করুণা বর্ষণে অদ্বিতীয়া, নিজে না খাইয়া ক্ষুধাতুরা গরীব-গোর্‌বাকে অন্নদানে তৎপরা, লজ্জা ও শরমের সাক্ষাৎ প্রতি-মূর্ত্তি, আল্লাহ তা-লার ভয়ে সর্ব্বদা প্রকম্পিতা, তাঁহার প্রণয় লাভে সদা সমুৎসুক, মধুর ভাষিণী, ক্রোধাদি স্বীপু বর্জ্জিতা, সর্ব্ব বিষয়ে অনুপমা স্বর্গ-রাজ্ঞী ছিলেন। এজন্য তিনি "খাতুনে জন্নত" নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার পবিত্র জীবনী লিখিবার শক্তি এ অধমের কোথায়? বড় বড় ঐতিহাসিক, বড় বড় আলেম, বড় বড় গ্রন্থকার আরবী-পারসী ও উর্দ্দূ প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার বিস্তৃত জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। এই সঙ্কীর্ণ স্থানে তাঁহার পবিত্র জীবনী বিশদ ভাবে লিখিবার স্থানাভাব। পুত্রহীন মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাল্লঃ)-এর সমুদয় সদ্‌গুণাবলী তাঁহার এই অতি প্রিয়—অতি স্নেহাস্পদ তনয়া-রত্নের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যদি নারী জাতিকে পয়গম্বরী প্রদান করা বিধাতার বিধান হইত এবং আঁ হজরত (ছালঃ)-এর উপর নবুয়ত 'খতম' (শেষ) না হইত, তবে স্বর্গের মহারাজ্ঞী সেইস্থান অবশ্যই অধিকার করিতেন।

এই সর্ব্ব গুণালঙ্কৃতা আদর্শ মহিলার জন্ম দিন দুনিয়াতে বিশেষ ভাবে গৌরবান্বিত। সেদিন মানুষ, পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু, নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, বৃক্ষ-লতা, ফুল-ফল ইত্যাদি সমস্তই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। এই স্বর্গীয়া বালিকার নাম রাখা হইয়াছিল ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)। ইঁহার 'নজিবত্তোরফায়েন' হওয়া সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহের "গোঞ্জায়েশ" নাই। মাতার পরিচয় ত ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে; পিতার পরিচয়

আর কি দেওয়া হইবে? খোদাতালার সৃষ্ট সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মানব, ফখরে আম্বিয়া, সর্ব্ব শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্‌মদ মজতবাঃ (ছালঃ) ইঁহার পিতা।

যখন আঁ হজরত (ছালঃ) মক্কাবাসীদিগের মধ্যে তওহিদের পবিত্র বাণী ঘোষণা করিতেছিলেন, কোরেশগণ তাঁহার প্রাণের বৈরী হইয়াছিল, কোরেশগণ তাঁহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতেছিল, তাঁহার মুষ্টিমেয় ছাহাবাঃ (রাঁজিঃ)-গণ শত্রুদল কর্ত্তৃক নানারূপে নির্য্যাতিত হইতে ছিলেন, এছলাম-সূর্য্য দুনিয়াতে তরুণ অরুণবৎ উদিত হইয়াছিল, সেই স্মরণীয় সময়ে এই স্বর্গের রাজ্ঞী জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে শান্তিধারা প্রবাহিত করেন। তাঁহার জননীর তিনিই শেষ সন্তান। আঁ হজরতের নবুয়ত ঘোষণায়, কঠোর হৃদয় কোরেশগণের হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছিল; পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সত্যের বাণী ঘোষণা করাতে পৌত্তলিকদিগের হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল; তাহারা আজ হজরতের অস্তিত্ব দুনিয়া হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল; এই সময় তাঁহার প্রতি কোরেশদিগের সহানুভূতির লেশমাত্রও ছিল না; সুতরাং তাঁহার গৃহে পাড়া প্রতিবেশী এবং কোরেশ নারীদিগের যাতায়াত বন্ধ হইয়াছিল। কেহ তাঁহার ঘরের খোঁজও লইত না। এই অবস্থায় স্বর্গের মহারাজ্ঞী জন্মগ্রহণ করিলেন। জননীর বিপুল ঐশ্বর্য্য রাশি তদীয় পরম-শ্রদ্ধেয় জনক এছলাম প্রচারে, দীন-দরিদ্রের অভাব মোচনে ব্যয় করিয়া ফেলিয়া ছিলেন; সুতরাং এ সময় দাস-দাসীর সংখ্যা ও একেবারে হ্রাস পাইয়াছিল। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) স্বীয় জননীর জন্মগ্রহণ কালের অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত ফাতেমা যোহরাঃ (রাজিঃ)-এর প্রসব কালে হজরত ওম্মোল:মুমোনিন খদিজাতুল কোব্‌রার কোনওরূপ কষ্ট হয় নাই—যেমন অন্যান্য বালক বালিকার জন্মকালে

গর্ভধারিণী দিগের হইয়া থাকে। জন্মগ্রহণ করিবামাত্র হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ) তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া তদীয় পেশানীতে (কপালে) চুম্বন করিলেন ; এবং ইঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল জন্য দোওয়া ফরমাইলেন। ঐ দোওয়ার এই ফল হইল যে, দুনিয়ার কোনও স্ত্রীলোক গৌরবে ও সম্মানে তাঁহার সমতুল্য হন নাই।

৬১১ খৃঃ অব্দের ২০শে জমাদিওল-আখের (জমাদিয়ছ্-ছানী) পবিত্র জুমার দিন প্রত্যুষে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তখন হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৪১ এ পড়িয়াছিল। এই সময় পবিত্র কাবা-গৃহ নূতন ভাবে নির্ম্মিত হইতেছিল ; পবিত্র ঘটনার সামঞ্জস্য এই যে, এক দিকে খোদা তা-লার উপাসনার্থ নির্ম্মিত প্রথম ঘর পবিত্র কাবা গৃহ নূতন ভাবে নির্ম্মিত হইতেছিল ; আর এক দিকে দুনিয়ার নারী কুলের শ্রেষ্ঠা ও আদর্শ নারী, রছুল নন্দিনী ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তখন জন্মগ্রহণ করিলেন। *

---

* হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জন্মস্থান " ছুয়গব বনি-হাশেম "এ অবস্থিত। আজকাল ঐ স্থানে " শাশিদা " ও ছাবক্কল্লায়েল " মহাল্লা বিরাজিত। হজরত খদিজাতুল কোব্রা (রাঃ—আঃ)-এর গৃহ এক 'তঙ্গ্' (সঙ্কীর্ণ) গলির পাশে দৃষ্ট হয়। হজরত রছুল করিম (ছালঃ) বিবাহের পর হজরত খদিজাতুল কোব্রা (রাঃ—আঃ)-এর এই নিজ সম্পত্তি, উপরোক্ত গৃহে বাস করিতেন। হেজরতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই গৃহেই বাস করিয়াছিলেন। গৃহে দালান ও দরদালান আছে। হজরত ফাতেমাঃ-যোহরাঃ (রাঃ– আঃ)-এর জন্মস্থান ভূপৃষ্ঠ হইতে কিছু নিম্নে অবস্থিত। ঐ স্থান যেয়ারত করিবার জন্য ৬ খানি সিড়ি অতিক্রম করিয়া নীচে অবতরণ করিতে হয়। নীচে অবতরণ করিলে দক্ষিণ দিকে একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত 'কোব্বা' দেখিতে পাওয়া যায়।

একদিকে যেমন স্থপতি (ইমারতের মিস্ত্রি) গণ কাবাগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছিল; অন্যদিকে বিশ্ব-শিল্পী, হজরত ফাতেমাঃ যোহরার সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। ঘটনার অপূর্ব্ব বৈচিত্র!!

হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওকাছ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত ছরওয়ারে আলম (ছালঃ) ফরমাইতেন, জিবরাইল আলায়হেচ্ছালাম জন্নতের (বেহেশ্‌ত্‌ বা মোছলেম-স্বর্গের) একটি ছেব (আপেল ফল) আমার নিকট আনয়ন করিলেন;—যাহা আমি মেয়রাজের রাত্রিতে (বেহেশ্‌ত্‌ ভ্রমণকালে) দেখিয়াছিলাম। ঐ রাত্রিতেই (হজরত) খদিজাতুল কোবরাঃ (রাঃ—আঃ) আমার দ্বারা 'হামেলাঃ' (গর্ভবতী) হইলেন। সেই গর্ভেই ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) জন্মগ্রহণ করিল। অতঃপর যখনই আমাকে জন্নতের 'খোশবু' (সুগন্ধ) অনুভব করিবার

উহার উপর আজ কাল একটি অতি সুন্দর বুরুজ বিরাজ করিতেছে। তদুপরি সবুজ বনাতের অতি সুদৃশ্য 'গেলাফ্‌' (আস্তরণ) চড়ান আছে। উহার শিরোদেশে দেয়ালের সঙ্গে একটি আটা পিষিবার চাক্কি রাখা হইয়াছে; কথিত আছে, শৈশবকালে তিনি এই চাক্কিতে আটা পিষিতেন। উহারই 'দোছরা তরফ' (অপরাংশে) আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'খলুত খানাঃ' (নির্জ্জনে থাকিবার স্থান) ও এবাদতের পবিত্র হুজরা (যাহাকে "কবতহল ওহী" বলা হয়) বিরাজিত। উহার অতি নিকটেই আঁ হজরত (ছালঃ) এবং হজরত খদিজাতুল কোবরা (রাঃ—আঃ)-এর ওজু করিবার স্থান রহিয়াছে। এই সকল পবিত্র স্থানের পাকা-পোখ্‌তা নিদর্শনাবলী ওহাবী ছোলতান এব্‌নে ছউদের আদেশে, ওহাবী বর্ব্বরগণ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়াছে, পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন সমূহ প্রস্তর ও ইষ্টকের ঢেড়িতে পরিণত হইয়াছে।

ইচ্ছা হয়, তৎক্ষণাৎ ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'দহন' (মুখ—বদন শশী) সুঙ্গিয়া (ঘ্রাণ লইয়া) থাকি।

"মদারেজ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'ছনে বেলাদত' (জন্মের সন), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এক চল্লিশ বৎসর বয়সে—পয়গম্বরী লাভের পরবর্ত্তী সময় বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাস-বেত্তা এই মত সমর্থন করে না। 'কামালে হছন' অর্থাৎ অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য আঁ হজরত (ছালঃ), তাঁহাকে অনেক সময়ই, "যোহরাঃ" নামে অভিহিত করিতেন। হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর এই কয়টি 'লকব' (নাম বা উপাধী) বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ—(১) আল-বতুল; (২) ছৈয়দতন্নেছা; (৩) আফজলন্নেছা; (৪) খয়েরন্নেছা; (৫) আছ-ছিদ্দিকা; (৬) আয্-যোহরাঃ; (৭) আত-তাহেরাঃ; (৮) আল্-শরকিয়া; (৯) আল-রাজিয়া; (১০) আল্-মরজিয়া; (১১) আল্-মহদেছাঃ।

আমিরুল মুমেনিন খলিফাতুল মোছলেমিন হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাজিঃ)-কে বলিতেন; আমার দেলে (অন্তঃকরণে) খোদা তায়ালার পরে সর্ব্বাপেক্ষা 'মহবুব' (প্রিয়) আপনার ওয়ালেদ মাজেদ (হজরত রছুল করিম [ছালঃ]) ছিলেন। তৎপরেই আপনাকে 'মহব্বত' করিয়া থাকি।

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন হজরত খদিজাতুল কোব্রা (রাঃ—আঃ)-এর বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর ছিল। ইঁনি তাঁহার আওলাদের (সন্তানগণের) মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠা ছিলেন; এই স্বর্গের রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ। বিবাহের ২০ বিংশতি বৎসর পরে দুনিয়ার সর্ব্ব প্রধানা নারী জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র দুনিয়া আলোকিত করেন। যখন খাতুনে জন্নতের বয়ঃক্রম পাঁচ

বৎসর হইল ; সেই সময় হজরত খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই অতি তরুণ বয়সে মাতৃ-বিয়োগে মাতৃগত প্রাণ কুসুম-কলিকাটির হৃদয়ে কি দারুণ আঘাত লাগিল—প্রাণে কি বিষাক্ত শোক-শেল বিদ্ধ হইল ; লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। এত অল্প বয়সে যে তাঁহাকে মাতৃহীনা হইতে হইবে, একথা তাঁহার কুসুম কোরক সদৃশ কচি হৃদয়ে কখনও স্থান পায় নহে ; তিনি মনের আনন্দে খেলিয়া ও মায়ের অনুসরণ করিয়া ফুল্ল মনে সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে ছিলেন ; হঠাৎ যে বিষম ঝঞ্ঝাবাতে তাঁহার প্রাণের সুখ-শান্তি উড়িয়া যাইবে, তাহা কে জানিত ? মাত্র ৫ বৎসর বয়সে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর মাতৃহীনা হওয়া অতি হৃদয় বিদারক শোচনীয় ব্যাপার। কিন্তু হজরত ফাতেমাঃ যোহরা (রাঃ—আঃ)-এর এই তরুণ বয়সে মাতৃহীনা হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্ তা-লার এক বিশেষ 'মছ্‌লেহত' (উদ্দেশ্য) ছিল। দয়াময় আল্লাহ্ তা-লা যখন কাহারও প্রতি বিশেষ করুণা প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহাকে নানা বিপদে ফেলিয়া অগ্নি-পরীক্ষা করিয়া থাকেন। খাঁটি স্বর্ণ যেমন আগুণে ফেলিয়া পরীক্ষা করা হয়, সর্ব্বশক্তিমান্ খোদা তা-লাও স্বীয় অকৃত্রিম প্রেমিক ও প্রেমিকাদিগকে সেইরূপ কঠোর পরীক্ষাধীন করিয়া থাকেন। দুনিয়ার সমস্ত পয়গম্বর, গওছ, কোতব, অলি, দরবেশ, তাপস কোনও না কোন কঠিন পরীক্ষাধীন হইয়াছেন, এবং এখনও হইতেছেন। দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খোদা-প্রেমিকের সম্পূর্ণ পদানুসরণকারিণী দুহিতা-রত্ন—যিনি স্বয়ংও খোদা তা-লার আদর্শ প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী, তাঁহার সম্পূর্ণ আদেশ পালন কারিণী—তাহার প্রতি কঠিন পরীক্ষা হইবে না কেন ? ভীষণ শোক-দুঃখে ফেলিয়া তাঁহাকে "জাচাই" করা হইবে না কেন ? যাঁহার পিতা সর্ব্ববিধ ভীষণ বিপদ-আপদ, কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করিয়া পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইতেছিলেন, আজ তাঁহার স্নেহময়ী কন্যা-রত্ন ও

সেইরূপ পরীক্ষাধীনা হইলেন। সুতরাং স্বর্গীয়া সম্রাজ্ঞীর পক্ষে শৈশবে মাতৃ-বিয়োগ অমঙ্গল-জনক না হইয়া দুনিয়ার পক্ষে কল্যানকরই হইয়াছিল। ইহা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের—ও পর জীবনের উজ্জ্বল পরিণাম বলিয়াই পরে প্রতিভাত হইয়াছিল। যদি তিনি শৈশবে মাতৃহীনা না হইতেন, তবে হয় ত অন্যের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ, আর্ত্ত-দুঃখীর প্রতি করুণা বিতরণ, অনাথ ও অনাথার প্রতি স্নেহ ও করুণার ছায়া বিস্তার—এ সকল মহা গুণ তত বিকাশ পাইত না। ইচ্ছাময়ের মহান্ ইচ্ছায়ই এইরূপ হইয়াছিল। তারপর অভাব ও দরিদ্রতা ভোগ করিয়া দীন দরিদ্রের অভাব ও কষ্টের পরিমাণ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি জীবনে দাস-দাসীর সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখেন নাই। সংসারের সমস্ত কার্য্য—স্বামী-সেবা, সন্তান পালন, চাক্কিতে (জাঁতায়) আটা পেষা, বস্ত্র ধৌত, গৃহাদি ঝেটান, রন্ধন কার্য্য, পুত্র কন্যাদিগের মল-মূত্র পরিষ্কার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই আজীবন স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। সংসারের এত কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থা হইয়া একদা মহামাননীয় ওয়ালেদ-নাজেদের খেদমতে একটি দাসীর প্রার্থনা জানাইয়া ছিলেন, তাহাতে তিনি নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া যে মহা উক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই সুবিদিত। অর্থাৎ "ছোবহানাল্লাহ্", "আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ্", "লায়েলাহা ইল্লাল্লাহ" ও "আল্লাহু আকবর" এই কালেমা চতুষ্টয় প্রত্যহ ৩৩ বার করিয়া পড়িলে ইহ-পরকালের সকল দুঃখ-কষ্ট ও অভাবাদি বিমোচন হইবে; দাসীর যে অভাব অনুভব করিতেছ, তাহা দূর হইবে। পিতার পবিত্র মুখ-নিঃসৃত এই পূতবাণী শুনিয়া কন্যার অভাব-অভিযোগ দূর হইল—তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করিলেন। সেই দিন হইতে তিনি আর দাস-দাসীর—পরিচারক-পরিচারিকার অভাব অনুভব করেন নাই। যে ব্যক্তি সারা-জীবনে কখনও ক্ষুধা-পিপাসার দারুণ কষ্ট অনুভব করে নাই, দরিদ্রতার

তাড়নায় অস্থির হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখে নাই, সে ব্যক্তি কিসে বুঝিবে, ক্ষুৎ-পিপাসা ও ভীষণ দরিদ্রতা কি জিনিষ? যে 'এতিম' ও 'এছির' (পিতৃ ও মাতৃহীন)—অনাথ ও অনাথা না হইয়াছে, সে তাহাদের দুঃখ-কষ্টের পরিমাণ কি বুঝিবে? নিজে যাহা ভোগ করা যায়, তাহার স্বরূপ যেমন মানুষ বুঝিতে পারে, অন্যের মুখে শুনিয়া বা দেখিয়া তাহা বুঝা সম্ভবপর নয়। সুতরাং স্বর্গ রাজ্যের সম্রাজ্ঞী স্বীয় জীবনে এ সকল বিষয় ভুগিয়া এবং সহিয়া, এ সকলের পরিমাণ ও গুরুত্ব বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; এবং তৎপ্রতিকারে পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন।

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তাঁ হজরত (ছালঃ)-এর কলিজার টুকরা ছিলেন। ওম্মতের সমুদয় 'হামদর্দ্দী' (সহানুভূতি) ও 'গম-গছারি' (দুঃখ দূরকারী) তাঁহার সঙ্গে ছিল। স্বয়ং হজরত রেছালত-মাব (ছালঃ)-এর পবিত্র ছায়া তাঁহার মস্তকের উপর বিরাজ করিত; আর সকলই ছিল; কোনও কিছুরই অভাব ছিল না; কিন্তু ঐ 'কোদরতি' (স্বাভাবিক) শোক-প্রভাব তাঁহার উপর আপনার ক্রিয়া বিস্তার করিয়াছিল—যাহা মাতৃহীন বালক বালিকার স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। তখন তাঁহার বয়স এমন ছিল না যে, সকল বিষয় বেশ বুঝিতে পারেন। তাঁ মায়ের স্নেহ-ভালবাসার স্বাভাবিক প্রভাব হইতে তিনি অব্যাহতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না, মায়ের দারুণ অভাব তাঁহার হৃদয়ে কঠোর ভাবে স্বীয় ক্রিয়া বিস্তার করিত। এই জন্যই তাঁহার চেহ্‌রা মবারকে উদাস ভাব দৃষ্ট হইত। আর এই জন্যই বেশী কথাবার্ত্তা না বলিয়া অধিকাংশ সময় তিনি নীরব থাকিতেন। তাঁহার অনুসন্ধানকারী ও 'মায়ুছ' (নিরাশ) চক্ষুর্দ্বয় যেন কাহারও তালাস করিতে থাকিত। যে মাতা এমন স্থানে গিয়াছেন, যেখান হইতে কোনও উপায়েই তাঁহাকে আনয়ন করা যাইতে পারে না। যখন মায়ের অভাব ও তদীয় দর্শন লাভের নৈরাশ্য, সীমা

অতিক্রম করিয়া যাইত, তখন তদীয় ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে মহা অশান্তির প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইতে থাকিত, তখন 'বে-কারার' (অধৈর্য্য) হইয়া হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আব্বাজান! আম্মা কোথায় গিয়াছেন? আর তিনি কবে আসিবেন?" আহা! এই মাছুম বাচ্চার মায়ের কথা কেমন স্মরণ ছিল। তিনি চাহিতেন, মাতাকে যে কোনও উপায়ে একবার দেখিতে পান। কিন্তু ইহা জানিতেন না যে, মাতা চির-দিনের জন্য বিদায় হইয়া গিয়াছেন; আর এমন জায়গায় চলিয়া গিয়াছেন, যেস্থান হইতে কেহই ফিরিয়া আসিতে পারেন না। হজরত রছুল করিম (ছালঃ) তাঁহাকে 'পেয়ার' করিতেন, পরম স্নেহের সঙ্গে প্রবোধ দিতেন, কিন্তু একথা কখনও বলিতেন না যে, তিনি কোথায়—কোন্ দিকে গিয়াছেন। সর্ব্বদা এই কথাই বলিতেন, তোমার মা ঐস্থানে গিয়াছেন, যেস্থান হইতে কেহই ফিরিয়া আসিতে পারে না। ছোবহানাল্লাহ্! সত্যবাদিতা সম্বন্ধে তাঁহার এতদূর 'লেহাজ' ও 'খেয়াল' ছিল যে, স্বীয় হৃৎপিণ্ড স্বরূপিনী স্নেহময়ী শোকাভিভূতা কন্যারত্নের 'তছকিন' (সান্ত্বনা—প্রবোধ) জন্য ও কখন মিথ্যা কথা বলেন নাই। খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর কি পরম সৌভাগ্য যে, তিনি এমন সত্যবাদী এবং এমন "আমীন" (আমানতদার—খোদার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল) পিতা লাভ করিয়াছিলেন। সন্তানের এরূপ 'শানদার' (গৌরব মণ্ডিত) শিক্ষাদানের জ্বলন্ত আদর্শ আর কি হইতে পারে? একালের পিতা মাতাগণ সন্তানের বাক্য-স্ফূরণ হইলেই নানা মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদিগের মন ভুলাইতে চেষ্টা করে। ইহার পরিণাম ফল এই হইয়া থাকে যে, সন্তানগণের যখন বুদ্ধিশুদ্ধি হয়, তখন সেই মিথ্যা ও ভিত্তিশূন্য কথা গুলি তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকে; আবার তাহারাও ভিত্তিশূন্য মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যস্ত হয়। সংক্রামক রোগের ন্যায় উহা বংশ-পরম্পরা গত হইয়া পড়ে।

কিছু দিন পরে আঁ হজরত (ছালঃ) এই মাতৃহীনা বালিকার লালন পালন এবং গৃহ কার্য্যাদির সুশৃঙ্খলা সাধন জন্য ওম্মোল মুমেনিন হজরত ছাওদাঃ (রাঃ—আঃ)-কে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। এই বিবাহের দরুণ হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ও তাঁহার ভগিনীদিগের কষ্টের অনেকটা লাঘব হইয়াছিল। হজরত ছওদাঃ (রাঃ—আঃ) শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন; তিনি মাতৃহীনা বালিকাদিগের প্রতি যথোচিত যত্ন ও স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। খাতুনে জন্নত মহাল্লার মেয়েদিগের সঙ্গে বড় একটা মিশিতেন না। সর্ব্বদা গৃহে থাকিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী-দিগের সঙ্গে খেলা করিতেন। ইহার ভগিনিগণ, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীদিগের গৃহে যাতায়াত করিতেন, কিন্তু এই ক্ষুদ্র বালিকা কখনও ঘরের চতুঃসীমার বাহিরে পা রাখিতেন না। তিনি দিবসের অধিকাংশ সময়ই একাকী নির্জ্জনে বাস করিতেন; মায়ের সে স্নেহপূর্ণ পবিত্র মুখচ্ছবি ভুলিতে পারিতেন না। এই নির্জ্জন বাসে তাহার হৃদয়ে দৃঢ়তা জন্মিয়াছিল। প্রতিবেশীদিগের কোনও বালিকা আসিলে তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মনে একটু শান্তি লাভ করিতেন। ঐ সময় মক্কার সমুদয় অধিবাসীই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি নিতান্ত বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিল; সকলেই তাঁহার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিত। সুতরাং কোরেশ বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহিলাগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোক তাঁহার গৃহে আসিতেন। আঁ হজরত (ছালঃ) এই সময় 'তব্‌লিগল্‌ এছলাম' অর্থাৎ এছলাম প্রচার কার্য্য হইতে খুব কমই 'ফোরছত' (অবসর) পাইতেন, সুতরাং ঘর-সংসারের দিকে মনোযোগ প্রদান করিতে পারিতেন না। কোরেশ-প্রমুখ মক্কাবাসীদিগের অত্যাচারে ও তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। সুতরাং মোছলেম-মাতা হজরত ছওদাঃ (রাঃ—আঃ)-এর উপর কন্যাদিগের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার দিয়া তিনি

অনেকটা নিশ্চিত ছিলেন। আর পিতৃব্যপুত্র তরুণ বয়স্ক হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সাংসারিক বিষয়ের অনেকটা দেখা শুনা করিতেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পক্ষে একটি মাত্র জিনিষ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা 'মহবুব' (প্রিয়) ছিল—উহা "এছলাম"। এছলামের ভালবাসায় তিনি এমনই নিমগ্ন ও আত্ম-বিস্মৃত ছিলেন যে, অন্য সকল বিষয়ই তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সংসারের মায়া তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়া ছিল না। কিন্তু তাঁহার সম্মুখে কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত ছিল যে, অন্য লোক তাহা ধারণাই করিতে পারিত না। পৃথিবীর মহাশক্তিশালী ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ্ ইত্যাদি যে কোনও শ্রেণীর সর্ব্ব-প্রধান পুরুষদিগকেও সকল দিকে এরূপ মাথা ঘামাইতে এবং শত্রুদিগের ভীষণ শত্রুতাচরণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চিন্তা ও চেষ্টা চরিত্র করিতে হয় নাই। সমগ্র দেশবাসী—এমন কি, আত্মীয়-স্বজনগণ ও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল, তাঁহার জীবন হননে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার পবিত্র মস্তিষ্ক কতদিকে, কি ভাবে চালনা করিতে হইতেছিল, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়; একদল ভক্ত শিষ্য অত্যাচার-প্রপীড়িত হইয়া পবিত্র জন্মভুমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আবিশিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অবশিষ্ট যাঁহারা মক্কায় বাস করিতেছেন, তাঁহারা ও পদে পদে ভীষণভাবে উৎপীড়িত ও বিপন্ন। আঁ হজরত (ছালঃ) সে চিন্তায় ও সর্ব্বদা বিব্রত থাকিতেন। এত বিপদ-বিপ্লববের পাহাড় তুনিয়াতে কবে কাহার হৃদয়, এরূপ ভাবে অবসন্ন করিয়াছিল? আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সাধনা ছিল "এছলাম" বা একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের বিজয়-তুন্দুভি তুনিয়াতে নিনাদিত করা; শের্ক্‌-রূপ মহাপাপের মূলোৎপাটন করা; মনুষ্য মাত্রকেই সত্য ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করা। এত বিপদ আপদ ও ভাবনা চিন্তার মধ্যে তাঁহার পক্ষে কন্যাগণের নিকট ২।১ ঘণ্টা বসিয়া, তাঁহাদের হৃদয়ে শান্তি-ধারা প্রবাহিত

করিবার সময় ও সুযোগ ছিল কোথায়? ধর্ম্ম-প্রচার জন্য তিনি ইতস্ততঃ গমন করিতেন; সময় মত আহার এবং বিশ্রাম পর্য্যন্ত ঘটিতনা। ইহার উপর প্রবল শত্রু পক্ষের শত্রুতাচরণ ও শুভকার্য্যে বাধা প্রদান পদে পদে। এতদ্সম্বন্ধে ও স্বর্গের রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তাঁহার 'জেগর' (হৃৎপিণ্ড)-এর টুক্‌রা, দেলের 'ছরওর' (ছরদার—অধিকারী) ও চক্ষের 'নূর' (জ্যোতিঃ) ছিলেন। এজন্য হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে অফুরন্ত 'মহব্বত' (স্নেহ—ভালবাসা) ছিল। যখন একটু 'ফোরছত' (অবসর) পাইতেন, হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর দিকে মনোযোগ প্রদান করিতেন, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন, তাঁহার মনোকষ্ট দূর করিতে চেষ্টা পাইতেন। যখন 'তব্‌লীগের' (এছলাম প্রচারের) জন্য বাহিরে যাইতেন, তখন সেই সুবর্ণ-প্রতিমা যেদ ধরিতেন, এবং বলিতেন, আব্বাজান, আমাকেও সঙ্গে লইয়া চলুন। আহা! ইহা কি হৃদয় বিদারক ব্যাপার ছিল। হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর হৃৎপিণ্ড, হজরত খদিজাতুল কোব্‌রাঃ (রাঃ—আঃ)-এর আঁখির পুতুলী, আর তাঁহার এই 'গোর্‌বত-এতিমি' (অনাথিনী) অবস্থা!! না ঘরে কাহারও সাহায্য, না বাহিরে কাহারও সহানুভূতি; 'তঙ্গ্‌দস্তির (দরিদ্রতার) এই অবস্থা ছিল যে, ঘরে যদিও 'চেরাগ' (প্রদীপ) ছিল, অনেক সময় জ্বালাইবার জন্য তেল থাকিত না। পানীর 'মট্‌কা' (জালা) ছিল, কিন্তু সকল সময় তাহাতে পানী থাকিত না; আহারের জন্য একবেলা খাদ্য (রুটি) থাকিলে হয় ত অন্য বেলা উপবাসে কাটাইতে হইত; এই অভাব ছিল, দরিদ্রতা ছিল, এই 'এতিমি' (মাতৃহীনতা) ছিল, এই নিঃসম্বলতা ছিল, পক্ষান্তরে তৎসঙ্গে ছিল ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, খোদার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর; পিতা 'ছাবের' (ধৈর্য্য গুণ বিশিষ্ট) ছিলেন, কন্যা সহ্য গুণ বিশিষ্টা। অর্থ-সম্পদ-হীন ছিলেন, কিন্তু ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা ও খোদা তা-লার

পতি নির্ভরতার চাবি তাঁহাদের হস্তগত ছিল। হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) যদিও এখন পর্য্যন্ত 'মাছুম' (অতি অল্পবয়স্কা নিষ্পাপ) ছিলেন; কিন্তু সম্পূর্ণ পবিত্রতা তাঁহার মধ্যে বিরাজ করিত। শ্রদ্ধেয় পিতা হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর পবিত্র বচনাবলী ও উপদেশ মালা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ এবং পালন করিতেন; কোনও বিষয় লইয়া 'যেদ' বা 'হঠ কারিতা' ফরমাইতেন না। হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নিকট তাঁহার 'হামনাম' (একই নাম বিশিষ্টা) বিবী ফাতেমাঃ-বিন্তে আছদ, ফাতেমাঃ বিন্তে যবির, আছমাঃ ও আয়েশা-বিন্তে হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হাফ্জা-বিন্তে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)—যাঁহাদের গৃহ খুব নিকটে ছিল—আসিয়া বসিতেন; এবং কথাবার্ত্তা বলিতেন। এই কতিপয় পবিত্র চরিত্রা বালিকা ব্যতীত হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে আর কোনও বালিকা বা মহিলার দেখা সাক্ষাৎ হইত না। ইঁহারাই তাঁহার সাথী বা প্রিয় বয়স্যা ছিলেন; ইহাদের সঙ্গে বাক্যালাপেই তিনি অনেকটা শান্তি অনুভব করিতেন। অপর কোনও সমবয়স্কা বালিকার সঙ্গে উঠা-বসা করিয়া তাঁহাকে কোনও রূপ লজ্জানুভব করিতে হয় নাই। কারণ, অর্থশালী কোরেশদিগের গর্ব্বিতা বালিকাগণ তাঁহার দারিদ্র্য অবস্থা দর্শনে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে পারিত। বিপদ ও দরিদ্রতার ঘাত-প্রতিঘাতে হজরত ফাতেমাঃ-যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে দুনিয়ার লোভ-লালসা ও স্বার্থপরতা ইত্যাদি দোষ হইতে আল্লাহ তালা পবিত্র রাখিয়াছিলেন। তিনি কোনও জিনিষেরই অভাব অনুভব করেন নাই। সাধারণ মোটা ও তালিযুক্ত কাপড় পরিধান এবং যও (যব)-এর মোটা আটার রুটি আহার করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতেন। সে খাদ্যও সকল দিন সকল বেলা মিলিত না। তিনি সকল বিষয়েই স্বীয় মহান্ পিতার পদানুসরণ করিতেন। আর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খোদা তা-লার উপাসনা ও আরাধনায় আত্ম-

নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে নমাযে কখনও 'গাফেল' দেখা যায় নাই। যথা-নিয়মে কোরআন 'তেলাওত' করিতেন। হৃদয়ের বৃন্ত স্বরূপিনী কন্যারত্নের কার্য্য-কলাপ, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার দর্শনে হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ) নিতান্তই আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি পুত্রের অভাব এই আদর্শ চরিত্রা কন্যা-রত্নের দ্বারা পূরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; অনেক সময় তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার জননীর কথা স্মরণ পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন; কখনও বা সেই স্মরণ উপলক্ষে পবিত্র নয়ন যুগলে অশ্রু-বিন্দু দেখা দিত। হুজুর (ছালঃ) স্বীয় হৃৎপিণ্ডের টুকরাটিকে 'বতুল' (তারেকদ্দুনিয়া—সংসারের প্রতি অনাশক্তা) নামে অভিহিত করিতেন। ফলতঃ স্বর্গের রাজ্ঞী এই নামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্রীই ছিলেন।

উর্দ্দূ কবি প্রাণস্পর্শী ভাষায় কি সুন্দরই না বলিয়াছেন :—

নঃ যর কি তমন্না নঃ দওলত কি পরওয়া;
নঃ আরামকি ধুন নঃ এশ্‌রত্‌ কি পরওয়া,
হওছ মান কি থি নঃ হশ্‌মত কি পরওয়া,
আগার থি তো যোহরা কো আছমত কি পরওয়া,
ওঃ লায়ীথি ফেত্‌রত্‌ছে তওকির এয়ছি,
মিলি কেছ্‌কো-দুনিয়ামে তক্ দির এয়ছি।

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) যখন অবুঝ্‌ হইতে একটু একটু করিয়া বুদ্ধি-শুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন, তখন দুনিয়ার কোফরকে স্বীয় 'নামওর' (স্বনাম প্রসিদ্ধ) পিতার বিরুদ্ধাচারী দেখিতে পাইলেন। মক্কার কাফেরগণ পদে পদে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিত। তাঁহাকে অবমানিত, লাঞ্ছিত ও বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য নানাপ্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিত। একদা আঁ হজরত (ছালঃ) পবিত্র কাবাগৃহে নমায্‌ পড়িতেছিলেন,

রত্‌বাঃ ও শয়বাঃ নামক কাফের দলের পাণ্ডাদ্বয়—যাহারা হুজুর (ছালঃ) কে 'তক্‌লিফ্‌' (কষ্ট) দেওয়ার চেষ্টায়ই সর্ব্বদা থাকিত—সদ্যঃ যবেহ করা উটের 'পোটা' (আঁতুড়ি), ছেজদার অবস্থায় হুজুর (ছালঃ)-এর 'গর্দ্দানে' (গ্রীবাদেশে) লেপ্টাইয়া দিল। উহার ভারে তিনি মাথা তুলিতে পারিতেছিলেন না। সংবাদ পাইবামাত্র হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) দৌড়িয়া কাবাগৃহে আসিলেন, তৎক্ষণাৎ পিতার গর্দ্দান হইতে উটের আঁতুড়ি তুলিয়া ফেলিলেন ; এবং যে সকল কাফের ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে 'বদ-দোওয়া' (অভিসম্পাত) করিলেন। কিয়ৎকাল পরে উহারা ওহাদের যুদ্ধে নিহত হইয়া জাহান্নম বাসী হইয়াছিল। উহারা দুনিয়াতেই পাপের ফল অনেকটা ভোগ করিয়াছিল—পরকালের কথা ভাবিবার বিষয়। হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ এই তরুণ বয়সেই কোফর ও এছলামের সঙ্ঘর্ষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। আরও দেখিতে পাইলেন, দুনিয়া সত্যের বিরুদ্ধে কিরূপ যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে, আর ইমানদারীর পূতবাণী ঘোষণা করা কিরূপ কঠিন কাজ। এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া তিনি স্বীয় পরম ভক্তি-ভাজন পিতার বিপদের পরিমাণ ও অনুমান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর তিনি কি কঠিন 'মোশ্‌কেলে' (কষ্টে) জীবনাতিপাত করিতেছেন, তাহাও বেশ বুঝিতে পারিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষাও পাইলেন যে, 'ছারেজাহানের' যিনি মালেক, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিপতি, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, যাঁহার বিনাদেশে একটি ধূলি-কণা—একটী পরমাণু ও স্থানচ্যুত হয়না, একমাত্র তিনিই মানুষের পূজনীয়—একমাত্র উপাস্য। তাঁহার মহাসম্মানিত 'ওয়ালেদ মাজেদ' (পিতা), লোকদিগকে সেই সর্ব্বশক্তিমান্‌ আল্লাহ তায়ালার দিকেই আহ্বান করিতেছেন ; তাঁহারই আনুগত্য স্বীকার করিতে বলিতেছেন। মানুষকে যথার্থ প্রভুভক্ত হইবার জন্য—অনন্ত পরকালে মুক্তি লাভের

জন্য উপদেশ দান করিতেছেন; খোদা-দ্রোহিতা, খোদাকে ছাড়িয়া অন্য দেবতা, মানুষ, জীব-জন্তু, নদ-নদী, গাছ-গাছড়া, প্রস্তর ইত্যাদির পূজা করা যে ঘোর খোদা-দ্রোহিতা, পিতা মহানবী হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছাল্ঃ)-এর উপদেশ-বাণীতে এবং কার্য্য-কলাপে, বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা বুঝিতে পারিতে ছিলেন। ওয়ালেদ মাজেদ কি জন্য দেশবাসীর শত্রু হইয়াছেন, তাহাদের বিষ 'নযরে' পড়িয়াছেন, তাহাদের অসহ্য অত্যাচার-উৎপীড়ন সহিয়া যাইতেছেন, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেছিলেন। মহামাননীয় পিতার সেই বিশ্বাস, সেই ধারণা ধীরে ধীরে তাঁহার কোমল হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছিল। মহামাননীয় জনকের দয়া, সৌজন্য, লোকের প্রতি সদ্ব্যবহার, দরিদ্রের প্রতি করুণা বিতরণ, নিজে না খাইয়া ক্ষুধার্ত্তকে আহার প্রদান, ছাহাবাঃ ((রাজিঃ) দিগের প্রতি অনন্ত স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন, উপাসনা-আরাধনায় নিয়মিত রূপে আত্ম-নিয়োগ, যথানিয়মে রোজা পালন, নিয়মিত রূপে জাকাত প্রদান ও কোরবাণী করণ—ইত্যাদি প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি গভীর মনোযোগ প্রদান করিতেন, এবং নিজেও সেই সকল সদ্গুণ লাভ এবং ও ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেন। দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণে সেই ক্ষুদ্র হৃদয় খানি পরিপূর্ণ ছিল। এ সময়ও যখন স্বীয় সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা আদর্শ জননীর কথা স্মৃতিপথে উদিত হইত, নীরবে অশ্রুপাত বা দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। আঁ হজরত (ছাল্ঃ) গৃহে আসিলেই সর্ব্বাগ্রে এই সুবর্ণ-প্রতিমার সন্ধান লইতেন, নিকটে আহ্বান করিয়া স্নেহালিঙ্গন করিতেন; তখন ভক্তি ও করুণ-রসে হজরত যোহরার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকিত না; ওয়ালেদ মাজেদের পবিত্র বদন মণ্ডলের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। মহাপুরুষ মহানবী (ছাল্ঃ)ও হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ রাশি যেন তাঁহার প্রতি ঢালিয়া দিতেন। শত যন্ত্রণা, শত উৎপীড়ন-

অত্যাচার, মহাদারিদ্র্য প্রভৃতির বিষয় ভুলিয়া যাইতেন, দেখিতেন, তাঁহারই আদর্শে একটী ক্ষুদ্র বালিকার জীবন কেমন সুন্দর ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে; তখন তাঁহার আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকিত না। বালিকার সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃতা জননী যেমন সর্ব্বপ্রথমে পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে-বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, স্বীয় পবিত্র আত্মা চরিতার্থ করিয়া ছিলেন; তাঁহারই স্নেহের পুতুল হজরত ফাতেমাঃ বতুল, তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক এছলামে পূর্ণ বিশ্বাসিনী হইয়া তরুণ স্বর্ণ-লতিকার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেন, ইহা কতই না আনন্দ-প্রদ ব্যাপার। বালিকা ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ মাজেদের প্রত্যেক কার্য্য ও প্রত্যেক বাক্যের প্রতি অতি সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখিতেছেন, তিনি যে, দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, খোদা তায়ালার 'খাছ বান্দা', এই তরুণবয়স্কা বালিকা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বুঝিতে পারিলেন। যে কয়টি মোছলেম-মহিলা বা বালিকা তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন, তাঁহার সঙ্গে বাক্যলাপ করিতেন, তাঁহার কার্য্য-কলাপ দেখিতেন, তাঁহার চাল-চলন এবং ভাব-ভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন; এই সুবর্ণ-প্রতিমার শিষ্টতা, নম্রতা, ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইতেন। তাঁহার লজ্জাশীলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। অনেক সময় তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। দরিদ্রের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত ও দ্রবীভূত হইত। কোনও 'ছায়েল' (ভিক্ষা-প্রার্থী) দ্বারে আওয়ায্ দিলে যদি ঘরে কিছু দেওয়ার মতন থাকিত, তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিতেন। নিজের মুখের গ্রাস রুটি খানিও পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিতেন না।

পাঠক, একথা বেশ অবগত আছেন, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর কিরূপ সঙ্কটকালে হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন আল্লাহ জল্লশানহুর তওহিদ অর্থাৎ খোদা তা-লার একত্ববাদ এবং

স্বীয় নবুয়তের ঘোষণা করিয়াছিলেন ; পৌত্তালিকতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা প্রদান করিয়া মক্কার ঘোর পৌত্তলিকদিগের নিতান্তই বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন ; তথাকার বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, নর এবং নারী তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল ; আবুলাহাব-প্রমুখ স্বগোত্রের অর্থাৎ বনি-হাশেমের বহুলোক তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিল ; তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে ও মক্কার অধিবাসী—বিশেষতঃ কোরেশগণ ঘৃণা প্রকাশ করিত ; বহুকষ্ট ও বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মাত্র ৪০ জন নর-নারীকে বিশ্বাসের পথে—মুক্তির দিকে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; দুই একজন মাত্র করিয়া লোক নানা কষ্ট অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র আহ্বানে সাড়া দিতেছিলেন, সেই কঠিন সময়—মহা বিপদের কালে স্বর্গের রাজ্ঞী, দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নারী জন্মগ্রহণ করিয়া, হজরত রছুল (ছালঃ)-এর গৃহ আলোকিত করিয়াছিলেন। দরিদ্রতা ও অভাব যেন তাঁহার চির সঙ্গী হইয়া আসিয়াছিল, এবং বিপদের পাহাড় তাঁহার ওয়ালেদ মাজেদের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু সেই বিপদ আপদে তিনি একটু মাত্র বিচলিত না হইয়া, অবিচলিত হৃদয়ে জলদ-গম্ভীর স্বরে তওহিদের পবিত্র বাণী ঘোষণা করিতে ছিলেন। তিনি কোনও বিপদকেই গ্রাহ্য করিতেছিলেন না ; মৃত্যুকেও ভয় করিতেন না। তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভুর আদেশ তিনি অবিচলিত চিত্তে—অম্লান বদনে পালন করিতেছিলেন। দুর্দ্দান্ত কাফের দিগের অত্যাচার ও উৎপীড়ন যত বাড়িতে ছিল, তাঁহার একাগ্রতা, দৃঢ়তা, কঠোর সঙ্কল্প ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অজেয় হইয়া উঠিতেছিল। প্রবল বন্যার সম্মুখে মাটী বা বালির সামান্য বাঁধ যেন তিষ্ঠিতে পারে না, সেইরূপ দুর্দ্ধর্ষ কাফেরদিগের শত বাধা প্রতিবন্ধতা ও তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প এবং অবিচলিত ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার সম্মুখে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। প্রভুর কঠোর মহাপরীক্ষা পর্য্যায়ক্রমে

তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেও, তিনি অবিচলিত হৃদয়ে তাহার সম্মুখীন হইয়া, সেই সকল কঠোর পরীক্ষায় অতি প্রশংসনীয় ভাবে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। বাল্য ও যৌবনকালের প্রতিপালক, সর্ব্ব অবস্থায় সাহায্যকারী পিতৃব্য আবুতালেবের মৃত্যু তাঁহার পক্ষে সামান্য বিপদ এবং শোক-দুঃখের কারণ ছিল না। তিনি পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেও, সর্ব্ব প্রকারেই পুত্রবৎ স্নেহ-ভাজন ভ্রাতুষ্পুত্রের সর্ব্বপ্রকার বিপদ আপদে সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে তাঁহারই হস্তে সঁপিয়া দিয়া, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার আদেশ পালনের জন্য সুদৃঢ় ভাবে অনুমতি দিয়া রাখিয়া ছিলেন। পিতৃ স্থানীয় সেই পিতৃব্যের মৃত্যু তাঁহার পক্ষে কিরূপ শোকাবহ ব্যাপার ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার কিছুদিন পরেই হজুর (ছালঃ)-এর সংসার-সাগরের একমাত্র অবলম্বন, সুখ-দুঃখের সাথী, সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার নবুয়ত স্বীকার এবং স্বীয় বিপুল ঐশ্বর্য্য রাশি তাঁহার পদে উৎসর্গ কারিণী, আদর্শ পত্নী ও আদর্শ সাধ্বী সতী হজরত খদিজাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ) সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া জীবনের পরপারে চলিয়া গেলেন; সুতরাং আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পক্ষে সংসারের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহার পারিবারিক শান্তির অবসান হইল। ৩টি কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহারা কখনও স্বামীগৃহে, আর কখনও বা পিতৃ-গৃহে থাকিতেন। আঁ হজরত (ছালঃ) তওহিদের বাণী ঘোষণা করাতে তাঁহার দুই কন্যার শ্বশুর ও স্বীয় পিতৃব্য আবুলাহাব এবং জামাতা দ্বয় তাঁহার বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং কন্যাদ্বয়ের পক্ষে স্বামী-গৃহ কিরূপ শান্তি জনক হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। পিতার পবিত্র কার্য্য-কলাপে কাট্টা কাফের স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী এবং তৎপরিবারস্থ আর আর সকলের দ্বারা তাঁহাদিগকে নিতান্ত গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত। শ্বশুরালয়

তাঁহাদের জন্য নরক সদৃশ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং মাতৃশূন্য পিতৃ-গৃহে আসিয়া মাঝে মাঝে দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি অনুভব করিতেন। এই অবস্থায় হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ক্রমে শুক্লপক্ষের শশি-কলার ন্যায় বাড়িতে ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরম শ্রদ্ধেয় পিতার প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক বাক্য এবং প্রত্যেক উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ঠিক তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিতে ছিলেন। পরম শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ্ মাজেদকে তিনি গৃহে খুব কমই দেখিতে পাইতেন। সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি নগরের বিভিন্ন স্থানে এবং পবিত্র কাবা-গৃহে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। গৃহে পুরুষের মধ্যে তরুণবয়স্ক হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং অতি প্রিয় ও বিশ্বস্ত ক্রীতদাস হজরত যয়েদ বিন্-হারেছ (রাজিঃ) ছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) ধর্ম্ম-প্রচারার্থ হজরত যয়েদ (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া তায়েফে গিয়া, তায়েফবাসীদিগের দ্বারা কিরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর জীবনীতে—এই পাক-পাঞ্জতনের প্রথম ভাগে পাঠকগণ তাহা অবগত হইয়াছেন। এতকাল মক্কার কাফেরগণ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি কঠোর অত্যাচার করিয়া আসিতেছিল; এইবার তাহারা তাঁহার হত্যাকাণ্ড সম্পাদন জন্য এক-মতাবলম্বী হইল। 'বোত্ পরস্ত' (পৌত্তলিক) নরনারী আপনাদের উপাস্য দেব-দেবী গুলিকে অতিশয় ভক্তি করিত, সে গুলিকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম মনে করিত, আপনাদের ভাল মন্দ—শুভা-শুভ সমস্তই তাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া বিশ্বাস করিত, আর বিশ্বাস করিত—ঐ সকল প্রতিমা গুলিই তাহাদিগকে পরকালে উদ্ধার করিবে; উহারাই সৃষ্টি-স্থিতি এবং প্রলয়ের মূল; সুতরাং তাহারা ব্যতীত ইহ ও পরকালে আর কোন গতি নাই; এমন ভক্তি-শ্রদ্ধা ভালবাসার পাত্র, মুক্তির একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ দেব-দেবী গুলির যিনি বিরুদ্ধাচারী, তাঁহার উপর ক্রোধের উদ্রেক হওয়া

স্বাভাবিক। তাঁহার প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করা একটা নূতন ব্যাপার নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী "তওহিদ"-ঘোষণাকারী পয়গম্বর (আলাঃ) গণ ও পৌত্তলিকদিগের দ্বারা নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের পয়গম্বর আখেরজ্জয্ যমান (ছালঃ) যেমন সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহার প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়নটাও সেইরূপ কঠোর এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। "তওহিদ"-প্রচারে—খোদাতা-লার **একত্ব** ঘোষণায় তাঁহাকে অতি কঠিন বাধা-প্রতিবন্ধকতা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ দয়াময় আল্লাহ তা-লার অনন্ত কৌশল ও অনন্ত মহিমায় তিনি সকল বিপদ-আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। মহামাননীয় হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তাহা ধীরভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন; এবং আদর্শ পিতার সর্ব্ববিধ আদর্শ কার্য্য-কলাপের নিজেও অনুসরণ করিতেছিলেন।

হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর শ্রদ্ধেয়া জননীর জীবিত কালের একটি ঘটনা এস্থলে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। একদা তাঁহার কোন আত্মীয়ের বাড়ীর বিবাহোপলক্ষে তিনি স্বীয় কন্যাগণকে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত করিয়া পাঠাইলেন। তখনও তাঁহার অর্থ-সম্পদের অপ্রতুল ছিল না। সুতরাং বালিকাদিগের জন্য উৎকৃষ্ট ও নূতন বস্ত্রালঙ্কারাদি তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ সময় স্বর্গ-রাজ্ঞী ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বয়ঃক্রম মাত্র ৫ বৎসর ছিল। কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার উৎকৃষ্ট বস্ত্র-অলঙ্কার প্রভৃতি বিলাসিতার সামগ্রীর প্রতি এমন বীতানুরাগ ছিল যে, তিনি কিছুতেই সেই সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার পরিতে চাহিলেন না—অথচ তাঁহার অন্যান্য ভগিনিগণ তাহা আগ্রহ সহকারে পরিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য! ঐরূপ শৈশবকালেই তিনি বস্ত্রালঙ্কারের পার্থিব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সংসার-বৈরাগ্য তাঁহার মধ্যে

প্রচ্ছন্ন ভাবে ক্রিয়া করিতেছিল। বিশ্ব-বরেণ্যা তাপসীদিগের শিরোভূষণ রূপে তিনি প্রকাশ পাইতেছিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, সাধারণ শিক্ষা তাঁহার সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা জননীর নিকটই আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার 'ওফাতের' (পরলোক গমনের) পরও সেই শিক্ষার 'ছেলছেলা' (শৃঙ্খল) ছিন্ন হইয়াছিল না। ৪৷৷০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি একদা স্বীয় জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আম্মাজান! খোদার 'ক্কোদরত' (মহিমা) ত সকল সময়ই আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়; কিন্তু খোদার 'দীদার' (দর্শন) লাভ কি মানুষের অদৃষ্টে ঘটিতে পারে? বালিকার মুখে এই কথা শুনিয়া মায়ের হৃদয়ে কতই না আনন্দের সঞ্চার হইল; ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) উত্তরে 'এরশাদ ফরমাইলেন' (বলিলেন), মা, যখন আমরা দুনিয়াতে 'নেককাম' (সৎকার্য্য) করিব, মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিব, খোদা তা-লার আদেশ পালনে তৎপর থাকিব, রছুলের প্রতি ঈমান আনিব, তদ্দ্বারা 'রোয্ কেয়ামতে' (হাশরের ময়দানে) আল্লাহ্‌র সন্তোষ বিধানে সক্ষম হইব, এবং এই উপায়েই তাঁহার 'দীদার' (দর্শন) লাভ ঘটিবে। জননীর এই উক্তি বালিকার কোমল হৃদয়-ফলকে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে, আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত ছওদাঃ (রাঃ—আঃ)-কে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিবার পর, বালিকাদিগের শিক্ষার ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ পূর্ব্বক এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ওম্মোল মুমেনিন ও এই কার্য্য এমন সুন্দর রূপে সম্পাদন করিতেছিলেন যে, স্বয়ং বালিকাদিগের জননী ওম্মোল মুমেনিন হজরত খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) জীবিত থাকিলেও সম্ভবতঃ ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু হইতে পারিত না।

হেজরতের কিছুকাল পূর্ব্বে হজরত রেছালতমাব (ছালঃ), তাঁহার প্রধান শিষ্য বা সহচর হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর অতি

অল্পবয়স্কা কন্যা (যাঁহার বয়স তখন ৯।১০ বৎসরের মধ্যে ছিল) ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-কে এবং দ্বিতীয় প্রিয়তম শিষ্য হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর কন্যা ওম্মোল মমেনিন হজরত হাফ্‌সা (রাঃ—আঃ)-কে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন। প্রথমোক্ত বিমাতা হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়া বিমাতা তাঁহার সমবয়স্কা এবং প্রিয়-বয়স্যা ছিলেন। অনেক সময়ই উভয়ে একত্র বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেন, এবং নির্দ্দোষ খেলাও শৈশবে উভয়ে খেলিতেন। কিন্তু যখন তাঁহাকে তদীয় বোযর্গ ওয়ালেদ্ মাজেদ বিবাহ করিলেন, তখন তাঁহারে প্রতি মাতার ন্যায় পূর্ণ ভক্তি-শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) সর্ব্বতোভাবে পিতৃগত প্রাণ ছিলেন। তিনি মহাসম্মানিত পিতাকেই যথা-সর্ব্বস্ব জানিতেন। তাঁহার ছোট বড় সকল কার্য্যের দিকেই অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য রাখিতেন, আর তাঁহার সেই সকল কার্য্যের অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেন। কেবল পিতা বলিয়াই যে এই ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা নহে; তিনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বেশ জানিতে এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেম যে, আমার ওয়ালেদ্ মাজেদ একজন 'মামুলী' (সাধারণ) মনুষ্য নহেন। ইঁনি খোদা তা-লার মনোনীত নবী অর্থাৎ পয়গম্বর বা রছুল। স্বীয় আদর্শ জননী তাঁহাকে নবী বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে স্বীকার করিয়াছিলেন। আরও বহু জ্ঞানী ও শক্তিশালী লোক তাঁহাকে নবী বলিয়া স্বীকার করিয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। পিতৃব্য হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহার পরম ভক্ত শিষ্য, সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। ক্রীতদাস (হজরত) যয়েদ বিন্-হারেছ (রাজিঃ) পিতার সংস্পর্শে আসিয়া একজন আদর্শ পুরুষ হইয়া গিয়াছেন। স্পর্শমণির সংস্পর্শে

যেমন নিকৃষ্ট লৌহাদিও সুবর্ণে পরিণত হয়, সেইরূপ যে কোনও ব্যক্তি তদীয় আদর্শ চরিত্র পিতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই নবজীবন লাভ করিয়া আদর্শ মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। এই সকল ব্যাপার দর্শনে স্বীয় মহান্ পিতার প্রতি তাঁহার ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতে লাগিল। পিতা যে একজন খোদা তা-লার 'খাছবান্দাঃ' (বিশেষ ও মনোনীত মনুষ্য) তাহা তিনি পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহান্ পিতার সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের যথা-সম্ভব অনুকরণ ও অনুসরণে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। এক অভাবনীয় পবিত্র স্বর্গীয় শিক্ষায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। পবিত্র কোরআনের প্রত্যেক অক্ষর, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক আয়াত তাঁহার হৃদয় ফলকে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর স্নেহ-বারিধি ক্রমশঃ উছলিয়া উঠিয়া এই কন্যা-রত্নকে যেন ভাসাইয়া লইয়া চলিল। তিনি তাঁহার মধ্যে যেন স্বীয় প্রতিকৃতি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য তাঁহার মধ্যে যেন প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত হইতেছিল। এজন্য শত বিপদ-আপদ, উৎপীড়ন-অত্যাচারের মধ্যেও এই দুহিতা-রত্নের বদন কমল দর্শন করিয়া ক্ষণেকের জন্য সকল ক্লেশ ভুলিয়া যাইতেন; আর এরূপ অসামান্যা কন্যা-রত্ন লাভ করিয়াছেন বলিয়া ভক্তি গদ্ গদ্ চিত্তে পরম করুণাময় আল্লাহ তা-লার মহা দরবারে "শোকর-গোজার" হইতেন।

তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে প্রণালীর— যে ভাবের শিক্ষা তৎকালে মক্কা নগরে মোছলমানদিগের মধ্যে প্রচলিতছিল; সেই প্রণালীতে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), স্বীয় শিক্ষিতা জননী হজরত খদিজাতুল কোব্রা (রাঃ)-এর নিকট মাত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে শিক্ষা অল্পকাল মাত্র স্থায়ী ছিল। কারণ, শিক্ষারম্ভের অল্প দিন পরেই সেই ধর্ম্মপ্রাণা সতী-সাধ্বী আদর্শ মহিলা ইহলোক ত্যাগ

করেন। পরে তাঁ হজরত (ছালঃ), মোছলেম-মাতা হজরত ছওদাঃ (রাঃ—আঃ)-কে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিলে, তিনি ইঁহার শিক্ষা-ভার গ্রহণ করেন। তিনি সপত্নী-পুত্রীকে যথোচিত স্নেহ করিতেন, ভাল বাসিতেন, সযত্নে শিক্ষাদান করিতেন; কোরআন শরীফের আয়াত সকল যেমন যেমন 'নাযেল' (অবতীর্ণ) হইত, অধিকাংশ মোছলেম-নরনারী তাহা মুখস্থ করিয়া লইতেন; হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) সম্বন্ধেও তাহার অন্যথা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার প্রধান শিক্ষার অবলম্বন ছিল স্বীয় জলিলল্ কদ্দর পিতার বিস্ময়কর কার্য্য-কলাপ, এছলামের প্রতি আপ্রাণ ভালবাসা, সর্ব্বশক্তিমান্ পরাৎপর প্রভু আল্লাহ্ তা-লার আদেশ পালন, গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) লোকদিগকে পথ-প্রদর্শন, দরিদ্রের প্রতি দয়া, অসাধারণ অমানুষিক ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি যাবতীয় সৎকার্য্য ও সদ্‌গুণাবলী। তাঁহার স্নেহ-পালিতা কন্যারত্ন ও সেই সকল মহান্ গুণ শিক্ষা ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পরিবারের মধ্যে মাতা-ভগিনিগণ (যাঁহারা-স্বামী-গৃহ হইতে কখন কখন পিত্রালয়ে আসিতেন), একটি মাত্র পিতৃব্য নব্যযুবক হজরত আলী (কঃ—ওঃ), ইঁহারা সকলেই আদর্শ চরিত্র এবং খাঁটি মোছলমানের নমুনা ছিলেন; প্রতিবেশী যে কয়জন মহিলা ও বালিকা সেই পবিত্র গৃহে আসিতেন, তাঁহারা মোছলমানদিগেরই স্ত্রী-কন্যা এবং আদর্শ মহিলা; অন্য শ্রেণীর প্রতিবেশীর যাতায়াত ছিল না; সুতরাং মক্কার বদ চাল-চলন বিশিষ্টা কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁহার মেলা-মেশাও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার চরিত্রে বা চাল-চলনে বিন্দুমাত্রও অনৈস্‌লামীক দোষ স্থান পায় নাই। মোছলমানদিগের ধর্ম্মভাব, কার্য্য-কলাপ, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন কিরূপ হওয়া চাই, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) কেবল তাহাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। নারীর প্রধান গুণ লজ্জাশীলতা, নম্রতা, বিনীত ভাব,—এ সকল

তাঁহার ভিতর পূর্ণরূপে বিরাজ করিত। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতেন না, উচ্চহাস্য করিতেন না, তাঁহার আওয়ায্ অন্যের কর্ণগোচর হইত না, যখন চলিতেন, মাটিও যেন টের পাইত না।

এই সকলের মধ্যে আবার সাংসারিক কার্য্যেও তাঁহার অলসতা ছিল না; বিমাতাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘর-সংসারের সকল কাজ ও অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতেন। প্রয়োজন মতে আটা পিষিতেন, খাদ্য যও (যব) গুলি বাছিতেন, রুটী ও ব্যঞ্জন প্রয়োজন মতন পাক করিতেন, কাপড় সেলাই করিতেন, হাঁড়ি বাসন (যদিও তাহা অতি যৎসামান্য ছিল) ধৌত করিতেন। তদ্ব্যতীত পিতার সেবাও করিতেন; বিমাতাগণ যাহা বলিতেন, তাহাও করিতেন; সুতরাং সাংসারিক কোনও কার্য্যেও তাঁহার আলস্য ছিল না। তিনি বিনা কাজে—অলস ভাবে একটু সময়ও নষ্ট করিতেন না। গল্প-গুজবে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইত না—দুনিয়ার ও আখেরাতের সকল সৎকার্য্যেই স্বর্গ-রাজ্ঞীর পূর্ণ আগ্রহ দৃষ্ট হইত। "বিলাসিতা" নামে কোনও জিনিষেরই অস্তিত্ব তাঁহার মধ্যে ছিল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণাবলীও তাঁহার মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয় খানি ধর্ম্মভাবে ভর-পূর ছিল। ওম্মোল-মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমি সর্ব্ব-প্রকার কার্য্য-কলাপ, আচার-ব্যবহারে ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) কে, হজরত রছুল (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ 'তকলিদ' (অনুকরণ—অনুসরণ) করিতে দেখিয়াছি। 'বেলা শোবাহ্' (নিঃসন্দেহে) আমি হজরত রছুল (ছালঃ)-এর সঙ্গে ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর অধিকতর 'মোশাবাহ্' (সাদৃশ্য) দেখিয়াছি।" ওম্মোল মুমেনিন হজরত ওম্মে ছালমাঃ (রাঃ—আঃ) বলিয়াছেন, 'রফ্তার' (চাল-চলন)এ, ও 'গোফ্তারে' (কথাবার্ত্তায়), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর উৎকৃষ্ট নমুনা (আদর্শ) ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)।

আঁা হজরত (ছালঃ) যখন কোনও যুদ্ধ বা প্রবাস হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, প্রথমে মছজেদে 'দোগানাঃ' (নফল দুই রাকায়াত নমায্) আদায় করিয়া হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) কে দেখিতে যাইতেন। তৎপর 'আয্ওয়াজে মত্হরাত্' (আহ্লিয়া বা সহধর্ম্মিণী) দিগের নিকট গমন করিতেন। আর যখন কোনও 'ছফরে' (প্রবাসে) গমন করিতেন, তখন সকলের শেষে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় হইতেন। উদ্দেশ্য, 'ফেরাক জুদায়ী' (বিচ্ছিন্নতা—বিচ্ছেদ)-এর সময় পিতা-পুত্রীর মধ্যে, অন্যান্য 'আহ্লে বয়েত' (পরিবার পরিজন বর্গ) অপেক্ষা যাহাতে কম থাকে। হজরত রছুল আক্রম (ছালঃ), হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর খুব 'য়েয্যত্' ফরমাইতেন (সম্মান প্রদর্শন করিতেন)। হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) কখনও তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেন, পরম সমাদরে নিজের কাছে বসাইতেন এবং তাঁহার মস্তকে ও চক্ষে বোছাঃ দিতেন (চুম্বন করিতেন)। * আবার যখন আঁা হজরত (ছালঃ) স্বয়ং তাঁহার গৃহে যাইতেন, তখনও ঐরূপ করিতেন। হুজুর (ছালঃ), এই হৃৎপিণ্ডের টুকরা স্বরূপিনী কন্যা-রত্নকে অসাধারণ স্নেহ করিতেন সত্য, কিন্তু আল্লাহ তা-লার আদেশ সম্বন্ধে কঠোরতাই অবলম্বন করিতেন; সে ক্ষেত্রে কন্যা-রত্নের মুখ চাহিয়া কথা বলিতেন না। খোদা তা-লার যাহা আদেশ, দৃঢ়তার সঙ্গে তাহা শুনাইয়া দিতেন। হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বিবাহিত জীবনের একবারের ঘটনা এই যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে তাঁহার একটু মনোবাদ হইয়াছিল; এই সংবাদ শ্রবণে আঁা হজরত (ছালঃ) কন্যা-রত্নের প্রতি বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

---

* তফ্রিহুল আয্কিয়াঃ ৩৬৭ পৃঃ।

স্বর্গ-সম্রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবনী পাঠে আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, আদর্শ পিতা ও আদর্শ কন্যার মধ্যে কি পবিত্র সম্বন্ধ ও পবিত্র ভক্তি-স্নেহের বন্ধন বিরাজ করে। পিতা ও সন্তানের পবিত্র 'মহব্বৎ' (ভালবাসা) এক স্বর্গীয় সামগ্রী। ইহা এক 'বরকত'—এক 'ছায়াদত' (পুণ্যবান্ হওয়া)—এক 'শরফ্' (সভ্যতা—ভদ্রতা)। সে পিতাকে সৌভাগ্যবান্ বলা যায় না—যে পিতা সন্তানের ভক্তি ও ভালবাসার আকর্ষণে আকৃষ্ট না হন, তাহাদিগকে প্রিয় বা স্নেহাস্পদ মনে না করেন, তাহাদের প্রতি স্নেহানুরাগ প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন। পক্ষান্তরে তোমরা ঐ সন্তানকে 'বদ-বখ্ত্' (হতভাগ্য), দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মনে কর—যাহাদের অন্তঃকরণে পিতামাতার প্রতি যথোচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত ভালবাসা নাই—যাহারা পিতা মাতার প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরার মধুর ব্যবহার ও ভক্তি-শ্রদ্ধায় তদীয় বিমাতাগণ তাঁহাকে স্ব স্ব গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। কেহ বুঝিতে পারিতেন না যে, ইঁহারা তাঁহার বিমাতা, আর তিনি ইহাদের সপত্নী-কন্যা। খয়বরের যুদ্ধে ওম্মোল মুমেনিন হজরত ছফিয়াঃ (রাঃ—আঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন; তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বীয় কাণের একজোড়া অতি মূল্যবান্ ঝুম্‌কা (কর্ণাভরণ)—যাহা বহুমূল্য মণি-মুক্তায় জড়িত ছিল—হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে উপহার প্রদান করেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার 'ছেহেলী' (বয়স্যা) দিগের প্রত্যেককে এক একটি অলঙ্কার দিয়াছিলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে, স্বর্গ-রাজ্ঞীর কিছু মনোবাদ ছিল; কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক। মহামাননীয়া মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)

(রাজিঃ)-এর একদস্তা (একদল) শামী (সিরীয়) সৈন্য, তরবারি বলে তাঁহার নিকট হইতে 'বায়্য়েত' গ্রহণ করিতে উদ্যত হয় ; এই সংবাদ মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) যখন শুনিতে পাইলেন, তখন ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ মছজেদ নববীতে গমন পূর্ব্বক হজরত আমীর মাবিয়া (রাজিঃ)-কে তথায় ডাকিয়া পাঠাইলেন ; তিনি মছজেদে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "হে মাবিয়া ! আমি শুনিলাম, তুমি হজরত 'ছারওয়ারে কায়েনাত' (ছাল্লঃ)-এর 'নওয়াছাঃ' (দৌহিত্র—নাতি) এমাম হোছেনের সঙ্গে গোস্তাখীর' (অশিষ্টতার) সহিত 'পেশ' আসিয়াছ ; দেখ, যদি তুমি ঈদৃশ অন্যায় কার্য্য হইতে 'তওবা' না কর, তবে আমি তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করিয়া দিব। তোমার সমস্ত শক্তি ও সমস্ত আমীরি 'ফাণা' (নিশ্চিহ্ন) করিব। যদিও উহার নানা এবং মাতা জীবিত নাই, কিন্তু তাঁহাদের স্থলে আমি জীবিত আছি।" যদি মহামাননীয়া ওম্মোল মুমেনিনের, হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে মনোবাদ থাকিত, তবে তাঁহার পুত্রের প্রতি কেন ঈদৃশ সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন ?

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) মৃত্যুর ২।৩ দিন পূর্ব্বে, মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর খেদমতে 'হাজের' (উপস্থিত) হইয়া ফরমাইলেন, আম্মাজান ! যদি আমার কোনও কার্য্য বা বাক্য আপনার 'মর্জীর' (মতের) বিরুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আমাকে 'লিল্লাহ্' 'মাফ্' (মার্জ্জনা) করিয়া দিবেন।' ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) এই কথা শুনিবামাত্র আকুল প্রাণে তাঁহাকে বক্ষেঃ ধারণ করিলেন, এবং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। একদল মোছলমানের পক্ষে পূর্ব্বোল্লিখিত মনোবাদের অমূলক ধারণা মনে স্থান দেওয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য। এই ধারণাটা শিয়া মতাবলম্বীদিগের মধ্য হইতে সংক্রামিত হইয়া,

ছুন্নিদলের মধ্যেও কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এমন পূতচরিত্রা আদর্শ মহিলাদিগের উপর একটু মাত্র বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করা, ধর্ম্ম ও নৈতিক হিসাবে অতীব গর্হিত কার্য্য।

উর্দ্দু কবিতা।

জনাব ফাতেমাঃ কি মরতাবাঃ কা কেয়া কাহ্ না;
হামেশা চাহিয়ে ওন্পর দরুদ খাঁ রাহ না।
জনাব হায়দর কার্‌রার্ কি উওহ্ হায় বিবী;
হাছন হোছেনকি মা হায় রছুলকী বেটি॥

এই কথা লইয়া অনেকের মধ্যে মতভেদ আছে যে, 'মর্ত্তবায়' (সম্মানে—পদ-মর্য্যাদায়) হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) হইতে বড়, কিংবা মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ), স্বর্গ-রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? "তহজ্জতল মহাফেল" গ্রন্থ লেখক, এই বিষয়ের 'তহকিক (অনুসন্ধান) করিয়া এই-রূপ 'রায়' (মতামত) প্রকাশ করিয়াছেন যে, হজরত খদিজাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ) 'আফ্জল' (শ্রেষ্ঠ) হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) হইতে; আর হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) নারীগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ছৈয়দ আবদুল জলিল বেলগ্রামী এ সম্বন্ধে একটি পারসী কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই:—

কোনও ব্যক্তি আমাকে বলিল যে, হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) 'ফজিলত' (শ্রেষ্ঠত্ব—সম্মান)-এর হিসাবে, হজরত ফাতেমাঃ

(রাঃ—আঃ) হইতে 'বেহ্‌তর'। তদুত্তরে আমি একটি কবিতা পাঠ করিয়াছি। উহার মর্ম্ম এই যে, 'রেশ্‌তাঃ' (বৈবাহিক সম্বন্ধ) এক জিনিষ; আর কলেজার টুকরা অন্য জিনিষ। জনাব হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ- আঃ) অবশ্য হজরত রছুল (ছালঃ)-এর বিবাহিতা পত্নী বলিয়া গৌরবান্বিতা; কিন্তু হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ আঁ হজরতের 'জগর গোশা' (হৃৎপিণ্ড) বা প্রিয় সন্তান। সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যাপারই স্বতন্ত্র। "ছনদছ্‌ ছায়াদাত" গ্রন্থের গ্রন্থকার এই বিষয় লইয়া 'বহাছ' তর্ক—আলোচনা) করিয়াছেন। তাঁহার মতে খাতুনে জন্নত হজরত ছৈয়দাঃ ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), 'দুনিয়ার' (পৃথিবীর) সমস্ত স্ত্রীলোক অপেক্ষা 'আফ্‌জলতর' (শ্রেষ্ঠা)। তাঁহার পক্ষে ইহাই কোন্‌ কম গৌরবের কথা ও সম্মানজনক বিষয় যে, তিনি আমাদের হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর স্নেহময়ী কন্যা-রত্ন বা কলেজার টুক্‌রা; তিনি তাঁহার মনের—জীবনের শান্তি প্রদায়িণী ও আঁখির তারা। তিনি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হইয়াছেন, তাঁহার 'খুন' (শোণিত) ইঁহার খুনের সঙ্গে মিশ্রিত আছে। জনাব হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) ফরমাইতেন, 'খাতুনে জন্নত' (হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ [রাঃ—আঃ) বেহেশ্‌তি খাতুন (স্বর্গস্থ নারি) গণের 'ছরদার' (প্রধানা—নেত্রী)। ইঁহার পবিত্র গর্ভে দুইজন 'মকদ্দছ' (পবিত্র—পাক) এমাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের 'শাহাদত' (শহীদ হওয়া) ও এমামত্‌, দুনিয়ার মোছলমানগণ হইতে 'খেরাজে এতেক্কাদ' (ভক্তি ও বিশ্বাসের খাজানা) আদায় করিয়াছে। আর যাঁহাদের 'এস্তেকলাল' (দৃঢ়তা—ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা) সমস্ত 'দুনিয়া জাহান' কে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। ইঁহারা ঐ মহামাননীয়া হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'আওলাদ' (সন্তান) ছিলেন—যাঁহাদের কার্য্য-কলাপে, অটল ধর্ম্ম বিশ্বাসে,

খোদা তা-লার প্রতি অসীম ভক্তি শ্রদ্ধায় এছলাম সঞ্জীবিত ও গৌরবান্বিত হইয়া আছে, এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত থাকিবে।

উর্দ্দু কবিতা।

ওম্মত তেরি মোজরেম ভি দোযখ্ ছে বরি নেক্‌লি ;
ছুরত মে তু এন্‌ছান থি ছিরতমে পরী নেক্‌লি।

খাতুন জন্নতের ইহাই কি কম 'ফজিলত'! (গৌরব—শ্রেষ্ঠত্ব) যে, ছৈয়দ গণের বংশ তরু তাঁহারই দ্বারায় এতাবৎ কাল দুনিয়াতে কায়েম (স্থাপিত—দৃঢ়ীকৃত) রহিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ 'ছহি মোছলেমে' বর্ণিত আছে, হজরত ছায়াদ-বিন্-আবিওক্কাছ (রাজিঃ) * ফরমাইয়াছেন, যখন আহ্‌লে-বায়েত্ সম্বন্ধে কোরআন পাকের আয়াত নাজেল হইল, তখন আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ),

---

* হজরত ছায়াদ বিন্-আবিওক্কাছ্ (রাজিঃ), আশরায় মোবাশ্বরার মধ্যে একজন। ইঁনি প্রাথমিক মোছলমানদিগের মধ্যে অন্যতম; ১৭ বৎসর বয়সে পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে-দীক্ষিত হন। খোদার পথে ইঁনিই সর্ব্ব প্রথমে, খোদা-দ্রোহী কাফেরদিগের বিরুদ্ধে তীর চালাইয়া ছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে সকল জেহাদেই ইঁনি যোগ দিয়াছিলেন। ইনি 'মস্তজবদ্দাওয়াত' ও ছিলেন, অর্থাৎ ইঁহার দোওয়া আল্লাহ তা-লার দরবারে গৃহীত হইত; এজন্য অনেকে তাঁহাকে ভয় করিতেন, কি জানি ইনি যদি 'বদ-দোওয়া' (অভিসম্পাত) করিয়া বসেন। হজরত রছুলে করিম (ছালঃ) ইঁহার জন্য এই বলিয়া আল্লাহ তা-লার দরগায়

(হজরত এমাম) হাছন এবং (হজরত এমাম) হোছেন রাজি আল্লাহ তা-লা আনহুম কে আহ্বান করিয়া ফরমাইলেন, হে আল্লাহ তা-লা! ইহারাই আমার 'আহ্লে-বয়েত'। তফছিরে কাশ্শাফে লিখিত আছে, যে এই আয়াত নজরানবাসী খৃষ্টীয়ানদিগের সঙ্গে মবাহেলাঃ (পরস্পরের প্রতি অভিসম্পাত) করিবার জন্য নাযেল হইয়াছিল। কিন্তু ঈছায়ী (খৃষ্টীয়ান) গণ 'মবাহেলাঃ' করিতে ভয় পাইয়াছিল; এজন্য

'খাছ' দোওয়া করিয়া ছিলেন যে, হে এলাহি! ইঁহার তীরের লক্ষ্য যেন কখনও 'খাতা' না করে (ব্যর্থ না হয়); আর ইঁহার দোওয়াও তুমি কবুল করিও। ইনি স্থূলকায় এবং খর্ব্বাকার ছিলেন। শরীর বহু রোম বিশিষ্ট ছিল। মহামান্য দ্বিতীয় খলিফার খেলাফৎ-কালে ইঁনিই পারস্য সাম্রাজ্য জয় করেন। মদীনার নিকটস্থ স্বীয় গৃহে, ৪৫ হিজরীতে, হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে এন্তেকাল করেন; তখন মারওয়ান-বিন-হকম মদীনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ঐ মারওয়ানই তাঁহার জানাযার নমাজ পড়াইয়াছিলেন। আশরায় মোবাশ্বরাদিগের মধ্যে ইঁনিই সর্ব্বশেষে পরলোক গমন করেন। যাঁহারা নিশ্চয়ই বেহেশ্তি বলিয়া সুসংবাদ ঘোষিত হইয়াছিল, তাঁহারাই আশরায় মোবাশ্বরাঃ। ১ হইতে ৪ নং খোলফায় রাশেদীন চতুষ্টয়, ৫। হজরত তাল্হা (রাজিঃ), ৬। হজরত যোবের (রাজিঃ), ৭। হজরত আবদুর রহমান-বিন্ যয়োফ্ (রাজিঃ), ৮। হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওক্কাছ (রাজিঃ), ৯। হজরত আবু ওবায়দাঃ-বিন্-জাররাহ (রাজিঃ), ১০। হজরত ছয়ীদ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ); তদ্ব্যতীত হজরত বিবী ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), এমাম হোছেন (রাজিঃ) কেও জন্নতি (বেহেশ্তি) বলিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) সুসংবাদ দিয়াছেন।

তাহারা 'মবাহেলাঃ' করিতে রাজী হইয়াছিল না। হজরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আযিয্ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রহঃ) লিখিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক মজবুৎ দলীল হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ও তাঁহার 'আওলাদ' (বংশধর)-দিগের 'ফজিলত' (সম্মান—শ্রেষ্ঠত্ব) সম্বন্ধে কিছুই হইতে পারে না যে, 'বনি-ফাতেমাঃ' ই হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'আওলাদ' (বংশধর)।

আয়াঃ-তৎহির—মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদিন প্রাতঃকালে জনাব হজরত রছুল খোদা (ছালঃ), একখানি 'মনক্কাশ' (সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট—সুচিত্রিত) চাদর গায় দিয়া বসিয়াছিলেন, ঐ সময় এমাম হাছন (রাজিঃ) সেখানে উপস্থিত হইলেন, আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে চাদরের মধ্যে টানিয়া লইলেন; পরে দ্বিতীয় ছাহেবযাদাঃ হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) আসিলেন, হুজুর (ছালঃ) তাঁহাকেও চাদরের ভিতরে গ্রহণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) ও সেখানে 'তশ্রিফ্' আনিলেন, হুজুর তাঁহাকে ও চাদরের মধ্যে টানিয়া লইলেন; অবশেষে হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুও সেখানে আগমন করিলেন, হুজুর (ছালঃ) তাঁহাকে ও চাদরের মধ্যে গ্রহণ করিলেন; এবং নিম্ন-লিখিত আয়াত পাঠ করিলেনঃ—ইন্নামা ইউরিদোল্লাহো লেয়ুয্হেবা আন্ কুমোর্ রেজ্ছা আহ্লাল বায়তে অয়ুতাহ্হেরাকুম্ তাত্হিরা। ছুরা আহ্যাব—৪র্থ রকু

আবু ছয়ীদ খুদরী (রাজিঃ) * বলেন, এই আয়াত পাক পাঞ্জতন

---

* হজরত আবু ছয়ীদ খুদরী (রাজিঃ)—ইঁহার পূর্ণনাম ছায়াদ-বিন্-মালেক খুদরী আন্ছারী (রাজিঃ) ছিল। ইঁনি স্বীয় কুনিয়েত আবু ছয়ীদ খুদরী নামেই প্রসিদ্ধ। এই মহাত্মা অতি উচ্চদরের আলেম ও ফাজেল ছিলেন।

সম্বন্ধে নাযেল হইয়াছিল। আর এক 'ছহি রওয়ায়েতে' (নির্ভুল বর্ণনায়) বর্ণিত আছে, হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত্ (ছালঃ) উপরোক্ত চারিজনকে চাদরে আচ্ছাদিত করিয়া ফরমাইয়াছিলেন, হে খোদাওন্দ তা-লা! ইহারাই আমার " আহ্লে-বয়েত "; তুমি ইহাদিগকে পাক (পবিত্র) কর; আর প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য (গোপনীয়) 'নজাছত' (অপবিত্রতা) ইহাদিগের মধ্য হইতে দূর কর।

দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন সকল 'নছব' (বংশ-মর্য্যাদা—খান্দানের গৌরব) ই বেকার হইয়া যাইবে; কেবল আমার নছব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আর সকল নবীর মেয়ের বংশধরগণ তাঁহাদের পিতার নামে পরিচিত হইবেন; কিন্তু ফাতেমার 'আওলাদ' আমার বংশধর বলিয়া পরিচিত হইবে।

ছহি-বোখারী গ্রন্থে হজরত মছুর-বিন্-মখ্রমাঃ (রাজিঃ) * হইতে

ইঁনি বহু হাদীছের বর্ণনাকারী। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হেজরতের ১০ বৎসর পূর্ব্বে মদীনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭৪ হিজরীতে, ৮৪ বৎসর বয়সে মদীনা তৈয়বায়ই পরলোক গমন করেন। 'জিন্নতল বকি' নামক স্বনাম প্রসিদ্ধ কবরস্থানে ইঁনি সমাহিত হইয়াছেন।

* মছুর-বিন্-মখ্রমাঃ (রাজিঃ)-এর কুনিয়েত আবু আবদুর রহমান যহরী কোরেশী ছিল। ইঁনি হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য্রোফ্ (রাজিঃ)-এর ভাগিনেয় ছিলেন। হেজরতের দুই বৎসর পরে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। ৮ম হিজরীর যেলহজ্জ মাসে মদীনায় আনীত হন। যখন আঁ হজরত (ছালঃ) পরলোক গমন করেন, তখন ইঁহার বয়ঃক্রম ৮ বৎসর। হুজুর (ছালঃ)-এর নিকট ইঁনি হাদীছ শুনিয়াছিলেন, এবং মনোযোগ

বর্ণিত আছে যে, জনাব হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, ফাতেমাঃ আমার 'পারাঃ গোশ্‌ত' (মাংসের টুকরা) ; যে উহাকে ক্রোধাবিষ্ট ও 'নারাজ' (অসন্তুষ্ট) করিবে, সে যেন আমাকে নারাজ করিল এবং ক্রোধাবিষ্ট করিল।

যয়েদ-বিন্ আরক্কম (রাজিঃ) * হইতে রওয়ায়েত আছে যে, তাঁ। হজরত (ছালঃ)-এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ), আলী (কঃ—ওঃ) ও হোছনায়েন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে যে লড়াই (যুদ্ধ) করিল, সে যেন আমার সঙ্গে লড়াই করিল ; আর যাহারা উহাদের সঙ্গে 'ছোলেহ' (সন্ধি) করিল, উহারা যেন আমার সঙ্গেই সন্ধি করিল। "ফৎহোল বারি" গ্রন্থে হজরত যয়েদ বিন্-আরক্কম (রাজিঃ)-এর বর্ণনা হইতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, মছজেদ নববীর সংলগ্ন বহু সংখ্যক ছাহাবী (রাজিঃ)-এর বাস গৃহ ছিল—যে সকল গৃহের দরওয়াযাঃ ছিল মছজেদের ভিতর দিয়া। তাঁ

সহকারে তাহা স্মরণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শাহাদত কাল পর্য্যন্ত ইঁনি মদীনা শরীফে ছিলেন, পরে মক্কায় চলিয়া আইসেন। ইঁনি এযিদের নামে বায়য়েত করিতে 'এন্‌কার' (অস্বীকৃতি জ্ঞাপন) করিয়াছিলেন। মক্কায় থাকিতে একটা প্রস্তরে আঘাত পাইয়া, ৭৪ হিজরীর রবিয়ল-আউওল মাসের প্রারম্ভে ইঁনি এন্তেকাল করেন।

* হজরত যয়েদ-বিন্-আরক্কম (রাজিঃ)-এর কুনিয়েত আবু ওমর আন্‌ছারী যররজি। ইঁনি মদীনা মনুওরার বসবাস ত্যাগ পূর্ব্বক কুফা নগরীতে গিয়া বাস করিতেছিলেন। ইঁহার নিকট অনেকে হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। ৬৬ হিজরীতে কুফা নগরীতেই ইঁনি দেহত্যাগ করেন। ইঁনিও বহু সংখ্যক হাদীছের বর্ণনাকারী।

হজরত (ছালঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহ ব্যতীত আর সকলের গৃহের দরওয়াযাঃ মছজেদের দিক দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ 'য়েতরাজ' (প্রতিবাদ) করাতে তিনি ফরমাইলেন যে, আমি আপনা হইতে এই কার্য্য করি নাই, বরং আমাকে আল্লাহ তা-লা এইরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন—আমি ঐ আদেশ পালন করিয়াছি মাত্র।

হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল (ভাবার্থঃ)—"আমি তোমার নিকট কোনও 'উজরত' (পারিশ্রমিক) চাই না, কিন্তু সমস্ত আকরবার 'মহব্বৎ' (আত্মীয়গণের প্রতি ভালবাসা) চাই। আঁ হজরত (ছাল-)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, এস্থলে কোন্ কোন্ লোকদিগের প্রতি 'এশারাঃ' (ইঙ্গিত) করা হইয়াছে—যাঁহাদের প্রতি 'মহব্বৎ' (ভালবাসা) 'ওয়াজেব' (অবশ্য কর্ত্তব্য) বলা হইয়াছে ? আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ), আলী (কঃ—ওঃ), আর তাঁহাদের উভয় 'ফরযন্দ' (পুত্র—এমাম ছাহেবদ্বয়)-এর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে (মছনদ এমাম আহ্‌মদ এব্‌নে খলিল [রহঃ]-এর পক্ষ হইতে)।

হজরত আবু ছয়ীদ খুদরি (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত আছে যে, একদা হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন করিলেন এবং ফরমাইলেন, অয়ি ফাতেমাঃ ! আমি, তুমি, আলী ও হোছনায়েন (এমাম ভ্রাতৃদ্বয়) কেয়ামতের দিন এক-স্থানে থাকিব (বা একত্রে সম্মিলিত হইব)।

হজরত এমাম মালেক (রহঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ—কেহই হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর 'জগরগোশাঃ' (হৃৎপিণ্ডের টুকরা বা কলেজার অংশ) হইতে 'ফজিলত' রাখে না (সম্মান বিশিষ্ট নয়)—যখন স্বয়ং আল্লাহ

তা-লা কোরআন পাকে ফরমাইয়াছেন (ভাবার্থ)—নেকাহ্ কর স্ত্রীলোক-দিগকে—যাহারা তোমাদের পছন্দ (মনোনীত) হয়, দুই তিন কিংবা চারিজন। এই আয়াত অনুযায়ী হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষে অধিকার ছিল যে, তিনি আরও (একাধিক) বিবাহ করেন। কিন্তু হজরত ছারওয়ারে-কায়েনাত রছুল করিম (ছালঃ) তাঁহাকে অন্য বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। এমাম মালেক (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, যেরূপ চারিজন অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বিবাহ করিবার 'এজাযত' (আদেশ—হুকুম) কেবলমাত্র আঁ হজরত (ছালঃ)-এর জন্য বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; সেইরূপ হজরত ফাতেমাঃ যোহরার (রাঃ—আঃ) বর্ত্তমানে (জীবিতকালে) হজরত শেরে খোদা আলী (কঃ—ওঃ)-কে অন্য বিবাহ করিতে বাধা দেওয়া, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পক্ষে ' দোরস্ত' (সিদ্ধ) ছিল—যিনি ছাহেবে শরিয়ত (শরিয়তের উদ্ভাবন কর্ত্তা বা শরিয়ত-প্রবর্ত্তক) ছিলেন; অন্য স্ত্রীলোকের জন্য এই 'হক্ হাছেল' ছিল না; অর্থাৎ অপর স্ত্রীলোকের জন্য এই ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; না আর কোনও ব্যক্তি শরিয়ত অনুযায়ী স্বীয় 'দামাদ' (জামাতা) কে অন্য বিবাহ করিতে নিষেধ করিবার অধিকারী। এই 'রেয়ায়েত' (অধিকার) আঁ হজরত (ছালঃ)-কেবলমাত্র স্বীয় 'মোকদ্দছ' ও 'তাহেরা' (পবিত্র) কন্যার জন্য 'জায়েয্' (সিদ্ধ) রাখিয়া ছিলেন। না প্রত্যেক পিতার 'দরজাঃ' (সম্মান) হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর সমান হইতে পারে, না সকল 'বেটী' (কন্যা) হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ফযায়েলের (সম্মানের—প্রাধান্যের) নিকট পঁহুছিতে পারে। অর্থাৎ ইঁহাদের পিতা-পুত্রীর মধ্যে যে বিশেষরূপ বিশেষত্ব ছিল, ইহা সকলেই অবাধে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

হাকেম (রাজিঃ), হজরত আবু ছয়ীদ খুদরি (রাজিঃ) হইতে

রওয়ায়েত করিয়াছেন, এবং ইহাকে ছহিহ্ হাদীছ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; ঐ হাদীছ এই যে, হজরত রছুল করিম (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, "(হজরত) ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) জন্নতের (স্বর্গবাসিনী) বিবীগণের ছরদার (অধিনেত্রী) ; কিন্তু মরিয়ম-বিন্তে-এমরান (আলাঃ) এই সীমার বহির্ভূত।" ইহা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, বিবী মরিয়ম (হজরত ঈছা আলায়হেচ্ছালামের জননী) ও স্বর্গীয় নারিগণের একজন অধিনেত্রী ; এবং তাঁহার সম্মান ও অতি উচ্চ।

হাকেম (রাজিঃ), ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন, এবং এই হাদীছকে সহীহ্ (বিশুদ্ধ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; তিনি লিখিয়াছেন যে, হজরত রছুল করিম (ছালঃ) পীড়িত অবস্থায় (যে পীড়ায় তিনি এন্তেকাল করিয়াছিলেন) হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে ফরমাইয়া ছিলেন, "তুমি কি এই বিষয় রাজী (সন্তুষ্ট) হইবে না যে, এই ওম্মতের (আমার ওম্মত অর্থাৎ মতানুবর্ত্তিগণের) সমুদয় স্ত্রীলোকও সমুদয় মুমেনা স্ত্রীলোক এবং 'ছারাজাহানের' (সমগ্র ছুনিয়ার) স্ত্রীলোকদিগের ছরদার তোমাকে বানান হয় ?"

হাকেম (রাজিঃ), হযিফাঃ (রাজিঃ) হইতে, আর তিনি হজরত রছুলোল্লাহ (ছালঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন (শ্রবণ করিয়াছেন) যে, তিনি (হজরত [ছালঃ]) ফরমাইয়াছেন যে, "হজরত জিব্রিল আমার নিকট আগমন করিলেন, এবং বলিলেন, (হজরত এমাম) হাছন (রাজিঃ) ও (হজরত এমাম) হোছায়েন (রাজিঃ), আহ্লে জন্নতের (বেহেশ্ত্ বা মোছলেম-স্বর্গস্থিত) পুরুষগণের ছরদার।"

হারেছ-বিন্-আবি আছামাঃ, মোহাম্মদ-বিন্ আলী হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছায়েন

(রাজিঃ), মাতামহ হজরত রছুল আকরম (ছালঃ)-এর সম্মুখে একদা কুশ্‌তি লড়িতে ছিলেন, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, হে হাছন, জল্‌দী কর (শীঘ্র কুশ্‌তি শেষ কর) ; হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ফরমাইলেন, এয়া রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ), আপনি হাছনের সাহায্য করিতেছেন ? ইহাতে বোধ হইতেছে, আপনার নিকট হোছায়েন অপেক্ষা হাছন অধিক প্রিয় ও স্নেহ-ভাজন। হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন ; " জিবরিল আলায়হেছ্ছালাম হোছায়নের সাহায্য করিতেছেন ; এজন্য আমি ইচ্ছা করি যে, হাছনের সাহায্য করি।" এই হাদীছ 'মোরছল'।

হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) হইতে বহু রওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে এস্থলে কয়েকটি রওয়ায়েত বর্ণনা করা যাইতেছে। জনাব হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ফরমাইয়াছেন, একদা হজরত নবী করিম (ছালঃ) আমার নিকট বসিয়াছিলেন, ঐ সময় এক 'খাদেমাঃ' (পরিচারিকা—দাসী) তথায় উপস্থিত হইল ; সে আঁ হজরত (ছালঃ)-কে বলিতে লাগিল, ইয়া রছুলোল্লাহ্ ! আমার 'আকা' (প্রভু—মনিব) তেজারতের জন্য (বাণিজ্যার্থ) 'বাহের' (ভিন্ন দেশে) গমন করিয়াছেন ; আর আমার প্রভুপত্নী গৃহে একাকিনী আছেন। তিনি গৃহের 'বালায়ী হেচ্ছায়' (উপর তলায়) বাস করেন, আর ঐ গৃহের নীচের তলায় তাঁহার বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা পিতা মাতা অবস্থান করিয়া থাকেন। আমার প্রভু বাণিজ্য-যাত্রাকালে প্রভু-পত্নীকে বলিয়া গিয়াছেন, আমি যে পর্য্যন্ত প্রবাস হইতে ফিরিয়া না আসি, তৎকাল পর্য্যন্ত তুমি এই গৃহের উপর তলা হইতে নিম্নে অবতরণ করিও না। এক্ষণে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমার প্রভু-পত্নীর পিতা কঠিন রোগাক্রান্ত ; আর তাঁহার মাতাও পীড়িতা। এমন কোনও লোক নাই যে, তাঁহাদের 'খবরগিরী' (পরিচর্য্যা) করে। এজন্য আমার প্রভু-পত্নী হুজুরের খেদমতে আরজ করিয়াছেন যে,

যদি হুজুর 'এজাযত' (আদেশ) দেন, তবে বিবী ছাহেবা উপর তল হইতে নিম্নতলে আগমন পূর্ব্বক পিতা মাতার 'খেদমত' (পরিচর্য্যা—সেবা-শুশ্রূষা) করিতে পারেন।

হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ফরমাইতেছেন, আঁ হজরত (ছালঃ) ঐ দাসীকে নিজের নিকট বসাইলেন, এবং ফরমাইলেন, তোমার বিবীকে গিয়া বলিয়া দাও যে, যে পর্য্যন্ত তাহার স্বামী গৃহে প্রত্যাবৃত্ত না হয়, খবরদার! সে পর্য্যন্ত সে যেন গৃহের নিম্নতলে পদার্পণ না করে। একথা শুনিয়া পরিচারিকা চলিয়া গেল। দুই ঘণ্টা (৫ দণ্ড) পরে ঐ দাসী আবার আসিল, এবং হুজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে আরজ করিল, এয়া রছুলোল্লাহ্, এক্ষণে আমার বিবীর পিতা জানকন্নির হালাতে (মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বের) অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন, হুজুর অনুমতি দিলে বিবী নীচে (পিতার নিকটে) নামিয়া আসিতে পারেন। হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, তুমি গিয়া তোমার বিবী (প্রভুপত্নী)-কে বল, যদি সে খোদা ও তাঁহার রছুলের সন্তুষ্টি লাভ করিতে চায়, তবে উহার পিতার মৃত্যু হইলেও যেন নীচে অবতরণ না করে। স্বামীর বিনানুমতিতে তাহার পক্ষে নীচে অবতরণ করা কোনও ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। দাসী চলিয়া গেল, এবং তখনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বিবীর পিতা 'এন্তেকাল' করিয়াছেন (মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন), বিবী গৃহের উপর তলে বসিয়া রোদন করিতেছেন, পিতার 'আখেরী দীদার' (শেষ সাক্ষাৎ) লাভেও 'মহ রুম' (বঞ্চিত) হইতেছেন। হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, অয়ি 'লাড়্কি' (মেয়ে)! বেশ করিয়া শুনিয়া লও, এবং স্মরণ রাখ, যে পর্য্যন্ত ঐ বিবীর স্বামী আসিয়া নীচে অবতরণ করিবার আদেশ নাদেয়, সে পর্য্যন্ত যাহাই কিছু হউক না কেন? তাহার নীচে অবতরণ করা জায়েয (সিদ্ধ—কর্ত্তব্য) নহে। তুমি

যাও, তোমার বিবীকে গিয়া বলিয়া দাও—খোদা, তাঁহার রছুল এবং স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করুক,পরলোকে ইহার 'আজর' (প্রতিদান—সুফল) লাভ করিবে। পরিচারিকাটি ফিরিয়া গেল। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে ঐ পরিচারিকাটি যখন হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর খেদমতে উপস্থিতহইল, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বিবীর এখন কি অবস্থা ? সে বলিল, 'কোরবান' হই এয়া বিন্তে রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ) ; আমার বিবীর পিতা ও মাতা ত ঐ দিনই পরলোক গমন করিয়াছিলেন ; হুজুর (ছালঃ)-এর আদেশক্রমে বিবী নিম্নে অবতরণ করিয়া মৃত পিতা মাতাকে দর্শনও করেন নাই। ইহার কয়েক দিন পর আমার প্রভু বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; এবং সমুদয় ঘটনা আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া প্রথমে বড়ই 'পেরেশান' (দুঃখিত) হইলেন এবং স্বীয় 'নেকবখ ত্' (ধর্ম্মানুরাগিনী) বিবীর এরূপ 'ফরমাবরদারীর' (আদেশ প্রতিপালনের) ব্যাপারে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ঐ রাত্রেই বিবী স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার পিতা মাতা 'জন্নতে' (বেহেশ্‌তে—মোস্‌লেম-স্বর্গে), অপূর্ব্ব অট্টালিকায় মণি-মুক্তা-বিখচিত অপূর্ব্ব সিংহাসনে বসিয়া আছেন। হুরগণ তাঁহাদের মস্তকোপরি চামর ব্যজন করিতেছে। বিবী স্বীয় পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দুনিয়াতে ত আপনাদের 'আমাল' (কার্য্য-কলাপ) এরূপ ছিল না যে, আপনারা স্বর্গলাভের অধিকারী হইতে পারেন ; কিন্তু আপনাদের এ কি অবস্থা দেখিতেছি ? তাঁহার পিতামাতা উত্তর করিলেন, 'বেটি' ! (কন্যে !) তুমি যে স্বীয় স্বামী এবং খোদা ও রছুল (ছালঃ)-এর আদেশ সম্পূর্ণ রূপে পালন করিয়াছিলে, তাহারই ফলে আমরা 'জন্নতে' (বেহেশ্‌তে) স্থান লাভ করিয়া, এই অনুপম সুখ-সম্পদের অধিকারী হইয়াছি। ছোবহানাল্লাহ ! খোদা তা-লা ও তাঁহার রছুলের আদেশ, তদানীন্তন কালের মহিলাগণ কিরূপ

একাগ্রচিত্তে—ভক্তি-প্রবণ হৃদয়ে পালন করিতেন, এই ঘটনা দ্বারা তাহা সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন হয়। পাঠক! ব্যাপার খানা একবার বুঝুন; একই গৃহের 'বালায়ী-হেচ্ছায়' (উপর তলায়) বিবী বাস করিতেন, আর নিম্ন-তলে তাঁহার পিতা মাতা থাকিতেন; পিতামাতা পীড়িত হইলেন, তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যার জন্ত লোক ছিল না; হয় ত দাস দাসিগণ কতকটা দেখা শুনা করিত কিংবা আহারাদি করাইত। বিবীর স্বামী প্রবাস গমনকালে তাঁহার স্ত্রীকে দ্বিতল হইতে নিম্নে পদক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; তাঁহার পিতা মাতা মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইলেও, হজরত রছুলে করিম (ছালঃ)-এর নিকট পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন; তিনি স্বামীর আদেশের বিপরীতাচরণ করিতে দৃঢ়তার সহিত নিষেধ করিলেন; এমন কি, পিতামাতা মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেও, বিবী নীচে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না; খোদা ও তাহার রছুলের আদেশ বিবী সম্পূর্ণ রূপে পালন করিলেন; স্বামীর আদেশের অন্তথাচরণ করিলেন না। পিতামাতা কবরস্থ হইলেন, তবু সেই ধর্ম্মভয়ে ভীতা আদর্শ মহিলা গৃহের নিম্ন-তলে অবতরণ পূর্ব্বক পিতা মাতাকে মৃত অবস্থায় দেখিতেও বিরত থাকিলেন; ইহার সুফল সঙ্গে সঙ্গেই ফলিল; বিবী তাহা স্বপ্নযোগে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হইলেন। স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বিবীর কার্য্যে মোহিত হইলেন, এমন ধর্ম্মপরায়ণা পত্নী লাভ করিয়াছেন বলিয়া খোদার দরবারে "শোকর-গোজার" হইলেন। আর আঁ হজরত (ছালঃ)-এর দৃঢ়তা ও আল্লাহ তা-লার আদেশ পালনে একাগ্রতা দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আজকালের স্ত্রীলোকদিগকে দেখুন, ইহাদের মধ্যে পনর আনাই স্বেচ্ছাচারিণী, স্বামীর ন্যায়সঙ্গত আদেশ ও উপদেশের কোন পরওয়া করেন না; খোদা ও রছুলের আদেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতে নারাজ,

তাহারা বিলাসিতায় নিমগ্ন; শোকর ও ছবর নাই। পাশ্চাত্য বিষাক্ত হাওয়া সজোরে প্রবাহিত হইয়া নারী জাতিকে নির্লজ্জ, বেহায়া, স্বেচ্ছাচারিণী ও বিলাসিনী করিয়া তুলিয়াছে। জাতীয় ও 'শরহবি' শিক্ষার অভাবে বিজাতীয় শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন। স্বামী গরীব হইলে স্ত্রী তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন; ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল বস্ত্রালঙ্কার লাভের জন্য বিষম আবদার করিতেছেন; অভিমানে কাল ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিতেছেন। অবস্থাপন্ন হইলে গৃহস্থালীর দিকে তেমন লক্ষ্য করিতেছেন না; চাকর-চাকরাণীর হস্তে সকল কার্য্যভার অর্পণ করিয়া, স্বয়ং নাটক-নভেল পড়িয়া, বিছনায়, সোফা বা ইজি চেয়ারে সটান হইয়া হাই তুলিতেছেন; সন্তান প্রতিপালনের ভার দাই, খেলায়ী বা পাশ্চাত্য অনুকরণে আয়ার হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক শান্তির নিশ্বাস ফেলিতেছেন। উদ্যান ভ্রমণ, থিয়েটার-বায়স্কোপ দর্শন, উন্মুক্ত মটর বা গাড়ীতে বায়ু সেবন—ইত্যাদি বিলাসিতার চুড়ান্ত নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিতেছেন। আবার আব-হাওয়া বদলাইবার জন্য দার্জ্জিলিং, শিলং, পুরী, ওয়ালটেয়ার, রাঁচি, শিমূলতলা, গিরিডি বা মধুপুরে গমন পূর্ব্বক বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে 'বে-পরদেগী' ও বিলাসিতার মাত্রা খুবই বাড়াইতেছেন। আমরা এক ভদ্র লোকের বিষয় জানি, স্বীয় ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহাকে ভীষণ গ্রীষ্মকালেও কলিকাতায় বাস করিতে হয়। কিন্তু বিবী ছাহেবা মাসিক ৩০০৲ ব্যয় করিয়া দার্জ্জিলিঙ্গে গ্রীষ্ম-কাল অতিবাহিত করেন। তথাকথিত উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত লোকের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, খুব জোর পিতামাতাকে লইয়া সংসার চালান। অন্য আত্মীয়-স্বজন, দেশবাসী, পাড়া-প্রতিবেশী, স্বধর্ম্মাবলম্বী, দরিদ্র শিক্ষার্থী প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট হইতে প্রায় কোনই সাহায্য পাননা। কন্যাদিগকে বিলাসিতা পূর্ণ শিক্ষাদান পূর্ব্বক তাহাদের আদর্শকে নিতান্ত খাটো করা হয়।

জনাব ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) আর একটি রওয়ায়েত করিয়াছেন, তাহা এই যে, একদা আঁ হজরত (ছালঃ) ভ্রমণার্থ কোনও উদ্যানে উপনীত হন। ঐ স্থানে কতিপয় 'বকরী' (ছাগ) চরিতে ছিল, উহারা তাঁহাকে দেখিয়া 'তায়জিম' (সম্মান প্রদর্শন) জন্য ছেজ্‌দাঃ (ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণিপাত) করে। সঙ্গীয় একজন ছাহাবাঃ (রাজিঃ) আরজ করিলেন, এয়া রছুলেল্লাহ্‌ (ছালঃ)! যখন বাক্‌শক্তি হীন পশু আপনাকে ছেজদাঃ করিতেছে, তখন আমাদিগকেও অনুমতি প্রদান করুন, আমরা আপনাকে ছেজদাঃ করি। তচ্ছ্‌্রবণে হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, হে লোক সকল! (প্রিয় শিষ্যমণ্ডলি!) যদি আল্লাহ্‌ ব্যতীত তালা কাহাকেও ছেজদাঃ (ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণিপাত) করা সিদ্ধ হইত, তবে আমি সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ তায়ালার শপথ করিয়া বলিতেছি, সমুদয় দুনিয়ার নারী জাতিকে দৃঢ়তার সহিত আদেশ প্রদান করিতাম যে, তাহারা স্ব স্ব স্বামীকে ছেজদাঃ করে। এই রওয়ায়েত দ্বারা একথা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, জনাব হজরত পয়গম্বর খোদা (ছালঃ), স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কিরূপ ভক্তি প্রদর্শন ও তাহাদের আদেশ প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর এতদপেক্ষা অধিক 'তায়জিম' এর (সম্মান প্রদর্শনের) কথা আর কি হইতে পারে? এতদ্দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রছুলের পরেই নারীর পক্ষে তাহাদের স্বামী :সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ। সেই স্বামীদিগকে কেবলমাত্র একজন সহযোগী, সহকর্ম্মী বা বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিলেই চলিবে না; তাহাদিগকে পরম ভক্তি-ভাজন দেবতা স্বরূপ মনে করিতে হইবে; এবং তদনুরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাহাদের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন করিতে হইবে। বর্ত্তমানকালে এই ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আদেশ প্রতিপালনের মাত্রা ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

হজরত আলী-বিন্-আবিতালেব (কঃ—ওঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'চাচ্চাযাদ ভাই' (পিতৃব্য-পুত্র—চাচাতো ভাই)। ইঁহাদের উভয়ের পিতা হজরত আবদুল্লা ও আবুতালেব পরস্পর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। বালকদিগের মধ্যে ইঁনিই সর্ব্ব প্রথমে পবিত্র এছলাম ধর্ম্মগ্রহণ এবং আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নবুয়ত স্বীকার করেন। যখন এই শেরে খোদা (আল্লাহ, তালার শার্দ্দূল) পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তখন ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ১০ বৎসর মাত্র ছিল। ইহা দ্বারা একথা প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহার 'ফেৎরত' (জন্মকাল)ই যেন এছলাম ছিল; অর্থাৎ জন্মকাল হইতেই তিনি মোছলমান ছিলেন। কারণ বালকগণ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহারা এছলাম ধর্ম্মাবলম্বী থাকে; 'নাবালেগ্' (অপ্রাপ্ত বয়স) পর্য্যন্ত তাহারা এছলাম ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যেই অবস্থান করে, সুতরাং হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই শৈশবকাল অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন; এরূপ ক্ষেত্রে কোফরীর অবস্থা তাঁহার জীবনে কখনও ঘটে নাই। পাঠক! সেই সময়ের কথা চিন্তা করুন; আঁ হজরত (ছালঃ) যখন স্বীয় নবুয়তের বিষয় আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া জন-সাধারণের মধ্যে ঘোষণা করেন, সেই সময় মক্কার কোরেশ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের পৌত্তলিক লোকেরা তাঁহার প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নগরের সমস্ত নরনারী, বালক-যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ তাঁহার ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার এবং তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী এছলাম ধর্ম্মগ্রহণকারী মুষ্টিমেয় নরনারী মক্কাবাসী-দিগের ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র—ঘোর শত্রু রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে মুষ্টিমেয় এছলাম ধর্ম্মাবলম্বীর অস্তিত্বই ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। কোরেশ ও মক্কাবাসী পৌত্তলিক সম্প্রদায় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি যেরূপ অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতেছিল,

তাঁহাকে পদে পদে অপদস্থ করিতেছিল, জগতে তাহার তুলনা নাই। একদা কোরেশদিগের জনতা মধ্যে দাঁড়াইয়া হজরত পয়গম্বর (ছাল্ঃ) ফরমাইলেন, যদি তোমাদের মধ্য হইতে কতিপয় লোকও আমার সঙ্গী হইয়া যাও, তবে আমি দেখাইয়া দিতে পারি, খোদা তালার আদেশ কি প্রকারে 'এশয়াত' (প্রচার) হইতে পারে। তৎক্ষণাৎ ১০ বৎসর বয়স্ক বালক হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সোৎসাহে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হে আল্লাহির সত্য ও মনোনীত রছুল! আমি 'দেলে' ও 'জানে' (মন-প্রাণে) আপনার সঙ্গী থাকিব—আপনার আদেশ প্রতি-পালন করিব। ছোব্‌হানাল্লাহ্! একটি দশ বৎসর বয়স্ক বালক—দুনিয়ায় ভাল মন্দ কোন খবর রাখিতেন না; এতদ্ স্বত্বেও সত্যতা ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ঈদৃশ অটলভাব! প্রকাশ্যে ত এই বাক্য হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল; কিন্তু 'জান্‌নেওয়ালা' জানেন যে, উহা খোদা-প্রদত্ত 'খাছ' একটি শক্তি ছিল—যাহা ঐ বালকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল; কোরেশ জন-সঙ্ঘ ত আঁ হজরত (ছাল্ঃ)-এর এই পবিত্র উক্তি শ্রবণে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেছিল; কিন্তু আঁ হজরত (ছাল্ঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে গলায় জড়াইয়া ধরিলেন, এছলামের গৌরব বর্ণনা করিলেন, আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর 'হেম্মত' (সাহস) ও মানসিক বলের প্রশংসা করিলেন। কিন্তু ঐ সময় কে জানিত, এই বালক—যাঁহাকে আজ কোরেশগণ হেকারত (ঘৃণা)-এর দৃষ্টিতে দেখিতেছে, তিনি একদা দুনিয়াতে 'শোজায়ত' (বীরত্ব) ও 'মায়রেফতের' (তত্ত্ব-জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের) বাদশাহ হইবেন। 'কেয়ামত' (পৃথিবীর ধ্বংসকাল) পর্য্যন্ত ইঁহার বীরত্ব ও ইমানদারী (ধার্ম্মিকতা) কোটি কোটি মনুষ্যের মুখে প্রতিধ্বনিত হইবে; ইনি আদর্শ বীর ও আদর্শ ধার্ম্মিক পুরুষ বলিয়া সম্মান লাভ করিবেন। আর হজরত

রছুল করিম (ছালঃ)-এর হৃদয়ের টুকরা হজরত বতুল (রাঃ—আঃ), ইঁহার সহিত পরিণীতা হইয়া, ইঁহার গৌরব ও সম্মান আরও অধিক পরিমাণে বৰ্দ্ধিত করিবেন। কেবল তাহাই নহে, কিয়ৎকাল পরে 'তখ্‌তে খেলাফৎ' (খলিফীয় সিংহাসন) ইঁহার পবিত্র পদ চুম্বন করিবে। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এছলাম গ্রহণ করিবামাত্র কোরেশগণ তাঁহার প্রাণের বৈরী হইল। আঁ হজরত (ছালঃ) ও কোরেশ কর্তৃক হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষভাব বা শত্রুতাচরণের বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতেছিলেন যে, আরবের পৌত্তলিক অধিবাসিগণ এই 'মাসুম' (নিষ্পাপ) বালকের প্রাণের শত্রু হইয়াছে; সুতরাং হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর 'হেফাযতের (রক্ষণাবেক্ষণের) খেয়াল তাঁহার মনে সর্ব্বদাই জাগরুক থাকিত। হুজুর (ছালঃ) সাধ্যানুসারে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে চোখে চোখে রাখিতেন—প্রায়ই চক্ষের অন্তরাল হইতে দিতেন না। কোনও দীনের অর্থাৎ ধর্ম্মের শত্রু তাঁহাকে বিপদ্‌ গ্রস্ত কিংবা অবমানিত করে, এই আশঙ্কা তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজ করিত। হুজুর (ছালঃ) কেবল মাত্র যে হজরত ছৈয়দতোন্‌ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ভাবনাই ভাবিতেন, তাহা নহে; শেরে-খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি 'নেগাহ্‌দাশ্‌ত্‌' (লক্ষ্য রাখা) ও তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'শফিক' (স্নেহ-পরায়ণতার—মেহেরবানীর) হস্ত ঐরূপ হজরত আলী (রাজিঃ)-এর মস্তকের উপর ছিল—যেরূপ আবুতালেব পিতৃ-মাতৃহীন বালক আঁ হজরত (ছালঃ)-কে অতি স্নেহে লালন পালন করিয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন; শেরে খোদা (কঃ—ওঃ) ও ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ

করিতেন; তদীয় আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, কার্য্য-কলাপ, জ্বলন্ত ধর্ম্মভাব, খোদানুরক্তি প্রভৃতির সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতেন। আঁ হজরত (ছালঃ) এই প্রতিপালিত, আশ্রিত, সম্পূর্ণ অনুগত ও আদর্শ চরিত্রবান্ ভ্রাতাকে এত ভাল বাসিতেন ও স্নেহ করিতেন যে, তাহার তুলনা হয় না। হজরত আলী (কঃ—জঃ)-এর প্রতি তাঁহার 'কোদরতি' (স্বভাব জাত) ভাল বাসা ছিল; যখন হুজুর (ছালঃ) বাহিরে যাইতেন, অনেক সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে সঙ্গে লইয়া গমন করিতেন। 'কোফ্ফার' (মক্কার কোরেশ ও পৌত্তলিক আরবগণ) হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে দেখিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইত; তাহারা জানিত, এই যুবক আঁ হজরত (ছালঃ)-এর দক্ষিণ বাহু স্বরূপ তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের সাহায্যকারী, প্রত্যেক বিষয়ের পক্ষসমর্থন কারী, তাঁহার জন্য জীবনোৎসর্গ কারী; পক্ষান্তরে এই তরুণ বয়সেই মহাবীর পুরুষ, দুর্জ্জয় সাহসী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও মহা অধ্যবসায়শীল। ইঁহার সহায়তা লাভে হুজুর (ছালঃ) অধিকতর বলীয়ান্। তাহারা উভয়কে একই প্রকার কোপ বা বিষ-দৃষ্টিতে দেখিত। অন্যান্য ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ সকল সময় সঙ্গে থাকিতেন না, স্ব স্ব বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন, বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করিতেন, সুযোগক্রমে মাত্র সম্মিলিত হইতেন, কিন্তু এই তেজস্বী ও বল-দর্পিত যুবক ছায়ার ন্যায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতার—শিক্ষাদাতা ধর্ম্ম-গুরুর অনুসরণ করিতেন; শত্রুর আক্রমণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন; তিনি অস্ত্রহীন অবস্থায় চলিতেন না। বীরত্বে স্বীয় অন্যতম পিতৃব্য মহাবীর হজরত আমীর হামযাঃ (রাজিঃ)-এর আদর্শ স্বরূপ ছিলেন; মক্কা নগরীতে এ উভয়ের বীরত্বেই কাফের দল অনেকটা ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল। মক্কাবাসী কোরেশ এবং অন্যান্য পৌত্তলিকগণ জানিত, আঁ হজরত (ছালঃ) একজন দয়ালু, হৃদয়বান্,

পরহিতৈষী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বিশ্বস্ত পুরুষ ; কোনও প্রকার দোষ তাঁহার চরিত্রে নাই ; তবুও তাহারা তাহাদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচারী বলিয়া তাঁহার প্রতি এতাদৃশ বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়াছিল—আর তাহাদের সেই বিদ্বেষানল ক্রমেই অধিকতর প্রবল ভাবে প্রজ্জলিত হইতেছিল। তাহারা দুনিয়াতে তাঁহার ন্যায় ঘোর শত্রু আর কাহাকেও মনে করিত না। পৌত্তলিকতা এমন বদ জিনিষ যে, যে ব্যক্তি পৌত্তলিক ও খোদাদ্রোহী হয়, তাহার হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া যায় ; অধর্ম্মাচারের বিষাক্ত বায়ুতে তাহার হৃদয় বিকৃত ও কলুষিত হইয়া পড়ে। সে সেই স্ব হস্তে নির্ম্মিত মৃত্তিকা বা প্রস্তর কিংবা কাষ্ঠ নির্ম্মিত পুত্তলিকা গুলিকেই মুক্তির একমাত্র অবলম্বন বলিয়া মনে করে। সেই অচল ও অক্ষম পদার্থ গুলির সম্মুখে মাথা রগ্‌ড়াইতে থাকে। ভক্তি গদ্‌গদ্ চিত্তে তাহাদের উপাসনা করে। তাহাদিগকে বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, পালন কর্ত্তা ও বিনাশ কর্ত্তা বলিয়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। সুতরাং ঐ গুলির বিরুদ্ধে কোনও কথা শুনিলেই তাহাদের ক্রোধ ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। পুরুষ অপেক্ষা নারীর ভক্তির প্রবাহটা আরও বেগবতী, সুতরাং তাহাদের ক্রোধাগ্নি আরও প্রকট ভাবে আত্ম-প্রকাশ করে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও পিতামাতা বা অন্যান্য গুরুজনের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তরুণ বয়স হইতেই পৌত্তলিক-মন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়। তাহাদের হৃদয় অন্ধ বিশ্বাসের গভীর তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। গর্ব্বোন্মত্ত কোরেশগণ ইচ্ছা করিত, যেরূপেই হউক, আবদুল্লার পুত্রকে (নঊয্ 'বেল্লাহ্) 'হালাক' (নিহত) করিয়া দেওয়া চাই। উদ্দেশ্য, দুনিয়াতে এই লোকটির অস্তিত্ব না থাকে ; আর আমাদিগকে ও আমাদের দেব-দেবীর বিরুদ্ধাচরণ—তাহাদের অবমাননা কর উক্তি শ্রবণ ইত্যাদি নিদারুণ মনোকষ্ট ভোগ করিতে না হয়। আল্লাহ্

তা-লার ইচ্ছা ছিল, এই বিদ্রোহী দলকে অপ্রস্তুত করা ; এজন্য তাহাদের সর্ব্বপ্রকার প্রাণপণ চেষ্টা, সর্ব্বপ্রকার কঠোর 'তদ্‌বির' (যোগাড়-যন্ত্র) পরিণামে কিছুমাত্র সাফল্য মণ্ডিত হইল না—তাহারা পদে পদে বিফল মনোরথ হইল। একটি নগরের বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত সমগ্র অধিবাসী মিলিয়া একটি ক্ষুদ্রতম শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারিল না ; তাহারা যতই সেই স্বর্গীয় শক্তিকে দাবাইতে চেষ্টা করিল, সে পবিত্র শক্তি ততই বল সঞ্চয় করিয়া দ্রুতবেগে উন্নতি-পথে ধাবিত হইতে লাগিল। পৌত্তলিকদিগের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া পড়িল। মক্কার অত বড় প্রবল শক্তি সম্পন্ন জাতি গুলির প্রাণপণ চেষ্টার বিপরীত ফলই ক্রমশঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। মক্কাবাসী—বিশেষতঃ কোরেশগণ আপনাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর একটি রোমও বক্র করিতে পারিতেছিল না। হুজুর (ছালঃ) এর দৃঢ়সঙ্কল্প, অমানুষিক 'এস্তেক্‌লাল' (ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা) 'গযবের' ছিল ; যতই তাঁহার প্রতি অত্যাচার করা হইত, ততই তাঁহার আরব্ধ কার্য্য মহাশক্তিশালী হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিত ; সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধাচারী ও বিরুদ্ধবাদী দিগের সকল চেষ্টা, সকল উত্তম, সকল যোগাড়-যন্ত্র, সকল মন্ত্রণা ব্যর্থ হইয়া যাইত—পরম করুণাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ তা-লার ইচ্ছা পূর্ণ হইত।

উর্দ্দু কবি বলিয়াছেন,—

"এছলামকি ফেৎরতমে কোদরত্‌নে লচক দি হায় ;
এত্‌না হি ইয়েহ্‌ ওভ্‌রেগা জেত্‌না কে দবা দেঙ্গে।"

কোরেশদিগের মধ্যে তিনি 'যবরদস্ত্‌' (অসাধারণ) 'ওয়াজ' ফরমাইলেন। চতুর্মুখী—সর্ব্বপ্রকার কোশেশ্‌ যত্ন ও চেষ্টা করিলেন,

যাহাতে কোরেশ ও মক্কার 'বোত-পরস্তের' (পৌত্তলিক বা অংশীবাদীর) দল 'রাহে্‌রাস্তে' (সুপথে) আগমন করে—মনুষ্যের প্রকৃত কর্ত্তব্য সাধন করিয়া আদর্শ মনুষ্যে পরিণত হয় ; প্রভুর সর্ব্বপ্রকার আদেশ পালন পূর্ব্বক আত্মা-চরিতার্থ করে। তিনি অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন যে, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে 'তওহিদ-পন্থী' হও ; আল্লাহ তা-লার আদেশ পালন পূর্ব্বক বেহেশ্‌তে গমনের পথ সুপ্রশস্ত, এবং ভীষণ আযাবের স্থান 'দোযখের' (নরকের) পথ বন্ধ কর। কিন্তু আল্লাহ্‌ তায়ালার আদেশ পালনরূপ মহা সৌভাগ্য লাভ ইহাদের অদৃষ্টে ছিল না। * উহাদের 'কলুবে' (দেল বা হৃদয়ে) 'হওয়াছে খাম্‌ছাঃ' (প্রকাশ্য পঞ্চেন্দ্রিয় বা গোপনীয় পঞ্চ শক্তি)-তে 'বেদিনীর' (খোদা-দ্রোহিতার) মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিবেকের মহান্‌ শক্তি মানবের করতলগত হইলেও, খোদা দ্রোহিগণ উহার বিপরীত আচরণ করে ; এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। এই 'বদ-কেছ্‌মত' (হতভাগ্য) লোকেরা কিরূপে আল্লাহ তাঁলার পবিত্র উপদেশ গ্রহণ ও আদেশ পালন করিবে—যখন উহাদের জন্য 'আযাবে আলিম (ভীষণ শাস্তি) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বহু বাক্‌-বিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে, বহু 'লড়াই-জঙ্গ' হইয়াছে, বহু শোণিতপাত হইয়াছে, পদে পদে অপ্রস্তুত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে, তবু তাহারা যেমন ছিল, তেমনই রহিয়া গেল। আপনাদের অসভ্যতা, বর্ব্বরতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতা হইতে ক্ষান্ত হইল না। যখন কাফের-দিগের কঠোর ব্যবহার, 'বে-আদবী', ঘৃণিত সঙ্কল্প সীমা অতিক্রম করিল ; আর হজরত নবী করিম (ছালঃ) তাহাদিগকে সুপথে আনয়নে 'মায়ূছ'

---

* খাতামাল্লাহো আলা কুলুবেহেম ওআলা ছাময়েহেম ওয়ালা আব্‌ছারেহেম গেশা ওয়াতুন ওলাহুম আযাবোন আলিম।

(নিরাশ) হইলেন, তখন অগত্যা জন্মভূমি মক্কা-মোয়াজ্জমা হইতে হেজরত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মক্কা-মোয়াজ্জমা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়া হজরতের পক্ষে একটা সাধারণ কাজ ছিল না; পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষদিগের পবিত্র লীলাভূমি, স্বীয় পবিত্র জন্ম-স্থান, জীবনের সুদীর্ঘ বায়ান্ন বৎসর কাল (শৈশব, বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়কাল) যে স্থানে তিনি অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয় খোদাতালার উপাসনার একমাত্র আদিগৃহ (পবিত্র কাবাগৃহ) যে পবিত্র মক্কা শহরে অবস্থিত, সেই পবিত্র নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্নদেশে গিয়া বস-বাস করা কি সহজ ব্যাপার ছিল? ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে কি দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা অনুমান করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তি সম্পন্ন লোকের পক্ষে অসম্ভব। অনেক পয়গম্বর (আলাঃ) কেই খোদা-দ্রোহিদিগের দ্বারা জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছে; কিন্তু আমাদের হজরত রছুল আক্‌রম (ছালঃ)-এর ন্যায় কাহারও প্রতি এত কঠোর অত্যাচার-উৎপীড়ন হয় নাই; এমন ভীষণ বিপদের সঙ্গে কাহাকেও সুদীর্ঘ কাল যুঝিতে হইয়াছিল না। হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লাহ্, হজরত ইউছফ্ (আলাঃ), হজরত আইয়ুব (আলাঃ), হজরত ইউনুছ (আলাঃ), হজরত মুছা (আলাঃ)—অনেক বিপদ আপদের সহিত যুঝিয়া পবিত্র এছলাম ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন; কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ)-এর ন্যায় ভীষণ বিপদ সাগর উত্তীর্ণ হইয়া কাহাকেও ঈদৃশ সাফল্য-মণ্ডিত হইতে হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে আর কোনও নবীর ওম্মতের মধ্যেই প্রকৃত 'তওহিদ-পন্থী' (একেশ্বরবাদী) লোকের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হইতেছে না; আজ পৃথিবীর ৪০ কোটি লোক একেশ্বরবাদী।

স্বীয় প্রিয় জন্মভূমি, পিতৃ-পিতামহাদির বাসস্থান, খোদাতালার প্রথম

উপাসনা-গৃহ, স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষ হজরত এছমাইল (আলাঃ)-এর আবাস স্থান পবিত্র মক্কা নগরী পরিত্যাগ করিতে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রাণে যে মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যখন তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ রূপে বিপন্ন হইবার উপক্রম হইল, তখনই তিনি মক্কা হইতে মদীনায় হেজরত করিলেন; তাঁহার পবিত্র জীবনীতে ইতিপূর্ব্বে সে বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যথাসময়ে হেজরত করিয়া, প্রিয় শিষ্য হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মদীনায় প্রস্থান করিলেন; ইতিপূর্ব্বে মদীনার বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত অধিবাসী পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; এবং হুজুর (ছালঃ)-এর প্রিয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের প্রায় সকলেই মদীনায় চলিয়া গিয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনায় পরম সমাদরে গৃহীত হইলেন। তিনি ও তাঁহার পরম ভক্ত বন্ধু হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), স্ব স্ব পরিবারবর্গ মক্কায় রাখিয়াই মদীনায় চলিয়া গিয়াছিলেন। এই সময়ের একটি ব্যাপারের সন্ধান ইতিহাসে পাওয়া যায় না। হজরত মদীনায় প্রস্থান করার ৩।৪ দিন পরেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও মদীনায় প্রস্থান করেন, ঐ সময়ে ওম্মোল মুমেনিনগণ, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ও তাঁহার ভগিনী হজরত ওম্মে কুলছুম (রাঃ—আঃ) প্রভৃতি কোথায় ছিলেন; পুরুষের মধ্যে তাঁহাদের কোনও অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক ত তখন মক্কায় উপস্থিত ছিলেন না। অবশ্য হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর পরিবারে তাঁহার পিতা ও পুত্রগণ বর্ত্তমান ছিলেন। যাহা হউক, মদীনায় কিছু দিন বাস করিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) উপাসনার জন্য মছজেদ নির্ম্মাণ করিলেন। নিজের বসবাস জন্য নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। অতঃপর স্বীয় পরম ভক্ত শিষ্য ও ক্রীত দাস হজরত যয়েদ বিন্-

হারছাঃ (রাজিঃ) (১) ও হজরত রাফেয় (রাজিঃ) (২)কে মক্কায় পাঠাইয়া, ওম্মোল মুম্মেনিন হজরত ছওদাঃ-বিন্ যোময়া (রাঃ—আঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত ওম্মে কোলছুম (রাঃ—আঃ), আছামাঃ বিন্-যয়েদ (রাঃ), (৩) তাঁহার মাতা ওম্মে-এমিন (রাঃ—আঃ)-(৪)কে মদীনায় আনাইলেন। আর হজরত আবহুল্লা-বিন্-আবিবকর

---

(১) ইঁহার বিষয় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর জীবন-চরিতে ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

(২) হজরত রাফেয় (রাজিঃ) মেছেরের কব্ তি (কপ্ট্) জাতীয় লোক এবং আঁ হজরত (ছালঃ)-এর গোলাম (ক্রীতদাস) ছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর চাচ্চা (পিতৃব্য) হজরত আব্বাছ (রাজিঃ), ইঁহাকে নযর স্বরূপ হজুর (ছালঃ)-কে দিয়াছিলেন। হজরত আব্বাছ (রাজিঃ) যখন পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) ইঁহাকে 'আযাদ' (স্বাধীন) করিয়া দেন।

(৩) আছামাঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ), ওম্মে এমিন (রাঃ—আঃ)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) যখন এন্তেকাল ফরমাইয়াছিলেন, তখন আছামাঃ (রাজিঃ)-এর বয়স ২০ বৎসর ছিল; অনেকের মতে ১৭।১৮ বৎসর মাত্র। তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শাহাদৎ-প্রাপ্তির পরে ইঁনি " ওয়াদি-আল্-কোরা " নামক স্থানে এন্তেকাল করেন;

(৪) ওম্মে-এমিনের (রাঃ—আঃ) নাম বরকাঃ। আবহুল্লার ওয়ালেদাঃ মাজেদাঃ—আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'আযাদ' করা (মুক্তি প্রাপ্তা) দাসী ছিলেন। যখন আঁ হজরত (ছালঃ) হজরত খদিজাতুল কোব্রা (রাঃ—আঃ)-কে বিবাহ করিলেন; তখন তদীয় ক্রীতদাস হজরত যয়েদ-বিন্-হারছাঃ (রাজিঃ)-এর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন।

(রাজিঃ) স্বীয় মাতা ওম্মে রোমান (রাঃ—আঃ), (*) স্বীয় ভগিনী ওম্মোল মুমেনিন হজরত আএশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া মদীনায় 'তশরিফ্' আনিলেন। যখন পরিবারবর্গ মক্কা হইতে মদীনায় আগমন করিলেন, সেই সময় আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় নব-নির্ম্মিত গৃহে গমন করিলেন। ঐ গৃহ মছজেদ-সংলগ্ন ছিল।

আঁ হজরত (ছালঃ) হেজরত করিয়া মদীনায় আসিয়াছেন : তাঁহার পরিবার বর্গের ও মদীনায় আগমন হইয়াছে। মহামাননীয় হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ও মদীনায় "তশ্‌রিফ্" আনিয়াছেন। এ সময় তিনি বয়ঃপ্রাপ্তা—যুবতী ; চতুর্দ্দিক হইতে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল ; অনেক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি বিবাহের 'পয়গাম' (প্রস্তাব) পাঠাই-লেন। আরবের খ্যাতনামা বড় বড় ছরদারের পক্ষ হইতেও বিবাহের আগ্রহ পূর্ণ প্রস্তাব আসিল। কিন্তু তিনি সকলকেই অসম্মতি-সূচক 'ছাফ্ জওয়াব' (স্পষ্ট, উত্তর) দিলেন। তিনি অর্থ-সম্পদের ধার ধারিতেন না, বিপুল ঐশ্বর্য্য——কোঠা-ইমারত প্রভৃতির গৌরব অনুভব করিতেন না, দৈহিক সৌন্দর্য্য ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য-সম্পদ দর্শনেও প্রীতিলাভ

(*) ওম্মে রোমান অর্থাৎ দহদ-বিন্তে আমের-বিন্ ওমর কেনানী এছলাম গ্রহণের পর ইনি দুই নেকাহ করেন ; তৃতীয় নেকাহ্ হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর সঙ্গে হইয়াছিল। এই পক্ষে ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ও হজরত আবদুর রহমান (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যু হইলে স্বয়ং আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে কবরে স্থাপন করিয়াছিলেন।

করিতেন না; মহা বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রতিও আঁস্থা স্থাপন করিতেন না; তিনি চাহিতেন খোদা-ভক্ত পরম ধার্ম্মিক আদর্শ মানুষ। তিনি প্রকৃত মনুষ্যত্বের গৌরবই বুঝিতেন। সচ্চরিত্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ, খাঁটি মোছলেমোচিত গুণ-গ্রাম, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা, জন-হিতৈষণা, দারিদ্রে সন্তুষ্ট বা আল্লাহর দরগায় শোকর ও ছবরকারী ব্যক্তিই তাঁহার নিকট গৌরবের—সহানুভূতির পাত্র ছিলেন। তিনি বলিতেন, অর্থ-সম্পদের কি মূল্য আছে? অল্প সময় মধ্যে উহার অস্তিত্ব মুছিয়া যাইতে পারে; অত্যুচ্চ সৌধমালা বা হর্ম্যরাজি সামান্য ভূমিকম্পেই চূরমার হইয়া ভূমিসাৎ হইতে পারে, সুন্দর সুঠাম দেহ শীঘ্রই বিকৃত আকার ধারণ করিতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, আদর্শ ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকট ঐ সকল বিষয় তুচ্ছ; সে দরিদ্র হইলেও মহা গৌরবের পাত্র ও আদর্শ পুরুষ। তাঁহার রূহানী (আধ্যাত্মিক) এমারত ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত বা ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার নহে। ঐ শ্রেণীর বড়লোকও আমীর-ওমরা ব্যতীত, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর শ্রেষ্ঠতম ছাহাবাঃ ও প্রচার-বন্ধু হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)ও, হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জন্য বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অবশ্য ইঁহাদের 'ফজিলত' ও 'মর্ত্তবা' সম্বন্ধে কোন কথা ছিল না; তাঁহাদের প্রস্তাবের উত্তরে আঁ হজরত (ছালঃ) এইমাত্র ফরমাইয়া ছিলেন, ফাতেমাঃ অতি তরুণ বয়স্কা বালিকা, সুতরাং এই সম্বন্ধ তাহার জন্য, আমার মতে ঠিক হইবে না; আবার ইহাও ফরমাইয়াছিলেন যে, ফাতেমার বিবাহ সম্বন্ধে আমি আল্লাহ তাআলার ওহীর (আদেশের) প্রতীক্ষা করিতেছি।

একদা মছজেদ নববীতে জনাব হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ), হজরত ফারুক আজম (রাজিঃ) ও হজরত ছায়াদ-বিন্-আবিওক্কাছ (রাজিঃ)

মছজেদ নববীতে বসিয়া, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বিবাহ সম্বন্ধে এই বলিয়া আলোচনা ও কথোপকথন করিতে ছিলেন যে, কোরেশ দলপতি এবং আরবের খ্যাতনামা ছরদারগণ ইঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব পাঠাইয়া ছিলেন; কিন্তু আঁ হজরত (ছালঃ) এ যাবৎ কাহারও প্রস্তাব মঞ্জুর করেন নাই; এক্ষণে একমাত্র (হজরত) আলী (কঃ—ওঃ) বাকী রহিয়াছেন; এযাবৎ তাঁহার পক্ষ হইতে বিবাহের প্রস্তাব হয় নাই; সম্ভবতঃ তাঁহার প্রস্তাব মঞ্জুর হইতে পারে। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ফরমাইলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) দরিদ্রতা ও রিক্ত হস্ত হওয়ার জন্য বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারিতেছেন না। আর ইহা আমার কেবলমাত্র 'খেয়াল নহে, বরং 'একিন ওয়াছক' (দৃঢ় বিশ্বাস) যে, (হজরত) ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বিবাহ তাঁহার সঙ্গেই হইবে। যদি আপনারা আমার সঙ্গে গমন করেন, তবে আমি (হজরত) আলী (কঃ—ওঃ)-কে, (হজরত) ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করি। যদি অর্থাভাব ও দরিদ্রতাই এই বিবাহের প্রতিবন্ধক হয়, তবে আমরা তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিব। তাঁহার প্রস্তাব অপর দুই মহাত্মার মনঃপুত হওয়াতে, তাঁহারা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সন্ধানে বাহির হইলেন; তিনি ঐ সময় মদীনার নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে স্বীয় উষ্ট্রটি চরাইতে ছিলেন। সাক্ষাৎ হওয়াতে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ফরমাইলেন, হে আলি (কঃ—ওঃ)! আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে আপনার 'খাছ করাবত' (ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা) আছে; এ সৌভাগ্য আর কাহারও নাই। আর যে সকল সদ্‌গুণাবলী আল্লাহ তা-লা আপনাকে দিয়াছেন, আপনার চরিত্র যেরূপ গৌরব মণ্ডিত করিয়াছেন, এরূপ আর কাহাকেও করেন নাই। কোরেশদিগের প্রধান প্রধান 'ছরদার' (দলপতি)-গণ, আরবের

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাগণ, ধনপতিগণ, (হজরত) ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু কাহারও আরজীই হুজুর (ছালঃ) কবুল করেন নাই; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, (হজরত) ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) আপনার জন্যই আছেন, যদি আপনি দরখাস্ত করেন, তবে নিশ্চয়ই আঁ হজরত (ছালঃ) আপনার প্রস্তাব মঞ্জুর করিবেন।

জনাব আবু তোরাব হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন, যখন হুজুর (ছালঃ) আপনাকে ও হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর প্রস্তাবে 'ছাফ্ জওয়াব' দিয়াছেন (স্পষ্ট উত্তর—অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন), এরূপ ক্ষেত্রে আমি কোন্ ভরসায় বিবাহের 'পয়গাম' (প্রস্তাব) করিব? আমি ত সম্পূর্ণ অর্থহীন দীন-দরিদ্র ব্যক্তি। অন্য রওয়াতে বর্ণিত আছে যে, হজরত ফারুকে আজম (রাজিঃ)-এর এই উক্তি শুনিয়া তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং ফরমাইলেন, আমি 'আতশে-শওক' (বাসনাগ্নি) এতদিন গোপন রাখিয়া ছিলাম, আপনি সেই বাসনানল আজ উদ্দীপ্ত করিয়া দিলেন। আমি যে বাসনা অতি কষ্টে মনের মধ্যে 'দাবাইয়া' (গোপন করিয়া—চাপিয়া) রাখিয়া ছিলাম, আপনি উৎসাহ দিয়া আমার সেই বাসনা নূতন ভাবে জাগরিত করিয়া দিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর জামাতা হইবার আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে যেরূপ প্রবল ভাবে আসন পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা আমিই বুঝিতে পারি। কিন্তু আক্ষেপ! দরিদ্রতা, নিঃসম্বলতা ও অর্থ কৃচ্ছ্রতার জন্য আমি 'মাযুর' (নিরূপায়); দরিদ্রতা আমার বাক্‌রোধ করিয়াছে; এজন্য আমার 'আরযু' (কামনা—বাসনা) মনের মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতেছে; অনেক বার ইচ্ছা হইয়াছে, বিবাহের জন্য প্রস্তাব করি, কিন্তু দরিদ্রতা ও অর্থহীনতা সে বিষয়ে প্রবল বাধা জন্মাইয়াছে। হজরত আলী

(কঃ—ওঃ)-এর উক্তি শুনিয়া হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ফরমাইলেন, হজরত 'ছরওয়ারে কায়েনাত' (ছালঃ)-এর দৃষ্টিতে অর্থ-সম্পদের কোনও মূল্য বা গৌরব নাই। আপনি অর্থহীনতার 'ওজর' করিবেন না। আপনি অবিলম্বে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বিবাহের প্রস্তাব 'পেশ' করুন। আমার 'দেল' (মন) সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, আপনার প্রস্তাব 'রদ' (অগ্রাহ্য) হইবে না। হুজুর (ছালঃ) প্রসন্ন চিত্তে আপনার প্রস্তাব 'মঞ্জুর' করিবেন।

এইরূপ কথোপকথন ও 'আহ্বাব' (বন্ধু)-দিগের অনুরোধে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি উষ্ট্রের 'মোহার' (নাসিকা-রজ্জু) হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে আগমন করিলেন; উষ্ট্রটী গৃহে বাঁধিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে 'হাজের' (উপস্থিত) হইলেন। ঐ সময় হুজুর (ছালঃ) ওম্মোল-মুমেনিন হজরত ওম্মে ছল্‌মাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে তাঁহার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইতে লাগিল। কোনওরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি দ্বারে করাঘাত করিলেন। গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। লজ্জা ও 'শরম' তাঁহার উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিল; তিনি গৃহের এক প্রান্তে নীরবে উপবেশন করিলেন। তিনি নির্ব্বাক্ ছিলেন, লজ্জায় মস্তকোত্তোলন করিতে পারিতেছিলেন না। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর দূরদর্শিনী জ্ঞান, কাহারও মনোগত ভাব জানিতে অক্ষম ছিল না; তিনি লোকের মুখের ভাব দেখিয়া মনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেন। পক্ষান্তরে তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় ও অবিদিত ছিলেন না। তিনি অতি স্নেহ-সূচক বিনম্র ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আলি!

আজ ইহা কি ব্যাপার! লজ্জা ও 'হেজাবের' এত আধিক্য দেখিতেছি কেন? আমি দেখিতেছি, তোমার চেহ্‌রায় উদাস ভাব প্রকটিত; তুমি যেন কোনও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন! আমার বোধ হইতেছে, আজ তুমি কোনও 'খাছ-মৎলব' (বিশেষ উদ্দেশ্য) লাভার্থ আমার নিকট আসিয়াছ; কিন্তু লজ্জা ও শরমে সেই কথা আমার নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছ না। তুমি ঠিক করিয়া বল, তুমি কি উদ্দেশ্যে এবং কোন্ বিষয়ের প্রার্থনা করিতে আমার নিকট আসিয়াছ। আঁ হজরতের এই স্নেহ-ব্যঞ্জক উক্তির পরেও যদি তিনি নীরব ও নির্ব্বাক্ থাকিতেন, তবে তাহা 'বে-আদবী' (অশিষ্টতা) বলিয়া পরিগণিত হইত। সুতরাং হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আদবের সঙ্গে, সলজ্জ অবস্থায় মস্তক অবনত করিয়া করজোরে আরজ করিলেন, এয়া রছুলোল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার নামে 'কোরবান' (উৎসর্গীকৃত) হউন, আমি বাল্যকাল হইতে আপনার দ্বারা প্রতিপালিত, আপনার অন্নে পরিবর্দ্ধিত, আপনার অনুপম স্নেহে সংরক্ষিত; আপনি প্রথম হইতেই আমাকে অনুপম স্নেহে প্রতি-পালন করিয়া আসিতেছেন; অধীন আপনার একান্ত আজ্ঞাবহ দাস আমি সর্ব্বদা আপনাকে স্বীয় পিতা আবুতালেব এবং মাতা ফাতেমাঃ-বিন্তে আছদ হইতে আমার প্রতি অধিক স্নেহশীল পাইয়াছি; আমার 'দীন' ও 'ঈমানের' অবলম্বনও আপনি। আপনিই আমার 'ওয়ালী' (প্রভু), 'মোখ্‌তার' (কর্ত্তা) এবং সর্ব্ব ক্ষমতাপন্ন 'আমীন' (অধিকারী); আপনি বাল্যকাল হইতেই আমার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আমার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের দায়িত্ব লইয়াছেন; আমার ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি সকল বিষয়ের ভারই আপনার উপর ন্যস্ত; আপনিই আমার একমাত্র অভিভাবক। আজ পর্য্যন্ত আপনিই আমার একমাত্র মুরব্বি ও আশ্রয় দাতা। বহুদিন হইতে

আমার কামনা ছিল যে, হুজুরের খেদমতে ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জন্য দরখাস্ত করি; কিন্তু লজ্জায় আমি এযাবৎ সে প্রস্তাব করিতে পারি নাই; যখনই প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা হইত, লজ্জা ও শরম আসিয়া তাহাতে বাধা-প্রদান করিত। এক্ষণে আলী খেদমতে নিতান্ত আদবের সহিত আরজ করিতেছি যে, এ অধম দাসকে স্বীয় পুত্ররূপে গ্রহণ পূর্ব্বক অধীনের চির মনঃঅভিলাষ পূর্ণ করুন। এতচ্ছ্রবণে হজরত রছুল করিম (ছালঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে নিকটে বসাইয়া স্নেহ-ভরে ফরমাইলেন;—তোমার 'মতলব' (উদ্দেশ্য) ত আমি বুঝিলাম, এক্ষণে তুমি বল, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) কে বিবাহ করিবার জন্য তোমার নিকট কি পরিমাণ 'ছরমায়াঃ' (পুঁজি) আছে? হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-এর এই প্রশ্নে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, আমার নিকট হুজুর (ছালঃ)-এর 'শফক্কৎ' (স্নেহ ও ভালবাসা) ই কি কম 'দওলৎ' (অর্থ-সম্পদ)? যখন হুজুরের অনুপম স্নেহ ও ভালবাসার হস্ত আমার মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছে, এ অবস্থায় আমার পার্থিব অর্থ-সম্পদেরই বা কি ভাবনা? বিশেষতঃ আমার নিকট কি আছে না আছে, তাহা হুজুরের অবিদিত নাই। একটি উষ্ট্র, একখানি তরবারি ও একটি 'যরাঃ' (বর্ম্ম) ব্যতীত আমার আর কোনই সম্বল নাই। অবশ্য আমি আপনার 'গোলাম' (দাস), এই গোলামীর গৌরবকে আমি এক অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার বলিয়া মনে করি।

পিণ্ডি বাহাউদ্দীন—পঞ্জাব নিবাসী সুকবি মোহাম্মদ আছলম খান ছাহেব এ সম্বন্ধে যে উর্দ্দু কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহা বড়ই হৃদয়স্পর্শী; নিম্নে সেই কবিতাটি উদ্ধৃত করা হইল :—

পরওয়ায়ে যর্‌-নেহী, না হ্যায় দওলত্‌ছে কোই কাম;
কুচ্‌ মেরে পাছ হ্যায় তো, ফকৎ হ্যায় খোদাকা নাম।

মোফ্‌লেছ্‌ হোঁ তঙ্গদস্ত্‌ হোঁ, পর দেল্‌কা হোঁ গণী ;
এক যরা হ্যায় জো জঙ্গমে আতি হ্যায় মেরি কাম।
লে দেকে মেরে ঘর্‌মে হ্যায় এয়া ছৈয়দল বশর ;
এক তেগ মোশ্‌গাফ্‌ তো শতর এক খোশ্‌ খরাম।
জো কুচ্‌কে হোঁ হুজুর পঃ হ্যায় ছব ওহ্‌ আশ্‌কার ;
কেয়া কম হ্যায় ইয়ে শরফ্‌, কে মোহাম্মদ (ছালঃ) কা হোঁ গোলাম।
দুনিয়াকে জাহ্‌ ও মাল্‌ছে কেয়া ওয়াস্তাঃ কে হ্যায় ;
ওরদে যবান খোদা, আওর রছুল খোদা কা নাম।

এই কবিতাটির ভাবার্থ উপরেই লিখা হইয়াছে। পাঠক। এক্ষণে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন, দৃঢ় সঙ্কল্প, দরিদ্রতাকে সাদরে গ্রহণ, ধর্ম্ম-প্রাণতা ও সচ্চরিত্রতাকে মনোনয়ন—কত উচ্চ আদর্শের পরিচায়ক, তাহা চিন্তা করুন। আরবের বড় বড় আমীর-ওমরা, মক্কার খ্যাতনামা রইছ প্রভৃতি কাহারও প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন না ; আর নিজের আশ্রিত, প্রতিপালিত, একেবারে দীন-দরিদ্র হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে স্বীয় অনুপমা কন্যা-রত্ন দান করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এই বাঙ্গালা দেশেই কোনও ধর্ম্ম-সমাজের একজন সর্ব্বজনমান্য গুরু বা নেতা স্বীয় কন্যার বিবাহ, স্বীয় ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধবাদী একজন বড় রাজার সঙ্গে সম্পাদন করিলেন। সেই রাজার ধর্ম্ম-মতানুসারে বিবাহ দিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান লোকদিগের এমনই বিরাগ ভাজন হইলেন যে, তাঁহার সেই সুগঠিত ধর্ম্ম-সঙ্ঘটি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহার দল ছাড়িয়া একটি নূতন ধর্ম্ম-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি ইহাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই বিবাহ সম্বন্ধে সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরাৎপর প্রভু কর্ত্তৃক আমি আদিষ্ট হইয়াছি। পার্থিব ঐশ্বর্য্য-সম্পদের নিকট তিনি স্বীয় ধর্ম্মমতকে বলি দিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমতের দুর্ব্বলতা

প্রকাশ পাইল। কিন্তু আমাদের হজরত রছুল করিম (ছালঃ) বিরাট পর্ব্বতের ন্যায় অচল থাকিয়া, স্বীয় সুদৃঢ় ধর্ম্মমতের ও হৃদয়ের মহান্ শক্তির কি অপূর্ব্ব—অসাধারণ পরিচয় প্রদান করিলেন।

হজরত রছুল করিম (ছালঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে ফরমাইলেন, তলোয়ার ত অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ; কারণ আজকাল প্রায় সকল সময়েই 'জেহাদ' (ধর্ম্মযুদ্ধ)-এর প্রয়োজন হইয়া থাকে; আর যাতায়াত এবং সাংসারিক কার্য্যের জন্য উষ্ট্রের ও একান্ত প্রয়োজন; আরোহণ করিবার জন্যও উষ্ট্রের আবশ্যক হইয়া থাকে। অবশ্য 'যরাঃ' (বর্ম্ম)ও প্রয়োজনীয় জিনিষ, কিন্তু উহা না হইলেও কোন রূপে চলিতে পারে। তুমি বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্বীয় বর্ম্মটিই বিক্রয় কর। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন, উহা ত খুব কম দামী জিনিষ; উহার মূল্য ৪০০ দরহমও হইবে না। হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি উহাই 'কবুল' করিব; তুমি যাও, যরাঃটি বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য আমার নিকট লইয়া আইস। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তৎক্ষণাৎ বর্ম্মটী বিক্রয় করণার্থ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ৪০০ দরহম, কাহারও কাহারও মতে ৪৮০ দরহম মূল্যে হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ) ঐ বর্ম্মটি ক্রয় করিয়া, সেই মূল্য তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন; এবং ফরমাইলেন, এক্ষণে আমি ত এই বর্ম্মের অধিকারী হইলাম; অতঃপর আমার 'এখ্‌তিয়ার' (অধিকার) আছে, যরাঃটি যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারি। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন,—নিশ্চয়ই আপনি বর্ম্মটি সম্বন্ধে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন; সে সম্বন্ধে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তচ্ছ্রবণে হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ) বলিলেন, আপনি আমা অপেক্ষা এই বর্ম্মের অধিক হক্‌দার, আপনিই ইহা ব্যবহারের উপযুক্ত পাত্র; এজন্য আমি শরানুযায়ী

হেবাঃ করিয়া এই যরাঃ আপনাকে প্রদান করিতেছি। এই বর্ম্ম আপনার জন্যই 'মবারক' হউক। এই বলিয়া বর্ম্মটী তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ)-এর এই দাতব্য শক্তি ও উদারতায় হজরত আলী (কঃ—ওঃ) অত্যন্ত বাধিত হইলেন; এবং দরহমও যরাঃ লইয়া হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-এর খেদমতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি জরা সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক হুজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে আরজ করিলেন। তিনি এই সংবাদ শ্রবণে হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর মঙ্গলার্থ দোওয়া ফরমাইলেন। অতঃপর হুজুর (ছালঃ) হজরত আনছ (রাজিঃ) * কে ফরমাইলেন, তুমি মছজেদে গমন পূর্ব্বক সমুদয় ছাহাবাঃ—মোহাজেরিন্ ও আন্ছারকে ডাকিয়া আন। তদনুসারে তিনি চলিয়া গেলেন। একটু পরে হুজুর (ছালঃ) ও মছজেদে আগমন করিলেন; আঁ হজরত (ছালঃ)-কে তখন বড়ই প্রফুল্লিত দেখা গিয়াছিল। হজরত আনছ (রাজিঃ) বলেন, আমি ঐ সময় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'খেদমতে' উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার 'চেহ্রাঃ মবারক' দর্শনে বোধ হইতেছিল, তাঁহার প্রতি 'ওহী' (প্রত্যাদেশ) নাযেল হইতেছে। যখন ওহী

---

* আন্‌ছ-বিন্-মালেক-বিন্-নজর (রাজিঃ)। ইঁহার কুনিয়েত (উপাধী বিশেষ) আবু হামযাঃ জররজি। ইঁনি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'খাছ' (বিশেষ) 'খাদেম'—(সেবক) ছিলেন। ইঁহার মাতার নাম-ওম্মে ছলিম-বিন্তে-ছলমান ছিল। যখন হুজুর (ছালঃ) হেজরত করিয়া মদীনায় প্রস্থান করেন, তখন ইঁহার বয়ঃক্রম ১০ বৎসর মাত্র ছিল। হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে ইঁনি মদীনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন ঔপনিবেশিক নগরী বস্রায় চলিয়া যান। আর ঐ বস্রা নগরেই ৯১ হিজরীতে, ১০৩ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করেন। তাঁহার কতিপয় পুত্র ও কন্যা ছিল।

অবতীর্ণ হইল, তখন তিনি ফরমাইলেন, হে আনছ! আমাকে আল্লাহ তা-লা আদেশ দিয়াছেন যে, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নেকাহ্ (হজরত) আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে সম্পন্ন করি। অতঃপর তিনি মছজেদ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। দুহিতা-রত্ন হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নিকট যাইয়া বলিলেন, আলী তোমার বিবাহ-প্রার্থী। ছৈয়দতন্নেছা (রাঃ—আঃ) পিতার উক্তি শ্রবণে অতি লজ্জিত ভাবাপন্ন ও 'খামুশ' (নীরব) হইয়া রহিলেন। তদনন্তর আঁ হজরত (ছালঃ) মছজেদে গমন করিলেন। আলেমদিগের নিকট বয়ঃপ্রাপ্ত বালিকার বিবাহ প্রস্তাবে বা বিবাহ কালে নীরব থাকাই সম্মতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

যখন ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ মছজেদ নববীতে—আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন হুজুর মিম্বরে গিয়া উপবেশন করিলেন; এবং ফরমাইলেন, হে মহাজেরিন ও আন্‌ছারগণ! এখনই হজরত জিব্‌রাইল, আল্লাহ্‌ জল্লেশানহুর আদেশ-বাণী লইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছিলেন; আল্লাহ তা-লা 'মালায়েক' (ফেরেশ্‌তাঃ) দিগকে 'বয়তুল মামুরে' সমবেত করিয়া স্বীয় 'কনিয্‌' (দাসী) ফাতেমাঃ-বিন্তে মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর বিবাহ স্বীয় 'গোলামে খাছ' (বিশেষ দাস) আলী (কঃ—ওঃ) বিন্‌-আবি তালেবের সঙ্গে সম্পন্ন করিয়াছেন। আর আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, 'আক্‌দে নেকাহ তজদিদ' করিয়া, বিশ্বস্ত সাক্ষীদিগের 'রুবরু' (সম্মুখে) ইজাব ও কবুল করাইয়া দি। অতঃপর তিনি বিবাহের খোত্‌বাঃ পাঠ এবং শুভ-বিবাহ কার্য্য-সম্পন্ন করিলেন। ২য় হিজরীর মোহর্‌রম মাসে—২১শে তারিখে এই পবিত্র বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

যে সময় আঁ হজরত (ছালঃ) বিবাহের খোত্‌বা পড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন, ঐ সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন

না; কোনও প্রয়োজন বশতঃ বাজারে গিয়াছিলেন। খোত্‌বা পড়ার অবস্থায়ই তিনি সেখানে আসিয়া পঁহুছিলেন। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ফরমাইলেন, আমি ৪০০ চারিশত মেছ্‌কাল * মোহরের 'য়েওজে' (পরিবর্ত্তে) ফাতেমাঃ (রাঃ আঃ)-কে তোমার নেকাহ্‌তে দিলাম; তুমি ইহাতে সম্মত আছ? শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, 'বছরও চশ্‌ম্‌'—অর্থাৎ তিনি আনন্দের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন হুজুর (ছালঃ) এই বলিয়া 'দোওয়া' (প্রার্থনা) ফরমাইলেন:—খোদা তোমাদের উভয়ের 'পেরেশানী' দূর করুন; আশা ও আকাঙ্ক্ষা সাফল্য মণ্ডিত করুন, তোমাদের প্রতি 'বরকত' (সচ্ছলতা) অবতীর্ণ হউক, আর তোমাদের পক্ষ হইতে 'পাক আওলাদ' (পবিত্র সন্তান) জন্মগ্রহণ করুক।

উপরের বর্ণনানুসারে দেখা যায়, এই নেকাহ (বিবাহ) আল্লাহ্‌

---

* তদানীন্তন চারিশত মেছ্‌কাল এদেশে প্রচলিত বর্ত্তমান মুদ্রার ১৬৵৹০ হয়; শিয়াদিগের মতে ৫০০ পাঁচ শত দরহম (দেরম) মোহর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। দরহমের ওজন ৩৷৹ মাশা। ১২ মাশায় এক তোলা হইয়া থাকে। এই হিসাবে ১৭৪০ মাশা বা ১৪৫ তোলার কিছু উপর হয়; আর মেছ্‌কালের ওজন ৪৷৹ মাশা। এই হিসাবে উহা ১৫০ তোলা হইয়া থাকে। সুতরাং উভয় সংখ্যার মধ্যে বেশী তারতম্য নাই। রৌপ্য মুদ্রার হিসাব ধরিলে বর্ত্তমান প্রচলিত মুদ্রার ১৬৷৹ বা ১৫৲ টাকা মোহর ধার্য্য হইয়াছিল। আর আজকাল এদেশে দু পাঁচ দশ হাজার বা বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ হাজার—অথবা লক্ষ বা লক্ষাধিক টাকার দেন মোহর ধার্য্য হইয়া থাকে। এবিষয়ে মোছলমান-দিগের বাড়াবাড়ি চরমে উঠিয়াছে।

তা-লার আদেশে 'আছমানে' (আকাশে—স্বর্গে) সম্পন্ন হইয়াছিল। তৎপর হজরত রূহোল-আমিন (জেব্রাইল ফেরেশ্তা), আঁ হজরত (ছালঃ)-কে আল্লাহর অভিমত ও আদেশ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সেই আদেশানুযায়ী তিনি দুনিয়াতে, যথা-নিয়মে এই শুভ-বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপর হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) একমুষ্টি দরহম লইয়া হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-কে প্রদান পূর্ব্বক এরশাদ ফরমাইলেন যে, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'জেহেয্' (কন্যা বিদায়ের দ্রব্য-সামগ্রী) ক্রয় করিয়া আন। তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন, উহাতে ৩৬০টি দরহম ছিল। হুজুর (ছালঃ), ছলমান ফারছী * (রাজিঃ) ও

---

* ছলমান ফারছি (রাজিঃ)-এর কুনিয়েত্ আবু-আবদুল্লাহ্। ইঁনি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'আযাদ করদাঃ' (মুক্তি দেওয়া—মুক্ত) 'গোলাম' (ক্রীত দাস) ছিলেন। ক্রীত দাস থাকা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইঁনি পারস্য দেশের অধিবাসী এবং বামহরমব্ সম্প্রদায় ভুক্ত অগ্ন্যুপাসক ছিলেন। ইঁনি সত্যধর্ম্মের অন্বেষণে গৃহ হইতে বাহির হন; এবং প্রথমে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া ঈছায়ী ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পরে একজন 'য়েরাবী' (বদ্দু) ইহাকে ধরিয়া এক য়িহুদীর নিকট বিক্রয় করে। তিনি তাহাকে 'মকাতেবাঃ' করিলেন; অর্থাৎ য়িহুদীর ক্রীত মূল্য তাহাকে আদায় করিয়া দিলেন; এই অর্থসংগ্রহ কার্য্যে আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। যখন হুজুর (ছালঃ) হেজরত করিয়া মদীনায় আসিলেন, তাহার কিয়ৎকাল পরে ছলমান ফারছী (রাজিঃ) পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে-দীক্ষিত হইলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইতেন, ছলমান ফারছী (রাজিঃ) 'আহ্লে বয়েত' অর্থাৎ হুজুর [ছালঃ]-এর পরিবার বর্গের অন্তর্ভুক্ত। তিনি নিজের উপার্জ্জিত অর্থ ব্যতীত অন্য

বেলাল * (রাজিঃ)কেও তাঁহার সঙ্গে দিলেন। পরে এক পাত্র খোরমা আনাইয়া উপস্থিত ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগকে বলিলেন, তোমরা ইহা লুঠিয়া লও। তদনুসারে তাঁহারা হাতে হাতে তাহা লুঠিয়া লইলেন। নিম্ন-লিখিত জেহেয্ হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-কে দেওয়া হইয়াছিল। (১) মিসর দেশীয় বস্ত্র-নির্ম্মিত একখানি বিছানার কাপড়

কোনও রূপ অর্থ দ্বারা আহার করিতেন না। ইঁনি অতি দীর্ঘজীবি ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ইঁহার বয়ঃক্রম ৩৫০ বৎসর হইয়াছিল। ৩৫ হিজরীতে মদায়েনে (পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ রাজধানীতে) ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। এক রওয়ায়েত মতে হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর খেলাফত কালে বয়তুল মকদ্দছে শহীদ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত বিবরণই বিশেষ ভাবে প্রামাণ্য।

† বেলাল-বিন্-রেয়াহ্ হাব্শী, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর আযাদ করা (মুক্ত) ক্রীতদাস ছিলেন। ইঁনি প্রাথমিক মোছলমান-দিগের মধ্যে একজন। বদর এবং তৎপরবর্ত্তী সমুদয় জেহাদেই তিনি 'শরীক' ছিলেন। শেষ সময়ে শামে চলিয়া যান; এবং ২০ হিজরীতে দেমেশ্কে এন্তেকাল করেন। উক্ত নগরের বাবুল আরবায়ীনে তাঁহার কবর আছে। ইঁহার কোনও সন্তান-সন্ততি ছিল না। যখন ইনি পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন ওম্মিয়া-বিন্ খলফ্ ইঁহার প্রতি ভীষণ উৎপীড়ন করিয়াছিল। অবশেষে সে বদরের যুদ্ধে হজরত বেলাল (রাজিঃ)-এর হস্তেই নিহত হয়। অন্য রওয়ায়েতে দৃষ্ট হয়, ছফিন যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন; এবং প্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ হজরত এমার-বিন্-এয়াছের (রাজিঃ) ঐ যুদ্ধে শহীদ হইলে, হজরত বেলাল (রাজিঃ) তাঁহাকে গোছল দেওয়াইয়া ছিলেন।

(তোষক)—যাহার ভিতর 'উন' (পশুলোম বা পশম) ছিল; (২) একখানি চামড়ার বিছানা; (৩) ২টি 'তকিয়া' (বালিস—উপাধান)—উহার একটির ভিতর পশম ও একটির ভিতর খোরমার ছাল ছিল; (৪) একখানি রেশমী চাদর; (৫) পানী পান করিবার জন্য ২টি মৃত্তিকা নির্ম্মিত গ্লাস; (৬) দুইখানি চাদর; (৭) চান্দির ২ গাছি বাজু-বন্দ; (৮) একখানি বৃহৎ কতিফাঃ নামক চাদর; (৯) একটি চাক্কি (আটা পিষিবার জাঁতা); (১০) একটি মশক (পানী আনয়নের জন্য চর্ম্মাধার); (১১) একটি পেয়ালা; (১২) একখানি পালং (চারপায়ী বা খাটিয়া); (১৩) একখানি 'জা-নমায' (নমাজ পড়িবার বিছানা বা আসন)।

যখন এই সকল জেহেযের 'ছামান' (সামগ্রী-সম্ভার) আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হুজুরে আনীত হইল; তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে ফরমাইলেন, হে আল্লাহ্! এই সকল জিনিষে তুমি 'বরকত' দান কর। এই সকল জিনিষ ক্রয় করিয়া যে মুদ্রা অবশিষ্ট থাকিল, উহা রছুলে খোদা (ছালঃ), ওম্মোল মুমেনিন হজরত ওম্মে ছালমাঃ (রাঃ—আঃ) এর হস্তে, অন্য রওয়াতোনুসারে আনিছ (রাজিঃ)-এর ওয়ালেদার হস্তে (তফরিহল আয্কিয়া ৩৬৮ পৃঃ) অর্পণ করিলেন; এবং ফরমাইলেন, ইহা দ্বারা 'যানানাঃ' (স্ত্রীলোক)-দিগের প্রয়োজনীয় জিনিষ (যথাঃ—আতর, সুগন্ধি তেল, আয়না, চিরুণী, ছোরমা প্রভৃতি) আনাইয়া লও। এই শুভ-বিবাহ কার্য্য যখন সম্পন্ন হইয়া ছিল, তখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বয়ঃক্রম ২১ বৎসর ও স্বর্গ-রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বয়স ১৫ বৎসর ৫ মাস ছিল (আল্লামা এব্নে হজর আস্কোলানী)।

বিবাহ উপলক্ষে শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) না অশ্বারোহণ করিয়াছিলেন; না হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) পাল্কিতে

চড়িয়াছিলেন, না গান বাজা ও কোন আড়ম্বর হইয়াছিল, না রং ছোড়া-ছোড়ি বা পিচ্‌কারীর সদ্ব্যবহার হইয়াছিল ; না লোকের মধ্যে লম্ফ-ঝম্ফ, নর্ত্তন-কুর্দ্দন হইয়াছিল ; বরং অতি সহজ ভাবে শুভ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। "রওজাতল-আছফিয়া" গ্রন্থে 'দাওতে ওলিমাঃ' (বরপক্ষ হইতে বিবাহের পর যে খানা দেওয়া হয়)-এর জন্য আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে খোরমা ও 'মওয়েয্‌' (একপ্রকার বৃহজ্জাতীয় সাধারণ শ্রেণীর আঙ্গুর) প্রদান করিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) উহার উপর জও এর দলিয়া 'এজাফা' (বৃদ্ধি) করিয়া দিলেন। ঐ জও এর দলিয়া ও দৈ—সমবেত মেহমানদিগের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইল; উহাই সকলে আনন্দের সহিত—তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করিলেন। এই বিবাহের দ্বারা হজুর (ছালঃ) প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অতি অল্প খরচে—মামুলী রকমে এই পবিত্র বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা চাই ; কিন্তু আজকাল এই বিবাহ-অনুষ্ঠান মোছলমানদিগের একটা মহা সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। অপব্যয়ের পরিমাণ সীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে ; গীত-বাদ্য, মহা আড়ম্বরের খানা, বিরাট মিছিল, বাইজী ও খেম্‌টাওয়ালীর নাচ ও গান, পার্টি, মেরাছিনের অশ্লীল সঙ্গীত ও কুৎসিৎ অঙ্গ-ভঙ্গি, ইত্যাদি—পবিত্র বিবাহ উৎসবে কত কি হইয়া থাকে। এই বিবাহের আড়ম্বর জন্য মোছলমানগণ ঘর বাড়ী বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করে, এবং সেই দেনায় বিষয়-সম্পত্তি, ঘর বাড়ী, হালের গরু, দুধের গাই প্রভৃতি সুদখোর মহাজনের হস্তগত হয় ; কিংবা আদালত কর্ত্তৃক প্রকাশ্যভাবে নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়।

এই বিবাহের তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে ; কাহারও মতে ২য় হিজরীর মোহর্‌রম মাস, কাহারও মতে ২য় হিজরীর ছফর মাস। এক রওয়ায়েত অনুসারে জঙ্গ-ওহদের (আহদ যুদ্ধের) পরে,

হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর 'রোখ্ছতির' (পিতৃ-গৃহ হইতে আঁ হজরত [ছালঃ]-এর গৃহে আগমন করিবার) সাড়ে চারি মাস পরে এই পবিত্র বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। (তবকাতে এব্নে ছায়াদ, বাবুন্নেছা)। শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় কন্যা-রত্ন হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নিকট আগমন করিলেন ; দেখিলেন, তিনি মামুলী (সাধারণ) কাপড় পরিধান করিয়া আছেন ; উদাস ভাবে, হায়া ও শরমে মস্তকাবনত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে চুপ-চাপ ও 'পেরেশান' অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া হুজুর (ছালঃ) খেয়াল ফরমাইলেন, সম্ভবতঃ আলীর (কঃ—ওঃ)-এর এফ্লাছের (দৈন্য—দরিদ্রতার) খেয়ালেই উহার এই অবস্থা। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) কন্যা-রত্নকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, " জরি মা পেয়ারী বতুল (রাঃ—আঃ)! তুমি 'মলুল' (দুঃখিত) হইও না ; আহ্লে বয়েতের মধ্যে আলী (কঃ—ওঃ) অপেক্ষা 'বেহ্তর' (উত্তম—শ্রেষ্ঠ) কেহ ছিল না—যাহাকে তোমার স্বামীত্বে বরণ করিতে পারিতাম। যদিও আলী (ক.—ওঃ) 'তঙ্গ্দস্ত্' (গরীব—দরিদ্র), তাহাতে কোনও 'পরওয়া' নাই ; এই পার্থিব দরিদ্রতা কয়েক দিনের জন্য মাত্র ; পরকালের সচ্ছলতার প্রতি দৃষ্টি রাখ। পরকালের 'খাজানাঃ' (ঐশ্বর্য্য রাশি) তোমার স্থায়ী সম্পদ্। পেরেশান হইবার কোনই কারণ নাই। এই অস্থায়ী পৃথিবীতে 'ফকর' (আন্দেশা—নৈরাশ্য) ও দরিদ্রতার দুর্ভাবনা করাই 'ফজুল' (বৃথা)। " আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এই পবিত্র উপদেশ—পবিত্র বাণী, বিশেষ রূপ ফলপ্রদ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। জনাব ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-কে " রব্বল য়েয্যত " (আল্লাহ জল্ল-শানহু) ছবর ও শোকর এর 'তওফিক' প্রদান করিলেন ; তিনি ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। নিশ্চয়ই ঐ সকল 'পাকরূহ্'

(পবিত্র আত্মা)-এর জন্য পরকালের সম্পদ রাশি নির্দ্ধারিত আছে—তাঁহারাই উহার অধিকারী—যাঁহারা এই অস্থায়ী দুনিয়ায় 'ছবর' এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকেন; নিঃসম্বলতা ও দরিদ্রতা সম্বন্ধে কোনও 'শেকায়েত' করেন না; অক্ষুণ্ণ চিত্তে, অম্লান বদনে উহার (দরিদ্রতার) ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন।

এই শুভ-বিবাহের পর ৬।৭ মাস গত হইয়া গিয়াছে; এই সময় মধ্যে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'এরশাদ' (আদেশ) অনুযায়ী হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হারছাঃ-বিন্-নওমানের একখানি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়ায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেরে খোদা (কঃ—ওঃ) লজ্জা বশতঃ স্বীয় আহলিয়ার (স্ত্রীর) বিদায় সম্বন্ধে একটি কথাও এযাবৎ আঁ হজরত (ছালঃ)-কে বলিয়াছিলেন না। বরঞ্চ যখন আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর কখনও নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইত, তখন হুজুর (ছালঃ) ফরমাইতেন, " হে আলি! তোমার পক্ষে তোমার বিবী মবারক হউক, সে বড় ভাল মেয়ে।" অতঃপর একদিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হজরত আকিল (রাজিঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া 'আরজ' করিলেন, আমি ইচ্ছা করি, বৌ এর 'রোখ্ছত' (বিদায়) কার্য্য ও সম্পন্ন হইয়া যায়। কোনও কোনও ঐতিহাসিক এতদ্‌ সম্বন্ধে অন্যরূপ লিখিয়াছেন, সেই বর্ণনা এই:—একদিন হজরত আকিল (রাজিঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকট আগমন করিলেন, এবং বলিলেন, আমাদের এই 'আরজু' (প্রাণের আগ্রহ) যে, আঁ হজরত (ছালঃ) এই সময় স্বীয় 'লখ্ত্ জগর' (কলেজার টুকরা)-কে 'রোখ্ছত' (বিদায়) দেন; প্রত্যুত্তরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, আমিও ইহাই চাই; কিন্তু হুজুর আকরম (ছালঃ)-এর নিকট আরজ করিতে আমার সাহস হয় না। হজরত

আকিল (রাজিঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন ; তৎপূর্ব্বে হুজুর (ছালঃ)-এর পরিচারিকা ওম্ম-এমিন (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল ; হজরত আকিল (রাজিঃ) তাঁহার নিকট স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করাতে তিনি বলিলেন, প্রথমে 'আয্ ওয়াজে মত হরাত' (আঁ হজরতের সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ মোছলেম-মাতা) গণের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ; এসম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক ; কারণ এই সকল ব্যাপারে স্ত্রীলোকদিগের 'খেয়াল' পুরুষদিগের অপেক্ষা 'পছন্দিদাঃ' (মনঃপুত) হইয়া থাকে। তৎপর আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে যথানিয়মে 'আরজ' (প্রার্থনা) করিবেন। এই পরামর্শ স্থির হওয়াতে তাঁহারা মোছলেম-মাতা হজরত ওম্মে-ছল্মাঃ (রাজিঃ)-এর গৃহে আসিয়া প্রথমে তাঁহার নিকট কথা উত্থাপন করিলেন, পরে আর আর মোছলেম-মাতার মত গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হইলেন ; ঐ সময় সেই গৃহেই আঁ হজরত (ছালঃ) অবস্থান করিতেছিলেন। হজরত আকিল (রাজিঃ) ও হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বাহিরে থাকিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে মোছলেম-মাতাদিগের অন্যান্য কথার আলোচনা হইতে লাগিল। কথা-প্রসঙ্গে হজরত ওম্মে-ছলমাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত খদিজাতুল কোব্রাঃ (রাঃ—আঃ)-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন ; সাংসারিক কাজ কর্ম্মে তাঁহার দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে অনুকূল আলোচনা করিলেন ; আর বলিলেন, তাঁহার সম্মুখে যদি ফাতেমার 'শাদী' (বিবাহ) হইত, তবে তিনি আজ কতই না আনন্দ প্রকাশ করিতেন ; আমাদিগকে কোনও বিষয়ের জন্য কিছুমাত্র ভাবিতে হইত না। আমরা হাসি-খুশির সঙ্গে মহা উৎসাহ ও উল্লাস সহকারে এই শুভকার্য্যে

যোগদান করিতাম। এক্ষণে আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহার বিবীর রোখ্ছতের জন্য প্রার্থী ; আর আমরা সকলেই 'রোখ্ছত' (বিদায়) করিতে প্রস্তুত ; এবং সেকার্য্যে সহানুভূতি সম্পন্ন ; এক্ষণে এ বিষয়ে আর কিসের জন্য বিলম্ব হইতে পারে ? হজরত খদিজাতুল কোব্রাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নাম শ্রবণে হুজুর (ছালঃ)-এর নেত্রযুগলে অশ্রু বিন্দু দেখা দিল ; তিনি শোক-ক্লিষ্ট হৃদয়ে ফরমাইলেন " খদিজা (রাঃ—আঃ)-এর উপমা কোথায় ? তিনি আমার 'তছদিক্' (সত্যতার সাক্ষ্য) ঐ সময় দিয়াছিলেন—যখন মক্কার সকল লোক আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রচার করিতেছিল। তিনি স্বীয় বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশি আমার জন্য খোদার পথে—আল্লাহর নামে উৎসর্গ এবং তদ্দ্বারা এছলামের পূর্ণ সহায়তা করিয়াছিলেন।" ওম্মে ছলমাঃ (রাঃ—আঃ) ফরমাইলেন, " এয়া হবিবে খোদা (হে আল্লাহ তা-লার বন্ধু) ? আপনি যাহা ফরমাইলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য ; খোদা তা'লা তাঁহার সঙ্গে আমাদিগকে 'জন্নতে' (মোছলেম-স্বর্গে) সম্মিলিত করাইবেন, ইহাই আমাদিগের সম্পূর্ণ আশা ও ঐকান্তিক কামনা। এক্ষণে আপনার ভ্রাতা—পিতৃব্যপুত্র এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন যে, আপনি তাঁহার স্ত্রীকে 'রোখ্ছত' (বিদায়) করিয়া দেন।" আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, " অয়ি ওম্মে ছলমাঃ ! আলী ত এযাবৎ আমাকে একথা বলে নাই।" হজরত ওম্মে ছলমাঃ (রাঃ—আঃ) আরজ করিলেন, " এয়া রছুলোল্লাহ্ ! আলী নিতান্ত লজ্জাশীল এবং 'মওদ্দব' (আদবদার) যুবক, এজন্য হুজুরের সম্মুখে স্বীয় বাসনা প্রকাশ করিতে পারেন নাই।" তখন হুজুর ফরমাইলেন, আচ্ছা যাও, আলীকে ডাকিয়া আন। তদনুসারে তিনি আহূত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় ওম্মোল মুমেনিনগণ কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। হুজুর (ছালঃ) হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আলি ! তুমি কি চাও ? তুমি কি

ইহাই চাও যে, আমি তোমার বিবীকে বিদায় করিয়া দি ? হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মস্তক অবনত করিয়া অতি আদবের সহিত বলিলেন, এয়া রছুলোল্লাহ্ ! আমার পিতামাতা হুজুরের নামে কোরবান্ হউন, আমার ত ইহাই আরয্। তচ্ছ্রবণে আঁ হজরত (ছালঃ) কয়েকটি 'দহরম' (মুদ্রা) হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তে প্রদান করিলেন ; এবং ফরমাইলেন, কতক 'ছোহারে' (খোরমা) ও কতক পনির প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আন। তদনুসারে তিনি বাজারাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে আঁ হজরত (ছালঃ), ছৈয়দাঃ ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বিদায়ের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইয়াছেন,—আমি ৫ দরহমের ঘৃত, ৪ দরহমের খোরমা ও এক দরহমের পনির আনিয়া হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। হুজুর (ছালঃ) দস্তর-খান চাহিলেন, ওমৎকর্তৃক আনীত ঐ সকল জিনিষ রুটির সঙ্গে দলিয়া মথিয়া স্বহস্তে মলিদা তৈয়ার করিলেন, এবং দস্তরখান স্থাপন করিয়া আমাকে আদেশ করিলেন, তুমি বাহিরে যাও, আর যে যে মোছলমানকে দেখিতে পাও, ডাকিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আইস। আমি মহাজের ও আন্ছারদিগের মধ্যে যাঁহাকে যাঁহাকে পাইলাম, ডাকিয়া লইয়া আসিলাম। তাঁহারা সেই পবিত্র গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক মলিদা ভক্ষণ করিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) একটি মাটীর পেয়ালা চাহিলেন ; উহা আনীত হইলে, তিনি ঐ পেয়ালাটি মলিদা দ্বারা পূর্ণ করিলেন, এবং ফরমাইলেন, ইহা ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) ও তাহার স্বামীর জন্য রাখা হইল। তৎপর উহা আয্ওয়াজ মোত্হারাত (মোছলেম-মাতা) দিগের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করিয়া দিলেন। অতঃপর মোছলেম-মাতা হজরত ওম্মে-ছলমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে বলিলেন, যাও, ফাতেমাঃ কে এখানে আনয়ন কর। তিনি উঠিয়া গিয়া ছৈয়দতন্নেছা

(রাঃ—আঃ)-কে সেখানে আনয়ন করিলেন। সে সময় ছৈয়দার চেহ্রা মবারক (বদন মণ্ডল) হইতে 'পছিনা' (ঘর্ম্ম) প্রবাহিত হইতে ছিল; এবং তিনি অতি কষ্টে সম্মুখের দিকে পা-বাড়াইতে ছিলেন। যখন তিনি পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহার মুখস্থিত 'রওয়া'—যাহা বোরক্কার স্থান অধিকার করিয়া ছিল—উত্তোলন করিলেন; এবং স্বীয় বক্ষঃস্থলের বামদিকে খাতুনে জন্নতের পবিত্র মস্তক রাখিয়া 'পেশানীর দরমিয়ানে' (কপালের মধ্যস্থলে) স্নেহ-ভরে 'বোছা' দিলেন (চুম্বন করিলেন)। আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তে তাঁহার হস্ত প্রদান পূর্ব্বক ফরমাইলেন, হে আলি! পয়গম্বর-দুহিতা তোমার জন্য 'মবারক' (মঙ্গলজনক) হউক। দুহিতা-রত্নকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, অয়ি ফাতেমাঃ! তোমার 'খাওন্দ্' (স্বামী) খুব ভাল লোক। এক্ষণে তোমরা 'মিঞা-বিবী' (স্বামী-স্ত্রী) স্বগৃহে গমন কর। দেওয়া-থোওয়ার জন্য খোদার পয়গম্বরের নিকট কি আছে না আছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। হাঁ! অবশ্য ওয়াজ-নছিহতের (উপদেশ দানের) অতুলনীয় উত্তরাধিকারিণী আমার 'জগর গোশাঃ' (কলেজার টুকরা)-কে করিয়াছি। আর ইহা এমনই 'নেয়ামত' (অতুলনীয় সম্পদ) ছিল যে, দুনিয়ার সমুদয় মূল্যবান্ ধন-রত্নও উহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। হুজুর (ছালঃ), হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে, তাঁহার প্রতি স্বামীর কি কি হক্ (অধিকার) আছে, তাহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন; আর স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি কি হক্ আছে, তাহা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কেও বিশেষ ভাবে বলিয়া দিলেন। হুজুর (ছালঃ) দীন ও ঈমানের অতুলনীয় সম্পদ দ্বারা স্বামী-স্ত্রীকে 'মালামাল' (সম্পদ-সম্পন্ন) করিলেন, তৎপর গৃহের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত উভয়কে বিদায় করিতে আগমন করিলেন। অবশ্য ইতিমধ্যে স্বর্গ-রাজ্ঞী বিমাতা দিগকে ছালাম করিয়া বিদায় গ্রহণ

করিয়াছিলেন। হুজুর (ছালঃ) গৃহের দ্বারদেশে পঁহুছিয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর দুই বাযু (বাহু) ধারণ পূর্ব্বক বরকতের দোওয়া ফরমাইলেন। ওদিকে উষ্ট্র সজ্জিত ছিল, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং ছৈয়দাঃ তদুপরি আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। এই উষ্ট্রের লাগাম (নাসিকা-রজ্জু) হজরত ছলমান ফারছী (রাজিঃ) ধরিয়া চলিলেন। আছমাঃ-বিন্তে ওমিছ * (রাঃ—আঃ) (এবং অধিকাংশ রাবির মতে ছলমি [রাঃ—আঃ] †) ঐ সময় হুজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে

* আছমাঃ-বিন্তে ওমিছ (রাঃ—আঃ), ইঁনি হজরত জাফর-বিন্-আবি তালেব (রাজিঃ)-এর বিবী ছিলেন; ইঁনি স্বামীর সঙ্গে হাব্শা-(আবিশিনিয়া) রাজ্যে হেজরত করিয়া গমন করিয়াছিলেন; সেই স্থানেই ইহার গর্ভে আবদুল্লা (রাজিঃ) ও আওন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। মুতাযুদ্ধে হজরত জাফর (রাজিঃ) শহীদ হইলে, ১ম খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ইঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ইঁহাকে নেকাহ্ করেন। তাঁহার গর্ভে শেরে খোদার ঔরসে ইয়াহ্ইয়া নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খাতুনে জন্নতের বিবাহ ও বিদায় কালে আছমাঃ-বিন্তে ওমিছ [রাঃ—আঃ] মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না; আবিশিনিয়ায় ছিলেন; সুতরাং ছলমি (রাঃ—আঃ)ই হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে গিয়াছিলেন।

† ছলমি ওম্মে রাফেয় (রাঃ—আঃ), আবি রাফেয় (রাজিঃ)-এর সহধর্ম্মিণী ও ছাহাবিয়া ছিলেন। ইঁহার নিকট হইতে ইঁহার প্রভু আবদুল্লা বিন্-আলী রওয়ায়েত করিয়াছিলেন যে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পুত্র এবাহিমের জন্মগ্রহণ কালে ইঁনি তাঁহার ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। স্বর্গ-রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর মৃত্যুর পর আছমা-বিন্তে ওমিছ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে একত্র হইয়া ইঁনি তাঁহার মৃত্যু-স্নান দেওয়াইয়াছিলেন।

আরজ করিলেন, এয়া রছুলোল্লাহ্! 'লাড়্কি' (কন্যা—মেয়ে)-দিগকে প্রথমে স্বামী-গৃহে গিয়া সময় অসময়ের জন্য কোনও স্ত্রীলোকের আবশ্যক হয়, এজন্য আমি ছাহেব যাদীর সঙ্গে যাইতেছি। হজরত ছারওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) এই কথা শ্রবণে খুব আনন্দ লাভ করিলেন; এবং উহার জন্য "দোওয়ায়-খায়ের" করিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়ের দ্বিতীয় দিন ছরওয়ারে আলম (ছালঃ) আমার গৃহে আগমন করিলেন। আমিও ফাতেমাঃ তকিয়া লাগাইরা (বালিশ হেলান দিয়া) বসিয়াছিলাম, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আওয়ায্ শুনিয়া ইচ্ছা করিলাম যে, আমি উঠিয়া যাই; কিন্তু তিনি আদেশ করিলেন, তোমরা যে অবস্থায় আছ, ঐ অবস্থায়ই বসিয়া থাক; তৎপরে তিনি আসিয়া আমাদের শিয়রের দিকে বসিয়া গেলেন। আর স্বীয় পবিত্র পা দুখানি আমাদের উভয়ের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন। আমি তাঁহার দক্ষিণ পদ এবং ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) বামপদ স্ব স্ব বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলাম। তিনি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। ইহার পর ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে বলিলেন, একটু পানী আনয়ন কর। তদনুসারে তিনি একটি মাটির পেয়ালায় করিয়া খানিকটা পানী আনিলেন। হুজুর (ছালঃ) সেই পানীর কিয়দংশ ফেলিয়া দিলেন; অবশিষ্ট পানী সহ পেয়ালা হাতে লইয়া কিছু দোওয়া পড়িলেন; এবং ফরমাইলেন, হে আলি! তুমি এই পানী পান কর; এবং উহার কিয়দংশ রাখিয়া দাও। আদেশ প্রাপ্তি মাত্রে আমি কিয়দংশ পানী পান করিলাম, অবশিষ্টাংশ রাখিয়া দিলাম। যে টুকু পানী অবশিষ্ট ছিল, তিনি উহা আমার বক্ষঃস্থলে ও মুখে ছিটাইয়া দিলেন, আর আমার মঙ্গলের জন্য দোওয়া ফরমাইলেন।

ইহার পর আবার পানী আনাইলেন, এবং ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে,

পানী দম করিয়া কিয়দংশ ঐরূপে পান করাইলেন ও অবশিষ্ট পানী তাঁহার গায়ে ছিটাইয়া দিলেন, এবং অবশেষে দোওয়া ফরমাইলেন। নাছেরু-ত্তাওয়ারিখকার লিখিয়াছেন, ঐ সময় ছলমি অর্থাৎ ওম্মে রাফেয়কে লক্ষ্য করিয়া জনাব হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) ফরমাইলেন, অয়ি ওম্মেরাফেয়! তুমি এক্ষণে এখানেআর কিজন্ত রহিয়াছ? উত্তরে তিনি বলিলেন, এয়া রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)! যে সময় ওম্মোল মুমেনিন হজরত খদিজাতুল কোব রাঃ (রাঃ—আঃ)-এর আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার জীবনের আর কোনও আশা ছিল না, আমি সেই সময় তাঁহার খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখিতে পাইলাম, তিনি রোদন করিতেছেন। আমি 'তায়াজ্জব' (আশ্চর্য্যান্বিত) হইলাম, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অয়ি ওম্মোল মুমেনিন! আপনি এসময় কেন রোদন করিতেছেন? আপনি পয়গম্বর আখেরয্‌যমান (ছালঃ)-এর বিবী, আর এমন বিবী—যাঁহার প্রদত্ত উপকার রাশির বিষয় হুজুর (ছালঃ) স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় এই আসন্ন কালে আপনার হৃদয়ে বেদনানুভূত হইবার কারণ কি? আপনি কেন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন? উত্তরে তিনি ফরমাইলেন, অয়ি ওম্মে রাফেয়! জুল্‌হীন (নব-বধূ)-দিগকে স্বামী-গৃহে যাইতে, প্রথমে কোনও হিতৈষিণী বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকা আবশ্যক---যে নারী সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়ে ও কার্য্যে তাহার সহায়তা করিতে পারে। আমার ফাতেমাঃ 'বাচ্চাঃ' (অতি অল্প বয়স্কা বালিকা), কি জানি, স্বামী-গৃহে বিদায় কালে যদি তাহার সঙ্গে কোনও বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক না পাওয়া যায়? ঐ কথা মনে করিয়া আমি ক্রন্দন করিতেছি। আমি আরজ করিলাম, অয়ি ওম্মোল মুমেনিন! যদি আমি ঐ সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকি, তবে আমি ঔ খেদমত আদায় করিবার জন্ত প্রতি-শ্রুতিদান করিতেছি। খোদার দরগায় হাজার শোকর, ফাতেমার

জননীর নিকট আমি যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলাম, আজ এই শুভ দিনে আমার সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইল। এই উক্তি শ্রবণে হজরত রছুল করিম (ছালঃ) ওম্মে-রাফেয় এর জন্য দোওয়া (খোদার দরগায় মঙ্গল কামনা) করিলেন। ইহার পর আঁ হজরত (ছালঃ) এরশাদ ফরমাইলেন, গৃহের সমস্ত কার্য্য, যথাঃ—রুটি পাক করা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, চাক্কিতে আটা পেষা ইত্যাদি কার্য্য ত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) সম্পন্ন করিবে; আর বাহিরের কাজ যথাঃ—বাজার (বা দোকান) হইতে সওদা-পত্র আনয়ন করা, পানী আনয়ন, উট চরান ইত্যাদি কার্য্য আলী (কঃ—ওঃ) 'আঞ্জাম' দিবে। বিবাহের ৭ মাস পরে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) স্বামী-গৃহে বিদায় হইয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনা দ্বারা জানা যায় যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হজরত আকিল (রাজিঃ) এই সময় স্বীয় জননীর সঙ্গে একত্রে বাস করিতে ছিলেন। স্বর্গ-রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) সেই গৃহেই আগমন করিয়াছিলেন। এই গৃহ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর গৃহ ও মছজেদে নববী হইতে কতকটা দূরবর্ত্তী থাকায়, তাঁহার যাতায়াতে কষ্ট হইত; কারণ, স্নেহময়ী কন্যা-রত্নকে দেখিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই সেই গৃহে উপস্থিত হইতেন। একদা তিনি ছৈয়দাঃ বতুল (রাঃ—আঃ)-কে ফরমাইলেন, ফাতেমাঃ! আমি তোমাকে স্বীয় গৃহের নিকটে রাখিতে ইচ্ছা করি; তদ্ শ্রবণে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) আনন্দ সহকারে ফরমাইলেন, আপনার গৃহের নিকট হারছাঃ (রাজিঃ)-এর অনেক গুলি গৃহ আছে; যদি আপনি তাঁহাকে বলেন, তবে তিনি আমার জন্য কোনও গৃহ খালি করিয়া দিতে পারেন। হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, হারছা (রাজিঃ) ত আমার জন্য এত অধিক সংখ্যক গৃহ খালি করিয়া দিয়াছে যে, এক্ষণে তাহাকে আর কোনও

গৃহের জন্য অনুরোধ করিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। এই সংবাদ হজরত হারছাঃ (রাজিঃ)-এর কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি আঁ হজরত (ছালঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এয়া রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)! আমি শুনিতে পাইলাম, আপনি হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে নিজের কাছে রাখিতে ইচ্ছা করেন, এজন্য আমি তাঁহার জন্য আপনার গৃহের অতি নিকটবর্ত্তী গৃহ খালি খালি করিয়া দিতেছি। * এয়া রছুলোল্লাহ্! আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুলের শপথ, আমার সমুদয় মাল (ঐশ্বর্য্য) আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুলের জন্য উৎসর্গীকৃত। আমার ঐ মাল—যাহা আপনার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা আমি অতি প্রিয় ও পবিত্র বলিয়া মনে করি। যাহা হউক, তিনি সেই গৃহ খানি অচিরে খালি করিয়া দিলেন; আর হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) ঐগৃহে আগমন করিলেন। এই গৃহ-পরিবর্ত্তন-ব্যাপারে আঁ হজরত (ছালঃ), ফাতেমাঃ যোহরাঃ(রাঃ—আঃ)-কে সর্ব্বদা দেখিবার সুযোগ লাভ করিলেন; হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) ও সর্ব্বদা পিতৃ-গৃহে গমন এবং বিমাতাদিগের সঙ্গে মিলিবার মিশিবার সুযোগ পাইলেন। সম্ভবতঃ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জননী স্বীয় জ্যেষ্ঠ-পুত্র হজরত আকিল (রাজিঃ)-এর গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। অবশ্য কনিষ্ঠ পুত্রের গৃহে ও যাতায়াত করিতেন। অন্যতম (তৃতীয়) পুত্র হজরত জাফর (রাজিঃ) তখনও আবিশিনিয়ায়ই ছিলেন।

---

* মছজেদ নববীতে যে স্থান এক্ষণে "বস্তানে ফাতেমাঃ" নামে উত্তরের দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ গৃহ খানি ঐস্থানে অবস্থিত ছিল। হজরত ফাতেমাঃ যোহরার কবর বলিয়া যে স্থান আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র রওযাঃ মবারকের উত্তর দিকে নির্দ্দেশ করা হয়, এই গৃহ-খানি ঐ স্থানে বিরাজ করিত।

হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) মহামহিম পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, কিছু দিন কিছু দূরে—স্বামী-গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন ;-এক্ষণে পিতার গৃহ-পার্শ্বে বাসস্থান নির্দ্দেশ হওয়াতে দূরত্বের অসুবিধা দূর হইয়া গেল। এইবার নিশ্চিন্ত মনে, ঐকান্তিক চিত্তে তিনি স্বামী-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। একদিকে নিয়মিত উপাসনা-আরাধনা, অন্য দিকে সাংসারিক কার্য্যের সুশৃঙ্খলা বিধান ও স্বহস্তে তৎ সমুদয়-সম্পাদন—সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-সেবা, পিতৃ-দর্শন, বিমাতা ও ভগিনীদিগের সঙ্গে সম্মিলন ইত্যাদি কার্য্যেই তাঁহার সারা দিন এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত। অবশিষ্ট ৪।৫ ঘণ্টা সময় মাত্র তাঁহার বিশ্রাম ও নিদ্রায় অতিবাহিত হইত। গভীর নিশীথেও "তাঁহাজ্জদ" নমাযে কাটাইতেন। তিনি একটু সময় ও বিনা কাজে বৃথা অপব্যয় করিতেন না। কি সুখ-শান্তিতেই না তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত হইতেছিল। তাঁহার গৃহে অর্থের সচ্ছলতা আদৌ ছিল না। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যৎসামান্য যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা কোনও মতে কষ্টে-স্নষ্টে 'দিন গোজরান' হইত। হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) সেই সামান্য খাদ্য জিনিসাদি দ্বারাই স্বামীকে তৃপ্তি সহকারে আহার করাইতেন ; ভিক্ষার্থী রাহী-মোছাফেরের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন ; আর যৎসামান্য যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তদ্দ্বারা স্বয়ং আহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া খোদার দরগায় "শোকর-গোজার" হইতেন। ধনী ও আমীর ওমরাগণ নানাপ্রকার উপাদেয় চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি খাদ্য দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া যত না পরিতৃপ্ত হইতেন, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) সামান্য যও এর রুটি ভক্ষণ করিয়া তদাপেক্ষা অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতেন। দুনিয়ার সমস্ত বিপদ অভাব ও অসচ্ছলতা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার

'ছবর' (ধৈর্য্য) ও 'তহম্মল' (সহ্যগুণ)এ একটুও পার্থক্য দৃষ্ট হয় নাই। মিঞা-বিবীর সম্বন্ধ অতীব মধুর ও প্রীতিকর ছিল। দাম্পত্য-জীবনে সুখ-শান্তির একটু অভাব ও কখন দৃষ্ট হয় নাই। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইয়াছেন, যতদিন (হজরত) ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) জীবিত ছিলেন, তাঁহার দ্বারা আমার উপর কোনও রূপ 'তকলিফ' (কষ্ট) হয় নাই। আর প্রকৃত পক্ষে কষ্ট হইবেই বা কিরূপে? যখন দুই দিক্ দিয়াই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর রঙ 'গালেব' ছিল, তাঁহার প্রতিবিম্ব উভয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হইতেছিল—তাঁহার খোদানুরক্তি, কার্য্য-কলাপ, আচার-ব্যবহার, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, এছলাম-প্রিয়তা উভয়ের মধ্যেই বিশেষ ভাবে পবিত্র ক্রিয়া প্রকাশ করিত, সেরূপ ক্ষেত্রে এই দুইটি পবিত্র জীবনের ধারা একই দিকে—পবিত্র পথেই প্রবাহিত হইত। সংসারের কোনও রূপ আবিলতায় তাঁহাদের দেহ মন কখনও কলুষিত হয় নাই। মহামাননীয় মহানবীর আদর্শ শিক্ষায় তাঁহাদের মন প্রাণ সর্ব্বতোভাবে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। তাঁহার সম্পূর্ণ পদানুসরণ করিয়া উভয়েই চলিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহারা সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহাপুরুষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেরিত মহাপুরুষের দ্বারা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। দুইটি জীবনের পবিত্র ধারা অবশেষে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একটী মহা-তরঙ্গিনীর সৃষ্টি করিয়াছিল; তাহাতে অপবিত্রতা, আবিলতা ও কলুষের লেশমাত্র ছিল না। সুতরাং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণও আদর্শ নর-নারী রূপে পৃথিবী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। যদি কোনও 'মামুলী' (সামান্য) বিষয় লইয়া উভয়ের মধ্যে কিছু 'শকররঞ্জিঃ' (মনোবাদ) উপস্থিত হইত : তাহা শুনিতে পাইয়া আঁ হজরত (ছালঃ) এমন অমূল্য ও ঐশী শক্তি সম্পন্ন উপদেশ প্রদান করিতেন যে, সেই সামান্য মনোবাদ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। পরিশেষে উভয়ে সেই মন কষাকষি ও মনোবাদের জন্য লজ্জিত হইতেন।

"আমল আশ্‌শরাহ্‌" গ্রন্থে হজরত ফেতান (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত আছে যে, ঘটনা বশতঃ একদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও হজরত ছৈয়দাঃ ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর মধ্যে কিছু মন-কষাকষি হইয়াছিল; যখন এই সংবাদ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর কর্ণগোচর হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের গৃহে গমন করিলেন; এবং হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে দক্ষিণ (ডান) দিকে এবং হজরত ছৈয়দতন্নেছা, (রাঃ—আঃ) কে বামদিকে বসাইয়া—স্বর্গীয় মহামূল্য উপদেশের 'দফ্‌তর' খুলিয়া দিলেন। তিনি এমন অমূল্য উপদেশ সকল দান করিলেন যে, উভয়ের মনোবাদ সম্পূর্ণরূপে দূর হইল—উভয়ের অন্তঃকরণ পরস্পরের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার হইয়া গেল। তাঁহাদের সে মনোবাদ বর্ত্তমান কালের স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসম্বাদের ন্যায় মারাত্মক ছিল না। উহার সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের দাম্পত্য-কলহের কোন তুলনাই হইতে পারে না। তাঁহাদের মধ্যে মনোবাদের সঞ্চার হইলে খোদা তা-লার ভয় অচিরে উভয়ের অন্তঃকরণে উপস্থিত হইত, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহা মিটিয়া যাইত। বর্ত্তমান কালে আল্লাহ্‌ তা-লার ভয় ও আতঙ্ক কাহারও মনে ক্ষণকালের জন্যও উদয় হয় না। উভয়েই আপনাদের দুর্জ্জয় 'যেদ' বজায় রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, এবং পরিণামে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া যায়। এই মনোবাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ভয়ানক বিষ বৃক্ষের উৎপত্তি হয়; এবং একে অপর কে 'জব্দ' করিবার জন্য নানা ফন্দি-ফেরেব আঁটিতে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মুখোমুখী অনেক সময় হাতাহাতিতে পরিণত হয়। হয় ত স্বামীর লাঠী কিংবা পাদুকা স্ত্রীর পৃষ্ঠে বা মস্তকে পতিত হয়। আবার স্ত্রীর জুতা-খড়ম, ঝাঁটা ও সময় সময় স্বামীর উপর বর্ষিত হয়। আর গালাগালি এবং বকাবকির ত কোন 'সীমানা-ছরহদ্দই' থাকেনা। অকথ্য ও অশ্রাব্য গালি-গালাজের ধারা উভয় পক্ষ হইতে প্রবাহিত হয়। হয় ত পরিণামে

ইহা দ্বারা অনেক সোণার সংসার ছাই হইয়া যায়। তাহারা খোদা ও রছুলের আদেশ এবং উপদেশ একেবারেই ভুলিয়া যায়। কোরআনের পবিত্র বাণীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ ও করে না। তাহারা যদি হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) এবং অন্যান্য পবিত্র চরিত্র ও পবিত্র চরিত্রা মোছলেম-নরনারীদিগের আদর্শ জীবন চরিত আগ্রহের সহিত—অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে, তবে তাহাদের মনের গতি অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

এমামুল-আওলিয়া হজরত হাছন বছরী (কোদ্দঃ) রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইয়াছেন, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) খুব অধিক পরিমাণ এবাদত করিলেও, গৃহকার্য্যে এবং সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানে তাঁহার কোনও রূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্ট হয় নাই।

শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর 'মালী হালাত' (আর্থিক অবস্থা) বিবাহিত জীবনে আদৌ সচ্ছল ছিল না। শারীরিক পরিশ্রম ও মজুরী কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কষ্টে স্বষ্টে—অভাব ও দৈন্যের মধ্য দিয়া কোনও রূপে দিন কাটিয়া যাইত। এক দিনের ঘটনা এই :—তিনি কোনও 'মযদুরী' (শ্রমিকের কাজ) পাইলেন না। অনাহারে মিঞা-বিবীর (স্বামী-স্ত্রীর) অষ্ট প্রহর (২৪ ঘণ্টা) কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় একজন তাযেরের (ছওদাগরের—বণিকের) উষ্ট্র, বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া মদীনায় আসিল; ঐ সকল মাল-আছবাব উট হইতে নামাইবার জন্য শ্রমিকের আবশ্যক হইল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত উষ্ট্র হইতে বাণিজ্য-দ্রব্য গুলি নামাইয়া যথাস্থানে রাখিলেন। ছওদাগর তাঁহাকে এই কার্য্যের জন্য ১ দরহম মাত্র পারিশ্রমিক দিলেন; তিনিও সন্তুষ্টির সহিত উহা গ্রহণ করিলেন।

রাত্রি দ্বি-প্রহর অতীত হইয়া যাওয়াতে নগরের প্রায় সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। একখানি দোকান খোলা পাইয়া সেখান হইতে কিছু 'জও' (যব) ক্রয় করিলেন। তিনি এক দরহমের জও লইয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন; হজরত বতুল (রাঃ—আঃ) আনন্দ সহকারে—হাসি-খুশির সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার ঝুলি হইতে জওগুলি বাহির করিয়া, তৎক্ষণাৎ উহা চাক্কিতে (জাঁতায়) পিষিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই টাট্‌কা আটার রুটি পাকাইয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সম্মুখে দস্তরখানে স্থাপন করিলেন। তিনি তৃপ্তি সহকারে আহার করিবার পর, অবশিষ্ট যাহা রহিল, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তাহা খাইলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইয়াছেন, ঐ সময় হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছাঃ)-এর এই 'এরশাদ' (উক্তি) আমার স্মরণ-পথে পতিত হইল যে, তিনি একদা বলিয়াছিলেন, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) দুনিয়ার 'বেহতরিণ আওরত' (সর্ব্বোৎকৃষ্ট—সর্ব্বগুণ সম্পন্না স্ত্রীলোক); স্মরণ মাত্রেই আমি খোদাতায়ালার শোকর আদায় করিলাম (আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম)।

স্বীয় জীবনের শেষ ভাগে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যখন খলিফার পবিত্র ও সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য-সম্পদ তাঁহার চরণ তলে গড়াইতে ছিল; তদীয় আযাদ করা (মুক্তিপ্রাপ্ত) প্রিয় ক্রীতদাস আবু রাফেয় (রাজিঃ) বয়তুল মালের অধ্যক্ষ পদে বরিত; সেই সময় একদা তাঁহার এক ছাহেবযাদী (কন্যা-রত্ন) এক ছড়া (একগাছি) ছাচ্চা মতির (মুক্তার) হার পরিয়াছিলেন। তিনি বয়তুল মালের মুক্তাহার দেখিয়া চিনিয়া ফেলিলেন, এবং বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মতির হার তুমি কোথায় পাইলে মা! কন্যা ফরমাইলেন, আবু রাফেয় (রাজিঃ) আমাকে ইহা দিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া এই বলিয়া 'তম্বি' (শাসন)

করিলেন যে, "ভবিষ্যতে যদি তুমি বয়তুল মালের কোনও জিনিসে হাত লাগাইবে, তবে তোমার হাত কাটিয়া ফেলা হইবে।" সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ফেরমাইলেন যে, "আমি যখন ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে 'আক্দ' (বিবাহ) করিলাম, তখন আমার এই অবস্থায় দিনাতিপাত হইতেছিল যে, একখানি মেষচর্ম মাত্র শয্যারূপে ব্যবহৃত হইত। দিনের বেলায় উহাতে করিয়া উটটিকে 'চারা' (ঘাস) খাওয়াইতাম, আর রাত্রিকালে, উহাই আমাদের শয্যায় পরিণত হইত। আমাদের দাস বা পরিচারক কেহ ছিল না; আমরা নিজেই সমুদয় গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতাম।"

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পরলোক গমনের পর কোনও ব্যক্তি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ব্যবহার আপনার সঙ্গে কিরূপ ছিল; তিনি বিষণ্ণ বদনে শোকার্ত্ত হৃদয়ে আহ্ শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "তিনি জন্নতের (মোছলেম-স্বর্গের) একটি সুগন্ধি পুষ্প ছিলেন; যাহা বিশুষ্ক হইয়া যাওয়ার পরেও উহার সুগন্ধে আমার মস্তিষ্ক 'ময়ত্তর' (সৌরভিত)।"

হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর এই নিয়ম ছিল যে, প্রথমে তিনি 'শওহর' (স্বামী) ও স্নেহাস্পদ বালক-বালিকাদিগকে আহার করাইতেন; অবশেষে তিনি স্বয়ং আহার করিতেন। ইহাও একটি প্রশংসনীয় 'আদব' ও আদর্শ কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। ইহার আর একটি কারণ এই ছিল যে, খাদ্য দ্রব্যের অল্পতা প্রযুক্ত প্রথমতঃ স্বামী এবং পুত্র কন্যাদিগকে উদর পুরিয়া আহার করাইতেন, যদি কিছু অবশিষ্ট না থাকিত, তবে নিজে উপবাস থাকিতেন। আবার কিছু খাদ্য দ্রব্য অবশিষ্ট থাকিলে, ঐ সময় যদি কোনও ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি দরওয়াজায় হাঁক মারিত—খাদ্য দ্রব্য প্রার্থনা করিত, তবে নিজে না খাইয়া প্রার্থীর-প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। সামান্য জওএর রুটিও

সকল সময় উদর পূরিয়া খাইতে পাইতেন না; কখনও অর্দ্ধাহারে, আর কখনও বা অনাহারে থাকিয়া 'ছবর' ও শোকর' 'এখ্‌তেয়ার' (অবলম্বন) করিতেন; এবং উপাসনাও আরাধনার দ্বারা আহারের অভাব মোচন করিতেন। তিনি আনন্দের সহিত এই অর্দ্ধাহার বা অনাহার-জনিত ক্লেশ সহ্য করিতেন। স্বামী এবং সন্তানগণ কে উদর পূরিয়া খাওয়াইতে পারিলেই, তিনি আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেন, আর মহামহিম পিতার পদানুসরণ করিতে পারিতেছেন বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। আজ কালকার বিলাসিনী বিবিগণ এই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন কি? তাঁহাদের বস্ত্রালঙ্কারের বহর, মূল্যবান্ বিনামা, আতর, এসেন্স্, বহুমূল্য সাবান, পমেটম, পাউডার নানাবিধ স্নো, সুগন্ধি তেল, উৎকৃষ্ট তওলিয়া, রুমাল ফিতা ইত্যাদি ফ্যাসান ও বিলাসিতার কত দ্রব্যেরই না আবশ্যক হয়। তাঁহারা এমনই ননীর পুতুল যে, পাক করিতে গেলে আগুণের তাপে গলিয়া যান। মামা, দাই, চাকরাণী, পরিচারিকা,—অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ বাবুচির হাতে পাক-সাকের, ভার অর্পণ করিয়া শান্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। সন্তানগণের লালন পালনের জন্য খেলাই, দাই, আয়া, বয় প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। নিজে শরীরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে, পারিপাট্য সাধনেই মূল্যবান্ সময় অতিবাহিত করেন। গল্প-গুজব, নাটক-নভেল পাঠ, 'হাম্ন-খেয়াল' বয়স্তদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস, বৈকাল বেলা মাঠে হাওয়া খাওয়া, নদী তটের স্নিগ্ধ বায়ু সেবন, উদ্যান ভ্রমণ, খোলা মটর বা গাড়ীতে ইতঃস্ততঃ বেড়ান ইত্যাদি কার্য্যকেই জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন। স্বামী বেচারা যদি ধনী হন, তবে ত অর্দ্ধাঙ্গিনীর সর্ব্বপ্রকার বিলাসোপকরণ যোগাইয়া, কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করেন। আর টাকা পয়সার অনাটন হইলে বিলাস-প্রিয়া মহিলাগণ স্বামীর প্রতি নিতান্ত নির্দ্দয় ও হৃদয়হীন ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র পক্ষে সর্ব্বদা টাকার দাবী, অলঙ্কার ও পোষাক-পরিচ্ছদের দাবী, বিলাস-ব্যসনের উপকরণের দাবী বড়ই মারাত্মক হইয়া উঠে। স্বল্প আয় বিশিষ্ট পুরুষগণ এরূপ ক্ষেত্রে চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া থাকেন। আমাদের পরিচিত কোনও উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র লোককে দেখিয়াছি, স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাদিগের ফ্যাসান রক্ষা করিতে, বহুমূল্য বস্ত্র-বিনামা ও বিলাস-সামগ্রী যোগাইতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেন। শেষ জীবনে ৪।৫ শত টাকা বেতনের চাকরী করিয়াও কিছু সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। অকস্মাৎ সুদূর প্রবাসে—চাকরী স্থলে প্রাণত্যাগ করাতে, স্ত্রী-কন্যা (কন্যা—যাহাদের বিবাহ হইয়াছিল না) জামাতাদিগের গলগ্রহ হইতে বাধ্য হইলেন। অথচ বিলাসিতা ও অপব্যয় রোগে আক্রান্ত না হইলে এমন কিছু বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন, যদ্দ্বারা স্ত্রী-কন্যাদির পরম সুখে দিন 'গোজরান' হইতে পারিত। একজন নয়, অনেকেই এইরূপ শোচনীয় অবস্থাগ্রস্ত। ৬০৲—৭০৲—৮০৲—৯০৲ বা শ'দেড় শত টাকা বেতনের লোকদিগের স্ত্রীগণ বিলাসী হইলে, তাহাদের সাংসারিক বিপদ কি ভীষণ আকার ধারণ করে, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় শহরে এই শ্রেণীর বিপদ-গ্রস্ত লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর মহামাননীয় পিতা ছিলেন 'ছোল্‌তানুল ফোকারাঃ' (ফকীর অর্থাৎ দরিদ্রদিগের সম্রাট), আর 'শওহর' (স্বামী) ছিলেন 'যোব্‌দাতুল্ মছাকিন' (মিছকিন অর্থাৎ গরীবদিগের অগ্রণী)। অর্থাৎ তাঁহার পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়, উভয় স্থানই ছিল দরিদ্রতা এবং অর্থহীনতার পূর্ণ আদর্শ স্থল। এই অবস্থায় ছৈয়দার 'এস্তেক্‌লাল্' (ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা) অসাধারণ ও অতুলনীয় ছিল। পার্থিব দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের প্রতি তিনি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

উহাতে যেন তাঁহার জন্মগত অধিকার ছিল। মহামাননীয় ওয়ালেদ-মাজেদের শিক্ষায় তিনি পরম পরাৎপর আল্লাহ্ তা-লার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীলা ছিলেন; আর পরজীবনের সুখ-শান্তির দিকেই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি স্বীয় গৃহের সমস্ত কাজকর্ম্মই স্বহস্তে-সম্পন্ন করিতেন; এবং তাহাতেই তিনি অনুপম শান্তি অনুভব করিতেন। পুত্র-কন্যাগণের জন্মগ্রহণের পর তাঁহার সাংসারিক কাজের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গেলেও, তিনি মহা উদ্যমের সঙ্গে ছোট বড় সকল কাজই স্বহস্তে প্রসন্ন চিত্তে নির্ব্বাহ করিতেন; সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-সেবা এবং উপাসনা-আরাধনা ও যথা-নিয়মে সম্পন্ন করিতেন। রাত্রির অধিকাংশ সময়—কখন কখন সমস্ত রাত্রি উপাসনা কার্য্যে অতিবাহিত হইত। দিনের বেলায় বিশ্রাম লাভ তাঁহার ভাগ্যে বড় একটা ঘটিত না।

পূর্ব্বে আরবদেশের নিয়ম ছিল, যুদ্ধে জয়-লব্ধ দ্রব্য-সামগ্রীর এক চতুর্থাংশ বিজয়ী দলের নেতা বা সেনাপতি লাভ করিতেন; অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ (চারি ভাগের তিন ভাগ) যোদ্ধ্ পুরুষদিগের মধ্যে বণ্টন হইত। আঁ হজরত (ছালঃ) নিয়ম করিলেন, বিজয়ী দলের দলপতি এক পঞ্চমাংশ পাইবেন; আর পাঁচ ভাগের চারিভাগ যোদ্ধ্ পুরুষগণ লাভ করিবেন। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোর-আন শরীফে আল্লাহ্ জল্ল-শানহু ফরমাইয়াছেন, "আর (মোছলমানগণ) জানিয়া রাখ যে, তোমরা যে জিনিষ (যুদ্ধে) লুঠিয়া আনিবে, উহার এক পঞ্চমাংশ খোদা এবং তাঁহার (রছুলের) 'করাবত দার' ('আত্মীয়-স্বজন)-দিগের, আর 'মহাতাজ' (দরিদ্র—পরমুখাপেক্ষী)-দিগের এবং 'মোছাফের' (প্রবাসী)-দিগের।" একদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) জানিতে পারিলেন, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট যুদ্ধে জয়-লব্ধ কতিপয় 'লওণ্ডি' (দাসী) আসিয়াছে; তিনি আসিয়া হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে এই বলিয়া সংবাদ দিলেন যে, তুমি বলিয়া থাক,

"চাক্কিতে (জাঁতায়) আটা পিষিতে পিষিতে আমার হস্তে 'আব্‌লা, (ফোস্কা) পড়িয়া গিয়াছে, আর গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমার এরূপ অবসর হয় না যে, সন্তানগণের যথোচিত রূপ 'হেফাযৎ' (তত্ত্বাবধান) করি।" এসময় কতকগুলি দাসী তোমার ওয়ালেদ মাজেদের হাতে আসিয়াছে ; তুমি যাইয়া উহাদের মধ্য হইতে একটি চাহিয়া লও। এই কথা শুনিয়া হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) পিতৃ-গৃহে গমন করিলেন, কিন্তু তিনি স্বীয় মহামহিম পিতার অবস্থা জানিতেন ; তিনি মোহাজের (দেশত্যাগী) মোছলমানদিগের সুবিধার দিকে সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিতেন ; তাঁহাদের অভাব দূর না করিয়া, স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের অভাব মোচনে কদাচ অগ্রসর হইতেন না। তিনি যখন পিতৃ-গৃহে গমন করিলেন, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) গৃহে উপস্থিত ছিলেন না ; কোন ও কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় অভিপ্রায় বিমাতা হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর নিকট প্রকাশ করিলেন, এবং বলিয়া গেলেন, আমার আগমন সংবাদ এবং আগমনের উদ্দেশ্য আপনি শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ-মাজেদের খেদমতে জানাইবেন। অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর আগমন সংবাদ এবং তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য তাঁহার খেদমতে আরজ করিলেন।

পয়গম্বর (ছালঃ) ছাহেব এই সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন করিলেন, এসময় তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শয়নের উদ্যোগ করিতে ছিলেন ; তাঁহারা আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আগমনের 'আহট্' (আভাষ) পাইয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিলেন ; কিন্তু তিনি বলিলেন, তোমরা ঐ অবস্থায়ই থাক ; অতঃপর তিনি গিয়া উভয়ের

মাঝখানে উপবেশন করিলেন, এবং ফরমাইলেন, অয়ি মা ফাতেমাঃ! তুমি যে জিনিষের জন্য প্রার্থনা করিতে আমার নিকট গমন করিয়াছিলে, উহা অপেক্ষা 'বেহ্ তর' (উত্তম) এক জিনিষের বিষয় তোমাকে জানাইতেছি,—তোমরা মিঞা-বিবী (স্বামী-স্ত্রী) যখন শয়ন করিবার জন্য শয্যায় আগমন করিবে, সেই সময় ৩৩ বার ছোব্ হান আল্লাহ্, ৩৩ বার আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ্ ও ৩৩ বার আল্লাহো আক্‌বর পড়িয়া লইবে। * এই 'আমল' (অনুষ্ঠান) তোমাদের জন্য 'খাদেম' (দাস দাসী) অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ হইবে। কে বলিতে পারে যে, জনাব হজরত পয়গম্বর (ছালঃ) ছাহেবের 'খোশ্ হালী' (সচ্ছল অবস্থাপন্ন হইবার) সুযোগ ছিল না ; সুযোগ ত বিলক্ষণ ছিল, অর্থ-সম্পদ ত তাঁহার চরণ তলে গড়াইত ; কিন্তু তিনি সচ্ছল অবস্থায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করিতেন না, তিনি দরিদ্রতাকেই পছন্দ করিতেন। অর্থ-সম্পদ মানুষের মধ্যে অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা, বিলাসিতা, আড়ম্বর-প্রিয়তা ইত্যাদি দোষাবলী আনয়নকরে ; তিনি স্বীয় 'ওম্মত' (শিষ্য বা অনুগমনকারী)-দিগকে ঐ সকল মারাত্মক দোষ হইতে বাঁচাইবার জন্য দরিদ্রতাই অবলম্বন করিয়াছিলেন ; তাঁহার খলিফা চতুষ্টয় ও অধিকাংশ ছাহাবাঃ (রাজিঃ) এবং প্রাথমিক বংশধর-গণও তাঁহার সম্পূর্ণ পদানুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শত সহস্র ছাহাবাঃ

---

* মতান্তরে ৩৩ বার লায়েলাহা ইল্লাল্লাহ্ শব্দের উল্লেখ আছে, যাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। চারিটিই অতি পবিত্র বাক্য। প্রত্যেক মোছলমানের পক্ষে শয়নের পূর্ব্বেই ইহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে সমগ্র রাত্রি সর্ব্ব প্রকার আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। আর ফজরের নমাজের পরে পাঠ করিলে সারাদিন বিপদ আপদ হইতে রক্ষিত থাকিবে।

(রাজিঃ) তদীয় পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জগতে এছলাম ধর্ম্মের জ্বলন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তদ্ব্যতীত হাজার হাজার এমাম, আলেম-ফাজেল, ছুফি-দরবেশ এরূপ দীনভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন যে, অন্য জাতির মধ্যে তাহার অস্তিত্ব বিরল। আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় 'খান্দান' (বংশধর)-দিগের সম্বন্ধে এই 'দোওয়া' (প্রার্থনা) করিতেন—" হে আল্লাহ্ ! তুমি মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর 'আহ্লও আয়াল' (পরিজন বর্গ ও বংশধর)-দিগকে এই পরিমাণ 'রুযি' (অর্থ-সম্পদ) দাও, যাহাতে উহারা 'ছরকশ্' (গর্ব্বোন্নত মস্তক—অসাধ্য) ও পাপাচারী না হয়।"

এই বিষয়টি আল্লামা শিব্লী নোমানী মরহুম মহোদয় উর্দ্দূ ভাষায়—হৃদয়োন্মাদিনী কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কথিত আছে, খয়বরের যুদ্ধে বহু দাস দাসী আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তগত হইয়াছিল; তাহাদের মধ্য হইতে ফজ্জা নাম্নী একটি দাসী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে তিনি দান করিয়া 'এরশাদ ফরমাইয়াছিলেন' " গৃহকার্য্যের অর্দ্ধেক এই দাসী করিবে, আর অর্দ্ধেক কাজ তুমি নিজে করিও। তুমি স্বয়ং যে খানা খাইবে; এই 'কনিয্' (দাসী) কেও ঠিকঐরূপ খানা খাওয়াইবে।"

একবার আঁ হজরত (ছালঃ) 'ছফর' (প্রবাস) হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যথানিয়মে সর্ব্বপ্রথমে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার গৃহে একখানি রঙ্গিণ পরদা ঝুলিতে ছিল; আর হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) স্বীয় পবিত্র হস্ত দ্বয়ে ২ গাছি চান্দির কাঙ্গণ (বলয়—বালা) পরিয়াছিলেন; ইহা দেখিয়াই আঁ হজরত (ছালঃ) গৃহে প্রবেশ না করিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহাদের অতি প্রিয় ক্রীতদাস হজরত আবু রাফেয় (রাজিঃ)

তথায় উপস্থিত হইলেন; তিনি হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-কে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি বলিলেন, ওয়ালেদ-মাজেদ হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) আমার গৃহ-দ্বারে আসিয়া, জানিনা কি কারণে গৃহে প্রবেশ না করিয়াই ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। আবু রাফেয় (রাজিঃ) বলিলেন, গৃহ-দ্বারের এই রঙ্গিণ পরদা ও আপনার হাতের কাঙ্গণ (কঙ্কণ) দেখিয়াই তিনি ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছেন। হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) তৎক্ষণাৎ ঐ উভয় জিনিষ হজরত বেলাল (রাজিঃ)-এর হস্তে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে পাঠাইয়া দিলেন; এবং ইহাও বলিয়া দিলেন যে, আমি উহা খয়রাত করিয়া দিয়াছি; আপনার যাহাকে ইচ্ছা উহা দান করুন। তদনুসারে তিনি উহা বিক্রয় করিয়া আছহাবে ছফ্‌ফাএর এখ্‌রাজাতে (প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যয় করিলেন। (বোখারী—এব্‌নে ওমর [রাজিঃ]-এর র'ওয়ায়েত)। মায়েজে আবু যর (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার আমাকে হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) আদেশ করিলেন যে, তুমি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে ডাকিয়া আন। তদনুসারে আমি তাঁহার গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, হজরত ছৈয়দাতুন্নেছা (রাঃ—আঃ), হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে ক্রোড়ে লইয়া চাক্কিতে (জাঁতায়) আটা পিষিতেছেন। এইরূপ একটি ঘটনা 'নাছেখত্তাওয়ারিখ'-প্রণেতা স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন; যদ্দ্বারা জানা যায়, হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) এক এক সময় তুই তুই 'ওয়াখ্‌ত্‌' (বেলা) অনাহারে অতিবাহিত করিতেন। ঐ অবস্থায় ও তিনি 'বাচ্চাঃ' (সন্তান) ক্রোড়ে লইয়া চাক্কিতে আটা পিষিতেন। মোল্লা জামালুদ্দীন মোহাদ্দেছ (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, একদা হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) মছজেদ নববীতে আগমন করিলেন, আর রুটির একখানি ছোট টুকরা আঁ হজরত

ছঁরওরে কায়েনাত্ (ছালঃ)-এর হস্তে দিলেন; হজরত রছুলে করিম (ছালঃ) ঐ রুটির টুকরা খানি সাদরে গ্রহণ করিলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইহা কোথায় পাইলে? হজরত ছৈয়দাতন্নেছা (রাঃ—আঃ) আরজ করিলেন, এয়া রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)! অল্প পরিমাণ জও (যব) পিষিয়া রুটি তৈয়ার করিয়াছিলাম, উহার দ্বারা রুটি প্রস্তুত করিয়া যখন 'বাচ্চাঃ' (বালক-বালিকা)-দিগকে খাওয়াইলাম, তখন মনে হইল, হজরত রছুলোল্লাহ (ছালঃ)-কেও কিছু খাওয়ান চাই; হে খোদার ছাচ্চাঃ (সত্য) রছুল! এই রুটি ৩য় দিনে আমাদের অদৃষ্টে জুটিয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী দুই দিন উপবাসে কাটিয়াছে); আঁ হজরত (ছালঃ) ঐ রুটির টুকরা 'তনাওল ফরমাইয়া' (খাইয়া) বলিলেন, অয়ি ফাতেমাঃ! চারি ওয়াক্তের পরে তোমার প্রদত্ত এই রুটি খণ্ড তোমার পিতার মুখে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

মাওলানা ছিমাব্ ছিদ্দিকী-আল-ওয়ারেছী আক্বরা বাদীর একটি উর্দ্দু কবিতাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বেটি এয় ছি ছাবেরাঃ আওর বাপ এয়ছা ছবর দোস্ত্;
আজকাল পয়দা কেহিঁ এয় ছি মেছালে হ্যায় কাহাঁ।
ফকর গর ছোলতান রাওয়া দারদ কামালে খুয়ে উস্ত্;
ওহঃ চলন জাতে রহে বিল্‌কুল্ ওহ্ চাঁদৈ হ্যায় কাহাঁ।

কব্রেদখানাঃ হ্যায় ইয়েঃ তুনিয়া মোমেনুঁ কে ওয়াস্তে ;
মাগে তুনিয়ামেঁ ভালা য়োকবে কি যেবায়েশ্ কাহাঁ।
হ্যায় ইয়েহ্ ছব ছওদায়ে ফানা কুচ্ দিনোঁ কে ওয়াস্তে ;
ফের আন্ধেরা গোর্‌কা হ্যায় ওছমেঁ আছায়েশ্ কাহাঁ।

ছিরতে যোহরাঃ কে জর আতরাফ্ দেখে বিবিয়াঁ ;
চাহিয়ে ওন্‌কো করেঁ যোহরা কি উও্হ তক্‌লিদ ভি।
ছবর মে আওর ফকরমেঁ খোশ্‌নুদীয়ে হক্ হ্যায় নেহাঁ ;
হোঁ আমল আচ্ছে তো জন্নত্ কি রাখ্‌খে ওম্মেদ ভি॥

এই সকল ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবনযাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ হইত। এইরূপ দরিদ্রতা ও অভাবের মধ্যেও 'ছবর' ও 'কেনায়াত' (ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা) সর্ব্বদাই তাঁহার পবিত্র জীবনে বিরাজ করিত। অভাব ও দরিদ্রতাকে তিনি আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। একদা হজরত আমিরুল মুমেনিন আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ) হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে ফরমাইলেন, অয়ি ফাতেমাঃ! ঘরে খাদ্য দ্রব্য যদি কিছু থাকে, আমাকে খাইতে দাও। কিন্তু ঘরে কিছুই 'মওজুদ' ছিল না; আমিরুল মুমেনিন অতি মাত্রায় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন, অগত্যা তিনি কিছু খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহার্থ বাহিরে চলিয়া গেলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, 'ছাবেরাঃ' (ছবরকারিণী—ধৈর্য্যশালিনী) ও 'শাকেরা' (শোকর কারিণী—আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারিণী) ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) জোহরের নমায্ পড়িয়া ছেজদায় (মস্তক ভূলুণ্ঠিত করিয়া) পড়িয়া আছেন, আর সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ তায়ালার দরগায় কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতেছেন।

একবারের ঘটনা এই যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনও খাদ্যদ্রব্য কি ঘরে 'মওজুদ' আছে ? উত্তরে হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) ফরমাইলেন, আজ ৩ দিন হইতে গৃহে জও এর একটি দানাও 'মওজুদ' নাই। তচ্ছ্রবণে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি ছৈয়দা (রাঃ—আঃ) ! আমাকে কেন এযাবৎ সে কথা বল নাই ? উত্তরে তিনি বলিলেন, বিদায়ের দিন আমার ওয়ালেদ মাজেদ (শ্রদ্ধেয় পিতা) আমাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, আমি কোনও জিনিষের জন্য ছওয়াল করিয়া (চাহিয়া) যেন আপনাকে লজ্জিত ও অপ্রস্তুত না করি।

হজরত এব্নে আব্বাছ (রাজিঃ) রওয়ায়েত (বর্ণনা) করিয়াছেন যে, বনি ছলিম সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একদা হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল ; এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, এয়া মোহাম্মদ (ছালঃ) ! এয়া মোহাম্মদ (ছালঃ) ! ! তিনি উত্তর দিলেন, তখন সে বলিল, তুমি কি সেই জাদুগর, যাহার সম্বন্ধে মশ্হুর আছে যে, তাহার শরীরে ছায়া পড়ে না ? আমার 'বোত্' (দেব-প্রতিমা) দিগের শপথ, যদি আমার এই খেয়াল না হইত—আমার 'কওম' (জাতি—সম্প্রদায়) খুশি হইবে না (নারাজ হইবে), তাহা হইলে এই তরবারির আঘাতে এখনই তোমার গরদান উড়াইয়া দিতাম। হজরত ওমর (রাজিঃ) ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, উহার এই 'গোস্তাখীর' (অসভ্যতার—অশিষ্টতার) উত্তর দেন, কিন্তু হজরত রছুলে করিম (ছালঃ), ইঙ্গিতে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন ; এবং ফরমাইলেন, আমি খোদার বান্দাঃ (দাস—সৃষ্ট-মনুষ্য) এবং তাঁহার আদেশ প্রচারকারী। হে ভ্রাতঃ ! পরকালের 'আযাব' (শাস্তি)-কে ভয় কর ; আর দোযখের (নরকের) অগ্নির 'খওফ' কর ; একমাত্র অদ্বিতীয় খোদা তা-লার পূজা (উপাসনা) করা উচিত—

যাঁহার কোনও 'শরীক' (অংশী) নাই। এই 'গোফ্‌তগুর' (কথোপ-কথনের) এমনই একটি অপ্রত্যাশিত ক্রিয়া প্রকাশ পাইল যে, সেই এরাবী (মরুবাসী যাযাবর বা বদ্দু) ইমান আনিয়া পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) তখন আছহাব (রাজিঃ)-দিগকে বলিলেন, ইহাকে কিছু কোরআনের আয়াত শিক্ষা দাও; যখন সে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া কোরআন পাকের কতিপয় আয়াত মুখস্থ করিল, তখন হুজুর (ছালঃ) উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কি পরিমাণ মাল (টাকা-কড়ি বা জিনিষ-পত্র) আছে? সে বলিল, ঐ পাকযাতের (আল্লাহ্‌ তা-লার) শপথ—যিনি আপনাকে পয়গম্বর (নবী—তত্ত্ববাহক) করিয়া পাঠাইয়াছেন; আমাদের বনি ছলিমের ৪০০০ চারি হাজার অধিবাসীর মধ্যে আমার ন্যায় ফকীর (গরীব—দরিদ্র) আর কেহই নাই। তখন হুজুর (ছালঃ) আছহাব (রাজিঃ)-গণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং ফরমাইলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তি আছ, ইহাকে একটি উষ্ট্র ক্রয় করিয়া দিতে পার? আমি 'যামেন' (প্রতিভূ) হইতেছি যে, খোদা ইহার উত্তম 'বদলাঃ' (প্রতিদান বা প্রতিফল) দিবেন। শ্রবণ মাত্রে হজরত ছায়াদ-বিন্‌-য়েবাদাঃ (রাজিঃ) সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌ তা-লার 'ছাচ্চে' (সত্য) রছুল! আমার নিকট একটি 'উট্‌নী' (উষ্ট্রী) আছে, আমি সেই উষ্ট্রীটি উহাকে দিতে প্রস্তুত আছি। ইহার পর হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) ফরমাইলেন, এক্ষণে তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে, উহার মস্তক ঢাকিয়া দিতে, এবং খোদাকে রাজী করিতে পার। তৎক্ষণাৎ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার নামে 'ফেদা' (উৎসর্গীত), আমি আপনার এই আদেশ পালন করিতেছি। এই কথা বলিয়াই স্বীয়

মস্তকস্থিত 'আমামা' (পাগড়ি) সেই এরাবীর মস্তকে স্থাপন করিলেন। অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে, উহার খোরাক ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পার? শ্রবণ মাত্রেই হজরত ছলমান ফারছি (রাজিঃ) উঠিলেন, এবং ঐ নব-দীক্ষিত মোছলমান ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া কয়েক গৃহে গমন করিলেন; ঐ সকল গৃহে কোনও খাদ্য দ্রব্য সে সময় 'মওজুদ' ছিল না। তখন তাঁহার দৃষ্টি হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর হুজরার প্রতি পতিত হইল; তিনি গিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন; হজরত ছৈয়দতন্নেছা (রাঃ—আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তিনি অ'রজ করিলেন, আমি ছলমান ফারছি। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য আসিয়াছ? তিনি সকল ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। তাহেরাঃ, যাকিয়াঃ, রাদিয়াঃ, মরদিয়া, ছৈয়দতন্নেছা হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, এবং ফরমাইলেন, হে ছলমান (রাজিঃ)! শপথ ঐ খোদা তা-লার,—যিনি আমার পিতাকে পয়গম্বর করিয়াছেন; আজ তৃতীয় দিবস, আমরা খাদ্যাভাবে উপবাসী আছি। দুই বাচ্চাঃ (পুত্র) হাছন (রাজিঃ) ও হোছেন (রাজিঃ) ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, ক্ষুধায় কাতর হইয়া এক্ষণে শুইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু 'ছায়েল' (প্রার্থী) দ্বারদেশে আসিয়া পড়িয়াছে, উহাকে বিমুখ করিতে পারি না। হে ছলমান! এই একখানি চাদর আমার নিকট মওজুদ আছে, ইহা লইয়া শমউন নামক য়িহুদীর নিকট গমন কর, এবং গিয়া বল হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর কন্যা ফাতেমার এই চাদর খানি বন্ধক রাখিয়া কিছু খাদ্য দ্রব্য প্রদান কর। তদনুসারে হজরত ছলমান ফারছি (রাজিঃ) চাদর খানি লইয়া উপরোক্ত য়িহুদীর গৃহে গমন করিলেন, এবং সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া কিছু খাদ্য দ্রব্য চাহিলেন;

শমউন য়িহুদী কিছুকাল চাদর খানি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিলেন, তৎপর হঠাৎ তাঁহার অবস্থান্তর উপস্থিত হইল; শমউন বলিলেন, হে ছলমান! ইঁহারা ঐ লোক—যাঁহাদের সংবাদ আমাদের পয়গম্বর হজরত মুছা (আলাঃ) তওরাতে দিয়াছেন। এক্ষণে আমি ফাতেমার পিতার উপর ইমান আনিলাম, আর 'ছাচ্চাঃ দেলে' (সত্য মনে—অকপট হৃদয়ে) মোছলমান হইলাম। ইহার পর উপযুক্ত পরিমাণ আনাজ (যবাদি শস্য) হজরত ছলমান ফারছি (রাজিঃ)-কে প্রদান করিলেন এবং চাদর খানিও ফেরত দিলেন। তিনি হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)এর-নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন; তখন হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) তাড়াতাড়ি জও পিষিয়া রুটি তৈয়ার করিলেন, এবং হজরত ছলমান ফারছি (রাজিঃ)-এর হস্তে দিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা হইতে কিছু রুটি বাচ্চাঃ দিগের জন্য রাখিয়া দিন। হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ফরমাইলেন, হে ছলমান (রাজিঃ)! যে জিনিষ খোদার রাহে দিয়াছি (দান করিয়াছি), উহার কোন অংশ আর এক্ষণে বাচ্চাঃ দিগের জন্য গ্রহণ করা উচিত নহে। হজরত ছল্‌মান ফারছি (রাজিঃ) ঐ রুটি লইয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন; এবং সকল ঘটনা তাঁহার হুজুরে বর্ণনা করিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) ঐ রুটি এরাবিকে দিলেন; আর মছজেদ হইতে হজরত ছৈয়দতন্নেছা (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার চেহ্‌রাঃ উদাস দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলেন, গত ৩ দিন যাবৎ অনাহারে আছেন। আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় স্নেহাধার কন্যা-রত্নকে নিজের কাছে বসাইলেন; এবং আকাশের দিকে তাকাইয়া দোওয়া করিলেন, হে এলাহি! তোমার দাসী ফাতেমার প্রতি রাজী থাকিও।

আব্দুল মজিদ ছিদ্দিকী ছাহেবের উর্দ্দু কবিতাংশ।

ইয়েহ্ মোফ্‌লেছি আওর আপ্‌কে ঈছার কি ইয়েহ্ হাল;
খোদ ভুকা রহ্‌না করনা নাঃ ছায়েলকা রদ ছওয়াল।
যোহরাঃ থিঁ গরচে দোখ্‌তরে ছরওয়ারে দো-জাহাঁ;
খোদ চাক্কি পিছ্‌তি থিঁ পাকাতি থি রোটিয়াঁ।
শেরেখোদা কি যওজাঃ থিঁ হাশেম কী পোতি থিঁ;
ফের ঘরকে ময়লে কাপ্‌ড়ে উওহ্ আপ্ ধোতি থিঁ।
থে-কুল্ জো আওরতুঁকে লিয়ে ইয়েঃ শরীফ্ কাম;
লাগ্‌তা হায় আজ উন্‌ছে বহু-বেটি-উঁকো নাম॥
ছিদ্দিকী পড়্‌হ্ দরুদ আদব্‌ছে রাত দিন;
ছল্লে আলা মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদীন॥

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন এক ওয়াক্তের (এক বেলার) পর আমাদের অদৃষ্টে খানাঃ জুটিয়াছিল। জনাব ওয়ালেদ ছাহেব ও আমাদের দুই ভ্রাতার খাওয়া (আহার কার্য্য) শেষ হইয়াছিল; কিন্তু ওয়ালেদাঃ ছাহেবাঃ তখন পর্য্যন্ত আহার করিয়াছিলেন না; অবশেষে আহার করিতে বসিয়া কেবলমাত্র 'নওয়ালাঃ' (লোক্‌মাঃ—গ্রাস) মুখে তুলিবেন, এমন সময় দ্বারদেশে একজন 'ছায়েল' (ভিক্ষুক) এই বলিয়া আওয়ায্ দিল যে, বিন্তে রছুলোল্লাহ্‌কে ছালাম (হজরত রছুলোল্লার কন্যাকে অভিবাদন)! আমি দুই ওয়াক্তের অনাহারী; আমার উদর পূর্ণ করিয়া দাও; এমাম ছাহেব

(রাজিঃ) ফরমাইতেছেন, জনাব ছৈয়দাঃ (আমার জননী) তৎক্ষণাৎ খানাঃ হইতে হাত তুলিয়া লইলেন; এবং আমাকে বলিলেন, যাও, এই খানাঃ (রুটি) ভিক্ষুককে দিয়া দাও। আমি ত এক-বেলাই খাই নাই; আর ঐ 'ছায়েল' (ভিক্ষুক) দুই বেলার অনাহারী।

'য়িছার' (অপরের উদ্দেশ্য বা স্বার্থ, নিজের উদ্দেশ্য বা স্বার্থের উপর বলবৎ করা—বোযর্গী), সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ তা-লা, শৈশব কাল হইতেই তাঁহার মধ্যে পূরিয়া দিয়াছিলেন; ফাতেমাঃ শামীয়া *, খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর ধর্ম্ম নিষ্ঠা, বুদ্ধিমত্তা, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ, পর-হিতৈষণা প্রভৃতি খোদা-প্রদত্ত অমূল্য গুণগ্রামের খ্যাতি শুনিয়া হজরত

---

* ফাতেমাঃ শামীয়া, শাম অর্থাৎ সিরিয়া নিবাসী একজন আমীর-কবীরের কন্যা ছিলেন; ইঁনি অতীব ধর্ম্ম-পরায়ণা, খোদা-পরস্ত এবং সর্ব্বগুণের আধার—পক্ষান্তরে জোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। যখন তিনি ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের গবেষণা দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, হজরত খাতেমন্নবীয়ীন (ছালঃ)-এর জন্মকাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, তখন তিনি সুদূর সিরিয়া প্রদেশ হইতে মক্কা-মোয়াজ্জমায় আগমন করিলেন; একদিন আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ওয়ালেদ আবদুল্লার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; তাঁহার 'পেশানীতে' (কপালে) 'নূরের' (স্বর্গীয় জ্যোতির) চিহ্ন দেখিয়া তিনি তাঁহার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার পিতার বিনা আদেশে এ সম্বন্ধে আমি কোনও মতামত প্রকাশ করিতে পারি না। কিছুদিন পরে যখন বিবী আমেনার সঙ্গে আবদুল্লার শুভ-বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল, আর সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ যখন আবদুল্লার 'পেশানী' (ললাটদেশ) হইতে বিবী আমেনার গর্ভে স্থান গ্রহণ করিল,

ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে মদীনায় আসিলেন। তিনি তওরিত ও যবুর গ্রন্থের সারতত্ত্ব. গ্রহণে অভ্যস্ত ও পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি শাম হইতে মদীনায় আগমন কালে নানা-প্রকার উপঢৌকন, অলঙ্কার, 'জওয়াহেরাত' (মণিমুক্তা প্রভৃতি), নানাবিধ মেওয়া, বহুমূল্য বস্ত্র, নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে আনিলেন। তিনি খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে আগমন করিলে, তিনি পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তৎপর ঐ সকল মূল্যবান্ সামগ্রী-সম্ভার হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর হুজুরে পেশ হইলে, তিনি ফাতেমাঃ শামিয়ার অভিমত গ্রহণ পূর্ব্বক, উহা এছলামের 'খেদমত' জন্য দান করিলেন; নিজের জন্য কিছুই রাখিলেন না। সমস্ত খাদ্য দ্রব্য ও বস্ত্রাদি ঐ সকল মোছলমানের মধ্যে বিতরণ করিলেন,—যাঁহারা এছলামের সেবা ও পরিচর্য্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ফাতেমাঃ শামীয়াঃ পয়গম্বর যাদির (রছুল নন্দিনীর) ঈদৃশ দাতব্য শক্তি, এছলাম সেবা ও পর-হিতৈষণা প্রভৃতি উন্নত গুণ ও সহৃদয়তা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন; এবং স্নেহ-ভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলা বাহুল্য, এই

ঐ সময় আবদুল্লা বিবাহ সম্বন্ধে পিতার মত গ্রহণ পূর্ব্বক ফাতেমাঃ শামীয়ার গৃহে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; তখন ঐ পুণ্যবতী মহিলা বলিলেন, আমি যে পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতির অনুসন্ধানে স্বীয় ঘর-দ্বার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুদূর মক্কায় আগমন করিয়াছিলাম, এবং আপনার 'পেশানী'তে (কপালে) যে জ্যোতির সন্ধান পাইয়াছিলাম, এক্ষণে ঐ জ্যোতিঃ আপনার নিকট নাই; যাঁহার অদৃষ্টে ছিল, তিনি উহা লাভ করিয়াছেন। পার্থিব কোনও প্রকার সুখ-সম্ভোগের জন্য আমি বিবাহের আকাঙ্ক্ষিনী ছিলাম না।

গুণবতী মহিলা (ফাতেমাঃ শামীয়াঃ) পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; এবং যতকাল জীবিত ছিলেন, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর প্রশংসা কীর্ত্তনে বিরত ছিলেন না। তিনি যে সর্ব্বোন্নত আদর্শ মহিলা; ইহা সেই অতি বৃদ্ধা, বিপুল ঐশ্বর্য্যশালিনী সিরীয় নারী মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন।

রওয়ায়েত (বর্ণিত) আছে যে, একদা জনাব ছৈয়দা (রাঃ—আঃ) নমাজ শেষ করিয়া ঐ মছল্লার (জা-নমাযের) উপরই উদাস ভাবে বসিয়া ছিলেন; 'এফ্‌লাছ' এর (দরিদ্রতার) খেয়াল করিয়া চিন্তা করিতে-ছিলেন; কারণ, সন্তানদিগের ক্ষুধার বিষয় তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরুক ছিল। মানুষের মনে কত প্রকার ভাব-তরঙ্গই না উপস্থিত হয়; তিনি একবার ভাবিতেন, খোদা তা-লা আমাকে বৃথা সৃষ্টি করিয়াছেন; সন্তান-দিগের জন্য না উদর পূরিয়া খাদ্য, না ভাল বস্ত্রের সংস্থান হয়; আমার মাথার চাদর খানি শত শত তালিযুক্ত। যদি খোদা আমাকে সৃষ্টি না করিতেন, তবে, তাঁহার খোদাইতে কোন্ অভাব থাকিয়া যাইত? হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে ছিলেন; ঠিক ঐ সময় জনাব হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বীয় কন্যা-রত্নের ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি মাতঃ ফাতেমাঃ? তোমার এ কি অবস্থা? তুমি উদাস ভাবে বসিয়া কেন নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছ? মহামাননীয় পিতার হঠাৎ আগমনে হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) চম্‌কাইয়া উঠিলেন; এবং আত্ম-সংবরণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া আদবের সঙ্গে ছালাম করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরজ করিলেন, কিছুই নয়, বাসয়া বসিয়া স্বীয় অভাব ও দরিদ্রতার বিষয় খেয়াল হইতেছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) তৎক্ষণাৎ কন্যার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ঐ স্থানেই বসিয়া

গেলেন ; এবং ফরমাইলেন, ফাতেমাঃ ! একবার তোমার যায়নমায্ খানা উল্টাইয়া দাও, হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তৎক্ষণাৎ পিতৃ-আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক যায়-নমাযের একদিক্ উল্টাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন, হুজুরের আদেশে নমাযের মছল্লার একদিক্ উল্টাইয়া দিয়াছি সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাইলেন, উহার নীচে দিয়া 'নহর' (ক্ষুদ্র পানীর স্রোত)—একটি সোণার ও একটি চান্দির প্রবাহিত হইতেছে। আঁ হজরত (ছালঃ) 'এরশাদ ফরমাইলেন'—ফাতেমাঃ, যত পার, সোণা এবং চান্দি গ্রহণ কর। এক্ষণে ইহা তোমার অধিকার ভূক্ত : তুমি উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য আহার কর, উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান কর, রম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ কর, সুদৃঢ় কেল্লা (দুর্গ) তৈয়ার কর ; যত ইচ্ছা দাসদাসী নিযুক্ত কর ; স্থূলকথা, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে থাক। কিন্তু একথা খুব বুঝিয়া রাখ যে, এই আরাম ও আয়েশ্ দুনিয়ায় মাত্র কয়েক দিনের জন্য। পক্ষান্তরে পরকালে লাভ করিবার কিছুই থাকিবে না। হয় তুমি পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ কর ; নয় পরকালের জন্য উহা রাখিয়া দাও। মহান্ পিতার মুখে এই কথা শুনিয়া হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) বলিলেন, আব্বাজান ! আমি আমার এই খেয়ালাতের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিতেছি ; ইন্‌শাল্লাহ্, আর কখনও এরূপ অন্যায় খেয়াল ও অসঙ্গত ধারণা আমি মনে স্থান দিব না। আমার পার্থিব ধন-সম্পদের প্রয়োজন নাই ; ইহা বলিয়া স্বীয় যায়-নমাজ উল্টান দিক্‌টা সোজা করিয়া দিলেন। হুজ্জতল এছলাম হজরত এমাম গয্‌যালী (রহঃ) আহ্‌ইয়া-উল্-ওলুম—৪র্থ জেল্‌দে ফরমাইয়াছেন, একবার হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) পীড়িত হইয়াছিলেন ; হজরত রছুল খোদা (ছালঃ), খ্যাতনামা ছাহাবী হজরত এমরান-বিন্-হাছিন (রাজিঃ)-কে ফরমাইলেন, হে এমরান ! তুমি আমার নিকট 'যি মরতবাঃ' (পদ-মর্য্যাদা সম্পন্ন) ও 'যি জাঃ' (সম্মান

প্রাপ্ত) ব্যক্তি, আমার সঙ্গে চল, রোগ-ক্লিষ্টা ফাতেমার পীড়ার অবস্থা দেখিয়া আসি। তদনুসারে তিনি, হজরত নবী-করিম (ছালঃ)-এর সঙ্গে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) ছৈয়দাঃ (ছালঃ)-এর গৃহ-সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন ; এবং ফরমাইলেন, আচ্ছালামো আলায়কুম, যদি 'এজাযত' (অনুমতি) হয়, গৃহে প্রবেশ করি। 'বিন্তে-রছুল' (রছুল-নন্দিনী) আরজ করিলেন, ভিতরে তশরিফ আনয়ন করুন। হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি একা নহি, আমার একজন 'সাথী' (সঙ্গী) ও আছে। তিনি ফরমাইলেন, আপনার সঙ্গে আর কে আছেন ? আঁ হজরত (ছালঃ)-এরশাদ ফরমাইলেন, এমরান-বিন্-হাছিন। হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) আরজ করিলেন, আমার নিকট এক 'আবা' ব্যতীত অন্য কোন কাপড় নাই। হুজুর (ছালঃ) হস্ত দ্বারা 'এশারাঃ' (ইঙ্গিত) করিলেন, ঐ আবা দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত কর। হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) আরজ করিলেন, আবা দ্বারা ত আমি শরীর ঢাকিতে পারি, কিন্তু উহা দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত হইতে পারে না। হুজুর (ছালঃ) স্বীয় পুরাতন চাদর খানি কন্যার দিকে ছুড়িয়া ফেলিলেন ; এবং বলিলেন, ইহা দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন কর। সর্ব্বশরীর এবং মস্তক বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তাঁহাদিগকে গৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। হুজুর (ছালঃ) গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) বলিলেন, শরীরের তীব্র বেদনায় অস্থির আছি। ইহার উপর অবস্থা এই যে, গৃহে খাওয়ার কোন জিনিষ নাই ; ক্ষুধায় আমি আরও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, ঘাব্‌রাইবার কোন কথা নাই, আমি ৩ দিন

যাবৎ অনাহারে আছি। আর খোদার নিকট তোমা অপেক্ষা আমার 'মর্ত্তবা' (পদ-মর্য্যাদা) অধিক। আমি আল্লাহর নিকট যাহা প্রার্থনা করি ; তিনি তাহা আমাকে অবশ্যই প্রদান করেন ; কিন্তু আমি 'দুনিয়া' অপেক্ষা 'আখেরাত' (পরকাল) অধিক মূল্যবান্ বলিয়া মনে করি। পরে তিনি স্বীয় পবিত্র হস্তখানি দুহিতা-রত্নের পৃষ্ঠদেশে বুলাইয়া (অর্পণ করিয়া) ফরমাইলেন, তুমি জন্নতের (বেহেশ্ত্ বা মোছলেম-স্বর্গের) নারীদিগের 'ছরদার' (অধিনেত্রী) ; তোমাকে দুনিয়ার বিপদে ও কষ্টে 'বেদেল' (ভগ্ন-হৃদয়—নারাজ) হওয়া উচিত নয়।

হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর দরিদ্রতা, অসচ্ছলতা ও অর্থহীনতার এই অবস্থা ছিল যে, অনশনের পর অনশন তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল ; অর্দ্ধাহারের ত কথাই নাই ; পূর্ণাহার ভাগ্যে খুব কমই জুটিত ; কিন্তু 'রেয়াজত্' (কঠোর পরিশ্রম—ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রাণপণ চেষ্টা) ও 'য়েবাদৎ' এ (উপাসনা-আরাধনায়) সম্পূর্ণ নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন। নফল নমায আদায়, কোরআন পাক তেলাওত, দোওয়া-দরুদ পাঠ ও যেকের ফেকেরে তাঁহার দিন এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। হজরত হাছন বছরী (কোদ্দাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'য়েবাদৎ' (উপাসনা-আরাধনা) এত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল যে, অধিকাংশ সময় সারারাত্রি খোদা-তায়ালার দরবারে দণ্ডায়মান থাকিতেন। হজরত ছলমান ফারছী (রাজিঃ)-এর 'বয়ান' (বর্ণনা) এই যে, একবার আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আদেশে, আমি হজরত ছৈয়দাঃ খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম, তদীয় পুত্র-কন্যাগণ মধ্যস্থলে শুইয়া আছেন, আর তাঁহাদের মহা সম্মানিতা মাতা তাঁহাদের গায়ে পাখার বাতাস

দিতেছেন; কিন্তু মুখে কালাম আল্লাহ্ এর 'তেলাওত' (পাঠ) জারী আছে। এই অবস্থা দর্শনে আমার অন্তঃকরণে এক 'খাছ হালাত' (বিশেষ অবস্থা) উপস্থিত হইল। আমি ভাবিলাম, সাধারণ স্ত্রীলোকেরা আয়েশ-আরামে দিনাতিপাত করে, কিন্তু হজরত রছুল (ছালঃ)-এর কন্যা পার্থিব সুখ-শান্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এতদূর উপাসনা-আরাধনায়—তপ-জপে আত্ম-নিয়োগ করিয়া আছেন। "আলাল আশ্ শরায়" গ্রন্থ লেখকের বর্ণনা হইতে জানা যায়, একদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বাহির হইতে গৃহে আগমন করিলেন, দেখিতে পাইলেন, হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) রুটি পাক করিতেছেন; আর পবিত্র বদনে আল্লাহ তা'লার 'যেকের' জারী আছে। উপাসনা-আরাধনায় তিনি এত কঠোর পরিশ্রম করিতেন যে, তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী অক্ষম। কারণ, তাঁহার চিরজীবনই উপাসনা এবং আরাধনায় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তিনি সকল সময় এবং সকল অবস্থায়ই বিশ্ব-পতি আল্লাহ তা-লার স্মরণে ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি-বিধানই তাঁহার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তৎপর মহামান্য পিতার আদেশ ও উপদেশ পালন, স্বামী-সেবা, সন্তানগণের লালন পালন, গৃহ কার্য্য-সম্পাদন, দরিদ্রের দুঃখ বিমোচন ইত্যাদি সদনুষ্ঠান সমূহ তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। ইতিহাস-বেত্তাগণ লিখিয়াছেন, যখন কোরআন শরীফে দোযখের (নরকের) 'আযাব' (শাস্তি) সম্বন্ধে আয়াত 'নাযেল' (অবতীর্ণ) হইল; ঐ সময় হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) ওম্মতগণের জন্য ভয়ে রোদন করিতেছিলেন। তিনি এত অধিক পরিমাণে রোদন করিয়াছিলেন যে, ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণও তদ্দর্শনে হুজুর (ছালঃ)-এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অতিরিক্ত ভালবাসা বশতঃ আকুল প্রাণে—ব্যাকুল ভাবে,

অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না যে, আঁ হজরত (ছালঃ) কিজন্য এরূপ ভাবে ক্রন্দন করিতেছেন। এজন্য তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন না করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে ছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এই 'য়াদত' (অভ্যাস) ছিল যে, হজরত ছৈয়দতন্নেছা (রাঃ—আঃ)-কে দেখিয়া তিনি শত শোক-তুঃখ ও বিপদ-আপদের মধ্যেও প্রফুল্ল ভাব প্রদর্শন করিতেন; তজ্জন্য সকলে মিলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কোনও প্রকারে ঐ পবিত্র-চরিত্রা মহিলাকে এখানে আনয়ন করিলে, হুজুর (ছালঃ)-এর মনে আনন্দ লাভ হইবে, এবং তিনি ক্রন্দন হইতে বিরত হইবেন; তাঁহার মানসিক ক্লেশের অবসান হইবে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া কয়েক জন ছাহাবাঃ মিলিয়া হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন করিলেন। হজরত ছলমান ফারছি (রাজিঃ) 'আওয়ায্' দিয়া গৃহ-মধ্যে চলিয়া গেলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) চাক্কিতে আটা পিষিতেছেন, আর কোরআন পাকের আয়াত আবৃত্তি করিতেছেন। হজরত ছলমান ফারছি (রাজিঃ) সকল ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আপনি হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর খেদমতে চলুন। হজরত ছৈয়দতন্নেছা সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তখনই উঠিলেন, এবং একখানি কম্বল দিয়া সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া চলিলেন, ঐ কম্বল খানিতে ১২টি তালি ছিল। ইহা দেখিয়া হজরত ছলমান ফারছি (রাজিঃ)-এর হৃদয়ে একটি অভিনব ভাবের তরঙ্গ উঠিল; তিনি বলিতে লাগিলেন, 'কায়ছর' (রোমক সম্রাট্) ও 'কেছরা' (পারস্য-সম্রাট্) রেশ্‌ম ও 'হরির' (এক প্রকার বহুমূল্য রেশম-এর উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য খচিত বস্ত্র) পরিধান করেন, আর পয়গম্বর আখেরয্‌যমান (ছালঃ)-এর কন্যা-রত্নের সামান্য বস্ত্র (কম্বল) খানি এত তালিযুক্ত ? এই

বলিয়া সেই ধর্ম্মপ্রাণ শ্রেষ্ঠতম ছাহাবাঃ (রাজিঃ) রোদন করিতে লাগিলেন। যখন সকলে মিলিয়া মছজেদ-নববীতে, হজরত রেছালত মাব (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) মহামাননীয় ওয়ালেদ মাজেদের খেদমতে সকল ঘটনা বর্ণনা করিলেন, এবং ফরমাইলেন, আমি চাক্কিতে (যাঁতায়) আটা পিষিতে এবং এই (অমুক) আয়াত পাঠ করিতেছিলাম। খোদা তা-লার 'কছম' (শপথ) গত ৫ বৎসর যাবৎ আমার এবং হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর একখানি 'বকরীর খাল' (ছাগচর্ম্ম) ব্যতীত বিছাইয়া শুইবার আর কিছুই নাই। ইহা শুনিয়া হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) ফরমাইলেন, অয়ি আমার স্নেহময়ী কন্যা ফাতেমাঃ! আমার বেটির 'ছবর' (ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার) 'বদলাঃ' (বিনিময়—পুরস্কার) খোদা তা-লার নিকট আমানত (গচ্ছিত) রহিয়াছে। অতঃপর হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) স্বীয় মহামান্য ও পরম শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ মাজেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! কিজন্য আপনি এত রোদন করিতেছিলেন? তখন হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ) নবাবতীর্ণ উক্ত আয়াত পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইলেন। সেই ভীষণ ভীতিপ্রদ দোযখের 'আযাব্' (শাস্তি) বর্ণিত আয়াত শ্রবণ মাত্রে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ভয়ে অভিভূত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন; তিনি সেই আয়াত পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীতি-ব্যঞ্জক স্বরে রোদন করিতে ছিলেন। এই ব্যাপার খোদা তা-লার 'পছন্দ' (মনঃপুত) হইল; এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'রহমতের' (দয়া বা করুণায়) আয়াত 'নাযেল' (অবতীর্ণ) করিলেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়া মাত্র হজরত ছারওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) শোকর্ গোযারীর সঙ্গে 'ছেজদাঃ' (ভূলুণ্ঠিত হইয়া মৃত্তিকায় মস্তক স্থাপন) করিলেন।

"আললশ্-শরায়" গ্রন্থে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর নিম্ন-লিখিত রূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমি স্বীয় মহাসম্মানিতা জননী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে 'শাম' (সন্ধ্যা) হইতে 'ছোবেহ্' (প্রাতঃকাল) পর্য্যন্ত খোদা তা-লার মহাদরবারে 'গিরিয়া যারি' (ক্রন্দন ও বিলাপ) করিতে, এবং তাঁহার 'হুজুরে' (দরগায়—সমীপে) প্রার্থনা করিতে দেখিয়াছি, ঐ দোওয়ায় (প্রার্থনায়) আমি কখনও দেখি নাই যে, তিনি নিজের জন্য কোনও প্রার্থনা করিয়াছেন (মহামান্য পিতার ওম্মত অর্থাৎ শিষ্যদিগের পারলৌকিক মঙ্গলার্থেই দোওয়া করমাইতেন)।

মাষ্টার ছৈয়দ বাছেত আলী বাছেত বছ-ওয়ানীর একটি উর্দ্দু কবিতা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

বারহা দেখ্‌হা হ্যায় খোদ হজরত হাছন (রাজিঃ) নে ছাল্‌হা ;
ছৈয়দাঃ খাতুনে-জন্নত এয়্যানে ওন্‌কি ওয়ালেদাঃ।
পেশ্‌তর্ ওক্‌কে রেবাদৎ রহ্‌তি থিঁ বায়াদ আয্ রেশাঃ ;
ছোবেহ্ তক্ করতি থিঁ উওহ্ বিস ইউঁহি য়্যাদে খোদা।
কেয়া কহোঁ থা ওন্‌কি দেল্‌মে কেছকদর খওফে খোদা ;
হেচ্‌কি বন্ধ্ জাতিথি রোতে রোতে বরমলা।
আরজ করতি থিঁ বরারে থল্‌কে উওহ্ ছোবেহ্ ও মছা,
হাঁ কভি মাঙ্গি নেহিঁ আপ্‌নি লিয়ে কোয়ী দোওয়া॥

য়েশ্‌ক্‌ বারি কাম থা আওর আহ্‌ও যারি কাম থা,
হ্যায় এছ্‌ পরদেমে ভি দেখ্‌হো তো ক্বয়েজে আম থা॥
বন্দেগানে হক্ক্‌ কি খাতের ছরফ্‌মাল ও যর্‌ নাঃ থা,
বল্‌কে ওন্‌কি ওয়াস্তে থা আওর ভি এছকি ছেওরা॥
এক বড়া হেচ্ছা দোওয়াকা থা ওন্‌হিকি ওয়াস্তে;
আওর কুচ্‌ হজরত আলী (কঃ) আওর আপ্‌নি বাচ্চুঁকে লিয়ে।
ইয়ুঁ দোওয়া ফরমায়ী রোকর জেছ্‌ ঘড়ি বিন্তে রছুল;
কেউ নাঃ হো উওহ্‌ বারগাহে হক্ক্‌ তায়ালেমে ক্ববুল।
দাস্তানে যেন্দাঃ হ্যায় বাছতে ফয়েজে দর্‌ইয়া বার কি;
এছ্‌ছে বড়্‌কর হোগি কেয়া আব্‌ এস্তেহা ঈছার কি।

হজরত জাবের আন্‌ছারী (রাজিঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) দেখিতে পাইলেন, হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর দেহে উটের চামড়ার 'লেবাছ' (পরিচ্ছদ) রহিয়াছে। এক হস্তে চাক্কিতে আটা পিষিতেছেন, আর দ্বিতীয় হাতের সাহায্যে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে দুগ্ধপান করাইতেছেন। এই অবস্থা দর্শনে আঁ হজরতের চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ফরমাইলেন, " অয়ি ফাতেমাঃ! দুনিয়ার কষ্টে ছবর (ধৈর্য্য—সহিষ্ণুতা)-এর সঙ্গে 'খাতেমাঃ' (শেষ) কর; আর আখেরাতের (পরকালের) খুশীর (আনন্দের) জন্য অপেক্ষা করিতে থাক।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইয়াছেন:—আমাকে ঘরের কাজ কর্ম্ম ও ধান্দা বিষয়ে কোনও সময়েই ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) সম্বন্ধে কোন 'শেকায়েত' (অভিযোগ) নাই; হজরত রছুল করিম (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, " অয়ি 'লখ্‌তে জগর' (কলেজার টুক্‌রা)! এ বিষয়ের

কখনও 'গরুর' (অহঙ্কার) ও 'তকব্বর' (গর্ব্ব) করিও না যে, আমি পয়গম্বর-দুহিতা, আমার নিকট কেয়ামতের দিন পাপ-পুণ্যের কোনও প্রশ্ন হইবে না ; একথা কখনও হইতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ তা'লার ছেহাব-কেতাব 'আলমগীর' অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী। তাঁহার নিকট হেছাব-কেতাবের জন্য সকলেই দায়ী হইবে ; উহা এমনই এক 'আদালত' (বিচারালয়) যে, 'আমীর' (বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী—বড়লোক) ও গরীব (দীন-দরিদ্র) এ উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। তাঁহার মহা-দরবারে কাহারও 'হাছব-নছব' (বংশ-মর্য্যাদা) কোনই কাজে আসিবে না।" হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) মহামান্য পিতার উপদেশ-বাণী শ্রবণে বহু রোদন করিলেন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর 'এবাদৎ-বন্দেগী'তে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। তিনি সর্ব্বদা খোদা ও রছুলের ভয়ে কম্পিত থাকিতেন। তাঁহার গৃহে 'শোকর' ও 'ছবর' এরই একাধিপত্য ছিল। এমনও অবস্থা ঘটিয়াছে যে, একাদিক্রমে কয়েক দিন উনানে আগুণ জ্বলে নাই। এই উভয় 'মিঞা-বিবী' (স্বামী-স্ত্রী) দুনিয়ার দিকে ফিরিয়াও তাকাইতেন না। দরিদ্রতা ও অনাহার-ক্লিষ্টতাকেই ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ বলিয়া মনে করিতেন। দিন ও দুনিয়ার ছরদার এর (নেতার) 'লখ্‌ৎ জগর' (কলিজার টুকরা), শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী হওয়া সত্ত্বেও, সারা জীবন এক খেজুর পাতার সামান্য চেটাইতে, কিংবা ছাগ বা উষ্ট্র চর্ম্মে শুইয়া কাটাইয়াছেন, ইহা শুনিয়া অনেকেই 'তায়াজ্জব' (বিস্ময়াপন্ন) হইবেন। হজরত রেছালত পানার স্নেহময়ী-দুহিতা-রত্ন স্বহস্তে 'চাক্কিতে' (যাঁতায়) আটা পিষিতেন ; ছোট বড় সর্ব্বপ্রকার গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতেন ; কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই ; খোদা তা'লার খাছবান্দ (দাস বা অনুগৃহীত ব্যক্তি)-গণ পরম করুণাময় আল্লাহ তা-লার আদেশ পালন ও দুনিয়ার

আয়েশ-আরাম-বর্জ্জনে স্বাভাবিক ভাবে বিতৃষ্ণ হন। পার্থিব দুঃখ ও কষ্টটাকে তাঁহারা অল্প দিন মাত্র স্থায়ী মনে করিয়া, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। দুনিয়ার আয়েশ-আরাম ও বিলাস-ব্যসনকে তাঁহারা 'ফানী' (অস্থায়ী) মনে করিয়া থাকেন। ইঁহাদের ইমানের 'কুওত' (শক্তি) অসাধারণ হইয়া থাকে। খোদা তা-লা এই শ্রেণীর লোকের জন্য যে 'ওয়াদাঃ' (প্রতিশ্রুতি দান) করিয়াছেন, তাঁহারা যেন তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আর অল্পকাল স্থায়ী ক্লেশ তাঁহারা এরূপ ভাবে সহ্য করেন, যেমন রোজাদার ব্যক্তিগণ রাত্রি ও এফ্‌তারের অপেক্ষায় দিবাভাগ অতিবাহিত করেন।

লেছানল্ হেন্দ, হজরত আমির্‌ খছ্‌রুর একটি কবিতা।

গেয়ে দওলত্ ছরায়ে ছৈয়দাঃ পর একদিন ছলমান;
নজর আয়ি তজল্লি যার উওহ্ কাশা নাঃ য়েরফান।
তজল্লি নূরে হক্ কি চ্ছন রহিথি গোশাঃ গোশাঃ ছে;
দর ও দিওয়ার পর চ্ছায়ীহুয়ী থি হয়বতে এয্‌দান।
আলী মছহফ্ থে বাচ্চে মছহফে নাতেক কে পারে থে;
যমিন বারে এমানতছে বনি থি হামেলে কোরআন।
জবিন্নুননে এহাঁ তক খাক কি য়েব্‌যত্ বাড়হায়ী থি;
শবস্তান্‌কা হর্‌এক যররাহ্ বনাথা কওকবে ঈমান।
উওহ্ ঘর্ গো পত্থর থা শহরকে আক্‌ছের মকানুঁছে;
মগর থা কম্‌ছেকম ফের ভি ছতুনে গনববদ গরদান।

উওহ্ ওছ কি চার দিওয়ারি নাঃ থি কুচ্ এয়ছি মস্তহকম;
মগর হাঁ আজতক রোকে হ্যায় নজমে আলমে এমকান।
মতায়ে দিন্নুয়ীছে পাক মানেন্দ্ দেলে আরেফ্;
কেনায়াত আওর তওয়কল্ কা মগর ছামান ছা ছামান।
নেগাহে যহদ পরওরছে ইয়েহ্ ছুরত এছ্‌তরেহ্ দেখ্‌হি;
ওবল আয়া দেল্ ছলমানছে—আওরাকে চশমাঃ ঈমান॥
আমিনে ওহিকা শাহ্‌যাদাঃ এক জানেব তড়প্‌তা থা।
নবী কি লাড্‌লী বেটী মগর থি আছিয়া গরদান॥
রেয়াজতছে জবিনে ছৈয়দাঃ থি ইওঁ আরক্কে আফ্‌শান।
লহো আহ্‌মদকা দস্তে ফাতেমাঃছে বহ্‌তা জাতাথা;
মহিতে আছিয়া থা আওর খুনে পঞ্জাঃ মরজান।
ইয়েহ্ হাল্লত্ দেখ্‌কর ছল্‌মাননে কি ইয়েহ্ আরজ শাহ্‌যাদী;
মশক্কত্ এছক্কদর এছ নাতোয়ানী পর্ নহিঁ শায়ান।
কাহা হ্যায় উওহ্ কনিযে থাছ ফজ্জাঃ নাম হ্যায় জেছ্‌কা;
ওছেতো বহরে খেদমত্ দেচুকে হেঁয় ছৈয়য়েদে দওরান।
ইয়েহ্ ছোন্‌কর ছৈয়য়েদাঃ খাতুন নে এরশাদ ফরমায়া;
মেলা হ্যায় বারগাহে আহ্‌মদীছে হামকো ইয়েহ ফরমান।
কারেঁ একরোয্ ঘরকা কাম মায়ঁ, আওর এক দেন্ ফজ্জাঃ;
এহি হ্যায় মরজি মাওলা এহি হ্যায় মরজি য়িয্‌দান।
মছাদাত এছ্‌কো কহ্‌তে হেয়ঁ ইয়েহ্ হ্যায়ঁ আখলাকে এছলামী;
ইয়েহ্ বাতেয়ঁ হ্যায় কেঃ জেন্‌পর মতহরে এছলাম হ্যায় নাযান॥

মওলানা ছিমাব ছিদ্দিকীর একটি কবিতা।

হায়দরে ছফ্‌দর আলী মরতজা শেরে খোদা ;
খোদহি ফরমাতে হেয়ঁ আওছাফে জনাবে ফাতেমাঃ।
কওল হ্যায় ওন্‌কী কেঃ জব্‌তক যেন্দেগী বাকী রহি ;
মেরে হুক্‌মে ওছ্‌নে যর্‌রাঃ ভর নাঃ ফরক আনে দিয়া।
খতম হো জাতাথা দেল্‌ বাঁচ্চুঁ কি খাতেরমে য়ুঁহি ;
রাতভর রহ্‌তিথি মছ্‌রুফে য়েবাদতে খোদা।
ঘর্‌মে হোতাথা আগার মওজুদ ছামামে তায়াম ;
ওয়াক্ত পর তৈয়ার করতিথি খানা বামযাঃ।
এক দফেয় কা মাজেরা হ্যায় ছৈয়দাঃ (রাঃ আঃ) বিমার থি ;
আর তৈয়ম্মম কি ভি আয়েত নাথি গোশ্‌ আশ্‌না।
ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) উঠ্‌ঠে ওছি হালাত মে আওর করকে ওজু ;
হোগেয়িঁ এস্তাদ পড়্‌হ্‌নেকো নমাযে বেরেয়া।
রাত্‌ভর্‌ মুঝ্‌কো না আয়ি নিন্দ্‌ ওছ্‌দিন করব্‌ছে ;
ছোবেহ্‌ কি ছাত্‌ আগেয়ি "আল্লাহ আকবর" কি ছদা।
মায়্‌ ওঠা আওর জানেবে মছজেদ গেয়া বহ্‌রে নমায্‌ ;
ফের ওজু কর্‌কে নমাযে বা-জমায়াত্‌ কী আদা।
ওয়াপেছ আকর্‌ দেখ্‌তা কেয়া হু কেঃ, এত্‌মিনান্‌ছে ;
হোগেয়িঁ মছরুফ্‌ চাক্কি পিছনেমেঁ ছৈয়দাঃ।
রহম আয়া মুঝ্‌কো আওর বোলা-কে আয় বিন্তে রছুল,
আব্‌কর্‌ আরাম ভি, ইয়েহ্‌ ওয়াক্ত হ্যায় আরাম কা।

এছক্কদর মছরুফিয়েত্ আওর এছক্কদর আশ্গাল্ছে ;
হো নাঃ তক্লিফে মরজ মেঁ মোশ্কেলুঁকা ছামনা।
আপ্ বোলে এয়া আলী, ইয়েহ্ তোমুঝে মায়লুম হ্যায় ;
হোঁ বহুত কমযোর বিমারি হ্যায় মেরি জানগয়া।
হ্যায় মগর মেরি মরজকা ছব্ছে বেহ্তর ইয়েহ্ য়েলাজ ;
আপকি তায়ত হো আওর তায়মিলে আহ্কামে খোদা।
হো আগার দোনো মেঁ কোয়ী মেরে মরনেকা ছবব ;
তো ভালা এছ মওতছে বেহ্তর হ্যায় কোয়ী মওত কেয়া।
যেন্দেগীকা মাহছুল ইয়েহ্ হ্যায় কেঃ ছরফে ফরজ হো ;
তায়তে শওহর করেঁ আওর বন্দেগী কিব্রিয়া।
মওত এয়ছি হালত মেঁ আজায়ে তো আয় খোশ্ কেছমতি,
ময়ে তো এয়ছি মওত পর্ করতি হোঁ ছও জানে ফেদা।

হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ), জনাব ছৈয়দাঃ খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে যেরূপ অতুলনীয় স্নেহ করিতেন—ভালবাসিতেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। সে স্নেহ ও ভালবাসা অপার্থিব—স্বর্গীয় ছিল। পক্ষান্তরে হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) ও স্বীয় 'মকদ্দছ' (পবিত্র—'পাক') পিতার জন্য জীবনোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। 'ওহুদ' (আহদ)-এর ভীষণ যুদ্ধে যখন হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) অতি গুরুতর রূপে আহত হইয়াছিলেন ; এমন কি, মদীনার সর্ব্বত্র তাঁহার শাহাদত হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল ; তৎক্ষণাৎ ১৪ চৌদ্দ জন স্বনামাখ্যাতা মহিলা যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে রওয়ানা হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে হজরত ছৈয়দাঃ ও একজন ছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, আঁ হজরত (ছালঃ) আহত অবস্থায়

বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; এবং ভূতলে শায়ীত আছেন; তিনি একপ্রকার চেতনা শূন্য অবস্থায় রহিয়াছেন। জনাব ছৈয়দাঃ তদ্দর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন; তদীয় নয়ন দ্বয় হইতে অজস্র ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল; তিনি পরম শ্রদ্ধাস্পদ ওয়ালেদ-মাজেদের পবিত্র মস্তক স্বীয় জানুর উপর স্থাপন করিলেন; হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ঢালে করিয়া পানী আনয়ন করিতে ছিলেন; আর হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) শোণিতাক্ত চেহ্‌রা মবারক ধুইয়া পরিষ্কার করিতে ছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে বস্তা বা চট পোড়াইয়া উহার ভস্ম ক্ষতস্থানে লাগাইতে-ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) চৈতন্য লাভ করিলেন। তখন তিনি 'তছ্‌কিন আমেষ্‌' (সান্ত্বনা-সূচক) বাক্য বলিয়া ঐ সকল মহিলাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া, শহীদ ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের 'গোর-কাফন' সম্পন্ন করিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) সায়ংকালে মদীনায় উপস্থিত হইলেন।

আঁ হজরত প্রত্যুষে যখন ফজরের নমায্‌ পড়িবার জন্য মছজেদ নববীতে উপস্থিত হইতেন, আর হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর চাক্কির আওয়ায্‌ তাঁহার কাণে পঁহুছিত, তখন তিনি 'বে-এখ্‌তেয়ার' হইয়া (বিচলিত হৃদয়ে) খোদা তা-লার দরগায় এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন, "হে এলাহি! ফাতেমাঃ কে এই 'রেয়াজত্‌' (পরিশ্রম—উপাসনাদি কার্য্যে 'মেহ্‌নত') ও 'কেনায়ত' (অল্পে সন্তুষ্টি) এর 'আজর' (প্রতিদান—পারিশ্রমিক) প্রদান করিও। আর উহাকে এইরূপ দরিদ্রতার অবস্থায় থাকিতে 'ছাবেত-ক্বদম্‌' (অবিচলিত) রাখিও।"

একদা হজরত রছুল করিম (ছালঃ) মছজেদে উপবেশন করিয়া-ছিলেন; উপস্থিত ছাহাবাঃ মণ্ডলী নীরবে উপবিষ্ট; এই সময় হজরত

আলী (কঃ—ওঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি উপবেশন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ; ঐ সময় আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হে আলি ! তুমি কি আমাকে কখনও দেখিয়াছ ?" তিনি অতি আদবের সঙ্গে আরজ করিলেন, " এয়া রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ), আমার জান 'ছাদক্কাঃ' আর আমার পিতামাতা আপনার নামে 'কোরবান' (উৎসর্গীত) ; আমি আপনাকে দেখিবার মতন দেখিয়াছি। বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করিয়াছি ; বদর যুদ্ধে, ওহোদ যুদ্ধে, হোনয়েন যুদ্ধে—অর্থাৎ সমুদয় বড় বড় যুদ্ধে হুজুরের অসাধারণ সাহস, অমানুষিক বীরত্ব এবং অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার নবুয়তের চিহ্ন দর্শন করিয়াছি, আমার 'খোশ্ নছিবি (পরম সৌভাগ্য) বশতঃ সকল সময়েই হুজুরের 'হামরেকাব' (সঙ্গী) থাকি ; আর এ সময়ও হুজুরকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিতেছি।" জনাব হজরত রেছালত্ পানাহ্ (ছালঃ) ফরমাইলেন, " না, আলী (কঃ—ওঃ) তুমি আমাকে কখনই দেখ নাই ! দেখ নাই ! ! দেখ নাই ! ! !" হুজুরের উক্তির দৃঢ়তা ও উহার পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) 'বেকারার' (অস্থির) হইলেন ; শরীর কম্পিত হইয়া তখনই তাঁহার দেহ জ্বরাক্রান্ত হইল ; হৃদয়ে 'দহশ্ত' (ভীতি-ব্যঞ্জকতা) প্রকাশ পাইল, তিনি তখনই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রস্থান করিলেন। গৃহে উপস্থিত হইয়া জনাব হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর নিকট সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন ; এবং 'গিরিয়া ও যারি' (আক্ষেপ ও ক্রন্দন—বিলাপের সঙ্গে রোদন) করিতে লাগিলেন। হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) তাঁহাকে একখানি কম্বল দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন, এবং তিনি (হজরত শেরে খোদা [কঃ—ওঃ]) শয্যায় শুইয়া গেলেন। অতঃপর হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) একজন দাসীকে এই বলিয়া আঁ হজরত

(ছালঃ)-এর খেদমতে পাঠাইলেন যে, তুমি গিয়া আব্বাজানকে বল, যদি তাঁহার অবসর থাকে, তবে একবার যেন আমার এখান হইয়া যান। দাসী হুজুরের খেদমতে গমন পূর্ব্বক সংবাদ পঁহুছাইল। তিনি এই সংবাদ শুনিবামাত্র পরিচারিকার সঙ্গেই মছজেদ-নববী হইতে স্নেহময়ী কন্যার গৃহে আগমন করিলেন; এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ ফাতেমাঃ! তুমি কিজন্য আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছ? 'বিন্তে রছুল' (পয়গম্বর-নন্দিনী) নিতান্ত আদব ও নম্রতার সহিত আরজ করিলেন, আব্বাজান! আজ আপনি শেরে খোদার হৃৎপিণ্ড চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রবল 'বেখার' (জ্বর) আসিয়াছে; আপনি আমার 'খাতেরে' তাঁহাকে স্বীয় 'জামাল বাকামাল' (পবিত্র দেহ) দেখাইয়া দিন। হজরত রছুল করিম (ছালঃ) তৎক্ষণাৎ 'ছহন মবারকে' দণ্ডায়মান হইয়া এক হস্ত হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর স্কন্ধোপরি স্থাপন পূর্ব্বক ফরমাইলেন, "হে আলি! আইস, আমার এই হস্তের নীচে দিয়া বাহির হইয়া আমাকে দর্শন কর।" আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ঐরূপ করিলেন, অর্থাৎ যখন হুজুর (ছালঃ)-এর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তদীয় বাহু-নিম্নে আগমন করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই অচেতনাবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন। তৎপর যখন তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হইল, তখন বলিলেন, "মাশা আল্লাহ্, আমি ইতিপূর্ব্বে বাস্তবিকই আপনাকে দেখিয়াছিলাম না।"

এই ঘটনার দ্বারা প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ে; গোপনীয় যবনিকা (গুপ্ত পরদা) উত্তোলিত হইয়া যায়। হজরত রছুল মকবুল (ছালঃ)-কে স্বীয় "নূরে নযর" হজরত বতুল (রাঃ—আঃ)-এর প্রতি কিরূপ স্নেহ ও ভালবাসা ছিল; এই ঘটনায় দ্বারা তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। হৃদয়ের বৃন্ত-স্বরূপিনী কন্যা যে বিষয়ের জন্য আবদার

করিতেন—অনুরোধ করিতেন, হুজুর (ছালঃ) তাহাই পালন করিতেন; কখনও তাঁহার কোন অনুরোধে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন না। বিন্তে-রছুল (স্বর্গ রাজ্ঞী ফাতেমাঃ যোহরাঃ) বাস্তবিকই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর চক্ষের তারা ছিলেন। প্রত্যেক মনোকষ্ট ও মনোবেদনা দূরীকরণ পক্ষে তিনিই একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ ছিলেন। ছোলতানে দোজাহান (ছালঃ) ফরমাইতেন, "ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) আমার কলেজার টুকরা।" যখন " ওয়ানযোর আঁশিরাতোকাল আকরেবিনা " এই পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ হইল, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় সমুদয় সম্প্রদায় এবং স্ববংশীয় লোকদিগকে সমবেত করিয়া এক পয়গম্বরানা 'লহ্‌জায়' (ভাষায়) আল্লাহ্ তা-লার এই কঠোর আদেশ শুনাইলেন। উক্ত আদেশের মর্ম্ম এই :—

" হে কোরেশ আত্মীয় বর্গ! হে আব্‌দে মনাফ্ সম্প্রদায়স্থ আত্মীয় বর্গ! হে আবদুল মোত্তালেব বংশীয় স্বজন বর্গ, অয়ি মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর কন্যা ফাতেমাঃ! তোমরা সকলে আপনাদিগকে দোযখের ভীষণ অগ্নি হইতে রক্ষা কর। কারণ কেয়ামতের দিন কেহ কাহারও কাজে আসিবে না।" হজরত ওম্মে-ছাল্‌মাঃ (রাঃ—আঃ) রওয়ায়েত করিয়াছেন, আঁ হজরত (ছালঃ) একদা রাত্রিকালে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া ফরমাইলেন, 'ছোবহানাল্লাহ্' আছমান হইতে 'ফেৎনা' ও 'ফাছাদ' (বিবাদ-বিসম্বাদ বা বিপ্লববাদ) দূর হইয়া গেল; আর 'বরকত' ও ফজলের খাজানাঃ (ঐশ্বর্য্য-সম্পদ) খুলিয়া গেল। হুজরায় শয়ন কারিণী (আয্‌ওয়াজ-মতহরাত বা মোছলেম-মাতা)-দিগকে জাগাইয়া দাও। কারণ, দুনিয়ার বহু বস্ত্র পরিধান কারিণী স্ত্রীলোকদিগকে 'আখেরাতে' (পরকালে) 'বরহ্‌নাঃ' (নগ্ন বা উলঙ্গ) অবস্থায় দেখা যাইবে।" *

* বোখারি-জিম (২) পৃষ্ঠা ২০ ছহি বোখারী, ১ম জেল্‌দ্ ৫০ পৃষ্ঠা।

আঁ হজরত (ছালঃ) একদা রাত্রিকালে হজরত আলী (রাঃ—আঃ)-এবং হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া ফরমাইলেন, তোমরা 'তাহাজ্জদ' নমায্ কেন নিয়মিত রূপে সর্ব্বদা পড়িতেছ না? উত্তরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, আমাদের নিদ্রা এবং জাগরিত থাকা ত খোদা তা-লার 'এখ্তিয়ারে' (অধিকারে) রহিয়াছে। যদি তিনি জাগাইয়া দেন, তবে জাগিতে পারি; নচেৎ কিরূপে জাগিব? ইহা শুনিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) 'খামুশ্' (চুপ) হইয়া গেলেন; কিন্তু ক্রোধ ভরে স্বীয় রাণের (জানুর) উপর 'আফ্ছোছের' (আক্ষেপের) সহিত হাত মারিলেন; এবং কোরআন শরীফের একটি আয়েত পাঠ করিলেন যাহার স্থূল মর্ম্ম ঃ—"মানুষ বড়ই ঝগরাটে।"

ছহিহীনে বর্ণিত হইয়াছে যে, তদানীন্তন মোছলমানগণ 'তহ্ফা-তহায়েফ্' (নজর—উপঢৌকন) 'যেয়াদাঃতর' (অধিকাংশ), ওম্মোল-মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর 'বারির' (পালার) দিন (যে দিন আঁ হজরত [ছালঃ] তাঁহার গৃহে বাস করিতেন) হুজুর আনওর (ছালঃ)-এর খেদমতে পাঠাইতেন। অন্যান্য 'আয্ওয়াজে মতহরাত' (হজরতের আহ্লিয়া—মোছলে-মাতা) গণ, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে বলিলেন, মা, তুমি গিয়া হজরত নবী করিম (ছালঃ)-এর খেদমতে এই আরজ কর যে, তহ্ফা-তহায়েফে (নযর ও উপঢৌকনে) আবু কোহাফার পৌত্রীর (হজরত আবুবকর ছিদ্দিক [রাজিঃ]-এর কন্যার) সঙ্গে অন্যান্য আব্ওয়াজে মতহরাত কেও যেন 'শরীক' (সঙ্গী) করা হয়। তদনুসারে বিমাতাদিগের আদেশ ও অনুরোধানুসারে তিনি পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বিমাতাদিগের অভিপ্রায় জানাইলেন। হুজুরে আনওর (ছালঃ) ফরমাইলেন, অয়ি

কন্তে? মোছলমানগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আয়েশা (রাঃ—আঃ)-এর পালার দিন, আমার বিনানুমতি বা বিনা ইঙ্গিতে তহ্‌ফা তহায়েফ্ পাঠাইয়া দেয়। আমি এ বিষয়ে কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করি নাই, পক্ষান্তরে নিষেধ ও করিতে পারি না। আমি এরূপ অভিমতও কখন জ্ঞাপন করি নাই যে, তোমরা আয়েশাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পালানুযায়ী নযর বা উপঢৌকন পাঠাইয়া দাও। অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, মা ফাতেমাঃ! তুমি কি উহাকে মহব্বত কর না—আমি যাহাকে মহব্বত করি (ভালবাসি)? হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) ফরমাইলেন, কেন আমি তাঁহাকে ভালবাসিব না? হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন—বাছ্, তুমি আয়েশা (রাঃ—আঃ)-কে মহব্বত করিবে।

একদা আঁ হজরত (ছালঃ) জানিতে পারিলেন যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর কিছু 'আন্-বান্' (মনোমালিন্য) উপস্থিত হইয়াছে। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রে তিনি মনঃক্ষুণ্ণাবস্থায় তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিলেন। অবশেষে উভয়ের মনোবাদ মিটাইয়া দিলেন এবং প্রফুল্ল চিত্তে তথা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুরের এরূপ প্রফুল্ল বদন হইবার কারণ কি? তদুত্তরে আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, "আমি ঐ দুইজন মানুষের মধ্যে 'ছোলেহ্' (সন্ধি—মিট্‌মাট্) করাইয়া দিয়াছি—যাহারা দুনিয়ায় মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।"

একদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ), আবুজহলের কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। পাত্রী পক্ষের মনে 'আন্দেশাঃ' (সন্দেহ—আশঙ্কা) ছিল যে, 'শায়েদ' (সম্ভবতঃ) এই বিবাহ আঁ হজরত (ছালঃ) এর পক্ষে 'নাগওয়ার' (অপ্রীতিকর—অনিচ্ছাজনক) হইবে; এই মনে

করিয়া তাহারা আঁ হজরত (ছালঃ)-এর অনুমতি গ্রহণ জন্য আসিল। এদিকে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) স্বীয় মহাসম্মানিত ও ভক্তি-ভাজন পিতার খেদমতে আরজ করিলেন : শ্রদ্ধেয় পিতঃ! সকল লোকেই স্ব স্ব দুহিতার 'হেমায়েত' (সাহায্য—পক্ষসমর্থন) করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনি আমার সম্বন্ধে কিছুই খেয়াল ফরমাইতেছেন না ; এক্ষণে হজরত আলী (কঃ—ওঃ), আবুজহলের কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমার উপর সতিনী আনিতেছেন ; এই সংবাদ শুনিয়া, এবং স্বীয় কলেজার টুকরা হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-কে 'গমগীন' (দুঃখিত—মনঃক্ষুণ্ণ) দেখিয়া, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ মছজেদে গমন পূর্ব্বক মিম্বরে (বেদীতে) আরোহণ করিলেন ; এবং সমবেত জন-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া ফরমাইলেন, " হেশাম-বিন্-আল্ মগিরার খান্দানের (বংশের) লোকেরা আমার নিকট 'এজাযত' (অনুমতি) লইতে আসিয়াছিল যে, আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে আবুজহলের কন্যার বিবাহ দেয়। কিন্তু আমি 'হরগেয্' (কিছুতেই) এ বিষয়ের অনুমতি দিব না। একথা কখনও হইতে পারে না যে, আল্লাহর রছুল, আর আল্লাহর 'দোষ্মণ' (শত্রু) আবু-জহলের কন্যা এক গৃহে—একত্রে বাস করিবে। সকলে স্মরণ রাখিবে, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) আমার হৃৎপিণ্ডের টুকরা ; তাঁহার 'রঞ্জে' (মানসিক কষ্টে—দুঃখে) আমার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে, তাহার দুঃখে আমার হৃদয়ে বিষম ক্লেশ অনুভূত হয়।" হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ)-এর এই " নারাজীর " (অসন্তুষ্টির) বিষয় অবগত হইয়া শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কাণের উপর হাত রাখিলেন ; এবং এই বিবাহের সঙ্কল্প একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। তদনুসারে হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর জীবিত কাল মধ্যে তিনি

আর কোনও বিবাহ করেন নাই; বা বিবাহ করিবার ইচ্ছাও জ্ঞাপন করেন নাই।

ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ফরমাইয়াছেন, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে একদা আমরা সকলে গৃহে বসিয়া ছিলাম; এই সময় (হজরত) ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) তথায় আসিলেন; আঁ হজরত (ছালঃ) যথা-নিয়মে তাঁহাকে পরম সমাদরে নিকটে বসাইলেন; এবং তাঁহার কাণে আস্তে আস্তে কি কথা বলিলেন; তাহা শুনিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; পরে হজরত (ছালঃ) আবার কি কথা ফরমাইলেন, তাহাতে ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) প্রফুল্ল বদনে হাসিতে লাগিলেন। আমি এই ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলাম; এবং আঁ হজরত (ছালঃ) সেথান হইতে উঠিয়া যাওয়ার পর, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম; বল ত মা আজ তোমার ক্রন্দন করিবার ও হাসিবার মধ্যে কি 'ভেদ' (রহস্য) আছে? তদুত্তরে ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) বলিলেন, যে কথা বাবাজান কেবলা গোপন রাখিয়াছেন, সেকথা আমি প্রকাশ করিব না। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'ওফাতের' (মৃত্যুর) পর ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে বলিলাম, অয়ি মাতঃ ফাতেমাঃ! সেই গোপনীয় কথা বলিবার আর ত কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা নাই, এক্ষণে সেই ভেদ প্রকাশ কর, শুনি। তখন ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) বলিলেন, হাঁ আম্মাজান, এক্ষণে সে কথা প্রকাশ করিতে কোন বাধা নাই। এই বার সেই গোপনীয় কথা ও আমার ক্রন্দন এবং হাস্যের কারণ শুনুন। বাবাজান কেবলা আমাকে ফরমাইয়াছিলেন, দেখ ফাতেমাঃ, জিবরাইল (আলাঃ) 'হামেশা' (সর্ব্বদা—প্রতি বৎসর) আমাকে রমজান শরীফে একবার কোরআন পাকের 'দওর' করাইতেন (পড়িয়া শুনাইতেন বা পড়াইয়া শুনিতেন), এ বৎসর তাহা

দুইবার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বোধ হয়, আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি মর্ম্মবেদনায় কাঁদিয়া উঠিলাম; তৎপর তিনি ফরমাইলেন: "দেখ মা! আমার সকল 'রেশ্‌তাদার' (আত্মীয়) অপেক্ষা তুমি সর্ব্বাগ্রে আমার সঙ্গে জন্নতে (বেহেশ্‌তে) সম্মিলিত হইবে। আর তুমি জন্নতে সকল স্ত্রীলোকের 'ছরদার" (অধিনেত্রী) হইবে। এই কথায় আমার মনে অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, এবং তজ্জন্যই হাস্য করিয়াছিলাম।

আঁ হজরত (ছালঃ) যেমন স্বীয় দুহিতা-রত্নকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, স্নেহ করিতেন, সেইরূপ জামাতা এবং দৌহিত্রদিগের প্রতিও অত্যন্ত স্নেহ এবং 'পেয়ার' প্রদর্শন করিতেন। তিনি অনেক সময় ফরমাইতেন, যে ব্যক্তি আমায় 'দোস্ত্‌' বন্ধু: সে আলী (কঃ—ওঃ)-এর ও বন্ধু। আবার কখনও কখনও ফরমাইতেন, হে আলি! তুমি 'দুনিয়াতে' (ইহকালে) ও 'আখেরাতে' (পরকালে) আমার ভ্রাতা। 'নওয়াছাঃ' (দৌহিত্র—নাতি)-দিগের প্রতি 'মহব্বত' (স্নেহ—ভালবাসা) সম্বন্ধে অধিক কিছু লেখাই বাহুল্য। সমস্ত ভালবাসা ও স্নেহ রাশি যেন তাঁহাদের উপর ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এমাম ভ্রাতৃ-যুগলকে আঁখির তারা স্বরূপ মনে করিতেন। স্নেহ ও ভালবাসার ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি হইয়ে পারে যে, হুজুর (ছালঃ) উভয় ভ্রাতাকে স্বীয় পবিত্র স্কন্ধোপরি বসাইয়া দিতেন, কখনও বা উভয় ভ্রাতাকে ক্রোড়ে বসাইয়া অনিমিষ লোচনে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, এবং বিমল আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হইতেন।

'একরোয্‌' (একদা) আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে 'তশরিফ্‌' আনিলেন। খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) বিশ্রাম করিয়াছিলেন; ঐ সময় কনিষ্ঠ এমাম

(রাজিঃ) পানী চাহিলেন, আঁ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং তাঁহাকে পানী পান করাইতে লাগিলেন ; ঐ সময় জ্যেষ্ঠ এমাম (রাজিঃ) পানী পান করিতে আসিলে, তিনি তাঁহাকে হটাইয়া দিয়া কনিষ্ঠ এমামকে পানী পান করাইলেন। তদ্দর্শনে হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এয়া হজরত! আপনি কি হোছায়েন (রাজিঃ)-কে অধিক 'ওলফৎ' (স্নেহ) করিয়া থাকেন ? উত্তরে তিনি ফরমাইলেন, না, আমি উভয়কে সমভাবে স্নেহ করি ; আর উভয়েই আমার 'দেলের রাহত্' (প্রাণের শান্তি)। কিন্তু এক্ষেত্রে হোছায়েন প্রথমে পানী পান করিতে চাহিয়াছিল, এজন্য আমি তাহাকেই প্রথমে পানী পান করাইলাম। অয়ি মা ফাতেমা! তুমি, তোমার 'খাওন্দ্' (স্বামী) এবং তোমার সন্তানগণ আমার সঙ্গে 'জন্নতে' (বেহেশ্তে—মোছলেম-স্বর্গ) একত্রে সম্মিলিত হইবে।

হজরত রছুল করিম (ছালঃ) ফরমাইতেন, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) আমার 'রায়হানাঃ' (সুগন্ধি ফুল বা সুগন্ধি তৃণ বিশেষ)। ওম্মোল মুমেনিন (মোছলেম-মাতা) হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ফরমাইতেন, আমার নেত্রদ্বয় হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর পরে ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) ব্যতীত আর কাহাকেও 'বেহ্তর' (উত্তম—মনোনীত) দেখে নাই। একদা কোনও ব্যক্তি মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ) সর্ব্বাপেক্ষা কাহার প্রতি অধিক 'মহব্বত' (স্নেহ—ভালবাসা) প্রদর্শন করিতেন ? উত্তরে তিনি বলিলেন, ফাতেমার প্রতি। ছহিহ্ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) জন্নতি 'খাওয়াতিনের' (নারিগণের) 'মালকাঃ' (রাজ্ঞী)। ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ একদা হুজুর (ছালঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন,

এয়া রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)! 'আওরুত' (স্ত্রীলোক)-দিগের মধ্যে কাহার 'দরজাঃ' (পদ-মর্য্যাদা) সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত? তচ্ছ্রবণে হুজুর (ছালঃ) মৃত্তিকায় একটি 'খৎ' (রেখা) আঁকিলেন, এবং বলিলেন, ১। মরিয়ম (রাজিঃ); ২। খদিজাঃ (রাজিঃ); ৩। ফাতেমাঃ (রাজিঃ) ও ৪। আছিয়া (রাজিঃ)—(আছিয়া—খোদাদ্রোহী মেছের-রাজ ফেরাউনের স্ত্রী)। এতৎ সম্বন্ধে 'মোহাদ্দেছীন' (হাদীছ-বেত্তা) দিগের মধ্যে মতভেদ আছে যে, ওম্মতের (আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ওম্মত অর্থাৎ মতানুবর্ত্তী দিগের) মধ্যে কোন্ মহিলার 'ফজিলত' (সম্মান—পদ-মর্য্যাদা) অধিক? এ বিষয়ে কতক মোহাদ্দেছীন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ফজিলত অধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; আর একদল হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ)-এর পদ-মর্য্যাদা অধিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশের মতে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পদ-মর্য্যাদা অধিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। "খাতুনে জন্নত" বলিয়া যে তিনি অভিহিত হইয়াছেন, ইহাই সে বিষয়ের এক শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ; এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। ওম্মোল-মুমেনিন হজরত খদিজাতুলকোবরাঃ ও হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর ফজিলত্ (পদ-মর্য্যাদা) অতুলনীয়। ইঁহারা সকলেই নারীকুলের ভূষণ—সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর আদর্শ মহিলা।

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর স্বভাব-চরিত্র, ধার্ম্মিকতা, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, প্রত্যেক বিষয়ে মহামান্য পিতার পদানুসরণ; দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ, দরিদ্রতায় অবিচলিত ভাব, ইত্যাদি গুণে আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে হৃৎপিণ্ডের টুকরা স্বরূপ মনে করিতেন এবং তাঁহার প্রতি অধিকতর স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। হজরত খাতুনে জন্নতের

পদ-মর্য্যাদা ও গৌরবের আরও কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। (১) তিনি আঁা হজরত (ছালঃ)-এর সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্রী কন্যা-রত্ন ছিলেন; (২) তিনি আঁা হজরত (ছালঃ)-এর পরম স্নেহাস্পদ পিতৃব্যপুত্র শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর আহ্‌লিয়া (সহধর্ম্মিণী—পত্নী) ছিলেন; (৩) তাঁহার গর্ভে যে দুইটি পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ও ধার্ম্মিকতা, শৌর্য্য-বীর্য্য ও পরাক্রম এবং চরিত্র গুণে অতুলনীয় ছিলেন: আর তাঁহাদের শাহাদতের শোচনীয় ঘটনা কেয়ামত (মহাপ্রলয়) পর্য্যন্ত প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে। এ গৌরব, এ সম্মান, এ পদ-মর্য্যাদা আর কোনও মহিলার অদৃষ্টে ঘটে নাই। তাঁহাদের বংশে বহু আদর্শ এমাম, জগদ্বিখ্যাত তাপস ও আলেম-ফাজেল জন্মগ্রহণ করিয়া মোছলেম জগতের অসাধারণ গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন। এক হজরত বড় পীর ছাহেব মহামান্য ছৈয়দ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী কোদ্দাছের্ রহুল আযিযের তুলনাও জগতে নাই। তিনি মারফত ও তরিকতের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে সমস্ত দুনিয়া আলোকিত করিয়া গিয়াছেন।

খাতুনে জন্নত হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) স্বীয় অসাধারণ 'এবাদত-বন্দেগী, (উপাসনা—আরাধনা) প্রভাবে 'মস্তাব-দ্দাওয়াত' হইয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি একাগ্র মনে আল্লাহ্ জল্লশানহুর দরগায় যে প্রার্থনা করিতেন, তাহাই সেই মহা দরবারে গৃহীত হইত। এই পৃথিবীতেই যখন কোনও দাস দাসী স্বীয় প্রভুর সর্ব্বপ্রকার আদেশ-অনুজ্ঞা পালন করে, প্রভু অর্থাৎ মনিবের যে কোনও হুকুম অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া থাকে, কোনও সময়েই প্রভুর আদেশের কিছুমাত্র অন্যথাচরণ করে না, তখন সেই প্রভু বা মনিব আপনার আদেশ পালক ও অনুজ্ঞা পালিকা দাস দাসীর উপর কিরূপ সন্তুষ্ট হন; তাহাদের প্রার্থনা ও

আব্‌দার রক্ষা করেন, তাহা সচরাচর দৃষ্টিপথে পতিত হয়। আর বিশ্ব-পালক মহাবিচারক আল্লাহ তা-লার আদেশ-নিষেধ-যে নর-নারী প্রাণপণে পালন করেন, তাঁহার আদেশ পালন করাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; তাঁহাদের প্রতি মহা দয়াময় আল্লাহ জল্লশানহুর দয়ার অনন্ত স্রোত কেন প্রবাহিত হইবে না? কেন তিনি তাঁহাদের যে কোন প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না? হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) আল্লাহ্ তা-লার সমুদয় আদেশ-নিষেধ প্রাণপণে পালন করিতেন; মহাপ্রভু যে অবস্থায় রাখিতেন—দরিদ্রতা ও অভাবের প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাতেও তিনি 'ছবর' ও 'শোকর' মাত্র অবলম্বন করিতেন; পার্থিব কোনও ক্লেশকেই তিনি ক্লেশ বলিয়া মনে করিতেন না। প্রসন্ন চিত্তে সকল অভাবের তাড়নাই সহ্য করিতেন; সাংসারিক কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া সন্তান পালন ও স্বামীর আদেশ পালনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেবা ও পরিচর্যা করণ; অবশিষ্ট সময়টা উপাসনা-আরাধনায় শেষ করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহার প্রার্থনা দয়াময়ের মহা দরবারে অবাধে গৃহীত হইত। এক দিনের ঘটনা এই যে, ঈদ-মবারকের দিন ছিল। স্বর্গ-রাজ্ঞী ফজরের নমায্ পড়িয়া অবসর হইয়াছিলেন; অতঃপর চাক্কিতে আটা পিষিতে লাগিয়া গেলেন। হালাল রুজি ও দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার তাঁহাকে যেন পাখার বাতাস দিতেছিল। উপাসনার কষ্ট ও শারীরিক পরিশ্রম যেন তাঁহাকে আহ্বান করিতেছিল; 'নফ্‌ছ্‌ কুশী' (খাহেশের আকর্ষণী—আকাঙ্ক্ষার টান) তাঁহার 'কদম' (পদ—পা) চুম্বন করিতেছিল। তাঁহার দুই প্রিয় 'লায়ল' (মণি—রত্ন)—আর নানার (মাতামহের) 'দুলারা' (পরম স্নেহাস্পদ) হজরত এমাম হাছান (রাজিঃ) ও এমাম হোছায়েন (রাজিঃ) ঘরের বাহিরে খেলা করিতেছিলেন; তাঁহারা

যখন বুঝিতে পারিলেন, আজ ঈদের দিন, তখন উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া জননীকে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং বলিলেন, আম্মাজান! আপনি কি অবগত নহেন যে আজ ঈদের দিন! আজ 'আমীর-ফকীর' (ধনী-দরিদ্র) নির্ব্বিশেষে সকলে আনন্দ স্রোতে ভাসিবে; আজ আমার নানার 'ওম্মত' (শিষ্য—মতানুবর্ত্তী) দিগের পক্ষে অতি খুশির দিন, আজ 'ঈদগাহে' আমার 'নানার' (মাতামহের) নামের-খোতবাঃ পড়া হইবে; আর মোহাজেরিন ও আন্‌ছারদিগের 'বাচ্চাঃ' (বালক)-গণ ভাল ভাল কাপড় পরিবে; বস্ত্রে সুগন্ধি লাগাইবে; উষ্ট্রে আরোহণ করিবে; উষ্ট্রগুলি সজ্জিত করিবে; উষ্ট্র গুলিকে অলঙ্কার পরাইবে; উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য আহার করিবে; আর আমরা কি এই অবস্থায়ই থাকিব? আসুন, আমাদিগকেও উৎকৃষ্ট কাপড় পরাইয়া দিন, আমরাও অন্যান্য বালকদিগের ন্যায় সাজিয়া-পারিয়া ঈদগাহে গমন করি। হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) পুত্রদ্বয়ের এই সকল কথা শুনিতে ছিলেন, আর 'বেকারার' (অধৈর্য্য) হইতে ছিলেন। ভাবিতেছিলেন, পুত্রদ্বয়কে কোথা হইতে বস্ত্রাদি দিবেন; কিরূপে ইঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন। যদিও মনে মনে 'পেরেশান' (চিন্তাকুলিতা) ছিলেন, চিন্তা-সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু মৌখিক বালক দ্বয়কে—নয়ন-মণি দুইটিকে 'তছল্লি' (প্রবোধ) দিতে ত্রুটি প্রদর্শন করিতেছিলেন না। তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেছিলেন, বাছাধনেরা একটু অপেক্ষা কর, আমি আটা পিষিয়া লই; তৎপর তোমাদিকে নূতন পোষাক পরাইব। কিন্তু কোমলমতি বালকদ্বয়ের এ বিলম্ব টুকুও সহ্য হইতে ছিল না। তাঁহারা বরাবর 'যেদ' করিতেছিলেন। খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) 'মজ্‌বুর' (নিরূপায়) হইয়া 'চাক্কি' (জাঁতা) বন্ধ করিয়া দিলেন। বালকদিগকে বলিলেন, আচ্ছা, বাছাধনেরা যাও, খুব ভাল রূপে 'গোছল' (স্নান) করিয়া

আইস। দেখ, এখনই 'দরজী' (খলিফা—ওস্তাগর) আসিবে; এবং তোমাদের জন্য কাপড় লইয়া উপস্থিত হইবে। বালক এমামদ্বয় জননীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং তাড়াতাড়ি 'গোছল' (স্নান) করিতে চলিয়া গেলেন। এদিকে হজরত খাতুনে জন্নত খায়রুন্নেছা (রাঃ—আঃ) 'জা-নমায্' বিছাইয়া সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা-লার দরগায় 'গিরিয়া' ও 'যারি' (ক্রন্দন ও বিলাপ) আরম্ভ করিয়া দিলেন; তিনি রোদন করিতে করিতে আল্লাহ্ তা-লার মহাদরবারে কাতর প্রাণে এই প্রার্থনা করিতেছিলেন যে, হে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'লা! আমার 'য়েয্যত' (মান) ও 'শরম' (লজ্জা) তোমার হাতে; তোমা ব্যতীত কে আছে যে, নবী (ছালঃ)-এর 'নওয়াছাঃ' (দৌহিত্র—নাতি) দিগকে 'তছ্কিন' (প্রবোধ) দেন; আর আমার 'কওল' ও 'এক্‌রার' (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করেন। তুমি সমগ্র দুনিয়া-জাহানের প্রকৃত 'শাহানশাহ্' (সম্রাট্); তোমার ফয়েজ ও করমের (দানের) সমুদ্র, অসংখ্য তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির তৃষ্ণা-নিবারণ করে। আজ হোছনায়েন (এমাম ভ্রাতৃ-যুগল) আমার নিকট নূতন কাপড় চাহিতেছে, আর আমার এই অবস্থা যে, তালিযুক্ত সাধারণ কাপড় ও আমার জুটিতেছে না। এই 'মাছুম' (নিষ্পাপ) বালকদিগের প্রতি ফজলের দৃষ্টি-নিপাতিত কর; 'গায়েবের' (অদৃশ্য) 'খাজানাঃ (ভাণ্ডার) হইতে উহাদের জন্য 'লেবাছ' (বস্ত্র—পরিচ্ছদ) পাঠাইয়া দাও। এই বালকদ্বয় তোমার মহবুবের (বন্ধুর) 'নওয়াছাঃ' (দৌহিত্র—নাতি); তুমি স্বীয় করমের দৃষ্টির ছদকায় ইহাদের দেল (মন) খুশি কর। তুমি গণী, তুমি দাতা, তুমি 'মোছাব্বেবল আছ্বাব'—তুমি যদি দিতে চাও, তবে তোমার নিকট কিসের অভাব? এই মাছুম বালকদ্বয় তোমার নবীর নাতি, (হজরত) আলী (কঃ—ওঃ)-এর চক্ষের তারা, আমার দেলের (প্রাণের) শান্তি।

এমন যেন না হয় যে, ইহাদের হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায়। যদি উহারা এরূপ দীনবেশে—ছিন্ন পরিচ্ছদে ঈদগাহে গমন করে, তবে এই ব্যাপার তাহাদের মনোভঙ্গের কারণ হইবে। আর আর বালকেরা ইহাদের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিবে—ইহাদিগকে উপেক্ষা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবে। আমি নিজের ব্যক্তিগত 'আয়েশ' (বিলাসিতা—আরাম) ও 'রাহত' (সুখ-শান্তি)-এর জন্য তোমার দরবারে কখনও কোন প্রার্থনা করি নাই; বা এখনও করিতেছি না। হাঁ, হোছনায়েনের জন্য তোমার দ্বারে খট্‌-খটাইতেছি—(দ্বারে করাঘাত করিতেছি)। দয়াময়! আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর। তাঁহার 'দোওয়া' (প্রার্থনা) শেষ হইতে না হইতেই কে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল; এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, এই কাপড় লইয়া যাও। বালকদ্বয় ইতিপূর্ব্বেই স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; আওয়ায্ শুনিয়া দ্বারদেশে গিয়া দেখিলেন, দ্বারে একজন 'য়েরাবী' (যাযাবর বা বদ্দু)-এর আকার বিশিষ্ট লোক দণ্ডায়মান আছে; তাহাকে দরবী বলিয়া বোধ হইল; তাহার হাতে একখানা খান (পাত্র বা খাঞ্চা), উহা বস্ত্র দ্বারা ঢাকা। এমাম ভ্রাতৃ-যুগল সেই বস্ত্রাচ্ছাদিত খান লইয়া মাতার নিকট চলিয়া গেলেন; কাপড় তুলিয়া রাখিয়া খাঞ্চা খানা সেই দরবীবেশধারী লোকের হস্তে প্রদান করিলেন; সে খাঞ্চাখানি গ্রহণ পূর্ব্বক এমাম বালকদ্বয়কে ছালাম করিয়া চলিয়া গেল। হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) এযাবৎ ছেজদায় পড়িয়াছিলেন; হজরত হোছায়েন (রাজিঃ) বলিয়া উঠিলেন, আম্মাজান উঠুন; দরবী আমাদের কাপড় লইয়া আসিয়াছে; সত্বরে আমাদিগকে এই নববস্ত্র পরাইয়া দিন। হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) শোকর প্রকাশ পূর্ব্বক ছেজদাঃ হইতে মস্তকোত্তোলন করিলেন, এবং এমাম ভ্রাতৃ-যুগলকে এই নূতন কাপড় পরাইয়া ঈদগাহে রওয়ানা করিলেন। ছোবহানাল্লাহ্!

প্রসিদ্ধ হাদীছ-বেত্তা মহাপণ্ডিত-ছাহাবা হজরত আবু হোরেরা (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত পয়গম্বর (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, "হায়া (লজ্জা—শরম) ঈমানের এক শাখা; আর আহ্‌লে ঈমান (ঈমানওয়ালা—ঈমানদার লোক) বেহেশ্‌তে বাস করিবে। * * * (তিরমযি)।

মেশ্‌কাতের এক ছহী হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যে হায়া ও ঈমান 'লাযেম'ও 'মযলুম'। যখন কোনও ব্যক্তির এই দুই জিনিষের এক জিনিষ উঠাইয়া লওয়া হয়, তখন অপর (দ্বিতীয়) জিনিষটি আপনা হইতে উঠিয়া যায়; কিংবা 'খোদ-বখোদ' (আপনা হইতে) উহার পেছনে (পশ্চাতে) চলিয়া যায়।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য মোছলেম-রাজ্যের (যথা :—তুরস্ক, মেছের, এরাক, শাম) নারিগণের মধ্যে অনেকেই উপরোক্ত 'চন্দ্‌ ছেফত্‌' (কতিপয় গুণ) পরিত্যাগ করিয়া, আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। পাশ্চাত্য বিষাক্ত শিক্ষা ও সংসর্গ প্রভাবে তাঁহারা নির্লজ্জতা ও 'বেহায়্যাপনীর' শেষ সীমায় পঁহুছিয়াছেন। যে নির্লজ্জতা ও স্বেচ্ছাচরিতা আজ পাশ্চাত্য সমাজে অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই 'বে-শরমী' ও 'বেহায়াপনী' আমাদের নব্য-শিক্ষিতা নারী সমাজের আজ অনুকরণীয়। তাঁহারা পুরুষের সমান অধিকার লাভের জন্য 'বে-চয়েন' (অধৈর্য্য) হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সর্ব্বশক্তিমান্‌ আল্লাহ্‌ তা-লা পুরুষ এবং নারীকে প্রাকৃতিক নিয়মে বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট করিয়া সৃজন করিয়াছেন। সেই অনুসারে তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ ও দায়িত্ব বিভিন্ন প্রকারের হওয়া আবশ্যক। পুরুষের প্রাকৃতিক কঠোরতার সহিত নারীর স্বভাবগত কোমলতা ও কমনীয়তার কোনও রূপ সৌসাদৃশ্য নাই। নর এবং নারীর শারীরিক

গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন। পুরুষ সন্তানের জন্মদাতা, আর নারী সন্তান গর্ভে ধারণ করেন। আমাদের কতকগুলি বিকৃতমনাঃ নরনারী, স্ত্রীলোকদিগকে সম্পূর্ণ আযাদী (স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা)-এর উপর জাতীয় উন্নতির নির্ভর বা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীন বিহারের ফলে বঙ্গীয় মোছলেম-সমাজে কতগুলি শোচনীয় দুর্ঘটনা ইতিপূর্ব্বে ঘটিয়া গিয়াছে; তবুও এই পাশ্চাত্য খেয়াল সম্পন্ন গুণধরদিগের চৈতন্য সম্পাদিত হইতেছে না। ইহারা চায় নরনারী স্বাধীনভাবে একত্র মিলিয়া-মিশিয়া পথে-ঘটে, বাগানে-কুঞ্জবনে, নিভৃত প্রকোষ্ঠে বিচরণ এবং উপবেশন করিয়া হাস্য পরিহাস, গল্প-গুজব করেন। পুরুষ ভৃত্য বা বয়, নারীদিগের সেবা পরিচর্য্যা করে। পুরুষের দোকানে প্রবেশ করিয়া 'ছওদা' (জিনিষ-পত্র) খরিদ করেন; পুরুষ বন্ধুদিগের সঙ্গে মিশিয়া নারিগণ উন্মুক্ত মাঠে বা নদী ও সমুদ্র তটে, পাহাড় পর্ব্বতে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন। তাঁরা আবার " বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড় " হইতে চান। পূর্ব্বতন আদর্শ ইস্‌লামী রাজ্য টার্কিতে (তুরস্কে) নারিগণ 'বেহায়াপনী' (অর্দ্ধ নগ্ন) ইউরোপীয় পোষাক-ভূষিতা হইয়া দীর্ঘ চুল ছাটাইয়া, পুরুষের সঙ্গে একত্রে ভ্রমণ-বিহার করিতেছেন; পুরুষের সঙ্গে ঐরূপ নগ্ন পরিচ্ছদে নৃত্য করিয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছেন। ইহাই কি এছলামী সভ্যতার আদর্শ! জর্ম্মনীতে যেমন উলঙ্গ নরনারীর একটি আড্ডা সৃষ্টি হইয়াছে; কালে হয় ত মোছলমান নামধারী বর্ত্তমান তুর্কী জাতির মধ্যে সেইরূপ ন্যাংটা পল্লী বা প্রমোদ-কাননের সৃষ্টি হইবে। কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতা মোছলেম মহিলা মোছলমান সমাজের সহানুভূতি আকর্ষণ জন্য স্বীয় পরিচালিত-স্কুলে বেশ পরদার শক্ত বাঁধুনী রাখিয়াছেন; কিন্তু নিজে পরদার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতেছেন। তিনি নিজেও এযাবৎ প্রকাশ্য ভাবে পরদার বন্ধন ছিন্ন করেন নাই; কিন্তু লেখনীর সাহায্যে ও বক্তৃতার

মুখে স্বীয় পরদা-বিরোধিতা খুব জোর-শোরে প্রকাশ করিয়া, পাশ্চাত্য খেয়াল বিশিষ্ট নর-নারীর নিকট বেশ 'বাহ্‌বা' লইতেছেন। পুরাতন খেয়াল বিশিষ্ট নর-নারীর উপর এই শ্রেণীর স্বেচ্ছাচারী ও স্বেচ্ছাচারিণী নর-নারিগণ অনবরত গরলোদ্গার করিতেছেন। "লজ্জা ও শরম" বলিয়া কোনও জিনিষের অস্তিত্ব ইঁহারা স্বীকার করেন না। নারীর লজ্জা ও শরমই যে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার, একথা তাঁহারা স্বীকার করিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। ইহারা বিবী, বেগম, খাতুন প্রভৃতি উপাধী ছাড়িয়া আজকাল মিস, মিসেস্ ও লেডি উপাধী অতি গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতেছেন। মোছলমানী পোষাক-পরিচ্ছদ ও আস্তে আস্তে পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহারা ময়ূরের পালক পরিহিত কাকের আকার ধারণ করিতে একটুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না। উর্দ্দুতে একটী কথা আছে, যথাঃ—"জেছনে কী শরম, ওছ্‌কে ফুটে করম; জেছনে কী বেহায়ী, ওছ নে খায়ী দুধ-মালায়ী।"

উপরোক্ত দুইটি ছহী হাদীছ দ্বারা লজ্জা ও শরমের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে; লজ্জাহীনা বেহায়ী নারী মোছলেম-সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ।

কিন্তু হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পবিত্র আচার-ব্যবহার, কার্য্য-কলাপ, চাল-চলন আমাদের কন্যাগণ, ভগিনিগণ এবং বিবিগণের সম্পূর্ণ অনুকরণীয়। আমরা একথা স্বীকার করি যে, এদেশের মোছলেম-অবরোধ-প্রথাটি কিছু কঠোর। সম্পূর্ণ বিধর্ম্মী মনুষ্য-প্লাবিত দেশে পূর্ব্বকালের নবাগত ও ভারত-বিজয়ী মোছলমানগণ অবরোধ ও পরদার কঠোরতা যাহা করিয়াছিলেন; তাহা দেশ, কাল এবং পাত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। এখনও তাহার প্রয়োজন আছে। নারীর পরদা ফাঁক করিলেই মোছলমানগণ উন্নতির উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিবেন, এ বিশ্বাস কোনও চিন্তাশীল খাঁটি এবং আদর্শ মোছলমানের

নাই। জাতীয় আদর্শ ছাড়িয়া, ধর্ম্মের অনুশাসন না মানিয়া যাহারা ভিন্ন জাতির—অমোছলমানের আদর্শ গ্রহণ করে, তাহারা পদে পদে বিড়ম্বিত হয়।

আঁ হজরত (ছালঃ) একদা যখন স্বীয় প্রাণাধিকা কন্যা-রত্ন হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্ত্রী জাতির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ 'ছেফত' (গুণ) কি ? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "না তাহারা পর পুরুষকে দেখে, না কোনও পর পুরুষ উহাদিগকে দেখিতে পায়।"

তাঁহার এই শরম ও হায়া খোদা তা'লার ও 'পছন্দ' (মনঃপুত) ছিল। মহাত্মা আবু নয়ীম নিম্ন-লিখিত রওয়ায়েত হজরত আবু হোরেরাঃ (রাজিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনাব হজরত রছুলে-করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ—কেয়ামতের দিন যখন বিন্তে-রছুল (হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ [রা—আঃ) 'পুল ছরাত' অতিক্রম করিবেন, তখন ফেরেশ্‌তাগণ 'মনাদি' (ঘোষণা) করিবে যে, "হে মনুষ্যগণ! তোমরা মস্তক অবনত কর, চক্ষু বন্ধ কর, ফাতেমাঃ বিন্তে-হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) পুল-ছরাত পার হইয়া জন্নতে (বেহেশ্‌তে) তশ্‌রিফ লইয়া যাইতেছেন।"

তিনি ফরমাইতেন, কোনও 'আওরত' (স্ত্রীলোক), বিনা 'আশদ্দ জরুরত" (অত্যন্ত প্রয়োজন), অপর স্ত্রীলোককেও যেন 'লাঙ্গে বদন' (নগ্ন দেহ) না দেখে। আর না দুইজন নগ্নদেহ স্ত্রীলোক একই চাদরে দেহ 'লেপ্‌টায়' (আবৃত করে)। যদিও বা ঘটনা বশতঃ কোনও স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকের নগ্নদেহ দেখিতে পায়, তবে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন, শরীরের সাজ-সজ্জা ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে স্বীয় স্বামীর নিকটও যেন প্রশংসাবাদ না করে। এই হায়া ও শরমের প্রভাবে হজরত

খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) 'মরজল-মওতে' (মরণ-ব্যাধিতে—যে রোগে তিনি এন্তেকাল ফরমাইয়াছিলেন, ঐ রোগের অবস্থায়) 'অছিয়ত' ফরমাইয়াছিলেন (অন্তিম-নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন) যে, আমার জানাযাঃ যেন রাত্রিকালে উঠান হয়, আর রাত্রিকালেও যেন আমার জানাযার উপর পরদা ঢাকা দেওয়া যায়। আর বিবী আছমাঃ (হজরত আবুবকর ছিদ্দিক [রাজিঃ]-এর 'যওজাঃ' [স্ত্রী] যিনি হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ [রাঃ—আঃ]-এর গোপনীয় বিষয় জ্ঞাত এবং পরম পুণ্যবতী ধার্ম্মিকা মহিলা ছিলেন) ব্যতীত, অপর কোনও স্ত্রীলোক যেন আমার মৃতদেহের গোছল না দেয় (মৃত্যু-স্নান না করায়)। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, য়েমরান-বিন্-হাছিন (রাজিঃ)-কে * একবার হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) হজরত বিবী ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে 'য়েয়াদত' (পীড়ার অবস্থার খবরগিরি)-এর জন্য নিজের সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) যে পর্য্যন্ত স্বীয় ওয়ালেদে মাজেদের চাদরখানি লইয়া সমগ্র দেহ আচ্ছাদন না করিয়াছিলেন—পদ-যুগল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত না ঢাকিয়া ছিলেন, হজরত য়েমরান (রাজিঃ)-কে গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিয়াছিলেন না ; এই ঘটনা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

---

* হজরত এমরান-বিন্-হাছিন (রাজিঃ)—ইঁহার কুনিয়েত আবু ছনজ্জিদ খবায়ী কায়বি ছিল ; ইঁনি খয়বর বিজয়ের বৎসর পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পরে ইঁনি বছরা নগরে স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। ৫২ হিজরীতে ইঁনি বস্রা নগরেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। বছরা নগরেই ইঁহার সমাধি আছে। ইঁনি একজন মহা বিদ্বান্ ছাহাবাঃ এবং 'ফোকাহ (কেফা-শাস্ত্রবিদ) মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

একবার আবদুল্লাহ্-বিন্-উম্-মক্তুম (রাজিঃ) * নামক অন্ধ ছাহাবী কোনও প্রয়োজনে আঁা হজরত (ছালঃ)-এর খোঁজ করিতেছিলেন। হুজুর (ছালঃ) ঐ সময় হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে তশ্রিফ রাখিয়া ছিলেন। উপরোক্ত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ঐ গৃহে উপস্থিত হইলে, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তাড়াতাড়ি অন্ত প্রকোষ্ঠে (কক্ষে—কামরায়) গমন করিলেন। যখন হজরত

---

* আবদুল্লা-বিন্-উম-মকতুম (রাজিঃ) অন্ধ ছিলেন। একদা মক্কা-মোয়াজ্জমায় জনাব হজরত রছুল করিম (ছালঃ), মক্কার রইছ দিগকে—যাহাদের মধ্যে আবুজহল-বিন্-হেশাম, ওতিবাঃ-বিন্-রাবিয়া, আবি ওম্মিয়া বিন্-খলফ্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কোরেশগণ উপস্থিত ছিল—পবিত্র এছলামের দিকে 'দাওত' দিতে (আহ্বান করিতে) এবং তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন; ঐসময় আবদুল্লা-বিন্-উম-মকতুম (রাজিঃ) ঐস্থানে আগমন করিলেন, এবং হুজুর (ছালঃ)-কে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এই 'কেতায়ে কালাম') বাক্য-স্রোতে বাধা প্রদান), আঁা হজরত (ছালঃ)-এর 'না-গওয়ার' (বিরক্তিকর) বোধ হওয়াতে, তিনি তাঁহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন, এবং তাঁহার প্রশ্নের কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না। ইহাতে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন্-উন-মকতুম (রাজিঃ) বড় দুঃখিত হইলেন; আঁা হজরত (ছালঃ) সভা হইতে উঠিয়া আসিলেন, ঐ সময় ছুরা আবছ (৩০ পারা) নাযেল (অবতীর্ণ) হইল। হুজুর (ছালঃ) আবদুল্লাহ (রাজিঃ)-কে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার 'দেলজুয়ী' (মনঃসন্তোষ) করিলেন। ইহার:পর এই অন্ধ ছাহাবাঃ যখন হুজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে আসিতেন, তিনি তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিতেন।

আবদুল্লাহ্ (রাজিঃ) স্বীয় প্রয়োজন সাধন পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন; তখন হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) সেই ভিন্ন প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন। জনাব হজরত রছুল করিম (ছালঃ) 'এরশাদ ফরমাইলেন' (বলিলেন), অয়ি কন্যে! আবদুল্লা-বিন্-উম-মকতুম ত 'নাবিনাঃ' (অন্ধ), তুমি কেন পরদার জন্য 'তক্‌লিফ্ (কষ্ট) স্বীকার করিলে? পিতৃবাক্য শ্রবণে হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) ফরমাইলেন, আব্বাজান! উনি ত অন্ধ ছিলেন, কিন্তু আমি ত অন্ধ ছিলাম না যে, 'গায়ের মহরেম' (যাঁহাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ)-কে দেখিতে থাকিব। এই ঘটনা সম্বন্ধে উর্দ্দু কবি ছৈয়দ মোহাম্মদ নোহ (মছলীশহরী) একটি হৃদয়োন্মাদিনী কবিতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; উহার শেষাংশ এই :—

আরজ কী ছিদ্দিকাঃ কোব্‌রেনে-তব্ ইয়েহ্ বা-আদব,
মুঝ্‌কো এছ এরশাদে আলী পর নাঃ কেওঁ আয়ে আজব।
বু আলবছির আন্ধে ছহি, ম্যায় তো নাবিনাঃ নেহী;
বায়ঠি রহ্‌তি কেছতরেহ্ আয় রহমতুল্লিল আলামীন।
পড়্‌হ্‌তি নামহরেম পর আখের কুচ্ না কুচ্ মেরিঁ নষর;
কেউ নাঃ কর্‌তি শরম কেবলা আপকি লখ্‌তে জগর।
খোশ্ হুয়ে ছোন্‌কর পয়গম্বর ইয়েহ্ জওয়াব বা-ছওয়াব;
দিয়ি দোওয়া—তুঝ্‌পর হো নাযেল রহ্‌মতে হক বেহেছাব।
পেশ্‌গাহ্ হক্‌ছে মষ্‌দাঃ লায়ে তব্ রুহোল আমীন;
ফাতেমাঃ যোহরাঃ হ্যায় ছরদারে নেছা আল্ আলামিন।

হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর শরম ও হায়ার আর একটি ঘটনা মেশ্‌কাত শরীফ হইতে নকল করা যাইতেছে :—একদা হজরত নবী করিম (ছালঃ) একটি 'নাবালেগ্' (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ক্রীতদাসকে

সঙ্গে লইয়া—যাহাকে স্বীয় নূর 'চশম' (চক্ষের জ্যোতিঃ) হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে 'হেবা' (দান) করিয়া দিয়াছিলেন,—হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে আগমন করিলেন। খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) তখন এরূপ একখানি ছোট কাপড় পরিধান করিয়া ছিলেন যে, উহা দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন করিলে বস্ত্রখানি পা পর্য্যন্ত পঁহুছিত না ; আবার পা ঢাকিলে মস্তক অনাবৃত হইয়া যাইত। তিনি অতি ব্যস্ততার সহিত ঐ ছোট কাপড় খানির দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, তদ্দর্শনে হজরত রছুলে করিম (ছালঃ) ফরমাইলেন, অয়ি ফাতেমাঃ ! কোনও ভয় নাই,—যে জন্য তুমি লজ্জিত হইতেছ। কেবলমাত্র তোমার পিতা ও তোমার 'নাবালেগ্ 'গোলাম আসিয়াছে। এই হাদীছ আবু-দাউদ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

মওলানা ছিমাব ছিদ্দিকী আকবরাবাদ একটি প্রাণতোষিণী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

শমঊন য়িহুদী এক হাম্‌ছায়া যোহরাঃ থা ;
আইয়্যামে জেহালত্‌মে দোশ্‌মন্ জো আলীকা থা।
তক্‌লিফ্ নাঃ থি কোয়ী জো ওছ্‌ছে নাঃ পঁহুছি হো ;
জো ওছ্‌ছে না পঁহুছা হো উওহ্ কোয়ী-নাঃ ছদ্‌মা থা।
তওফিকে এলাহীনে আখের ওছে ললকারা ;
আগাহ্‌ছে আঞ্জামে তক্‌দীর কুচ্ আচ্ছাঃ থা।

এছলাম কি জাহুনে তছ্খির্ কিয়া ওছ্কো ;
মোমেন উওহ্ হুয়া আখের জো কোফ্র পর শিদা থা।
জেত্নে থে আযিয্ ওছ্কে, ছব্ ওছ্ছে হুয়ে বরহম্ ;
আওর দোশ্মনে জান ওছ্কা হর্ আপ্না এগানাঃ থা।
আছ্বাবে তেজারত্ কী মছহুদ হুয়ে রছ্তে,
ওছমেভি পড়া টুটা জো কাম উওহ্ কর্তা থা।
এফ্লাছনে আ ঘেরা নোক্বত্নে কিয়া ফেহ্রা ;
আল্লাহ্ তেরি কোদ্রত্ কেয়া হো গেয়া আওর কেয়া থা।
থি ওছ কি জো এক বিবী, ওছ্কো ভি ক্বজা আয়ি ;
আফত্ পঃ ইয়েহ্ আফত্ থি ছদ্মে পঃ ইয়েহ্ ছদমাঃ থাঃ।
এত্না ভি না থা কোয়ী আকরব্ ওছে নাহ্লাতা ;
বেকছ কি নেগাহুঁমে তারিক যমানাঃ থা।
এছ্ ওয়াকেয়ে কি আখের যোহরাঃ নে খবর পায়ী ;
লওণ্ডিনে কাহা আ-কার্ জো ওয়াকেয়াঃ গোযরা থা।
উও্হ রাত্ কা ছান্নাটা আলম পঃ হুয়া তারি ;
উওহ্ আলমে তারিকি হর্ ছমত্ আন্ধেরা থা।
যোহরা ওঠ্ঠেঁ আওর ছর্ পর্ রওয়া ডালি ;
ওছ্ ঘর্কা লিয়া রাস্তাঃ জেছ্ ঘর্মে উওহ্ রাহ্তা থা।
পঁহুছি তো ওহাঁ জাকর খোদ্হি ওছে নাহ্লায়া ;
কাফ্নায়ী গেয়ী-মইয়েত্ জেয়ছা কেঃ তরিকাঃ থা।
কী ফাতেমাঃ নে আপ্নি হাতুঁছে হরএক খেদ্মত্ ;
শময্নছে গোয়া কেঃ ওন্কা কোয়ী রেশ্তাঃ থা।
ছব্ভুল গেয়িঁ ক্কেছে গোয্রেথে জো কুচ্ পহ্লে ;
ছিনেমে নাঃ থা কিনাঃ দেল থা তো মছফ্ফা থা।

দোশ্‌মন্‌ছে ভি হোথা থা এছ্‌ দরজাঃ ছলুক ওন্‌কা ;
গমখারী ও হামদর্‌দী ছাদাত্‌কা শিওয়াঃ থা।
গোরবত্‌ মে মছিবত্‌ মে হামছায়া কে কাম আনা ;
ইয়েহ্‌ মোছলকে যোহ্‌রাঃ থা ইয়েহ্‌ মশ্‌রব্‌ যোহরা থা।

ঐ কবির লিখিত আর একটি কবিতা ঃ

এক য়িহুদী কা মকান থা আপ্‌কে হাম্‌ছায়া মেঁ ;
ওছ্‌কি লাড়্‌কী হজরতে যোহরাঃ পা থি দেল্‌ছে নেছার।
গয়ের মর্‌হব থি তো উওহ্‌ লেয়কীন হকিকত্‌ মেঁ ওছে ;
মেল্লতে বয়জাছে থা এক ওন্‌ছ্‌, ওন্‌ছ ওস্তোয়ার।
খোল্‌কে যোহরানে মছখ্‌খর কর্‌ লিয়া থা য়িয়ুঁ ওছে ;
জেছ্‌তরেহ্‌ শাহীন কে কাবু মেঁ আ-জায়ে শেকার।
আ-কে পহর দেন্‌ বয়েঠ্‌তি থি আওর ছোন্‌তিথি কালাম ;
থি উওহ্‌ গোয়া যর-খরিদি আপ্‌কি খেদমত্‌ গোযার।
এক দেন্‌ থোড়াছা লায়ী হালুয়া যোহরাঃ কে লিয়ে ;
আর কাহা ফরমাইয়ে এছ্‌কো কবুল্‌ আয় যি ওকার।
হজরতে যোহরানে ছোচা, হ্যায় য়িহুদীকা ইয়েহ্‌ মাল ;
এছ্‌কা খানা না রওয়া হ্যায় এছ্‌কো লেনা না গওয়ার।
আওর আগার্‌ এন্‌কার করতি হোঁ তো দেল জায়েগা টুট ;
জানে কেয়া দেল্‌মে কাহে আপ্‌নে ইয়েহ্‌ লাড়্‌কী শরম্‌ছার।
আল্‌-গরজ্‌ ইয়েহ্‌ ছোচ্‌কর্‌ হালুয়া খুশিছে লে লিয়া ;
আওর-উওহ্‌ লাড়কী রওয়ানা হো গয়ি মেন্নত গোযার।

জব্ হুয়া মালুম ফেদ্দাহ্ কো ইয়েহ্ ছারা ওয়াকেয়া ;
কওন ফেদ্দা ? আপ্ কি পেয়ারী কনিয্ নামদার।
আরজ কী, আছহাবে ছুফ ফাঃ কো ইয়েহ্ ভেজওয়া দিজিয়ে ;
তাকেঃ ইয়েহ্ খায়রাত হো খোশ্নুদীয়ে পর্ওয়ার দেগার।
আপ্নে এরশাদ ফরমায়া কেঃ ফেদ্দা গওর কর্ ;
কেয়া খোদাকো দোঁ উওহ্ শয় জো খোদ হ্যায় মুঝ্কো নাগওয়ার।
জা কোয়ী রাহেব য়িহুদী ঢুন্ড্ হালুয়া ওছ্কো দে ;
মস্তহক্ ওছ্কা ওহি হ্যায়, হাম্ নেহি হেঁয় খিন্হার।
লায়ী ফের্ এক দেন্ ইয়েহ্ লাড়্কী চান্দ্ দীনার ও দর্হম ;
আওর কাহা লেলিজিয়ে বিন্তে-রছুল কর্দেগার।
আপ্নে ইয়েহ্ কাহ কে উওহ্ দীনার ওয়াপছ কার্ দিয়ে ;
ইয়েহ্ পরায়ে হেঁয়, নেহি এন্পর তোম্হারা এখ্তিয়ার।
তোম এজাযত্ বাপ্ছে লেকর নেহী লাই ইয়েহ্ মাল ;
দোশ্মনে এছলাম হেয় উওহ্ ইয়েহ্ নেহী ওছ্কা শায়া।
পাছ ইয়েহ্ জাহের হেরকেঃ চোরী কার্কে দরহম লায়ী হো ;
মালে চোরীকা মোছলমানুঁ কো কব্ হ্যায় ছায্গার ?
জাও লেজাও নাঃ কর্না ফের্ তোম এয়ছা ভুল কর্ ;
উল্ফতে এছলামকা এছপর নেহী হ্যায় এন্হেছার।
তোম আগার মোহতাজ হো তো কোয়ী রঞ্জ্ গম নহি ;
ছাফ্ নিয়েত দেখ্নে ওয়ালা হ্যায় উওহ্ পরওয়ার দেগার।
এহ্তিয়াতে এছলাম মে হেয় এক ওছুল বেহ্তরিন ;
থা জো আহ্লে বয়েত্কা দওরে নবুয়ত মে শয়ার।
আওর এস্তেগ্নাঃ কা ইয়েহ্ আলম তওক্কলকী ইয়েহ্ শান ;
হ্যায় জাহাঁমে ফাতেমাঃ যোহ্রাকি যেন্দাঃ এয়াদগার।

ইহাতে খোদা তা-লার কোনও 'বড়ি হেকমৎ' (মহান্ কৌশল বা উদ্দেশ্য) ছিল যে, জনাব হজরত রছুলোল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহাহ্ আলায়হে ওয়াছাল্লামের কোনও পুত্র সন্তান জীবিত ছিলেন না, কেবলমাত্র 'দোখ্তরি আওলাদ' (কন্যার সন্তান-সন্ততি) দ্বারা তাঁহার 'নছল' ('আওলাদ'—বংশাবলী) পৃথিবীতে এযাবৎ বিদ্যমান আছে। আবার প্রথমোক্ত ৩ কন্যার বংশ-তরু অবশিষ্ট নাই; কেবলমাত্র সর্ব্বকনিষ্ঠা ও সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহেরপাত্রী হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বংশ-তরুই সমগ্র পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর কন্যা হজরত ওম্মে-কলছুম (রাঃ—আঃ)-এর কোন 'আওলাদ' (সন্তান) ই হইয়াছিল না। সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যা হজরত যয়নব (রাঃ—আঃ)-এর একটি পুত্র সন্তান জন্মিলেও, অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এমামাঃ নাম্নী একটি মাত্র কন্যা জীবিত ছিলেন; হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর পরলোক প্রাপ্তির পর, শেরেখোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার আওলাদও দুই 'পোশ্ত্' (পুরুষ)-এর মধ্যেই নিঃশেষিত হয়। তৃতীয় কন্যা হজরত রোকয়া (রাঃ—আঃ)-এর ও কোন সন্তান-সন্ততি ছিলেন না। জনাব হজরত ছৈয়দার গর্ভে ৩টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; (১) হাছন (রাজিঃ), (২) হোছায়েন (রাজিঃ) ও (৩) মহছেন (রাজিঃ); আর ৩টি কন্যা-রত্ন যথা:—হজরত যয়নব (রাঃ—আঃ), হজরত ওম্মে কলছুম (রাঃ—আঃ) এবং হজরত রকিয়া (রাঃ—আঃ)।

"ফজলল-খেতাব" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হজরত ওম্মে কলছুম (রাঃ—আঃ)-এর নাম হজরত রকিয়া (রাঃ—আঃ) ও কুনিয়েত ওম্মে কলছুম ছিল। এই হিসাবে হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর দুইটি মাত্র কন্যা ছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু অন্য রওয়ায়েতে দৃষ্ট হয়, হজরত

রকিয়া (রাঃ—আঃ) শৈশবেই এন্তেকাল করিয়াছিলেন। ওম্মে কলছুমের বিবাহ শেরেখোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ), স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া দ্বিতীয় খলিফা হজরত ফারুকে আজম ওমর বিন্ খেতাব (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মহামান্য খলিফার ঔরসে যয়েদ নামক এক পুত্র ও রকিয়াঃ নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ইঁহারা উভয়ে অতি শৈশবেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। মহামান্য ২য় খলিফা হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর শাহাদৎ প্রাপ্তির পর, অয়োন এব্‌নে জাফর (হজরত আলী [কঃ—ওঃ]-এর ভ্রাতুষ্পুত্র)-এর সঙ্গে তাঁহার 'নেকাহ ছানী' (দ্বিতীয় বার বিবাহ) হয়। ইঁহার পক্ষ হইতে কোনও আওলাদ হইয়াছিল না। ইঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা হজরত মোহাম্মদ বিন্-জাফর (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ইঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়; ইঁহার পক্ষে একটি পুত্র সন্তান জন্মিলেও, শৈশবেই সেই পুত্র মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন। মোহাম্মদ-বিন্ জাফর (রাজিঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁহাদের অন্যতম ভ্রাতা আবদুল্লা-বিন্-জাফর (রাজিঃ) তাঁহাকে বিবাহ করেন; ইহা হজরত বতুল-নন্দিনীর ৪র্থ বিবাহ। ইঁহার পক্ষেও কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন নাই; আর ইঁহার সঙ্গে বিবাহিত অবস্থায়ই হজরত ওম্মে কলছুম (রাঃ—আঃ) 'ওফাত' পাইয়াছিলেন।

হজরত যয়নব (রাঃ—আঃ)-এর বিবাহ আবদুল্লা-বিন্-জাফর (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সম্পন্ন হইয়াছিল, ইঁহার গর্ভে আলী (রাজিঃ) নামক এক পুত্র ও ওম্মে কলছুম (রাঃ—আঃ) নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই কন্যার সহিত কাছেম-বিন্-মোহাম্মদ-বিন্-জাফর (রাজিঃ)-এর বিবাহ হয়। ইঁহাদের বহু 'আওলাদ' (সন্তান-সন্ততি) হইয়াছিল। আর আলী-বিন্-আবদুল্লা (রাজিঃ) হইতেও বহু সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের বংশধরগণ জাফরী ও ফাতেমী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

৫ই রমজানুল মবারক—মতান্তরে ১৫ই শা'বানুল মোয়াজ্জম (তৃতীয় হিজরী), হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে অন্যান্য রওয়ায়েত থাকিলেও, উপরোক্ত বর্ণনাই সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য। হজরত এমাম জয়নাল আবেদীন (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যখন আমার পিতৃব্য বড় এমাম ছাহেবের 'বেলাদত' (ভূমিষ্ঠ) হওয়ার সময় আসন্ন হইল, তখন হুজুর ছরওয়ারে আ'লম (ছালঃ) হজরত আছমাঃ-বিন্তে-ওমিছ (রাঃ—আঃ) ও ওম্মে এমিন (রাঃ—আঃ)-কে মদীয় পিতামহী জনাব ছৈয়দাঃ ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর খেদমতে পাঠাইয়া দিলেন; এবং তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমরা আয়েতল কুরছি ও মযুযুয্ পড়িয়া পড়িয়া ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর প্রতি দম করিবে। তাঁহার বেলাদত (জন্ম) আছরের নমাজের সময় হইয়াছিল। আছমাঃ-বিন্তে-আমিছ (রাঃ—আঃ) বলিয়াছেন, যে সময় (হজরত এমাম) হাছন (রাজিঃ) ভূমিষ্ঠ হইলেন, তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নেফাছের শোণিত দেখিতে পাইলাম না। এতদ্দর্শনে আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম এবং আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে এবিষয় আ'রজ করিলাম। তচ্ছ্রবণে তিনি ফরমাইলেন, আমার কন্যা-রত্ন ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) 'পাক' (পবিত্র)। প্রসবান্তে 'গোছল' (স্নান) করিয়া তিনি সেই দিনই মগ্‌রেভের নমায্ যথানিয়মে আদায় করিয়াছিলেন। এযাবৎ আর কোনও মহিলা সম্বন্ধে এরূপ ঘটনা ঘটে নাই। শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইয়াছেন, (হজরত এমাম) হাছন (রাজিঃ)-এর 'আকিকা' (সন্তান জন্মিবার পর বিশেষ অনুষ্ঠান) জনাব ছরওয়ারে আ'লম (ছালঃ) স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে (হজরত) ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর প্রতি আদেশ

করিলেন, শিশুর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া উহার চুলের সম পরিমাণ চান্দি (রৌপ্য) খায়রাত করিয়া দাও। তদনুসারে হজরত হাছন (রাজিঃ)-এর মস্তক মুণ্ডন করা হইল; শিশুর চুলের ওজন এক দরহম বা তদপেক্ষা কিছু কম হইয়াছিল।

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আকিকার বকরীর একখানি রাণ ও এক দরম দাইকে দেওয়া হইয়াছিল। হজরত আছমা-বিন্তে আমিছ (রাঃ—আঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, জন্ম-গ্রহণের ৭ম দিবসে এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর আকিকা কার্য্য সম্পন্ন হয়; দুইটি মেষ (দোম্বা) বা ছাগল যবেহ হইয়াছিল। (হজরত এমাম) হাছন (রাজিঃ)-এর মস্তক মুণ্ডন করিয়া, তাঁহার চুলের পরিমাণ 'চান্দি' (রৌপ্য) খায়রাত করা হয়। অতঃপর হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) স্বীয় পবিত্র হস্তে শিশুর মস্তকে সুগন্ধ লাগাইলেন, এবং ফরমাইলেন, অয়ি আছমাঃ! শিশুর মস্তকে 'খুন' (রক্ত—শোণিত) লাগান, 'রছম জাহেলিয়ত' (অসভ্যতা-মূলক নিয়ম)। (ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, অন্ধকার যুগে আরব (কোরেশ)-দিগের মধ্যে শিশুর মস্তকে শোণিত লেপন করার নিয়ম প্রচলিত ছিল।) জাফ্রাণ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য শিশুর মস্তকে লাগান চাই।

অতঃপর এই ঘটনার ২য় বর্ষে (৪র্থ হিজরীতে) ৪ঠা কিংবা ৬ই শা'বান রোয্ ছেঃশোম্বা (সোমবার)—আর এক রওয়ায়েত অনুযায়ী রবিয়ছছানী মাসে (হজরত এমাম) হোছায়েন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আকিকা ও ঠিক ঐ নিয়মেই সম্পন্ন হইয়াছিল। আছমাঃ (রাঃ—আঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি (হজরত এমাম) হোছায়েন (রাজিঃ)-কে 'হুজুর আক্‌দছ' (ছালঃ)-এর ক্রোড়ে 'লেটাইয়া' (শোয়াইয়া) দিলাম। হজরত (ছালঃ) তখন রোদন

করিতে ছিলেন। আমি আরজ করিলাম, এয়া রছুলোল্লাহ, (ছালঃ) আপনি কেন রোদন করিতেছেন? আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, অয়ি আছমা! আমার এই পুত্র (দৌহিত্র) অত্যাচারীর তরবারি-মুখে শহীদ হইবে। আমার ওম্মতের 'বাগী' (বিদ্রোহী) সম্প্রদায় ইহাকে হত্যা (শহীদ) করিবে। আল্লাহ্ তা-লার নিকট আমার 'শাফায়াত' ('ছোফারেশ'—মুক্তি প্রদান জন্য অনুরোধ) ঐ 'বদনছিব' (হতভাগ্য) লোকদিগের অদৃষ্টে ঘটিবে না। অয়ি আছমাঃ 'খবরদার' (সাবধান)! ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে একথা কিছুতেই বলিবে না। সে নব-প্রসূতি, এই হৃদয়-বিদারক সংবাদ শুনিলে সে শোকে অত্যন্ত অধৈর্য্য হইবে।

হজরত জাবের (রাজিঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে (বর্ণিত হইয়াছে), হজরত হোছায়েন (রাজিঃ)-এর 'আকিকা ৭ম দিনে সম্পন্ন হইয়াছিল, আর ঐ দিন তাঁহার খতনাঃ (ত্বকচ্ছেদ) ও হয়।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইয়াছেন, " যখন হাছন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিল, তখন আমি তাহার নাম 'হরব' (লড়াই-জঙ্গ—যুদ্ধ) রাখিলাম। পরক্ষণেই হজরত হুজুর ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) আমার গৃহে 'তশরিফ' আনিলেন (আগমন করিলেন), এবং ফরমাইলেন, আমার বেটাকে আমার নিকট আনয়ন কর। উহার কি নাম রাখা হইয়াছে? লোকেরা বলিল, হরব নাম রাখা গিয়াছে। হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, না, বরং হাছন নাম রাখা হউক। তৎপর যখন হোছায়েন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিল; তাঁহার নামও প্রথমে হরব রাখা হইয়াছিল। কিন্তু হুজুর (ছালঃ) তাঁহার নাম হোছায়েন (রাজিঃ) রাখিলেন। ইহার পর যখন মহছেন জন্মগ্রহণ করিল, আমি তাহার নামও হরব রাখিলাম, কিন্তু হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, না, ইহার নাম মহছেন

রাখা হইল। পরে হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি এই সকল বাচ্চার (শিশুর) নাম, হজরত হারুণ আলায়হেচ্ছালামের পুত্রদিগের নামানুসারে রাখিলাম ; তাঁহাদের নাম শব্বর (রাজিঃ), শব্বির (রাজিঃ) ও মশর (রাজিঃ) ছিল ; এব্রাণা (হিব্রু) ভাষায় ঐ তিন নামের আরবী অর্থ হাছন (রাজিঃ), হোছায়েন (রাজিঃ) ও মহছেন (রাজিঃ)।

রেওয়ায়েত আছে, হাছন (রাজিঃ) ও হোছায়েন (রাজিঃ) 'আহ্‌লে জন্নতের' (বেহেশ্‌ত্‌ বা মোছলেম-স্বর্গ বাসীর) নাম। আরবের 'যামানাঃ জাহেলিয়তে' (অসভ্যতা ও বর্ব্বরতার অন্ধকার যুগে) কাহারও এই নাম রাখা হইয়াছিল না। আর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত রেছালতমাব (ছালঃ), জ্যেষ্ঠ এমামের নাম হাছন ও কুনিয়েত আবু মোহাম্মদ রাখিয়াছিলেন ; আরবের অন্ধকার যুগে কাহারও এই নাম ছিল না। আর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী 'খোদাওয়ান্দ্‌ আলম' (সর্ব্বশক্তিমান্‌ আল্লাহ্‌ জল্লশানহু) হাছন ও হোছায়েন এই উভয় নাম 'মখলুক্‌' (সৃষ্ট জীব বা মানুষ) হইতে 'পুশিদাঃ' (গোপন) রাখিয়াছিলেন ; যখন এই দুই 'ছাহেবযাদাঃ' জন্মগ্রহণ করিলেন, ঐ সময় হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) ঐ নামদ্বয় ঘোষণা করিলেন। হজরত এমাম জাফর ছাদেক (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই উভয় নাম এমাম ভ্রাতৃযুগলের আকিকার দিন—অর্থাৎ জন্মগ্রহণের ৭ম দিবসে রাখা হইয়াছিল। হজরত আবু রাফেয় (রাজিঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, যখন হজরত হোছনায়েন (এমাম ভ্রাতৃ-যুগল [রাজিঃ]) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ), তাঁহাদের উভয় কাণে আযান দিয়াছিলেন।

হজরত ওম্মেলফজল (হজরত আব্বাছ রাজিঃ আল্লাহ আন্হুর সহ-ধর্ম্মিণী) ফরমাইয়াছেন, আমি হজরত নবী করিম (ছালঃ)-এর খেদমতে আরজ করিলাম, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, হুজুরের পবিত্র দেহের কোন অংশ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) আমার গৃহে আছে। তাঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আপনার স্বপ্ন খুব ভাল ; ফাতেমাঃ (রাজিঃ)-এর গৃহে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে ; আর আপনি তাহাকে দুগ্ধ পান করাইবেন। বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিলে, তিনি হজরত কুলছুম (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে, ওম্মোল ফজল (রাঃ—আঃ)-এর ও দুগ্ধ পান করিয়া ছিলেন ; আর স্বপ্নের 'তায়বির' (ফল) সফল হইয়াছিল।

হাকেম (রাজিঃ), হজরত জাবের (রাজিঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, জনাব হজরত রছুল করিম (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, প্রত্যেক মাতার পুত্রদিগের আছ্বাঃ (পিতার পক্ষ হইতে রেশ্তাদার) হইয়া থাকে ; কিন্তু হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পুত্রদিগের কেহ আছবাঃ নাই। আমি ঐ উভয়ের অলি এবং আছবাঃ (খছায়েছ কোব্রে-প্রণেতা এমাম জালালুদ্দীন ছেয়ুতি [রহঃ])।

হজরত এব্নে আব্বাছ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'এক মরতবাঃ' (একবার) জনাব হজরত রছুল খোদা (ছালঃ) স্বীয় 'দওলতখানাঃ' (বাসগৃহ) হইতে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে 'দোশ মবারকে' (স্কন্ধে) লইয়া তশ্রিফ্ আনিতেছিলেন ; পথিমধ্যে এক ব্যক্তি দেখিয়া ছাহেবযাদাঃকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ওয়াহ্ মিঞা ছাহেবযাদা ! তোমার 'ছওয়ারি' ত খুব ! তচ্ছ্রবণে হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) ফরমাইলেন, এ 'ছওয়ারি' (আরোহী) ও ত 'আচ্ছা' (উত্তম)।

এমাম হোছায়েন (রাজিঃ) শৈশবকালে একবার ছদকার একটি খেজুর লইয়া মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ঐ দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে 'টুকিলেন' (সাবধান করিলেন) এবং " কখ্ কখ্ " করিলেন,—ফরমাইলেন, তুমি কি জাননা, আমার খান্দানের কেহ ছদকা খায়না। এজন্যই ছৈয়দ বংশধরদিগের পক্ষে ছদকা ও খায়রাত গ্রহণ করা উচিত নয়, 'নযর' বা উপঢৌকন গ্রহণ করিতে পারেন।

আবদুল্লাহ্-বিন্-আবদুর রহমান-বিন্ যবির (রাজিঃ) বলেন যে, আহ্লে বয়েত নবুবীর মধ্যে এমাম হাছন (রাজিঃ), আঁ হজরত (ছালঃ) এর সহিত শারীরিক গঠনে, 'ছুরত শকলে' (অঙ্গ-সৌষ্ঠবে) বহুলাংশে 'মোশাবাহ্' (তুলনীয়) ছিলেন। হুজুর (ছালঃ) তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা 'পেয়ার' করিতেন (ভাল বাসিতেন—স্নেহ প্রদর্শন করিতেন)। আমি অনেক বার দেখিয়াছি, জনাব রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ) নমাযে ছেজদায় থাকিতেন, ঐ সময় এমাম হাছান (রাজিঃ) আসিলে তাঁহার উপর ছওয়ার হইয়া যাইতেন। অনেক সময় এমনও হইত যে, হুজুর (ছালঃ) যদি রুকুতে হইতেন, ত এমাম হাছন (রাজিঃ) তাঁহার পবিত্র পদদ্বয় লেপ্টাইয়া ধরিতেন। হুজুর (ছালঃ) পা 'ফয়লাইয়া' (বিস্তৃত করিয়া—প্রসারিত করিয়া) দিতেন, উদ্দেশ্য যাহাতে তিনি অন্য দিক্ দিয়া বাহির হইয়া যান।

ছহি বোখারী গ্রন্থে য়োক্‌বাঃ-বিন্-হারেছ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক 'মর্ত্তবাঃ' (একবার) জনাব হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) আছরের নমায্ আদায় করিয়া, হজরত আলী মরতুজাঃ (কঃ—ওঃ)-এর 'হামরাহ্' (সঙ্গে) মছজেদ হইতে বাহির হইলেন ; পথিমধ্যে এমাম হাছন (রাজিঃ) বালকদিগের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন ; তিনি

(হজরত ছিদ্দিক আকবর [রাজিঃ]), তাঁহাকে তুলিয়া স্কন্ধে লইলেন ; এবং বলিতে লাগিলেন, এই বালক ত 'ছুরতে' ও 'শকলে' (আকার প্রকারে ও শারীরিক গঠনে) হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ)-এর অনুরূপ ; হে আলি ! আপনার ছুরত-শকলের সঙ্গে ইহার ছুরত-শকল (আকার প্রকার) মিলিতেছে না। হজরত আলী (রাজিঃ) একথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

জামেয় তিরমযিতে বর্ণিত আছে যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) মস্তক হইতে 'ছিনায়' (বক্ষঃদেশ) পর্য্যন্ত, আর এমাম হোছায়েন (রাজিঃ) বক্ষঃস্থল হইতে পবিত্র পা-মবারক পর্যান্ত, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন।

হজরত আবু হোরেরাঃ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যখন আমি এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে দেখিয়া থাকি, তখন 'ফর্‌তে মোহব্বতে' (স্নেহ-ভালবাসায়) আমার অশ্রুপাত হইতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, এক দিবস জনাব হজরত ছরওয়রে আলম (ছালঃ) স্বীয় 'দওলত খানাঃ' (বাসগৃহ) হইতে বাহির হইলেন, আর মছ্‌জেদে আগমন করিলেন ; এবং আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক একদিকে গমন করিতে লাগিলেন ; 'এহাঁতক' (এই পর্য্যন্ত) যে, আমরা বনি কেন্‌কার বাজারের রাস্তায় মছ্‌জেদ নববীতে পঁহুছিলাম ; পথিমধ্যে একস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক তিনি ফরমাইলেন, আমার বেটাকে ডাকিয়া আন। ইতিমধ্যে এমাম হাছন (রাজিঃ) সেখানে দৌড়িয়া আসিলেন ; এবং আসিয়াই হুজুরের ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। হুজুর (ছালঃ) পুনঃ পুনঃ স্বীয় পবিত্র মুখ তাঁহার মুখে স্থাপন পূর্ব্বক বলিতেছিলেন, খোদাওয়ান্দ্‌ ! আমি ইহাকে 'পেয়ার' করি (স্নেহকরি—ভালবাসি) ; আর যে কোনও ব্যক্তি ইহাকে পেয়ার করে, তাহাকেও আমি প্রিয় জ্ঞান করি।

হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ফরমাইয়াছেন যে, আমি হজরত নবী ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লামকে ইহা ফরমাইতে শুনিয়াছি যে, (ঐ সময় (এমাম) হাছন (রাজিঃ) তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়াছিলেন, তখন) তিনি এক একবার লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ছিলেন, আর এক একবার তাঁহার (এমাম হাছন [রাজিঃ]-এর) প্রতি দেখিতেছিলেন, আর ফরমাইতেছিলেন, এটী আমার বেটা ও ছরদার ; আশা করি আল্লাহ তা-লা ইহার দ্বারা মোছলমানদিগের দুই দলের মধ্যে 'ছোলেহ্' (সন্ধি) করাইয়া দিবেন।

আছামাঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ) হজরত নবী ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, তিনি আমাকে (আছামাঃ [রাজিঃ]-কে) ও এমাম হাছান (রাজিঃ)-কে ক্রোড়ে লইতেন, এবং ফরমাইতেন, হে " আল্লাহ্ ! আমি এই উভয় বালক্কে দোস্ত (প্রিয়) রাখি ; তুমিও ইহাদিগকে দোস্ত (প্রিয়) রাখিও।"

হজরত আনছ-বিন্-মালেক (রাজিঃ) বলিয়াছেন, ওবায়দুল্লাহ-বিন্-যেয়াদের সম্মুখে এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর 'ছের' (মস্তক) মবারক আনিয়া এক 'তশ্তে' (থালা বা বাসনে) রাখা গেল। এব্নে যেয়াদ তাঁহার পবিত্র চক্ষে ও নাকে বেত্র দ্বারা আঘাত করিতেছিল ; আর তাহার 'খুব ছুরতি (সৌন্দর্য্য) সম্বন্ধে কিছু বলিতে (বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে) ছিল। হজরত আনছ (রাজিঃ) বলিলেন, ইঁনি সর্ব্বাপেক্ষা রছুল খোদা (ছালঃ)-এর 'মোশাবাহ্ঃ' (আকার বিশিষ্ট বা নমুনা স্বরূপ) ছিলেন। হজরত এমাম হোছায়ন (রাজিঃ)-এর চুলে এবং দাড়িতে খেজাব লাগানো ছিল (সম্ভবতঃ মেহেন্দীর খেজাব হইবে)।

হজরত বরাঃ (রাজিঃ) বলিয়াছেন, আমি হজরত নবী করিম (ছালঃ)-কে দেখিয়াছি, একদা হজরত এমাম হাছন এব্নে আলী

(রাজিঃ) তাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে ছিলেন ; তিনি সেই অবস্থায় ফয়মাইতে ছিলেন,: " আয় আল্লাহ্ ! আমি ইহাকে দোস্ত্ রাখি ; আর তুমিও ইহাকে দোস্ত্ রাখ। "

হজরত এব্নে ওমর (আবতুল্লাহ্-বিন্-ওমর—[রাজিঃ]) বলেন যে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) বলিতেন, হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর 'রেযামন্দি' (রাজী থাকা—সন্তুষ্ট থাকা) তাঁহার আহ্লে বয়েতের (পরিবারস্থ নরনারীর) 'খেদমত' ও 'মহব্বত্' (পরিচর্য্যা ও ভালবাসা)—ইহা বুঝিয়া লও।

হজরত আনছ (রাজিঃ) বলিয়াছেন, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) অপেক্ষা, হজরত নবী ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওছাল্লামের 'মশাবাহ' (আকৃতির আদর্শ—শারীরিক গঠনের নমুনা) আর কেহই ছিলেন না।

এব্নে আবি নয়ীম (রাজিঃ) বলিয়াছেন, আমি হজরত আবতুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ)-এর মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার নিকট কোনও ব্যক্তি মোজরেমের (অপরাধীর) বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ঐ মক্ষিকে যদি কতল (হত্যা) করা যায়, তবে তাহা কেমন হয় ? হজরত আবতুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ) উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, 'আহ্লে এরাক' (এরাকবাসী) মক্ষি এর 'কতল' (হত্যা) এর মছলা জিজ্ঞাসা করিতে-ছিল, কিন্তু তাহারাই হজরত রছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়াছাল্লামের ছাহেবযাদীর পুত্রকে 'কতল' (হত্যা) করিয়াছিল। আর হজরত নবী (ছালঃ) ফরমাইয়াছিলেন, ইহারা উভয়ে (এমাম ভ্রাতৃ-যুগল) আমার দিনের 'আরায়েশ্' (সৌন্দর্য্য)—(ছহীহ্ বোখারী)।

সুকবি মাওলানা ছিমাব ছিদ্দিকীর একটী উর্দ্দু কবিতা।

তরবিয়ত্ আওলাদ কি হোতি হ্যায় মাঁ-কি গোদ মেঁ,
মক্তব আউওল হ্যায় মাঁ কি গোদ ওছমে শক নেহিঁ।
ছৈয়দাঃ দেতিথি জেয়ছি তর্‌বিয়ত্ আওলাদ কো;
আজ দুন্‌ইয়া মেঁ নেহি পয়দা নজীর ওছ্‌কি কহিঁ।
জব ছোলাতি থি কভি উওহ্ শব্বর (১) ও শবীর কো;
আয়েতেম্ম পড়হ্‌তে কালামে পাককী বাছদ একীন।
ঝুটে ছাচ্চে ওন্‌কো আফ্‌ছানে নাঃ বিলকুল য়্যাদ থে;
লোরিয়াঁ ওন্‌কে কালামে পাক কী আয়াত থিঁ।
উওহ্ ডরাতি থিঁ তো পড়্‌হতি থিঁ উওহ্ আয়াতে পাক;
আওর ছমঝাতেঁ তো করতিঁ ওর্‌দে আয়াতে মবিন।

এক দেন্ শব্বির ও শব্বর মে লাড়ারী হোগয়ী;
আয়ে দোনো চিথ্‌তে রোতে মচ্‌লতে বেকারার।
ফের শেকায়েত্ দোছরী ভাইকী কী এক ভাই নে;
দেখ্‌হো আম্মাজান মারা হ্যায় হামেঁ বে-এখ্‌তেয়ার।
আপনে দোনুঁকো পহ্‌লে ছরছরি তছকিন দি;
ফের কাহা "বাচ্চু নহি থওফে খোদা কেয়া যিন্‌হায়?"
উওহ্ তো কহ্‌তা হ্যায় কে আপছমে লড়ো ঝগড়ো নাঃ তোম,
আওর করো বরপা নাঃ ফেত্‌নে লড়্-ঝগড় কর বার বার।

(১) হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ); (২) হজরত এমাম হোছায়ন (রাজিঃ)।

এছ্‌ছে কুচ্‌ মত্‌লব নেহী তোম্‌মেছে হ্যায় কেছকী খাতাঃ ;
হাঁ মগর আল্লাহ্‌কে তোম্‌ হো গয়ো তক্‌ছির ওয়ায় ।
আব্‌ বাতাও, দোগে কেয়া আল্লাহ কো এছ্‌কা জওয়াব ;
তোম্‌ছে জব্‌ পুছহেগা উওহ্‌ এছ্‌কা ছবব রোষে শোমার ।

মাঁকে কহ্‌নেকা আছর বচ্চঁুকি দেল্‌পর হো গেয়া ;
ভুল্‌ বয়ঠে আপ্‌নে তুক্ষ্‌, খওফে খোদাছে রো দিয়ে ।
কাঁপ ওঠ্‌ঠা জেছম্‌, লরযাঃ ছারে আযামে পড়া ;
রো চুকে—তো ফাতেমাঃ যোহরা ছে ইউ কহ্‌নে লাগে ।
ইয়েহ্‌ খাতা বেশক্‌ হুয়ী হাম্‌ নায়্‌তরফ হাঁয় আওর খজল ;
আব্‌ তো ইয়েহ্‌ তক্‌ছির হক্‌ছে আফু করওয়া দিজিয়ে ।
হোগী আয়েন্দাঃ নাঃ হাম্‌ছে আব্‌ কভি এয়ছি খাতা ;
বায্‌ আয়ে ডয়গয়ে হাম্‌ খওফ্‌ আল্লাহ্‌ কে ।

আপ্‌নে ফরমায়া—আচ্ছা জল্‌দ্‌তর কর লো ওজু ;
আব্‌ তোম্‌হে খোশ্‌ নোদয়ী মওলা আগার দরকার হ্যায় ।
ফের করো ছেজদাঃ দোওয়া মাঙ্গো কেঃ এয়া রব্বে গফুর ;
আফুকর্‌ দে ইয়েহ্‌ খাতাঃ তু, তু বড়া ছত্তার হ্যায় ।
উওহ্‌ বড়া হ্যায় রহম ওয়ালা উওহ্‌ বড়া হ্যায় মেহেরবান ;
আফু কার্‌ দেগা খাতা, ওছ্‌কি বড়া ছর্‌কার হ্যায় ।
আলগয়্‌য ছেজদাঃ মেঁ দোনো শাহ্‌যাদে গের পড়ে ;
আওর কাহা " এয়ারাব্বে আগ্‌ফের্‌লি কেঃ তু গফ্‌ফার হ্যায় ।
ছৈয়দাঃ ভি ছাত বাচ্চঁুকে থিঁ মছ্‌রুফে দোওয়া ;
হ্যায় মোয়ছর ইয়েহ্‌ রহে তাদিব কো দেশ্‌ওয়ার হ্যায় ।

বাচ্চেওয়ালী বিধিবয়ো! তক্‌লিদ কর্‌নি চাহিয়ে;
ইয়েহ্‌ তরিকে আহ্‌লে বায়্‌তে আহ্‌মদে মোখ্‌তার হ্যায়।

উপরোক্ত প্রসিদ্ধ কবির লিখিত আর একটি কবিতা (কনিষ্‌ যোহরা (রাঃ—আঃ))

নোরতজে কো হজরত বুবকর নে দি এক কনিষ্‌;
খুব ছুরত খুব ছিরত খোশ্‌ তবিয়ত খোশ্‌ জামাল।
ফাতেমা কো জব হুয়া মালুম ছারা ওয়াকেয়া;
আপ্‌কে দেল্‌কো হুয়া ফর্‌তে মহব্বতছে মলাল।
ওস্মে এমিন আয়ি বয়ঠি, আওর পুছহা—ছৈয়দাঃ;
কেউঁ তবিয়ত ছোছ্‌ত হ্যায় চেহরা কেউঁ গম্‌ছে নড্‌হাল।
টাল্‌ কর্‌ খাতুনে জন্নত ছেপায়্যা রাযে দেল;
ওস্মে এমিন কো হুয়া এছ ওয়াজে হছে ছদমাঃ কামাল।
আওর কাহা কোরবান জায়েঁ মেরে মাঁ বাপ আপ্‌পর;
বেছবব কেউঁ আপ্‌নে মুঝে ছেপায়া দেল্‌কা হাল।
খোদ রছুলোল্লাহ্‌ কাহ্‌দেতেথে মুঝ্‌ছে হালে দেল্‌;
রায্‌দারি ছরওরে কওনায়েন হোঁ আয় খোশখ্‌ খ্ছাল।
কহিয়ে কহিয়ে হালে দেল্‌ আওর মন্‌ ও আন কহ্‌হ ডালিয়ে;
কেয়া আজব দেল্‌ছে তোম্‌হারে ধো ছকোঁ গর্‌দে মলাল।

কর্‌দিয়া ছব্‌ ছৈয়দাঃ নে ওস্মে এমিন পর আয়ান ;
আপ্‌নি শওহর আওর কনিযে নও রছিদাঃ কা খেয়াল।
ওস্মে এমিন লে গেঁয়ে তশরিফ্‌ নয্‌দে মোরতযেঃ ;
আওর দর পর হোকে এস্তেদাঃ কুচ্‌ এয়ছি কী মকাল।
এয়া আলি, রাখ্‌তে থে আহ্‌লে বয়েতকো হজরত আযিয্‌ ;
আপ্‌নে কেওঁ ফাতেমাঃকে ছর পঃ ডালা হ্যায় ওবাল।
আপ্‌কো লাযেম থি দেলজোয়ী বতুলে যার কি ;
এক্‌হিতো উওহ্‌ রছুলোল্লাহ্‌ কী হ্যায় নওনেহাল।
আল্‌গরজ শেরে খোদানে পুছ্‌হি ওজেহ্‌ রঞ্জ্‌ ;
ওঠ্‌কে হো বয়ঠে, ছোনা জব ওস্মে-এমিন কা ছওয়াল।
ওস্মেএমিন নে কেনায়্যামে কাহে ছব্‌ ওয়াকেয়াত ;
এয়ীনে যোহরাঃ কো কনিয্‌ নওকা হ্যায় বেহদ খেয়াল।
বোলে হায়দর, ওস্মে এমিন ! উওহ্‌ নেহী মেরি কনিয্‌ ;
খাদেমাঃ যোহরাঃ কি হ্যায় বে পশ ও পছ বে কিল ও কাল।
খাদেমাঃ জব্‌ ওন্‌কি হ্যায় উওর উওহ্‌ নেহী মেরি কনিয্‌ ;
তোম্‌ ওন্‌হিছে পুছ্‌না, কেউকর হুয়ী মুঝ্‌ পর মলাল্‌।
মায়ঁ দেল যোহরা কো ছদমাঃ দোঁ ইয়েহ্‌ হো ছেক্‌তা নেহিঁ ;
ওস্মে এমিন ! হ্যায় মুঝে উন্‌ছে ছওয়া ওন্‌কা খেয়াল।

১০ দশম হিজরীতে হুজুর ছরওয়ারে কায়েনাত্‌ (ছালঃ) মদীনার পার্শ্ববর্ত্তী সমুদয় জাতি ও সম্প্রদায়কে এতলাঃ (সংবাদ) দিলেন যে, আমি হজ্জ্‌-যাত্রার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছি ; যাহার যাহার এই পবিত্র ফরজ কার্য্য সম্পাদনের ইচ্ছা হয় ; তাহারা আমার সঙ্গে গমন কর। ঘোষণা প্রাপ্তে অসংখ্য জনসঙ্ঘ মদীনা-মনুওরায় আসিয়া সমবেত

হইলেন। ২৫শে যিকাদাঃ (যেল্কদ) সোমবার দিন হুজুর (ছালঃ) 'গোছল' (স্নান) করিয়া :শরীরে সুগন্ধি (আতরাদি) লাগাইলেন। ধৌতবস্ত্র পরিধান করিলেন। তৎপরে বাদ জোহরের নমায্, 'তরিক্ক্ ওস্ত্' অর্থাৎ শজরার রাস্তায় " যোল-হুলিফাঃ " নামক স্থানে পঁহুছিলেন। এই হজ্জ্ যাত্রায় সমুদয় 'আয্ওয়াজ মতহরাত' (আঁ হজরতের আহ্লিয়া অর্থাৎ মোছলেম-মাতা)-গণ উষ্ট্রের হোদজে (হাওদায়) আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। বিপ্লববাদী দিগের দমন জন্য হজরত আলী শেরে খোদা (ক—ওঃ) ইতিপূর্ব্বেই এমনে গমন করিয়া ছিলেন, তাঁহাকে সেইস্থানে সংবাদ পাঠান হইল যে, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), শেরে খোদা (কঃ—ওঃ)-এর অনুপস্থিতিতেই স্বীয় ওয়ালেদ বোযরগোয়ার (মহাসম্মানিত পিতার) সমভিব্যাহারে হজ্জের নিয়েত করিয়া উষ্ট্রের হোদজে আরোহণ পূর্ব্বক মক্কা-মোয়াজ্জমায় আগমন করিতেছেন। তাঁহারা পথিমধ্যে (মক্কা-মোয়াজ্জমার অতি নিকটে)—যে স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন ; হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও এমন হইতে রওয়ানা হইয়া ঐস্থানে আসিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর কাফেলায় সম্মিলিত হইলেন ; তিনি এমন হইতে কতিপয় উষ্ট্র আঁ হজরত (ছালঃ)-এর জন্য 'হাদিয়াঃ' (নজর) স্বরূপ আনিয়াছিলেন।

হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ), হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), হজরত আলী শেরে খোদা (কঃ—ওঃ) স্ব স্ব হাদিয়াঃ (কোরবাণীর পশু) সঙ্গে আনিয়াছিলেন। কিন্তু ওম্মেহাতল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) ও হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে কোরবাণীর কোনও পশু ছিল না। এজন্য জনাব বতুল (রাঃ—আঃ) এহ্রামের বাহির হইয়া 'মোহেল' হইয়া গেলেন।

হজরত শেরেখোদা (কঃ—ওঃ) যখন তাঁহাকে রঙ্গিণ কাপড় পরিহিত এবং চক্ষে 'ছোরমাঃ' (সুর্ম্মা) লাগান অবস্থায় দেখিলেন, তখন নিতান্ত নারাজী (অসন্তুষ্টি) প্রকাশ করিলেন। জিজ্ঞাসার উত্তরে হজরত বতুল (রাঃ—আঃ) বলিলেন, আমাকে আমার ওয়ালেদ বোযরগোয়ার (ছালঃ) এহ্‌রাম ভাঙ্গিবার অনুমতি দিয়াছেন। আর আপনার আগমন সংবাদ পাইয়া আমি 'যিনতের' (সাজ-সজ্জা ও শৃঙ্গারের) বন্দোবস্ত করিয়াছি; শরীরে সুগন্ধি লাগাইয়াছি, এবং নূতন ও রঙ্গিণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছি। তচ্ছ্রবণে হজরত শেরেখোদা (কঃ—ওঃ), হজরত ছরওয়ারে আলম (ছালঃ)-এর খেদমতে এবিষয়ের 'শেকায়েত' (অভিযোগ) করিলেন; এবং বলিলেন, তিনি (হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ) আপনার আদেশানুসারে ইহা করিয়াছেন, বলিয়া বলিতেছেন। হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, হাঁ, সে সত্য কথাই বলিয়াছে।

হজরত আলী মরতুজা (কঃ—ওঃ) এপর্য্যন্ত এহ্‌রামের অবস্থায়ই ছিলেন; তিনি এমন হইতে কোরবাণীর জন্য যে উট আনিয়াছিলেন, জনাব রেছালতমাব (ছালঃ)-এর সঙ্গে মিলিয়া 'বচ্ছা' (বড়শা বা বল্লম) ধারণ করিলেন, এবং উষ্ট্র 'নহর' (কোরবাণী) করিলেন। কোরবাণী কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পয়গম্বর খোদা (ছালঃ), 'খচ্চর' (অশ্বতর) এ আরোহণ করিলেন, এবং শেরেখোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে স্বীয় পশ্চাদ্ভাগে বসাইয়া লইলেন।

হজ্জ "আল্‌বেদা" হইতে অবসর হইয়া জনাব রছুল খোদা (ছালঃ) 'খম-গদর' নামক স্থানে 'মঞ্জেল' (গমন) করিলেন; আর জোহরের নমাযের পর "মযশ্‌রল মোছলেমিন" (হজ্জ-প্রার্থী)-দিগের সম্মুখে (যাঁহাদের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ছিল), একটি হৃদয়োন্মাদিনী ওজস্বিনী 'খোত্‌বা পাঠ' (বক্তৃতা প্রদান) করিলেন। সেই খোত্‌বায় ইহাও

ফরমাইলেন যে, আমি সত্বরেই দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিব; তোমাদের মধ্যে 'দো-চিয্' (দুইটি জিনিষ) রাখিয়া যাইতেছি—যাহার 'য়েয্যত' (সম্মান) একজনকে অপর জনা হইতে অধিক পরিমাণে করা 'লাযেম' (কর্ত্তব্য)। (১) কোরআন মজীদ ; আর (২) আমার নিজের 'আওলাদ' (বংশধর)—অর্থাৎ (হজরত) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ও তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ। ইহাদের প্রতি সীমাতীত 'এহ্তেরাম' (সম্মান) প্রদর্শন করিবে। এন্শাল্লাহ ইহারা পরস্পর 'জুদা' (স্বতন্ত্র) হইবে না। এ উভয়ের মধ্যে 'এত্তেহাদ' (একতা—সম্মিলন) থাকিবে। কেয়ামতের দিন ইহারা উভয়ে 'হাওজ-কওছরে' আমার সঙ্গে সম্মিলিত হইবে। খোদাওয়ান্দ্ তা'লা আমার 'মাওলা' (প্রভু), আর আমি প্রত্যেক দিনদার ব্যক্তির ওলী। তৎপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তধারণ পূর্ব্বক এরশাদ ফরমাইলেন, আমি যাহার ওলী, আলী ও তাহার ওলী। হে পরম করুণাময় খোদাওয়ান্দাঃ! আলী (কঃ—ওঃ) যাহার ওলী হইবে, তুমি তাহার 'মহাফেজ' (তত্ত্বাবধায়ক) ও 'নেগাহ্বান' (রক্ষক—প্রহরী) থাকিও। আর যে ইহার সঙ্গে 'আদাওত' (শত্রুতা) রাখিবে, উহার প্রতি কেয়ামত পর্য্যন্ত 'গযব' (ক্রোধাগ্নি) বর্ষণ 'নাযেল' (অবতীর্ণ) রাখিবে।

ফদকের মোয়ামেলা।

হজরত বিবী ফাতেমাঃ যোহরাঃ 'খাতুনে মহশর', হজরত রেছালমাব (ছালঃ)-এর ছাহেবযাদী (দুহিতা-রত্ন) ছিলেন। 'শাফেয়ে রোয

মহশর' (হাশরের দিনের ছোফারেশ কারী—পাপ মোচনের জন্য আল্লাহ তা-লার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনাকারী)—অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্ মদ মোজ্ তবা (ছালঃ)-এর কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিলেন নাঃ এজন্য হুজুর (ছালঃ) এই কন্যা-রত্নের প্রতি পুত্র সন্তানের ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। তজ্জন্য সকল মোছলমানই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান দেখাইতেন। ইহা অবশ্য আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আছরের 'ছবব' (কারণ) ছিল। কোরেশগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন ; হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে স্বর্গ-রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরা (রাঃ—আঃ)-এর পবিত্র বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া, তাঁহার (শেরেখোদা হজরত আলীর) 'ফখরের' (গৌরবের) অন্যতম কারণ ছিল। একথা 'মশহুর' (প্রসিদ্ধ) আছে যে, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর প্রভাবেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ছয় মাস পর্য্যন্ত ১ম খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর হস্তে বায়্ য়েত করিয়াছিলেন না ; আর যখন বিন্তে রছুল (পয়গম্বর-নন্দিনী)-এর পরলোক প্রাপ্তির পর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর 'তাকত' (শক্তি), 'কুওত' (বল) এবং আছর (প্রভাব) কম হইয়া গেল, তখন তিনি মহামান্য প্রথম খলিফার হস্তে বায়্ য়েত করিলেন। বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক-সিদ্ধান্ত অনুসারে এই কথাটি 'গলৎ' (ভুল—ভ্রমপূর্ণ) ; কারণ হাদীসবেত্তা ও ইতিহাসবেত্তাদিগের সত্যানুসন্ধানে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আঁ হজরত (ছালঃ) এর পরলোক গমন এবং হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ গ্রহণের অতি অল্পকাল পরেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মহামান্য খলিফার হস্তে বায়্ য়েত করিয়াছিলেন। তবুও উপরোক্ত রওয়ায়েত অনুসারে এবিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায় যে, তদানীন্তন ছাহাবাঃ কারাম

(রাজিঃ)-গণও মোছলমান জন-সাধারণ, স্বর্গ-রাজ্ঞী হজরত বতুল (রাঃ—আঃ)-এর জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি কিরূপ অসাধারণ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন ; এই ১৩ শত বৎসর মধ্যে মোছলমানদিগের মধ্যে শত শত বিভিন্ন মতবাদের ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইলেও, আজ পর্য্যন্ত কোনও সম্প্রদায়ই—তা তাহারা যে মজহাবাবলম্বীই হউক না কেন, হজরত খাতুনে জন্নত ও খাতুনে মহশর (রাঃ—আঃ)-এর প্রতি কোনও রূপ বেআদবী এবং অভক্তি প্রদর্শন করে নাই। ইহাও খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর এক আশ্চর্য্য মওজেষাঃ ও অপূর্ব্ব কারামত যে, এই সুদীর্ঘ তেরশত বৎসরের ঊর্দ্ধকাল হইতে তিনি প্রত্যেক মনুষ্যের 'গোস্তাখানা কালাম' (বে-আদবী-সূচক বাক্য) হইতে 'মোবর্‌রা' (বিমুক্ত) রহিয়াছেন। আর এনশাল্লাহ্ কেয়ামত পর্য্যন্ত এইরূপ নিন্দাবাদের অতীত অর্থাৎ বিমুক্ত থাকিবেন। যদি হজরত কাছেম (রাজিঃ) কিংবা হজরত এবরাহিম (রাজিঃ) জীবিত থাকিতেন, তবে হয় ত তাঁহার (হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ [রাঃ—আঃ]-এর) প্রতি হজুর (ছালঃ)-এর স্নেহ ও ভালবাসার মাত্রা হ্রাস পাইত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ইহা ইচ্ছা ছিল না ; তিনি 'রোযে আযল' (অদৃষ্ট-লিপি নির্দ্ধারণের দিন), 'ফখ্‌রে দোজাহান' (হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্‌মদ মোজতবা [ছালঃ]) স্বীয় পূর্ণ 'মোহাব্বত' (স্নেহ-ভালবাসা)-এর সম্পূর্ণ অংশ হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে দিয়াছিলেন। এই অতুলনীয় ও অখণ্ড স্নেহ-ভালবাসার কোনওরূপ 'তক্‌ছিম' (ভাগ-বাটওয়ারা) হইবার উপায় ছিল না।

ফদকের হেবাঃ (দান) ও 'মিরাছ' (মৃত ব্যক্তির মাল—যাহা উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্ত হন)-এর 'মছলাঃ' বা আলোচ্য বিষয় এমন গুরুতর ব্যাপার ছিল না, যেরূপ গুরুত্ব ইহাকে দেওয়া হইয়াছে। আঁ হজরত

(ছালঃ)-এর জীবনের এই একটি ব্যাপার—যাহাতে মোছলমানদিগের মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি হইয়া মহামতভেদের সৃষ্টি করিয়াছে; এবং এক সম্প্রদায় ইহার গুরুত্ব বাড়াইতে বাড়াইতে সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক বিষয়টিকে একটী মহাজটিল সমস্যায় পরিণত করিয়াছে। এই সামান্য ব্যাপারটিকে একটা ভয়ানক ব্যাপার বলিয়া প্রধানতঃ শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা বহু কেতাব লিখিয়াছেন, এবং অযথা কাগজ ও কালী খরচ করিয়াছেন। ফদক একটি ক্ষুদ্র পল্লী; যাহা খয়বর যুদ্ধ হইতে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার হস্তগত হইয়া, তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছিল; মহামান্য পিতার ত্যজ্য সম্পত্তি বলিয়া হজরত বিবী ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) প্রথমে তাহা দাবী করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ১ম খলিফা হজরত সিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) এই বলিয়া তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য করেন যে, আম্বিয়া আলায়-হেচ্ছালাম দিগের মিরাছ তাঁহাদের উত্তরাধিকারী দিগের মধ্যে ভাগ-বণ্টন হয় না; উহা সাধারণের সম্পত্তিতে পরিগণিত হয়। প্রকৃত ব্যাপার এইটুকুই হইবে; কিন্তু ইহা লইয়া হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং মহামান্য খলিফা বা তাঁহার মত সমর্থনকারী প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ) যথা :— হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) প্রভৃতির মধ্যে কোনও রূপ মনোবাদ হইয়াছিল না। যদি তাহাই হইত, তবে প্রামাণ্য ইতিহাসে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ থাকিত। হাদীছ বর্ণনাকারী বিজ্ঞ ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ তাহা রওয়ায়েত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। খাতুনে জন্নত হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) পার্থিব অর্থ ও ঐশ্বর্য্য-সম্পদের আকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন না। তবে পিতার ত্যজ্য সম্পত্তিতে তাঁহার হক্ আছে বলিয়া তিনি ফদকের দাবী করিয়াছিলেন; ১ম খলিফা মহাপ্রাজ্ঞ হজরত আবুবকর ছিদ্দিক

(রাজিঃ)-এর যুক্তি-সঙ্গত উক্তি, আঁ হজরতের বর্ণিত হাদীছ শুনিয়া তিনি আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও এ বিষয়ে কোন বাড়াবাড়ি করেন নাই। মহামান্য খলিফার সঙ্গে তাঁহার কিছুমাত্র মন কষাকষি হইয়াছিল না। তিনি মহামান্য খলিফার মন্ত্রণা-সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্রত্যেক গুরুতর রাজনীতিক বিষয়ে, শরিয়তের বিধি-ব্যবস্থায় তিনি তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। তিনি অনেক সময়ই মহামান্য খলিফার মহা দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। এ ব্যাপারে হজরত ফারুক আজম (রাজিঃ)-এর প্রতি হজরত শেরেখোদা (কঃ—ওঃ)-এর, অধিকতর মনোবাদ হওয়া সম্ভবপর ছিল ; কারণ তিনিই মহামান্য আমিরুল মুমেনিন-খলিফাতুল মোছলেমিনের প্রধান মন্ত্রী স্বরূপ কাজ করিতেন ; এবং তাঁহার প্রধান পরামর্শ-দাতা ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার প্রতি হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ)-এর এতটা বাধ্য-বাকতা ও সহানুভূতি ছিল যে, তিনি তাঁহাকে স্বীয় কন্যা-রত্ন দান করিয়া, তাঁহাকে জামাতা রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং শিয়াদিগের এই বাড়া-বাড়িটা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বর্গ-রাজ্ঞী হজরত বিবী ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) যদি অর্থ ও ঐশ্বর্য্য সম্পদের আকাঙ্ক্ষিনী হইতেন, তবে পৃথিবীর বিপুল ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের দ্বার তাঁহার জন্য খোলা ছিল ; কিন্তু তিনি উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সর্ব্বদা উপেক্ষার চক্ষেই দেখিতেন। স্বীয় জীবনে কখনও ঐশ্বর্য্য-সম্পদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই। মহামান্য ওয়ালেদ মাজেদের পবিত্র উপদেশাবলী তাঁহার পাক হৃদয়-ফলকে গভীরভাবে অঙ্কিত ছিল ; সে অনুপম স্বর্গীয় উপদেশাবলী তিনি জীবনে কখনও বিস্মৃত হন নাই।

খাতুনে জন্নত হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'ছবর', 'শোকর'—ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার কোনও সীমা পরিসীমা ছিল না। তারপর

খোদাপরস্তির ত কোন তুলনাই নাই। দুনিয়াবী লোভ-লালসা তাঁহার মধ্যে কিছুমাত্র দেখা যাইত না। তিনি ত দরিদ্রতাকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। মহামাননীয় পিতার অমূল্য উপদেশাবলী তাঁহার হৃদয়-ফলকে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত ছিল। তাঁহার দানের হস্ত এত প্রসারিত ছিল যে, কোন 'ছায়েল' (ভিক্ষুক) তাঁহার দরওয়াজা হইতে কখনও রীক্ত হস্তে ফিরিয়া যায় নাই; তিনি নিজে অনাহারে থাকিয়া ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি এক টুকরা সামান্য যমিনের জন্য যে মহামান্য খলিফার আদালতে দৃঢ়তার সহিত অভিযোগ উপস্থিত করিবেন, সামান্য জ্ঞানেও ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। পরম ভক্তি-ভাজন ওয়ালেদ মাজেদের এন্তেকালে (পরলোক গমনে) তিনি এমনই শোকাকুলিত হইয়াছিলেন যে—অন্য ভাবনা, অন্য চিন্তা, অন্য খেয়াল তাঁহার মধ্যে আদৌ ছিল না। তিনি শোকার্ত্ত হৃদয়ে অনবরত নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। 'দুনিয়াবী' (পার্থিব) চিন্তা বা খেয়াল সেই সময় মধ্যে তাঁহার ভিতর আত্ম-প্রকাশ করিবার কোন সুযোগই লাভ করে নাই। তিনি যে একবার ফদকের জন্য দাবী করিয়া ছিলেন; তাহা এছলামী শরিয়তের—উত্তরাধিকারী-বিধানের সাধারণ নিয়মানুসারেই করিয়া থাকিবেন; কিন্তু মহামান্য খলিফা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগের উক্তি অনুসারে যখন তিনি জানিতে পারিলেন, পয়গম্বর দিগের সম্পত্তির কেহ উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, উহা সাধারণের সম্পত্তি; তখন আর দ্বিরুক্তি বা উচ্চবাচ্য করেন নাই। ঐতিহাসিক হিসাবে এই টুকুই সত্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শিয়া ছাহেবান ইহাতে রং চড়াইয়া ব্যাপারকে অত্যন্ত গুরুতর ও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন; কাজেই ছুন্নত জামাতের আলেমদিগকেও উহার উত্তর দিতে গিয়া অনেক কথা বলিতে হইয়াছে—

অনেক দলিল ও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। শিয়া ছাহেবদিগের উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, মহামাননীয়া খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-কে অতি লোভী, অতি স্বার্থপর, অতি ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ বিশিষ্টা, পার্থিব সুখ-সম্পদের প্রতি একান্ত লালসা-সম্পন্না প্রভৃতি সাধারণ[illegible] যুক্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তিনি এই সকল দোষ হইতে সম্পূর্ণ পাক (পবিত্র) ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ঐ সকল বিষয়ের খেয়াল মনে স্থান দেওয়া ও জীবন্ত পাপ। ইহা দ্বারা তাঁহার পবিত্র চরিত্রে দোষারাপ করা হয়। খোদা মোছলমান মাত্রকেই ঐ সকল অযথা ধারণা হইতে দূরে রাখুন।

ফদক কোথায় অবস্থিত ?

"কামুছ" নামক বিখ্যাত আরবী অভিধানে লিখিত হইয়াছে, "ফদক খয়বরের একটি পল্লীগ্রাম।" "মেছবাহল লোগাত" নামক অভিধানে বর্ণিত হইয়াছে, "উহা একটি 'বলদাঃ' (বস্তি)—মদীনা তৈয়বাঃ হইতে ২ দিনের পথ দূরে অবস্থিত, আর খয়বর হইতে ১ 'মঞ্জেল' দূরবর্ত্তী।" আবার "লেছানল্-আরব" গ্রন্থে লিখিত আছে, "ফদক" "হেজাযে অবস্থিত একটি গ্রাম।" আবার যহরী বলেন, "ফদক একটি গ্রাম খয়বরে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, উহা হেজায্ প্রদেশের প্রান্তবর্ত্তী একটি গ্রাম; উহাতে পানীর চশমাঃ ও খেজুরের বাগান ছিল; খোদা তালা উহা স্বীয় পয়গম্বরের প্রতি উহা "ফয়" * করিয়াছিলেন।" আর "মেরাছাদাল

---

* 'ফয়' ঐ 'গণিমত' (লুটের মাল বা লুঠের দ্রব্য) ও 'খেরাজ'

আতুলায় আলা আছমা আলাল কাস্তাঃ ওয়াল্-বকায় ” নামক গ্রন্থের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় (যাহা জর্ম্মণিতে মুদ্রিত হইয়াছে) লিখিত আছে, “ ফদক হেজাযের একটি গ্রাম মদীনার পথে অবস্থিত এবং মদীনা হইতে উহা ২।৩ দিনের পথ দুরবর্ত্তী। আর উহা খোদা তা'-লা স্বীয় রছুল (ছালঃ)-কে 'ফয়া' করিয়াছিলেন। এজন্য ইহা 'ছোলেহান্' (বিনা যুদ্ধ বা বিনা জেহাদে) হস্তগত হইয়াছিল। ইহাতে 'চশমাঃ' (ঝরণা বা নিঝ'রিণী) এবং খেজুরের বাগান ছিল।” আবার “ময়জমল বোলদান এয়াকুত হমুয়ী ” গ্রন্থে লিখিত আছে, “ ফদক নামক গ্রামটি হেজায্ প্রদেশে অবস্থিত, উহা মদীনা হইতে ১ দিনের পথ দূরবর্ত্তী।” কোনও কোনও রওয়ায়েত অনুযায়ী ৩ দিনের পথ দুরবর্ত্তী। এই গ্রাম হেজরতের ৭ম বর্ষে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তগত হইয়াছিল। আর ইহাতে পানীর 'চশ্মাঃ' (নহর—ঝরণা) এবং খেজুরের বাগান ছিল। ছহিহ্ বোখারীর শরাহ্ ফত্হল বারির ৬ষ্ঠ 'জেল্দে' (খণ্ডে) লিখিত আছে যে, “ ফদক একটি কছবাঃ (ক্ষুদ্র শহর)-এর নাম। ইহা মদীনা হইতে ৩ দিলেন পথ দূরবর্ত্তী।” উপরের বিভিন্ন বর্ণনা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ফদক একটি সাধারণ মওজাঃ বা গ্রাম মাত্র; উহা কোনও 'কছবাঃ' নহে। আর এই গ্রামের চতুঃসীমাও অন্যান্য গ্রামেরই মতন। আঁ হজরত (ছালঃ) এই গ্রাম স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া ইহার 'এন্তেজাম' (বন্দোবস্ত)-এর ভার ঐ সকল লোকের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন—যাহাদের নিকট

(যমিনের খাযানাঃ)-কে বলে, যাহা মোছলমানগণ বিধর্ম্মী লোকদিগের নিকট হইতে জেহাদ ও যুদ্ধ ব্যতীত প্রাপ্ত হন। খয়বরের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আঁ হজরত (ছালঃ) বিনা যুদ্ধে এই ভূখণ্ড লাভ করিয়াছিলেন; এবং উহা সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার অংশে পড়িয়াছিল।

হইতে 'ছোলেহান' (আপস-নিষ্পত্তির সহিত) উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, ঐ গ্রামের যমিনে যে 'ফছল' (শস্য) উৎপন্ন হইবে, উহার 'নেছ্‌ফ্‌' (অর্দ্ধাংশ) উহারা গ্রহণ করিবে, আর অর্দ্ধাংশ আঁ হজরত (ছালঃ)-কে প্রদান করিবে। ঠিক আমাদের দেশের আধিভাগ অর্থাৎ অর্দ্ধাংশ বর্গাভাগের বন্দোবস্তে দেওয়া হইয়াছিল। এই 'ফয়ছলাঃ' (মীমাংসা) অনুযায়ী প্রতি বৎসর কতিপয় লোক আঁ হজরত (ছালঃ) তথায় প্রেরণ করিতেন, এবং তাঁহারা ভাগ করিয়া হজরত পয়গম্বর (ছালঃ)-এর অর্দ্ধাংশ হিসাব মতন লইয়া আসিতেন। যে শস্য ফদক হইতে পাওয়া যাইত, আঁ হজরত (ছালঃ) উহার কিয়দংশ স্বীয় পরিবার বর্গের ভরণ পোষণের জন্য রাখিয়া অবশিষ্টাংশ মোছলমান-দিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন।

ফদক কিরূপে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর অধিকারে আসিয়াছিল।

"ফৎহোল বারি" গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে, ১৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, বহু আছহাব, (রাজিঃ) ফদক 'কব্‌জায়' (অধিকারে) আসিবার বিবরণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ফদকের অধিবাসিগণ য়িহুদী ছিল। যখন খয়বর মোছলমানদিগের দ্বারা বিজিত হইল, আঁ হজরত (ছালঃ) সদলবলে মদীনাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, পথিমধ্যে আরও কতিপয়-জনপদের য়িহুদী অধিবাসিগণ বিনা যুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল; ঐ সময় ফদকের কতিপয় প্রতিনিধি আসিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর

খেদমতে প্রার্থনা জানাইল যে, আপনি আমাদিগকে 'আমন' (শান্তি) প্রদান করুন, আমরা আমাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি। আবু দাউদ (রহঃ), যহরী (রহঃ)-এর রওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন যে, খয়বরের কতিপয় অধিবাসী 'কেলাঃবন্দ্' হইয়া (দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হুজুরে প্রার্থনা জানাইল যে, আমাদের 'খুন' (মৃত্যু দণ্ডের ব্যবস্থা) 'মায়াফ্' (ক্ষমা) করিয়া, আমাদিগকে আমাদের বাসভূমি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে অনুমতি দিন ; তদনুসারে আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন ; ফদক বাসিগণ ও আপনাদের গৃহদ্বার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র প্রস্থান করিল। আবু দাউদ (রাঃ), এব্নে শহাব (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, আঁ হজরত (ছালঃ) যখন অবশিষ্ট খয়বরবাসীদিগের বাসস্থান অবরোধ করিয়াছিলেন, ঐ সময় তন্নিকটবর্ত্তী ফদক এবং আর কয়েকটি গ্রাম বা জনপদের অধিবাসিদিগের সঙ্গে 'ছোলেহ্' (সন্ধি) হইয়া গিয়াছিল। মেছেরে মুদ্রিত তফ্ছির কবীরের ২৭১ পৃষ্ঠায় " ওমা ফাল্লাহ-আলা রছুলেহী মিন্হুম " এই পবিত্র আয়াতের 'শানে নযুলে' লিখিত আছে যে, এই আয়াত ফদক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই জন্য এই আয়েত নাযেল হয় যে, ফদকের অধিবাসিগণকে 'জালাওতন' (নির্ব্বাসিত) করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর উহাদের সমস্ত গাঁও (গ্রাম—পল্লী) এবং সামগ্রী-সম্ভার বিনা যুদ্ধে হওরত রছুলোল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওছাল্লামের হস্তগত হইয়াছিল। ফদকের প্রাপ্ত 'গল্লা' (শস্য) হইতে আঁ হজরত (ছালঃ) নিজের এবং পরিবার বর্গের খরচোপযোগী অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক, অবশিষ্টাংশ দ্বারা যেহাদের জন্য অস্ত্র-শস্ত্রাদি ক্রয় করিতেন।

এমাম আবুল আব্বাছ আহ্মদ বিন্-ইয়াহিয়া বালাযোরী (রহঃ)

"ফতুহল-বলদান" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আছামাঃ বিন্-যয়েদ (রাজিঃ), এব্নে শহাব (রাজিঃ) হইতে, আর তিনি মালেক-বিন্-আওছ (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, ২য় খোল্ফায়ে রাশেদীন হজরত ওমর বিন্-আল্ খাত্তাব (রাজিঃ) বলিয়াছেন যে, হজরত রছুল (ছালঃ)-এর তিন ছফায়্যা (ছফায়্যা উহাকে বলে, যাহা এমাম অর্থাৎ নেতা 'মালে-গনিমত' (যুদ্ধ বা সন্ধি-লব্ধ সম্পত্তি বা সামগ্রী-সম্ভার হইতে নিজের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া লয়েন) ছিল। প্রথম, বনি-নজীরের মাল; দ্বিতীয়, খয়বরের মাল; তৃতীয়, ফদকের মাল। বনি নজীরের 'মাল' (সম্পত্তি) আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় প্রয়োজন সাধন জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন; ফদকের উপস্বত্ব মোছাফের (প্রবাসী)-দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল; আর খয়বরের উপস্বত্ব ৩ ভাগ করিয়া দুই অংশ মোছলমানদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন; আর এক অংশ স্বীয় ব্যক্তিগত খরচ-পত্র নির্ব্বাহ এবং পরিবার বর্গের ব্যয়-ভূষণ জন্য 'মহ্ফুজ' (স্বতন্ত্র—সংরক্ষিত) করিয়া লইয়া ছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পরিবার বর্গের খরচ-পত্র নির্ব্বাহ হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, উহা ফকীর (ভিক্ষা-জীবি) এবং 'মোহাজেরীন' (দেশত্যাগী—হেজরতকারী) মোছলমানদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন (দেখুন জর্ম্মনিতে মুদ্রিত "ফতহুল বোলদান" গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠা)। ঐ গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত আছে যে, লোকেরা বলিয়াছেন, আঁ হজরত (ছালঃ) খয়বর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, মহহিছাঃ-বিন্-মছঊদ-আন্ছারী (রাজিঃ)-কে ফদক বাসীদিগের নিকট এছলাম প্রচারার্থে প্রেরণ করেন। ফদকের 'রয়ীছ' অর্থাৎ দলপতির নাম ছিল, য়িহুদী ধর্ম্মাবলম্বী ইউশয়-বিন্-রুন। য়িহুদিগণ 'নেছফ্ হেচ্ছাঃ' (অর্দ্ধাংশ) যমিনের (ভূ-সম্পত্তির) উপর হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর স্বত্ব স্বীকার

পূর্ব্বক সন্ধি-বন্ধন করিয়া ছিল। মোছলমান যোদ্ধ্ পুরুষ দিগকে এক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে বা অস্ত্র চালনা করিতে হইয়াছিল না বলিয়া, ইহা খাছ রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর অংশ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। যে সকল 'মোছাফের' (বিদেশী—প্রবাসী) তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদের আহারাদি খরচ-পত্র নির্ব্বাহের জন্য ফদকের উপস্বত্ব ব্যয়িত হইত। উহার য়িহুদী অধিবাসিগণ হজরত ওমর ফারুক (রাজি)-এর খেলাফ্ত-কাল পর্য্যন্ত ঐস্থানে বাস করিতে ছিল। কিন্তু তিনি অবশেষে পবিত্র হেজায্ ভূমি হইতে য়িহুদিদিগকে বাহির করিয়া দিলেন। মহামান্য খলিফা (রাজিঃ), আবু আল্ শমি মালেক-বিন্-তয়্হান, সহল-বিন্-আবি খছিমাঃ এবং যয়েদ-বিন্-ছাবেত্ আন্ছারী (রাজিঃ)-কে ফদকে পাঠাইলেন; তাঁহারা উহার 'নেছফ্' (অর্দ্ধেক) যমিনের (ভূমির) ন্যায় সঙ্গত মূল্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক য়িহুদিদিগকে প্রদান করিলেন; আর শাম (সিরিয়া) প্রদেশে তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন (দেখুন, জর্ম্মণিতে মুদ্রিত " ফত্হুল বোলদান " গ্রন্থ ২৮ পৃষ্ঠা)। প্রায় এইরূপ বিবরণই প্রসিদ্ধ ইতিহাস " তব্রি " এবং " তারিখ কামেল আছির " এ ও লিপিবদ্ধ আছে।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ হইতে পরিষ্কার ভাবে প্রতিপন্ন ও প্রমাণিত হইতেছে যে, 'ফয়্' এর মাল ও গণিমতের মালে (যুদ্ধ-বিজয় জনিত অর্থ বা সম্পত্তিতে) কেবলমাত্র এই পার্থক্য রহিয়াছে যে, যুদ্ধ জয়-লব্ধ সাধারণ মালে যেমন যোদ্ধৃ-পুরুষদিগের অধিকার ছিল, ফয় এর মালে তাঁহাদের সে অধিকার ছিল না; ইহা আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'খাছ' অধিকার ভুক্ত ছিল। তিনি মতওল্লি রূপে এই সম্পত্তির উপর আধিপত্য করিতেন। আর খোদা তা-লার আদেশ এবং 'মরজী' (অভিপ্রায়) অনুযায়ী ইহা ব্যয় করিতেন। আঁ হজরতে (ছালঃ)-এর পরলোক গমনের পরে ইহা

মহামান্য খোল্‌ফায় রাশেদিনগণ এবং অন্যান্য খলিফাগণের অধিকার ভুক্ত হয়। উদ্দেশ্য, তাঁহারাও ঐ সকল (দান-খায়রাত, অতিথি-সেবা প্রভৃতি) কার্য্যে উহা ব্যয় করেন—যেরূপ আঁ হজরত (ছালঃ) নিজে করিতেন। ইহা দ্বারা এই কথাই প্রতিপন্ন হয় যে 'ফয়্‌' এর মাল তাঁহার এরূপ ব্যক্তি-গত সম্পত্তি ছিল না যে, তাহা উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে ভাগ-বণ্টন হইবে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ফদকের উপস্বত্ব হইতে কিয়দংশ আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় ব্যক্তিগত খরচ-পত্রে ব্যয় করিতেন, কিয়দংশ পরিবার বর্গের ভরণ-পোষণে পর্য্যবসিত হইত, অবশিষ্টাংশ 'রাহী মোছাফের' (অতিথি অভ্যাগত—বিদেশ হইতে আগত প্রবাসী)-দিগের আহারাদি এবং দান কার্য্যে ব্যয় করা হইত; এজন্য তাঁহার পরলোক গমনের পর কোনও কোনও 'মোফ্‌ছেদ' (হয় ত মোনাফেকদিগের গুপ্ত দল), এছলামের অসাধারণ উন্নতি দর্শনে উহার ক্ষতি সাধন মানসে হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-কে বুঝাইয়া ছিল যে, ফদক আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আর আপনি তাঁহার একমাত্র কন্যা-রত্ন ও উত্তরাধিকারিণী; সুতরাং উহার 'ওয়ারেছ' আপনি ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না। বিরুদ্ধবাদী দলের বক্তব্য এই যে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর খেলাফতের প্রারম্ভে, হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তাঁহার সমীপে গমন করিলেন, আর স্বীয় ওয়ালেদ মাজেদের উত্তরাধিকারী সূত্রে ফদকের দাবী কোরআন মজীদের এই আয়েত দ্বারা করিলেন; যাহার অর্থ এই যে, " তোমার আওলাদের 'হেচ্ছায়' (অংশে) পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্বন্ধে এই আদেশ দিতেছেন যে, এক পুত্রকে দুই কন্যার সমান অংশ প্রদান কর।" মহামান্য খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাজিঃ)-কে তাঁহার দাবীর উত্তরে বলিলেন, পয়গম্বরদিগের

'মালে' (অর্থ-সম্পত্তিতে) 'ওয়ারেছের' (উত্তরাধিকারিত্বের) দাবী জারী হইতে পারে না (অর্থাৎ তাঁহাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা)। এই কথা শুনিয়া হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর প্রতি নিতান্ত নারাজ হইয়া চলিয়া গেলেন ; আর মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নাই।

'মহক্কিন' (অনুসন্ধানকারী—ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু)-দিগের 'রায়' (মত) এবং আমাদিগের জ্ঞান বিশ্বাস মতে নিম্ন-লিখিত হাদীছের মর্ম্মানুযায়ী (হাদীছঃ)—"আমাদের—পয়গম্বরদিগের মালে 'ওয়ারেছ' (উত্তরাধিকারী) নাই ; আমরা যাহা কিছু (ধন-সম্পত্তি) ছাড়িয়া যাই, উহা খোদার পথে ছদকাঃ [দাতব্য]) " ইহা নিতান্ত 'ছহী '(সন্দেহ বর্জ্জিত) ; পয়গম্বর (ছালঃ ও আলাঃ)-দিগের অনেক বিষয়ই সাধারণ লোক হইতে স্বতন্ত্র ; যথা :—বহু বিবাহ ইত্যাদি)। এই হাদীছের বিষয় হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) না ও জানিতে পারেন, সুতরাং তিনি শরীয়তের সাধারণ ব্যবস্থানুসারে ফদকের দাবী করিতে পারেন, কিন্তু হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর উক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতেন না, তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ আজ্ঞানুবর্ত্তী ও পদানুসরণকারী ছিলেন।

খয়বর যুদ্ধ সম্বন্ধে হাদীছের মহাগ্রন্থ বোখারী শরীফে, মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকাঃ (রাঃ—আঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, " বিন্তে-রছুল ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) কোনও ব্যক্তিকে (খলিফা) হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর খেদমতে পাঠাইলেন, এবং মদীনাঃ, ফদক ও খয়বরের 'খম্‌ছ' (এক পঞ্চমাংশ)—যাহা হজরত রছুলোল্লাহ (ছালঃ)-এর পরলোক গমনের পর অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল, আপনার প্রাপ্য অংশ বলিয়া পাইবার দাবী করিলেন ;

হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) উত্তরে বলিলেন, হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ) ফরমাইয়া গিয়াছেন, আমাদের পয়গম্বরদিগের 'মালে' (ত্যজ্য-সম্পত্তিতে) ওয়ারেছ (উত্তরাধিকারী) নাই। আমরা যাহা কিছু পরিত্যাগ করিয়া যাইব, তাহা খোদার 'রাহে' (পথে) ছদ্কাঃ (দাতব্য)। অবশ্য আঁ হজরতের বংশধরগণ এই মাল হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় খরচ পরিমাণ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। আল্লাহ্ তা-লার শপথ, আমি এ বিষয়ে (ঐরূপ খরচ-পত্র প্রদানে) একটুও বিলম্ব করিব না। আর যেরূপ 'তছরুরোফ্' (আধিপত্য) ইহাতে হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ) করিতেন, আমিও ঐরূপই করিব ; যখন হজরত আবুবক্কর ছিদ্দিক (রাজিঃ) অংশ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ; তখন হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) নারাজ হইলেন ; এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আর বাক্যালাপ করিলেন না। ”

এই ঘটনা দ্বারা ইহাই জানা যায় যে, হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) যেরূপ আদেশ হজরত রছুল করিম (ছালঃ) হইতে পাইয়াছিলেন, তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে যাহা করিতে দেখিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন। হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে তাঁহার কোনও 'বোগ্জ' (হিংসা-দ্বেষ) বা 'আদাওত' (শত্রুতা) ছিল না ; বরং হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর অতি স্নেহেরপাত্রী কন্যা-রত্ন বলিয়া তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও সহানুভূতিই প্রদর্শন করিতেন। স্বীয় দীক্ষা-গুরু এবং খোদার রছুলের প্রতি তাঁহার কিরূপ অপরিসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ত্যক্ত সম্পত্তির 'তরকাহ্' (মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল বা সম্পত্তি) সম্বন্ধে পরিষ্কার দলিল এই যে, যদি উহা উত্তরাধিকারী সূত্রে-ভাগ-বণ্টন হইত, তবে হজরত খাতুনে

জন্নত (রাঃ—আঃ) একাকী তাহা পাইবার হকদার ছিলেন না ; আঁ হজরতের আহ্‌লিয়া (মোছলেম-মাতা)-গণ ও ফরায়েজ অনুযায়ী অংশ পাইতেন, আর আঁ হজরত (ছালঃ)-এর চাচ্চাঃ (পিতৃব্য) হজরত আব্বাছ (রাজিঃ) ও একটা মোটা রকমের অংশ প্রাপ্ত হইতেন। আবার মোছলেম-মাতা (রাঃ—আঃ)-দিগের মধ্যে হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ত হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর দুহিতা-রত্নই ছিলেন। পিতা হইয়া কি তিনি স্বীয় কন্যার স্বত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন ? যদি স্বীকার করা যায় যে, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গেই মহামান্য খলিফা হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর মনোবাদ ছিল ; তবে তিনি স্বীয় দুহিতা-রত্ন সহ মোছলেম-মাতাগণ এবং হজরত আব্বাছ-বিন্-আবদুল মোত্তালেব (রাজিঃ)-এর ওয়ারেছী স্বত্ব কেন লোপ করিলেন ? হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর প্রত্যেক কার্য্য-কলাপ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তিনি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আদেশ এবং উপদেশের একটু মাত্র ব্যতিক্রম করেন নাই ; যথা :—ওছামাঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ)-এর নেতৃত্বাধীনে সিরিয়ায় অভিযান প্রেরণ করা, যাহারা জাকাৎ প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে যেহাদ ঘোষণা করা ইত্যাদি।

পবিত্র হাদীছ গ্রন্থ ছহি বোখারী ও মওতা গ্রন্থে এই হাদীছটিও বর্ণিত আছে যে, আয্‌ওয়াজ নবী (আঁ হজরত [ছালঃ]-এর আহ্‌লিয়া অর্থাৎ মোছলেম-মাতা গণ), হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ)-কে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর নিকট এই বলিয়া পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার হইতে নিকট আমাদিগের প্রাপ্য এক অষ্টমাংশ (৮ ভাগের এক ভাগ) 'তলব' (প্রার্থনা—দাবী) করেন, যাহা আল্লাহ তা'লা স্বীয় রছুলকে 'গণিমত' (সন্ধি-সূত্রে প্রাপ্ত) বলিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) হজরত ওছমান (রাজিঃ)-কে এই বলিয়া 'ওয়াপছ' (ফেরত) পাঠান (যাইতে নিষেধ করেন) যে, আপনি গিয়া আমার সপত্নী দিগকে বলুন, আপনারা কি খোদা তা-লা কে ভয় করেন না? তাঁহারা কি জানেননা যে, হজরত রছুল খোদা (ছালঃ) ফরমাইতেন "আমি যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইব, উহার (আমার ত্যজ্য সম্পত্তির) কেহ 'ওয়ারেছ' (উত্তরাধিকারী) হইবে না। যাহা আমি ছাড়িয়া যাইব, উহা 'ছদক্কাঃ' (খোদার পথে ফকীর-মিছকিন কে দেওয়ার মাল বা অর্থ)। কেবলমাত্র 'আলে' মোহাম্মদ (ছালঃ) অর্থাৎ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর বংশধর—বিশেষতঃ কন্যার বংশীয়গণ) আপনাদের প্রয়োজনানুরূপ উহা হইতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।" যখন আঁ হজরত (ছালঃ)-এর বিবিগণ (ওম্মোল-মুমেনিনগণ) এই হাদীছের বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা চুপ হইয়া গেলেন। এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাগুক্ত হাদীছের বিষয় না মহামাননীয়া ওম্মোল মুমেনিন (হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা [রাঃ—আঃ] ব্যতীত)-গণ জানিতেন, না হজরত খাতুনে জন্নত (রাজিঃ) জানিতেন; কেবলমাত্র হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত আয়েশাঃ ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এবং আরও কোন কোন ছাহাবাঃ (রাজিঃ)এই হাদীছের বিষয় অবগত ছিলেন। হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাজিঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এই উক্তি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, এজন্য তাহা কার্য্যে পরিণত করা তাঁহার পক্ষে ফরজ (একান্ত কর্ত্তব্য) ছিল। যাহা হউক, আমরা এ বিষয়ের আলোচনা এই স্থানেই শেষ করিলাম। যাঁহারা এই ব্যাপারটিকে তুমুল কাণ্ডে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহারা যেদ ও হঠকারিতা কর্ত্তৃকই পরিচালিত হইয়াছেন; উপরোক্ত প্রমাণ সমুহই ইহার জন্য যথেষ্ট। মহামান্য খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)

যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপেই ন্যায়সঙ্গত ছিল। যদি তাঁহার কার্য্য অসঙ্গত হইত, তবে হজরত শেরে খোদা আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ) সহজে নিজেদের স্বত্ব পরিত্যাগ করিতেন না ; ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) গণ এবং হজরত আব্বাছ (রাজিঃ) ও স্ব স্ব দাবীকৃত অংশ নিশ্চয় গ্রহণ করিতেন। কিন্তু হাদীছের জ্বলন্ত বাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন।

মহাপণ্ডিত এমাম জালালুদ্দীন সেউতী (রহঃ) "খছায়েছ কোব্‌রের" নামক গ্রন্থের ২য় জেল্‌দে (খণ্ডে) লিখিয়াছেন যে, এবনে ছায়াদ ওয়াকেদী হইতে, তিনি শবল-বিন্‌ল্ আঁলা হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত নবী (ছালঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে ফরমাইয়াছিলেন যে, যে সময় আমি 'ওফাত' পাইব (পরলোক গমন করিব), তুমি "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন" বলিবে ; কারণ, প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য এই কলমাঃ প্রত্যেক 'মছিবত্' (বিপদ আপদ)-এর 'বদলা।' অর্থাৎ ইহা পাঠে নানা বিপদ-আপদ কাটিয়া যায়। হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এয়া রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)! আপনার 'তরফ্' (পক্ষ) হইতে যে 'মছিবত' হইবে, তাহারও কি ইহাই বদলা? হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, হাঁ, আমার মছিবত্ (বিপদ)-এর ও ইহাই বিনিময়। হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-এর 'ওছাল' (পরলোক গমন)-এর সময়, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ ব্যতীত তাঁহার সমুদয় 'আওলাদ' (সন্তান)ই পরলোকে চলিয়া গিয়াছিলেন। হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর বয়ঃক্রম যখন মাত্র ২৮ কি ২৯ বৎসর, সেই সময় আঁ হজরত সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া পবিত্র স্বর্গধামে মহা প্রস্থান করিয়াছিলেন। এমন কোন্ 'কমবখ্‌ত্' (হতভাগ্য) ছিল,

এই প্রচণ্ড শোকাঘাতে 'বেতাব' (একান্ত অধৈর্য্য) হইয়া ছিল না। কিন্তু এমন মহান্ পিতার—আদর্শ ওয়ালেদ বোযর্গের ছায়া মস্তকের উপর হইতে উঠিয়া যাওয়াতে—যিনি রছুলে খোদা (আল্লাহ্ তা-লার সংবাদ বাহক বা তত্ত্ববাহক) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আপনার আওলাদের সঙ্গে অপরিসীম স্নেহ প্রদর্শনকারীও ছিলেন ; তাঁহার অভাবে পিতৃগতপ্রাণ স্নেহের প্রতিমা হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল ; দুনিয়া হইতে তাঁহার মন একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল ; সংসার-বন্ধন তিনি একেবারে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। তখন জীবিত থাকা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনাময় বলিয়া বোধ হইতে ছিল। তিনি হজরত আন্‌ছ (রাজিঃ) কে কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করিতেন হে, আনছ ! তোমার মন কিরূপে 'গওয়ারা' (কর্ত্তব্য বোধ) করিল যে, তুমি হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর উপর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিলে (তাঁহাকে কবরস্থ করিলে) ? হজরত আনছ (রাজিঃ) "আবদীদাঃ" হইয়া (অশ্রুপূর্ণ লোচনে) কহিতেন, " আল্লাহ তা-লার কার্য্যে কাহারও কিছু বলিবার শক্তি নাই।" পৃথিবীতে এতিমির 'দাগ' (চিহ্ন) বড়ই মারাত্মক হইয়া থাকে। বিশেষতঃ হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাজিঃ)-এর জন্য হজরত রছুলে করিম (ছালঃ)-এর 'ফরাক্' (জুদায়ী—বিচ্ছেদ) বড় ভীষণ কষ্টদায়ক ছিল। কারণ, আঁ হজরত (ছালঃ), স্বীয় প্রাণ-প্রতিম কন্যা-রত্নকে 'বেহদ' (সীমাতীত রূপ) ভালবাসিতেন ও স্নেহ করিতেন। আর তাঁহাকে স্বীয় কলেজার টুকরা বলিয়া সর্ব্বদা উল্লেখ করিতেন। পিতৃ-বিয়োগে হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর শোকাবেগ এমন প্রবল আকার ধারণ করিল যে, হুজুর (ছালঃ)-এর 'রেহ্‌লতের' (পরলোক গমনের) কিছু দিন পরেই তিনি রোগাক্রান্তা হইয়া পড়িলেন। ইহা তাঁহার শারীরিক রোগ নয়, কঠিন মানসিক রোগ ছিল। পিতৃ-বিয়োগের পর

তিনি ছয়মাস কাল মাত্র জীবিত ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে কেহ তাঁহাকে হাস্ত করিতে বা প্রফুল্ল মুখে কথা বলিতে দেখেন নাই। একথা সত্য যে, হৃদয়ের দাগ বড়ই মারাত্মক হইয়া থাকে; অবশেষে উহাতে মানুষকে 'ঘুলাইয়া' (গলাইয়া—অতি দুর্ব্বল করিয়া) দেয়; তাহার জীবনীশক্তি হ্রাস পাইয়া থাকে। বালক বালিকাগণ (এমাম দ্বয় ও তাঁহাদের ভগিনী দ্বয়) নানার (মাতামহের) শোকে পূর্ব্ব হইতেই অর্দ্ধ মৃতাবস্থাপন্ন হইয়া ছিলেন, এক্ষণে স্নেহময়ী জননীর এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে একেবারেই মৃতকল্প হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই উদাস ভাব দৃষ্ট হইত। হজরত হায়দারে কার্‌রার (কঃ—ওঃ)-এর মানসিক অবস্থাও অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার বীর হৃদয় দমিয়া গিয়াছিল। গৃহে আসিয়া হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) ও পুত্র কন্যাগণের শোক ক্লিষ্ট বদন মণ্ডল যখন নিরীক্ষণ করিতেন, তখন তাঁহার অতীত সুখের দিন ও দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তির কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া, তাঁহাকে অতি মাত্রায় আকুল করিয়া তুলিত; আঁ হজরত (ছালঃ)-এর তিরোধানে তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে ছিলেন; তাঁহার সেই অজেয় শৌর্য্য-বীর্য্য ও পরাক্রম যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি মনে মনে ভাবিতেন, আমার দিন ও দুনিয়ার (পরকাল ও ইহকালের) সাহায্যকারী ত পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন; আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'জুদায়ীর' (বিচ্ছেদের) পাহাড় আমার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; এক্ষণে এই 'হামদর্দ' (সহানুভূতি সম্পন্না) হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ [রাঃ—আঃ] ও না আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। হজরত শেরে খোদা (কঃ—ওঃ), হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-কে কেবল স্বীয় পরম হিতৈষিণী, আরাম-দায়িনী, শোক-দুঃখে শান্তি প্রদায়িনী বিবী বলিয়াই মনে করিতেন না, বরং আঁ হজরত (ছালঃ)-এর একমাত্র 'নেশানী'

(চিহ্ন) বলিয়াও মনে করিতেন। এজন্য তাঁহার প্রতি অফুরন্ত প্রেম ও ভালবাসা ছিল। এই স্বর্গ-রাজ্ঞীর পরলোক গমনে বীরেন্দ্র কেশরী হজরত হায়দারে কার্রার আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহুর হৃদয় দুর্ব্বার শোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা তাঁহার কবর যেয়ারত করিতে যাইতেন, এবং নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেন ; আর শোকার্ত্ত হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র আত্মার মঙ্গল কামনা করিতেন। একদা তিনি কবরের পার্শ্বে বসিয়া রোরুদ্যমান অবস্থায় যে প্রাণস্পর্শী কবিতাটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—

(১) " আমি নিজের উপর দুনিয়ার বহু পীড়া দেখিতেছি, আর এই পীড়িত ব্যক্তি (আমি স্বয়ং) মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত পীড়িত থাকিব।

(২) যে স্থলে দুইজন বন্ধু আছেন, 'আখের' (অবশেষে) ইহাদের মধ্যে 'জুদায়ী' (বিচ্ছেদ) হইবে। আর সমুদয় 'মছিবত' (আপদ—বিপদ) এই বিচ্ছেদের 'ছদমাঃ' (তীব্র আঘাত) হইতে কম।

(২) হজরত রছুলোল্লাহ্ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের 'বাঁদ' (পরে) ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে হারাইয়া ফেলা এই বিষয়ের 'দলীল' (প্রমাণ) যে, কোনও 'পেয়ারাঃ' (প্রিয়ব্যক্তি) ও 'দোস্ত' (বন্ধু) চিরকাল এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। "

মূল আরবী কবিতাটির ভাব ও সৌন্দর্য্য অন্য ভাষায় প্রকাশ করা এবং সর্ব্ব-সাধারণকে উপলব্ধি করান সম্ভবপর নহে।

" তফ্রিহল আয্কিয়া " গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) কোনও রূপ রোগগ্রস্তা ছিলেন না ; বরং এন্তেকালের (পরলোক গমনের) দিন অতি প্রত্যুষে 'খেলাফ্ মামুল' (নিয়মিত নিয়মের বিপরীত ভাবে), বেশ 'খোশ' ও 'খোর্‌রম' (আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঙ্গে) শয্যাত্যাগ করিলেন ; এবং 'কনিয্' (দাসী)-

কে এরশাদ ফরমাইলেন, আমার স্নানার্থ পানী আনয়ন কর। দাসী আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক গোছলের পানী আনিয়া দিল; হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) অতি কষ্টে গোছল করিলেন; আর ধৌত করা পাক (পবিত্র) বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া, কেব্‌লাভিমুখী হইয়া শয়ন করিলেন; এবং এরশাদ ফরমাইলেন; আমি স্বীয় জীবন খোদা- ওয়ান্দ্‌ করিমের নামে সমর্পণ করিতেছি। অতঃপর কেহ যেন আমাকে আহ্বান না করে; আর আমাকে যেন এই অবস্থায়—এই স্থানেই "দফণ" (কবরস্থ) করা হয়। যখন হজরত আলী মরতুজা (কঃ—ওঃ) বাহির হইতে গৃহে আগমন করিলেন; তখন হজরত ছৈয়দার 'ওছিয়ত' (অন্তিম নির্দ্দেশ) অনুযায়ী কার্য্য করিলেন। কিন্তু এব্‌নে জরযী (রহঃ) এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস-বেত্তাগণ এই হাদীসটিকে 'মওযুয়াত' (অপ্রামাণ্য—জয়ীফ্‌) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, হজরত ছৈয়দা 'নযুয়' (অন্তিম) সময়ে—মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, হজরত আছমাঃ-বিন্তে ওমিছ (রাঃ—আঃ—হজরত আবুবকর ছিদ্দিক [রাজিঃ]-এর আহ্‌লিয়া অর্থাৎ পত্নী)-কে ফরমাইলেন, আমার 'তদফিনে' (কাফন-দফন কার্য্যে) পরদার সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত রাখিবেন; আর আপনি স্বয়ং এবং আমার স্বামী ব্যতীত আমার মৃত্যু-স্নানে যেন আর কেহ শরীক না হন (যোগ না দেন)। জানাযার সময় ও দফন (কবরস্থ) করার সময় যেন অধিক লোকের সমাগম এবং ভিড়্‌ ভাড়্‌ না হয়। "তবক্কাত এব্‌নে সাদা ছাযা" এবং "আছদল গালেবাঃ" (১৭।১৮ পৃঃ) তেও ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) এর এন্তেকাল সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে।

ঐ 'যামানায়' (সময়ে) স্ত্রীলোকদিগের জানাযাঃ এইরূপে কবরস্থানে লইয়া যাওয়া হইত—যেরূপ আজকাল পুরুষদিগের জানাযাঃ লইয়া

যাওয়া হয় ; স্ত্রীলোকের জন্য বিশেষ ভাবে পরদার কোনও বন্দোবস্ত ছি না। হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবিতাবস্থায়ই এবিষয়ের খ 'ফেকের' (চিন্তা) ছিল ; তিনি ভাবিতেন, আমার জানাযাও বাহি যাইবে, এবং পর পুরুষেরা দেখিতে পাইবে। এইরূপ 'বে-পরদেগী' সম্ব তিনি বড়ই লজ্জা এবং সঙ্কোচ বোধ করিতেন। মৃত্যুর কয়েক দি পূর্ব্বে তিনি আছমাঃ (রাঃ—আঃ) এর নিকট এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ছিলেন ; তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি হাবশাতে (আবিশিনিয়ায় দেখিয়াছি, স্ত্রীলোকদিগের জানাযার উপর বৃক্ষের নরম শাখা বান্ধিয়া ডুলির আকারে পরিণত করিয়া পরদার ব্যবস্থা করে—যাহাতে মৃতদে কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হয় না—(যাহাকে 'ঘওয়ারাঃ' বলে)। অতঃপ বিবী আছমাঃ (রাঃ—আঃ) ঘওয়ারার নমুনা তৈয়ার করিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। উহা দেখিয়া হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) বড়ই সন্তুষ্টি লাভ করিলেন। তৎপরে আছমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে বলিলেন, মৃত্যুর পর আপনিই আমায় 'গোছল' দেওয়াইবেন ; এবং কাফন পরাইবেন ; আর যেরূপ ঘওয়ারার নমুনা আমাকে দেখাইলেন, আমার জানাযার উপর এইরূপ ডুলির আকার বিশিষ্ট পরদার ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ পরদার ব্যবস্থা সর্ব্ব প্রথমে হজরত খাতুনে জন্নতের জানাযায়ই হইয়াছিল ; তৎপর হজরত জয়নব বিন্তে-হজশ্ (ছাহাবিয়া রাঃ—আঃ)-এর জানাযায় ব্যবহৃত হয়। 'ছরকারে আউলিয়া' (হজরত খাতুনে জন্নত [রাঃ—আঃ]) যখন বুঝিতে পারিলেন, এবং তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, আমাকে অতি শীঘ্রই 'শফিক্' (মেহেরবান—স্নেহ প্রদর্শনকারী) পিতার নিকট যাইতে হইবে। এ সময় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এন্তেকালের ছয়মাসও পূর্ণ হইয়াছিল না—হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) পবিত্র জীবন-বিসর্জ্জন করিলেন (ইন্না লিল্লাহে

ওয়া ইন্না এলায়হে রাযেঊন)। দ্বাদশ হিজরীর ৩রা রমজানল্-মবারক মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রিকালে, হজরত রছুলেখোদা (ছালঃ)-এর 'জগর গোশাঃ' (হৃৎপিণ্ডের টুকরা) তাঁহার সঙ্গে গিয়া সম্মিলিত হইলেন।

জনাব হজরত আলী (কঃ—ওঃ) শেরে খোদা ছিলেন; 'ছফ্ দারে জার্'র' ছিলেন; 'হায়দারে কার্'র' ছিলেন; ছুনিয়ার কোনও শক্তি—শত্রুপক্ষের কোনও 'তক্‌লিফ্' (ক্লেশ) তাঁহাকে ভীত, সন্ত্রস্ত ও ভগ্ন হৃদয় করিতে পারিত না। 'মায়ূছি' (নৈরাশ্য) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর পরলোক গমনে তাঁহার কলেজাঃ টুক্‌রা টুক্‌রা এবং লোহার ন্যায় সুদৃঢ় বক্ষঃস্থল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মাছুম এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের 'মছিবত্' (বিপদ)-এর পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

স্বর্গ-রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'ওছিয়ত' (অন্তিম নির্দ্দেশ) অনুযায়ী, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহার গোছল এবং কাফনের 'এন্তেজাম' (বন্দোবস্ত) করিলেন। আর হজরত আছমাঃ (রাঃ—আঃ) গোছল করাইয়া, কাফন পরাইয়া পরদার ছামান করিয়া দিলেন—যেরূপ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই সময় (গোছল ও কাফন পরাইবার সময়) হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) তথায় আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু হজরত আছমাঃ (রাঃ—আঃ) এই বলিয়া তাঁহাকে সেই কার্য্যে যোগ দিতে নিষেধ করিলেন যে, হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) একার্য্যে আর কাহাকেও যোগ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ইহাতে দুঃখিত হইয়া স্বীয় পিতা মহামান্য খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ—আঃ)-এর খেদমতে এই বলিয়া 'শেকায়েত' (অভিযোগ) করিলেন যে, আপনার বিবী (স্বীয় সৎ মা) আমাকে ফাতেমার মৃতদেহের নিকট যাইতে দেন নাই।

হজরত আয়েশাঃ ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) পিতাকে ইহাও বলিলেন, আছমাঃ (রাঃ—আঃ), ফাতেমার জানাযার উপর ডোলের ন্যায় কোনও জিনিষ বাঁধিতেছেন। ইহা শ্রবণ মাত্রে হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) খাতুনের জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন পূর্ব্বক, দরওয়াযায় দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় আহ্‌লিয়াকে বলিলেন, তুমি ইহা কি 'গযব' করিতেছ? হজরত রছুলোল্লার বিবীদিগকে ও তাঁহার কন্যার মৃতদেহের নিকট আসিতে দিতেছ না; আর জানাযার উপরে দিবার জন্য কি নূতন জিনিষ তৈয়ার করিতেছ? আছমাঃ (রাঃ—আঃ) তাঁহার নিকটও ঐ ওজর পেশ করিলেন যে, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) আমাকে এই ওছিয়ত করিয়া গিয়াছেন, আপনিই আমাকে গোছল দেওয়াইবেন, আর কাহাকেও সেখানে প্রবেশ করিতে দিবেন না। আমি কোনও নূতন জিনিষ জানাযার উপর স্থাপন জন্য তৈয়ার করিতেছি না; বরং মরহুমার অভিপ্রায়ানুযায়ী জানাযার উপর পরদার ব্যবস্থা করিতেছি মাত্র। জনাব হজরত ছিদ্দিক আকবর * এই কথা শুনিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং বিবী আছমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে অনুমতি দিলেন; ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) যেরূপ ওছিয়ত করিয়া গিয়াছেন, তুমি

---

* এই রওয়ায়েত দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর মৃত্যু-সংবাদ যথাসময়েই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর কবর তাঁহার হুজরায় হইয়াছিল না; কারণ হুজুরায় কবর হইলে তাঁহার জানাযায় পরদা করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। "খদবল কলুব আয় দেয়ারল মহবুব"-প্রণেতা মাওলানা শেখ শাহ্ আবদুল হক্ ছাহেব মহদ্দছ দেহলবী)।

সেইরূপ কার্য্যই কর। জনাব হজরত খাতুনে জন্নত ছৈদাঃ (রাঃ—আঃ) লজ্জা ও শরমের জন্য পরদার বিশেষরূপ খেয়াল করিতেন। এজন্য তিনি ইহাও 'আরযু' (অভিপ্রায়—ইচ্ছা) ফরমাইয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে স্বীয় পরম ভক্তি-ভাজন মহা সম্মানিত স্বামী হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, আমাকে যেন রাত্রিকালে 'দফন' (কবরস্থ) করা হয়; তদনুসারে রাত্রিকালেই তাঁহার জানাযাঃ কবর স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। মদীনাবাসীদিগের বিখ্যাত কবরাস্থান " জন্নতল বক্কিয় " তেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। জানাযার নমায্ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-ই পড়াইয়াছিলেন। রাত্রিকালে জানাযার নমায্ পড়া ও দফন কার্য্য সম্পন্ন করাতে জানাযায় লোকসংখ্যা খুব কমই হইয়াছিল। আর আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নামে জীবনোৎসর্গকারী ভক্ত বৃন্দের পক্ষে এজন্য বড়ই 'আফ্ছোছ' (আক্ষেপ) রহিয়া গিয়াছিল। মহামাননীয়া খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর পরলোক গমন সংবাদ ও যথানিয়মে—যথাসময়ে ঘোষণা করা হইয়াছিল না; তাহা করিলে সহস্র সহস্র ছাহাবাঃ (রাঃ—আঃ) ও জন-সাধারণ তাঁহার জানাযার নমাযে সাগ্রহে যোগদান করিতেন।

" তবক্কাত্ এব্নে ছায়াদ " (কেতাবম্নেছা) গ্রন্থে মোহাম্মদ-বিন্-মুছা (রহঃ) হইতে রওয়ায়েত আছে যে, হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) কে স্বয়ং হজরত আলী (কঃ—ওঃ) 'গোছল' (মৃত্যু-স্নান) দেওয়াইয়া ছিলেন। আর হজরত আবদুল্লা-বিন্-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, জানাযার নমাজ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-ই পড়াইয়া-ছিলেন; এবং হজরত ফজল-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ)-এর সহায়তায় তাঁহার পবিত্র মৃতদেহ, শেরে খোদা হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ)-ই কবরে স্থাপন করিয়াছিলেন। এমাম শাহাবুদ্দীন আস্কোলানী (রহঃ) বর্ণনা

করিয়াছেন যে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর 'আহ্ লিয়া' (পত্নী) আছমাঃ-বিন্তে য়মিছ (রাঃ—আঃ)-এর সাহায্যে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-ই মহামাননীয়া ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গোছল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এস্থলে আমরা একটি বিষয় বুঝিতে পারিতেছি না। ইতিপূর্ব্বে পরদা সম্বন্ধীয় কোরআন পাকের আয়েত 'নাযেল' (অবতীর্ণ) হইয়াছিল। এরূপক্ষেত্রে আছমাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত আলী (ক—ওঃ)-এর সম্মুখে যাইতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া কিরূপে গোছল দেওয়াইলেন? " আছাবাঃ " নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ওছিয়ত ছিল, আছমাঃ-বিন্তে য়মিছ (রাঃ—আঃ)-এর সাহায্যে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বয়ং তাঁহাকে মৃত্যু-স্নান দেওয়াইবেন। এক রওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, মৃত্যুর পর হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-কে আর গোছল দেওয়ান হয় নাই; এন্তেকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি 'এত্ মিনানের' (স্থির বিশ্বাসের—নিশ্চিন্ততার) সহিত স্নান কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন; ঐ গোছলই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট মনে করা হইয়াছিল। এমাম ছাহেব এক জয়ীফ্ (দুর্ব্বল) রওয়ায়েত অনুসারে ফরমাইয়াছেন যে, জানাযার নমাজ মহামান্য খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) পড়াইয়াছিলেন। কিন্তু " তব্ কাত এব্ নে ছায়াদ " এ লিখিত আছে, জানাযার নমায্ হজরত আব্বাছ (রাজিঃ) পড়াইয়াছিলেন। তৎকাল প্রচলিত নিয়মানুসারে মহামান্য আমিরুল-মুমেনিন খলিফাতুল মোছলেমিন হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এরই জানাযার নমায্ পড়ান সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর অন্তিম নির্দ্দেশানুযায়ী হজরত আলী (কঃ—ওঃ)ই জানাযার নমায্ পড়াইয়া ছিলেন বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্ ই পরিজ্ঞাত।

এক রওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর এন্তেকাল মগরেবের নমাযের অব্যবহিত পরেই হইয়াছিল। তাঁহার জানাযায় হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত যোবের (রাজিঃ), হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়্যোফ্ (রাজিঃ) উপস্থিত ছিলেন ; হজরত আলী (রাজিঃ) ফরমাইলেন, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা 'আফ্জল' (উত্তম—সম্মানিত), সুতরাং তিনিই জানাযার নমায্ পড়াইবেন।

রওয়ায়েত আছে যে, হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর পরলোক গমনে আকাশ কাঁদিতে ছিল ; পৃথিবী শোক প্রকাশের সঙ্গে ক্রন্দন করিতে ছিল ; ফেরেশ্তাগণ 'নালা' (ক্রন্দনের সহিত শোক প্রকাশ) করিতেছিল ; বন-জঙ্গলে, মনুষ্যের বসতি স্থানে—যে দিকে দেখ, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'ওফাতের' (মৃত্যুর) 'মাতম' (শোক-প্রকাশ) জারী ছিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর গৃহের 'শাময়া' (চেরাগ—প্রদীপ) 'গুল' (নির্ব্বাণ) প্রাপ্ত হইয়াছিল। শোকের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার বীর হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল। পৃথিবীর সকল জিনিষই শোকার্ত্ত বোধ হইতেছিল। এক 'যমানায়'—হজরত রেছালত মাব্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের পরলোক গমনে, মদীনা তৈয়বায় শোকের প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্ত প্রবাহিত হইয়াছিল ; সকলেই মহাপুরুষের অন্তর্ধানে ভীষণ শোকানলে দগ্ধীভূত হইতেছিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার কথা ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগের স্মৃতিপথে পতিত হইতেছিল। নরনারী সকলেই দুর্ব্বহ শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলের মস্তকেই যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আজ হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পরলোক গমন

সংবাদে তাঁহাদের শোকাবেগ নূতন ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রত্যেকে সেই স্বর্গ-রাজ্ঞীর 'আখ্লাক্' (সৌজন্য), দীন-দরিদ্রের প্রতি করুণা বিতরণ, এতিম-এছিরের প্রতি স্নেহ-প্রদর্শন, উপাসনা আরাধনায় পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ, খোদা তা-লার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা, আদর্শ চরিত্রতা, নম্রতা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি যাবতীয় সদ্গুণের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইলেন। দুনিয়া হইতে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি যেন হঠাৎ বিলীন হইল; ধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতিঃ যেন অকস্মাৎ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুতে অনেক নর-নারীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া যেন চুরমার হইল। এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের চেহেরা 'যরদী' (হরিদ্রা বা পাণ্ডুবর্ণ) ধারণ করিয়াছিল। ইঁহাদের 'জগরে' (হৃৎপিণ্ডে) এই দ্বিতীয় প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়া ছিল। কখনও স্বীয় পরম ভক্তি-ভাজন মানব কুলশ্রেষ্ঠ নানার (মাতামহের) 'শকল' (প্রতিকৃতি বা ছবি) তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদয় হইত, আর কখনও 'শফিক্' (স্নেহ-কারিণী) মাতার চেহারা স্মরণ পথে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে একান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিত। ইঁহারা স্বীয় শোকার্ত্ত পিতার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া আরও 'পেরেশান' হইতেন। দুনিয়ার সকল দিকেই তাঁহারা 'গম' (শোক) ও ব্যাকুলতাই দেখিতে পাইতেন। শাহ্যাদী দ্বয়ের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। মাতৃহীনা ক্ষুদ্র বালিকাদ্বয় স্নেহময়ী জননীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন। গৃহ তাঁহাদের পক্ষে ভীষণ শোকপুরী বলিয়া বোধ হইত। কে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবে? জননীর স্নেহ-ছায়া তাঁহাদের মস্তকোপরি হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বীর হৃদয় মৃৎপাত্রের ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; তিনি স্নেহের কুসুম পুত্র কন্যাদিগকে বক্ষেঃ লাগাইয়া সান্ত্বনার বাণী শুনাইতেন, কত প্রকারে প্রবোধ দিতেন। কিন্তু সে ভাঙ্গাপ্রাণে কিছুতেই শান্তি বোধ হইত না।

নানা ও মায়ের অভাব কিছুতেই পূরণ হইতেছিল না। ভীষণ শোকের আঘাত বড়ই মারাত্মক হইয়া থাকে; সে শোকাগ্নি কোনও প্রবোধ বা সান্ত্বনার পানীতে নির্ব্বাপিত হয় না। মদীনা শরীফের কথা ত বলাই বাহুল্য, অনেক দূরবর্ত্তী স্থানের নরনারিগণ ও তাঁহার পরলোক গমন সংবাদে বিশেষরূপ শোক প্রকাশ করিতে ছিলেন। মক্কা-মোয়াজ্জমা, তায়েফ্, যেদ্দা, এমন, ওমান প্রভৃতি বহু দূরবর্ত্তী স্থানেও এই শোকের প্রচণ্ড আঘাত গিয়া লাগিয়াছিল। কারণ, মরহুমার ধর্ম্মনিষ্ঠা, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ, স্বামী সেবা, আর্ত্তজনের প্রতি করুণা প্রদর্শন, মহা সম্মানীয় ওয়ালেদ মাজেদের সম্পূর্ণ পদানুসরণ, দীনভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ, সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক কাজ স্বহস্তে সম্পাদন, নারী জাতিকে নানাপ্রকার উপদেশ দান, নিজের মুখের গ্রাস বুভুক্ষদিগকে প্রদান করিয়া তাহাদের ক্ষুন্নিবারণ, মানব মাত্রের প্রতি করুণা প্রদর্শন, তাহাদের মুক্তির জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্ তা-লার মহা দরবারে কাতরভাবে প্রার্থনা—ইত্যাদি সদ্গুণাবলী তদানীন্তন মোছলদিগের মধ্যে—সমগ্র আরব দেশের সর্ব্বত্র বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই পরিমাণে শোকের প্রবল স্রোত ও সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াছিল। বড় বড় ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) ও ছাহাবিয়া (রাঃ—আঃ)-দিগের ত কথাই নাই; সর্ব্ব শ্রেণীর মোছলমানদিগের মধ্যেই হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। আজ সকলে বুঝিতে পারিলেন, হজরত রছুল (ছালঃ)-এর গৃহের সর্ব্বপ্রধান 'শামাদান' (প্রদীপ) টি নির্ব্বাপিত হইল। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পূর্ণাদর্শ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইল।

যদিও আজ প্রায় তেরশত বৎসর অতীত হইল, হজরত খাতুনে জন্নত এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি নারীজাতির যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার যে স্মৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা

কেয়ামত (মহা প্রলয়কাল) পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। মোছলেম নরনারী তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিবে। নানা ভাষায় লিখিত তাঁহার পবিত্র জীবনী মানুষের মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার করিবে। তাঁহার পবিত্র স্মৃতি কিছুতেই মুছিয়া যাইবার নহে।

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পরলোক গমনের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জীবনীতে ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং তাহার আর পুনরুল্লেখ হইল না। তিনি কোনওরূপ পীড়াগ্রস্ত হইয়া এন্তেকাল ফরমান নাই। দারুণ পিতৃ-শোকে বিদগ্ধ হইয়া, জীর্ণ-শীর্ণ দেহে দুর্ব্বল হইতে হইতে মৃত্যু-পথের পথিক হইয়াছিলেন। এই প্রায় ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার চক্ষের পানী শুকাইয়া ছিল না; নীরবে সর্ব্বদা অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেন। জীবন তাঁহার পক্ষে ভার বোধ হইতেছিল। তিনি পরম ভক্তি-ভাজন ওয়ালেদ মাজেদের সঙ্গে সম্মিলিত হইবার জন্য একান্তই আকুল হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। পরম ভক্তি-ভাজন স্বামী, অতি স্নেহ-ভাজন পুত্রদ্বয়ও পরম স্নেহের পাত্রী কন্যাদ্বয়কে ছাড়িয়া যাইতে অবশ্যই মনে বিষম কষ্ট অনুভব করিতেন। মাতৃহীন বালক-বালিকার যে শোচনীয় দুর্গতি হয়, তাহাও সময় সময় চিন্তা করিতেন; কিন্তু পিতার সঙ্গে সম্মিলন-আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল হইয়াছিল যে, প্রণয়-ভালবাসা ও স্নেহের বন্ধনও তিনি অবাধে ছিন্ন করিয়াছিলেন। পৃথিবীর কোনও বন্ধনই তাঁহাকে পিতার সম্মিলন-আকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত রাখিতে পারিতে ছিল না। এই সুদীর্ঘ ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার পবিত্র বদনে কখনও হাস্য প্রকটিত হইয়া ছিল না। আহারের রুচি তিরোহিত হইয়াছিল; জীবন ধারণের জন্য যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য মাত্র গলাধঃ করিতেন। পরম ভক্তি-ভাজন পিতার সঙ্গে সম্মিলিত হইবার জন্য তিনি এমন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে,

সে কথা বর্ণনা করা অসাধ্য। এমন পিতৃগত প্রাণ পুত্র কন্যা ছুনিয়াতে কাহারও দেখা যায় নাই। ফলতঃ তিনি সত্য সত্যই 'ছোলতানে দোজাহান' (ছালঃ)-এর কলেজার টুকরাই ছিলেন।

আবু নয়ীম (রাজিঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, জনাব হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, "যখন কেয়ামতের দিন সমাগত হইবে, সর্ব্ব প্রথমে আমি "পুল ছরাত" এর উপর দিয়া গমন করিব। তৎপর বলা হইবে, হে আহ্‌লে হশর (হশরে উপস্থিত লোক সকল)! তোমরা স্ব স্ব চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ কর, কারণ ফাতেমাঃ যোহরাঃ বিন্তে হজরত মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহ ওয়া আলায়হে ওয়া ছাল্লাম) পুল ছরাত পার হইয়া যাইবেন। তিনি এমন 'শান' ও 'শওকতে' পুলছরাত পার হইবেন যে, ছুইখানি চাদর দ্বারা তাঁহার পবিত্র দেহ আচ্ছাদিত থাকিবে।

আবু নয়ীম (রাজিঃ), হজরত আবু হোরেরা (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, আমি হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর মুখে শুনিয়াছি, তিনি ফরমাইতেন, যখন ক্কেয়ামতের দিন সমাগত হইবে, হেজাবী (হাশর প্রান্তরে উপস্থিত ব্যক্তি) গণকে ঘোষণাকারিগণ ঘোষণা করিয়া বলিবে, হে লোক সকল! তোমরা চক্ষু মুদ্রিত কর, এবং স্ব স্ব মস্তক অবনত করিয়া লও, কারণ ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) বিন্তে হজরত রছুল (ছালঃ) পুল ছরাত পার হইয়া 'জন্নতে' ('বেহেশ্‌তে'— মোছলেম-স্বর্গে) গমন করিতেছেন।

মোছলেম (রহঃ), হজরত আনছ (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, জনাব হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, সর্ব্ব প্রথমে আমি জন্নতের (বেহেশ্‌তের) দরওয়াযাঃ খট্‌-খটাইব (দ্বারে করাঘাত করিব), এবং উহার দরওয়াযাঃ খোলাইব; 'খাতুনে জন্নত'

(বেহেশ্তের অধ্যক্ষ) জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি কে ? আমি বলিব: মোহাম্মদ (ছালঃ) ; তখন বেহেশ্তের অধ্যক্ষ বলিবেন, আপনার সম্বন্ধে এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, আপনার পূর্ব্বে কাহারও জন্য যেন বেহেশ্তের দরওয়াযাঃ খোলা না হয়। আপনার পরে (হজরত আবু হোরেরাঃ [রাজিঃ]-এর রওয়ায়েতানুসারে) হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) 'ফরদওছ বরিঁতে' দাখেল হইবেন (প্রবেশ করিবেন)। তাঁহার খাতুনে জন্নত নামের সার্থকতা এই উক্তির দ্বারাই স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি হয়।

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'মকামাতে দফন' (কবরের স্থান) বিভিন্ন 'রওয়ায়েত' (বর্ণনা) অনুসারে ৪ স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। ১। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র রওযাঃ মবারকের 'পোশ্ত্' (পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশে)—মছজেদ নববীর অভ্যন্তরে। এই স্থান 'বেলা এখ্তেলাফ্' (বিনা মতভেদ) ছুন্নি ও শিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মোছলমানগণ 'যেয়ারত' করিয়া থাকেন। এখানে কবরের জায়গা তৈয়ার করা আছে ; অর্থাৎ স্থানটি কবরের ন্যায় করিয়া রাখা হইয়াছে। উহাতে 'কত্বাঃ' (স্মারক-লিপি—লিখিত প্রস্তর ফলক) ও স্বতন্ত্র ভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ২। এক অপরিজ্ঞাত স্থলে—মছজেদ নববীর মিম্বর ও আঁ হজরত (ছালঃ)-এর রওজাঃ শরীফের মধ্যবর্ত্তী স্থানে খাতুনে জন্নতের পবিত্র কবর আছে বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করেন ; এই স্থানে কেবলমাত্র শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা যেয়ারত করিয়া থাকেন। ৩। এক রওয়ায়েত অনুসারে তাঁহার 'মদফন' (কবর) রওজাঃ 'আহ্লে বয়েতে' আছে। এই রওজা মবারক 'জন্নতল-বকিয়' নামক সুনাম প্রসিদ্ধ কবরস্থানে অবস্থিত ; এবং উহার উপরিভাগে একটি সাদা 'গনবদ' (গুম্বজ) বিরাজিত—যাহার ইমারত 'যেয়াদাঃ শানদার' (বিশেষ আড়ম্বর পূর্ণ) নহে। ছাদের উপর জরিহ্-যরবফ্ত্ এর কাপড় আছে। হজরত

ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর কবরের সম্মুখবর্ত্তী দেয়ালে অত্যন্ত মূল্যবান্ 'তালায়ী' (স্বর্ণের) কারুকার্য্য খচিত চাদর দোদুল্যমান আছে—যাহা কয়েক সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে তৈয়ার হইয়াছে। এবারতের বহির্দ্বারের উপরিভাগে আরবী ভাষায় নিম্ন-লিখিত কবিতাটি উৎকীর্ণ আছে ঃ—

লি খাম্‌ছাতো উৎফিবেহা হারাল ওবা আল্ হাতেমাঃ ;

আল্ মোস্তফা ওয়াল মরতুজা ও আব্‌না হুমা ওয়াল ফাতেমাঃ।

রওজা শরীফ্ অর্থাৎ সমাধি মন্দিরের অভ্যন্তরে, খাতুনে জন্নত হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পবিত্র 'মযারে মবারক' (কবর শরীফ) 'জানেবে গরব্' (পশ্চিম দিকে) এক প্রান্তে—উচ্চ স্থানে অবস্থিত।

৫র্থ রওয়ায়েত অনুসারে তিনি " বয়তুল হযন " নামক স্থানে সমাহিত (কবরস্থ) হইয়াছেন। ঐ স্থান " জন্নতল-বক্কিয় " নামক স্বনামখ্যাত কবরস্থানের পশ্চাদ্দিকে ২০ 'কদম' (২০ পাদ) মাত্র দূরে অবস্থিত। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'ওফাতের' (পরলোক গমনের) পরে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) এই স্থানে বসিয়া পিতৃ-শোকে রোদন করিতেন। ঐ সময় এই স্থানটি জঙ্গলপূর্ণ ছিল। তিনি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া রোদন করা পছন্দ করিতেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র মযায় শরীফে সর্ব্বদা লোকেরা আসিয়া যেয়ারত করিতেন, সুতরাং সেখানে বেশীক্ষণ নির্জ্জন থাকা সম্ভবপর ছিল না ; এই জন্য এই জঙ্গল পূর্ণ নির্জ্জন স্থানে বসিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন, ইহাও তাঁহার এই স্থানে বসিয়া ক্রন্দনের অন্যতম কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয়। উল্লিখিত কারণে ঐ স্থানের নাম " বয়তুল হযন " বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর পরলোক গমনের পর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই স্থানে

একটি মছজেদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই মকামে একটি স্থান দুই গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া এবং সওয়া গজ উচ্চ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে; উহার দরওয়াযাঃ লৌহ-নির্ম্মিত। উহার উপরিভাগে 'ছব্‌য্‌' (সবুয্‌) মখ্‌মলের 'গেলাফ্‌ (আচ্ছাদনী) আছে। হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গুম্বজের চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক আরবী কবিতা উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

নয্‌দী ওহাবী বর্ব্বরগণ ঐ সকল পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন ভাঙ্গিয়া 'চূর-মার' করিয়া ফেলিয়াছে।

মহামাননীয়া হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পবিত্র 'মযার শরীফ্‌' (পাক কবর) সম্বন্ধে খাজা হাছন নেযামী ছাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই :—

এই গোর 'গোরবত্‌' বিন্তে রছুলোল্লার। ইহা হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'মরকদে খামুশ্‌' (নীরবে থাকিবার চির নিদ্রার স্থান)—যিনি হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) হবিবে খোদার 'নূর চশ্‌ম্‌' (নয়নের জ্যোতিঃ) ছিলেন। এখানে শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর 'খাতুন' (স্ত্রী—পত্নী) শয়ন করিয়া আছেন। এই পবিত্র ভূখণ্ডে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর মহা সম্মানিতা জননী 'কাফন' পরিয়া আরাম করিতেছেন। এই চুপ্‌চাপ্‌ (নীরবতা পূর্ণ) কবরের শোকে অশ্রুপাত কর। এই কবরের মধ্যে দুইজন বে-গোনাঃ (নিরপরাধ—নিষ্পাপ) 'মক্‌তুলের' (শহীদের—নিহত ব্যক্তির) মাতা এবং এক নিরপরাধ কাতলের (নিহত পুরুষের) 'যওজাঃ' (আহ্‌লিয়া—স্ত্রী)-এর 'আখেরাতের হুজরাঃ' (পরলোকের বাসস্থান বা বিশ্রাম স্থান) বানান হইয়াছে। আর এই মযার মবারকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অভিনিবেশ সহকারে ও ধ্যান-

স্তিমিত নেত্রে হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর উপদেশ-মূলক জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ কর। যে চিরস্থায়ী 'আওয়ায্' (শব্দ) শুনান হইতেছে, আর যে 'গম' (শোক) 'গায়েব' (অদৃশ্য) এখানে লিখিয়া দিয়াছে, তাহা এই :—

ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-বিন্তে হজরত মোহাম্মদ রছুলোল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম এর কবর (এই স্থানে), যিনি 'জন্নত' ('বেহেশ্ত'—মোছলেম-স্বর্গ)-এর স্ত্রীলোকদিগের 'ছৈয়দাঃ' (অধি-নেত্রী); যাঁহার জননী হজরত বিবী খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন; যাঁহার জনক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ), খোদা তা-লার সর্ব্বপ্রধান রছুল (পয়গম্বর -তত্ত্ববাহক) ছিলেন। আর যাঁহার 'খাওন্দ্' (স্বামী) আলা মরতুজা 'নওজওয়ান' (তরুণ যুবক) দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মোছলমান এবং মহব্বে খোদার (হজরত রছুলোল্লার) পূর্ণ 'মহবুব' (সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত প্রিয়পাত্র) ছিলেন—যাঁহার 'ফরয্‌ন্দ' (সন্তান—পুত্র) হজরত এমাম-হাছন (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছায়েন (রাজিঃ) শহীদগণের 'ছরদার' (নেতা) এবং যাঁহারা বেহেশ্‌তের তরুণ যুবকদিগের ছৈয়দ (ছরদার)। তিনি (খাতুনে জন্নত) দুনিয়ার 'আহ্‌লে দুনিয়ার' (পার্থিব ভোগাশক্তদিগের) ন্যায়-সুখ সম্ভোগ করেন নাই। তিনি চাকি দ্বারা আটা পিষিতেন, সমুদয় গৃহকার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন। তিনি ক্রমাগত কয়েক 'ওক্ত্' (বেলা) 'ফাকে' (উপবাস) থাকিতেন। কিন্তু এত কষ্টে থাকিয়াও খোদাতালার 'শেকায়েত' ('গেলা'—নিন্দাবাদ) কখনও করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা অন্য কেহ হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ)-কে 'মহব্বৎ' করেন নাই (ভালবাসেন নাই)। ইঁনি খোদাও তাঁহার রছুলের 'লাড্‌লী' (প্রিয়) 'বেটী' (কন্যা) ছিলেন। আর হজরত

রছুল (ছালঃ)-এর 'ওফাতের' (পরলোক গমনের) পর সর্ব্বপ্রথমে ইঁনি দুনিয়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে এবং খোদা তা-লার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই কবর—যাহা বনি-ফাতেমার 'ওম্মেদ' (আশা) কেয়ামত পর্য্যন্ত 'যেন্দাঃ' (জীবিত—স্থায়ী) রাখিবে। এই কবর দুনিয়ার 'গমযদাঃ' (শোকার্ত্ত) লোকদিগকে 'হশর' (পুনরুত্থান) পর্য্যন্ত 'তছল্লি' (প্রবোধ) দিতে থাকিবে। কেননা, কোনও ব্যক্তির এমন 'শান' (মর্য্যাদা—সম্মান) হইতে পারে না—যাহা হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ছিল। না এত 'মছিবত' (বিপদ—কষ্ট) কেহ সহ্য করিতে পারিবে, যে পরিমাণ বিপদ ও কষ্ট তিনি ভোগ করিয়াছিলেন। হশর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি দরুদ ও ছালাম বর্ত্তুক।"

হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-কে তাঁহার জনৈক 'ছহলী' (পরিচারিকা) জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, যদি কাহারও ৪০টি উট থাকে, উহার জন্য কি যাকাত দিতে হইবে। হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) উত্তর করিলেন, তোমার জন্য ৪০টিতে ১টী, আর আমার জন্য পূরা ৪০টি। এই 'মযহব' হজরত সিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর ছিল। তিনি যখন যথাসর্ব্বস্ব লুটাইয়া (বিলাইয়া—দান করিয়া) আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা আবকিত লা মেল্‌ক্" (স্বীয় আহ্‌ল ও আয়ালের [পরিবারবর্গের] জন্য কি রাখিয়াছ?); হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) তখন আরজ করিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রছুলকে। তবুক যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) যে চাঁদা তুলিয়াছিলেন, তাহাতে হজরত আবুবক্কর ছিদ্দিক (রাজিঃ) নিজের যথা-সর্ব্বস্ব আনিয়া জমা দিয়াছিলেন। হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর উক্তিরও ঐরূপই উদ্দেশ্য ছিল।

হজরত রছুল আকরম (ছালঃ)-এর 'ওফাতে' (পরলোক গমনে)

হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) একটি হৃদয় বিদারক কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এইরূপ ঃ—

" —'আয়' (হে) 'ওয়ালেদ' 'বোযর্গওয়ার' (পরম শ্রদ্ধের পিতঃ)! এক্ষণে ঐ সময় আমার সম্মুখে উপস্থিত যে, জিবরিল আলায়হেচ্ছালাম আমাকে আপনার পরলোক গমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

" আফ্ ছোছ আব্বাজান (আক্ষেপ পিতৃদেব) ! আপনি এক্ষণে আল্লাহ্ তা-লার হুজুরে তশরিফ্ লইয়া যাইবেন, আর 'জন্নতল ফেরদওছ' (পবিত্র 'বেহেশ্ত্'—স্বর্গধাম) আপনার বাসস্থান হইবে।

" যে ব্যক্তি আহ্মদ (ছালঃ)-এর কবরের ঘ্রাণ লয়, তাহার কর্ত্তব্য কি ? তাহার কর্ত্তব্য এই যে, সমগ্র জীবনে কোনও 'খোশবু' (সুগন্ধি দ্রব্য) এর ঘ্রাণ গ্রহণ না করে।

" আমার প্রতি ঐ 'মছিবত্' (বিপদ) উপস্থিত হইয়াছে যে, যদি উহা আলোপূর্ণ দিবসের উপর পতিত হইত, তবে উহা ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে পরিণত হইত। "

একবার হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু এই পীড়িত অবস্থায় সারারাত্রি য়েবাদতে (উপাসনাদি কার্য্যে) অতিবাহিত করেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যখন ফজরের নমায্ পড়িবার জন্য মছজেদে গমন করিলেন, তখন তিনি ও নমাযের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যখন মছজেদ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) চাক্কিতে আটা পিষিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি ফরমাইলেন, অয়ি রছুলে খোদার 'লখ্ত্ জগর' (হৃৎপিণ্ডের টুকরা)! এত 'মেহনত' (পরিশ্রম) করিও না। কিছুক্ষণ 'আরাম' (বিশ্রাম) করিয়া লও। এমন না

হয়, এইরূপ কঠোর পরিশ্রমে তোমার অসুখ বাড়িয়া যায়। তদুত্তরে হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) ফরমাইলেন, এ উভয় কার্য্য এমন নহে যে, ইহাতে ব্যারাম বৃদ্ধি হইতে পারে। খোদা তা-লার 'এবাদত' (উপাসনা ও আরাধনা)-এবং আপনার 'এতায়ত' (আদেশ পালন—তাবেদারী) ব্যাধির উৎকৃষ্টতম চিকিৎসা। যদি এই দুই কার্য্যের কোনও কার্য্য 'মওতের বায়ছ' (মৃত্যুর কারণ) হয়, তবে এই মৃত্যু অপেক্ষা কোন্ মৃত্যু অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিতে পারি—যাহার জন্য সহস্র জীবন উৎসর্গীত করা কর্ত্তব্য।

মক্কা-বিজয়ের পূর্ব্বে যখন মদীনা মনুওরায় আবু-ছুফিয়ানকে তাঁহার কন্যা ওম্মোল-মুমেনিন হজরত ওম্মে-হবিবাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত রেছালত মাবের 'মছল্লে' (জা-নমায্) হইতে এই বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছিলেন যে, তুমি কাফের, আর এই মছল্লে (জা-নমায্) জনাব পয়গম্বর আখেরয্ যমানের নমায্ পড়িবার স্থান, ইহার উপর তোমার 'নাপাক' (অপবিত্র) শরীর লাগান চাই না। আবু-ছুফিয়ান নিরাশ হইয়া হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন পূর্ব্বক হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, হে বাচ্চা (শিশু)! তুমি আমাকে স্বীয় 'পানায়' (আশ্রয়ে) গ্রহণ কর। তাহা শুনিয়া হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) এরশাদ ফরমাইলেন, "হজরত রছুল আকরম (ছালঃ)-এর 'মরজীর খেলাফ্' (মত-বিরুদ্ধে) আজ মদীনা-মনুওরার কোনও ব্যক্তিই তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে না। তুমি এখান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাও (আল্-হেশামী, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)। যদি তুমি আপনাকে বাঁচাইতে চাও, তবে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে গিয়া হাজের হও।"

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনারা খাতুনে জন্নত হজরত ফাতেমাঃ

যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পবিত্র জীবনী—অর্থাৎ জীবনের ঘটনাবলী অবশ্যই বেশ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন। নারী জীবন ইহাপেক্ষা পবিত্রতর হইতে পারে কি? একটি মহিলার মধ্যে যত প্রকার সদ্‌গুণাবলী থাকিতে পারে, মহামাননীয়া ছৈয়দতন্নেছা (রাঃ—আঃ)-এর জীবনে তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লা জল্লশানহুর প্রতি তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার আদেশ-নিষেধ তিনি আজীবন দৃঢ়ভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মহামাননীয় পিতা, তদীয় কর্ণকুহরে যে সকল উপদেশামৃত অহর্নিশ ঢালিয়া দিতেন, তিনি ক্ষণকালের জন্যও তাহা বিস্মৃত হইতেন না। সেই সকল অমূল্য উপদেশ তিনি অতি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেন; এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেন। পবিত্র কোরআন মজীদের মর্ম্ম তিনি পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহার প্রকাশ্য মর্ম্ম ব্যতীত আধ্যাত্মিক মর্ম্মও পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মহামাননীয় পিতা তাঁহাকে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা শুনাইতেন; তিনি মনোযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ করিয়া, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইতেন; সঙ্গে সঙ্গেই পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইত; সেই ভক্তির পবিত্র স্রোতে তাঁহার হৃদয় পবিত্রীকৃত হইত। আর সঙ্গে সঙ্গে এছলামের পবিত্র জ্যোতিঃতে তদীয় ক্ষুদ্র হৃদয় খানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত; তখন তিনি তন্ময় চিত্তে ভাব সাগরে ডুবিয়া যাইতেন—আত্ম-বিস্মৃত হইতেন।

হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া মহা-মাননীয় পিতার স্নেহ-ক্রোড়ে পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। পিতা তাঁহাকে যেরূপ স্নেহ করিতেন, ভালবাসিতেন, পৃথিবীতে কোনও

পিতা স্বীয় দুহিতা-রত্নকে সেরূপ স্নেহ করেন নাই—ভালবাসেন নাই—সমগ্র স্নেহ-রাশি কন্যার প্রতি উৎসর্গীত করেন নাই। পক্ষান্তরে কন্যাও পিতাকে সেইরূপ অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন। পিতা যেমন পুত্র ও কন্যার প্রাপ্য সমস্ত স্নেহ স্বীয় প্রাণ-প্রতিম কন্যা-রত্নের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন; পিতা ও মাতার সমুদয় স্নেহ-ভালবাসা তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন; কন্যা-রত্ন ও সেইরূপ পিতা এবং মাতার প্রাপ্য সমুদয় ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পিতার প্রতি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা যে খোদা তা-লার প্রেরিত সর্ব্ব প্রধান পয়গম্বর, প্রেরিত মহাপুরুষ, ভাববাদী নবী বা রছুল, তাহা তিনি সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি স্বীয় মহান্ পিতার সর্ব্বপ্রকারে পদানুসরণ করিতেন; তাঁহার প্রত্যেক বাণীর মূল্য শত কোটি "কোহেনূর" অপেক্ষাও মূল্যবান্ মনে করিতেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার কোনও আদেশের ক্ষুদ্রতম অংশের ও যাহাতে অন্যথাচরণ না হয়, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। মহামান্য পিতা যখন তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়া নানা উপদেশ-বাণী শুনাইতেন, সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া—অন্য বিষয় ও অন্য চিন্তা ভুলিয়া গিয়া, সেই পবিত্র উপদেশ-সুধা-তিনি পান করিতেন। উহাই তাঁহার 'রূহের গেজা' (আত্মার খোরাক বা খাদ্য) ছিল। আবার অনেক সময় স্বীয় খোদা-গতপ্রাণ আদর্শ স্বামী শেরেখোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেন; সদুপদেশ ব্যতীত অন্য কথা তাঁহার কাণে স্থান পাইত না। যখন পিতৃ-গৃহে গমন করিতেন, তখন পবিত্র চরিত্রা আদর্শ স্থানীয়া বিমাতা দিগের নিকটও নানাপ্রকার উপদেশ-বাণী এবং আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র হাদীছ সকল শুনিয়া চরিতার্থ হইতেন। মহামাননীয় ওয়ালেদ মাজেদ গৃহে উপস্থিত থাকিলে,

তিনি পবিত্র কোরআনের বাণী ও মৌখিক উপদেশ বাণী শুনাইতেন। গৃহে যখন তাঁহার সমবয়স্কা বালিকা ও মহিলা—ছাহাবীয়া (রাঃ—আঃ) গণ আগমন করিতেন, তাঁহাদের সঙ্গেও প্রধানতঃ ধর্ম্মালোচনাই হইত। তাঁহারা স্ব স্ব পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা বা স্বামীদিগের নিকট পবিত্র কোরআনের যে সকল বাণী বা ব্যাখ্যা ও হাদীছ শুনিতেন, তাহাও খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)কে শুনাইতেন, আবার তাঁহারা ইঁহার নিকট ধর্ম্মের অনেক নূতন বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হইতেন। কুকথা, পরের নিন্দা-গ্লানি প্রভৃতি কখনও তিনি শুনিতেন না বা বলিতেন না। পরনিন্দা কারিণী, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ কারিণী বা ঐ শ্রেণীর কোনও স্ত্রীলোকের তাঁহার গৃহে প্রবেশাধিকার ছিল না। ভয়ে ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোক তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিত না। আর অল্পদিনের মধ্যেই মদীনা হইতে বিধর্ম্মীর অস্তিত্ব প্রায় লোপ পাইয়াছিল। পৌত্তলিক, য়িহুদী ও খৃষ্টানের নাম-নেশানও তথায় ছিল না। অবশ্য মোনাফেক (কপট মোছলমান)-দিগের একটী দল ছিল, কিন্তু তাহাদের স্ত্রীলোকদিগের ও খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গতিবিধি ছিল না। সুতরাং তদীয় পবিত্র গৃহ পাপীর পাদস্পর্শে কখনও কলুষিত হয় নাই : আর কোনও রূপ পাপ বাক্য তাঁহার কর্ণেও কদাপি প্রবেশ করে নাই। পবিত্র মদীনা নগরী ক্রমে একটি স্বর্গীয় পুণ্য নগরীতে বা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল।

স্বামী ভক্তি ও স্বামী সেবা—যখন তাপসকুল-চূড়ামণি শেরে খোদা মহাবীর হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর সহিত পবিত্র পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন, তখন তিনি কিরূপ গরীব-'নাতোয়ান' ছিলেন, তাহা তদীয় জীবন-চরিত ও হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবন-বৃত্তান্তে ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের মধ্যে মহামান্য হজরত আলী মর্ত্তুজাঃ

(কঃ—ওঃ)-এর স্থায় দরিদ্র ব্যক্তি অতি অল্পই ছিলেন। অতি কষ্টে তাঁহাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। অধিকাংশ সময় অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে তাঁহাদের দিন কাটিয়া যাইত। আজকাল আমাদের শরীফ্ নামধারী ব্যক্তিরা শ্রমজীবি ও কৃষিজীবির নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা "শরীফ্" ও "রজিল"—"আশ্রাফ্" ও "আত্রাফ্" এই তুইটী দলের স্থষ্টি করিয়া হিন্দুদিগের স্থায় একটা বিরাট জাতিভেদের স্থষ্টি করিয়াছেন; এই জাতিভেদ দ্বারা তাঁহারা মোছলমানদিগকে নিতান্তই দুর্ব্বল ও একতা বিহীন করিয়া ফেলিয়াছেন। আছল বা নকল ছৈয়দ ও মীর ছাহেবেরা দরিদ্রতা-নিবন্ধন ভিক্ষাজীবী সাজিয়াছেন—যে ভিক্ষা গ্রহণ করা তাঁহাদের পক্ষে একেবারে 'নাজায়েয্' (নিষিদ্ধ); লেখাপড়া না শিখিয়া খোন্কার বা 'ছায়েল' সাজিয়াছেন, কিন্তু ওদিকে বংশ-মর্য্যাদার অভিমানে একেবারে অন্ধ। অথচ কিছু অর্থলাভ হইলে সেই "রজিল" বা "আতরাফ্" উপাধী বিশিষ্ট কৃষি-জীবি এবং শ্রমজীবির কন্যা বিবাহ করিতে, বা তাহাদিগকে কন্যা সম্প্রদান করিতে একটু মাত্রও কুন্ঠিত নহেন। সেই ছৈয়দ, মীর বা আশরাফ্ কুল-তিলকগণ একথা স্মরণ করেন না যে, স্বয়ং হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) ও হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ) শ্রমজীবির কাজ করিতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত হন নাই। ইহার তুই একটি দৃষ্টান্ত শেরে খোদা হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহুর জীবন-চরিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ছৈয়দ, মীর ও শরীফ্ ছাহেবেরা চরিত্রহীন, ব্যভিচারী, নেশাখোর, বে-নামাযী, সুদখোর প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইলেও, হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের স্থায় তাঁহাদের মধ্যে আত্মাভিমান ও আত্মগর্ব্ব পূর্ণভাবে বিরাজমান। একজন শ্রমজীবী কৃষি-জীবী, বস্ত্রশিল্পী বা মৎস্যজীবী মোছলমান দিনী এলেমে মহাবিদ্বান্, শরাপরস্ত্, দীনদার-পরহেয্গার হইলেও দুশ্চরিত্র আশরফ্ তাহা হইতে আপনাকে

উচ্চতম মনে করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে বা হিন্দুস্থানে হিন্দুজাতির সংস্পর্শে ও দৃষ্টান্তে তাঁহারা ঈদৃশ মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন। পরম করুণাময় আল্লাহ তা-লার দরবারে ঈদৃশ-শরীফ্ রযিল এবং আশরাফ্-আতরাফের কোনও তারতম্য নাই; সেখানে তারতম্য দিনী-এলেম, দিনদারী-পরহেজগারী, খোদা তা-লার আদেশ-নিষিদ্ধ পালন কার্য্যের।

যাহা হউক, হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) দরিদ্র স্বামীর গৃহে আসিয়াও মহামান্য পিতার উপদেশ এবং স্বীয় শিক্ষা ও দীক্ষা অনুযায়ী "শোকর-গোযার" ছিলেন। সেই দরিদ্র অবস্থাকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। দরিদ্র স্বামীর প্রতি ক্ষণকালের জন্যও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই; দরিদ্রতার জন্য দুঃখানুভব করেন নাই; আদর্শ সতী-সাধ্বী রূপে প্রাণপণে স্বামী-সেবা করিয়াছেন,—অবনত মস্তকে স্বামীর সকল আদেশ পালন করিয়াছেন। নিজে অনাহারে থাকিয়া তাঁহাকে তৃপ্তি সহকারে আহার করাইয়া, স্বয়ং পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। স্বামীর আদেশের বিপরীতাচরণ কখনও করেন নাই। নিজের অসুস্থ শরীরেও স্বামীর সর্ব্বপ্রকার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন। তাঁহার বস্ত্র ধৌত করিয়া দিয়াছেন; তাঁহার অজু ও গোছলের পানী যোগাইয়াছেন; জীবনে কখনও তাঁহার আদেশের বিপরীতাচরণ করেন নাই; কোনও জিনিষের জন্য তাঁহার নিকট আবদার করেন নাই; কিসে তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন, সর্ব্বদা সেই চিন্তা ও সেই খেয়ালই করিতেন।

যখন তিনি সন্তানের মা হইলেন, সংসারের কাজ কর্ম্ম ক্রমে বাড়িয়া চলিল, একদিকে চাক্কিতে আটা পেষা, ঘর ও আঙ্গিনা পরিষ্কার করা, হাঁড়ি বাসন মাজা, স্বামী ও পুত্র-কন্যার বস্ত্রাদি ধৌত করা, ছেলে মেয়েদিগকে 'গোছল' (স্নান) করান, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার

সাংসারিক কার্য্য তাঁহাকে স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে হইত। এতগুলি কাজের সঙ্গে স্বামী সেবা, স্বামীর পরিচর্য্যা ইত্যাদি করা, সেলাই ইত্যাদি করা কত দূর কষ্টকর, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই সকল সাংসারিক কাজ করিয়া নিয়মিত রূপে দৈনিক ৫ 'ওয়াক্ত' (সময়—বার) নমায্ পড়া, দোওয়া-দরূদ পড়া, কোরআন 'তেলাওত (পাঠ), রাত্রিকালে, তাহাজ্জদ ও অন্যান্য নফল নমাজ পড়া, কত-দূর গুরুতর ব্যাপার, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। তিনি বিশ্রাম ও শয়ন করিবার সময় বা অবসর খুব কমই পাইতেন। দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি বোধ হয় ৪ ঘণ্টা কালও শয়ন এবং বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতে পারি-তেন না। চাক্কিতে আটা পিষিবার সময়ও তিনি কোরআন পাঠ করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়েদিগকে উপদেশ প্রদানেও ত্রুটি করিতেন না। আবার পাড়া প্রতিবেশিনী, সমবয়স্কা বালিকা এবং যুবতিগণ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাঁহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া আলাপ এবং ধর্ম্মালোচনা করিতেন; ধর্ম্মকথা শুনিতেন, এবং বলিতেন। মহামাননীয় পিতার নিকট যে সকল উপদেশ ও নীতি কথা শুনিতেন, তাহা সমাগত মহিলাদিগের নিকট বর্ণনা করিতেন। ধর্ম্মকথা, নীতিকথা, সাংসারিক বিষয়ের কথা ছাড়া অন্য প্রকার গল্প-গুজব করিতেন না বা শুনিতেন না। তাঁহার মুখে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকথা ও নীতিকথা শুনিয়া সমাগত মহিলা ও বালিকাগণ মহাতৃপ্তি লাভ করিতেন। তাঁহাদের মনে হইত, যেন কোনও ধর্ম্ম-সভায় বসিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, উপাসনা-আরাধনা, স্বামী-সেবা, সন্তানগণের প্রতি স্নেহ-প্রদর্শন, সাংসারিক কার্য্যাবলীর আলোচনা করিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইতেন; এবং শত মুখে তাঁহার প্রশংসা করিতেন।

তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ, দরিদ্র ও অনাথ বালক-বালিকার প্রতি

দয়া ও সহানুভূতি, সকলের প্রতি সদয়-নম্র ব্যবহার, পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ, নিজে অনাহারে থাকিয়া খাদ্য-প্রার্থীর উদর পূরণ করণ, নিজে কপর্দ্দক শূন্য হইয়াও দরিদ্র 'ছায়েলের' (সাহায্য-প্রার্থীর) ছওয়াল পূর্ণকরা—প্রভৃতি তাঁহার দাতব্য-শক্তির জ্বলন্ত প্রমাণ ছিল। যদি ঘরে কিছু না থাকিত, ধার-কর্জ্জ করিয়া দরিদ্রের ছওয়াল পূর্ণ করিতেন। নিজের বস্ত্রাভাব থাকিলেও, যে সামান্য বস্ত্র থাকিত, তাহা হইতে যতদূর সম্ভব (পুরাতন ছেঁড়া হউক না কেন,) বস্ত্রা-প্রার্থীকে দান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন, এবং তাহাতেই তাঁহার আত্ম-প্রসাদ অনুভূত হইত। দান কার্য্যে তাঁহার হস্ত নিতান্ত 'দারায্' (দীর্ঘ) ছিল। যদি ঘরে কিছুই না থাকিত, আর ভিক্ষা-প্রার্থীকে তিনি কিছুই দিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তিনি বড়ই মনোকষ্ট অনুভব করিতেন ; তাঁহার প্রাণে বিষম আঘাত লাগিত।

সৎমা দিগের প্রতি তাঁহার প্রবল ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। সকল বিমাতার প্রতিই তিনি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন। আদবের সঙ্গে তাঁহাদিগের নিকট বসিয়া কোরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা শুনিতেন। মহামাননীয় পিতার সেই সকল অমূল্য উপদেশ-বাণী হৃদয়-পটে গভীর ভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন। জীবনে কাহারও সহিত তাঁহার মনোবাদ বা মন কষাকষি হয় নাই। তিনি প্রত্যেক নর-নারীর শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং স্নেহ-ভালবাসা লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। কোনও ব্যক্তিই তাঁহার নিন্দা-'শেকায়েত'এর সুযোগ পান নাই। তিনি সকলের ভক্তিমতি জননী স্বরূপিনী ছিলেন। সকলের মুখেই তাঁহার প্রশংসাবাদ শুনা যাইত। মহামাননীয় পিতার সম্পূর্ণ আদর্শে তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল।

একটী নারীর মধ্যে যত প্রকার সদ্‌গুণ ও সদাচার থাকিতে পারে,

একটী মহিলা যতদুর আদর্শ স্থানীয়া হইতে পারেন, হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর মধ্যে তৎসমুদয়ই পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছিল। তিনি অতি লজ্জাশীলা ছিলেন। পরদা সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ দৃঢ়তা ও কঠোরতা ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ তিনি সর্ব্বপ্রকারেই স্বর্গের মহারাজ্ঞী স্বরূপিনী ছিলেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার নিকট তিনি সম্পূর্ণ রূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে পরাৎপর মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী বলিয়া মনে করিতেন; এবং সেইরূপ ভাবেই জীবনের ২৮ বা ২৯ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যদিও বর্ত্তমান কালের ন্যায় শিক্ষা-প্রণালী তখন প্রবর্ত্তিত ছিল না; কিন্তু তৎকালোচিত শিক্ষালোকে তাঁহার পবিত্র হৃদয় আলোকিত ছিল। পবিত্র কোরআন ও হাদীছে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। কখনও কাহারও নিন্দা-চর্চ্চা করেন নাই; হাস্য-পরিহাস করেন নাই; বৃথা গল্প-গুজবে আত্ম-নিয়োগ করেন নাই; নম্রতা, শিষ্টতা, সৌজন্য, ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ প্রভৃতি সদ্গুণাবলী তাঁহার হৃদয়ের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল। তিনি সময়ের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতেন, একটু সময় ও বৃথা নষ্ট করিতেন না। একের গোপনীয় কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। লোক-সেবায়, পরোপকারে তাঁহার মন কত উন্নত ছিল; একাধিক উর্দ্দু কবিতায় তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরের দুঃখ দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিত; নেত্র-নীরে তাঁহার বসন ভিজিয়া যাইত। ফলতঃ তিনি সর্ব্ব-প্রকার সদ্গুণের আধার ছিলেন; একাধারে এতগুণ মানুষে সম্ভবে না।

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর কর্ত্তব্য পরায়ণতা, প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার, বিপন্নের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, পরোপ-

কারিতা প্রভৃতি গুণের বহু কাহিনী বহু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; এই গ্রন্থেও একটি উর্দ্দু কবিতায় একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ঘটনাটি এই :—শমঊন নামক মদীনাবাসী একজন য়িহুদী বড়ই এছলাম-বিদ্বেষী ছিল ; সে কাফেরী অবস্থায় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি বড়ই বিদ্বেষ প্রকাশ করিত, তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতে সে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার এমনই অপূর্ব্ব মহিমা যে, সেই কাট্টা কাফের শমঊন য়িহুদী, পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে-দীক্ষিত হইয়া এছলামের জন্য জীবনোৎসর্গকারী হইলেন ; তদ্দর্শনে তদীয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সম্প্রদায়ের লোক সকল তাঁহার প্রতি বিষম কোপাবিষ্ট হইল, তাহারা তাঁহার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিল। শমঊন একজন বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ছিলেন ; এছলাম ধর্ম্ম গ্রহণের পর সেই বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তিনি নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িলেন ; তাঁহার সংসার চলা ভার হইল। স্বজাতির নিকট তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ও তাহাদের দ্বারা পদে পদে নিগৃহিত হইতে লাগিলেন। বিপদের উপর বিপদ ; পরিবারের মধ্যে এক স্ত্রী ব্যতীত তাঁহার আর কেহ ছিল না। অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া তাঁহার স্ত্রী মারা পড়িলেন। তখন তিনি এমন বিপন্ন হইলেন যে, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কে তাঁহাকে (শমঊনের মৃতা স্ত্রীকে) গোছল দেওয়াইবে, এই চিন্তায় তিনি নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখনও মদীনার মোছলমান সমাজের সঙ্গে তিনি পরিচিত হইয়া ছিলেন না ; সুতরাং মৃতা স্ত্রীকে লইয়া তিনি কিঙ্কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। অচিরে হজরত খাতুনে জন্নতের দাসী গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করিল। তিনি সংবাদ শ্রবণে শমঊনের বিপদে নিতান্ত সহানুভূতি সম্পন্না হইয়া 'রওয়া' (বোরকা বিশেষ) পরিয়া সেই নব-দীক্ষিত মোছলমানের গৃহে উপস্থিত

হইলেন ; এবং যথানিয়মে স্বহস্তে তাঁহার স্ত্রীর মৃত-দেহের গোছল দেওয়াইলেন ; তাঁহাকে কাফন পরাইলেন ; অবশ্য এই অবসরে মোছলমানগণ সংবাদ প্রাপ্তে তথায় উপস্থিত হইয়া, মৃত-দেহের জানাযার নমায্ আদায় ও জাতীয় কবরস্থানে মৃতাকে নিয়া দফন করিলেন ; হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার এই কার্য্যটি কতটা সহৃদয়তার পরিচায়ক ও প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তাহা চিন্তা ও বিবেচনা করিবার বিষয়। আমরা বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ উচ্চ আদর্শ হইতে কতদূরে গিয়া পড়িয়াছি, তাহা মনে হইলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। মনে হয় আমাদের আদর্শ কত নীচু ও কত খাটো হইয়াছে।

মহামাননীয়া হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর তরুণ বয়স্ক পুত্ররত্ন এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের মধ্যে যদি কখনও বাল-সুলভ ঝগড়া-ঝাটি হইত, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া তাঁহার জননীর নিকট বিচার-প্রার্থী হইতেন, তাহা হইলে তিনি ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদের জন্য—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দোষারোপের জন্য, আল্লাহ্ তা-লার ভয় দেখাইতেন ; ইহা যে পাপ কার্য্য, তাহা বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিতেন ; আর আল্লাহর দরবারে পাপ-মোচনের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিতেন। সেই ৫।৬ বৎসর বয়স্ক বালকদ্বয় আপনাদের দোষ-ত্রুটি বুঝিয়া লজ্জানুভব করিতেন, ভীত হইতেন ; এবং জননীর উপদেশানুসারে আল্লাহর দরবারে 'তওবা' (অনুশোচনা—পাপ মোচনের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা) করিতেন। মাতাও সেই সঙ্গে দুই হাত তুলিয়া পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে 'মনাযাতে' (প্রার্থনায়) শরীক হইতেন। এইরূপে তিনি বালক দ্বয়কে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতেন। সেই তরুণ বয়স হইতেই এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের হৃদয়ে পাপের ভয় বদ্ধমূল হইয়াছিল। যে বিষয়ের দোষ মাতা কিংবা পিতা অথবা মাতামহ জনাব হজরত

রছুলে করিম (ছালঃ) বুঝাইয়া দিতেন, ঐ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে বলিতেন, ভ্রাতৃদ্বয় তাহা মানিয়া লইতেন—গ্রহণ করিতেন, তাদৃশ কার্য্য জীবনে আর কখনও করেন নাই। এই উপায়ে তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই পাপে ভীত এবং পাপ কার্য্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন. তাহার ফল স্বরূপ এই ছাহেবযাদাঃ দুইটি দুনিয়াতে আদর্শ পুরুষ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রগণও আদর্শ ধর্ম্মবীর হইয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে শত সহস্র আওলিয়া-আব্দাল, তাপস, ছুফী ও আদর্শ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া মানব সমাজে ধন্য ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

আদর্শ সতী-সাধ্বী পতিব্রতা নারী ও বেহেশ্‌তের রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) পৃথিবীতে নারী কুলের শিরোভূষণ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কোনও নারীর তুলনাই হইতে পারে না। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে এরূপ মহিলা-রত্ন কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং ভবিষ্যতেও করিবেন না। তিনি নারী জাতির সে সর্ব্বোন্নত আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন ; এই প্রায় সাড়ে তের শত বৎসর যাবৎ মোসলমান জগতে তাঁহার জীবনের পুণ্য-কাহিনী সুবর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা এছলামের মর্য্যাদা বুঝেন, এছলামের গৌরব অনুভব করেন, নারী জাতির আদর্শ কত উন্নত হইতে পারে, এ বিষয় চিন্তা ও আলোচনা করেন ; সত্য ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষায় চেষ্টা পায়েন, তাঁহারা ধীরভাবে মহামাননীয়া হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবনী সমালোচনা করিয়া ধন্য হন। তাঁহারা তাঁহার পবিত্র জীবনী মধ্যে অমূল্য ও সর্ব্বোন্নত আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক উপদেশ মোছলমানদিগের পরকালের সম্বল ; মোছলমান নারীদিগের পক্ষে উহা

সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়। তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও কার্য্যাবলীর অনুকরণ ও অনুসরণ করিলে আজও মোছলমান নারী সমাজ উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অনেক ভাগ্যবতী মোছলমান মহিলা তদীয় পবিত্র আদর্শ সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক দুনিয়াতে ধন্য ধন্য হইয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের আখেরাতের পথ ও দীপ্তি-সম্পন্ন; তাঁহারা মুক্তি পথের পান্থ হইয়াছেন। ধরাতল তাঁহাদেয় পক্ষে স্বর্গ-ধামে পরিণত হইয়াছিল।

অয়ি বঙ্গীয় স্নেহের মোছলেম ভগিনিগণ! তোমরা স্বর্গ-রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সম্পূর্ণ পদাঙ্কানুসরণ কর। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য-কলাপ, প্রত্যেক আচার-ব্যবহার, তাঁহার প্রত্যেক সদ্‌গুণ তোমরা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা পাও। তাঁহার ন্যায় সংযম, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, 'ছবর', 'শোকর' আয়ত্ত কর। বিলাসিতা ও বড় মানুষী চাল সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দাও। দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণে হৃদয় পরিপূর্ণ কর। সাংসারিক কাজ যতদূর সম্ভব, স্বহস্তে সম্পাদন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা কর। আদর্শ শিক্ষা আয়ত্ত কর। এছলামীক শিক্ষা-দীক্ষা আয়ত্ত করিয়া আদর্শ নারী রূপে প্রতিপন্ন হও। পবিত্র এছলাম ধর্ম্মের সর্ব্ববিধ বিধান প্রাণপণে পালন কর। ঐহিক সুখ ও বিলাস-ব্যসনে আত্ম-নিয়োগ করিয়া, পরলোকের পথ কণ্টকিত করিও না। দম্ভ, অহঙ্কার, আত্ম-শ্লাঘা পদাঘাতে দূর করিয়া দাও। সাধ্যানুসারে দরিদ্রের সাহায্য কর। বৃথা গল্প-গুজবে আত্ম-নিয়োগ করিও না। অসার নাটক-নভেল, উপন্যাস-নবন্যাস, জঘন্য গল্প পুস্তক পাঠ করিয়া আত্মা কলুষিত করিও না। সময়ের সদ্ব্যবহার কর। সর্ব্ব প্রকারে আদর্শ মোছলমান মহিলা হইতে চেষ্টা পাও; গরীবকে দেখিয়া নাক সিকৃটাইওনা। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া গৃহকার্য্য সম্পন্ন কর। চাকরাণী বা মামা-দাই এর হস্তে সকল বিষয় ছাড়িয়া দিয়া নিজে " ফুল বিবী " হইও না। সন্তানগণকে

সযত্নে পালন কর; এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা তাহাদিগকে দাও। পরকালের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা কর। নমায্-রোযায় "গাফেল" থাকিও না। সর্ব্বদা মৃত্যুর চিন্তা করিবে, এবং পরম কারুণিক আল্লাহ্ তা-লার নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ করিবে।

আমরা এই স্থানেই জনাব খাতুনে জন্নত হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ রাজিঃ আল্লাহ আন্হার পবিত্র জীবনী শেষ করিলাম। হে আল্লাহ্! তুমি মহা-মাননীয়া ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর দোওয়ার বরকতে সমুদয় মোছলমান নরনারীকে পাপ-তাপ হইতে বিমুক্ত কর। সকল মোছলমান নরনারীর তওবাঃ কবুল কর। মোছলমান মাত্রকেই—প্রত্যেক "তওহীদ-পন্থী"কেই দোযখের ভীষণ অগ্নি হইতে মুক্তি প্রদান করিও। আযাবে কবর, আযাবে 'হশর' হইতে বাঁচাইয়া লইও। তোমার এই অধম দাসানুদাস লেখককে স্বীয় প্রিয় হবিব (ছালঃ) এবং হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর 'ছোফারেশে' মুক্তি প্রদান করিও।

চতুর্থ ভাগ।

হজরত এমাম হাছন

(রাজিঃ)-এর জীবন চরিত।

হজরত রছুল মকবুল (ছালঃ)-এর প্রিয়তম দৌহিত্র, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর তনয়-রত্ন, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নয়নমণি স্নেহ-কুসুম, জ্যেষ্ঠ এমাম হজরত হাছন (রাজিঃ), তৃতীয় হিজরীর ১৫ই রমজানুল্ মবারক ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কোনও কোনও রাবির (বর্ণনাকারীর) মতে ১৫ই শা'বান তারিখে এমাম হাছন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু প্রথমোক্ত তারিখই ঠিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জন্মের তারিখ সম্বন্ধে অন্যান্য রওয়ায়েত ও আছে; কিন্তু তাহা নির্ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। হজরত এমাম জয়নাল আবেদীন (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন আমার মহামাননীয় জ্যেষ্ঠ চাচ্চা ছাহেব (পিতৃব্য)-এর জন্মগ্রহণ কাল আসন্ন হইল, তখন হুজুর ছরওয়ারে আলম (ছালঃ), হজরত আছমাঃ-বিন্তে য়মিছ (রাঃ—আঃ) এবং হজরত ওম্মে-এমিন (রাঃ—আঃ)-কে, জনাব দাদী আম্মা ছৈয়দাঃ হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন; এবং ফরমাইলেন, তোমরা আয়েতল কুরছি ও ময়ুয্ ৩ বার করিয়া পড়িয়া, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-

এর উপর দম্ (ফুৎকার) দিবে। আছরের নমাযের পরে তাঁহার 'বেলাদত্ (জন্ম) হইয়াছিল। হজরত আছমাঃ বিন্তে-য়মিছ (রাঃ—আঃ) বলিয়াছেন যে, যে সময় হাছন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিলেন, তৎপরে আমি হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নেফাছের শোণিত দেখিতে পাইলাম না। আমি ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হজরত নবী ছালঃ) ছাহেবের খেদমতে এবিষয় আরজ করিলাম; তাহা শুনিয়া হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমার বেটি (কন্যা) ফাতেমাঃ যোহরা (রাঃ—আঃ) পাক (পবিত্র)। প্রসবের পরেই তিনি গোছল (স্নান) করিয়া ঐ দিন শামের নমায্ (মগরেবের নমাজ) পড়িয়াছিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বর্ণনা করিলেন যে, হাছন (রাজিঃ)-এর আকিকাঃ জনাব হজরত ছরওয়ারে আলম (ছালঃ) সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে আদেশ করিয়াছিলেন যে, হাছন (রাজিঃ)-এর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া (মাথা কামাইয়া), সেই চুলের 'হাম-ওজন' (সমান ওজনের) 'চান্দি' (রৌপ্য) খায়রাত করিয়া দিবে। ঐ চুলের ওজন ১ দরম বা তদপেক্ষা কিছু কম হইয়াছিল।

হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন যে, বকরীর একখানি রাণ (সম্পূর্ণ পা) ও একটি দরম দাঈকে দেওয়া হইয়াছিল। হজরত আছমাঃ-বিন্-য়মিছ (রাঃ—আঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, জন্মগ্রহণের ৭ম দিবসে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর আকিকা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। দুইটি 'মেন্‌ঢেয়ে' (মেষ বা দোম্বা) যবেহ করা হয়, আর দাঈকে উহার রাণ দেওয়া হইয়াছিল। এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া তাহার চুলের পরিমাণ চান্দি খায়রাত করিয়া দেওয়া হয়। তৎপর হজরত নবী (ছালঃ), হাছন (রাজিঃ)-এর মস্তকে 'খোশবু' (সুগন্ধি দ্রব্য) লাগাইলেন; আর হজরত আছমাঃ

(রাঃ—আঃ)-এর প্রতি ফরমাইলেন, " অয়ি আছমা ! বালকের মস্তকে 'খুন' (রক্ত) লাগান 'জাহেলিয়তের' (অসভ্যতার) 'রছম' (নিয়ম)।" জাফরাণ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য মস্তকে লাগান উচিত।

হজরত জাবের (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'হছনায়েনেরে' (এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের) আকিকা তাঁহাদের জন্মের ৭ম দিনে সম্পন্ন হয় ; আর ঐ দিন 'খৎনাঃ (ত্বক্‌চ্ছেদ) কার্য্য ও সম্পন্ন হইয়াছিল।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন হাছন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিল, আমি তাহার নাম 'হরব' (যুদ্ধ—লড়াই-জঙ্গ) রাখিয়াছিলাম। অতঃপর হজরত ছারওয়ারে কায়েনাতঃ (ছালঃ) আমার গৃহে আগমন করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বেটা (পুত্র—দৌহিত্র)-কে আমার নিকটে লইয়া আইস। উহার কি নাম রাখিয়াছ ? উপস্থিত লোকেরা বলিলেন, শিশুর নাম 'হরব' রাখা হইয়াছে। তিনি ফরমাইলেন, না, তা নয় ; বরং উহার নাম হাছন রাখা হউক। এইরূপে হোছেন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিলে, আমি তাহার নামও প্রথম 'হরব' রাখিয়াছিলাম ; কিন্তু হজরত (ছালঃ) তাঁহার নাম হোছেন (রাজিঃ) রাখিলেন। যখন মহছেন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিল, তাহার নামও আমি পূর্ব্ববৎ হরব রাখিয়া ছিলাম ; কিন্তু হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, উহার নাম মহছেন রাখা হইবে। তৎপরে আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন ; আমি ইহাদিগের নাম হজরত হারুণ (আলাঃ)-এর পুত্রদিগের নামানুসারে রাখিলাম। শবর (রাজিঃ), শব্বির (রাজিঃ) ও মশর (রাজিঃ), হজরত হারুণ আলায়হেচ্ছালামের পুত্রত্রয়ের নাম ছিল ; আর হাছন (রাজিঃ), হোছায়েন (রাজিঃ) ও মহছেন (রাজিঃ) ঐ তিন নামের আরবী 'তরজমাঃ' (অনুবাদ)।

রওয়ায়েত আছে যে, এমাম হাছন (রাজিঃ) ও এমাম হোছেন (রাজিঃ)

'আহ্‌লে জন্নত' (বেহেশ্‌ত্‌ বাসী)-এর নাম। 'যমানাঃ জাহেলিয়তে' (অসভ্যতা বা অন্ধকার যুগে) আরবে বা কোরেশদিগের মধ্যে এই সকল নাম কাহারও রাখা হইয়াছিল না। আর এক রওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর নবী (ছালঃ) বড় এমাম ছাহেবের নাম হাছন ও কুনিয়েত আবু মোহাম্মদ (রাজিঃ) রাখিয়াছিলেন। অন্ধকার যুগে আরবে এই নাম কাহারও রাখা হয় নাই। আর এক রওয়ায়েতানুযায়ী খোদাওন্দ্‌ আলম (আল্লাহ জল্লশানহু) হাছন ও হোছেন (রাজিঃ)—এই দুইটি নাম স্বীয় 'মখ্‌লুক' (সৃষ্ট জীব বা মনুষ্য) হইতে 'পুশিদাঃ' (গোপন) রাখিয়া ছিলেন। যখন এই দুই ছাহেবযাদাঃ (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিলেন,, তখন হুজুর ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) ইহা 'য়েলান' (ঘোষণা) করিলেন।

হজরত এমাম জাফর ছাদেক (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই নাম জন্মগ্রহণের সপ্তম তারিখে—আকিকার দিনে রাখা হইয়াছিল। হজরত আবু রাফেয় (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন এমাম ভ্রাতৃ-যুগল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হজরত ছরওয়ারে আলম (ছালঃ) উঁহাদের কাণে আযান দিয়াছিলেন।

হজরত আব্বাছ (রাজিঃ)-এর 'আহ্‌লিয়া' (স্ত্রী) ওম্মোল ফজল (রাঃ—আঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে আরজ করিলাম, আমি 'খাবে' (স্বপ্নে) দেখিলাম, হুজুরের পবিত্র 'আযা' (অঙ্গ) হইতে কোনও অঙ্গ আমার গৃহে আছে। হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আপনার স্বপ্ন খুব ভাল। ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে; আর আপনি তাহাকে দুগ্ধ পান করাইবেন। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন এমাম হাছন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি হজরত কুলছমের

সঙ্গে, হজরত ওম্মোল ফজল (রাঃ—আঃ)-এর ও দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন ; সুতরাং স্বপ্নের 'তায়বির' (ফল অর্থ) পূরা হইয়াছিল।

হাকেম, হজরত জাবের (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত রছুলোল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াআলাহ্ ওয়া ছাল্লাম ফরমাইয়াছিলেন, " প্রত্যেক মাতা বেটাদিগের 'আছবাহ্' (পিতার পক্ষ হইতে রেশ্তাদার) হয় ; কিন্তু ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর দুই পুত্রের কোন আছবাহ্ নাই ; আমিই ঐ উভয় ভ্রাতার আছবাহ্। "

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া, শুক্লপক্ষের শশি কলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। মাতামহ হজরত ছরওয়ারে আলম (ছালঃ) তাঁহার প্রতি কতই না স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শন করিতেন। পিতা মাতার ও আদরের সীমা-পরিসীমা ছিল না। মাতা-মহিগণও তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। যখন তাঁহার কথা ফুটিল, এবং আধ আধ স্বরে কথা বলিতে লাগিলেন ; তখন 'নানার' (মাতামহের) আনন্দের সীমা-পরিসীমা রহিল না। তিনি প্রায়ই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর গৃহে গমন পূর্ব্বক স্নেহাস্পদ 'নওয়াছাঃ' (নাতি—দৌহিত্র)-কে দেখিতেন ; তাঁহার প্রতি আদর ও স্নেহ প্রদর্শন করিতেন ; তাঁহার আধ আধ স্বরের অমৃতময় বাল্যাবলী শুনিয়া কতই না আনন্দ উপভোগ করিতেন। কখনও ক্রোড়ে লইয়া, কখনও বা স্কন্ধে চড়াইয়া স্বীয় গৃহে বা মছজেদে লইয়া যাইতেন। খেলার জিনিষ ও খাদ্য-সামগ্রী দিয়া বালকের সন্তোষ বিধান করিতেন। আঁ হজরতের পরম স্নেহের পাত্র নাতি বলিয়া ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণও তাঁহার প্রতি নিতান্ত স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার অর্দ্ধস্ফুট বাক্য শুনিয়া উৎফুল্লিত হইতেন। হজরতের পবিত্র গৃহে ওম্মোল-মুমেনিনগণ তাঁহাকে লইয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন ; কত প্রকারে স্নেহ ও 'পেয়ার' করিয়া

আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেন। তিনি মাতামহ ও পিতার গৃহের 'চেরাগ' (প্রদীপ) স্বরূপ ছিলেন।

হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় পবিত্র 'দওলত খানাঃ' (গৃহ) হইতে এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে স্বীয় পাক 'দোশ্‌' (স্কন্ধ) মবারকে ছওয়ার করাইয়া (চড়াইয়া) মস্‌জেদে তশ্‌রিফ্‌ আনিতেছিলেন; এক ব্যক্তি তাহা দেখিয়া বলিল, ওয়াহ্‌ মিয়ঁা ছাহেবযাদে, তোমার 'ছওয়ারি' ত খুব বেশ! তাহা শুনিয়া হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) ফরমাইলেন; ছওয়ারও ত আচ্ছা (বেশ—ভাল) আছে।

দ্বিতীয় বৎসর অর্থাৎ ৪র্থ হিজরীর ৪ঠা কিংবা ৬ই শা'বান তারিখে, সোমবার দিন হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ভূমিষ্ঠ হইলেন। সুতরাং জ্যেষ্ঠ এমাম (রাজিঃ) ছাহেব অপেক্ষাও কনিষ্ঠ এমাম (রাজিঃ) ছাহেবের বয়ঃক্রম এক বৎসরের কম।

ছহীহ্‌ বোখারী গ্রন্থে হজরত ওক্‌বাঃ-বিন্‌-হারেছ (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত আছে যে, একদা হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ), আছরের নমায্‌ আদায় করিয়া, হজরত আলী মরতুজাঃ (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে মছজেদ হইতে বাহির হইলেন; পথিমধ্যে এমাম হাছন (রাজিঃ) বালক-দিগের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন, তিনি তাঁহাকে স্কন্ধোপরি তুলিয়া লইলেন: এবং ফরমাইলেন, এই বালক ত ছুরত-শকলে (আকৃতি ও চেহেরায়) জনাব রছুলে খোদা (ছালঃ)-এর 'মোশাবাহ্‌' (আকার বিশিষ্ট); হে আলি (রাজিঃ)! আপনার ছুরতের সঙ্গে ত ইহার আকার মিলিতেছে না। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) একথা শুনিয়া হাস্য করিলেন।

জামেয় তেরমজিতে বর্ণিত আছে যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) মস্তক হইতে 'ছিনাঃ' (বক্ষঃস্থল) পর্য্যন্ত, আর হজরত এমাম হোছেন

(রাজিঃ) ছিনাঃ হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত আঁ হজরত (ছালঃ)-এর 'মোশাবাহ' (আকার বিশিষ্ট) ছিলেন।

মহা বিদ্বান্ ও অদ্বিতীয় হাদীছ-বেত্তা হজরত আবু হোরেরাঃ (রাজিঃ) বলিয়াছেন, আমি যখন এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে দর্শন করি, 'ফরীত মহব্বতে' (ঐকান্তিক ভালবাসায়) আমার 'আছু' (অশ্রু) বাহির হইয়া পড়ে। একদা জনাব হজরত ছরওয়ারে আলম (ছালঃ) স্বীয় দওলত খানা হইতে বাহির হইলেন ; এবং প্রথমে মছজেদে তশরিফ্ আনিলেন ; পরে আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক একদিকে গমন করিতে লাগিলেন ; এমন কি, আমরা বাজার-বনি-কনিক্কায় এর পথে মছজেদ নববীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পথিমধ্যে তিনি একস্থানে উপবেশন করিলেন, এবং আমাকে বলিলেন, আমার বেটাকে ডাকিয়া আন। ইতিমধ্যে এমাম হাছন (রাজিঃ) দৌড়িয়া আসিলেন এবং হুজুর (ছালঃ)-এর 'আগুশ্ মবারকে' (পবিত্র ক্রোড়ে) বসিয়া গেলেন। হজরত (ছালঃ) পুনঃ পুনঃ স্বীয় পবিত্র মুখ তাঁহার মুখে লাগাইতে এবং বলিতেছিলেন, "খোদা ওয়ান্দাঃ! আমি ইহাকে 'পেয়ার' (স্নেহ) করি, আর যে ব্যক্তি ইহাকে পেয়ার করে, সেও আমার প্রিয় ব্যক্তি।"

হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ফরমাইয়াছেন, একদা (হজরত এমাম) হাছন (রাজিঃ), হজরত নবী করিম (ছালঃ)-এর ক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিলেন ; আঁ হজরত (ছালঃ) একবার বালক হাছন (রাজিঃ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, আর একবার উপস্থিত জনগণের দিকে তাকাইয়া দেখিতে ছিলেন। হুজুর (ছালঃ) তখন মিম্বরের (বেদীর) উপর উপবেশন করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি স্বীয় প্রিয় দৌহিত্রের দিকে ইঙ্গিত করিয়া ফরমাইতেছিলেন, "আমার এই বেটা 'ছরদার' (নেতা) ; আর 'ওম্মেদ' (আশা) আছে, ইহার দ্বারা মোছলমান

দিগের 'দো-গেরদের' (দুই সম্প্রদায়ের) মধ্যে 'ছোলেহ্' (সন্ধি) স্থাপিত হইবে।"

আছামাঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ), হজরত নবী ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হুজুর (ছালঃ) আমাকে ও হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে ক্রোড়ে লইতেন, এবং ফরমাইতেন, "হে আল্লাহ্! আমি এই উভয় বালককে 'দোস্ত্' (বন্ধু—প্রিয়) রাখি; তুমিও ইহাদিগকে দোস্ত রাখ (বন্ধু বলিয়া গ্রহণ কর)।"

হজরত বরাঃ (রাজিঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি; একদা (এমাম) হাছন (রাজিঃ), হজরত নবী ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লামের ক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিলেন; সেই অবস্থায় আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, "হে আল্লাহ্! আমি ইহাকে দোস্ত রাখি, তুমিও ইহাকে দোস্ত্ রাখিও (বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিও)।"

হজরত আনছ (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) হইতে হজরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহে আলায়হে ওয়া ছাল্লামের 'মশাবাহ্' (আকৃতির আদর্শ) আর কেহ ছিলেন না। অর্থাৎ হুজুর (ছালঃ)-এর শারীরিক গঠনের সঙ্গে তাঁহার এই প্রিয় দৌহিত্রের শারীরিক গঠন অনেক পরিমাণে মিলিত।

এই সকল বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ছরওয়ারে আলম (ছালঃ), স্বীয় এই দৌহিত্র-রত্নকে কিরূপ স্নেহ করিতেন। তিনি ইঁহাকে এবং ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে চক্ষের পুত্তলীর ন্যায় বা হৃৎপিণ্ডের টুকরার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। স্নেহময়ী দুহিতা ও প্রিয়তম জামাতা-রত্নের সমস্ত স্নেহ রাশি এই দুই ভ্রাতার প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ক্ষণকাল ইঁহাদিগকে না দেখিলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেন। তখন তাঁহার পক্ষে কি সঙ্কট জনক

সময়। বদর ও ওহুদের ভীষণ যুদ্ধ এবং আরও কতিপয় ছোট বড় যুদ্ধ হইয়া গেলেও, একদিকে মক্কার কোরেশগণ, অন্যদিকে মদীনার মোনাফেকগণ এবং খয়বর প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত য়িহুদিগণ তাঁহার ভয়ানক রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতে ছিল; আরবের অন্যান্য সম্প্রদায়ও এই নবোদ্ভুত এছলাম-শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইত। আঁ হজরত (ছালঃ) একদিকে এই সকল প্রবল শত্রুর কবল হইতে এছলামকে রক্ষা করিবার জন্য দিবানিশি চিন্তা ও 'খেয়াল' করিতে এবং প্রয়োজনানুসারে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছিলেন। অন্য দিকে এছলাম প্রচার কার্য্যে, হেজরত-কারী (স্বদেশত্যাগী) মোছলমানদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহ-ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। হেজরতকারীদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ, তাঁহাদের অন্ন-বস্ত্র ও উপার্জ্জনের পন্থা নির্দ্দেশ, আবিশিনিয়ায় হেজরতকারী মোছলমানদিগের জন্য ভাবনা-চিন্তা, ইত্যাদি কত বিষয়েই না তাঁহাকে মস্তিষ্ক চালনা করিতে হইয়াছিল; স্বীয় ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা বিভিন্ন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুঝিবার উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন; এতদ্‌স্বত্বেও স্নেহ-কুসুম নাতিদ্বয়ের প্রতি স্নেহ ও করুণা বর্ষণে কিছুমাত্র বিরত ছিলেন না। তাঁহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে তিনি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতেন।

খয়বর 'ফতেহ্' (জয়) এবং ফদক অধিকারে আইসায় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আর্থিক অবস্থা একদিকে যেমন সচ্ছল হইয়াছিল, তেমনই ব্যয়ের পরিমাণও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। হেজরতকারী অর্থাৎ দেশত্যাগী মোছলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের পরিমাণও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার আরবের বিভিন্ন প্রদেশবাসী নব-দীক্ষিত মোছলমান বা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ দলে দলে মদীনায় আসিতেছিলেন; ঐ সকল লোকের খাদ্যাদির ব্যবস্থা করা একটা মহা বিরাট ব্যাপার ছিল; ইহা ছাড়া বহু দূরবর্ত্তী নানা

স্থানের দরিদ্র লোক অন্ন-বস্ত্রের প্রার্থী হইতেন, তাঁহাদের ও প্রার্থনা পূর্ণ করা হইত। তখনও বয়তুলমাল তহবিলে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইতে ছিল না; সুতরাং আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ব্যক্তিগত আয় হইতে ঐ সকল ব্যয় সঙ্কুলান করা হইত। এজন্য সর্ব্বদাই তাঁহার অর্থাভাব থাকিত; তাঁহার পরিবারে লোক সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না; সুতরাং অনেক সময় তাঁহাদিগকে উপবাস থাকিতে হইত। পক্ষান্তরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ও এমন কোনও কাজ কর্ম্ম কিংবা আয়ের পথ ছিল না; যদ্দারা তিনি সচ্ছল ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। সুতরাং নিতান্ত অভাবের মধ্য দিয়া তাঁহাদের জীবন কাটিয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় ভ্রাতৃ-যুগলের বাল্য-জীবন খুব অসচ্ছল অবস্থায়ই অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আদর্শ পিতা মাতা এবং আদর্শ মাতামহের নিকট যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বনে ও আল্লাহ তা-লার দরবারে "শোকর-গোযার" হওয়া ব্যাপারে তাঁহারা বিশেষ ভাবে অভ্যস্ত ছিলেন। বিলাসের কোনও উপকরণেরই তাঁহাদের প্রয়োজন ছিল না; যও এর সাধারণ রুটি ও দাল-তরকারি বা শাক-ছব্জীই তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। তাঁহারা কদাচিত মাংসের মুখ দেখিতেন। মোটা কাপড়ের তহবন, পিরাহন বা চাদর, খুব বেশী হইলে সাধারণ পা-জামা ও পাগড়ি বা টুপি তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রের অভাব পূরণ করিত। 'নালায়েন' (খড়ম) বা সাধারণ 'বিনামা' (জুতা) তাঁহারা পায় দিতেন। এই ত ছিল তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদের ঘটা। অবশ্য ঐ সামান্য পোষাক পরিচ্ছদ ও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইত। খাদ্য, পরিচ্ছদ ও চাল-চলন সম্বন্ধে যে উন্নত আদর্শ তাঁহাদের সম্মুখে বিরাজ করিত, তদ্দারাই তাঁহারা সাধারণ আহার ও পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট থাকিতেন। যখন অতি তরুণবয়স্ক বালক ছিলেন, ভাল-মন্দ কিছু বুঝিতে

পারিতেন না, তখনই ভাল বস্ত্রাদির জন্য মহামাননীয়া মাতার নিকট কখনও কখনও আবদার করিয়াছিলেন ; একটু বুঝিবার শক্তি হইবামাত্র তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের মহা সম্মানিত মাতামহ আল্লাহ্ তা-লার প্রেরিত মহানবী, শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর ও মানবেব মুক্তি পথ-প্রদর্শনকারী। পিতা অদ্বিতীয় বীর পুরুষ, পক্ষান্তরে অদ্বিতীয় তাপস ; মহামাননীয়া জননী রছুল-নন্দিনী খাতুনে জন্নত ; তাঁহাদের কাহারও মধ্যেই পার্থিব বিষয়-সম্পদের লিপ্সা নাই ; ভাল খাদ্য ও উত্তম পরিধেয় বস্ত্রের জন্য আকাঙ্ক্ষা নাই। মানবের কল্যান সাধনই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এজন্য দরিদ্রতাকেই তাঁহারা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। একমাত্র পরম করুণাময় সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ তা-লার আদেশ পালন এবং তাঁহার সন্তুষ্টি-বিধানই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মহামান্য ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের মধ্যেও তাঁহারা ঐ সকল গুণেরই উন্মেষ দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, সেই দিকেই মানবের সর্ব্বোন্নত আদর্শ তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইত। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই পার্থিব সুখ-সম্পদের প্রতি তাঁহাদেব বিরাগ জন্মিয়াছিল। কোনও রূপ হীন আদর্শ তাঁহাদের নয়নতলে কখনও পতিত হয় নাই। তাঁহারা "ধরাতলে স্বর্গধামই" দেখিতে পাইতেন। তাঁহাদের ন্যায় এমন সৌভাগ্য কাহারও অদৃষ্টে কস্মিন কালেও ঘটে নাই। পৃথিবীতে লক্ষাধিক পয়গম্বর (আলাঃ) ও অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও পুত্র-পৌত্র বা দৌহিত্রের এমন সৌভাগ্য ঘটে নাই যে, মাতামহ, পিতা, মাতা, মাতামহিগণ, মাতামহের শিষ্য মণ্ডলীর নিকট ধর্ম্ম-নীতি ও সংসার-নীতি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে শিক্ষা লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার আদর্শ চরিত্র মানুষ হইয়াছিলেন ; আর সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহ্ তা-লার সর্ব্ব প্রকার আদেশ পালনে, তাঁহার প্রতি আত্ম-সমর্পণ করণে

সমর্থতা লাভ করিয়াছিলেন; সম্পূর্ণ আদর্শ চরিত্র পরম ধার্ম্মিক পুরুষ রূপে পৃথিবী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; অবশেষে জীবন দান করিয়া আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত নিদর্শন প্রদর্শন এবং "শহীদ" গণের শিরোভূষণ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কোটি কোটি মানুষ তাঁহাদের জন্য শোক-প্রকাশ করিয়া, তাঁহাদের শাহাদতের স্মৃতি চিরকালের জন্য জাগরূক রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং আজও হইয়াছেন। তাঁহাদের শাহাদতের স্মৃতি স্বরূপ লোকে নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানও সদনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। উপাসনা-আরাধনা, (নফল নমাজ পড়া—এবাদৎ-বন্দেগী করা), রোযাপালন করা, পবিত্র কোরআন পাক তেলাওত করা, দান-খায়রাত করা, তাঁহাদের পবিত্র আত্মার মঙ্গল কামনা করা ইত্যাদি পূতকার্য্য দ্বারা আত্মা-চরিতার্থ করা হইয়া থাকে; এরূপ কোন্ পয়গম্বর, পয়গম্বর-পুত্র বা তাঁহাদের পৌত্র ও দৌহিত্রের জন্য হইয়াছিল বা হইয়া থাকে? সুতরাং মহামাননীয় এমাম ছাহেব (রাজিঃ) দ্বয় কত বড় সৌভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন, ইহা চিন্তাও খেয়াল করিবার বিষয়। অবশ্য এই উপলক্ষে কতকগুলি লোক কতক 'বেদয়াত' কার্য্য ও নিষিদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা নিতান্তই দুঃখ-জনক। সে গুলি বাদ দিলে আর যে সকল সদনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, তাহা অতুলনীয়; কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার শতাংশের একাংশ পরিমাণ সদনুষ্ঠানেরও অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় কতকগুলি অসার আমোদ-প্রমোদ, অস্বাভাবিক পাঠানুষ্ঠান-পাপাচার ও অসৎ কার্য্যে রাশি রাশি অর্থ ব্যয়। উহারই অনুকরণে একদল মোছলমানও কতকটা অনাচার করিয়া থাকে।

তখন আরবে—বিশেষতঃ মক্কা-মদীনায় কোনও রূপ নিয়মিত মাদ্রাছা-মক্তব প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল না। ব্যক্তি বিশেষের নিকট শিক্ষা লাভের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। অন্ধকার যুগের পর পবিত্র এছলামী

যুগের আবির্ভাব হইলেও, প্রথম প্রথম অবস্থায় ঐ প্রণালাতেই শিক্ষালাভ হইত। পবিত্র কোরআন ও হাদীছের শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা ছিল। কোরআন ত আল্লাহ্ তা-লার মহাবাণী, সে শিক্ষা আঁ হজরতের নিকট, কোরআনের আয়াত সমূহ 'নাযেল' (অবতীর্ণ) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পবিত্র-চরিত্র ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ শিক্ষা লাভ করিতেন; আর আঁ হজরতের মৌখিক উপদেশ ও তাঁহার আদর্শ কার্য্য-কলাপ পবিত্র হাদীস রূপে মোছলমানদিগের শিক্ষার অবলম্বন বা বাহন ছিল। নরনারী সকলেই সে শিক্ষা লাভ করিতেন। আরবী তাঁহাদের মাতৃ-ভাষা ছিল বলিয়া, মোটামুটি রূপে কোরআনের অর্থ তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেন। জটিল অংশ আঁ হজরত (ছালঃ) কিংবা তাঁহার শ্রেষ্ঠতম ছাহাবাঃ ও মহা বিদ্বান্ ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। মহামাননীয়া ওম্মোল-মুমেনিনগণ, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবীয়া (রাঃ—আঃ)-গণ, নারী-দিগের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করিতেন। ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু নারীগণ ঐ সকল পবিত্র চরিত্র ধর্ম্মপ্রাণা ও ধর্ম্ম বিষয়ে অভিজ্ঞা মহিলাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার মছলা-মছায়েল এবং ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করিতেন। স্থূলকথা, তখন মৌখিক শিক্ষাই শিক্ষা লাভের সোপান স্বরূপ ছিল। নানা যুদ্ধ বিগ্রহ, অভিযান প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া ও আঁ হজরত (ছালঃ) পবিত্র বচন-সুধা পান করাইয়া ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের ধর্ম্ম-পিপাসা নিবারণ করিতেন; কোরআন পাকের সহজ-সরল ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতেন। সেইরূপে আবার মহামাননীয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণও জন-সাধারণের মধ্যে ঐ সকলের পুনরাবৃত্তি করিতেন—জন-সাধারণকে উপদেশ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। বহু উপযুক্ত ও শিক্ষিত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) বিভিন্ন প্রদেশে,

বিভিন্ন জনপদে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেরিত হইয়া, কোরআনের পবিত্র শিক্ষা দান করিতেন—হাদীছ বয়ান করিতেন। এইরূপে অল্পকালের মধ্যেই বিশাল আরব দেশের মধ্যে এছলামের পবিত্র জ্যোতিঃ দ্রুতভাবে বিকীর্ণ হইয়াছিল। উত্তরে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও এরাক হইতে দক্ষিণে আরব সাগর পর্য্যন্ত, পশ্চিমে লোহিত সাগর ও সুয়েজ যোজক হইতে পূর্ব্বে পারস্যোপসাগর ও ওমান উপসাগর পর্য্যন্ত বিশাল জনপদের মধ্যে এছলামের পবিত্র শিক্ষা প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) প্রথমে স্বীয় আদর্শ ধর্ম্ম-পরায়ণা জননী খাতুনে জন্নত হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নিকট—এবং সঙ্গে সঙ্গে মাতামহ হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ)-এর নিকট এছলামের পবিত্র শিক্ষা লাভ করিতে ছিলেন। পিতা হায়দরে কার্‌রার হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মৌখিক শিক্ষাদান করিতেন। দুই ভাই মাত্র কয়েক মাসের বড়-ছোট ছিলেন; সুতরাং উভয় ভা'য়ের শিক্ষাই একত্রে চলিয়া ছিল। মহামাননীয় মাতামহ, মহামতি ওয়ালেদ মাজেদ, মহামাননীয়া ওয়ালেদা মাজেদা, প্রত্যেক বিষয়ে মৌখিক শিক্ষা দিতেন; ধর্ম্ম-নীতি ও সংসার-নীতি সম্বন্ধে অতি মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের তরুণ হৃদয়ে ধর্ম্ম-বীজ বপন করিতেন। তদ্ব্যতীত প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের মুখেও উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিতেন। সর্ব্ব প্রকারের আদর্শ শিক্ষায়ই তাঁহাদের হৃদয় নির্ম্মল ও জ্যোতিষ্মাণ হইতে ছিল। কোনও রূপ কুশিক্ষা বা কু আদর্শ তাঁহাদের সম্মুখে কখনও স্থাপিত হয় নাই। তাঁহাদের সমবয়স্ক বালকগণ ও আদর্শ চরিত্র লইয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে ছিল। খেলার সাথিগণের মধ্যেও কেহ বিপথগামী ছিলেন না। সকলেই বাল্যকাল হইতে ধর্ম্ম ও নৈতিক শিক্ষায় আদর্শ স্থানীয় হইয়া উঠিতেছিলেন। এই শিক্ষা

প্রধানতঃ মৌখিক ছিল। হজরত আবদুল্লা-বিন্-যোবের (রাজিঃ), হজরত আসামা-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ) প্রভৃতি তরুণ মোছলেম যুবকগণ এমাম ভ্রাতৃ-যুগল হইতে কিছু অধিক বয়স্ক ছিলেন। মহামাননীয় নানা, মহামান্য পিতা ও মহামাননীয়া ওয়ালেদাঃ মাজেদাঃ হইতে এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-গণ যে মৌখিক শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন; সে শিক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ে গাঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতেছিল। তাহা প্রস্তরে বা লৌহ ফলকে খোদিত স্মারক-লিপির ন্যায় তাঁহাদের পবিত্র হৃদয়ে এমন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, সারা জীবনে তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যত্যয় ঘটে নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ তা-লার প্রতি তাঁহাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল; তাঁহার আদেশ-নিষেধ অতি সতর্কতা সহকারে পালন করিতেন। পবিত্র কোরআনের শিক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ে অতি দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল। মহামাননীয় নানার ত কথাই নাই; তাঁহার ওয়ালেদ মাজেদও কোরআনের প্রকাশ্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ ছিলেন। সুতরাং সে শিক্ষায়ও তাঁহারা ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিয়া, আধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞানী হইতেছিলেন। তাঁহাদের শিষ্টতা-নম্রতা, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ দর্শনে সকলেই শত মুখে তাঁহাদের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেন। ক্রোধ ও লোভাদি জঘন্য রীপু হইতে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে 'পাক' (পবিত্র) ছিলেন। গুরুজনের প্রতি ভক্তি, সমবয়স্ক ও বয়োকনিষ্ঠ দিগের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা, দীন-দরিদ্রের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি, তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচন করিতে বিশেষ তৎপরতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়-পরায়ণতা, হিংসা-দ্বেষ ও পরশ্রী কাতরতা হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত; কাহারও দুর্ণাম প্রচার বা গুপ্ত কথা ব্যক্ত করা কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে 'পাক' (পবিত্র) ছিলেন। মানুষের মধ্যে যত প্রকার সদ্গুণ ও সৎ প্রবৃত্তি থাকিতে পারে; এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের

মধ্যে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম-প্রাণ খাটি মনুষ্য ও আদর্শ মোছলমান ছিলেন। অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁহারা প্রাণপণে বুঝিতেন। তাঁহারা মহামাননীয় নানা ও মহামান্য পিতার দরিদ্রতায় গৌরব অনুভব করিতেন। কৃপণতা কাহাকে বলে, তাহা জানিতেন না। কৃপণতা ও অর্থ-গৃধ্নুতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। নমায্-রোযা পালন, কোরআন তেলাওত, তছবিহ্ জপ ইত্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে, পবিত্র হজ্জ্ কার্য্য সম্পাদনে জীবনে কখনও শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন না। ফলতঃ তাঁহারা যেন ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তৃতীয় হিজরীর ১৫ই রমজান, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং ঐ বৎসরের সাড়ে তিন মাস, আর একাদশ হিজরীর ২ মাস ১২ দিন এই প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস এবং ৪র্থ হিজরী হইতে দশম হিজরী পর্য্যন্ত ৭ বৎসর এই কিঞ্চিদূণ ৭॥০ বৎসর বয়সে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), তাঁহার পরম ভক্তি-ভাজন নানা, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁহার প্রতি একান্ত স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শনকারী জনাব হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ)-কে হারাইয়া ছিলেন। আবার ইহার প্রায় ৬ মাস পরে কিঞ্চিদূণ ৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্নেহ-স্বরূপিনী জননী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে হারাইয়া, প্রায় সর্ব্ব প্রকার স্নেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। একমাত্র পিতা ব্যতীত প্রকৃত স্নেহ-প্রদর্শনকারী আর কেহ রহিলেন না। কনিষ্ঠ এমাম ছাহেব (রাজিঃ) এই হিসাবে প্রায় ৬॥০ ও ৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পরম শ্রদ্ধেয় মাতামহ ও পরম শ্রদ্ধেয়া গর্ভধারণীকে হারাইয়া ছিলেন। এই তরুণ বয়স্ক বালক-দ্বয়ের মস্তকের উপর হইতে স্নেহের পবিত্র ছায়া যেন চলিয়া গিয়াছিল, শোকের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহাদের ক্ষুদ্র হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহাদের তাৎকালীন শোচনীয় অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলেও হৃদয়

অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন একমাত্র মহামান্য পিতার অসাধারণ স্নেহই তাঁহাদের সান্ত্বনার একমাত্র অবলম্বন ছিল। পিতা হজরত শেরে খোদা (কঃ—ওঃ) ত তাঁহাদের শোকোপনোদনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছিলেন।

সর্ব্বপ্রকার গুণগ্রাম ব্যতীত এমাম ভ্রাতৃ-যুগল মহামান্য পিতার মহাবীরত্বের ও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহারা কেবলমাত্র ননীর পুতুল ছিলেন না। যৌবন সমাগমে আরব বালকদিগের ন্যায় যুদ্ধ-বিদ্যা ও যথানিয়মে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সমবয়স্ক ও বাল্যসঙ্গী যুবকদিগের সঙ্গে মিলিয়া অশ্বারোহণ, তরবারি ও বর্শা সঞ্চালন, তীর নিক্ষেপ পূর্ব্বক লক্ষ্য ভেদ, কুশ্‌তি-কছরত প্রভৃতি বীর জনোচিত সর্ব্বপ্রকার সমর বিদ্যাই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আরব ও হাশেমী বীরত্ব তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল। তাঁহাদের ধমনীতে পিতৃ-পুরুষদিগের পবিত্র শোণিত প্রবাহিত হইত; সুতরাং আরবের কোনও বংশের লোক অপেক্ষা তাঁহাদের শৌর্য্য-বীর্য্য কিছুমাত্র কম ছিল না; বরং সর্ব্বাপেক্ষা অধিকই ছিল। জমল যুদ্ধে, ছফিন যুদ্ধে, উত্তর আফ্রিকা ও কনষ্টাণ্টিনোপলের ও শেষ কারবালার যুদ্ধে তাঁহাদের সেই বীরত্বের "জওহর" প্রকাশ পাইয়াছিল।

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনিদ্বয়কে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের সুখ-শান্তির দিকে সর্ব্বদাই বিশেষ খেয়াল রাখিতেন। তিনি পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান বলিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনীদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ-সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিত, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণেই প্রদর্শন করিতেন। মহামান্য পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি চিরদিনই অটুট ছিল। জননীর মৃত্যুর পর জনক ক্রমান্বয়ে কয়েকটি বিবাহ করিলেও, মহামান্য শেরে খোদা (কঃ—ওঃ)

এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের প্রতি একই রূপ স্নেহ-পরায়ণ ছিলেন। বরং মাতামহ ও মাতৃহীন বলিয়া স্নেহ ও ভালবাসা আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পুত্রদ্বয় ও পিতার প্রতি তদনুযায়ী ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনে একটু মাত্রও কার্পণ্য প্রদর্শন করিতেন না। ফলতঃ তাঁহারা আদর্শ নানার আদর্শ নাতি এবং আদর্শ পিতার আদর্শ পুত্র ছিলেন। এমন পুত্র-রত্ন পৃথিবীতে অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল।

জননীর পরলোক গমনে এই তরুণ বয়স্ক এমাম ছাহেব (রাজিঃ) দ্বয় শোকে এমন অভিভূত হইলেন যে, তাঁহাদের সেই শোকের পরিমাণ নির্ণয় করা অসাধ্য। তাঁহাদের সেই কোমল হৃদয় পরম শ্রদ্ধাস্পদ 'নানা' (মাতামহ) এবং অতি শ্রদ্ধেয়া ওয়ালেদাঃ মাজেদার অন্তর্ধানে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, সেই দিকেই শোকের জীবন্ত চিত্র তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইত। মছজেদ নববীতে গেলে মাতামহের স্থান শূন্য দেখিতেন; মছজেদের যেস্থলে দাঁড়াইয়া হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) এমামতি করিতেন, সেই স্থানে এক্ষণে হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) কে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইতেন। জুমার দিন যে মিম্বরে দাঁড়াইয়া মহামান্য মাতামহ খোৎবা পাঠ করিতেন, সেখানে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না; নানার গৃহে গমন করিয়াও তাঁহার দর্শন লাভ ঘটিত না। মহামাননীয়া নানীগণের সকল গৃহেই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর শয্যা শূন্য দেখিতেন; সকলই আছে, সকলেই আছেন; কেবল নানার স্থানই শূন্য দেখিয়া তাঁহাদের হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইত, অশ্রুধারায় বক্ষঃপ্লাবিত হইত; নানিগণ নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিতেন, ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিতেন, অশ্রু মুছাইয়া দিতেন, সঙ্গে

সঙ্গে নিজেরাও নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেন। দুনিয়ার যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পরম স্নেহাধার দৌহিত্র দ্বয়কে ক্ষণকাল না দেখিলে অধীর হইতেন, দৌড়িয়া স্নেহময়ী কন্যার গৃহে উপস্থিত হইতেন, রাস্তায় দেখিতে পাইলে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেন, কখনও বা স্কন্ধে ধারণ করিতেন, আজ সেই পরম ভক্তি-ভাজন স্বর্গীয় জ্যোতিঃ সম্পন্ন মাতামহ কোথায়? নানাজানকে ত আর দেখিতে পাইতেছেন না। গৃহে পরম শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ মাজেদের মুখপানে তাকাইলে দেখিতে পাইতেন, শোকের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার পবিত্র বদন মণ্ডল বিষাদ পূর্ণ; তাহাতে প্রফুল্লতার লেশমাত্রও নাই। মাতার অভাবে গৃহ অন্ধকার। মাতার শয্যা, মাতার নমাজের স্থান, তাঁহার আটা পিষিবার জাঁতা, পাক করিবার উনান, গৃহস্থালীর সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী রহিয়াছে; কিন্তু জননীকে কোথাও দেখা যাইতেছে না। মাতৃহীনা ক্ষুদ্র ভগিনী দ্বয়ের মুখ-চন্দ্রিমা গভীর শোক-মেঘে আচ্ছন্ন। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেন, শোকের জীবন্ত মূর্ত্তি তাঁহাদের নেত্রপথে পতিত হয়। নানাজানের কবর শরীফে গিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করেন; আম্মা জানের সমাধি স্থলে উপস্থিত হইয়া শোকাশ্রুতে বক্ষঃ প্লাবিত করেন; ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ দেখিতে পাইলে নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া, ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া গৃহে পঁহুছাইয়া দেন। পিতা যখন গৃহে থাকেন, ক্রোড়ে লইয়া মধুর বচনে সান্ত্বনা দেন, আর খোদার দরগায় "ছবর" এবং "শোকর" করিতে বলেন; এবং নানাপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিতে থাকেন। দুই ভাইয়ের অবস্থা দেখিয়া মদীনার নরনারিগণ মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করেন। বালকদ্বয় যেন কি হারাইয়াছেন, কাহার সন্ধানে ফিরিতেছেন, সমবয়স্ক বালক-দিগের সঙ্গে আর খেলা করেন না। কোনও স্থানে গিয়াই তাঁহারা শান্তি পান না। উপর্য্যুপরি দুইটি ভীষণ শোকের আঘাতে তাঁহাদের সদা

প্রফুল্ল আনন ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন; এক্ষণে আর উদর পূরিয়া আহার করেন না; আহার করিতে বসিলে পরম স্নেহশীলা জননীর কথা মনে পড়ে; মহামাননীয় নানার কথা স্মৃতিপথে পতিত হয়; আর আহার করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। মহামান্য ওয়ালেদ মাজেদ নানা-প্রকার সান্ত্বনা দিয়া কিছু আহার করান। পুত্রদ্বয়ের অবস্থা দর্শনে তাঁহার কলেজা ফাটিয়া যায়।

যে আদর্শ বীরপুরুষ, পৃথিবীর অদ্বিতীয় যোদ্ধা শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রচণ্ড প্রতাপে—সিংহ-বিক্রমে বড় বড় নাম যাদাঃ বীরপুরুষ ভয়ে একান্ত অভিভূত ও কেশরীর সম্মুখস্থ শৃগাল শিশুর ন্যায় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িত; যে তাঁহার সম্মুখীন হইত, তাঁহার আর নিস্তার ছিল না; যে কোনও প্রচণ্ড শত্রুকে তিনি হয় শমন সদনে পাঠাইতেন, কিংবা ভূপাতিত করিয়া বন্দী করিয়া লইতেন; আঁ হজরতের তিরোভাবে তাঁহার সে শৌর্য্য-বীর্য্য যেন অন্তর্হিত হইয়া ছিল; তিনি শোকে একান্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন; এক্ষণে একমাত্র সান্ত্বনার পাত্রী আদর্শ পত্নী খাতুনে জন্নতের পরলোক গমনে একেবারে মুষরিয়া পড়িলেন। তাঁহার সদা প্রফুল্ল বদনে আর হাস্য প্রকটিত হয় না। মহামান্য পিতার এই শোক-ক্লিষ্ট বদন দেখিয়া পুত্রদ্বয়ের শোক-সিন্ধু আরও যেন উছলিয়া উঠে। তাঁহারা কোনও স্থানেই শান্তি পান না। মছজেদ নববীতে, নানাজানের গৃহে, তাঁহার রওযাঃ মবারকে, জননীর কবর পার্শ্বে, স্বীয় গৃহে, খেলার স্থানে—সর্ব্বত্রই অশান্তি—দারুণ অশান্তি! তবু মহামান্য পিতা, মহামাননীয়া মাতামহিগণ ও ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ)-দিগের প্রবোধ বাক্যে, উপদেশে, 'তছল্লিতে' (সান্ত্বনা বাক্যে) অনেকটা শোক সংবরণ করিয়া থাকেন। দাদা হজরত আব্বাছ (রাজিঃ), চাচ্চা হজরত আকিল (রাজিঃ), পিতৃব্য হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ

(রাজিঃ), যতদুর সম্ভব, সান্ত্বনা প্রদান করেন ও প্রবোধ দেন। ক্রমে শোকের মাত্রা একটু একটু করিয়া হ্রাস পাইতে লাগিল। মহামান্য খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ চলিতে লাগিল। নানাদিকের বিদ্রোহ দমনে তিনি নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এক সময় এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, বিদ্রোহিগণ মদীনা তৈয়্যবাঃ আক্রমণার্থ দলবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইল। শেরে খোদা হজরত আলী মর্ত্তুজা (রাজিঃ)-প্রমুখ বীরপুরুষগণ তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ জন্য নগরের বাহিরে প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে এ বিদ্রোহ দমন করিবার শক্তি খলিফার ছিল না; কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লা এছলামকে জয়যুক্ত করিবেন; সুতরাং অসম্ভব ও সম্ভবে পরিণত হইল। হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ খলিফা মহামান্য হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ১২ জন বিখ্যাত সেনাপতির অধীনে ১২ দল সৈন্য বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করিলেন; তাঁহারা অল্প দিনের মধ্যে সেই ভীষণ বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিয়া এছলামের গৌরব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সম্পূর্ণ বিপথগামিগণ মৃত্যু-পথের পথিক এবং আর সকলে তওবাঃ করিয়া পুনরায় এছলামে দৃঢ় বিশ্বাসী হইলেন। ইতিপূর্ব্বে হজরত ওছামাঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ), আঁ হজরতের আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবার জন্য সিরিয়ায় অভিযান করিয়াছিলেন; তিনিও সাফল্য মণ্ডিত হইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইবার শাম ও এরাক স্থায়ী ভাবে আক্রমণ জন্য মোছলেম সেনাদল বিভিন্ন সেনাপতির অধীনে প্রেরিত হইলেন। আল্লাহ তা-লার প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হইল। মোছলেম-সেনাপতিগণ প্রত্যেক যুদ্ধে জয়ী হইয়া অসংখ্য বন্দী ও অপরিমিত ধনৈশ্বর্য্য ও মাল-আসবাব মদীনায় পাঠাইতে লাগিলেন। এমাম ভ্রাতৃ-যুগল

শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। মহামান্য মাতামহ ও মহামাননীয়া জননীর নিকট মৌখিক যে সকল শিক্ষা লাভ করিতেন, তাঁহাদের অন্তর্ধানে সে শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল। এক্ষণে একমাত্র ওয়ালেদ মাজেদ হজরত হায়দরে কার্‌রার্ আলী শেরে খোদা (কঃ—ওঃ)-এর নিকট শিক্ষা-লাভ করিয়া পবিত্র এছলামী-শিক্ষায় পরিপক্কতা লাভ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ইরাণ (পারস্য) ও শামের (সিরিয়ার) দিকে এছলামী বিজয়ের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই সকল জেহাদে যোগদান করিলেন না। তিনিও হজরত ওছমান জন্নূরায়েন (রাজিঃ), মহামান্য খলিফার মন্ত্রণা-দাতা ও তাঁহার পক্ষ হইতে চিঠি-পত্র লিখার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

১৩শ হিজরীর ২২শে রবিয়ছ-ছানী, রবিবার দিবাগত সোমবার রাত্রে, মগরেবের নমাযের পরক্ষণে, ৬৩ বৎসর বয়সে মহামান্য খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) পরলোক গমন করিলেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাযেঊন)। সুতরাং তিনি কিঞ্চিদূণ ২॥০ আড়াই বৎসর কাল মাত্র খলিফার পবিত্র পদে অভিষিক্ত ছিলেন। সেই সময় মধ্যে বয়তুল মাল হইতে যে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন, তদ্দ্বারা হজরত শেরে খোদা আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহুর সংসার-যাত্রা বেশ সচ্ছলভাবে নির্ব্বাহ হইত। এই সময় মধ্যে তিনি অন্য বিবাহ করিয়া-ছিলেন কিনা, তাহা জানা যায় না। তবে একথা সুনিশ্চিত যে, এ সময় তাঁহার দাস দাসীর অভাব ছিল না। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) মহামান্য পিতার অপরিসীম স্নেহে, মহামাননীয় মাতামহ ও মহামাননীয়া মাতার শোক কিঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। দুনিয়ার সাধারণ নিয়মানুসারে মানুষের শোকের বেগ যতটুকু হ্রাস প্রাপ্ত হয় ; ইঁহাদের শোক সে পরিমাণে হ্রাস

হইয়াছিল না। কারণ ইঁহারা নানাজানের "**জান**" স্বরূপ এবং জননীর "**চক্ষের তারা**" স্বরূপ ছিলেন। মহামান্ত নানা ও মহামাননীয়া আম্মা জান তাঁহাদের সমগ্র স্নেহ-রাশি এই দুই ভ্রাতার প্রতি ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সে পবিত্র স্বর্গীয় স্নেহের তুলনা হয় না। মহামান্ত মরহুম খলিফাও দুই ভ্রাতার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ-প্রদর্শন করিতেন। মাতামহিগণ ও স্নেহ-প্রদর্শনে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। দুই ভ্রাতা আবার সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে নির্দ্দোষ খেলা এবং শারীরিক ব্যায়াম ও কুশ্‌তি-কছরতে প্রবৃত্ত হইলেন।

২৩ হিজরীর ২৭শে যেলহজ্জ তারিখে মহামান্ত খলিফা ওমর ফারুক (রাজিঃ), মগিরাঃ-বিন্‌-শয়বার এক 'নছরানী গোলাম' (খৃষ্টীয়ান ক্রীত দাস) কর্ত্তৃক ভীষণ ভাবে আহত হইয়া ২৪ হিজরীর ১লা মোহর্‌রম তারিখে 'এন্তেকাল ফরমাইলেন' (ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না এলায়হে রাবেউন)। এই মহামান্ত খলিফার সাড়ে দশ বৎসর কাল স্থায়ী খেলাফতে এছলামের যে উন্নতি হইয়াছিল, যতদেশ জয় হইয়াছিল, এরূপ ব্যাপার পূর্ব্বে বা পরে আর কথনও ঘটে নাই। ১৪শ হিজরীতে তিনি শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর কন্যারত্ন হজরত ওম্মে কলছুম (রাঃ—আঃ)-কে ৪০ হাজার দরহম দেন মোহরে বিবাহ করেন। এতদ্দ্বারা আহ্‌লে বয়তের সঙ্গে মহামান্ত খলিফার বৈবাহিক সম্বন্ধও মহামান্ত এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের সঙ্গে তাঁহার পবিত্র সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মহামান্ত খলিফা (রাজিঃ) বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে এই ছাহেবযাদাঃ দ্বয়কে বিশেষ রূপ স্নেহ করিতেন, এবং ভালবাসিতেন।

মহামান্ত দ্বিতীয় খলিফার খেলাফৎ কালেই এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের শুভ-বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সময় তাঁহারা পূরা সংসারী

হইয়াছিলেন। মহামান্য খলিফা হজরত ফারুকে আজম (রাজিঃ)-এর পরলোক গমন কালে এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর ও এমাম হোছায়েন (রাজিঃ)-এর বয়ঃক্রম ১৮ বৎসরের কিছু ঊর্দ্ধ মাত্র ছিল। মহামান্য দ্বিতীয় খলিফার খেলাফৎ কালে এরাক (মেসোপটেমিয়া), পারস্য (ইরাণ), শাম (সিরিয়া), ফলস্তিন (প্যালেষ্টাইন), মেছের (মিসর বা ঈজিপ্ট) দেশ, সাম্রাজ্য, রাজ্য এবং প্রদেশ সমূহ মোছলমান বীর বৃন্দের দ্বারা বিজিত হইলে, ঐ সকল দেশের যুদ্ধ-লব্ধ বহু মূল্যবান্ সামগ্রী ও বন্দী এবং বন্দিনী-মদীনা শরীফে অনবরত আসিতে থাকে। ইহার যে অংশ শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) পাইতেন, তদ্দ্বারা তাঁহার বিশাল পরিবারের খরচ-পত্র খুব সচ্ছল ভাবেই চলিত। এই সময় মধ্যে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং তখন তাঁহার সংসারটি নিতান্ত ছোট খাট ছিল না। পরিবারের ভরণ পোষণ করিয়া যে অর্থ বাঁচিত, তাহা প্রায় সমস্তই দীন-দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন— অভাবগ্রস্তের অভাব পূরণ করিতেন। পারস্যের যুদ্ধে যখন মোছলমান-গণ কিছু বিব্রত হইয়া পড়েন; তখন স্বয়ং হজরত ফারুকে আজম (রাজিঃ) যুদ্ধে গমন করিতে উদ্যত হন; এমন কি, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে মদীনায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, মদীনা তৈয়বা হইতে সসৈন্যে রওয়ানা হন। কিন্তু কতিপয় প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ) তাঁহার যুদ্ধ-যাত্রার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাতে, তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে ডাকাইয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন; তিনিও প্রতিকূল মত প্রকাশ করাতে মহামান্য খলিফা স্বয়ং যুদ্ধে গমনে বিরত হন। অতঃপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) পারস্য-বিজয় কার্য্যে অনুরুদ্ধ হইলে, তিনি তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন; অবশেষে হজরত ছায়াদ-বিন্-

আবি ওক্কাছ (রাজিঃ) মোছলেম-সৈন্তের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া পারস্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন।

আমিরুল মুমেনিন হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) শহীদ হইলে, সর্ব্ব সম্মতিক্রমে হজরত ওছমান জিন্নুরায়েন-বিন্-আফ্ফান (রাজিঃ) খলিফা পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার খেলাফতের শেষ ভাগে এছলাম-জগতে বিদ্রোহ ও বিপ্লব উপস্থিত হয়। মহামান্ত খলিফার নরম মেজাযী, স্বজন-প্রিয়তা, কূট বুদ্ধি সম্পন্ন কুচক্রী মারওয়ান-বিন্-হকমকে মীর মুনশী পদে নিযুক্ত করিয়া, বহু রাজকার্য্যের ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ—ইত্যাদি ব্যাপারে মেছের ও কুফার বহুসংখ্যক লোক খলিফার বিরুদ্ধাচারী হয়, এবং তাহারা মদীনায় সমবেত হইয়া মারওয়ান-বিন্-আল্ হকম কে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্ত দাবী করে। তাহাকে বিপ্লব-পন্থী দিগের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহারা এই কুচক্রী ব্যক্তিকে নিশ্চয় 'ক্বতল্' (হত্যা) করিত; আর বিপ্লব সম্ভবতঃ এখানেই থামিয়া যাইত; কিন্তু তিনি তাহা না করাতে বিদ্রোহী ও বিপ্লবকারিগণ তাঁহার গৃহ বেষ্টন করিয়া ফেলে। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে হজরত এমাম হাছান (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে তাঁহার গৃহ-রক্ষার্থ পাঠাইয়া দেন; হজরত যোবের (রাজিঃ) স্বীয় পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্ (রাজিঃ)-কে, হজরত তাল্হা (রাজিঃ) স্বীয় পুত্র ছয়ীদ (রাজিঃ)-কে ও মহামান্ত খলিফার গৃহ-রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) ও মহামান্ত খলিফার গৃহ-দ্বার রক্ষা এবং বিপ্লববাদী দিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক দূরে তাড়াইয়া দিতেছিলেন। মহামান্ত খলিফা সকলকে বিদ্রোহী দিগের গতিরোধ করিতে নিষেধ করিতেছিলেন; এমাম ভ্রাতৃ-যুগলকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা তোমাদের পিতার নিকট চলিয়া যাও; কিন্তু তাঁহারা

তাঁহার দ্বার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন না। হজরত মগিরাঃ-বিন্-আল্ আখনছ (রাজিঃ) কতিপয় যোদ্ধ্ পুরুষের সঙ্গে বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সদলবলে শহীদ হইলেন। হজরত আবু হোরেরাঃ (রাজিঃ) ও বিদ্রোহী এবং বিপ্লব-পন্থীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু মহামান্য খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ) তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ছালাম (রাজিঃ) বিপ্লববাদীদিগকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার সহিতও যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল; অগত্যা তিনি প্রস্থান করিলেন। অবশেষে খলিফা হজরত ওছমান জিন্নূরায়েন (রাজিঃ) বিপ্লববাদীদিগের হস্তে, ৮২ বৎসর বয়সে, অতি নৃশংসভাবে শহীদ হইলেন। তিনি ১২ বৎসর কাল খেলাফৎ করিয়াছিলেন। এমাম হাছন (রাজিঃ) মহামান্য খলিফার জানাযায় শরীকে ছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিতে পাই যে, মেছেরের শাসনকর্ত্তা হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ) উত্তর আফ্রিকার "আফ্রিকা" নামক রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য মহামান্য খলিফার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সেই যেহাদে যোগ দেওয়ার জন্য হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ), হজরত ওমর-বিনল্ আছ (রাজিঃ), হজরত এমাম হাছন-বিন্-আলী মরতুজা (রাজিঃ), হজরত এমাম হোছেন-বিন্-আলী মরতুজা (রাজিঃ), হজরত এব্‌নে জাফর (রাজিঃ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ ও জগদ্বিখ্যাত বীরপুরুষগণ যোগদান করিয়া ছিলেন। ভীষণ যুদ্ধে জয়ী হইয়া আফ্রিকা রাজ্য (ইহা তারাব্লিছ) [ত্রিপলী] হইতে "তাঞ্জাঃ" [ট্যাঞ্জিয়ার] পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল) মোছলমানগণ অধিকার করেন। বর্ত্তমান টি পলী, টুনিস্, আলজিরিয়া ও মরক্কোর বিপুলাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তৃতীয় খলিফার সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী খেলাফৎ কালে মহামান্য এমাম ভ্রাতৃ-যুগলকে কেবলমাত্র এই এক যুদ্ধে যোগদান করিতে দেখা যায়। এই সময় মধ্যে তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদি ও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সময়ের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর কোনও তালিকা দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহারা স্বীয় গৃহে খোদা তা-লার এবাদৎ-বন্দেগীতে "মশ্‌গুল" থাকিতেন; খলিফার রাজ-সভায় ও তাঁহাদের গতিবিধি ছিল। সম্ভবতঃ তাঁহারা অবসর কালে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাতে পরিপক্কতা লাভ করিতেছিলেন। তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান গণি (রাজিঃ)-এর খেলাফতের শেষভাগে বিশাল এছলামী খেলাফতে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। মহামান্য খলিফা (রাজিঃ) সমুদয় শাসনকর্ত্তার পদে স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও অনুগত বন্ধু-বান্ধবকে নিযুক্ত করাতে, তাঁহার কার্য্যে অনেকেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মারওয়ান-বিন্-হকম—যাহাকে আঁ হজরত (ছালঃ) মিথ্যা কথা বলার জন্য মদীনা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন; মহামান্য দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ও তাহাদের পিতা পুত্রকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, মহামান্য ৩য় খলিফা তাঁহাকে মীর মুন্‌শীর পদে নিযুক্ত করাতে, তাহার কুচক্রে ও দুর্ব্ব্যবহারে জন-সাধারণ নিতান্তই বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মারওয়ান রাজ্যশাসন কার্য্যে অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করাতে নানাপ্রকার অনর্থের সূত্রপাত হইতে ছিল। এই কুচক্রী লোকটি বনি-হাশেমের সহিত বিষম বিদ্বেষ ভাব মনে মনে পোষণ করিত। ইহার অন্যায়-অসঙ্গত কার্য্য-কলাপেই মহামান্য খলিফাকে অতি নির্দ্দয় ভাবে শহীদ হইতে হইয়াছিল।

হজরত ওছমান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ)-এর শহীদ হওয়ার পর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) খলিফা নির্ব্বাচিত হইলেন। যখন হজরত যোবের

(রাজিঃ) ও হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ)-এর সহানুভূতিতে ওম্মোল-মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ), মহামান্য খলিফা হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ)-এর অন্যায় রূপে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ মক্কা-মোয়াজ্জমা হইতে একদল যোদ্ধৃপুরুষ লইয়া বস্রা অভিমুখে অভিযান করিলেন; সেই সংবাদ পাইয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও সসৈন্যে ঐ দিকে গমন করিলেন; সেই সময় কুফার যোদ্ধৃপুরুষগণকে স্বদলভুক্ত করণার্থ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ও হজরত এমার-বিন্‌-এয়াছর (রাজিঃ)-কে কুফায় পাঠাইলেন; কুফার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা হজরত আবু মুসা আশয়ারি (রাজিঃ) কুফাবাসী যোদ্ধৃপুরুষগণকে নিরপেক্ষ থাকিবার জন্য বিশেষ রূপে চেষ্টা পাইতে ছিলেন, কুফার বহুসংখ্যক লোক তাঁহার মতানুবর্ত্তী ছিল; ঐ সময় হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) কুফাবাসীদিগকে স্বীয় ওয়ালেদ মাজেদ আমিরুল-মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষ সমর্থনার্থ যে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার জ্ঞানবত্তা, বক্তৃতা-শক্তি এবং চিন্তা ধারার সুন্দর পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার সেই অনল বর্ষিণী ও সুধা নিস্যন্দিনী বক্তৃতায় জনমত আমিরুল-মুমেনিন খলিফাতুল মুছলেমিন হজরত আলী করমুল্লাহ্‌ ওয়াজহুর সম্পূর্ণ অনুকূল হইল। ইতিপূর্ব্বে হজরত মোহাম্মদ বিন্‌-আবিবকর (রাজিঃ) ও হজরত আশরে বিন্‌-আব্বাছ (রাজিঃ), মহামান্য খলিফার পক্ষ হইতে কুফায় গিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিলেন। একদিকে শাসনকর্ত্তার বাধা প্রদান, অন্য দিকে 'ওম্মোল-মুমেনিন' (মোছলেম-মাতা) হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ), হজরত যোবের (রাজিঃ) ও হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ)-এর প্রতি কুফার বহুসংখ্যক লোকের প্রাণের সহিত সহানুভূতি থাকাতে,

ব্যাপার বড়ই জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আবার এই সময় মহামাননীয়া মোছলেম-মাতার পক্ষ হইতে কুফার প্রধান প্রধান লোকদিগের নামে এই মর্ম্মের পত্র আসিয়াছিল যে, তোমরা এ সময় আমাকে সাহায্য কর ; একান্ত পক্ষে তাহা না করিলে নিরপেক্ষ ভাবে স্ব স্ব গৃহে চুপ করিয়া বসিয়া থাক। তাঁহার এই পত্রের প্রভাবে জনমত তাঁহার একান্ত অনুকূল হইয়াছিল ; কিন্তু মহাপ্রাজ্ঞ ও মহাবাগ্মী হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর সেই অনল-বর্ষিণী বক্তৃতায় অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। কুফার পরাক্রান্ত বীরবৃন্দ মহামান্য আমিরুল-মুমেনিন-খলিফাতুল মুছলেমিনের সাহায্য করিবার জন্য একমতাবলম্বী হইল। জনগণ শাসনকর্ত্তার অনুরোধ এবং মোছলেম-মাতার অনুরোধে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক, হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহুর পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। এই সময় বীরেন্দ্র কেশরী মালেক আশ্‌তর তথায় উপস্থিত হইয়া কুফার বীরবৃন্দকে উৎসাহিত করাতে, মহামান্য খলিফার পক্ষে সোণায় সোহাগা হইল। যাহা হউক, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), হজরত এমার-বিন্-এয়াছের (রাজিঃ) ও মহাবীর মালেক আশ্‌তর ৯০০০ বিক্রান্ত যোদ্ধ্ পুরুষ কুফা হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বক, মহামান্য খলিফা-সমীপে উপস্থিত হইলেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার সামরিক শক্তি খুবই প্রবল হইল।

আবদুল্লা-বিন্-ছাবা ও বিপ্লবপন্থী কপট লোকদিগের ষড়যন্ত্রে, উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপনের সম্পূর্ণ আয়োজন হইয়াও অন্যায় তুমুল যুদ্ধের অবতারণা হইল। এব্‌নে ছাবার দল রাত্রিকালে হঠাৎ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল ; উভয় পক্ষই দারুণ ভ্রমে রহিয়া গেলেন। মহামাননীয়া ওম্মোল মুমেনিন্‌ও তাঁহার পক্ষাবলম্বিগণ মনে করিলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইয়া অন্যায় ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হজরত আলী

(কঃ—ওঃ) তাঁহার পক্ষের নেতৃগণ মনে করিলেন, হজরত যোবের (রাজিঃ) ও হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইয়া কপটতা পূর্ব্বক নৈশযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পাইল না। অনর্থক উভয় পক্ষের বহু সহস্র মোছলমান জমল যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। ঐ পরিমাণ উৎকৃষ্ট যোদ্ধা যদি কোনও বিধর্ম্মীর রাজ্য আক্রমণ করিত; তবে সে রাজ্য মহামান্য খলিফার অধিকারভুক্ত ও মোছলেম সাম্রাজ্যের অংশ রূপে পরিণত হইত। এই যুদ্ধে ও এমাম ভ্রাতৃ-যুগল বীরত্বের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু মোছলমানের শোণিতপাতে তাঁহাদের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। এব্‌নে ছাবা-প্রমুখ কপটদিগের বিষম ধোকা বাজীতে এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

এই ঘটনার পর সিরিয়া প্রভৃতি প্রদেশ ও রাজ্যের শাসনকর্ত্তা দামেশ্‌কাধিপতি হজরত মোয়াবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মহামান্য আমিরুল-মুমেনিন খলিফাতুল মোছলেমিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর যে ভীষণ যুদ্ধ বিশাল ছফিন প্রান্তরে সঙ্ঘটিত হইল, তাহাতেও এমাম ভ্রাতৃদ্বয় (রাজিঃ) আপনাদের বীরত্বের পূর্ণ 'জওহর' দেখাইয়াছিলেন।

ইহার পর বহু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল, উহা হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর এত্‌দ সঙ্গীয় জীবনীতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার সৈন্যদলে এব্‌নে ছাবার কপট দল ও কুফার যে সকল চঞ্চলমতি যোদ্ধৃপুরুষ ছিল, তাহাদের দোষে মহামান্য আমিরুল-মুমেনিন পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার খেলাফতের শেষ সময়ে মেছের, মক্কা, মদীনা, এমন প্রভৃতি প্রদেশ, জনপদ ও পবিত্র নগরাবলী হজরত আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ)-এর হস্তগত হইল। তিনি আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে "খারেজী"

সম্প্রদায়ের আবির্ভাবে তাঁহার বিরাট আয়োজনে প্রবল বাধা জন্মিল। যদিও নহরওয়ান এর যুদ্ধে দুর্দ্দান্ত খারেজী দল একেবারে নির্ম্মূল হইয়াছিল; কিন্তু যে ৯ জন লোক সেই মহাসংহারক যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতেই পাপীষ্ঠ আবদুর রহমান-বিন্-মলজম, মহামান্য আমিরুল-মুমেনিন খলিফাতুল মোছলেমিন শেরে-খোদা হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুকে শহীদ করিয়া মোছলমান জগতের সর্ব্বনাশ সাধন করিল। আদর্শ ধার্ম্মিক, আদর্শ তাপস, হজরত রেছালতমাবের সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী, আদর্শ চরিত্র, জগতের অদ্বিতীয় আদর্শ বীরপুরুষ অকালে পৃথিবী হইতে মহা প্রস্থান করিলেন। প্রকৃত খেলাফতের এখানেই প্রায় শেষ হইল। মহামান্য খলিফার 'অছিয়ত' (অন্তিম নির্দ্দেশ) অনুসারে এমাম ভ্রাতৃ-যুগল মোহাম্মদ-হানিফ-প্রমুখ ও তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ অতি সঙ্গোপনে পিতার দফন কার্য্য-কুফা হইতে অনেকটা দূরবর্ত্তী "নজফ্" নামক স্থানে সম্পাদন করিলেন। আর মহামান্য পিতার নিদেশানুসারে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) দুরাত্মা আবদুর রহমান বিন্-মলজমকে তরবারির একই আঘাতে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। তাহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। পাপীষ্ঠ দুনিয়াতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিল; পরকালের ভীষণ নরক-যন্ত্রণা তাহার অদৃষ্টে অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

আমিরুল-মুমেনিন হজরত আলী কমমুল্লাহ্ ওমাজহুর ওফাতের (পরলোক প্রাপ্তির) অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার পরে কি আমরা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর হস্তে-বয়্য়েত করিব? উত্তরে তিনি ফরমাইলেন, আমি নিজের অবস্থায় 'মশ্গুল' (বিব্রত), তোমরা যাহাকে 'পছন্দ' (মনোনীত) কর, তাহার হস্তেই বয়্য়েত করিবে। লোকেরা ইহাকে হজরত এমাম হাছন

(রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্যাত করার 'এজাযত' (ইঙ্গিত—আদেশ) মনে করিয়া, তাঁহার পরলোক গমনের পর বড় এমাম ছাহেবের হস্তে বায়্য়েত করিলেন। সর্ব্ব প্রথমে হজরত কয়েছ্-এব্নে-ছায়াদ এব্নে য়েবাদ (রাজিঃ) বয়্য়েত করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন; ইহার পরে কুফাবাসী লোকেরা দলে দলে বয়্য়েত করিতে লাগিল; অর্থাৎ তাঁহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল। বয়্য়েত গ্রহণের সময় হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) সমবেত জনমণ্ডলী হইতে এই 'এক্রার' (স্বীকৃতি) লইতেছিলেন :—

"আমার কথায় আমল (আমার আদেশ পালন) করিবে, আমি যাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব, তোমরা ও তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে; আমি যাঁহার সঙ্গে 'ছোলেহ্' (সন্ধি) করিব, তোমরা ও তাঁহার সঙ্গে 'ছোলেহ্' করিবে।

এই বয়্য়েত গ্রহণের পরেই কুফাবাসিগণ পরস্পর এই বলিয়া 'ছরগোশিয়াঁ' (কাণাঘুসা) করিতে লাগিল যে, ইঁহার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। হজরত আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ), যখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর শাহাদতের (শহীদ হওয়ার) সংবাদ পাইলেন; তখন তিনি "আমিরুল-মুমেমিন" উপাধী ধারণ করিলেন—যদিও ইতিপূর্ব্বে হজরত আবু মুছা আশয়ারী (রাজিঃ) ও হজরত ওমরু-বিনল্-আছ (রাজিঃ)-এর মীমাংসার পরই তিনি শামবাসীদিগের নিকট হইতে খেলাফতের বয়্য়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে দ্বিতীয় বার বয়্য়েত গ্রহণ পূর্ব্বক খলিফার পদ দৃঢ়ীভূত করিলেন। কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ) যখন হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্য়েত করিয়াছিলেন, ঐ সময় তিনি বলিয়াছিলেন, আমি কেতাব আল্লাহ্ ও ছোন্নত রছুলোল্লার অভিমতানুসারে

'মলহদীন' (বিধর্ম্মী—ধর্ম্মদ্রোহী) দিগের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবার জন্ত বয়্য়েত করিতেছি।' হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) তাঁহার উক্তি শ্রবণে ফরমাইলেন, 'কেতাল' (যুদ্ধ) ও 'যেহাদ' (ধর্ম্ম-যুদ্ধ) প্রভৃতি সকলই 'কেতাব আল্লাহ্' (কোরআন পাক) ও ছোন্নত-রছুলোল্লার 'শামেল' (অন্তর্ভুক্ত); ইহার জন্য স্বতন্ত্র নাম উল্লেখ করার কোনও প্রয়োজন করে না। এই উক্তির দ্বারা 'আহ্লে কুফার' (কুফা নগরবাসীদিগের) পূর্ব্বোক্ত কাণাকাণি করিবার অধিকতর 'মওকা' (সুযোগ) ঘটিয়াছিল। তদনুসারে তাহাদের মনে এই সন্দেহ হইয়াছিল যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) যুদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছুক নহেন। হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ) দ্বিতীয় বার লোকের নিকট হইতে বয়্য়েত গ্রহণ কার্য্য হইতে অবসর লাভ করিয়া, ৬০ হাজার পরাক্রান্ত সৈন্ত লইয়া দেমেশ্ক্ হইতে কুফাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর নিকট এই বলিয়া দূত পাঠাইলেন যে, 'ছোলেহ্' (সন্ধি) 'জঙ্গ' (যুদ্ধ) হইতে উত্তম। আর 'মোনাছেব' (সঙ্গত কার্য্য) এই যে, আপনি আমাকে 'খলিফা ওয়াক্ত্' (এই সময়ের খলিফা—অর্থাৎ মোছলেম-জগতের নেতা) স্বীকার করিয়া, আমার হাতে বয়্য়েত করেন। এদিকে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) যখন সংবাদ পাইলেন যে, হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ) সসৈন্যে কুফাভিমুখে আসিতেছেন, তখন তিনিও চল্লিশ হাজার সৈন্ত লইয়া দামেশ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 'মঞ্জেল তয়' (পথ অতিক্রম) করিয়া যখন তিনি "বির আবদুর রহমান" নামক স্থানে পঁহুছিলেন, তখন হজরত কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ)-কে ১২ হাজার সৈন্তসহ 'মকদ্দমাতুল জয়েশ্' (অগ্রগামী সেনাদল)-এর সেনাপতি রূপে সম্মুখের দিকে প্রেরণ করিলেন। মদায়েনের (পূর্ব্বতন পারস্ত সাম্রাজ্যের রাজ-ধানী) সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া এমাম ছাহেব (রাজিঃ) তথায় শিবির সন্নিবেশ

করিলেন ; ঐ সময় কোনও লোক এই 'গলৎ খবর' (মিথ্যা-সংবাদ) প্রদান করিল যে, হজরত কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ) যুদ্ধে মারা গিয়াছেন। মহামান্য খলিফা ঐ স্থানে একদিন এই উদ্দেশ্যে 'কায়াম' (অবস্থান) করিলেন যে, ছওয়ারির পশুগুলি একটু বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। এই স্থানে সমবেত জন-মণ্ডলীর সম্মুখে তিনি এক 'খোত্‌বা এরশাদ ফরমাইলেন' (বক্তৃতা প্রদান করিলেন); 'হামদ্' (খোদা তা-লার প্রশংসা) ও হজরত রছুলোল্লার 'ছানা' (তারিফ্—গুণানুবাদ) বর্ণনা করিবার পর বলিলেন,—

"হে জন-মণ্ডলি! তোমরা আমার হস্তে এই শর্ত্তে বয়্‌য়েত করিয়াছ যে, সন্ধি কিংবা যুদ্ধে আমার 'তাবেদারী' (আদেশ পালন) করিবে; আমি সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ তা-লার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার সঙ্গে কাহারও বিদ্বেষ ভাব বা শত্রুতা নাই। 'মশরেক' (পূর্ব্ব) হইতে 'মগ্‌রেব' (পশ্চিম) পর্য্যন্ত এমন এক ব্যক্তিকেও আমি দেখিতে পাই না যে, আমার প্রতি সে লোক 'রঞ্জ্' ও 'মলাল' (মনঃক্ষুণ্ণতা), 'নফ্‌রত' ও 'করাহিয়াত' (ঘৃণা—অবজ্ঞা) প্রদর্শন করে। 'মহব্বত' (ভালবাসা) 'ছালামতি' (নিরাপদতা), ছোলেহ্' (সন্ধি) কে আমি 'না-এত্তেফাকি' (অনৈক্য) ও 'দোশ্‌মনি' (শত্রুতা) হইতে 'বেহ্‌তর' (উত্তম) বলিয়া মনে করি।"

এমাম ছাহেবের এই বক্তৃতা শুনিয়া 'মোনাফেক' (কপট) ও খারেজী সম্প্রদায়, সমগ্র সেনাদলে এই কথা ঘোষণা করিয়া দিল যে, এমাম হাছন (রাজিঃ), মোবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল পাপাচারীর দল হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর প্রতি 'কোফরের ফতওয়া' প্রচার করিল। এই কোফরী ফতওয়ায় হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর সেনাদলের মধ্যে এই

'আছর' (ক্রিয়া—প্রভাব) বিস্তৃত হইল যে, সাধারণ সেনাদলের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, এমাম হাছন (রাজিঃ) কাফের হইয়া গিয়াছেন ; আর একদল লোক বলিতে লাগিল, না এমাম ছাহেব (রাজিঃ) কাফের হন নাই, তিনি খাঁটি ও আদর্শ মোছলমান। অবশেষে কাফেরের ফত্ওয়া দাতার দল সংখ্যায় বেশী হইয়া পড়িল ; উহারা তাহাদের মত-বিরোধী দলের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া, উহাদিগকে মার্-ধর আরম্ভ করিয়া দিল। আবার বহুসংখ্যক লোক "কাফের"— "কাফের" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর 'খিমায়' (শিবির বা তাম্বুতে) প্রবেশ করিল ; আর চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার পরিহিত বস্ত্র সজোরে টানিতে এবং উহা ছিন্ন করিতে লাগিল। এই ঘটনায় তাঁহার গায়ের সমস্ত কাপড় ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। তাঁহার স্কন্ধোপরি যে চাদর খানি ছিল, এই বেহুদা বে-আদবের দল তাহাও কাড়িয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে খিমার আসবাব-পত্র ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল। এই অবস্থা দর্শনে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) তাড়াতাড়ি অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক রবিয়ঃ ও হামদান 'কওম' (সম্প্রদায় বা জাতি)-কে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। এই দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা (যাহারা তাঁহার সেনাদলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অবস্থান করিতেছিল) তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল। তাহারা আক্রমণকারী বদমাশ্দিগকে দূরে তাড়াইয়া দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই গোলমাল, শোর-চীৎকার ও বিশৃঙ্খলা দূর হইল। অতঃপর মহামান্ত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) সেখান হইতে "মদায়েন" শহরের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে জরাহ্-বিন্-কবিছনাঃ নামক এক পাষণ্ড খারেজী সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার প্রতি একটা নেযাঃ (বল্লম বা বড়শা বিশেষ) নিক্ষেপ করিল। ঐ নেযাঃ তাঁহার 'রাণে' (পাদ-মূলে) বিদ্ধ হওয়াতে তিনি 'যখ্মী' (আহত) হইলেন। তাঁহাকে সেই অবস্থায় চারপায়ী

অর্থাৎ খাটুলীতে করিয়া মদায়েন রাজধানীস্থ " কছ্‌রে আবেজ " নামক রাজ-প্রাসাদে আনয়ন করা হইল; এবং ঐ স্থানেই তিনি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌ হজল ও আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌ যবিয়ান ঐ পাষণ্ড জরাহ-বিন্‌-ক্বিছনাঃ খারেজীকে 'ক্বতল' (হত্যা) করিল। কছরে আবেজে অস্ত্র-চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা করাতে, অতি অল্প কাল মধ্যেই তিনি আরোগ্য লাভ: করিলেন। ক্বয়েছ-বিন্‌-ছায়াদ (রাজিঃ) যে ১২ হাজার সৈন্য লইয়া অগ্রগামী হইয়াছিলেন, তিনি " আন্‌বার " নামক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমীর হজরত মায়বিয়া (রাজিঃ) স্বীয় বিপুল সৈন্যদল সহ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে 'মহাছেরাঃ' (বেষ্টন) করিয়া লইলেন; আর আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-আমের (রাজিঃ)-কে অগ্রগামী সেনাদলের নেতৃ রূপে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া মদায়েনে পাঠাইলেন। এদিকে মদায়েনে পঁহুছিয়া এবং স্বীয় সৈন্যদলের " বদ-তমিযি " (অশিষ্টতা—অসদ্ব্যবহার) দর্শন করিয়া হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), সন্ধি স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া হজরত আমীর মায়বিয়া (রাজিঃ)-এর ভাগিনেয় আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌ হারেছ-বিন্‌-নওফলকে দূত স্বরূপ আমীরের নিকট ইতিপূর্ব্বেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-আমের মদায়েনের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) তাঁহার সঙ্গে 'মোকাবেলা' (যুদ্ধ) করিবার জন্য মদায়েন হইতে বাহির হইলেন। আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-আমের, এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর সৈন্য দলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তাহাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন; এবং এরাকী যোদ্ধ্‌-পুরুষদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসি নাই; অমি আমীর মায়বিয়া (রাজিঃ)-এর 'মকদ্দমাতুল জয়েশ' (অগ্রগামী সেনাদল)-এর সেনাপতি; আমীর মায়বিয়া (রাজিঃ) মূল সেনাদল লইয়া আন্‌বারে অবস্থান করিতেছেন; তোমরা হজরত

এমাম হাছন (রাজিঃ) সমীপে আমার ছালাম পঁহুছাইয়া দাও ; আর আমার পক্ষ হইতে বল যে, আবতুল্লাহ্ আপনাকে খোদার 'ওয়াস্তাঃ' দিয়া বলিতেছে যে, আপনি যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া 'হালাকৎ' (ধ্বংস) হইতে অব্যাহতি লাভ করুন। যখন হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) এই কথা শুনিলেন, তৎক্ষণাৎ মদায়েনে ফিরিয়া আসিলেন, এবং আবতুল্লার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমি আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে 'ছোলেহ্' (সন্ধি) করিতে, এবং খেলাফতের দাবী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য আছি—যদি আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ) আমার কতিপয় শর্ত্ত্ মঞ্জুর করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও প্রধানতম শর্ত্ত এই যে, আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ) কেতাব (কোরআন পাক) ও ছোন্নত নববীর প্রতি সম্পূর্ণ আমল রাখিবেন ; আর পূর্ব্বতন 'মোখালেফত্' (শক্রতা) ভুলিয়া যাইবেন, এবং কাহারও 'জান' (জীবন) ও মাল (সম্পত্তি)-এর প্রতি হস্তার্পণ করিবেন না, আর আমার পক্ষাবলম্বিগণের জীবন রক্ষার্থে প্রতিশ্রুতি দান করিবেন।

"আল্ ছোলেহ্ খায়ের"—সন্ধি মঙ্গল জনক। আবতুল্লাহ্-বিন্-আমের এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর এই উত্তর শুনিয়া তৎক্ষণাৎ হজরত আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট আন্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; এবং বলিলেন, কতিপয় শর্ত্তে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) খেলাফৎ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য আছেন। হজরত আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই সকল শর্ত্ত কি কি ? আবতুল্লাহ্ বলিলেন, প্রথম শর্ত্ত এই যে, আপনার মৃত্যুর পর খেলাফত হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) প্রাপ্ত হইবেন ; দ্বিতীয় শর্ত্ত এই যে, যতদিন আপনি জীবিত ও খেলাফত্-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, বয়তুল মাল হইতে এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-কে প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ দরহম

নিয়মিত রূপে পাঠাইয়া দিবেন। তৃতীয় শর্ত্ত এই যে, আহ্ওয়ায্ ও ফারছের (পারস্য দেশের) খাজানা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে প্রদান করিতে হইবে। এই ৩টি শর্ত্তই আবদুল্লাহ-বিন্-আমের স্বয়ং এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে 'পেশ্' করিয়া ছিলেন। তৎপর ঐ সকল শর্ত্তের ও উল্লেখ করিলেন, যাহা এমাম ছাহেব (রাজিঃ) স্বয়ং তাঁহার নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমীর হজরত মোয়াবিয়া (রাজিঃ) বলিলেন, এই সকল শর্ত্ত সমুদয়ই আমি মঞ্জুর করিতেছি। এমাম হাছন (রাজিঃ) যদি ইহা ব্যতীত আর ও কোন শর্ত্ত পেশ করেন, তাহাও আমি মঞ্জুর করিব ; কারণ তাঁহার 'নিয়ত' (সঙ্কল্প) নেক বলিয়া বোধ হইতেছে। আর মোছলমানদিগের মধ্যে 'ছোলেহ্' (সন্ধি) ও শান্তি স্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া আমি মনে করিতেছি। এই কথা বলিয়া হজরত আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ) এক খণ্ড সাদা কাগজে স্বীয় মোহর অঙ্কিত ও নাম স্বাক্ষর করিয়া, আবদুল্লাহ্ বিন্-আমেরকে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, তুমি এই কাগজ হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর নিকট লইয়া যাও, আর তাঁহাকে গিয়া বল, তিনি যে যে শর্ত্ত চান, এই কাগজে তাহা লিখিয়া দেন, আমি সেই সকল শর্ত্তই পালন করিতে প্রস্তুত আছি। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ও আবদুল্লাহ্-বিন্-জাফর (রাজিঃ) যখন জানিতে পারিলেন, এমাম হাছন (রাজিঃ) সন্ধি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক, তখন তাঁহারা বড় এমাম (রাজিঃ) ছাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে এই সঙ্কল্প হইতে বিরত থাকিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু তিনি তাঁহাদের এই 'রায়' (মত) 'পছন্দ' করিলেন না। তিনি হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর সময় হইতে কুফা ও এরাক বাসীদের কার্য্য-কলাপ এবং ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া আসিতেছিলেন ; পক্ষান্তরে হজরত

মোয়াবিয়া (রাজিঃ)-এর 'মোল্‌কীএন্তেজাম' (রাজ্যশাসন সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত), রাজনীতিক জ্ঞান ও তদ্বিষয়ের দৃঢ়তা এবং শাসন-শৃঙ্খলা ও তাঁহার 'পেশ-নযর' (দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত) ছিল, সুতরাং তিনি সন্ধি স্থাপন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দৃঢ়সঙ্কল্প রহিলেন। যখন আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-আমের, হজরত আমীর মোয়াবিয়ার 'দস্তখতি' (স্বাক্ষরীত) কাগজ লইয়া আসিলেন; এবং সমুদয় 'পেশ্‌-করদাঃ শরায়েত্‌' (উত্থাপিত শর্ত্ত সমূহ) এর উল্লেখ করিলেন, তখন হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) বলিলেন, আমি এই শর্ত্ত:পছন্দ করি না যে, হজরত মোয়াবিয়া (রাজিঃ)-এর পরে আমাকে খলিফা পদে অভিষিক্ত করা হয়। কারণ যদি আমার খেলাফত লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তবে আমি এ সময় কেন উহা পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি? অতঃপর তিনি কাতেবকে ডাকাইয়া সন্ধিপত্র লিখিতে আদেশ করিলেন; তদনুসারে নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে সন্ধি-পত্র লেখা হইল;—" এই 'ছোলেহ্‌নামাঃ' (সন্ধিপত্র) হাছন (রাজিঃ) বিন্‌-আলী (রাজিঃ) বিন্‌-আবিতালেব, এবং মোয়াবিয়া (রাজিঃ)-বিন-আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর মধ্যে লেখা যাইতেছে। উভয়ে নিম্ন-লিখিত শর্ত্ত্‌ সমূহে একমতাবলম্বী এবং 'রেজামন্দ' ('রাজী'—সম্মত) হইয়াছেন। 'আমার খেলাফত' (খলিফার পদ) মোয়াবিয়া (রাজিঃ) বিন্‌-আবি ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর হস্তে অর্পণ করা হইল। মোয়াবিয়া (রাজিঃ)-এর পরে মোছলমানগণ তৎসাময়িক 'মছলেহত' (সিদ্ধান্ত) অনুযায়ী যাহাকে ইচ্ছা করিবেন, খলিফার পদে অভিষিক্ত করিবেন। মোয়াবিয়া (রাজিঃ)-এর হস্তে এবং বাক্যে সমুদয় 'আহ্‌লে এছলাম' (মোছলমান-গণ) নিরাপদ, নির্ভয় ও শান্তির সহিত বাস করিবে। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর মতানুবর্ত্তী ও পক্ষাবলম্বিগণের প্রতি মোয়াবিয়া (রাজিঃ) কোনও রূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করিবেন না (তাঁহাদের প্রতি কোনও

রূপ উৎপীড়ন করিবেন না); হাছন-বিন্‌-আলী (রাজিঃ)-এবং হোছেন বিন্‌-আলী (রাজিঃ)-এর প্রতি এবং তাঁহাদের 'মোতরল্লেকিন' (পক্ষাবলম্বী বা সহানুভূতি সম্পন্ন এবং আত্মীয়-স্বজন)-এর প্রতি মোয়াবিয়া (রাজিঃ) কোনও রূপ 'জরর' পঁহুছাইবেন না (ক্লেশ প্রদান করিবেন না), আর এই দুই ভ্রাতা এবং তাঁহাদের সম্পর্কীত ও পক্ষাবলম্বিগণ খেলাফতের অধিকারভুক্ত যে কোনও শহরে বা যে কোনও পল্লী বা গ্রামে ইচ্ছা, বসবাস করিবেন; আমীর মোয়াবিয়া, (রাজিঃ), তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্ত্তাগণ বা কর্ম্মচারিগণের এরূপ কোনও অধিকার থাকিবে না যে, তাঁহাদিগকে আপনাদের 'মহকুম' ('হুকুম বরদার'—'তাবেদার'—অধীন) মনে করিয়া, আপনাদের কোনও ব্যক্তিগত আদেশ পালনের জন্য তাঁহাদিগকে 'মজবুর' (বাধ্য) করেন। 'আহ্‌ওয়ায্‌' নামক 'ছুবার' (প্রদেশের) খাজানা এমাম হাছন (রাজিঃ) নিয়মিত রূপে প্রাপ্ত হইবেন, আর বার্ষিক ২০ লক্ষ দরম হোছেন-বিন্‌-আলী (রাজিঃ)-কে, আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ) যথানিয়মে পঁহুছাইতে থাকিবেন। কুফার 'বয়তুল-মালে' (রাজকোষে) বর্ত্তমান সময়ে যে পরিমাণ টাকা (ও সামগ্রী-সম্ভার) 'মওজুদ' (জমা) আছে, তৎ সমস্ত হজরত এমাম হাছন-বিন্‌-আলী (রাজিঃ)-এর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। তিনি নিজের ক্ষমতাবলে উহা যেরূপ ইচ্ছা খরচ করিবেন। আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ), 'বনি-হাশেম' (হাশেম বংশীয়)-দিগকে 'এনাম' (পারতোষিক) ও বৃত্তি ইত্যাদি প্রদানে অন্যের অপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী মনে করিবেন।"

এই 'আহদ নামার' (সন্ধিপত্রের) উপর আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-আল্‌-হারছ-বিন্‌-নওফল, ওমর-বিন্‌ আবি ছলমাঃ-প্রমুখ কতিপয় প্রধান প্রধান লোকের 'দস্তখত্‌' (স্বাক্ষর), সাক্ষী ও 'জামেন' (প্রতিভূ) স্বরূপ হইল। যখন সন্ধিপত্র লিখিত হইয়া উহা 'আনবার' নামক স্থানে হজরত

মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট পঁহুছিল, তখন তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) সদল বলে "মদায়েন" হইতে কুফায় পঁহুছিলেন। হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) ও আনবার হইতে 'মহাছেরা' (অবরোধ) তুলিয়া লইয়া, কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ)-কে স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছা গমন জন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সসৈন্যে কুফাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ) ও ঐদিন সদলবলে ঐস্থান হইতে রওয়ানা হইয়া যথাসময়ে কুফায় গিয়া পঁহুছিলেন। আমীর হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) কুফার জামে-মছজেদে পঁহুছিয়া হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ও 'আহ্‌লে কুফা' (কুফাবাসিগণ) হইতে যথা-নিয়মে বয়্‌য়েত গ্রহণ করিলেন। কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ) বয়্‌য়েত করিতে প্রথমে অস্বীকৃত হইলেন, আর তিনি ঐ সময়ে মছজেদে ও আসিলেন না। আমীর হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) তাঁহার নিকটও একখানি সাদা কাগজে মোহর ও স্বীয় নাম 'দস্তখত' করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার যাহা শরত্‌ করিবার ইচ্ছা, এই কাগজে উহা লিখিয়া দাও ; আমি তাহাই মঞ্জুর করিব। তদনুসারে তিনি কেবল নিজের, এবং স্বীয় অধীনস্থ ও মতাবলম্বী লোকদিগের 'জানের আমান' (জীবন সম্বন্ধে নিরাপদতা) চাহিলেন ; অর্থ-সম্পদ বা টাকা কড়ি সম্বন্ধে কোনও প্রার্থনা জানাইলেন না। আমীর হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরত্‌ মঞ্জুর করিয়া লইলেন। ইহার পর কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ) ও তাঁহার মতানুবর্ত্তী লোকেরা ও মছজেদে উপস্থিত হইয়া বয়্‌য়েত করিলেন। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) প্রথমে বয়্‌য়েত করিতে 'এন্‌কার' (অস্বীকার) করিলেন ; হজরত আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ) বয়্‌য়েত গ্রহণ জন্য 'এছরার' (তাকিদ) করিতে লাগিলেন, ; তদ্দর্শনে এমাম হাছন (রাজিঃ) বলিলেন, আপনি (এমাম)

হোছেন (রাজিঃ) হইতে বয়্য়েত গ্রহণ জন্য পাড়াপীড়ি করিবেন না ; সে আপনার নিকট বয়্য়েত করা অপেক্ষা স্বীয় 'ফখর' (গৌরব) প্রিয় মনে করে। ইহা শুনিয়া হজরত আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ) 'খামুশ' (চুপ) হইয়া গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) আসিয়া হজরত আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্য়েত করিলেন। এই ছফরে (প্রবাসে) হজরত আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ওমরু-বিনল্-আছ (রাজিঃ) ও ছিলেন, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, এক্ষণে আপনি এমাম হাছন (রাজিঃ) ও কুফাবাসিগণের মনস্তুষ্টি সাধন জন্য এমাম ছাহেব (রাজিঃ) দ্বারা একটি বক্তৃতা দেওয়ান। হজরত আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ) তাঁহার এই মত পছন্দ করিলেন ; তদনুসারে তাঁহার অনুরোধে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন ; সেই বক্তৃতার মর্ম্ম এই :—

"মোছলমানগণ ! আমি 'ফেৎনা" (বিবাদ বিসম্বাদ)-কে বড়ই 'মক্রুহ্' (নাপছন্দ—অপ্রিয়) বলিয়া মনে করি। স্বীয় 'জদ্দে-আমজদ' (এস্থলে মাতামহ অর্থাৎ হজরত রেছালতমাব [ছালঃ]-কে লক্ষ্য করা হইয়াছে)-এর ওম্মতের সঙ্গে 'ফছাদ' ও বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করিবার জন্য, ও তাহাদের 'জান ও মাল' (ধন ও সম্পত্তি) 'মহ্ফুয্' (নিরাপদ) রাখিবার অভিপ্রায়ে আমি হজরত আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে 'ছোলেহ্' (সন্ধি) করিলাম ; এবং তাঁহাকে আমীর ও খলিফাঃ বলিয়া স্বীকার করিলাম। যদি এমারত ও খোলাফতে ইঁহার হক্ (স্বত্ব) থাকিয়া থাকে, তবে ত উনি তাহা লাভ করিয়াছেন, আর যদি উহা আমার হক্ হয়, তবে আমি তাহা ইঁহাকে প্রদান করিলাম।"

ইহার পর 'ছোলেহ্' (সন্ধি)-এর সমুদয় ব্যাপার ও অনুষ্ঠান শেষ হইল, সঙ্গে সঙ্গে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ঐ 'পেশগোয়ী'

(ভবিষ্যদ্বাণী)ও—যাহা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) সম্বন্ধে তিনি ফরমাইতেন, তাহা সফল হইল ; ঐ ভবিষ্যদ্বাণী এই :—

"আমার এই বেটা (পুত্র—অর্থাৎ দৌহিত্র) 'ছরদার' (নেতা) ; খোদা তা-য়ালা ইহার দ্বারা মোছলমানদিগের দুই দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন (মিলন) করাইয়া দিবেন।"

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়া মিম্বর হইতে অবতরণ করিলে, হজরত আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ) উৎসাহের সঙ্গে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"আবু মোহাম্মদ ! আপনি আজ যেরূপ 'জওয়ামর্দ্দি' (বীরত্ব), ও 'বাহাদুরী' (সাহসিকতা) প্রদর্শন করিলেন, এরূপ জওয়ামর্দ্দিও বাহাদুরী আজ পর্য্যন্ত কেহ দেখাইতে পারেন নাই।"

এই সন্ধি ৪১ হিজরীতে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর শাহাদৎ-প্রাপ্তির ৬ মাস পরে স্থাপিত হইয়াছিল ; এজন্য এই ৪১ হিজরী "আম আল্-জমায়াত" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সন্ধি স্থাপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া হজরত মোয়াবিয়া (রাজিঃ) সসৈন্যে ও সদল বলে দামেস্কে চলিয়া গেলেন। এমাম হাছন (রাজিঃ) যতকাল জীবিত ছিলেন, হজরত আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ) সন্ধির সকল শরত্ই যথানিয়মে পালন করিয়াছিলেন ; সন্ধি-শরতের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন না। নিয়মিত রূপে তাঁহার বৃত্তির টাকা প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি প্রদর্শন করেন নাই। তিনি কুফা হইতে চলিয়া যাওয়ার পর চঞ্চলমতি আহ্লে কুফা (কুফাবাসিগণ) পরস্পর এই চর্চ্চা করিতে লাগিল যে, ছুয়া আহ্ওয়াব্ এর 'খেরাজ' (খাজানা) ত আমাদের 'মালে-গণিমত' (জয়লব্ধ-সম্পত্তি), আমরা

উহা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে কিছুতেই লইতে দিব না। এই আলোচনা শ্রবণে জনাব হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) কুফাবাসী-দিগকে সমবেত করিয়া উহাদের সম্মুখে নিম্ন-লিখিত রূপ 'তকরির' (বক্তৃতা) করিলেন।

"হে এরাক বাসিগণ! আমি তোমাদিগের কার্য্যে 'বারহা' (বারংবার—পুনঃ পুনঃ) 'দরগোযর' (চশমপুশি'—দেখিয়া ও না দেখা) করিয়াছি; তোমরা আমার মহামান্য পিতাকে শহীদ করিয়াছ; আমার বাড়ী ঘর লুণ্ঠন ও আমাকে নেযাঃ মারিয়া 'যখ্মি' (আহত) করিয়াছ, তোমরা দুই শ্রেণীর 'মকতুলিন' (নিহত) লোকদিগকে স্মরণ করিয়া থাক; প্রথমতঃ যাহারা ছফিন যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ যাহারা নহরওয়ানের যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তোমরা উহাদের 'ময়াওযাঃ (বদলা) দাবী করিতেছ; হজরত মায়বিয়া (রাজিঃ) তোমাদের সঙ্গে যে 'মোয়ামেলা' (ব্যবহার) করিয়াছেন, উহাতে তোমাদের কোন সম্মান লাভও হয় নাই; আর উহা 'এন্‌ছাফ্ (বিচার) সঙ্গত ও নহে। এরূপ ক্ষেত্রে তোমরা যদি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও, তবে আমি এই সন্ধি ভঙ্গ করি, আর তরবারি ও নেযার দ্বারা ইহার 'ফয়ছলা' (মীমাংসা) করিয়া লই। পক্ষান্তরে তোমরা যদি আপনাদের জীবন প্রিয় জ্ঞান কর, তবে আমি এই সন্ধি 'কায়েম' (অক্ষুণ্ণ—বলবৎ) রাখি।"

এই আবেগময়ী বক্তৃতা শ্রবণে চতুর্দ্দিক, হইতে শব্দ উত্থিত হইল—"সন্ধি 'কায়েম' (স্থির) রাখুন, সন্ধি কায়েম রাখুন।" প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) কুফাবাসীদিগের 'কম হেম্মতি' (সাহসহীনতা—কাপুরুষতা) ও 'বেওকুফির' (নির্ব্বুদ্ধিতার) বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি ধমক দিয়া উহাদিগকে 'শায়েস্তা' (সোজা) করাই কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন। এই ভীতি-প্রদর্শনে তাঁহার

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কুফাবাসী যুদ্ধ করিয়া প্রাণদান করিতে ইচ্ছুক ছিল না; সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধ চর্চ্চা ও আলোচনা এই স্থানেই শেষ হইল। কুফাবাসিগণ আদর্শ যোদ্ধ্ পুরুষ হইলেও, নিতান্ত চঞ্চল মতি ছিল; তদুপরি ছাবায়ী দল ও খারেজী দল তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া সর্ব্বদাই বিপথগামী করিত। তাহারা স্থিরচিত্ত হইয়া যুদ্ধ করিলে, ছফিন যুদ্ধে অনেক পূর্ব্বেই বিশ্ব-ত্রাস মহাবীর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) জয়লাভ করিয়া, অখণ্ড মোছলেম জগতের একচ্ছত্র খলিফা হইতেন; হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) শোচনীয় রূপে পরাস্ত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেন। ইহাদের মধ্যে মহাবীর মালেক আশ্‌তর-প্রমুখ কতিপয় কর্ত্তব্য পরায়ণ এবং হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর অকৃত্রিম ও পরম ভক্ত আদর্শ বীর-পুরুষ ছিলেন। যাহা হউক, হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) নির্ব্বিরোধে সমগ্র মোছলেম-জগতের খলিফা হইলেন; তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহই রহিলেন না। আশ্‌রায়ে মোবাশ্বরার অন্যতম পুরুষ, পারস্য-বিজয়ী ও কুফা নগরের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর হজরত ছায়াদ-বিন্‌-আবি ওক্কাছ (রাজিঃ) রাজনীতিক ব্যাপারের সংস্রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, উষ্ট্র এবং ছাগ-মেষ চরাইয়া এবং 'গোশা-নিশিনি' (নির্জ্জনবাস) অবস্থায় কেবল-মাত্র আল্লাহ্‌ তা'লার উপাসনা-আরাধনায় দিনাতিপাত করিতেছিলেন; তিনিও হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্‌য়েত করিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-ওমর (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-যোবের (রাজিঃ), হজরত আবদুর রহমান-বিন্‌-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) প্রভৃতি সকলেই ক্রমশঃ হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্‌য়েত করিলেন। স্থূলকথা, মহামান্য ছাহাবাঃ (রাজিঃ) এবং অন্যান্য ক্ষমতাশালী মোছলমান দিগের মধ্যে কেহই বয়্‌য়েত করিতে বাকী থাকিলেন না। সুতরাং হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ)

সমগ্র মোছলেম-জগতের একচ্ছত্র খলিফা হইলেন। উত্তরে এসিয়া মাইনর, ককেশ্‌শ পর্ব্বতমালা ও বাহ্‌রে খেজর (কাস্পীয়ান সাগর) হইতে দক্ষিণে আরব সাগর এবং পূর্ব্বে তুর্কীস্তানের সীমা হইতে পশ্চিমে মরক্কোর সীমা পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পরে এই সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সন্ধি স্থাপনের পর হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)—ভ্রাতা, আত্মীয়-ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে লইয়া কিছু দিন কুফা নগরে বাস করিলেন; তৎপর কুফানগরী চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদল বলে মদীনা শরীফে রওয়ানা হইলেন। কুফার অধিবাসিগণ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়াছিল। এই দিন হইতে কুফার দুর্দ্দিনের সূত্রপাত হইল। এমাম ছাহেব (রাজিঃ) মদীনা শরীফে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মহামাননীয় নানার (মাতামহের) এবং পরম শ্রদ্ধেয়া জননীর পবিত্র কবর যেয়ারত করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন; এবং সর্ব্বদা আল্লাহ্‌ তা-লার এবাদৎ-বন্দেগীতে 'মশ্‌গুল' নিয়োজিত থাকিতেন। তাঁহাদের আগমনে মদীনাবাসিগণও অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহাদের ভক্ত ও অনুরক্ত দলের আনন্দের সীমা পরিসীমাই ছিল না। হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) একটি অপ্রীতিকর কার্য্য এই করিয়াছিলেন যে, আত্মীয়তার অনুরোধ কুচক্রী ও বনি-হাসেম এবং আহ্‌লে বয়েতের পরম শত্রু মারওয়ান-বিন্‌-হকমকে পবিত্র নগরী মদীনা-তৈয়বার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, মহামান্য এমাম ছাহেব (রাজিঃ) দ্বয়ের হৃদয়ে দারুণ বেদনা প্রদান করিয়াছিলেন।

৫০ কিংবা ৫১ হিজরীতে হজরত এমাম হাছন আলায়হেচ্ছালাম 'ওফাত' পাইয়াছিলেন। সাধারণতঃ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী জয়দাঃ-বিন্তে আল্‌-আশয়ত তাঁহাকে বিষ পান করাইয়া-

ছিলেন। কিন্তু যখন হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) এবং হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)ও নিশ্চিত রূপে ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন না যে, কে এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-কে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল; এবং কি জন্য বিষ পান করাইয়া তাঁহার পবিত্র জীবনের অবসান করিয়াছিল, তখন প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পরে একজনের প্রতি দোষারোপ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। পরবর্ত্তী কালে এই ঘটনা সম্বন্ধে অনেক প্রকার বর্ণনাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এবং বিবী জয়দাঃকেই বিষ প্রয়োগ কারিণী বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে।

'ওফাতের' (মৃত্যুর) পূর্ব্বে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে বলিলেন " আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পর হইতে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) পর্য্যন্ত (অর্থাৎ খেলাফতের প্রথম অবস্থা পর্য্যন্ত) খেলাফৎ পঁহুছিয়াছে (অর্থাৎ এই সময় পর্য্যন্ত খেলাফতের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই); কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে তরবারি কোষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে; অথচ খেলাফতের কোন মীমাংসা হয় নাই। এক্ষণে আমি খুব ভাল রূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে, এমামৎ ও খেলাফৎ আমার 'খান্দানে' (বংশে) একত্রে থাকিতে পারে না। ইহাও 'আন্দেশা' (আশঙ্কা) হইতেছে যে, বিপ্লববাদী ও বিশ্বাসঘাতক কুফাবাসিগণ তোমাকে এখান হইতে তথায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবে, তুমি কোনও ক্রমেই তাহাদের 'ফেরেবে' (চক্রান্তে) পড়িও না। আমি (নানী) হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-কে বলিয়া ছিলাম, আমার মৃত্যু হইলে আমাকে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র কবরের পার্শ্বে দফন করিতে অনুমতি দিবেন; তখন ত তিনি এ সম্বন্ধে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকের খেয়াল এই যে, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে এক্ষণে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন না;

কিন্তু আমার পরে (আমার মৃত্যু হইলে) তুমি আবার তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিবে, যদি তিনি আদেশ না দেন, তবে তুমি কোনও রূপ প্রতিবাদ করিও না। ”

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) পরলোক গমন করিলে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ), মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর নিকট ভ্রাতার দফন কার্য্য সম্বন্ধে অনুমতি চাহিলে তিনি প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি প্রদান করিলেন। কিন্তু মদীনার শাসনকর্ত্তা শঠ-চূড়ামণি কুটিলমনাঃ মারোয়ান-বিন্-হকম যখন শুনিতে পাইলেন যে, মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সমাধি-পার্শ্বে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে দফন (.কবরস্থ) করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তখন তিনি ইহাতে বাধা প্রদান করিলেন। এই সংবাদ প্রাপ্তে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ও তাঁহার ভক্ত এবং অনুচর মণ্ডলী অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ভ্রাতাকে বলপূর্ব্বক দফন করিতে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে ছিলেন ; কিন্তু এই সময় পণ্ডিত কুল চূড়ামণি হজরত আবু হোরেরাঃ (রাজিঃ) আসিয়া হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে বুঝাইয়া শুঝাইয়া শোণিতপাত হইতে নিবৃত্ত করিলেন। অগত্যা তিনি স্বীয় ভ্রাতা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে তাঁহার ওয়ালেদাঃ মাজেদাঃ হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সমাধির পার্শ্বে—জন্নতল বকিতে দফন করিলেন।

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর ৯টি পুত্র ও ৬টি কন্যা—সর্ব্বসমেত এই পনরটি সন্তান ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৭ কিংবা ৪৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। খেলাফতের দাবী পরিত্যাগ এবং হজরত আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের পর তিনি মাত্র ১০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে হজরত এমাম হোছেন

(রাজিঃ), তদীয় অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, মহামাননীয়া নানী ছাহেবা (রাঃ—আঃ)-গণ, ছাহাবাঃ কারামগণ এবং মদীনার অধিবাসিগণ বিশেষ শোকাকুলিত হইয়াছিলেন। তিনি তদীয় মহামান্য পিতার ন্যায় ধর্ম্মের সাক্ষাৎপ্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ছিলেন। এমাম ছাহেবের প্রশংসনীয় স্বভাব চরিত্র এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে দৃঢ়তা:——হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) নিতান্ত 'হলিম' (ক্রোধ-সংবরণকারী), 'ছাহেবে-ওকার' (ভারী-ভরকম্পন—গম্ভীর), 'ছাহেবে-হশ্মত' (দব্দবা-ওয়ালা) এবং নিতান্ত 'ছখি' (দাতা) ছিলেন। 'ফেৎনা' (বিবাদ-বিসম্বাদ) ও 'খুনরেযী' (রক্তপাত)-এর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। তিনি 'পেয়াদাঃ-পা' (পদব্রজে) ১৫টি হজ্জ্ করিয়া ছিলেন—যদিও তাঁহার সঙ্গে আরোহণোপযুক্ত বিস্তর উট থাকিত। পদব্রজে গমন করিয়া অধিক পুণ্য লাভ হয় বলিয়া তিনি এত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক হাটিয়া গিয়া পবিত্র হজ্জ্কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। আজকাল নিতান্ত দরিদ্র লোক ব্যতীত কেহই হাটিয়া গিয়া হজ্জ্ করেন না। য়মির-বিন্-এছহাক বলেন, কেবলমাত্র হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)ই এমন এক 'শখ্ছ' (ব্যক্তি) ছিলেন যে, তিনি যখন কথা বলিতেন, আমি তখন ইচ্ছা করিতাম, তিনি কথা বলিতে থাকুন, কথা বলিতে তিনি যেন কোনও ক্রমেই ক্ষান্ত না হন। আমি তাঁহার মুখে কখনও কোন 'ফহশ্ কল্মাঃ' (অশ্লীল বা অশ্রাব্য কথা) শুনি নাই। মারওয়ান-বিন্-আল্ হকম যখন মদীনার শাসনকর্ত্তা ছিল, আর হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) খেলাফৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদীনায় বাস করিতেছিলেন, ঐ সময় বে-আদব মারওয়ান একটি লোকের দ্বারা হজরত এমাম (রাজিঃ)-কে বলিয়া পাঠাইল যে, " আপনার 'মেছাল' (উপমা) খচ্চরের ন্যায় (নউযবেল্লাহ্ মেন্হ) ; কারণ, উহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়

তোর বাপ কে ছিল ? উত্তরে সে বলে আমার মা ঘোড়ী ছিল।" ইহার উত্তরে হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) বলিয়া পাঠাইলেন, " আমি তোমার একথা কখনও ভুলিতে পারিব না যে, তুমি বিনা কারণে আমাকে গালি দিতেছ। 'আখের' (অবশেষে) তোমাকে ও আমাকে একদিন খোদা তা-লার সম্মুখে যাইতে হইবে। যদি তুমি তোমার 'কওলে' (কথায়) 'ছাচ্চা' (সত্যবাদী) হও, তবে খোদা তা-লা তোমাকে সত্য কথা বলিবার সুফল প্রদান করিবেন ; আর যদি তুমি 'ঝুটা' (মিথ্যাবাদী) হও, তবে খুব স্মরণ রাখিও যে, খোদা তা-লা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক 'মন্তকম্' (বদলা লেনেওয়ালা—প্রতিশোধ গ্রহণকারী)।"

হবিব-বিন্-আছমা বলেন, যখন হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলেন, তখন মারওয়ান তাঁহার জানাযার কাছে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ফরমাই-লেন, এক্ষণে ত তুমি রোদন করিতেছ, কিন্তু জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে 'ছাতাইতে' (বিরক্ত করিতে—মনোকষ্ট দিতে) ছিলে। উত্তরে মারওয়ান বলিল, আমি জানিতাম যে, ঐ ব্যক্তির সঙ্গে আমি ঐরূপ ব্যবহার করিতাম—যিনি পাহাড় অপেক্ষাও অধিক 'হালিম' (বোরদোওয়ার—ধৈর্য্যশালী—সহগুণ-বিশিষ্ট) ছিলেন।

আলী-বিন্-যয়েদ বলেন, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) দুইবার স্বীয় সমস্ত 'মাল' (অর্থ-সম্পত্তি) খোদা তা-লার রাহে খায়রাত করিয়া দিয়াছিলেন। আর দুইবার অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক মাল দান করিয়া-ছিলেন ; এই পর্য্যন্ত খায়রাত করিয়াছিলেন যে, একখানি জুতা রাখিয়া-ছিলেন, একখানি দান করিয়াছিলেন ; ঐরূপে একখানি মোযাঃ রাখিয়া আর একখানি মোযাঃ খায়রাত করিয়া দিয়াছিলেন।

একবার তাঁহার সম্মুখে হজরত আবুযর (রাজিঃ) বলিয়াছিলেন, "আমি

'তওঙ্গরি' (ঐশ্বর্য্যশালী) হইতে 'মোফ্‌লেছি' (দরিদ্রতা) কে, আর 'তন্দরস্তি' (স্বাস্থ্য-সম্পদ) হইতে পীড়িত থাকাকে অধিক 'আযিয' (প্রিয়) বলিয়া মনে করি;" তচ্ছ্রবণে হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) বলিলেন, " খোদা আপনার উপর 'রহম' (দয়া প্রদর্শন—করুণা বিতরণ) করুন, আমি কিন্তু আমাকে সর্ব্বতোভাবে খোদা তা-লার হস্তে অর্পণ করিয়াছি; আর কোনও কথারই 'তমান্নাঃ' (আরযু—খাহেশ—কামনা) করি না; তাঁহার (আল্লাহ্‌ তা-লার) যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবেন; আমার তাহাতে 'দখল' দেওয়ার কি আছে?"

তিনি ৪১ হিজরীতে হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-কে খেলাফত ছাড়িয়া দেন। উহার পরে তাঁহার কোনও 'দোস্ত্‌' (বন্ধু) তাঁহাকে " আমিরুল-মুমেনিন " বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি ফরমাইতেন যে, 'আর' ('শরম'—লজ্জা—লাজ), 'নার' (দোযখ্‌—নরক) হইতে 'বেহ্‌তর' (উৎকৃষ্ট)। এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়া ছিল, হে মোছলমান দিগকে 'যলিল' (অপদস্থ) করনেওয়ালা! তোমাকে ছালাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি মোছলমানদিগকে অপদস্থ বা অবমাননা-কারী নহি; আমার পক্ষে কি উহা ভাল কাজ ছিল যে, তোমাদিগকে হত্যা করাইয়া দিতাম?

জবির-বিন্‌-নফিল বলিয়াছেন যে, আমি হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে বলিলাম, এইরূপ জনরব যে, আপনি নাকি পুনরায় খেলাফতের 'খাহেশ্‌মন্দ্‌' (আকাঙ্ক্ষী)? উত্তরে তিনি ফরমাইলেন, যখন আরববাসীর মস্তক আমার হাতে ছিল, যাহাকে ইচ্ছা যুদ্ধে লাগাইতে পারিতাম, ঐ সময়ও আমি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ তা-লার প্রীতি সাধন জন্য খেলাফৎ পরিত্যাগ করিলাম; সেইরূপ ক্ষেত্রে এক্ষণে 'আহ্‌লে হেজায্‌' (হেজায্‌ বাসী)-দিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কেন

খেলাফৎ কবুল করিব? ৫০ হিজরীর রবিওল-আউওল মাসে তিনি শহীদ হইয়াছিলেন; বিষ প্রয়োগেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল; হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) নিতান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁহার নিকট জানিতে চাহিলেন যে, কে আপনাকে বিষ খাওয়াইয়াছে, বলুন; কিন্তু তিনি তাহা কিছুতেই প্রকাশ করিলেন না; বরং ফরমাইলেন, "আমার যাহার প্রতি 'শোবাহ্' (সন্দেহ), যদি সেই লোকই আমার 'ক্বাতেল' (হত্যাকারী) হয়, তবে খোদা তা'-লা কঠোর 'এন্তেকাম' (প্রতিশোধ) গ্রহণকারী; অন্যথা আমার জন্য কেন কোনও ব্যক্তি 'নাহক্' (অনর্থক) মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হইবে?

খেলাফৎ হাছেনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

কোনও কোনও ইতিহাস-বেত্তা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর ছয় মাস কাল মাত্র স্থায়ী খেলাফৎ কে "খেলাফৎ রাশেদাঃ"তে ভুক্ত করিতে চাহেন না। কারণ ইহা অতি অল্প সময় মাত্র স্থায়ী এবং 'নামকম্মল' (অসম্পূর্ণ) খেলাফৎ ছিল। আমাদের মতে এই অল্পকাল স্থায়ী খেলাফৎকে অসম্পূর্ণ খেলাফৎ বলিতে গেলে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেলাফৎকেও অসম্পূর্ণ বলিতে হয়। সুতরাং উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে তাঁহার খেলাফৎকেও খেলাফৎ রাশেদার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোনও ক্রমেই সিদ্ধ নয়। খেলাফৎ অল্পকাল স্থায়ী হইলেই, তাহা খেলাফতের বহির্ভূত বলিয়া ধরা

কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর বর্ণিত হাদীছানুসারে যখন প্রকৃত খেলাফতের সময় ৩০ বৎসর ধরা হইয়াছে, তখন এই নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যের খেলাফৎ অবশ্যই খেলাফৎ রাশেদার অন্তর্ভুক্ত হইবে। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর ছয়মাস কাল স্থায়ী খেলাফৎ ঐ ত্রিশ বৎসরের অন্তর্ভুক্ত। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালের প্রতি যদি স্থির ভাবে—অবিচলিত চিত্তে, নিবিষ্ট মনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তবে উহাকে নিশ্চয়ই খেলাফৎ রাশেদাঃ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর অতি অল্প-কাল স্থায়ী খেলাফৎ কাল মধ্যে যদিও ভিন্ন দেশ বিজয় এবং যুদ্ধ-হাঙ্গামা কিছু ঘটে নাই ; কিন্তু তিনি যুদ্ধ-হাঙ্গামায় লিপ্ত ও শোণিতপাত না করাতে, এছলাম ও এছলাম জগতের এত উপকার সাধিত হইয়াছিল যে, সুদীর্ঘ বিংশতি বৎসরের খেলাফতে ও শত শত যুদ্ধ ও অসংখ্য লোকের শোণিতপাত দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইত না। এছলামের 'খেদমতে' (পরিচর্য্যায়—সেবা কার্য্যে) হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) নিশ্চয়ই খোল্‌ফায়ে রাশেদিনের পার্শ্বে আসন পাইবার উপযুক্ত। তিনি ৪।৫ বৎসরের "খানাঃজঙ্গী' (আপসের যুদ্ধ—অন্তর্ব্বিপ্লব) যাহা দূর হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। মোছলেম-বিদ্বেষী মোনাফেক ও মোছলমান আকার বিশিষ্ট য়িহুদীদিগের যে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত সুদীর্ঘ ৯।১০ বৎসর হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) তাহা একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। সেই বিপ্লবানলে হঠাৎ যেন পানী পড়িয়া উহা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সময়কার প্রবল মোনাফেক দলের নেতা আবদুল্লা-বিন্‌-আবির মৃত্যুতে সেই বিপ্লববাদী দলটি যদিও মাথা গুঁজিয়া

ছিল; এবং ১ম খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর অল্পকাল স্থায়ী গৌরবান্বিত খেলাফৎ কাল, এবং অদ্ভুতকর্ম্মা মহা প্রভাবশালী ২য় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে, তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ঐ রক্তবীজের দল একেবারে নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল; তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর খেলাফতের প্রথমাংশ, ২য় খলিফার সেই গৌরবান্বিত কার্য্যাবলীর প্রভাবে, সেই প্রচণ্ড স্রোতে সম্পূর্ণ শান্তির সহিত অতিবাহিত এবং পূর্ণ তেজে বিদেশ বিজয় ও এছলাম-প্রচার হইয়াছিল; মহামান্য তৃতীয় খলিফার খেলাফতের শেষ ভাগে য়িহুদী সম্প্রদায় হইতে উদ্ভুত মোনাফেক সম্প্রদায় আবার মস্তোকোত্তোলন করিল; আবদুল্লা-বিন্-ছাবাঃ নামক একজন মহা ক্ষমতাশালী চালবাজ ব্যক্তি ও তাহাদের নেতৃরূপে জুটিল; অনেক খাঁটি মোছলমান ও উহার ধোকায় পড়িয়া বিপথগামী হইয়াছিলেন; উহাদের কুহক-জালে জড়িত হইয়া একটা ভীষণ বিপ্লবানল প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন। যে মোনাফেক দল প্রথমে মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল, উহারা এক্ষণে পূর্ব্ব-দিকে এরাক ও পারস্য এবং পশ্চিম দিকে মিশর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। আবদুল্লা-বিন্-ছাবার গুপ্তচর বা এজেণ্টগণ মোছলেম-জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদেরই ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে এবং মারওয়ান বিন্-হকমের দুষ্কৃতি-ফলে, নির্দ্দোষ তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ) অতি নৃশংস ভাবে শহীদ হইয়াছিলেন। ইহাদেরই ষড়যন্ত্রে অতি সর্ব্বনাশ কর "জমল" যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, এবং হজরত যোবের (রাজিঃ) ও হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) অতি শোচনীয় ভাবে শহীদ হন; এবং উভয় পক্ষে ১০ দশ হাজার অপেক্ষা-ও অধিক সংখ্যক মোছলমান বীরের উত্তপ্ত শোণিতে সমর-ক্ষেত্র রঞ্জিত ও কর্দ্দমিত হয়। তৎপর ছফিন যুদ্ধেও উভয় পক্ষের ৭০।৮০ হাজার সৈন্যের নিপাত

সাধন হয়। এই সময় মোনাফেক ও এব্‌নে ছাবার দল হইতে "শিয়া" এবং "খারেযী" সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে খারেজিগণের উৎপাত ও বাড়াবাড়ি চরমে উঠিলে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কর্ত্তৃক নহরওয়ানের যুদ্ধে উহাদের অস্তিত্ব এক প্রকার বিলুপ্ত হয়; কিন্তু ঐ ভীষণ যুদ্ধে যে ৯ জন খারেজী জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল; তাহাদেরই এক পাষণ্ড কর্ত্তৃক মহামান্য আমিরুল-মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) শহীদ হন। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর খেলাফৎকালে ইহাদের দল আবার বাড়িতে থাকে। হজরত আমীর মাবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত না হইলে, এই পাষণ্ড দল আরও যে কি ভীষণ পাপানুষ্ঠান ও মোছলমানদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিত, তাহা বলা যায় না।

এই সন্ধির দ্বারা যদিও হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) বংশগত ও ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন; খেলাফৎ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্য দিকে মোছলমানদিগের জাতীয়তার হিসাবে ইহা আপাততঃ বড়ই ফলোপধায়িনী হইয়াছিল। মোছলমানদিগের আপসের যুদ্ধ-হাঙ্গামা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; বিপ্লববাদী মোনাফেক ও খারেজী সম্প্রদায়ের উৎপাত নিবারিত হইয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে অমোছল-মানের রাজ্য আক্রমণ ও তাহাদের রাজ্য মোছলেম-খেলাফতের অধীন হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বে তুর্কস্তানের দিকে, পশ্চিমে রুমের কায়ছরের রাজ্য ও আফ্রিকায় মোছলেম-বিজয় কার্য্য অতি গৌরবান্বিত রূপে সম্পন্ন হইতে ছিল। ইতিপূর্ব্বে যে শাণিত তরবারি ও তীক্ষ্ননেযাঃ (বল্লম বা বড়শা) মোছলমানদিগের পরস্পরের মধ্যে স্বীয় ধ্বংসকরী কার্য্য করিতেছিল, উহা এক্ষণে বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ হইবার সুযোগ ঘটিল। এই ব্যাপারে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) যে উন্নত হৃদয় ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, মোছলমানদিগের

পরস্পরের মধ্যে শোণিতপাতের দ্বারাবরোধ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠে চির দিন স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। যে অস্ত্র এত দিন মোছলমানদিগের পরস্পরের বক্ষঃ বিদ্ধ করিতে ছিল; সঙ্গে সঙ্গে মোছলেম-শত্রুগণ—বিপথগামী খৃষ্টীয়ান অগ্ন্যুপাসক ও পৌত্তলিকগণ শান্তির নিশ্বাস ফেলিতে ছিল, মোছলমান জাতিকে ধ্বংস করিবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহাদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ ও সে সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। মোছলমানগণের শাণিত অস্ত্র গুলি আবার তাহাদের রক্ষঃভেদ করিবার জন্য উদ্যত হইল; মোছলেম-বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হইল। আবার বিক্রান্ত আরব-বাহিনী পশ্চিমে, পূর্ব্বে ও উত্তরে বিজয়-পতাকা উড়াইয়া, বিধর্ম্মী ও খোদা-দ্রোহী জাতিকে এছলামের দিকে আহ্বান করিবার সুযোগ লাভ করিল। যে বিশাল মোছলেম-সৈন্যদল—বিশ্বত্রাস মোছলেম বীর বৃন্দ জমল যুদ্ধে, ছফিন যুদ্ধেও মেছের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, যাঁহাদের সংখ্যা এক লক্ষের উপর ছিল; তাঁহাদের দ্বারা সমগ্র এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এছলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত। তবুও পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আত্ম-দ্বন্দ্ব, আত্ম-কলহ ও আত্ম-বিচ্ছেদের দ্বার রুদ্ধ হইল। পরবর্ত্তী কালে আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), নিতান্ত অসচ্চরিত্র, কদাচারী, ব্যভিচারী, মদ্য-পায়ী মোছলেম-বিদ্বেষী নরাধম পুত্র এযিদকে স্বীয় উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত না করিলে, কয়েক বৎসরের জন্য আবার মোছলেম-বিজয়ের গতিরোধ হইত না। যাহা হউক, এক্ষেত্রে উদার হৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) যে উন্নত হৃদয়ের, নিঃস্বার্থ পরতার ও উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্ব-বিশ্রুত অসমসাহসিক মহাবীর পুরুষ হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ)-এর বীরত্ব অপেক্ষাও গৌরবান্বিত। আজ সমগ্র মোছলেম-জগত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এবং তদীয় কনিষ্ঠ

সহোদর হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর শত মুখে গুণ কীর্ত্তন এবং তাঁহাদের পবিত্র আত্মার সদ্গতি-কামনা করিতেছেন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর হস্তে যখন 'বয়্য়েত' করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সময়কার শেষ উক্তিটুকু স্মরণ করুন :—" যদি এমারত (আমীরি) ও খেলাফৎ হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর 'হক্' ছিল, তবে তিনি তাহা প্রাপ্ত হইলেন, আর যদি উহা আমার 'হক্' (ন্যায্য প্রাপ্য) ছিল, তবে আমি উহা তাঁহাকে 'বখ্শিয়া' দিলাম (প্রদান করিলাম)। ইহা কি উদারতার পরিচায়ক মূল্যবান্ উক্তি! জনাব আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রিয় দৌহিত্রের উপযুক্ত উক্তিই বটে। তাঁহার এই উদারতা পূর্ণ উক্তিতে তাঁহার পিতৃ-শত্রু, বনু-হাশেমের চির বিরুদ্ধাচারী, প্রায় শেষ পর্য্যন্ত পবিত্র এছলাম ও আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ভীষণ শত্রু, কোরেশ দলের নেতা হজরত আবু ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর পুত্র হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এমনই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসাবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। আবার এই উদারতায় বিমোহিত হইয়া মেছের-বিজয়ী মহাবীর ও কুটিল রাজনীতিবিদ হজরত ওমরু বিনল্-আছ (রাজিঃ), হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) দ্বারা এমাম ছাহেব (রাজিঃ) কে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; সে সুন্দর বক্তৃতার-সার মর্ম্ম ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এমাম ছাহেন (রাজিঃ) ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ব-নবীর উপযুক্ত আদর্শ বংশধর, আদর্শ উত্তরাধিকারী, ও আদর্শ পদানুসরণকারী ছিলেন।

মহামান্য হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর এই উদারতায়, এছলাম-প্রীতিতে, নিঃস্বার্থপরতায় কেবল যে সেই সময়কার মোছল-মানগণই মহা উপকৃত হইয়াছিলেন; তাহা নহে। বরং 'কেয়ামত'

(মহাপ্রলয়) কাল পর্য্যন্ত ইহার সুফল মোছলমানগণ ভোগ করিবে। তাঁহাদের পক্ষেও অর্থাৎ শোণিত পাতের অন্ধকার সমুদ্রে মহামান্ত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর কার্য্য "লাইট্ হাউস" এর কার্য্য করিবে। কুফার অধিবাসিগণের মধ্যে অন্য যত প্রকার দোষই থাকুক না কেন ? তাহাদের চিত্ত-চাঞ্চল্য, অস্থিরমতিত্ব, শত্রুর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হওয়া, স্বার্থ-পরতা ইত্যাদি দোষ নিতান্ত মারাত্মক হইলেও, তাহারা ভীষণ যোদ্ধা, অসম সাহসিক বীর পুরুষ, সংগ্রামে হৃদয়ের শোণিত দান কার্য্যে অভ্যস্ত ছিল। এই শ্রেণীর ৪০ হাজার বিক্রান্ত যোদ্ধৃপুরুষ এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর পক্ষে হৃদয়ের শেষ রক্ত বিন্দু পর্য্যন্ত দান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল ; উহারা নির্ব্বোধ এবং চঞ্চলমতি হইলেও, যুদ্ধক্ষেত্রে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত ছিল না ; বিগত ছফিন যুদ্ধে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। শাম—অর্থাৎ সিরীয় বীরপুরুষগণও আদর্শ যোদ্ধা এবং শত্রুর পক্ষে যম স্বরূপ ছিল ; তাহাদের বাহুবলে রোমক সাম্রাজ্য টলটলায়মান হইত ; তাহাদের অসাধারণ ভূজবলে কনষ্টান্টিনোপলস্থ রোমক বা গ্রীক্ সম্রাটের এসিয়িক অধিকারের অধিকাংশ স্থান মোছলেম-খেলাফতের শাসনাধীন হইয়াছিল ; হজরত আমীর মাবিয়া (রাজিঃ) কর্তৃক পরিচালিত সেই সিরীয় সেনাদল কোনও দিনই রোমক বীরদিগের দ্বারা পরাভূত হয় নাই ; বরং প্রত্যেক যুদ্ধে পরাজিত ; বিধ্বস্ত ও পলায়নপর হইয়া ছিল ; কিন্তু ছফিন যুদ্ধে সেই বিক্রান্ত, শামী অর্থাৎ সিরীয় বীরদল এরাক অর্থাৎ কুফাবাসী বীরগণের হস্তে শোচনীয় রূপে পরাভূত হইয়াছিল ; যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের ৩, গুণ সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই মহা পরাক্রান্ত যোদ্ধৃ পুরুষগণ মহাবীর হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), হজরত এমাম ছোছেন (রাজিঃ), মহাবীর কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ) ও অন্যান্য হাশেমী

বীরগণের দ্বারা পরিচালিত হইলে আবার ছফিন যুদ্ধের পুনরাভিনয় হইত। মক্কা ও মদীনায় বহুসংখ্যক ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) এবং আরবের বিভিন্ন প্রদেশস্থ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও এমাম ভক্তগণ, আর পারস্যাদি দেশের মোছলমানগণ ক্রমশঃ তাঁহার পতাকা-মূলে সমবেত হইয়া, তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করিত, সুতরাং এই যুদ্ধে আমীর হজরত মৌবিয়া (রাজিঃ)-এর জয়লাভ করা সুদূর পরাহত ছিল। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ), হজরত জাফর তইয়্যার (রাজিঃ)-এর তনয়গণ, হজরত অকিল (রাজিঃ)-এর পুত্র হজরত মোছলেম (রাজিঃ) ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ, এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ প্রত্যেকেই তরুণ যুবক ও আদর্শ বীর-পুরুষ ছিলেন। শত্রুদলের পক্ষে তাঁহারা ভীষণ কালান্তক কাল স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেন। পরবর্ত্তী কারবালার যুদ্ধে মুষ্টিমেয় হাশেমী বীরগণ অনাহারে ও ভীষণ ভাবে পিপাসার্ত্ত থাকিয়াও এযিদী ও এব্‌নে যেয়াদী সৈন্যগণের সহিত কিরূপ মহাবীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই-হাশেমী বীরগণের বীর্য্য-বত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং এই যুদ্ধ যে অতি ভীষণ আকার ধারণ করিত, এবং তাহাতে উভয় পক্ষীয় মোছলেম বীরগণ পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইত, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। এমাম ছাহেব (রাজিঃ) দ্বয়, শেরে খোদা হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর উপযুক্ত পুত্র এবং তাঁহারই দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত আদর্শ বীর পুরুষ ছিলেন ; সুতরাং সেই তেজস্কর পিতৃ-শোণিত যাঁহাদের ধমনীতে প্রবাহিত হইত ; তাঁহারা সমরক্ষেত্রে কি ভীষণ সমর-লীলারই অভিনয় করিতেন, উহা স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। তখনও শত শত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) জীবিত ছিলেন ; যাঁহারা হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর দৌহিত্র দ্বয়ের প্রতি মাতামহের অতুলনীয় ও অনন্ত স্নেহ-

ভালবাসার স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুরাগ স্বভাবতঃই এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের প্রতি ছিল। আবার তাঁহাদের আদর্শ ধর্ম্মানুরাগ, আদর্শ মোছলেম-প্রীতি, আদর্শ চরিত্র প্রভাবে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। এমন কি, হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ)-এর অন্যায় শাহাদতে (হত্যাকাণ্ডে) ভ্রম-জনিত নানাকারণে যাঁহারা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না; হজরত এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের প্রতি তাঁহাদের ও পূর্ণ সহানুভূতি ছিল; ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) ও অন্যান্য ক্ষমতাশালী ন্যায়পরায়ণ মোছলমানজিগের মধ্যে অধিকাংশ জ্ঞানী মহাপুরুষই জানিতেন যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)ই প্রকৃত পক্ষে খলিফা হইবার উপযুক্ত পাত্র। কারণ, মাতামহ এবং পিতা মাতার সর্ব্ব প্রকার সদ্‌গুণ ও আদর্শ শক্তি তাঁহার মধ্যে নিহিত ছিল। একদিকে যেমন ধর্ম্ম বিদ্যায় ও শস্ত্র বিদ্যায় পরিদর্শী ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই রাজনীতি শাস্ত্রে ও সুপণ্ডিত ছিলেন। কোনও প্রকার চালবাজী ও ধোকাবাজী তাঁহার মধ্যে ছিল না। তিনি অতি সরল বিশ্বাসী, সরল চেতা আদর্শ মহাপুরুষ ছিলেন। এই সকল বিষয় তাঁহার একান্ত অনুকূল হইলেও, তিনি মোছলমানদিগের শোণিতপাতে কিছুমাত্র ইচ্ছুক ছিলেন না। মোছলমান-দিগের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃভাব সম্পাদনের জন্যই তিনি একান্ত ব্যাকুল ছিলেন; তাহার ফলেই অতি সহজে এই পবিত্র সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

এই সন্ধি স্থাপনের এই ফল এই হইল যে, মোছলমানগণ আবার একতাবদ্ধ হইয়া মোছলেম-বিদ্বেষী শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। এছলাম প্রচারের জন্য মোছলেম ধর্ম্ম-প্রচারক ও মোছলেম বীরপুরুষগণ পশ্চিমে, পূর্ব্বেও উত্তর দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন; বাহ্‌রে-রুম' (ভূমধ্য-সাগর)-এর স্বনামখ্যাত দ্বীপ 'কোবরছ্‌' (সাইপ্রস্‌)

ও রোড্‌সাদি মোছলমানদিগের অধিকার ভুক্ত হইল; খলিফা হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর বিজয়ী সেনাদল বহুসংখ্যক ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দ্বারা গঠিত হইয়া, রোমক রাজধানী বিশ্ব-বিশ্রুত মহানগরী কনষ্টাণ্টিনোপল অবরোধ করিলেন; এই অভিযানে সুপ্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ হজরত আবু আইয়ূব আন্‌ছারী (রাজিঃ) অন্যতম নেতা রূপে গমন করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ দুই বৎসর কাল অবরোধ সময় মধ্যে তিনি সেখানে প্রাণত্যাগ করিলেন; কনষ্টাণ্টিনোপলের নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। আজ উহা কনষ্টাণ্টিনোপল (কুস্তন্তুনিয়া বা ইস্তাম্বুল)-এর একটি প্রধান "যেয়ারত-গাহ্‌" এবং সেখানে "জামেয় আবু আইয়ূব" নামে অভিহিত এক প্রকাণ্ড জামেয় মছজেদ তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন রূপে বিরাজ করিতেছে। হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর জগদ্বিখ্যাত সেনাপতি ওত্‌বাঃ উত্তর আফ্রিকার আল্‌-জিরিয়া ও মরক্কো (আল্‌-মগরেব) অধিকার করিয়া—আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের তট পর্য্যন্ত এছলামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। তিনি আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে স্বীয় অশ্ব নিপাতিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "হায়! আর স্থলভাগ নাই; এই বিশাল সমুদ্র আমাদের গতিরোধ করিল।" মোছলেম-গৌরবের সেই একদিন, আর আজ একদিন। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সন্ধি-বন্ধন না করিলে, এই গৌরবান্বিত মোছলেম-বিজয় কার্য্য সম্পাদিত হইত না। হয় ত মোছলেম-আত্ম-বিচ্ছেদের ফলে বহু নব-বিজিত রাজ্য, দেশ, প্রদেশ, জনপদ ও নগরাবলী মোছলমান-দিগের হস্তচ্যুত হইত; তওহিদের মহাবাণী আর নূতন কোনও দেশে শুনা যাইত না। পৌত্তলিক, অগ্নি-পূজক ও খৃষ্টীয়ানদিগের দ্বারা উন্নতিশীল এছলামের গতিরোধ হইত; পৃথিবী আবার ঘোর অন্ধকারে

আচ্ছন্ন হইত। পৌত্তলিকতা, জড়বাদ, অগ্নিপূজা ও খৃষ্টীয়ানী ত্রিত্ববাদ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইত। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর উদারতা, স্বার্থত্যাগ, এছলামের প্রতি প্রাণের সহানুভূতি, সমবেদনা ইত্যাদির প্রবল আকর্ষণে মোছলমানদিগের মধ্যে আত্ম-কলহ ও আত্ম-দ্বন্দ্বের অবসান হইল। তদনুসারে হজরত মৌবিয়া (রাজিঃ)-এর দীর্ঘকাল ব্যাপী-রাজ্য শাসন কালে মোছলেম-জগতে কোনও রূপ অশান্তির উদ্রেক হয় নাই; নব নব দেশ বিজিত এবং ঐ সকল দেশে এছলাম প্রচার হইয়াছিল।

আদর্শ ধার্ম্মিক, আদর্শ চরিত্র এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর অকাল মৃত্যুতে মোছলমান মাত্রেই শোকাকুলিত হইয়াছিলেন। অমন উদার, অমন-দয়ালু, অমন স্বজাতি-বৎসল ও স্বধর্ম্মানুরাগী পুরুষের অন্তর্ধান বড়ই শোকাবহ ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

হে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'-লা! মহামান্য হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর পবিত্র আত্মার দোওয়ার বরকতে দুনিয়ার মোছলমান নরনারীদিগকে মুক্তি প্রদান করিও; আর অধম লেখকের প্রতি অনন্ত করুণাকণা বিতরণ পূর্ব্বক, পরকালের সর্ব্ব-প্রকার আযাব হইতে তাহাকে রক্ষা করিও।

পঞ্চম ভাগ।

হজরত এমাম হোছেন

(রাজিঃ)-এর জীবনী।

জন্ম-বৃত্তান্ত।

হজরত মাওলানা ওয়ালী উদ্দীন দামেশ্‌কী মেশ্‌কাত শরীফ্‌ (রহঃ), স্বরচিত কেতাব " আকমাল ফি আছমায়ের রেজাল " নামক গ্রন্থে 'তহরির ফরমাইয়াছেন' (লিপিবদ্ধ করিয়াছেন) যে, বিভিন্ন বিশ্বাস্য গ্রন্থাদি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এমাম আল্‌-আমম্‌ ছরদারে শিদান কারবালা, ছব্‌তর রছুল জনাব হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম ৪র্থ হিজরীর ৪ঠা শা'বান, শনিবার দিন মদীনা-মনুওরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার 'কুনিয়েত' " আবদুল্লাহ্‌ ", লকব " যকি ", " শহীদ " " ছিদাঃ " ও " ছব্‌ত্‌ "। 'বাচ্চাঃ' (সন্তান—শিশু) সাধারণতঃ ৯ মাসে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু তিনি ছয়মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ছয় মাসের কোনও শিশু এই এমাম ছাহেব (রাজিঃ) ও হজরত ইয়াহ্‌ইয়া (আলাঃ) ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন নাই। ইহাও তাঁহার এক 'খল্‌কি কারামত' (জন্মগ্রহণ জনিত আশ্চর্য্য ব্যাপার) ছিল—

যাহা হজরত ইয়াহ্ইয়া (আলাঃ)-এর পরে তাঁহার উপর ঘটিয়াছিল। আবার তাঁহার উপরই ইহা 'খতম (শেষ)ও হইয়াছে; অর্থাৎ তাঁহার পরেও আর কোন ব্যক্তি ৬ মাস কাল গর্ভে থাকিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জীবিত থাকেন নাই এবং থাকিবেনও না। ইঁনি হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) হইতে মাত্র ৭ মাস ২০ দিনের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। যখন ইঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার সংবাদ জনাব হজরত রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের নিকট পঁহুছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা-লার দরগায় শোকরিয়ার (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের) ছেজদাঃ আদায় করিলেন। তৎপর তিনি তখন তখনই হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে আগমন করিলেন। হজরত আছমাঃ-বিন্তে-য়মিছ (রাঃ—আঃ), শিশুকে কাপড়ে জড়াইয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। হুজুর (ছালঃ) শিশুর ডান কাণে আজান ও বাম কাণে আকামত বলিলেন। অতঃপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আলি! তুমি এই শিশুর কি নাম রাখিয়াছ? শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) করজোরে 'আরজ' করিলেন, "হুজুর বর্ত্তমান থাকিতে আমি কিরূপে এই শিশুর নাম রাখিতে পারি? আপনি যে নাম উপযুক্ত মনে করেন, সেই নামই রাখুন। আমি মনে করিয়াছিলাম, ইহার নাম "হরব" (যুদ্ধ) রাখা হইবে; এক্ষণে হুজুরের যাহা মরজী।"

আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, হে আলি! আমি স্বয়ংও এই নাম রাখা ব্যাপারে অগ্রবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করি না; অর্থাৎ নিজ হইতে শিশুর নাম রাখিতে ইচ্ছুক নহি। আল্লার ওহীর (প্রত্যাদেশের) অপেক্ষা করিতেছি। এই কথাবার্ত্তা চলিতেছে, ইত্যবসরে হজরত জিব্রিল আলায়হেচ্ছালাম 'নাযেল' (অবতীর্ণ) হইলেন; এবং

আরজ করিলেন, এয়া রছুলোল্লাহ্! শাহ্যাদাঃ এমাম হাছন আলায়-হেচ্ছালামের নাম, হজরত হারুণ আলায়হেচ্ছালামের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামানুসারে শব্বর অর্থাৎ হাছন রাখা হইয়াছে। এজন্য ছোট শাহ্যাদার নামও হজরত হারুণ (আলাঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্রের নামানুসারে শব্বির অর্থাৎ হোছেন রাখুন; তদনুসারে ঐ নামই রাখা হইল।

আঁ হজরত (ছালঃ) এই পবিত্র শুভবাণী শ্রবণে নিতান্তই আনন্দ লাভ করিলেন। আল্লাহ্ জল্লশানাহুর আদেশানুসারে এই নব-প্রসূত শাহ্যাদার নাম হোছেন রাখিলেন। ৭ম দিনে শিশুর 'আকিকা' কার্য্য সম্পন্ন করা হইল। আকিকায় ২টি 'বকরী' (ছাগ) যবেহ, আর মাথার চুলের পরিমাণ চান্দি খায়রাত করা হইয়াছিল। আল্হাম্দো লিল্লাহ্! এই 'রছম' (নিয়ম) মোছলমানদিগের মধ্যে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে, এবং ইহার মধ্যে কোনও রূপ 'বেদয়াত' (কুপ্রথা—নিষিদ্ধ নিয়ম) এযাবৎ প্রবেশ করে নাই।

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) মস্তক হইতে 'ছিনাঃ' (বক্ষঃস্থল) পর্য্যন্ত, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ছিনাঃ হইতে পা মবারক পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত হজরত রছুল মকবুল (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ 'মশাবাহ' (আকৃতি বিশিষ্ট) ছিলেন। যেমন খোদা তালা এই উভয় শাহ্যাদাকে 'মজ্মুয়ী' (একত্রে) হজরত রছুল আল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের 'তছবির' (মূর্ত্তি) 'মকম্মল' (পূর্ণভাবে) সৃজন করিয়াছিলেন।

ফজায়েল ও মনাক্কব

(সদ্‌গুণাবলী ও সদাচার)।

জনাব হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সদ্‌গুণাবলী ও প্রশংসা সীমাতীত ও অনুমান বহির্ভূত; অর্থাৎ তাঁহার সদ্‌গুণ ও প্রশংসা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তদীয় পবিত্র জীবনী ও ইতিহাসের পৃষ্ঠা সেই সদ্‌গুণ ও প্রশংসাবাদে পরিপূর্ণ। তাঁহার ফজিলত পূর্ণতা প্রাপ্ত কেন হইবে না? তাঁহার মধ্যে হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর 'খুন' (শোণিত—রক্ত) প্রবাহিত ছিল। তাঁহাকে ছরদারী বা নেতৃত্ব এবং বোজর্গী খোদাতায়ালা হইতে বিশেষ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছিল। জনাব হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) তাঁহার প্রতি 'বেহদ' (অসীম) 'মহব্বৎ' (স্নেহ—ভালবাসা) রাখিতেন। নিম্ন-লিখিত রওয়ায়েতানুযায়ী (বর্ণনানুসারে) হুজুর (ছালঃ)-এর মহব্বৎ বা স্নেহ ভালবাসার কিছু প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ছনিন তেরমযি শরীফে লায়লী-বিন্-মররাহ (রাজিঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, হোছেন (রাজিঃ) আমার মধ্যে আছে, এবং আমি হোছেন (রাজিঃ)-এর মধ্যে আছি। খোদা তা-লা তাহাকে দোস্ত রাখিয়াছেন (বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন); যে হোছেন (রাজিঃ)-এর দোস্ত্; হুজুর আকরম (ছালঃ) তাঁহাকে সীমাতীত রূপ পছন্দ ফরমাইতেন। এতদ্ সম্বন্ধীয় একটি ঘটনা এই যে, একদা হজরত ছারওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) মদীনা শরীফের কোনও গলি দিয়া গমন করিতেছিলেন। তথায় কয়েকটি ছোট ছোট বালক খেলা করিতেছিল। হুজুর (ছালঃ) তন্মধ্য হইতে একটি বালককে ক্রোড়ে

তুলিয়া লইলেন; এবং তাহার 'পেশানীতে' (কপালে) চুম্বন করিলেন। জনৈক ছাহাবাঃ (রাজিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর এটি কাহার ছেলে যে আপনি উহার প্রতি এতাদৃশ স্নেহ প্রদর্শন করিলেন? উত্তরে হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, এই বালকটি একদিন আমার হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে খেলা করিতেছিল, আমি দেখিতে পাইলাম, এই বালক হোছেন (রাজিঃ)-এর পায়ের মাটী লইয়া স্বীয় চক্ষে মর্দ্দন করিল। সেই দিন হইতে এই বালককে আমি মহব্বতের (স্নেহ-ভালবাসার) দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছি; আর এন্‌শাল্লাহ্‌ কেয়ামতের দিন উহার পিতা মাতার জন্য শাফায়াত ('ছোফারেশ'—মুক্তি প্রদান জন্য অনুরোধ) করিব।

এমাম তেরমযি (রহঃ), এব্‌নে মাজাঃ (রহঃ), এব্‌নে হবান (রহঃ) ও হাকেম (রাজিঃ) রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, জনাব হজরত রছুল করিম (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমি লড়িব (যুদ্ধ করিব) উহার সঙ্গে—যে লড়িবে (যুদ্ধ করিবে) ফাতেমা (রাঃ—আঃ) ও হাছন (রাজিঃ) এবং হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে; আর 'ছোলেহ' করিব উহাদের সঙ্গে—যাহারা 'ছোলেহ' (সন্ধি) করিবে উহাদের সঙ্গে।"

ছহিহ্‌ মোছলেম গ্রন্থে রওয়ায়েত আছে যে, একদা হজরত রছুল করিম (ছালঃ), গৃহের বাহিরে 'ছহনের' (চাতানের) একাংশে উপবেশন করিয়াছিলেন; এবং একখানি বুটাদার কম্বল তাঁহার গায় ছিল। এই সময় হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) তথায় আগমন করিলেন; তিনি তাঁহাকে ঐ কম্বলের মধ্যে টানিয়া লইলেন; অর্থাৎ তাঁহাকে কম্বল দিয়া ঢাকিলেন; ইহার পর হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) আগমন করিলেন; তাঁহাকে ও তিনি কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন; তৎপর হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) আসিলেন; তাঁহাকেও ঐরূপে কম্বল দ্বারা ঢাকিয়া

লইলেন ; অবশেষ শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আগমন করাতে, তাঁহাকেও কম্বলের মধ্যে ঢাকিয়া লইলেন এবং কোরআন পাকের নিম্ন-লিখিত পবিত্র আয়াত তৎহির পাঠ করিলেন :—

" ইন্নামা ইউরিদোল্লাহো লেয়ূয্‌হেবা আন্‌কুমোর রেজছা আহ্‌লাল বায়্‌তে অইউ-তাহ্‌হেরা কুম তাৎহিরা। "

এব্‌নে আবদুল্লাহ্‌ হইতে রওয়ায়েত আছে, আর এই হাদীছ এমাম তেরমষি (রহঃ), হজরত হজিফাঃ (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত রছুল করিম (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, আমার নিকট 'আছমান' (আকাশ) হইতে এক ফেরেশ্‌তা আগমন করিয়াছে—যে ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও আমার নিকট আইসে নাই ; সে আসিয়া আমাকে ছালাম করিল, এবং আমাকে 'খোশ-খবরী' (সুসংবাদ) দিল যে, " হাছন (রাজিঃ) ও হোছেন (রাজিঃ) 'বেহেশতের' (মোছলেম-স্বর্গের) তরুণ যুবকদিগের 'ছরদার' (নেতা) "।

আহ্‌মদ (রহঃ), তেরমষি (রহঃ), এব্‌নে মাজাঃ (রহঃ), এব্‌নে আবু দাউদ (রহঃ) এবং ফছালী (রহঃ)-এর সম্মিলিত 'রওয়ায়েত' (বর্ণনা) এই যে, একদা আঁ হজরত (ছালঃ) খোতবাঃ পড়িতে ছিলেন, ঐ সময় সম্মুখের দিক্ হইতে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) আগমন করিলেন। কিন্তু অতি অল্পবয়স্ক বলিয়া তাঁহাদের পদদ্বয় কম্পিত হইতে ছিল। হুজুর (ছালঃ) তদ্দর্শনে মনে করিলেন, বালক দ্বয় না পড়িয়া যায় ; এই আশঙ্কা করিয়া তিনি খোতবা পড়া ছাড়িয়া দিয়া উহাদের দিকে ধাবিত হইলেন, এবং 'কামাল মহব্বৎ' ও 'পেয়ার'-এর সঙ্গে (অতীব স্নেহ-প্রদর্শন পূর্ব্বক) উভয় শাহ্‌-যাদাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

এইরূপে একদিন হজরত রছুলে করিম (ছালঃ) মছজেদ-নববীতে

নমায্‌ পড়াইতেছিলেন (নমাযে এমামতি করিতেছিলেন), এবং তিনি ছেজদায় গিয়াছিলেন, এই সময় হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) দৌড়িয়া আসিলেন, এবং হুজুর (ছালঃ)-এর পবিত্র পৃষ্ঠোপরি চড়িয়া বসিলেন, হুজুর (ছালঃ) খেয়াল করিলেন যে, যদি আমি এ সময় ছেজদাঃ হইতে মস্তকোত্তোলন করি, তাহা হইলে হোছেন (রাজিঃ) পড়িয়া যাইবে, এবং তাহার শরীরে আঘাত লাগিবে। ইহা মনে করিয়া ছেজদাঃতেই রহিয়া গেলেন—যে পর্য্যন্ত হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) হুজুর (ছালঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ হইতে অবতরণ না করিলেন।

একদা হজরত রছুল আকরম (ছালঃ), অত্যন্ত স্নেহ-ভালবাসার সঙ্গে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ; বল ত ভাই তোমার 'মর্ত্তবা' (শ্রেষ্ঠত্ব) অধিক কি আমার ? সেই বালক এমাম ছাহেব (রাজিঃ) একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, নানাজান ! মর্ত্তবা ত আমারই অধিক। হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, ইহার কি 'ছবুত' (প্রমাণ) আছে ? এমাম ছাহেব (রাজিঃ) বলিলেন, নানাজান ! আপনি খেয়াল ফরমাইয়া দেখুন, আমার পিতা হজরত শেরে খোদা (কঃ—ওঃ), এরূপ পিতা আপনার কোথায় ছিলেন ? যেমন আমার মাতা হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), এরূপ মাতা আপনার কোথায় ছিলেন ?—যাঁহার সম্বন্ধে আপনি স্বয়ং "বোদোয়াতন মিন্নে" ফরমাইয়াছেন। আর আমার নানা যেমন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম, এরূপ নানা আপনার কোথায় ছিলেন ? এই সকল কথার দ্বারা পরিষ্কার রূপে জানা যায় যে, আমার মর্ত্তবাই বড়। দৌহিত্র-রত্নের ঈদৃশ দলীল ও যুক্তির কথা শুনিয়া হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) 'ঈষৎ হাস্যের' (মুচ্‌কি হাসির) সহিত নীরবতা অবলম্বন করিলেন।

হজরত এব্নোল্ খছাব (রাজিঃ), হজরত আবি আওয়ানাঃ (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, হাছন (রাজিঃ) ও হোছেন (রাজিঃ) বেহেশ্তের দুইটি 'গোশ্ওয়ারে' (যেওর—অলঙ্কার)। যখন আল্লাহ্ জল্লশানহু বেহেশ্তবরিঁ " (জন্নতল ফরদওছ—মোছলেম-স্বর্গ) 'পয়দা' (সৃষ্টি) করিলেন ; তখন উহার প্রতি ফরমাইলেন, তোমাকে ফকীর ও মিছকিনের 'মছকন' (গৃহ) বানাইব। বেহেশ্ত্ আদবের সহিত বলিল, 'এয়ারব !' (হে আল্লাহ্ তা-লা !) " লাম এজ্য়েল্নী মছকন লিল্ মাছাকিন " (অর্থাৎ) হে পরওয়ার দেগার ! আমাকে 'মিছকিন' (ফকীর—দরিদ্র) দিগের ঘর কেন বানাইতেছেন ? যখন আপনি আমার 'রোত্বাঃ' (সম্মান—পদ-মর্য্যাদা) এতদুর বাড়াইয়াছেন, আর আমাকে স্বীয় 'রহমতে' (দয়া গুণে) 'ফরদওছ' বানাইয়াছেন ; এরূপ অবস্থায় আমাকে দীন-দরিদ্রের থাকিবার স্থান নির্দ্ধারিত করাতে আমার কি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইতে পারে ? 'আওয়াষ্' (শব্দ) আসিল, আয় বেহেশ্ত্ ! তুমি কি রাজী নওযে, আমি তোমার 'আরকান' ('ছতুন'—থাম) হাছন (রাজিঃ) ও হোছেন (রাজিঃ) দ্বারা 'আরাস্তাঃ' (সুসজ্জিত) করি ? যখন বেহেশ্ত্ এই কথা শুনিল, তখন সে 'ফখর' (আত্ম-গৌরব প্রকাশ) করিতে লাগিল, এবং বলিয়া উঠিল " রদিয়ত্' (রজিয়ত)—রদিয়ত " আমি রাজী হইলাম। এই দলিলানুসারে বেহেশ্তের 'আরকান' (ছতুন বা থাম) হজরত এমাম হাছন ও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)। ইঁহারা যেমন বেহেশ্তের থাম, সেইরূপ 'মোমেন' (ধার্ম্মিক) গণের 'দেলের রওশ্নী' (হৃদয়ের আলো বা জ্যোতিঃ)। ছোবহান আল্লাহ্ ! আল্লাহ্ তা-লা রছুল মকবুল (ছালঃ)-এর এই জগর গোশাকে কি মরতবাই না প্রদান করিয়াছেন :—

আরবী কবিতা।

বাছিতা রছুলোল্লাহে ছদবী মোনাওয়ারুন ;
ওহোব্বো হুমা ফি খাব্বাতিল্ ক্বাল্‌বে ইয়াষ্‌হেরুন।
আঁখুকা হেঁয় নূর দেল্ কে আরাম হোছেন (রাজিঃ)
ফরদ ওছ বরিঁ কি নোষ্‌হাতে আম হোছেন (রাজিঃ)।
দোনুঁ হায় হায়্যাতে মেল্লতে মস্তফুয়ী ;
হায় রূহ্ হাছন (রাজিঃ) তো জানে এছলাম হোছেন (রাজিঃ)।

খোলক্ব্ হোছেনী

(সর্ব্ব প্রকার সদ্ব্যবহার ও ক্ষমা গুণ ইত্যাদি)।

একদা জনাব হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ), আরবের বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে এক সভায় বসিয়া আহার করিতেছিলেন। তদীয় একজন ক্রীতদাস অতি গরম আশ্ অর্থাৎ শুরুয়া পূর্ণ পেয়ালা লইয়া পরিবেশন জন্য যাইতে যাইতে, সভাস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের আতঙ্কে পদ-স্খলিত হইয়া সে ফর্শের উপর পড়িয়া যায় ; ঐ অবস্থায় সেই পেয়ালা জনাব হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর গায় পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়ে। তিনি 'তাদিবের' (আদব শিক্ষার ইঙ্গিত পূর্ণ) কটাক্ষে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে, সেই 'খাদেম' (ক্রীত-দাস) ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ; ঐ অবস্থায় কোরআন শরীফের

কয়েকটি শব্দ তাহার স্মরণ পথে পতিত হইল; আর হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর দিকে 'রহম তলব' (দয়া-প্রার্থনার) নযরে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল "আল্‌কা যমিনল্ গায়েযা", তচ্ছ্রবণে জনাব হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) ফরমাইলেন, হে খাদেম! আমি আমার ক্রোধ-সংবরণ করিলাম। ক্রীতদাস আবার বলিয়া উঠিল, "আল্ আফিনা আনিন্নাছ," তখন হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) ফরমাইলেন, আমি তোমার 'কছুর' (অপরাধ) ও মার্জ্জনা করিলাম। ক্রীতদাস "ও আল্লাহ ইউহেব্বোল মোহছেনীন" বলিয়া পবিত্র আয়াতটি পরিসমাপ্ত করিল; হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ), পবিত্র কোরআনের আয়েতের শেষাংশ শ্রবণে ফরমাইলেন, যাও, আমি তোমাকে দাসত্ব হইতে 'আযাদ' (স্বাধীন—মুক্ত) করিয়া দিলাম। আর চির জীবনের জন্য তোমার 'কেফালত' (যামানত—প্রতিভূত্ব) আমি গ্রহণ করিলাম। আল্লাহ্ আকবর! জনাব হজরত এমাম আলী মকাম (রাজিঃ)-এর 'খলক্' ('মরুওত'—ক্ষমা গুণ—নম্রতা ও শিষ্টতা) এইরূপ ছিল। বর্ত্তমান সময়ের বড় লোকেরা—প্রভুগণ, দাস বা পরিচারক বর্গের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহাও একবার খেয়াল করুন। আজকাল কোনও আমীর-ওমরা বা বড় লোকের চাকর কিংবা পরিচারক এইরূপ গুরুতর অপরাধ করিলে তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিত, তাহাও খেয়াল এবং চিন্তা করিবার বিষয়।

এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর যোহদ ও তক্‌ওয়া (পরহেয্‌গারী এবং পার্থিক সুখ-সম্পদে বিতৃষ্ণা)।

জনাব এমাম ছাহেবের উপাসনা আরাধনা ও পার্থিক সুখ-সম্পদে বিতৃষ্ণ ভাব সর্ব্বোচ্চ সীমায় উঠিয়া ছিল। তিনি শৈশব ও বাল্য জীবনের মাত্র ৭টি বৎসর স্বীয় মহামাননীয় মাতামহ হজরত রছুল আকরম (ছালঃ)-এর নবুয়ত এবং আজমতের ছায়ায় জীবন যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আল্লাহ্‌ তা-লার ভেদ (গূঢ়তত্ত্ব) লাভে তাঁহার অন্তঃকরণ ভরপূর হইয়াছিল। হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর ওফাতের (পরলোক গমনের) পরে শরিয়ত, তরিকৎ, হকিকৎ ও মারেফত সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার প্রকাশ্য ও গুপ্ত 'এলম' (বিদ্যা) তিনি স্বীয় 'ওয়ালেদ মোকর্‌রম' (সম্মানিত পিতা) হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য মহামান্য ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের নিকট ও অনেক বিষয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি দিবা রাত্রি খোদা ও রছুলের আদেশ পালনে অতিবাহিত করিতেন। এই জন্যই তাঁহার সমকালে এবাদৎ-বন্দেগীতে (উপাসনা-আরাধনায়), খোদা তা-লার আদেশ-নিষেধ পালনে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না ; অর্থাৎ তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবীর ও ধর্ম্মের জীবন্ত আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) পদব্রজে ১৫ হজ্জ্‌ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁনি 'পেয়াদা-পাঃ' (পদব্রজে) ২৫ হজ্জ্‌ করিয়া

অতুলনীয় গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। এবাদত-বন্দেগী ও উপাসনা-আরাধনার এই অবস্থা ছিল যে, তিনি দৈনিক ফরজ, ওয়াজেব ও "ছোন্নত মওয়াক্কাদাহ্" ব্যতীত ১০০০ রেকায়াত নফল নমায্ প্রত্যহ দিবারাত্রির মধ্যে আদায় করিতেন।

বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক পাঞ্জে শোম্বা (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যার সময় হইতে প্রভাত সময় পর্য্যন্ত রোদন করিতেন ; এবং 'তওবাঃ আস্তাগ্‌ফার' পড়িতেন। এই স্থলে 'গওর' (অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা) করা উচিত যে, মহামান্য রছুল করিম (ছালঃ)-এর প্রিয়তম দৌহিত্র যদি আল্লাহ্ জল্লশানহুর ভয়ে এরূপ ভীত ও আতঙ্কিত থাকিতেন, সেরূপ ক্ষেত্রে আমাদের ন্যায় 'গোনাহ্‌গার' (পাপাচারী) লোকের কি উপায় হইবে,—যাহারা দিনরাত্রি নানাপ্রকার 'ফেছক্' ও 'ফজুরে' (অসার আমোদ-প্রমোদে) লিপ্ত থাকে, তাহাদের কখনও এমন 'তওফিক' হয় না যে, আল্লাহ্ তা-লার মহা দরবারে মস্তক অবনত করে, এবং পাপাচারের জন্য ক্ষমা চায়। আমরা বড় বড় পাপ কার্য্য করিতেও ভয় করি না ; 'ছগীরা গোনাহ্' অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ কার্য্য সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই। স্থূল কথা, প্রকাশ্য এবাদৎ-বন্দেগী ব্যতীত, গুপ্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানেও খোদা প্রাপ্তির পথে তিনি শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। আর হইবেন ইবা না কেন ? জগতের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ, সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী যাঁহার মাতামহ, তাপস কুলের অগ্রণী মারেফাত তত্ত্বের মহাতত্ত্বজ্ঞ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ-পুরুষ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যাঁহার মহা সম্মানিত পিতা, স্বর্গ-রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) যাঁহার জননী, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর ন্যায় আদর্শ পুরুষ যাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কি আর কোনও সংশয় থাকিতে পারে ? এস্থলে একটি উর্দ্দু কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

" এব্‌নে আলী (রাজিঃ) ও ছেব্‌তে রছুলে খোদা হোছেন ;
পেয়ারা থা ক্যায়ছা বেশ্‌তরে কিব্‌রিয়া হোছেন।
মাদর মিলী বতুলছি গোদী খেলানেকো ;
জিবরিল আয়ে আর্শ্‌ছে ঝুলা ঝোলানেকো।

'শাদী' (বিবাহ)।

হজরত ওমর ফারুখ রাজি আল্লাহ্‌ আন্‌হুর খেলাফৎ কালে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর শুভ-বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই বিবাহ সম্বন্ধে ইতিহাসে নিম্ন-লিখিত রূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। যখন পারস্য-সাম্রাজ্য মোছলমানদিগের দ্বারা বিজিত হইল ; ঐ সময় ইযদ্‌ জরদ (সম্রাট্ নওশেরওয়াঁনের বংশধর) পারস্যের শেষ সম্রাট্‌ ছিলেন। যুদ্ধে পারস্য-সম্রাট পরাজিত ও দেশত্যাগী হন। ইতিপূর্ব্বে বড় বড় যুদ্ধে পারস্যের খ্যাতনামা বীর সেনাপতিগণ, মোছলমানদিগের হস্তে পরাজিত, নিহত বা পলায়ন করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। পারস্য-সম্রাটের মূল্যবান্ সামগ্রী-সম্ভার আরবদিগের হস্তগত হইয়াছিল। তন্মধ্যে " বহাতে কছরবী " নামক একখানি অতি মূল্যবান্ " ফর্শ্‌ " (বিছানা বা গালিচাঃ) ছিল ; উহাতে 'তকৃইয়া' (গেরদা অর্থাৎ মোটা বালিশ) ঠেক লাগাইয়া সম্রাট্‌ বসিতেন, এবং বয়স্যগণের সঙ্গে মদ্য পান করিতেন ; ঐ অপূর্ব্বও অতি মূল্যবান্ আসন মোছলমানদিগের হস্তগত হইয়া মদীনায় আসিল। সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের কন্যারত্ন ও বন্দিনী বেশে মদীনায় আনীত হইলেন। হজরত ছায়াদ-বিন্‌-আবিওক্কাছ (রাজিঃ) এই বিজয়ী সেনাদলের সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি বিজয়-লব্ধ-দ্রব্যের এক

পঞ্চমাংশ সহ ঐ বহুমূল্য আসন ও সম্রাট্-দুহিতাকে মহামান্য খলিফা সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময় এই নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধে যে সকল 'মালে-গণিমৎ' (যুদ্ধ জয়-লব্ধ ·দ্রব্য-সামগ্রী) মোছলমানদিগের হস্তগত হইত, উহা ৫ অংশে বিভক্ত করিয়া ৪ অংশ বিজয়ী সৈন্য-সেনা-পতিগণ পাইতেন ; আর এক পঞ্চমাংশ 'বয়তুল-মালে' জমা করিবার জন্য মহামান্য খলিফা সমীপে প্রেরিত হইত। যখন এই গৌরবান্বিত শেষ বিজয় লাভের পর যুদ্ধে জয়-লব্ধ বহু মূল্যবান্ সামগ্রী-সম্ভারের পঞ্চমাংশ ও পূর্ব্বোক্ত অতি মূল্যবান্ আসন এবং সম্রাট্-নন্দিনী বন্দিনী বেশে মদীনায় আনীত হইলেন, ঐ সময় মহামান্য খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) সমুদয় 'আরকান-দওলত' (সভাসদ-পারিষদ) এবং মহামাননীয় ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ) দিগকে সমবেত করিয়া, মছজেদে-নববীতে এই গৌরবান্বিত বিজয়-সংবাদ ঘোষণা করিলেন ; এবং যুদ্ধে জয়-লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার প্রদর্শন ও ভাগ-বণ্টন করিবার জন্য মিম্বরে আরোহণ পূর্ব্বক, মোছলমানদিগের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে একটি হৃদয়াকর্ষণী জ্বলন্ত বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ঐ সময় জগদ্বিখ্যাত সুবিচারক সম্রাট্ নওশেরওয়াঁনের পৌত্রী বা প্রপৌত্রী অবনত মস্তকে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আর অহঙ্কার ও গর্ব্বোন্মত্ত কেছরার দরবার হইতে, ফকীরী ও বিনয়-নম্রতার 'শানদার' (গৌরবপূর্ণ) সভায় নিশ্চিন্ত ভাবে নীরবে অবস্থান করিতেছিলেন। যুদ্ধ জয়-লব্ধ বিপুল সামগ্রী-সম্ভার একদিকে স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়িয়া ছিল ; মহামান্য খলিফা ঐ সকল জিনিষ-পত্র মহা মাননীয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মধ্যে যথাযোগ্য রূপে ভাগ-বণ্টন করিয়া দিলেন ; অবশেষে পূর্ব্বোক্ত বহুমূল্য আসন খানিও টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ভাগ করিলেন ; উহার এক অংশ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) পাইয়াছিলেন।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ না হইলেও ঐ অংশ টুকু ৩০ লক্ষ মুদ্রায় বিক্রয় হইয়া ছিল। এই ভাগ-বণ্টনে মহামান্ত খলিফা স্বীয় পুত্র হজরত আবতুল্লা (রাজিঃ) কে কম অংশ ও হজরত এমাম ভ্রাতৃ-যুগলকে অধিক অংশ অর্থাৎ হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) দিগের অংশের অর্দ্ধেক মাত্র দেওয়াতে, হজরত আবতুল্লাহ্ (রাজিঃ) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমি ইহা বুঝিতে পারিলাম না যে, আমাকে হছনায়েন (এমাম ভ্রাতৃদ্বয়) হইতে কেন কম অংশ দেওয়া যাইতেছে; অথচ আমার পিতা স্বয়ং খলিফা। তচ্ছ্রবণে মহামান্ত খলিফা হজরত ওমর (রাজিঃ) ফরমাইলেন, হে আবতুল্লাহ্! আজ যদি যুদ্ধ বিজয়-লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার আমার ব্যক্তিগত মতানুসারে বণ্টন করা হইত; তবে তোমাকে এক কপর্দ্দকও দেওয়া হইত না। ইহার কারণ এই যে, ইঁহাদের নানা (মাতামহ) রছুল, পিতা ওলি আল্লাহ্ (সাধক শ্রেষ্ঠ) এবং মাতা হজরত রছুল (ছালঃ)-এর স্নেহময়ী কন্যা। তোমার পিতা কেবলমাত্র খেলাফৎ লাভ করিয়াছে; আর ইহাও হোছনায়নের মহামান্ত নানার তাবেদারীর ফল।

যখন যুদ্ধ জয়-লব্ধ সমুদয় জিনিষ-পত্র ভাগ-বণ্টন হইয়া গেল; কেছরার সেই বহুমূল্য আসন খণ্ড খণ্ড করিয়া যথাযোগ্য পাত্রে বিতরিত হইল; তখন কেবলমাত্র পারস্য-সম্রাটের কন্যাটি অবশিষ্ট রহিয়া গেলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মহামান্ত খলিফাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বালিকাটি কাহাকে দেওয়া যাইবে? তখন আমিরুল মুমেনিন খলিফাতুল মুছলেমিন হজরত ফারুকে আজম (রাজিঃ) ঐ বালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তিনি দেখিতে পাইলেন, সম্রাট্-নন্দিনী হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন; তৎক্ষণাৎ মহামান্ত খলিফা আদেশ করিলেন যে, এই সম্রাট্-নন্দিনী এমাম হোছেনের প্রাপ্য।

তদনুসারে জগদ্বিখ্যাত সম্রাট্ নওশেরওয়াঁর প্রপৌত্রী, হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর দৌহিত্র-রত্নের সঙ্গে পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। এছলামী নিয়মানুসারে বালিকাকে বন্দিনী অবস্থা হইতে আযাদ (স্বাধীন—মুক্ত) করিয়া দেওয়া হইল। তখন এই সম্রাট্-নন্দিনীর নাম রাখা হইল "শহরবানু"। এই অগ্নি-পূজক সম্রাটের কন্যা যেমন অনিন্দ্য সুন্দরী, সেইরূপ ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্রা, দয়াবতী, গুণবতী ও একান্ত স্বামী-পরায়ণা ছিলেন। ইঁনি হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বামীর পরম ভক্ত, তাঁহার একান্ত গুণ-গ্রাহিণী এবং তাঁহার ঐকান্তিক প্রেমানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়া-ছিলেন। কারবালার মহাযুদ্ধে ইঁনি উপস্থিত থাকিয়া পরম ভক্তি ভাজন স্বামীর প্রতি অসাধারণ প্রেমানুরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক জগতে চির স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। হজরত এমাম জয়নাল আবেদীন (রাজিঃ) ইঁহারই গর্ভজাত পুত্র-রত্ন; তাঁহার বংশ-তরুই অদ্যাপি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ছৈয়দ নামে বিদ্যমান আছেন।

এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর এই পত্নী ব্যতীত আরও চারিটি পত্নী ছিলেন; একজনের মৃত্যুর পর আর একজনকে তিনি পত্নীতে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। আলী আকবর (রাজিঃ)-প্রমুখ পুত্রগণ সেই সকল পত্নীর গর্ভ-জাত। কিন্তু তাঁহারা সকলেই কারবালার হৃদয়-বিদারক অন্যায় যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন। উপরোক্ত মহা মাননীয়া বিবিগণের নাম এই :—(১) লয়লী-বিন্তে আবি মরত বিন্-মোরওয়াঃ-বিন্ মছউদ ছকফি; (২) ওম্মে এছহাক বিন্তে তালহা-বিন্-আবদুল্লাহ্ (৩) আবকাব-বিন্তে আমরাল্ কুয়েছ-বিন্-আদায়ী; (৪) ইঁহার নাম অপরিজ্ঞাত।

———

আখ্বারে শাহাদৎ
(শহীদ হইবার ভবিষ্যদ্বাণী)।

জনাব হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর শাহাদত এর কারণানুসন্ধানে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন; এক দলের মতে এই ব্যাপার একটা ঘটনা স্রোতের মুখে সঙ্ঘটিত হইয়াছে, আবার তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তী একদলের মত এই যে, ইহা একটা অন্তর্ব্বিপ্লব বা খান্দানী বিদ্বেষের পরিণাম। কিন্তু আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব যে, জনাব হজরত এমাম আলী মকামের শাহাদৎ খোদা তা-লার অভিলষিত একটি বিশেষ ঘটনা ছিল; যাহা রোয্ আজলে (সৃষ্টির প্রারম্ভে—সৃষ্টিকালে) তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। মামুলী যুদ্ধে, মামুলী অর্থাৎ সাধারণ ভাবে যুদ্ধে নিহত হওয়া তাঁহার পক্ষে একটা গৌরবের বিষয় নহে। সেরূপ হইলে এই শোকাবহ ঘটনা বিগত ত্রয়োদশ শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত মোছলমান জগতে এরূপ স্মরণীয় হইয়া থাকিত না।

যদি মহামান্য ছৈয়দশ্ শোহাদাঃ হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর শাহাদত কোনও ঘটনার 'যের আছর' (অন্তর্ব্বর্ত্তী) হইত, তবে উহার সংবাদ ও 'আশ্হাদ' (সাক্ষ্য) পূর্ব্ব হইতে 'নমুদার' ('যাহের'—প্রকাশ) হওয়া অসম্ভব ছিল; কিন্তু প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ দেখিতে পাইবেন যে, হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর 'ছগর ছিনি' (শৈশব) অবস্থায়ই আঁ হজরত (ছালঃ), এই শাহাদতের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

শওয়াহদ নবুওতে ওম্ম-হারেছ হইতে, আর মেশকাত শরীফে জনাব ওম্ম ফজল-বিন্তে হারেছ (রাঃ—আঃ) হইতে রওয়ায়েত আছে যে,

একদিন আমি জনাব হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর খেদমতে আরজ করিলাম, এয়া রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ), আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আপনার পবিত্র 'জেছম' (দেহ) মবারকের এক টুকরা কর্ত্তিত হইয়া আমার ক্রোড়ে পতিত হইয়াছে ; আমি এই স্বপ্ন দেখিয়া নিতান্ত 'হয়রান' (চিন্তাযুক্ত) হইয়াছি। এই স্বপ্নের 'তায়বির' (অর্থ) কি ? হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আপনি খুব ভাল স্বপ্ন দেখিয়াছেন। ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে খোদা তা-লা 'বেটা' (পুত্র-সন্তান) দিবেন ; আর আপনি উহাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিবেন। ওম্ম ফজল (রাঃ—আঃ) ফরমাইয়াছেন, কিয়দ্দিন পরে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে খোদা তা-লা এমাম হোছেন (রাজিঃ) রূপ তনয় রত্ন দান করিলেন আমি তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলাম। একদিন আমি জনাব এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-কে ক্রোড়ে লইয়া হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম ; এবং তাঁহাকে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ক্রোড়ে প্রদান করিলাম। তিনি জনাব এমাম ছাহেব (রাঃ—আঃ) কে 'পেয়ার' (স্নেহ-প্রদর্শন) করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পবিত্র নেত্রযুগল হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমি বলিলাম, এয়া রছুলোল্লাহ্ ! আমার পিতা মাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আপনি এ সময় কেন 'মলুল' (শোকাকুলিত) হইলেন ? হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, অয়ি ওম্মে ফজল ! আমাকে জিব্রিল (আলাঃ) আসিয়া সংবাদ দিলেন, আমার পুত্র (দৌহিত্র) হোছেন (রাজিঃ) আপনার ওম্মতের হস্তে 'আন্করিব' (অনতিবিলম্বে) কতল হইবেন। আমি বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে আরজ করিলাম, এয়া রছুলোল্লাহ্ ! কি, এমন ব্যাপারই ঘটিবে ? তিনি ফরমাইলেন হাঁ, জিবরিল ঐ স্থানের (যে স্থানে সে শহীদ হইবে) রক্তবর্ণ মৃত্তিকা ও আমাকে আনিয়া দিয়াছেন।

এই রওয়ায়েত দ্বারা স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় যে, জনাব হজরত রছুল করিম (ছালঃ), জনাব হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ প্রথম হইতেই অবগত ছিলেন। " শওয়াহেদন্নবুয়ত " গ্রন্থে মাওলানা হাজী রহমতোল্লাহ্ আলায়হে ফরমাইয়াছেন যে, জনাব হজরত রছুল খোদা (ছালঃ-আম), মোছলেম-মাতা হজরত ওম্মে ছালমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে একমুষ্টি 'খাক' (মৃত্তিকা) দিয়া ফরমাইয়া ছিলেন, অয়ি ওম্মে-ছালমাঃ ! যখন এই মৃত্তিকা লালবর্ণ ধারণ করিবে, তখন বুঝিবে যে, আমার স্নেহাস্পদ বেটা (দৌহিত্র—নাতি) হোছেন (রাজিঃ) কতল (নিহত—শহীদ) হইয়া গিয়াছে।

" কন্‌যল্ গরায়েব " গ্রন্থে সুদৃঢ় প্রমাণের সহিত লিখিয়াছেন যে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর শাহাদৎ-সংবাদ (শহীদ হওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী), হজরত জিবরিল আলায়হেছ্ছালাম, জনাব হজুর ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ)-কে ক্রমান্বয় পাঁচ বার দিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার 'পয়দায়েশের' (ভূমিষ্ঠ হওয়ার) দিন ; ২য় বার, এমাম ছাহেব (রাজিঃ) যখন ৪ মাস বয়স্ক ছিলেন ; ৩য় বার, যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩ বৎসর হইয়াছিল ; ৪র্থ বার, যখন তিনি ৪ বৎসর বয়স্ক ছিলেন ; ৫ম বার, যখন তাঁহার বয়স ৫ বৎসর হইয়াছিল।

জনাব হজরত রছুলে করিম (ছালঃ), এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ জনাব হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কেও বলিয়া ছিলেন।

যখন হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) কারবালায় পঁহুছিয়াছিলেন, ঐ সময় তিনি স্বীয় কনিষ্ঠা সহোদরা হজরত ওম্মে-কুলছুম (রাঃ—আঃ)-কে ফরমাইয়াছিলেন, অয়ি ভগিনি ! একদা আমি পরম ভক্তি-ভাজন ওয়ালেদ মাজেদ আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে 'ছফরে'

(প্রবাসে) ছিলাম ; যখন তিনি ছফর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে এই 'যমিনে' (ভূ-খণ্ডে) পঁহুছিলেন, এবং বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন ; এবং পরক্ষণেই শুইয়া গেলেন ; ঐ সময় তাঁহার পবিত্র মস্তক আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর জানুর উপর ন্যস্ত ছিল ; আর আমি তাঁহার 'ছরহানে' (মস্তকের দিকে) ছিলাম। অল্প কাল মধ্যে জনাব ওয়ালেদ মাজেদ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; 'একাএক' (অকস্মাৎ) তিনি নেত্র উন্মীলন করিলেন, এবং রোদন করিতে করিতে উঠিয়া বসিলেন। ভাই ছাহেব তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ফরমাইলেন, আমি এই মাত্র স্বপ্নে দেখিলাম যে, এই ভূখণ্ড রক্তের 'দরিয়ার' (সমুদ্রের) আকার ধারণ করিয়াছে ; এবং আমার 'ফরযন্দ' (পুত্র)—তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোছেন (রাজিঃ) সেই রক্ত-সমুদ্রে হস্তপদ সঞ্চালন করিতেছে ; আর 'ফরিয়াদ' (সাহায্য-প্রার্থনা) করিতেছে ; কিন্তু তাহার সাহায্য প্রার্থনায় কেহ কর্ণপাত করিতেছে না। সে 'পানাহ্' চাহিতেছে, কেহ উহাকে 'পানাহ্' (আশ্রয়) দিতেছে না। অতঃপর আমার দিকে 'মোখাতেব' হইয়া (লক্ষ্য করিয়া—যাহার সঙ্গে কথা হয়, তাহার দিকে নির্দ্দেশ করা) বলিলেন, যে দিন এই ঘটনা ঘটিবে, তুমি তখন কি করিবে ? আমি মস্তক অবনত করিয়া নিতান্ত আদবের সহিত বলিলাম, আয় 'পেদর বোযর্গ ওয়ার' (সম্মানিত পিতঃ) আমি আল্লাহ তা'লার পরীক্ষার উপর 'ছবর' (ধৈর্য্য-ধারণ) করিব ; এন্‌শাল্লাহ্ ঐ রক্তের সমুদ্রে আমি সাঁতার দিব ; আমার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

এই বর্ণনা দ্বারা একথা প্রতিপন্ন হয় যে, জনাব এমাম আলী মকাম (রাজিঃ)-কে ও এই শাহাদৎ-ঘটনার পূর্ব্বে, এ বিষয় জ্ঞাপন করান হইয়াছিল। প্রামাণ্য গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে, হজরত জিবরিল আলায়-

হেচ্ছালাম, হজরত আদম (আলাঃ)-কেও এই শাহাদতের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। আর হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর সেই সময়কার (শাহাদৎ হওয়া কালের) পিপাসার্ত্ত হওয়ার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, তাঁহার এরূপ পিপাসা হইবে যে, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ঘনীভূত ধূম উত্থিত হইয়া, তাঁহার ও আকাশের মধ্যে 'হায়েল' (প্রতি-বন্ধক—দৃষ্টি-রোধক) হইয়া যাইবে।

জনাব ছৈয়দ হোছেন কাছফি (রহঃ) স্বীয় "রওজাতোশ্-শোহাদাঃ" নামক গ্রন্থে এই ঘটনা সম্বন্ধে আর একটি রওয়ায়েত ফারছীতে লিখিয়াছেন, যাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, জনাব হজরত এমাম হোছেন আলায়হেছ্ছালাম যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, ঐ সময় পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লা জিব্রিল (আলাঃ)-কে, জনাব আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, যাও, আমার হাবিবকে—এমাম হোছেনের জন্ম-গ্রহণের সুসংবাদ জ্ঞাপন কর, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার শাহাদতের সংবাদও দাও; এবং 'তাযিয়ত' (শোক-প্রকাশানুষ্ঠান) ও আদায় কর। এমাম ছাহেব (রাজিঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ক্রোড়ে ছিলেন; এবং তিনি ঐ সময় তাঁহার 'হলকে' (গলদেশে) চুম্বন করিতে ছিলেন; ঐ সময় জিবরিল আলায়হেছ্ছালাম আসিয়া 'মবারকবাদ' দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, মবারক বাদ প্রদানের কারণ ত অবগত আছি, কিন্তু এই শোক প্রকাশের কারণ কি? জিবরিল আমীন বলিলেন, এয়া রছুলোল্লাহ্! এই যে আপনার প্রিয় নাতির গল-দেশ আপনার চুম্বনের স্থান; মায়ের পরলোক প্রাপ্তি এবং পিতা ও ভ্রাতার শাহাদতের পর উহাতে 'খঞ্জর জফা' (তরবারি বা ছুরী) চালান হইবে। তৎপর হজরত জিবরিল আলায়হেছ্ছালাম কারবালার ভবিষ্যৎ

ঘটনা সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিলেন। জনাব হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) এই ভাবী শোকাবহ ঘটনার সংবাদ শুনিয়া খুব ক্রন্দন করিলেন। হজরত আলী মরতুজা (রাঃ—আঃ) ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি আঁ হজরত (ছালঃ) ও হজরত জিবরিল আমীনের কথোপকথন কিছুমাত্র শুনিতে পাইয়াছিলেন না; তিনি আঁ হজরত (ছালঃ)-কে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—অত্যন্ত ঘাবরাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আয় ছৈয়দল মোর-ছালিন (ছালঃ)! আপনার এরূপ ক্রন্দনের কারণ কি? তখন আঁ হজরত (ছালঃ), জিবরিল আমীন যে সংবাদ দিয়া গেলেন, সেই কথা আনুপূর্ব্বিক তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। জনাব হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই অশুভ-সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত 'পেরেশান' হইলেন; এবং তাঁহারও চক্ষুর্দ্বয় হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি এই রোরুদ্যমান অবস্থায় হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর হুজ্‌রায় গমন করিলেন; জনাব হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) যখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে রোদন করিতে দেখিলেন, তখন বলিয়া উঠিলেন; হে পুত্রের পিতা, হে 'ছর্‌ওরে দেল' (প্রাণের ছরদার)! আজ আনন্দ প্রকাশ করিবার দিন, না কি শোক প্রকাশ করিবার দিন? আপনার এই রোদন যদি আনন্দ জনিত হয়, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন, নচেৎ আপনার এই পেরেশানীর কারণ প্রকাশ করুন। হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর বাক্য শ্রবণে হজরত আলী মরতুজা (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন, অয়ি ফাতেমাঃ! আমি হোছেনের শোকে এরূপ অভিভূত হইয়াছি। আজ তোমার ওয়ালেদ মাজেদ হজরত রছুল আকরম (ছালঃ)-কে জিব্‌রিল আমীন হোছেনের শাহাদতের সংবাদ দিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র জনাব হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)

শোকে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন, তৎক্ষণাৎ চাদরে দেহ আবৃত করিয়া হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর হুজরায় গমন করিলেন, এবং স্বীয় ওয়ালেদ মাজেদের খেদমতে আরজ করিলেন যে, 'আয় পেদর বোযরগোয়ার' (হে মহামান্য পিতা!) আপনি হজরত আলী (রাজিঃ)-কে কি এই সংবাদ দিয়াছেন যে, আমার হোছেনের ঐ পবিত্র গলদেশ—যাহাতে আপনি সর্ব্বদা চুম্বন দিয়া থাকেন, আপনারই ওম্মতের 'জালেম' (অত্যাচারী) লোকেরা তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা তাহা চ্ছেদন করিবে? আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, হাঁ, আমাকে জিব্রিল এইরূপই বলিয়া গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন, বাবাজান! আমার হোছেন এমন কি 'গোনাহ্' (পাপ কার্য্য) করিয়াছে যে, শৈশব অবস্থায় তাহার উপর এইরূপ অত্যাচার করা যাইবে? হজরত খাজায়ে আলম (ছালঃ) ফরমাইলেন, এই ঘটনা উহার শৈশবকালে কিংবা যৌবন কালে সঙ্ঘটিত হইবে না; বরং এমন সময় ঘটিবে, যখন না তুমি থাকিবে, না আমি থাকিব, না আলী (রাজিঃ) থাকিবে, না উহার ভ্রাতা হাছন (রাজিঃ) জীবিত থাকিবে। তখন জনাব হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) এই কথা শুনিয়া নিতান্ত 'বেকারার' (অধৈর্য্য) হইয়া ফরমাইলেন, অয়ি-উৎপীড়িত হোছেন-জননি! অয়ি শহীদ হোছেনের জননি! অয়ি 'বেকছ' (নিরূপায়)—হোছেনের জননি! যখন হোছেনের নানা, জনক-জননী, ভ্রাতা—ইঁহাদের কেহই দুনিয়ায় থাকিবে না যে, তোমার সেই ভীষণ বিপদ কালে সাহায্যকারী হন, এবং তোমার জন্য শোক প্রকাশ করেন; এরূপ অবস্থায় তোমার কি উপায় হইবে? যদি আমি ঐ সময় জীবিত থাকিতাম, তোমার জন্য শোক প্রকা া করিতাম। ঐ সময় গায়েব হইতে এই 'আওয়ায' আসিল (শব্দ হইল), অয়ি ফাতেমাঃ। তুমি 'গম' ('রঞ্জ'—

দুঃখ প্রকাশ) করিও না ; তোমার উৎপীড়িত পুত্রের জন্য কেয়ামত পর্য্যন্ত লোকেরা শোক প্রকাশ করিবে। আর তোমার পিতার ওম্মতগণ এমাম আলায়হেচ্ছালামের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য কেয়ামত পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিবে।

পবিত্র কোরআন শরীফেও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর শাহাদতের ইঙ্গিত আছে ; এ ক্ষুদ্র পুস্তকে সেই সকল বহু বিস্তৃত বিষয়ের আলোচনা করা হইল না। উর্দ্দু ভাষায় এমাম ছাহেবের বহু সঠিক বিস্তৃত জীবনী আছে ; তাহাতে এ বিষয়ের বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

এমাম ছাহেব শৈশবে মাতামহ হারা হইয়াছিলেন। তাহার ছয় মাস পরেই মাতৃ-হারা হন। ইহার পর যে ভাবে ইঁনি মহামান্য পিতা ও পরম শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহ-শীতলচ্ছায়ায় জীবনাতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর জীবনীতে ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার বাল্য জীবন ও যৌবন কালের অধিকাংশ সময় পরম ভক্তি-ভাজন পিতার স্নেহ এবং ভালবাসা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। পিতা তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকে কতই না স্নেহ করিতেন।

এস্থলে আরও একটি কথার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ জল্লশানহু, মহাপ্রাণ পয়গম্বর হজরত এব্রাহিম খলিলোল্লাহ্ (আলাঃ)-এর প্রতি তাঁহার প্রিয় পুত্র হজরত এছমাইল (আলাঃ)-কে কোরবাণী দিতে আদেশ করিয়াছিলেন ; তদনুসারে সেই খোদাগত প্রাণ মহীয়ান্ পয়গম্বর বিনাপত্তিতে পুত্র-রত্নকে কোরবাণী দেওয়ার জন্য ছুরী ও দড়ী সহ কোরবানীর স্থানে (বধ্য-ভূমিতে) গমন করেন ; এবং পরম স্নেহাস্পদ পুত্র-রত্নকে কোরবাণী করিতে উদ্যত হন। আল্লাহ্ তা-লা তাঁহার ঈমানের এবং খোদা-ভক্তির জ্বলন্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া পুত্রের পরিবর্ত্তে দোম্বার কোরবাণী গ্রহণ করেন ; এই ঘটনা চান্দ্র

বৎসরের শেষ মাস ১০ই যেলহজ্জ তারিখে ঘটিয়াছিল। আবার হজরত এব্রাহিম (আলাঃ)-এর অধঃস্তন ৭২ তম পুরুষে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)। চান্দ বৎসরের ১ম মাসের ১০ই (মোহার্রম) তারিখে কারবালায় শহীদ হন, সুতরাং সাধারণতঃ মনে এই ধারণা উপস্থিত হয় যে, হজরত এব্রাহিম (আলাঃ) কর্ত্তৃক প্রদত্ত কোরবাণী জনাব হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) দ্বারাই পূর্ণ হইয়াছিল। এই কোরবাণীর শাহাদতের অন্তরালে কোন্ গূঢ় রহস্য নিহিত আছে, তাহা সেই সর্ব্ব-রহস্যময় আল্লাহ্ তা-লাই জানেন। মানুষের চিন্তাধারা ইহার কোনও কুল-কেনারা করিতে পারে না। কোরআন-হাদীসেও ইহার কোন প্রমাণ নাই ; ঐতিহাসিক গবেষণাও এস্থলে কার্য্যকরী হয় না। তবে একথা সহজেই বুঝা যায় যে, এই আদর্শ শাহাদৎ—সর্ব্বোন্নত শাহাদৎ দ্বারা মোছলমানগণ পরকালে অনেকটা লাভবান্ হইবেন। জনাব হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর এই শোচনীয় শাহাদতের ফল কিছুতেই ব্যর্থ হইবে না। আল্লাহ্ জল্লশানহু, নাতির আত্মত্যাগের—আত্ম-বিসর্জ্জনের ফল নানার ওম্মত মণ্ডলীকে কিছু না কিছু প্রদান করিবেন।

৪৯ কিংবা ৫০ হিজরীর ২৯শে ছফর তারিখে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) বিষ-প্রয়োগে প্রাণত্যাগ করেন ; বড় এমাম ছাহেব (রাজিঃ) খেলাফৎ পরিত্যাগ করিবার পরে মদীনা তৈয়বায়ই অবস্থান করিতে ছিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে কনিষ্ঠ এমাম সাহেবও মদীনাবাসী হইয়াছিলেন ; দুই ভ্রাতা পরমানন্দে—নিশ্চিন্ত মনে মদীনায় থাকিয়া পরম শ্রদ্ধেয় নানাজান এবং পরম শ্রদ্ধেয়া ওয়ালেদা মাজেদার রওজা মবারক জেয়ারত করিতেন ; মদীনার ছাহাবাঃ কারাম ও সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণের সহিত এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মেলা-মেশা করিতেন, প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্মালোচনা করিতেন

আর রাত্রিকালে একান্ত মনে তাহাজ্জদ ও অন্যান্য নফল নমায্ যথা-নিয়মে আদায় করিতেন। রাজনীতির সংশ্রবে আদৌ যাইতেন না। খলিফা হজরত আমীর মাবিয়া (রাজিঃ) যথানিয়মে, যথা সময়ে তাঁহাদের বৃত্তির টাকা ও ছুবে আহ্ওয়াজের খাজানার টাকা পাঠাইতেন; তদ্দ্বারা খুব সচ্ছলভাবে তাঁহাদের দিন কাটিয়া যাইত। তাহারা দীন-দরিদ্র ও মহতাজদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিতেন, নিরন্নকে অন্ন ও বস্ত্র হীনকে বস্ত্র প্রদান করিতেন; আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যাঁহারা অভাবগ্রস্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকেও যথোচিত ভাবে সাহায্য করিতেন। হজ্জ্ করিতে মক্কা শরীফে গমন পূর্ব্বক বহু উষ্ট্র ও দোম্বা কোরবানী দিতেন; ফকীর মিছকিনকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেন। তাহাদের "দস্তরখান" ও অত্যন্ত 'কোশাদাঃ' (প্রশস্ত) ছিল; দুই-বেলা বহু মেহমান-মোছাফের, আগন্তুক অভাগত এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।

৪৮ হিজরীতে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), কুস্তুন্তনিঞা (কনষ্টাণ্টি-নোপল—ইস্তাম্বুল)স্থ গ্রীক্ সম্রাটের শক্তি পরীক্ষার পর তাঁহার রাজধানী আক্রমণের ইহা উপযুক্ত সুযোগ মনে করিলেন। নৌ-সামরিক বলে কয়ছরকে পর্য্যুদস্ত করিবার তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। যখন তিনি কনষ্টাণ্টিনোপল আক্রমণের সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থা ঠিক করিলেন, তখন পবিত্র নগরী মক্কা-মোয়াজ্জমা ও মদীনা তৈয়বায় ও এতৎ সম্বন্ধে ঘোষণা প্রচার করাইলেন। মহামান্য ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) গণ, কুস্তুন্তনিয়াঁর আক্রমণ সম্বন্ধীয় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র মুখ-নিঃসৃত পবিত্র হাদীছ অবগত ছিলেন; ঐ হাদীছের মর্ম্ম এইরূপ:—"আমার ওম্মতের ১ম সেনাদল যাহারা কায়ছরের শহর (রাজধানী), আক্রমণে যোগদান করিবে, তাহারা 'মগ্ফেরাত' (মুক্তি) পাইবে।"

উপরোক্ত ঘোষণানুযায়ী মুক্তি-কামনায় হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ), হজরত আবু-আইউব আনছারী (রাজিঃ)-প্রমুখ বহু প্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ (রাজিঃ) এই পবিত্র অভিযানে যোগদান করিলেন। এক বিরাট সেনাদল গঠিত হইল; আমীর হজরত মৌবিয়া (রাজিঃ) ছুফিয়ান-বিন্-ময়োফ্‌কে এই বিরাট বাহিনীর সর্ব্ব-প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলাভিমুখে রওয়ানা করিলেন। হজরত আমীর মৌবিয়া (রাজিঃ)-এর পুত্র এযিদ, "ছালফাঃ" নামধেয় সৈন্য দলের সেনাপতি ছিল। তাহাকেও একদল সৈন্যসহ প্রধান সেনাপতির অধীনতায় প্রেরণ করা হইল; এই বিরাট সেনাদল জাহাজারোহণে সমুদ্র-পথে কনষ্টাণ্টিনোপলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আবার একদল স্থলসৈন্যও কায়ছরের রাজধানী অভিমুখে প্রেরিত হইল। মোছলমান বীরগণ সমুদ্রপথে ও স্থলপথে গিয়া কনষ্টাণ্টিনোপল অবরোধ করিলেন। কিন্তু নগরের প্রাচীর অতি দৃঢ় উচ্চ ও দুর্ভেদ্য ছিল, তদ্ব্যতীত এই জগদ্বিখ্যাত রোমক রাজধানী প্রাকৃতিক নিয়মেও অত্যন্ত সুরক্ষিত থাকাতে, মোছলমান-দিগের ভীষণ আক্রমণ ব্যর্থ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকারের সৌভাগ্য আর একজন বীর পুরুষের ভাগ্যে নির্দ্ধারিত ছিল, এজন্য এই প্রাথমিক আক্রমণ সাফল্য মণ্ডিত হইল না। মোছলমান-দিগের কতিপয় বিখ্যাত বীরপুরুষ এই যুদ্ধে শহীদ হইলেন। প্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ হজরত আবু আইউব আন্‌ছারী (রাজিঃ)ও এই অবরোধ কালে এন্তেকাল ফরমাইলেন। নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগে তাঁহাকে 'দফন' (কবরস্থ) করা হইল। অধুনা তাঁহার পবিত্র মজার শরীফ্ কুস্তুন্তুনিয়াঁর সর্ব্ব প্রধান 'যেয়ারত গাহ্'। জামেয় আবু আইউব

আন্‌ছারী নামধেয় বিখ্যাত সুবৃহৎ জামেয় মস্‌জেদ কনষ্টাণ্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলের একটি প্রধান উপাসনালয় ও প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। প্রচণ্ড শীত, রসদাদির অভাব ও অন্যান্য নৈসর্গিক বাধা-প্রতিবন্ধকতায় এই বিরাট অভিযান ব্যর্থ হইল। যদিও এই অভিযান সাধারণ দৃষ্টিতে ব্যর্থ হইয়াছিল; কিন্তু এই আক্রমণের ফল বড়ই সন্তোষ জনক রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। মোছলমানদিগের এই আক্রমণে কায়ছার, তাঁহার সেনাপতিগণ এবং সেনাদলের মনে এরূপ ত্রাস ও আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মোছলমানদিগের অধিকৃত কোনও জনপদ আক্রমণ করিতে আর সাহসী হন নাই। আর যে সকল এলাকা সম্বন্ধে রোমক সম্রাট্ ও মোছলমানগণ পরস্পর দাবী করিতেন, সেই সকল এলাকা মোছলমানদিগের অধিকার ভুক্ত হইল। এই অভিযান দ্বারা আরও একটি বিষয় জানিতে পারা যায় যে, মহামান্য এমাম ছাহেব (রাজিঃ) বীরত্ব প্রকাশ এবং যেহাদ করিবার জন্য সুদূর ইউরোপে পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন; আর তাঁহার ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রচণ্ড শত্রু এবং তাঁহার শাহাদতের প্রধান নায়ক এযিদও এই অভিযানে তাঁহার সহযোগী এবং সহকর্ম্মী ছিল। পূর্ব্বে ৩য় খোল্‌ফায়ে রাশেদীন হজরত ওছমান জিন্নূরায়েন (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে তিনি যেহাদ উপলক্ষে উত্তর আফ্রিকার টুনিস পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। একবার যেহাদোপলক্ষে পারস্য দেশেও গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অবস্থান কেবলমাত্র আরব দেশ, শাম ও এরাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; আর বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ লাভ করিতে তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা পাইতেন।

এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা—এই তিন মহাদেশেই তিনি যেহাদে গমন করিয়াছিলেন।

এযিদের অলি আহাদী বা যুবরাজত্ব।

৫০ হিজরীতে কুফার শাসনকর্ত্তা মগিরাঃ-বিন্-শায়বাঃ, কুফা হইতে দেমেশ্কে গমন করিলেন। তিনি হজরত আমীর মাবিয়া (রাজিঃ)-কে বলিলেন, আমি হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ)-এর শহীদ হওয়ার ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; পরবর্ত্তী আর সমস্ত ঘটনা আমার চক্ষের সম্মুখে এখনও ঘূর্ণায়মান হইতেছে। খেলাফৎ সম্বন্ধে মোছলমানদিগের মধ্যে কিরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শোণিতপাত হইয়াছে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এজন্য আমার মতে আপনার পক্ষে স্বীয় পুত্র এযিদকে আপনার পরবর্ত্তী খলিফা নির্ব্বাচন করা উচিত। ইহা মোছলমানদিগের পক্ষে বিশেষ মঙ্গল জনক ও ফলপ্রসূ হইবে। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এযাবৎ কাল এরূপ খেয়াল বা কল্পনা কখনও করিয়াছিলেন না যে, স্বীয় পুত্র এযিদকে খলিফা নির্ব্বাচন করিবেন। মগিরাঃ-বিন্-শয়বার উক্তি শ্রবণে সর্ব্ব প্রথমে এ বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তিনি মগিরাঃ কে বলিলেন, ইহা কি সম্ভবপর যে, আমার পরে মোছলমানগণ আমার পুত্র এযিদের হস্তে 'বয়্য়েত' করিবে? মগিরাঃ বলিলেন, এই কার্য্য অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। কুফার অধিবাসিগণকে আমি এ বিষয়ে রাজী করিব; আর বস্রাবাসিগণকে আপনার ভ্রাতা যেয়াদ-এব্নে আবু ছুফিয়ান বাধ্য করিবেন। মক্কা ও মদীনায় মারওয়ান-বিন্-হকম এবং সয়ীদ-বিন্-আছ লোকদিগকে স্ব স্ব মতাবলম্বী করিতে পারিবেন। আর মোলকে শামে ত কোনও প্রকার 'মোখালেফৎ' (বিরুদ্ধাচরণ)-এর সম্ভাবনাই নাই। ইহা শুনিয়া হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), মগিরাঃ-বিন্-শয়রাঃকে এই বলিয়া কুফায় ফেরত

পাঠাইলেন যে, তুমি কুফায় গিয়া এই কার্য্য সুসম্পন্ন কর। এই ঘটনাটি অন্য এক ভাবেও বর্ণিত হইয়াছে ; তাহা এই যে, হজরত আমীর মৌবিয়া (রাজিঃ) কুফার শাসনকর্ত্তা মগিরাঃ বিন-শয়বাঃ কে লিখিলেন, তুমি আমার পত্র পাঠ মাত্র আপনাকে 'মৌজুল' (বরখাস্ত—পদচ্যুত) মনে করিবে। কিন্তু এই পত্র যখন মগিরার নিকট পঁহুছিল, তখন এই আদেশ 'তায়মিল' (পালন) করিতে তিনি বিলম্ব করিলেন। তৎপর তিনি যখন হজরত আমীর মৌবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট দামেশ্‌কে উপস্থিত হইলেন, তখন হজরত আমীর মৌবিয়া (রাজিঃ) তাঁহার আদেশ পালনে বিলম্ব করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মগিরাঃ বলিলেন, আদেশ পালনে বিলম্ব করিবার এই কারণ ছিল যে, আমি কোনও এক 'খাছ' (বিশেষ) কার্য্যে লিপ্ত ছিলাম। আমীর হজরত মৌবিয়া (রাজিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ প্রয়োজনীয় কার্য্যে তুমি লিপ্ত ছিলে? তদুত্তরে মগিরাঃ বলিলেন, আমি আপনার পুত্র এযিদের নামে লোকের নিকট হইতে বয়্‌য়েত গ্রহণ করিতেছিলাম। আমীর হজরত মৌবিয়া (রাজিঃ) এই কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন ; এবং তাঁহাকে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া কুফায় ফেরত পাঠাইলেন। যখন মগিরাঃ দামেশ্‌ক্ হইতে কুফায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন কুফার লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, দামেশ্‌কে তোমার সম্বন্ধে কি ব্যাপার ঘটিল? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-কে এমন এক দল্‌দলে, (গভীর কর্দ্দমে) ফাসাইয়া আসিয়াছি যে, তিনি কেয়ামত পর্য্যন্ত তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবেন না। ঘটনা যাহাই হউক, ইহাতে সন্দেহ নাই যে, আমীর মৌবিয়া (রাজিঃ)-কে মগিরাঃ-বিন্-শায়বাই এমন কার্য্যে অগ্রসর করিয়াছিলেন যে, যদ্দ্বারা ভবিষ্যতে খেলাফতের নামে পিতার স্থলে পুত্র বাদশাহ হইতে লাগিলেন ; এবং

'মশ্‌বেরা' (পরামর্শ) ও 'এন্তেখাব' (নির্ব্বাচন)-এর পবিত্র প্রণালী সেই হইতে উঠিয়া গেল—খেলাফৎ বংশানুক্রমিক হইয়া দাড়াইল। এযিদ আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-এর পুত্র ছিল, পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ-প্রদর্শন, এবং পিতার পুত্রের প্রতি রাজত্ব অর্পণ বা উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন একটি 'ফেৎরতি' (স্বাভাবিক) নিয়ম। এবিষয়ে হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-কে অনেকটা 'ময্‌যুর' (নিরুপায়) মনে করা যাইতে পারে; অবশ্য ইহা তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা এবং পবিত্র খেলাফৎ-নিয়মের পরিপন্থী; কিন্তু মগিরাঃ-বিন্‌-শয়বার পক্ষ সমর্থনের কোনও পথই নাই। এই লোকটি জানিয়া শুনিয়া পবিত্র খেলাফতের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি একজন ছাহাবাঃ হইয়াও কুফার শাসন কর্ত্তৃত্বের লোভেই এই অন্যায় অনুষ্ঠানে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

মগিরাঃ দামেশ্‌ক্ হইতে কুফায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথায় 'শোরফাঃ' ও 'রোওছাঃ' (সম্ভ্রান্ত এবং নেতৃ মণ্ডলী)-কে আহ্বান পূর্ব্বক এই কার্য্যে 'আমাদাঃ' (অগ্রসর) করিলেন যে, আপনারা এযিদের 'ওলী আহাদী' (যুবরাজত্ব) বিষয়ে স্বীকৃতি দান করুন; তাঁহাদিগকে একথা বিশেষ ভাবে বুঝান হইল যে, এই উপায়ে ভবিষ্যতে মোছলমানদিগের মধ্যে খেলাফৎ অর্থাৎ আধিপত্য লইয়া কলহ এবং শোণিতপাত হইবে না; সর্ব্ব প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ এবং বিপ্লবের অবসান হইবে। কুফার চঞ্চল মতি অধিবাসিগণ শাসনকর্ত্তা মগিরার এই যুক্তি মানিয়া লইলেন, মগিরাঃ যখন দেখিলেন, তাঁহার প্রস্তাবে কুফাবাসিগণের আর কোনওরূপ মত দ্বৈধ নাই; তখন স্বীয় পুত্র মুছার নেতৃত্বে কুফার প্রধান প্রধান লোক দ্বারা গঠিত এক 'ওফদ' (ডেপুটেশন) খলিফা হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর সমীপে দেমেশ্‌কে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা দেমেশ্‌কে পঁহুছিয়া খলিফা হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-কে বলিলেন, আমরা এই মতের

সমর্থন করিযে, এযিদকে 'ওলী আহাদ' (যুবরাজ) নির্ব্বাচন করিয়া, তাঁহার নামে বয়্যেত গ্রহণ করা হয়। ইতিপূর্ব্বে মগিরাঃ হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এর হৃদয়ে যে সঙ্কল্প দৃঢ়ীভূত করিয়া ছিলেন; উপস্থিত ঘটনায় তাহাতে আরও শক্তি-সঞ্চয় হইল। তিনি এই প্রতিনিধি দলের প্রতি খুব সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক বিদায় করিলেন; এবং ইহাও বলিয়া দিলেন যে, যখন সময় আসিবে, তখন তোমাদের নিকট হইতে বয়্যেত গ্রহণ করা যাইবে। আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) একজন 'দূর আন্দেশ' (বহুদর্শী—ভবিষ্যদ্দর্শী) এবং সতর্কতার সহিত কার্য্য উদ্ধার-কারী রাজনীতি কুশল পুরুষ ছিলেন। তিনি এই অনুমান করিতে চাহিতে ছিলেন যে, তদানীন্তন মোছলেম-জগত তাঁহার ইচ্ছার অনুকূল কি না? এ বিষয়ের পরীক্ষা জন্য তিনি একদিকে মদীনার শাসনকর্ত্তা মারওয়ান-বিন্-হকম কে, অন্যদিকে বস্রার শাসনকর্ত্তা যেয়াদ-বিন্-আবু ছুফিয়ানকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; আমার মনে এই আশঙ্কা হইতেছে যে, আমার পরে মোছলমানদিগের মধ্যে খেলাফৎ লইয়া না বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়। এজন্য আমি ইচ্ছা করি যে, আমার জীবিত অবস্থায় কোনও ব্যক্তিকে আমার পরে খলিফা নির্ব্বাচন করি। বৃদ্ধদিগের মধ্যে খলিফার উপযুক্ত কেহ আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হইতেছেন না; যুবক দলের মধ্যে আমার পুত্র এযিদকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমাদের উচিত যে, খুব সতর্কতার সঙ্গে এসম্বন্ধে জন-সাধারণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির কর। আর তাহাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য এযিদের হস্তে বয়্যেত করিবার জন্য বাধ্য কর। বস্রার শাসনকর্ত্তা যেয়াদ-বিন্-আবি ছুফিয়ানের নিকট এই মর্ম্মের পত্র পঁহুছিলে, তিনি বস্রার জনৈক রইছ-য়বেদ-বিন্-কায়াব নরিমিকে ডাকাইয়া হজরত আমীর মাবিয়া (রাজিঃ)-এর ঐ

পত্র খানি দেখাইলেন, এবং বলিলেন, আমার মতে আমিরুল মুমেনিন এই ব্যাপারে বড় তাড়াতাড়ি করিয়াছেন ; এবিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন নাই। কারণ এযিদ একজন বিলাস ব্যসন-পরায়ণ তরুণ যুবক। একথা সকলেই অবগত আছে যে, সে সর্ব্বদা ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও মৃগয়াদি কার্য্যেই সময়াতিপাত করে। তাঁহারা নিশ্চয়ই উহার নামে বয়্যেত করিতে আপত্তি করিবে। য়বিদ-বিন্-কায়াব নমিরি বলিলেন, আপনি আমিরুল-মুমেনিনের মতের বিরুদ্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করিবেন না। আমাকে আপনি দেমেশ্‌কে পাঠাইয়া দেন, আমি এযিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব, এবং তাঁহাকে বলিব, আপনি নিজের কার্য্য-কলাপ, আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করুন—যাহাতে আপনার নামে বয়্যেত গ্রহণে কোনও প্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতা না জন্মে। আমি আশা করি, এযিদ অবশ্যই আমার এই উপদেশ গ্রহণ করিবেম। যখন উহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, চাল-চলন সংশোধিত হইবে, তখন উহার নামে বয়্যেত গ্রহণ করিতে কোনও রূপ বাধা-প্রতিবন্ধকতা জন্মিবে না ; সঙ্গে সঙ্গে আমিরুল-মুমেনিনের উদ্দেশ্য ও পূর্ণ হইবে। যেয়াদ তাঁহার এই পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে অতি সত্বরে দামেশ্‌কে রওয়ানা করিয়া দিলেন। য়বিদ দামেশ্‌কে পঁহুছিয়া এযিদকে সকল বিষয় বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন ; তদনুসারে এযিদও কিছুকালের জন্য স্বীয় কার্য্য-কলাপ ও আচার-ব্যবহার সংশোধন করিয়া লোকদিগের প্রতিবাদের পথ বন্ধ করিল।

মদীনা-মনুওরায় যখন মারোয়ানের নিকট এই মর্ম্মের পত্র পঁহুছিল, তিনি মদীনার সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে আহ্বান করিয়া প্রথমে কেবলমাত্র এই কথা প্রকাশ করিলেন যে, আমিরুল-মুমেনিনের সঙ্কল্প এই যে, তিনি জীবিত থাকিতে মোছলমামদিগের আত্ম-কলদুহ দ্রীকরণ মানসে

কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভবিষ্যৎ খলিফা মনোনীত করেন। ইহা শুনিয়া সকলে বলিলেন, তাঁহার এই মত আমাদের সকলেরই মনঃপুত। আমরা সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত আছি। কয়েক দিন পরে আবার মারোয়ান-বিন্ হকম মদীনার প্রধান প্রধান লোকদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ; এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন, দামেশ্ক্ হইতে আমিরুল-মুমেনিনের ২য় পত্র আসিয়াছে, ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, আমি মোছলমানদিগের 'বেহ্তরীর' জন্য (মঙ্গলার্থ) আমার পুত্র এযিদকে 'ওলি য়াহ্দী' (যুবরাজ বা ভাবী খলিফা) পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছি। এই কথা শ্রবণে হজরত আবদুর রহমান বিন্-আবিবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা-বিন্-যোবের (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ইহার কঠোর প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, এই নির্ব্বাচন মোছলমানদিগের মঙ্গলার্থে নয়, বরং মোছলমানদিগের 'বরবাদির' (ধ্বংস সাধনের) জন্য করা হইয়াছে। কারণ, এইরূপ নির্ব্বাচন দ্বারা মোছলমানদিগের খেলাফৎ কয়ছর এবং কেছরার (রোমক-সম্রাট্ ও পারস্য-সম্রাট্) এর ছোলতানতের ন্যায় হইয়া যাইবে ; অর্থাৎ পিতার পরে পুত্র সিংহাসনারূঢ় হইবে ; এইরূপ নির্ব্বাচন এছলামী খেলাফতের সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

এইস্থলে এ ঘটনাও উল্লেখ যোগ্য যে, যখন মদীনা মনুওরায় মারোয়ান-বিন্ হকম, হজরত আমীর মাবিয়া (রাজিঃ)-এর 'মনশাঃ' (অভিপ্রায়)-এর 'এলান' (ঘোষণা) করেন, ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বেই হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) পরলোক গমন করিয়াছিলেন। লোকেরা সাধারণতঃ একথাও অবগত ছিল যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর সন্ধি স্থাপন কালে আবদুল্লা-বিন্-আমের এই শর্ত্তটি নিজের পক্ষ হইতে লাগাইয়াছিলেন যে, আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-

এর পরে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) পুনরায় খলিফার পদ লাভ করিবেন; কিন্তু বড় এমাম ছাহেব (রাজিঃ) সন্ধি-পত্রে এই শর্ত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন না। অথচ সর্ব্ব সাধারণের মনে এই 'খেয়াল' (ধারণা) ছিল যে, যদিও হজরত এমাম হাছন আলায়হেচ্ছালাম সন্ধিপত্রে ভাবী খলিফা-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু মোছলমান জগৎ হজরত এমাম হাছন আলায়হেচ্ছালামের খেলাফৎ লাভ সম্বন্ধে এক মতাবলম্বী হইবেন। মারওয়ান-বিন্-হকম যখন প্রথমবার মদীনায় আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর পত্রের মর্ম্ম ঘোষণা করিয়াছিলেন, তখন অধিকাংশ লোকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর পরলোক গমনে হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-এর মনে এই খেয়ালের উদ্রেক হইয়াছে যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কাহাকেও খলিফা নির্ব্বাচন করেন; কারণ যখন হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) জীবিত ছিলেন, ঐ সময় পর্য্যন্ত তিনি (হজরত মোবিয়া [রাজিঃ]), এমাম হাছন (রাজিঃ)-কেই নির্ব্বাচিত ভাবী খলিফা বলিয়া মনে করিতেন; প্রথম ঘটনা দ্বারা একদিকে হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর 'নেক-নিয়ত্‌' (সৎসঙ্কল্প) ও 'এন্‌ছাফ্-পছন্দি' (সদ্বিবেচনা বা সুবিচার)-এর ঝলক প্রকাশ পাইতেছিল; পক্ষান্তরে তাঁহার পরে যাঁহারা আপনাদিগকে খলিফা পদের 'মস্তহক্' (হক্‌দার—ন্যায় সঙ্গত অধিকারী) বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাদের মনে উহা লাভের আশা জন্মিয়াছিল। মারওয়ান যখন দ্বিতীয় বার এযিদের ভাবী খলিফা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ঘোষণা প্রচার করিলেন, তখন পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার ধারণাই লোকের মন হইতে অন্তর্হিত হইল। আর হজরত এমাম হাছন রাজি আল্লাহু আন্‌হুর পরলোক গমনের পরই এই কার্য্যের (এযিদকে খলিফা নির্ব্বাচন) জন্য লোকের মনে নানাপ্রকার সন্দেহের উদ্রেক হইতে লাগিল। কতক

লোক এইরূপ মত প্রকাশ করিতে লাগিল যে, হজরত আমীর মৗবিয়া (রাজিঃ)-ই হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে বিষ-প্রয়োগে শহীদ (হত্যা) করিয়াছিলেন। এযিদের 'অলী-আহাদী' (খেলাফতের উত্তরাধি-কারিত্ব) ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে কাহারও মনে এরূপ সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল না যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর 'ওফাত' (পর-লোক প্রাপ্তি)-এবং হজরত আমীর মৗবিয়া (রাজিঃ)-এর 'খাহেশ' (ইচ্ছা) ও 'কোশেশ' (চেষ্টা)-এর মধ্যে কোনও সম্বন্ধ আছে—কিংবা নাই। পাঠকগণ ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করিয়া ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর বিষ-প্রয়োগে মৃত্যুর সঙ্গে আমীর হজরত মৗবিয়া (রাজিঃ)-এর কোনও সম্বন্ধ ছিল না। এরূপ একটা ভীষণ গর্হিত কার্য্য তাঁহার ন্যায় একজন বিখ্যাত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) কখনও করিতে পারেন না। মহামান্য আছহাবগণ নরহত্যা—বিশেষতঃ হজরত রছুল-করিম (ছালঃ)-এর দৌহিত্রের হত্যা সাধন করিবেন, এরূপ একটা খেয়াল মনে স্থান দেওয়া ও মহাপাপ। অবশ্য চাতুরী, ধোকাবাজী প্রভৃতি অনুষ্ঠান কোনও কোনও ছাহাবাঃ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিবী জয়নবের বিবাহ সম্বন্ধে এযিদের ষড়যন্ত্র বিষয়ক যে কাহিনী সাধারণতঃ প্রচলিত আছে; তাহার মূলে সত্য থাকিতে পারে। কারণ এযিদের ন্যায় কামাতুর পাপাচারীর পক্ষে সেরূপ কার্য্য করা অসম্ভব নহে। তাহার দলে ঐরূপ ষড়যন্ত্রকারী দুশ্চরিত্র লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু আমীর হজরত মৗবিয়া (রাজিঃ)-এর জ্ঞাতসারে এরূপ পাপানুষ্ঠান কোনও ক্রমেই হয় নাই। বিশেষতঃ আমীর হজরত মৗবিয়া (রাজিঃ) জীবনে কখনও হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে কোনও রূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই। আবার মগিরাঃ-বিন্-শয়বাঃ (রাজিঃ), হজরত এমাম হাছন আলায়

হেচ্ছালামের পরলোক গমনের পরে, আমীর হজরত মৌবিয়া (রাজিঃ)-কে এযিদের 'অলী আহাদী' (যুবরাজত্ব) সম্বন্ধে মনোযোগী ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন ; তৎপূর্ব্বে তাঁহার মনে এরূপ খেয়ালও কখন উদয় হয় নাই।

মগিরাঃ-বিন্-শয়বাঃ (রাজিঃ), এযিদকে 'অলী আহাদী' অর্থাৎ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা সম্বন্ধে যেমন প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন ; সেই রূপে ইহা কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধেও বিশেষ রূপ উদ্যোগ-আয়োজন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। একার্য্যে তাঁহার ন্যায় আপ্রাণ চেষ্টা আর কেহই করিয়াছিলেন না। আমীর হজরত মৌবিয়া (রাজিঃ) মদীনাবাসী এবং হেজায্‌বাসীর বিরুদ্ধাচরণের সংবাদ মারওয়ান-বিন্-হকমের পত্রে জানিতে পারিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, মদীনাবাসীদিগকে কিরূপে স্বমতে আনয়ন করা যায় ; অর্থাৎ কিসে—কোন উপায়ে তাঁহারা এযিদের ভাবী খেলাফৎ সম্বন্ধে আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। এই সময় হঠাৎ সংবাদ আসিল যে, কুফার শাসনকর্ত্তা মগিরাঃ-বিন্-শয়বাঃ (রাজিঃ) প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইহা ৫১ একান্ন হিজরীর ঘটনা। মগিরাঃ-বিন্-শয়বাঃ (রাজিঃ)-এর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া হজরত মৌবিয়া (রাজিঃ), স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যেয়াদ-বিন্-আবু ছুফিয়ানকে বস্রার সঙ্গে কুফার শাসন কর্ত্তৃত্বও প্রদান করিলেন।

৫৮ হিজরীতে ওম্মোল-মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) পরলোক গমন করেন। 'জিন্নতল বকিয়' নামক মদীনার সুবিখ্যাত গোরস্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই মদীনার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা শঠ-চূড়ামণি মারোয়ান-বিন্-হকমের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন ; কারণ মারওয়ানের কার্য্য-কলাপ ভাল ছিল না। এই গ্রন্থের

স্থানে স্থানে মারওয়ান-বিন্-হকমের অন্যায় ও অসঙ্গত কার্য্যের একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। মারওয়ান একদিন ধোকাবাজীর সহিত মোছলেম-মাতাকে দাওত করিলেন; মারওয়ান পূর্ব্ব হইতেই একটি গর্ত্তের ভিতর তরবারি এবং ছুরা ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্রে খাড়া করাইয়া রাখিয়া ছিলেন; ওম্মোল মোমেনিন (রাঃ—আঃ) যখন তাহার গৃহে যাইতেছিলেন, তখন তাহার নিয়োজিত লোক, তাহাকে ধাক্কা দিয়া ঐ গর্ত্তে ফেলিয়া দিল; তিনি অতি বৃদ্ধা হইয়া ছিলেন; বয়ঃক্রম ৬৮ বৎসর হইতে ৭০ বৎসরের মধ্যে ছিল; তিনি এই ঘটনায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, (ইন্না-লিল্লাহে ওয়াইন্না এলায়হে রাযেউন)। দুঃখের বিষয়, আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), এরূপ ভীষণ দুষ্কার্য্য সম্বন্ধে মারওয়ানের প্রতি কোনও রূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন না; তাঁহার এই দুষ্কার্য্যের বিষয় অবশ্যই আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) অবগত হইয়াছিলেন।

৫৯ হিজরীতে স্বনামখ্যাত হাদীছ-বেত্তা মহাপণ্ডিত হজরত আবু-হোরেরাঃ (রাজিঃ) পরলোক গমন করেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, হে এলাহি! আমি তোমার নিকট তরুণ যুবকদিগের হুকুমত (রাজত্ব) ও ৬০ হিজরী হইতে পানাঃ (আশ্রয়) চাহিতেছি—অর্থাৎ ঐ দুইটি ব্যাপার যেন আমাকে দেখিতে না হয়। পরম করুণাময় আল্লাহ তালার দরগায় তাঁহার প্রার্থনা কবুল (গৃহীত) হইয়াছিল; অর্থাৎ তিনি ৬০ হিজরীর পূর্ব্বেই, আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর খেলাফতের শেষ ভাগে ৫৯ হিজরীতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

হজরত আমীর মৌবিয়া (রাজিঃ)-এর 'ওফাত' (পরলোক গমন)।

৬০ হিজরীর রজবমাসের প্রারম্ভে আমীর হজরত মৌবিয়া (রাজিঃ) পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ব্যারামের অবস্থায় যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, তাঁহার আসন্ন সময় উপস্থিত—জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার আর বেশী দিন বাকী নাই; তখন তিনি স্বীয় পুত্র এযিদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এযিদ ঐ সময় রাজধানী দামেস্কের বাহিরে কোথাও শিকারে কিংবা অভিযানে গমন করিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট 'কাছেদ' (দূত) রওয়ানা করা হইল; দূত গিয়া এযিদকে ডাকিয়া আনিল; সে পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, আমীর হজরত মৌবিয়া (রাজিঃ) তাহার দিকে 'মোখাতেব' হইয়া (লক্ষ্য করিয়া বা সম্বোধন করিয়া) ফরমাইলেন :—

" হে পুত্র! আমার 'ওছিয়ত' (অন্তিম-নির্দ্দেশ) মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, এবং আমার প্রশ্ন সমূহের জওয়াব দাও। এক্ষণে খোদা তা-লার ফরমান অনুযায়ী আমার মৃত্যুকাল আসন্ন। তুমি আমাকে বল, আমার পরে তুমি মোছলমানদিগের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে চাও।" উত্তরে এযিদ বলিল, "আল্লার কেতাব ও রছুলোল্লার 'পয়রবী' (পদানুসরণ) করিব।"

হজরত মৌবিয়া (রাজিঃ) বলিলেন, ছিদ্দিকী ছোন্নতের প্রতিও আমল করা চাই। কারণ তিনি 'মোরতেদ' (এছলাম ধর্ম্মত্যাগী)-দিগের সঙ্গে 'জঙ্গ' (যুদ্ধ—যেহাদ) করিয়াছিলেন; ঐ অবস্থায় তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; 'ওম্মত' (মোছলমান)-গণ তাঁহার উপর অত্যন্ত 'খোশ' (সন্তুষ্ট) ছিলেন

এযিদ বলিল, "তা নয়, কেতাব আল্লাহ্ (কোরআন) ছোন্নত রছুলোল্লার 'পয়রবী' (অনুসরণ) করাই যথেষ্ট।"

হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) আবার বলিলেন, হে পুত্র! হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর ও 'পয়রবী' (পদানুসরণ) করিবে; কারণ তিনি অনেক নূতন শহরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; সৈন্য দলকে মজবুৎ ও শক্তিশালী করিয়াছেন, আর যুদ্ধে বিজয়-লব্ধ 'মাল' (অর্থ ও সম্পত্তি) মোছলমানদিগের মধ্যে যথাযোগ্যরূপে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন।"

উত্তরে এযিদ বলিল, তা নয়, কেতাব আল্লাহ্ ও রছুলোল্লার পদানুসরণ করাই যথেষ্ট।

হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) আবার বলিলেন, "হে পুত্র! ওছমান গণী (রাজিঃ) 'ছিরত' (সদ্‌গুণাবলী)-এর প্রতি ও আমল করা চাই। কারণ, তিনি স্বীয় জীবনে লোকদিগকে নানাপ্রকারে উপকৃত করিয়াছেন; আর দাতব্য শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।"

এযিদ বলিল, "তা নয়, কেতাব আল্লাহ্ ও ছোন্নত রছুলোল্লার অনুবর্ত্তী হইয়া চলাই যথেষ্ট।"

এযিদের উক্তি শুনিয়া হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) বলিলেন, হে পুত্র! তোমার ঈদৃশ উক্তি দ্বারা আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তুমি আমার এই সকল উপদেশ পালন করিবে না। বরং আমার উপদেশের বিপরীতাচরণ করিবে। হে এযিদ! তুমি এই কথার উপর অহঙ্কার করিও না যে, আমি তোমাকে স্বীয় 'অলি-আহাদী' (উত্তরাধিকারী—স্থলবর্ত্তী—ভাবা খলিফা) নির্ব্বাচিত করিয়াছি; আর আমার অধিকার ভুক্ত সকল দেশের অধিবাসিগণ তোমার 'ফরমাবরদারী' (অধীনতা) একরার (স্বীকার) করিয়াছে। আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ) হইতে তোমার কোন আশঙ্কা নাই; কারণ তিনি পার্থিব সুখ-সম্পদের অভিলাষী নহেন

হোছেন বিন্-আলী (রাজিঃ)-কে এরাকবাসিগণ অবশ্যই তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিবে; তুমি যদি যুদ্ধে জয়ী হও; তবে কিছুতেই তাঁহাকে 'ক্বতল' (হত্যা) করিবে না। 'করাবত্' ও 'রেশ্তাদারীর' (আত্মীয়তার) খেয়াল রাখিবে। আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) ধূর্ত্ত শৃগালের ন্যায় চালবায্ লোক, উহাকে যদি যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করিতে পার, তাহাকে তবে 'ক্বতল' (হত্যা) করিবে। মক্কা ও মদীনার অধিবাসিদিগের প্রতি সর্ব্বদাই সদ্ব্যবহার করিবে। এরাকের অধিবাসিগণ যদি সর্ব্বদা শাসনকর্ত্তা বদলী করার জন্য 'ফরমায়েশ্' (অনুরোধ—আবেদন) করে, তবে সর্ব্বদাই তাহাদের মন রক্ষার জন্য শাসনকর্ত্তা বদলী করিবে। 'আহ্লে শাম' (শাম অর্থাৎ সিরিয়াবাসী)-দিগকে সর্ব্বদা আপনার 'মদদগার' (সাহায্যকারী) মনে করিবে; আর তাহাদের 'দোস্তীর' (বন্ধুত্বের) উপর ভরসা রাখিবে।"

ইহার পর এযিদ আবার মৃগয়ায় (শিকারে) চলিয়া গেল। হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতে লাগিল। অবশেষে ৬০ হিজরীর ২২শে রজব বৃহস্পতিবার দিন তিনি এই নশ্বর পৃথিবীর মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়া পরলোক গমন করিলেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না এলায়হে রাযেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি একজন অতি উপযুক্ত ও যোগ্যতম শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ খলিফা ছিলেন। তাঁহার খেলাফৎকালে মোছলমানদিগের বিজয়-স্রোত পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল।

হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট আঁ হজরত (ছালঃ)-এর কেশ ও 'নাখুন' (নখ) ছিল; তিনি মৃত্যুকালে ওছিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, এই পবিত্র কেশগুচ্ছ ও 'নাখুন' (নখ) মবারক কবরে আমার মুখ ও চক্ষের উপর বাঁধিয়া দিবে। জোহাক-বিন্-কয়েছ তাঁহার জানাযার

নমায্ পড়াইয়াছিলেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দামেশ্ক্ শহরের "বাবে জাবিয়াঃ" ও "বাবে ছগীর" এর মধ্যেবর্ত্তী স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। হজরত আবদুর রহমান-বিন্-আবিবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর কিছু দিন পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) সুদীর্ঘ ২০ বৎসর কাল বিশাল মোছলেম-জগতের উপর পূর্ণ প্রভাবের সহিত আধিপত্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে কোনও শত্রুই জয়ী হইতে পারেন নাই। মোছলমানদিগের মধ্যে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন না; হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) খেলাফতের দাবী পরিত্যাগ করাতে, আর কেহই খেলাফতের জন্য দাব করেন নাই। তাঁহার খেলাফতের প্রথম আধিপত্য কালে আশ্রায় মোবাশ্বরা দিগের মধ্যে পারস্য-বিজয়ী মহাবীর হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি-ওকাছ (রাজিঃ) জীবিত ছিলেন; তিনিও তাঁহার হস্তে বয়্য়েত করেন। এমাম হোছেন (রাজিঃ) প্রথমে বয়্য়েত না করিলেও, একটু পরেই বয়্য়েত করেন। হজরত আবদুর রহমান-বিন্-আবিবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ গণ তাঁহার হস্তে বয়্য়েত করিয়াছিলেন। মেছের-বিজয়ী মহাবীর হজরত ওমর বিনল্-আছ (রাজিঃ) ত সফিন যুদ্ধকাল হইতে তাঁহার প্রধান পরামর্শ-দাতা ও প্রধান মন্ত্রী স্বরূপ ছিলেন; পরিশেষে মেছেরের গবর্ণর হন; এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যেয়াদ-বিন্-আবু ছুফিয়ান একজন রাজনীতিবিদ মহা প্রতাপশালী শাসনকর্ত্তা ও সুবিখ্যাত বীরপুরুষ

ছিলেন; প্রথমে তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর অধীনে বস্রা এবং সমগ্র পূর্ব্ব দেশের প্রধানতম শাসনকর্ত্তা বা রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার শাহাদৎ প্রাপ্তির পর আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) তাঁহাকে বিশেষ কৌশলে বশীভূত করেন। হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) মহাসৌভাগ্য-শালী পুরুষ ছিলেন; তিনি উপযুক্ত মন্ত্রী, উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা, উপযুক্ত সেনাপতি ও খ্যাতনামা বীরপুরুষদিগের সাহায্য লাভে রাজ্য শাসনে এবং এছলামের গৌরব রক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে সফলকাম হইয়াছিলেন। সমুদয় প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধেই তিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার আধিপত্য কালে এছলামের বিজয় কার্য্য অতি গৌরবান্বিত রূপে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বেদিকে এসিয়ায়, উত্তর দিকে এসিয়ায় এবং পশ্চিম দিকে আফ্রিকায় তাঁহার রাজ্য বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল। তিনি এছলামের গৌরব সর্ব্বতোভাবে বজায় রাখিয়া ছিলেন। তখন মদীনা-তৈয়বাঃ ও কুফার পরিবর্ত্তে মহানগরী দামেশ্‌কই মোছলমান-জগতের মহারাজধানী ও কেন্দ্র স্থানে পরিণত হইয়াছিল। অর্থাগমের আশায়, প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায়, মোছলেম-জগতের বহু বিদ্বান্ ও প্রতিভা সম্পন্ন লোক দামেশ্‌কে সমবেত হইয়াছিলেন। আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) আত্মীয়তার অনুরোধে কুচক্রী মারওয়ান-বিন্-হকমকে মদীনার শাসন-কর্ত্তা করিয়াছিলেন। খেলাফতের শেষভাগে যেয়াদ-পুত্র দুর্দ্দান্ত ওবায়-দুল্লাহ্‌কে বস্রার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। অবশেষে অপত্য-স্নেহের বশীভূত হইয়া বিলাসী, দুশ্চরিত্র, মদ্যপায়ী, অহঙ্কারী এযিদকে মোছলেম-জগতের খলিফা নির্ব্বাচন করিলেন। যাঁহার প্ররোচনা ও উৎসাহেই তিনি এই কার্য্য করিয়া থাকুন না কেন, সেই অত্যাচারী পুত্রের দুষ্কার্য্যের ফলে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর বংশধরগণ এক প্রকার নির্ম্মূল হইয়া

গিয়াছিলেন ; ইহার দ্বারা এমন একটি ভীষণ অত্যাচার-মূলক শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল, জগতে যাহার তুলনা নাই ; এবং আজ তের শত বৎসর পর্য্যন্ত মোছলমান জগত সেই শোচনীয় বিষাদ-কাহিনী স্মরণ করিয়া বৎসর বৎসর কঠোর ভাবে শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) একজন প্রধান ছাহাবাঃ, বিদ্বান্ ও জ্ঞানী পুরুষ হইয়া খলিফা নির্ব্বাচনের পবিত্র প্রণালী ভাঙ্গিয়া দিলেন। সেই হইতে খেলাফৎ বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়াইল ; আর তাঁহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে উপকৃত জ্ঞাতি-ভ্রাতা মারওয়ান-বিন্-হকম, তাঁহার বংশধরের হস্ত হইতে খেলাফৎ কাড়িয়া লইয়া, তাঁহার বংশের অস্তিত্ব এক প্রকার মুছিয়া ফেলিল।

এযিদ বিন্ হজরত মাবিয়া।

এযিদের অপর নাম আবু খালেদ ; ২৫ কিংবা ২৬ হিজরীতে, হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালের শেষভাগে সে জন্ম গ্রহণ করে ; তখন হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) শাম (সিরিয়া) এবং পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহার মাতার নাম মিছন-বিন্তে বহদল ছিল, তিনি বনু-কলব সম্প্রদায়ের মেয়ে ছিলেন। এযিদ খুব মোটা তাযা (স্থূলাঙ্গ), এবং তাহার শরীর বহু লোম বিশিষ্ট ছিল। এযিদ জন্ম-গ্রহণ করিয়া 'হুকুমত' ও 'এমারত' এর বেষ্টনী মধ্যে ও মহা আড়ম্বরের ভিতরে থাকিয়া লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) একজন বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি স্বীয় একমাত্র প্রিয়পুত্র এযিদের শিক্ষাকল্পে বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শনে কিছুমাত্র ত্রুটি করিয়াছিলেন না। তাহাকে একজন আদর্শ চরিত্র পুরুষ রূপে গঠন করিতে চেষ্টা বিশেষ ভাবে পাইয়াছিলেন। কারণ তিনি স্বয়ং সমগ্র মোছলেম-জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। পৃথিবীতে সে সময় তাঁহার ন্যায় মহা প্রতাপশালী বাদশাহ আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে আট্লাণ্টিক মহাসাগর হইতে পূর্ব্বে হিন্দুস্তান ও তুর্কীস্তানের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি এযিদকে দুই একবার "আমীর-হজ্জ্" নিযুক্ত করিয়াও মক্কায় পাঠাইয়াছিলেন। সেনাপতির পদ ও প্রদান করিয়াছিলেন। রোমক রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল মহানগরী আক্রমণ ও অবরোধ কালে এযিদ একদল সৈন্যের সেনাপতি ছিল। এযিদ বড়ই মৃগয়া-প্রিয় ছিল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর মৃত্যুকালে এযিদ দেমেশ্কে উপস্থিত ছিল না; মৃগয়া উপলক্ষে রাজধানী হইতে অনেক দূরে ছিল। কয়েক দিন পরে আসিয়া পিতার কবরের উপর জানাযার নমায্ পড়িয়াছিল। আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর জীবিত অবস্থায়ই উহার জন্য স্বীয় বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র হইতে বয়্য়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন; উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব-চরিত্র, বিলাসিতা, ধর্ম্মভাবের অভাব প্রভৃতি কারণে অধিকাংশ মোছলমান উহার উপর নারাজ ছিলেন। তাঁহারা উহাকে ভয় করিতেন বটে, কিন্তু ভক্তি করিতেন না। মদীনা-মনুওরার তদানীন্তন ধার্ম্মিক ও খ্যাতনামা পুরুষ (ছাহাবাঃ কারাম)-গণও এযিদের নামে বয়্য়েত করিতে স্পষ্ট ভাবেই অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষে স্বীয় জীবিত অবস্থায়, এযিদের নামে বয়্য়েত গ্রহণ করা বিষম ভ্রমাত্মক কার্য্য ছিল; অনেকেই এই ভ্রমকে "মহব্বত পেদরী" (অপত্য-স্নেহ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আমরাও তাহা স্বীকার করি; কিন্তু অপত্য-

স্নেহের বশীভূত হইয়া কেহ অন্যায়-অসঙ্গত কার্য্য করিলে তাহা কি সমালোচনা-বহির্ভূত হইতে পারে ? মহামান্য ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সমালোচনা করা পরবর্ত্তী মোছলমানদিগের পক্ষে বে-আদবী হইলেও, অতি বড় ভ্রম-প্রমাদ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক হিসাবে কিরূপে নীরব থাকা যায়? অপত্য-স্নেহ কার না আছে? ১ম খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) স্বীয় পুত্রের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম পুরুষ হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-কে স্বীয় উত্তরাধিকারী বা পরবর্ত্তী খলিফা নির্ব্বাচন করিলেন; ২য় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), ৬ জন প্রধান পুরুষের হস্তে খলিফা-নির্ব্বাচনের ভারার্পণ করিয়া গেলেন; আর স্বীয় পরম ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্ (রাজিঃ) কে খলিফা নির্ব্বাচন করিতে দৃঢ়তার সহিত নিষেধ করিয়া গেলেন; ৩য় খলিফা হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ) অকস্মাৎ শহীদ হওয়াতে খলিফা নির্ব্বাচনের অবসর প্রাপ্ত হন নাই; ৪র্থ খলিফা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বীয় উপযুক্ত পুত্র হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে ভাবী খলিফা মনোনীত না করিয়া, মোছলমানদিগকে উপযুক্ত খলিফা নির্ব্বাচন করিতে বলিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন; কিন্তু হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) স্বীয় দুষ্ক্রিয়াশীল অযোগ্য পুত্রকে মোছলমান জগতের ভাবী খলিফা নির্ব্বাচন জন্য মোছলমানদিগের নিকট হইতে বয়্য়েত গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। পক্ষান্তরে তিনি এছলামের পবিত্র গণতন্ত্র-প্রথা, খলিফা নির্ব্বাচন ও বয়্য়েত গ্রহণের পবিত্র নিয়ম চিরদিনের জন্য বন্ধ করিলেন। তিনি শাসনকার্য্যে যেরূপ দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পবিত্র এছলাম ধর্ম্ম প্রচার ও এছলামি ধর্ম্মের গৌরব-রক্ষায় এবং নব নব দেশ বিজয়ে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র

মোসলমান জগতের তিনি সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার খলিফা নির্ব্বাচন কার্য্যে মোছলমানদিগের যে ক্ষতি সাধন হইয়াছিল, তাহা অসাধারণ, সে ক্ষতির আর পূরণ হইল না। তাঁহার অযোগ্য উত্তরাধিকারী নানাপ্রকার দুষ্কার্য্য করিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করিল; তাঁহার বংশধরগণ খেলাফৎ লাভে চির দিনের জন্য বঞ্চিত হইলেন। তাঁহার বংশের সন্ধান ও আজ দুনিয়াতে খুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এমন কি, "এযিদ" নামের উপর মোছলমানদিগের এমন ঘৃণা জন্মিয়াছে যে, কেহ স্বীয় পুত্র বা আত্মীয়-স্বজনের ঐ নাম রাখিতে চান না। এযিদ নামের উল্লেখ হইলেই লোকের মনে একটা নির্দ্দয় নির্ম্মম পাষণ্ডের কল্পনা হয়। আজ দামেশ্‌ক্ নগরে খুজিয়াও এযিদের কবর পাওয়া যায় না। লোকে ঘৃণাভরে এখনও তাহার কবরের উদ্দেশ্যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে।

আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর পরলোক গমনের পর 'আহ্‌লে শাম' (সিরিয়ার অধিবাসি)-গণ ত বিনা আপত্তিতেই এযিদের হস্তে বয়্‌য়েত করিল; অন্যান্য ছুবার লোকেরাও এযিদের নামে স্থানীয় শাসনকর্ত্তা দিগের হস্তে বয়্‌য়েত করিতে বাধ্য হইল। ছোলতানতের দাপটে ও ভয়ে কেহ বয়্‌য়েত করিতে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিলেন না। এযিদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও গবর্ণরদিগের নামে আদেশ-লিপি পাঠাইল যে, লোকের নিকট হইতে আমার নামে বয়্‌য়েত গ্রহণ কর। এই সময় অলিদ-বিন্-য়োকবাঃ-বিন্-আবু-ছুফিয়ান মদীনাঃ-তৈয়বার ও নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ) কুফার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই উভয় শাসনকর্ত্তাই 'নেক-তবিয়ত' (সদাশয়) এবং "ছোলেহ্ জো' (শান্তি-প্রিয়) গবর্ণর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় কঠোরতা

ও নির্দ্দয়তা ইঁহাদের মধ্যে আদৌ ছিল না। যখন এযিদের আদেশ-লিপি মদীনার শাসনকর্ত্তা অলিদ-বিন্-য়োক্‌বার নিকট পঁহুছিল; তিনি মদীনার প্রধান প্রধান লোকদিগকে (যাঁহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক ছাহাবাঃ কারাম [রাজিঃ] ও ছিলেন) আহ্বান করিয়া এযিদের প্রেরিত পত্র খানি পড়িয়া শুনাইলেন। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ), আমীর মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পরলোক গমন সংবাদ শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ, এবং তাঁহার মগ্‌ফেরাত্‌ (পরলৌকিক মঙ্গল) জন্য দোওয়া করিলেন; আর অলিদ কে বলিলেন, আমার বয়্‌য়েত গ্রহণ জন্য তাড়াতাড়ি করিবেন না। আমি বুঝিয়া-শুঝিয়া স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিব। মদীনার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা কুচক্রী ও কুটিল চূড়ামণি মারওয়ান-বিন্-হকম এ সময় শাসনকর্ত্তার পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া, নব-নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা অলিদের 'মশির' (মন্ত্রী) স্বরূপ কাজ করিতেছিল; সে অলিদকে পরামর্শ দিল যে, এমাম হোছেন (রাজিঃ) হইতে এখনই বয়্‌য়েত গ্রহণ করা চাই; বয়্‌য়েত না করা পর্য্যন্ত তাঁহাকে এখান হইতে যাইতে দেওয়া উচিত নহে। এস্থলে বোধ হইতেছে, মারওয়ানের কার্য্য-কলাপে অসন্তুষ্ট হইয়া আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) তাহাকে শাসনকর্ত্তার পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া, নব নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অলিদের মন্ত্রী স্বরূপ নিয়োজিত করিয়াছিলেন; সে টুকুও নিতান্ত আত্মীয়তার খাতেরেই করা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, শাসনকর্ত্তা অলিদ, মারওয়ানের পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না; হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর বয়্‌য়েত পর দিবসের জন্য 'মুলতবি' রাখিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্‌-বিন্-যোবের (রাজিঃ) শাসনকর্ত্তা অলিদের নিকট আসিলেন না; পুনরায় ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলে তিনি যাইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন; এবং একরাত্রির অবকাশ চাহিয়া পাঠাইলেন;

তাঁহাকে ও অলিদ এক রাত্রির অবকাশ দিলেন। অতঃপর হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) রাত্রির সুযোগে স্বীয় পরিবারবর্গ সহ মদীনা হইতে বাহির হইয়া গেলেন, এবং মদীনা হইতে মক্কা গমনের প্রকাশ্য পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অপর কোনও 'গয়ের মারুফ্' (অপ্রসিদ্ধ—অপ্রকাশ্য) পথে দ্রুতগতি মক্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পর দিন তাঁহার মদীনা ত্যাগের সংবাদ শুনিয়া শাসনকর্ত্তা অলিদ ও মারওয়ান ৩০ জন সৈন্য সহ তাঁহার অনুসরণে বাহির হইলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। অকৃত-কার্য্য হইয়া সন্ধ্যাকালে তাঁহারা মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহারা সমস্ত দিন হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর অনুসরণে ব্যাপৃত ছিলেন; এজন্য হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) সম্বন্ধে মনোযোগ প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন না, সুতরাং পরবর্ত্তী রাত্রিতে তিনিও সুযোগক্রমে সপরিবারে মক্কাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; পরদিন এমাম ছাহেবের মদীনা ত্যাগের সংবাদ প্রচার হইলে অলিদ বলিলেন, আমি এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর 'তায়াক্কব' (পশ্চাদ্ধাবন) করিব না; হইতে পারে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং তাঁহার শোণিতে আমার হস্ত রঞ্জিত হইবে। এরূপ কার্য্য করা আমি কোনও ক্রমেই সঙ্গত মনে করি না। উপরোক্ত দুই মহাত্মার মদীনা ত্যাগের পর অলিদ-বিন্-ওেকবাঃ মদীনার অবশিষ্ট অধিবাসিগণের নিকট হইতে এযিদের নামে বয়্য়েত গ্রহণ করিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ) হইতে কোনও 'খৎরাঃ' (আশঙ্কা) ছিল না, কারণ তিনি স্বীয় মহামান্য পিতার নির্দ্দেশ ক্রমে কখনও খেলাফতের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। আবার এযিদ ও লিখিয়া পাঠাইয়াছিল যে, যদি হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ) বয়্য়েত না করেন, তবে তজ্জন্য তাঁহাকে বাধ্য করিবে না; সুতরাং

হজরত আবত্নল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ)-কে বয়্য়েত করিবার জন্ত কেহ অনুরোধ করিলেন না। ইহার কয়েক দিন পরে হজরত আবত্নল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ) ও হজরত আবত্নল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) মদীনা হইতে মক্কায় চলিয়া গেলেন। হারেছ বিন্-হর (রাজিঃ)-কে এযিদ মক্কার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছিল। হজরত আবত্নল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) একই সময় মক্কা-মোয়াজ্জমায় উপস্থিত হইলেন; ইঁহাদিগকে দেখিবামাত্র মক্কার অন্ততম 'শরীফ্' (সম্ভ্রান্ত) পুরুষ আবত্নল্লাহ্-বিন্-ছফ্ওয়ান-বিন্-ওম্মিয়া হজরত আবত্নল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্য়েত করিলেন; ইহার পর মক্কার দুই হাজার সম্ভ্রান্ত ও প্রধান প্রধান লোকও তাঁহার হস্তে বয়য়েত করিলেন। হজরত আবত্নল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ), এযিদ কর্তৃক প্রেরিত শাসনকর্ত্তা হারেছ (রাজিঃ)-কে ধৃত করিয়া কারাগারে বন্দী অবস্থায় রাখিলেন, এবং মক্কার শাসনকর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) মক্কায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি হজরত আবত্নল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্য়েত করিলেন না; হজরত আবত্নল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) ও তাঁহার বা তাঁহার বংশের অপর কাহারও নিকট হইতে বয়্য়েত গ্রহণ করিলেন না; কিংবা তাঁহা-দিগকে বয়্য়েত করিবার জন্ত অনুরোধও করিলেন না। এইরূপে হজরত আবত্নল্লাহ্-বিন্-ওম (রাজিঃ) ও হজরত আবত্নল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) যখন মক্কায় আগমন করিলেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতেও বয়্য়েত গ্রহণ করিলেন না বা বয়্য়েত গ্রহণ জন্ত অনুরোধও করিলেন না; আবত্নল্লাহ্-বিন্ যোবের (রাজিঃ) অধিকাংশ সময় খানাহ্ কাবায় (পবিত্র কাবাগৃহ) এবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করিতেন। এই চারি মহাত্মা ও হজরত নবী করিম (ছালঃ)-এর বংশধর অপর লোক ব্যতীত, মক্কার অন্তান্ত

জন-সাধারণ সকলের নিকট হইতেই হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) বয়্য়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ), হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ এবং যুক্তি-পরামর্শ করিতেন। অনুমান করা হয়, হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) নিজে খলিফা হইবার জন্য লোকের নিকট হইতে বয়্য়েত গ্রহণ করিতেন না, বরং এই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিতেন যে, অসচ্চরিত্র, সুরাপায়ী, ব্যভিচারী এযিদের নামে যেন কেহ বয়্য়েত না করে; অর্থাৎ তাহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার না করা হয়। আর যে পর্য্যন্ত সাধারণ নির্ব্বাচনানুসারে, বৈধ উপায়ে, সর্ব্ববাদী-সম্মত রূপে কেহ খলিফা নির্ব্বাচিত না হন, তৎকাল পর্য্যন্তের জন্য শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনার্থে তিনি মক্কা-মোয়াজ্জমায় সাময়িক শাসন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে এ বিষয় অপ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল যে, হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-কে কেন মক্কার শাসনকর্ত্তা ও খলিফা বলিয়া স্বীকার করা হয়। তাঁহার মনের গতি ক্রমেই এ সম্বন্ধে প্রতিকূল হইতে থাকে; এজন্য অবশেষে তিনি এবং তাঁহার 'আহ্লে-খান্দান' (স্ববংশীয় লোক), কাবা-গৃহে, হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর এমামতিতে নমায্ পড়িতে যাইতেন না।

ওদিকে আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর মদীনা হইতে চলিয়া যাওয়া, এবং মদীনা-তৈয়বাবাসী অপর সকল লোক হইতে বয়্য়েত গ্রহণের সংবাদ মারওয়ান-বিন্-হকম, এযিদের নিকট লিখিয়া পাঠাইল। এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রেই এযিদ তৎক্ষণাৎ অলিদ-বিন্-য়োকবাঃ কে পদচ্যুত করিয়া, তাঁহার স্থলে য়োমরু-বিন্-ছয়ীদ-বিন্-আছকে মদীনার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইল।

ওমরু-বিন্-ছয়ীদ মদীনায় আসিয়া দৃঢ়হস্তে মদীনার শাসনভার ধারণ করিলেন; ইতিপূর্ব্বে তথায় কিছু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলেও, নূতন শাসনকর্ত্তার দৃঢ় শাসনে সে চাঞ্চল্য দুর হইল। অলিদ-বিন্-য়োক্ বাঃ মদীনাঃ হইতে দেমেশ্‌কে এযিদের নিকট চলিয়া গেলেন। ওদিকে হজরত আবহুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) কর্ত্তৃক মক্কায় আধিপত্য বিস্তার এবং এযিদের নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা হারেছকে বন্দী করার সংবাদ, হারেছ-বিন্-খালেদ পত্র লিখিয়া এযিদের নিকট প্রেরণ করিলেন। হারেছ-বিন্-খালেদ মক্কায় বাস করিতেছিলেন বটে, কিন্তু ভয়ে ঘরের বাহির হইতেন না। মক্কার অবস্থা অবগত হইয়া এযিদ মদীনার শাসনকর্ত্তা ওমরু-বিন্-ছয়ীদকে লিখিয়া পাঠাইল, তুমি সসৈন্যে মক্কায় যাইয়া আবহুল্লা-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-কে 'গেরেফ্‌তার' (বন্দী) কর, এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। ওমরু একজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে একদল প্রবল সৈন্য মক্কায় পাঠাইলেন; হজরত আবহুল্লাহ্-বিন্-যোবেরের সঙ্গে তাহার ভীষণ যুদ্ধ হইল; যুদ্ধে মদীনা হইতে আগত সেনাদল পরাস্ত ও তাহাদের সেনাপতি, হজরত আবহুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দী হইল।

কুফাবাসিগণ হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর জীবিত অবস্থায়ই হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে গোপনে পত্র ব্যবহার করিতে ছিল, এবং বারংবার এই অনুরোধ জানাইতেছিল যে, আপনি সত্বর কুফায় চলিয়া আসুন, আমরা আপনার হস্তে বয়্‌য়েত করিব। কুফাবাসিগণের এই গোপনীয় কার্য্য ও ষড়যন্ত্রের বিষয় আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) ও অবগত ছিলেন। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) কুফাবাসীদিগের স্বভাব চরিত্র ও কার্য্য-কলাপের বিষয় বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন, তাঁহার চক্ষের উপর কুফাবাসিগণ তাঁহার পরম শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ মাজেদ

হজরত আলী মর্ত্তুজা (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে, এবং পরে তাঁহার নিজের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করিয়া ছিল, তাহাতে তাহাদের উপর বড় এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর একটু মাত্র বিশ্বাস ও আস্থা ছিল না ; এজন্যই তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বীয় পরম স্নেহাস্পদ সরলচেতাঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে 'ওছিয়েত' করিয়া গিয়াছিলেন যে, তোমাকে কুফাবাসিদিগের 'ফেরেবে' পড়া চাই না। ওদিকে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)ও মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র এযিদকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া গিয়াছিলেন যে, কুফাবাসিগণ এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে অবশ্যই তোমার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে বাধ্য করিবে ; যদি এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়,—এবং তুমি তাঁহার উপর যুদ্ধে জয়ী হও, তবে তাঁহাকে কোনও ক্রমেই হত্যা করিবে না ; এদিকে মক্কার শাসন কর্ত্তৃত্ব হজরত আবদুল্লাহ্ বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর হস্তগত হওয়াতে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর মনোযোগ কুফার দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। কুফায় যখন তথাকার শাসনকর্ত্তা নওমান-বিন-বশির (রাজিঃ)-এর নিকট এযিদের পত্র পঁহুছিল ; এবং হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পরলোক গমন সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল ; তখন বনু-ওম্মিয়ার ভক্ত মণ্ডলী তৎক্ষণাৎ এযিদের খেলাফৎ স্বীকার করিয়া এযিদের নামে শাসনকর্ত্তার হস্তে বয়্য়েত করিল। আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর ভক্ত মণ্ডলী—যাহারা ইতিপূর্ব্বে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে কুফায় আহ্বান করিবার জন্য 'কোশেশ' (চেষ্টা) করিতেছিল, তাহারা এযিদের নামে বয়্য়েত করিতে বিলম্ব করিল ; এবং ছোলায়মান-বিন্-ছুরদের গৃহে সমবেত হইল। সেখানে পরস্পর পরামর্শ করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিল যে, এযিদকে কিছুতেই খলিফা স্বীকার করা হইবে না ; আর হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-

কে কুফায় আহ্বান করা হউক। তাহাদের মধ্যে এইরূপ 'খুফিয়া' (গোপনীয়) পরামর্শ হইতেছিল, ইতিমধ্যে তাহারা সংবাদ পাইল যে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) মদীনা হইতে মক্কায় চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু মক্কাবাসিগণ হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্য়েত না করিয়া, হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্য়েত করিয়াছেন; হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) এযাবৎ হজরত আবদুল্লাহ্ বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্য়েত করেন নাই। তখন তাহারা মনে করিল, এইবার হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) তাহাদের আহ্বানে নিশ্চয়ই কুফায় আগমন করিবেন। সুতরাং তাহারা নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর নামে পত্র লিখিলেন,—

"আমরা আপনার 'ওয়ালেদ বোযর্গওয়ার' এবং আপনার পরম ভক্ত— আপনাদের নামে জীবনোৎসর্গকারী এবং বনু-ওম্মিয়ার শত্রু। আমরা সর্ব্বদাই আপনার ওয়ালেদ মাজেদের 'হেমায়েত' (সহযোগিতা— সাহায্য) করিয়া, তাঁহার সাহায্যকারী রূপে হজরত তাল্হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি; আমরা ছফিন-প্রান্তরে যুদ্ধক্ষেত্র গরম করিয়াছিলাম। 'শামী' (সিরিয়াবাসী)-দিগের 'দাঁত খাট্টা' করিয়া দিয়াছিলাম। আমরা এক্ষণে আপনার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি এই পত্র পাওয়া মাত্র কুফাভিমুখে রওয়ানা হইবেন। আপনি এখানে আসিলে আমরা শাসনকর্ত্তা নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ)-কে 'কতল্' (হত্যা) করিয়া, কুফা নগরী আপনার হস্তে অর্পণ করিব। কুফা ও এরাকে ১ লক্ষ যোদ্ধ্ পুরুষ 'মওজুদ' (বর্ত্তমান) আছে; উহারা সকলেই আপনার হস্তে বয়্য়েত করিতে প্রস্তুত। আমরা সকলে আপনাকে খেলাফতের 'হক্দার' (ন্যায্য অধিকারী) বলিয়া মনে করি; এবিদ আপনার 'মোকা-

বেলায়' (সম্মুখে) কোনও ক্রমেই খেলাফতের দাবী করিতে পারে না। এক্ষণে মহা সুযোগ উপস্থিত, আপনি এখানে আসিতে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিবেন না। আমরা এযিদকে হত্যা করিয়া আপনাকে 'আলমে এছলামের' (মোছলেম-জগতের) একমাত্র খলিফা পদে অভিষিক্ত করিতে চাই। আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এযিদের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ নওমান বশির (রাজিঃ)-এর পশ্চাতে জুমার নমায পড়া ও ছাড়িয়া দিয়াছেন। কারণ, আমরা এমামতের 'মস্তহক' (হক্‌দার—অধিকারী) আপনাকে এবং আপনার 'নায়েব' (প্রতিনিধি) দিগকে মনে করি।"

হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর নিকট মক্কায় এই 'মজমুনের' (মর্ম্মের) পত্র ক্রমান্বয়ে আসিতে লাগিল। ইহাতে তাঁহার মনে কুফা-বাসীদিগের প্রতি বিশ্বাস জন্মিল। তিনি অবশেষে এই কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন যে, প্রথমে আমার একজন প্রতিনিধি কুফায় পাঠান উচিত। তদনুসারে তিনি স্বীয় 'চাচ্চাযাদ ভাই' (পিতৃব্যপুত্র) মোছলেম-বিন্‌-আকিল (রাজিঃ)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইঁনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐ আকিল (রাজিঃ)-এর পুত্র—যিনি ভ্রাতা খলিফা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সহিত মনোবাদ করিয়া আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট চলিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মোছাহেব ও অন্যতম মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছিলেন ; আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট হইতে তিনি উচ্চ বৃত্তি লাভ করিতেন। সম্ভবতঃ পিতার মৃত্যুর পর ইঁহারা মদীনায় চলিয়া আসিয়াছিলেন ; আর বর্ত্তমান সময়ে ইঁনি হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন। এমাম ছাহেব (রাজিঃ), ভ্রাতা মোছলেম (রাজিঃ)-কে ফরমাইলেন, ভ্রাতাঃ! আপনি আমার প্রতিনিধি রূপে কুফায় যান ; এবং গুপ্তভাবে

গমন পূর্ব্বক সঙ্গোপনে গিয়া সেখানে বাস করুন; আর আমার নামে লোকদিগের নিকট হইতে বয়্য়েত গ্রহণ করিতে থাকুন। যে সকল লোক আপনার হস্তে আমার নামে বয়্য়েত করিবে, তাহাদের সংখ্যা ও তন্মধ্যে প্রধান প্রধান লোকের নামের তালিকা, পত্রযোগে আমার নিকট পাঠাইবেন। আপনি আপনাকে গোপন রাখিতে বিশেষ রূপে চেষ্টা পাইবেন। আর যাহারা বয়্য়েত করিবে, তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিবেন, আমি যে পর্য্যন্ত সেখানে গিয়া না পঁহুছি, তৎকাল পর্য্যন্ত যেন তাহারা কোনও রূপ যুদ্ধ-হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত না হয়। তদনুসারে হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্- যোবের (রাজিঃ) যাহাতে জানিতে না পারেন, এইরূপ সতর্কতার সহিত হজরত মোছলেম (রাজিঃ) কুফা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গিয়া তাঁহার মনে এমন এক ভাবের উদয় হইল যে, তিনি হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে পত্র লিখিলেন, ভ্রাতঃ! আমাকে এই কার্য্যের পরিণাম ভাল বোধ হইতেছে না; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন; আমার পরিবর্ত্তে অন্য কোন ও লোককে কুফায় পাঠাইয়া দিন। পত্রোত্তরে এমাম ছাহেব (রাজিঃ) লিখি-লেন, আপনি 'বোয্দেলী' (সাহস হীনতা—কাপুরুষতা) পরিহার করিয়া কুফায় গমন করুন। অগত্যা হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল কুফায় রওয়ানা হইলেন। তিনি কুফায় পঁহুছিয়া মোখ্তার-বিন্-ওবেদার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ 'শইয়ানে আলী' (হজরত আলী [কঃ—ওঃ]-এর ভক্ত মণ্ডলী)-এর মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়াতে, দলে দলে লোক আসিয়া হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর নামে, হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্রেত হইতে লাগিল। প্রথম দিনেই ১২ হাজার লোক বয়্য়েত করিল। হজরত মোছলেম (রাজিঃ), হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে মঙ্গল মতে কুফায় পঁহুছার সংবাদ সহ কুফাবাসিগণের বয়্য়েত করিবার অবস্থা লিখিয়া পাঠাইলেন; এবং

ইহাও লিখিলেন যে, প্রথম দিনেই ১২ হাজার কুফাবাসী আপনার নামে আমার হস্তে বয়্য়েত করিয়াছে; তন্মধ্যে ছোলতান-বিন্-ছরদ, মছিব-বিন্-নাজিয়াঃ, রকাতাঃ-বিন্-শদাদ, হানী-বিন্-মরুয়াঃ প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোক সকলও আছেন। কয়েছ ও আবদুর রহমান নামক দুই ব্যক্তি এই পত্রখানি লইয়া হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর খেদমতে মক্কা শরীফে গমন করিল। এই পত্র পাঠ করিয়া হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম বড়ই আনন্দিত হইলেন; এবং পত্র বাহক দ্বয়কে তৎক্ষণাৎ কুফাভিমুখে রওয়ানা করিয়া দিলেন; তৎসঙ্গে হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-কে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, আমি অতি সত্বরেই কুফায় পঁহুছিতেছি। এক্ষণে হজরত এমাম হোছেন আলায় হেচ্ছালামের মনে এই ধারণা উপস্থিত হইল যে, বস্রায় ও ওয়ালেদ মাজেদ মরহুমের বহুসংখ্যক ভক্ত এবং অনুরক্ত লোক আছে; তাহারাও অবশ্যই আমার নামে বয়্য়েত করিবে। তদনুসারে স্বীয় একজন 'মোয়াতামদ' (বিশ্বস্ত) লোক, বস্রায় আথফ-বিন্-মালেক এবং বস্রার অন্যান্য 'শোরফার' (সম্ভ্রান্ত লোকের) নিকট পত্রসহ পাঠাইলেন। এই সকল পত্রে লিখিত ছিল, আমার নামে বয়্য়েত করিয়া আপনাদিগকে অনতিবিলম্বে কুফায় পঁহুছান চাই।

কুফায় যখন মোছলেম-বিন্-আঁকিল (রাজিঃ)-এর পঁহুছার ও লোকদিগের নিকট হইতে বয়্য়েত গ্রহণের সংবাদ সাধারণ ভাবে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল, তখন এযিদ-ভক্ত কুফাবাসী আবদুল্লাহ্-বিন্-মোছলেম আল্-খজরমী, শাসনকর্ত্তা নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, হে আমির! খলিফার কাজে এরূপ 'ছুছ্তি' (শৈথিল্য) প্রদর্শন করা উচিত নহে। আজ কয়েক দিন হইল, মোছলেম-বিন্-আঁকিল (রাজিঃ) কুফায় আসিয়া লোকদিগের নিকট

হইতে (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ)-এর নামে খেলাফতের বয়্য়েত গ্রহণ করিতেছেন, আপনার পক্ষে কর্ত্তব্য এই যে, মোছলেম (রাজিঃ)-কে কতল করেন, কিম্বা বন্দী করিয়া খলিফা এযিদের নিকট পাঠাইয়া দেন। আর যাহারা বয়্য়েত করিয়াছে, তাহাদের প্রতি যথোচিত দণ্ড বিধান করেন। উত্তরে শাসনকর্ত্তা নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ) বলিলেন, ঐ সকল লোক যে কার্য্য আমা হইতে গোপন রাখিয়া করিতেছে, আমি তাহাদের সেই কার্য্য প্রকাশ করা 'মোনাছেব' (কর্ত্তব্য) বলিয়া বোধ করি না। যে পর্য্যন্ত তাহারা প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর না হয়, তত্তাবৎ কাল পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগকে আক্রমণ করিব না। আবদুল্লাহ্ এই কথা শুনিয়া শাসনকর্ত্তার দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং তৎক্ষণাৎ নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র এযিদকে লিখিল ঃ—

" মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ) কুফায় আসিয়া (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ)-এর নামে লোকের নিকট হইতে বয়্য়েত গ্রহণ করিতেছেন; আর বহুসংখ্যক লোক তাঁহার হস্তে বয়্য়েত করিতেছে। (হজরত এমাম) হোছেন (রাজিঃ) ও সত্বরে কুফায় আসিবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শাসনকর্ত্তা নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ) এ বিষয়ে বড়ই দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতেছেন। আপনি যদি বেলায়েতে কুফাঃ (কুফাঃ প্রদেশ) স্বীয় আয়ত্তাধীনে রাখিতে চান, তবে কোনও 'যবরদস্ত' (ক্ষমতাশালী) গবর্ণর কুফায় পাঠাইয়া দিন; সেই শাসনকর্ত্তা আসিয়া যেন মোছলেম (রাজিঃ)-কে 'গেরেফ্তার' (বন্দী) করেন, এবং লোকদিগের বয়্য়েত 'ফেছ্খ্' (বাতিল) করিয়া দেন। আর (হজরত এমাম) হোছেন (রাজিঃ)-কে কুফায় প্রবেশ করিতে বিশেষ ভাবে বাধা প্রদান করেন। এই কার্য্যে যদি আপনি

বিলম্ব করেন, তবে কুফা আপনার হস্ত-বহির্ভূত হইল বলিয়া মনে করিবেন।”

এই মর্ম্মের পত্র যেমারা-বিন্-য়োত্বাঃ ও আবি-ময়্য়িতও এযিদকে লিখিয়া ছিল। এই সকল পত্র পাঠ করিয়া এযিদ নিতান্ত ‘পেরেশান’ ও চিন্তাকুল হইল। ছরজুন নামক হজরত মৗবিয়া (রাজিঃ)-এর একজন ‘আযাদ-করদাঃ’ (মুক্তি প্রাপ্ত) ক্রীত দাস ছিল। সে অতি বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ লোক ছিল বলিয়া, হজরত মৗবিয়া (রাজিঃ) ও কোন গুরুতর ও পেঁচিদাঃ (জটিল) ব্যাপারে তাহার নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, এবং অনেক গুরুতর বিষয়ে উহার পরামর্শ গ্রহণে ‘ফায়দাঃ’ (উপকার)ও লাভ করিতেন। ছরজুনকে অনেকে “রুমী” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ লোকটি পূর্ব্বে রোমক খৃষ্টীয়ান ছিল। যাহা হউক, এযিদ পিতার সেই বিশ্বস্ত ও হিতাকাঙ্ক্ষী মুক্ত দাসকে ডাকিয়া কুফা নিবাসী আবদুল্লা-বিন্-হয্রমীর পত্রখানি দেখাইল। এস্থলে একথাও উল্লেখ যোগ্য যে, এযিদ, যেয়াদ-বিন্-আবু ছুফিয়ানের উপর সর্ব্বদাই নারাজ ছিল। যেয়াদের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র ওবায়দুল্লার প্রতিও সে নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিল। ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদকে আমীর হজরত মৗবিয়া (রাজিঃ) বস্রার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। এযিদ ‘এরাদা’ (ইচ্ছা) করিয়াছিল যে, ওবায়দুল্লাকে পদচ্যুত করিয়া অপর কোনও ব্যক্তিকে বস্রার শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করিবে। এক্ষণে কুফা হইতে যখন এই ভীতিপ্রদ অমঙ্গল জনক সংবাদ আসিল, তখন এযিদ পূর্ব্বোক্ত ছরজুনের নিকট এ সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, এ সময় এরাক প্রদেশ আপনার হস্তচ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যদি আপনি ছুবে এরাক রক্ষা করিতে চান, তবে ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ ব্যতীত এসময় আপনাকে কেহ সাহায্য

করিতে পারে না। আমি জানি যে, আমার এই পরামর্শ আপনার পক্ষে বিরক্তি-জনক হইবে, কিন্তু ওবায়দুল্লাহ্ ব্যতীত আর যাহাকেই না কেন আপনি এরাকের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন, সে এরাক কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে এই পরামর্শও দিতেছি যে, যেরূপ আপনার পিতা হজরত মোবিয়া (রাজিঃ), ওবায়দুল্লার পিতা যেয়াদকে কুফা এবং বস্রা উভয় ছুবার (প্রদেশের) শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন; আপনিও সেই প্রকার ওবায়দুল্লাহ্‌কে উপরোক্ত উভয় বেলায়তের (প্রদেশের) শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করুন। বস্রার জন্য কোনও নূতন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। এযিদ ছরজুনের পরামর্শ শুনিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তৎপর "ফওরান" (তৎক্ষণাৎ) ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদের নামে নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে 'হুকুমনামা' (আদেশ-লিপি) লিখাইয়া পাঠাইল ঃ—

"আমি বস্রার সঙ্গে কুফাঃ 'বেলায়েত' (ছুবা বা প্রদেশ)ও তোমার শাসনাধীনে প্রদান করিলাম। এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্য এই যে, এই আদেশ-লিপি পঁহুছিবামাত্র বস্রায় কাহাকেও স্বীয় 'নায়েব' (প্রতিনিধি) নিযুক্ত কর, এবং অনতিবিলম্বে কুফায় উপস্থিত হও। সেখানে মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ) আসিয়া, এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর জন্য বয়্য়েত লইতেছে, উহাকে ধরিয়া বন্দী কিংবা 'কতল্' (হত্যা) কর; আর যাহারা উহার হস্তে 'বয়্য়েত' করিয়াছে, যদি সেই বয়্য়েত্ 'ফেছ্খ্' (ভঙ্গ) না করে, তবে তরবারির দ্বারা তাহাদের মস্তক চ্ছেদন কর। এইরূপে সর্ব্ব প্রকার 'খৎরাঃ' (আশঙ্কা নিবারণের বন্দোবস্ত কর।"

"ওবায়দুল্লাহ্-বিন্ যেয়াদের সম্পূর্ণ 'একিন' (বিশ্বাস—ধারণা) ছিল যে, এযিদ আমাকে বস্রার শাসনকর্ত্তৃত্ব 'হইতে মায়যুল' (পদচ্যুত) ও

'বরতরফ' না করিয়া ছাড়িবে না। উপরোক্ত পত্রখানি পড়িয়া এক দিকে সে 'হয়রান' (বিস্ময়াবিষ্ট), এবং অন্য দিকে 'রঞ্জিদাঃ' (দুঃখিত)ও হইল। কারণ, তাহার মনে এই আশঙ্কারও উদয় হইয়াছিল যে, এযিদ এই বাহানায় আমাকে বস্রা হইতে স্থানান্তরিত করিতে চায়। তবুও সে ঐ আদেশ পালন করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিল। তদনুসারে স্বীয় ভ্রাতা ওছমান-বিন্-যেয়াদকে বস্রায় স্বীয় 'কায়েম-মোকাম' (স্থলাভিষিক্ত) নিযুক্ত করিয়া, আগামী দিবস কুফায় রওয়ানা হইবার সঙ্কল্প করিল। ইতিমধ্যে মন্যর-বিন্-আল্ হারেছ দৌড়িয়া উহার নিকট আসিল, আর বলিল (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্-আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রেরিত এক ব্যক্তি এখানে আসিয়াছে, এবং আপনার অজ্ঞাতসারে গোপন ভাবে লোকের নিকট হইতে (হজরত এমাম) হোছেন (রাজিঃ)-এর জন্য বয়য়েত গ্রহণ করিতেছে। ওবায়দুল্লাহ্ এই সংবাদ পাইয়া ধোকা প্রদান পূর্ব্বক, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর প্রেরিত 'কাছেদ' (দূত বা গুপ্তচর)-কে গেরেফ্তার করিল; এবং পরদিন নগরবাসীদিগকে সমবেত করিয়া নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে এক বক্তৃতা প্রদান করিল :—

"(হজরত এমাম) হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ)-এর এক কাছেদ বস্রায় আসিয়াছে; এবং অনেক লোকের নামে 'খতুত্' (চিঠি-পত্র) আনিয়াছে। আমি ঐ কাছেদকে গেরেফ্তার করিয়াছি। বস্রার যে যে লোকের নামে চিঠি-পত্র ও 'পয়গাম' (সংবাদ) আনিয়াছে, উহার নিকট হইতে তাহাদের নাম জানিয়া লইয়াছি। আর যে যে ব্যক্তি উহার হস্তে বয়য়েত করিয়াছে, তাহাদের নামের 'ফেহরস্ত' (তালিকা) ও তৈয়ার করিয়াছি। তোমরা একথা বেশ অবগত আছ যে, আমি যেয়াদ-বিন্-আবু ছুফিয়ানের পুত্র। মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ), কুফায় আসিয়াছে, আমি এক্ষণে কুফায় যাইতেছি; সেখানে মোছলেম-

বিন্‌-আকিল (রাজিঃ) ও যে সকল লোক তাহার হস্তে বয়্‌য়েত করিয়াছে, তাহাদের সকলকেই 'কতল' (হত্যা) করিব। আর যদি সমগ্র কুফাবাসী বয়্‌য়েত করিয়া থাকে, তবে তাহাদের সকলকেই হত্যা করিব, কাহাকেও ছাড়িয়া দিব না। তোমাদের সঙ্গে অধুনা এই 'রেয়ায়েত' (অনুগ্রহ প্রদর্শন) করিতেছি যে, (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্‌-আলী (রাজিঃ)-এর-কাছেদ ব্যতীত আর কাহাকেও কিছু বলিব না; কিন্তু আমার এখান হইতে যাওয়ার পর যদি কেহ কর্ণ হেলায় (কাণ নাড়ে), তবে তাহার আর রক্ষা থাকিবে না।"

এই বক্তৃতা প্রদানের পর সে, (হজরত এমাম) হোছেন (রাজিঃ)-এর কাছেদকে সেখানে আনাইল; এবং সেই সমবেত নগরবাসীদিগের সমক্ষেই তাঁহাকে কত্‌ল করিল। এই শোচনীয় ব্যাপারে কেহ উচ্চ-বাচ্য বা আহা উহু করিল না। এই অনুষ্ঠানের পর সে নিশ্চিন্ত হইয়া কুফাভিমুখে রওয়ানা হইল। ওদিকে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) মক্কা শরীফে থাকিয়া মনে করিতেছিলেন, বস্রাতেও আমার নামে বয়্‌য়েত গ্রহণ করা হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বস্রায় তাঁহার প্রেরিত কাছেদ অতি শোচনীয় ভাবে নিহত হইলেন। ওবায়দুল্লাহ্‌-বিন্‌-যেয়াদ কাদেছিয়ায় পঁহুছিয়া, স্বীয় সঙ্গীয় সেনাদলকে সেখানে রাখিয়া, স্বয়ং স্বীয় পিতার 'আযাদ করদাঃ' (স্বাধীনতা প্রদান করা—মুক্ত) গোলামকে সঙ্গে লইয়া একটি উষ্ট্রে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রুতগতি কুফাভিমুখে যাইতে লাগিল, এবং মগ্‌রেব ও এশার নমাযের মধ্যবর্ত্তী সময়ে কুফা শহরে প্রবেশ করিল। ওবায়দুল্লাহ্‌-বিন্‌-যেয়াদ হেজাযী আমামা মস্তকে বাঁধিয়া ছিল। কুফাবাসিগণ হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিল। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ও হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ভক্তগণের প্রভাব নগরে এত বাড়িয়া গিয়াছিল

যে, শাসনকর্ত্তা নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ) সন্ধ্যার পরক্ষণেই স্বীয় 'দেওয়ান খানার' (দরবার গৃহের) 'আহ্তার' (সীমা বেষ্টনীর) সদর দরওয়াজা (গেট্) বন্ধ করিয়া দিতেন, আর স্বীয় খাছ খাছ (বিশিষ্ট) বন্ধুদিগকে লইয়া 'মজলেছ গরম' করিতেন। দ্বারদেশে গোলাম (ক্রীত দাস) এই উদ্দেশ্যে বসাইয়া রাখিতেন যে, প্রত্যেক আগন্তুক লোকের নাম ও ঠিকানা জানিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত লোক বোধ করিলে দরওয়াযাঃ খুলিয়া ভিতরে যাইতে দেয়, আর প্রবেশের অযোগ্য বোধ করিলে দ্বার খুলিয়া না দেয়। ওবায়হুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ যখন কুফায় প্রবেশ করিল, এবং লোকেরা হেজাযী আমামা পরিহিত উষ্ট্রারোহীকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইল, তখন ওবায়হুল্লার উট যে দিক দিয়া যাইতে লাগিল, সেই দিক্ হইতেই "**আচ্ছালামো আলায়কা এয়া এব্নে রছুলোল্লাহ্**" এই পবিত্র ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। ওবায়হুল্লাহ্ উষ্ট্রারোহণে সরকারী 'দেওয়ান খানাঃ' (শাসনকর্ত্তার বাসগৃহ বা দরবার গৃহ) পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দেখিল, দরওয়াযাঃ বন্ধ রহিয়াছে। ওবায়হুল্লাহ্ দরওয়াযাঃ খট্ খটাইল (দ্বারে করাঘাত করিল বা দরওয়াযার কড়া নাড়িল), কিন্তু মুখে কোন কথা বলিল না। শাসনকর্ত্তা নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ) স্বীয় বন্ধুবর্গকে লইয়া গৃহের ছাদে বসিয়াছিলেন, তিনি দ্বারের করাঘাত শব্দ শুনিয়া ছাদের কেনারে গমন করিলেন, এবং হেজাযী পরিচ্ছদধারী ওবায়হুল্লাহ্কে দেখিতে পাইলেন। তখন হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) কুফায় আগমন করিবেন বলিয়া লোকেরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; তিনি ওবায়হুল্লাহ্কেই হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) বলিয়া মনে করিলেন, এবং তদনুসারে তিনি উপর হইতে বলিলেন, "এয়া এব্নে রছুলোল্লাহ্! আপনি 'ওয়াপছ' (ফেরত) চলিয়া যান, এখানে 'ফেৎনা' (বিপ্লব) উপস্থিত করিবেন

না; এযিদ কথনও আপনাকে কুফা ছাড়িয়া দিবে না।” নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ)-এর যে সকল বন্ধু ছাদের উপর বসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, আপনি হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর প্রতি ঈদৃশ 'বে-মরওত্তি' (শিষ্টাচারের বিরুদ্ধাচরণ) করিবেন না; কম পক্ষে দরওয়াযাঃ খুলিয়া তাঁহাকে গৃহের ভিতরে আসিতে দিন; তিনি 'ছফর' (প্রবাস—মোছাফেরী) হইতে সোজাসুজি আপনার গৃহে 'মেহমান' (অতিথি) রূপে উপস্থিত হইয়াছেন। নওমান (রাজিঃ) বলিলেন, আমি ইহাও পছন্দ করি না যে, লোকে একথা বলিবার সুযোগ লাভ করে যে, নওমানের শাসনকর্ত্তৃত্ব কালে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে কুফায় 'কতল' (নিহত—শহীদ) করা হইয়াছে। ইত্যবসরে ওবায়দুল্লাহ্ মস্তকের আমামা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, 'কম-বখ্ত্' (হতভাগ্য) দরওয়াযাঃ ত খোল্। ওবায়দুল্লার আওয়ায্ শুনিয়া সকলে উহাকে চিনিতে পারিল, এবং তাড়াতাড়ি দরওয়াযাঃ খুলিয়া দিয়া সকলে এদিক্-ওদিক্ সরিয়া পড়িল। ওবায়দুল্লাহ্ ভিতরে প্রবেশ করিবার কিছুকাল পরেই তাহার সৈন্যদল কুফা শহরে আসিয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গেই হজরত মোছলেম (রাজিঃ) সংবাদ পাইলেন যে, ওবায়দুল্লাহ সসৈন্যে কুফায় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে গৃহে অবস্থান করিতে ছিলেন, ও সাধারণতঃ সকলে যে গৃহ জানিত, তিনি সেই গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হানী-বিন্-য়রুয়ার গৃহে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় পর্য্যন্ত হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর হস্তে যাঁহারা বয়্য়েত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ১৮ হাজার পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ পরদিন নগরবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সম্মুখে নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে একটি বক্তৃতা প্রদান করিল; এযিদের যে 'হুকুমনামাঃ' (আদেশ-লিপি) বস্রায় তাহার নিকট পঁহুছিয়াছিল, তাহাও পড়িয়া শুনাইল, এবং বলিল :—

" তোমরা আমার পিতা যেয়াদ-বিন্-আবি ছুফিয়ানকে খুব ভালরূপেই জান। আর তোমাদের ইহাও জানা আছে, তিনি কিরূপ রাজনীতি বিশারদ মহা পরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমার মধ্যেও পিতার সর্ব্বপ্রকার 'আদাত' (শক্তি ও গুণ) বিদ্যমান আছে। তোমরা আমাকেও বিশেষ ভাবে জান; আর আমিও তোমাদের প্রত্যেকের নাম জানি; এবং সকলের গৃহ ও মহাল্লার সন্ধান ও রাখি। আমার নিকট কোনও 'চিয্' (বস্তু) তোমরা গোপন রাখিতে পার না। আমি ইহাও চাই না যে, কুফা নগরে শোণিত স্রোত প্রবাহিত, এবং তোমাদিগের হত্যা সাধন করি। তোমরা (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ) এর নামে, মোছলেম-বিন-আকিল (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্য়েত করিয়াছ; আমি এই শর্ত্তের উপর তোমাদিগকে 'আমান' (শান্তি) দিতেছি যে, তোমরা পূর্ব্বোক্ত বয়্য়েত ভঙ্গ কর; আর যে ব্যক্তি বিদ্রোহ উপস্থিত করিবে, তাহাকে কেহ স্ব-গৃহে স্থান দিবে না। যদি আশ্রয় দাও, তবে প্রত্যেক আশ্রয় দাতাকে তাহার গৃহের দ্বারদেশে কতল করা যাইবে। "

ইহার পর ওবায়দুল্লাহ্ সকলের নিকট জানিতে চাহিল যে, মোছলেম (রাজিঃ) কোথায় আছেন; কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিল না। ইহার পর ওবায়দুল্লাহ্ স্বীয় 'জাছুছ' (গুপ্তচর)-দিগের দ্বারা জানিতে পারিল যে, তিনি হানী-বিন্-য়রুয়ার গৃহে গোপনভাবে অবস্থিতি করিতে-ছেন। ওবায়দুল্লাহ্, ময়কল নামক তমিমের একজন 'আযাদ করদাঃ' (মুক্ত) ক্রীতদাসকে (যাহাকে কুফাবাসী কোনও লোকই চিনিত না) ডাকিয়া, ৩০০০ দরহমের একটি 'তোড়া' (থলে) তাহার হাতে দিয়া বলিল, তুমি অমুক মহাল্লায় হানী-বিন্-য়রুয়ার গৃহে গমন কর, হানী-বিন্ য়রুয়ার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইলে তুমি তাহাকে বলিবে, আপনার সঙ্গে আমার

কিছু গোপনীয় কথা আছে। যখন তাহার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাহাকে বলিবে, বস্রা নগরবাসী অমুক অমুক ব্যক্তি আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, আর তাঁহারা এই ৩০০০ তিন হাজার দরহম আমাকে এই বলিয়া দিয়াছেন যে, যাও, তুমি কুফায় গমন পূর্ব্বক এই দরহম গুলি হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ)-কে পঁছাইয়া দাও; আর তাঁহাকে বল, আমাদের নিকট মক্কা শরীফ্ হইতে হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের পত্র আসিয়াছে, তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছেন, তোমরা অমুক তারিখে কুফায় পঁহছিয়া যাও, আমি ঐ তারিখে নিশ্চয় কুফায় পঁহছিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা সকলেই ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখে, হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের সঙ্গে একত্রে কুফায় প্রবেশ করিব। এই ৩ হাজার দরহম পাঠাইতেছি, আপনি ইহা আমাদের নজর স্বরূপ গ্রহণ করিবেন; এবং প্রয়োজনীয় কার্য্যে খরচ-পত্র করিবেন। অতএব আপনি (হানী) আমাকে হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর নিকট পঁহছাইয়া দিন; আমি এই সকল 'পয়গামাত' (সংবাদ) এবং দরহম গুলি তাঁহার খেদমতে পঁহুছাইয়া দিব; এবং এখনই বস্রায় চলিয়া যাইব। কারণ, এব্‌নে যেয়াদ কুফায় পঁহছিয়াছে; সে আমাকে চেনে; সুতরাং সে জানিতে পারিলে আমার ধৃত ও বন্দী হইবার আশঙ্কা আছে। এব্‌নে যেয়াদ:বদনেহাদের এই উপদেশানুসারে ময়কল দরহমের থলিটি লইয়া হানীর গৃহে গিয়া পঁহছিল। তিনি তখন গৃহের দ্বারদেশে বসিয়াছিলেন; ময়কলের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উহাকে হজরত মোছলেম (রাজিঃ) এর খেদমতে লইয়া গেলেন। হজরত মোছলেম (রাজিঃ) ময়কলের কপটতা পূর্ণ কথা শুনিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক, মুদ্রার থলিটি গ্রহণ করিলেন; এবং তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিলেন।

ময়কল স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া সোজাসুজি ওবায়দুল্লার নিকট গিয়া পঁহুছিল; এবং বলিল, আমি দরহমের থলেটি মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ)-এর হস্তে দিয়াছি; আর তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তাও বলিয়া আসিয়াছি; তিনি হানীর গৃহেই আছেন। ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া হানীকে ডাকাইয়া আনিল, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মোছলেম (রাজিঃ) কোথায় আছেন? হানী বলিলেন, তাহা আমি জানি না। তখন ওবায়দুল্লাহ্ ময়কলকে ডাকিয়া বহু লোকের সম্মুখে উহার বর্ণনা শুনাইল। তখন হানী 'শরমেন্দা' (লজ্জিত) হইয়া বলিলেন, হাঁ, হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ) আমার গৃহে 'পানাহ্ গুযিন' (আশ্রয় গ্রহণ করিয়া) আছেন; কিন্তু আমি নিজের এই 'বে-য়েয্যতি' (অবমাননা) 'বরদাশ্ত্' (সহ্য) করিতে পারি না যে, আমি তাঁহাকে তোমার হস্তে 'ছোপর্দ্দ' (সমর্পণ) করি। ওবায়দুল্লাহ্ তখন তাঁহাকে 'গেরেফ্তার' (বন্দী) করিল; শহরে এই জনরব রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, ওবায়দুল্লাহ্ হানীকে 'ক্বতল' (হত্যা) করিয়াছে। হানী-বিন্-য়োরুয়ার বাড়ীর মহিলাগণ এই সংবাদ শ্রবণে রোদন করিতে লাগিলেন। হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ) এই হৃদয় বিদারক ব্যাপার দর্শনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ 'শমশের' (তরবারি) হস্তে ধারণ পূর্ব্বক হানীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং ঐ সকল লোককে আহ্বান করিলেন, যাহারা তাঁহার হস্তে বয়্য়েত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ১৮ হাজার কুফাবাসী হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর হস্তে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর নামে 'বয়্য়েত' করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার আহ্বানে মাত্র ৪০০০ যোদ্ধৃ-পুরুষ সমবেত হইল। হজরত মোছলেম (রাজিঃ) অবশিষ্ট লোকদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা প্রত্যেকেই উত্তর প্রদান করিল যে, আমাদিগের নিকট হইতে

বয়্য়েত গ্রহণকালে এই ‘একরার’ (প্রতিশ্রুতি) গ্রহণ করা হইয়াছিল যে, যে পর্য্যন্ত হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) এখানে আগমন না করিবেন, তত্তাবৎ কাল পর্য্যন্ত যেন আমরা কাহারও সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হই। তাঁহার আগমন কাল পর্য্যন্ত আপনার অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ) গুপ্ত স্থান হইতে প্রকাশ্য স্থানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, একদল যোদ্ধ্‌পুরুষ ও যুদ্ধ করিবার জন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে তিনি আর আত্ম-গোপন করিতে পারিতেছিলেন না ; বিশেষতঃ তদীয় আশ্রয়-দাতা হানীর পরিবার বর্গের ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদে তাঁহার হৃদয় নিতান্ত বিচলিত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল ; হাশেমী শোণিত তাঁহার ধমনীতে ‘জোশ্’ মারিতেছিল ; তিনি ঐ চারি হাজার সৈন্য সহ ধাওয়া করিয়া ‘দারুল এমারতে’ (শাসনকর্ত্তার প্রাসাদে) ওবায়দুল্লাহ্‌কে গিয়া ‘মহাছেরা’ (অবরোধ) করিলেন। ওবায়দুল্লাহ্ তখন দারুল এমারতে ৩০।৪০ জন লোকের সঙ্গে বসিয়াছিল। তাহারা গৃহের ছাদে চড়িয়া অবরোধকারী-দিগের প্রতি তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে আক্রমণকারী ও অবরোধকারীদিগের আত্মীয়-স্বজন সেখানে আসিয়া হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর সাহায্যকারী যোদ্ধ্‌পুরুষদিগকে এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিল যে, তোমরা কেন আপনাদিগকে ‘হালাকতে’ (ধ্বংসপথে) নিপাতিত করিতেছ ? প্রবল পরাক্রান্ত খলিফীয় সৈন্যদিগের হস্তে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। এই কথা শুনিয়া সেই আক্রমণকারী কুফী যোদ্ধ্‌পুরুষগণ আস্তে আস্তে ছত্রভঙ্গ হইয়া এদিক্ ওদিকে সরিয়া পড়িল। হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মাত্র ৩০।৪০ জন লোক রহিয়া গেল। এই অবস্থা দর্শনে বেগতিক দেখিয়া তিনিও ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন ; ক্রমে সেই ৩০।৪০ জন

লোকও পলায়ন করিল। তিনি নিরুপায় হইয়া জনৈক কুফাবাসীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ওবায়তুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য ওমরু-বিন্-জরীর মখ্যুমীকে কতিপয় যোদ্ধৃপুরুষের সঙ্গে পাঠাইয়া দিল। হজরত মোছলেম-বিন্-আঁকিল (রাজিঃ] উপায়ান্তর না দেখিয়া নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ওমরু-বিন্-জরীর তদ্দর্শনে বলিল, আপনি কেন অনর্থক নিজের জীবন নষ্ট করিতেছেন? আপনি আমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করুন, আমি স্বীয় 'যেম্মাদারী'তে আপনাকে আমীর ওবায়তুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদের নিকট লইয়া যাইব; আর আপনার নিকট প্রতিশ্রুতি দান করিতেছি যে, আপনার জীবন রক্ষা করাইয়া দিব। তচ্ছ্রবণে হজরত মোছলেম (রাজিঃ) তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া, স্বীয় হস্ত উহার হস্তে অর্পণ করিলেন; সে হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-কে ওবায়তুল্লার নিকট লইয়া গেল। ওবায়তুল্লাহ্ হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-কে ঐ প্রকোষ্ঠে বন্দী করিল—যে প্রকোষ্ঠে ইতিপূর্ব্বে হানী-বিন্-য়োরুয়াঃকে বন্দী বরিয়া রাখিয়াছিল। সে রাত্রি ত ঐ ভাবে অতিবাহিত হইল; পর দিবস বয়্য়েতকারীদিগের ১০ হাজার যোদ্ধৃপুরুষ সমবেত হইয়া ওবায়তুল্লার বাসগৃহ—অর্থাৎ শাসন-কর্ত্তার রাজপ্রাসাদ গিয়া অবরোধ করিল; এবং হজরত মোছলেম ও হানীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য দাবী করিল; আর বলিতে লাগিল, যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তবে ত ভালই, নচেৎ আমরা বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া লইব। ওবায়তুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ তদ্দর্শনে স্বীয় লোকদিগের প্রতি আদেশ করিল, মোছলেম (রাজিঃ) ও হানীকে ছাদের উপর লইয়া গিয়া সমবেত লোকদিগের সম্মুখে 'কতল' (হত্যা) কর। তদনুসারে অনতিবিলম্বে এই দুই জন ধর্ম্মবীরের হত্যা সাধন করা হইল। এই হৃদয় বিদারক ভীষণ ব্যাপার দর্শনে

সমবেত যোদ্ধৃপুরুষগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। বোধ হইল, উহারা যেন এই দুইজন ধর্ম্মবীরের হত্যা সাধন করাইবার জন্যই সজ্জিত হইয়া সেখানে আসিয়াছিল। অতঃপর ওবায়তুল্লাহ্ স্বীয় লোক-দিগকে আদেশ করিল যে, গৃহের দ্বার খুলিয়া উভয়ের দেহ 'দারে' (শূলকাষ্ঠে) লটকাইয়া দাও; এবং তাহাদের ছিন্ন মস্তক দেমেশ্‌কে খলিফা এযিদের নিকট লইয়া যাও। তাহার আদেশ অনতিবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইল।

ওদিকে এযিদের নিকট হইতে ওবায়তুল্লার নামে এই মর্ম্মের পত্র আসিল যে, এমাম হোছেন (রাজিঃ) মক্কা হইতে কুফাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছেন, তিনি অতি শীঘ্রই কুফায় পঁহুছিবেন, তুমি খুব ভাল রূপে আপনার 'হেফাযৎ'—অর্থাৎ আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা কর। আর তাঁহার আগমনের পথে উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্যদল স্থাপন কর—যেন তাহারা পথিমধ্যেই এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর গতিরোধ করে, তাঁহাকে যেন কোনও ক্রমেই কুফায় প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয়।

এস্থলে কয়েকটি কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কুফা নগরী তদানীন্তন মোছলেম জগতের একটি প্রধানতম সামরিক আড্ডা ছিল। এই নগরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বীয় খেলাফতের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। অধিবাসীদিগের মধ্যে বহুতর ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) এবং আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত মোছলমান যোদ্ধৃপুরুষগণ ছিলেন। প্রায় ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে এই কুফার পরাক্রান্ত অধিবাসিগণ তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ)-এর নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাকে নগরে প্রবেশ করিতে না দিয়া ফিরিয়া যাইতে, এবং তাঁহাদের মনোনীত হজরত আবু মুছা আশয়ারি (রাজিঃ)-কে শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইতে বাধ্য করিয়াছিল। এই কুফার পরক্রান্ত বীর পুরুষগণ

" জমল " যুদ্ধে মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর·বস্রাবাসী সৈন্যদিগকে শোচনীয় রূপে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল। আবার ইহারাই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে নানাপ্রকার 'নাফরমানী' ও 'বে-আদবী' করিয়াছিল ; কিন্তু ছফিন যুদ্ধে হজরত মৌবিয়া (রাজিঃ)-এর প্রবল পরাক্রমশালী শামী সেনাদলকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিল ; ইহাদেরই একজন সুবিখ্যাত বীরপুরুষ মালেক আশ্‌তর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নামে জীবনোৎসর্গকারী এবং তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে এবং মেছেরের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত। এই কুফাবাসী এক পাষণ্ডের হস্তেই মহাবীর মহাপ্রাণ সাধক কুল-চূড়ামণি আদর্শ খলিফা হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু অতি শোচনীয় রূপে শহীদ হইয়াছিলেন। ইহারাই হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে নানাপ্রকার অসদাচরণ করিয়াছিল। ইহাদেরই একজন শঠ কুল-চূড়ামণি বিপ্লববাদীদিগের নেতা মোছলেম-শত্রু আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-ছাবার প্ররোচনায়, তাহার মন্ত্র-শিষ্য কতিপয় লোক মহামান্য তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ)-কে শোচনীয় ভাবে শহীদ করিয়াছিল ; ইহাদেরই একদল " খারেজী " রূপে আবির্ভূত হইয়া মোছলমানদিগের মধ্যে ভীষণ বিপ্লব ও অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কর্ত্তৃক নহরওয়ানের যুদ্ধে ইহাদের নিপাত সাধন না হইলে, এই পাষণ্ডের দল আরও নানা অনর্থ ঘটাইত। ইহারা একদিকে দুর্জ্জয় সাহসী ও মৃত্যু-ভয় শূন্য ভীষণ যোদ্ধা ছিল, পক্ষান্তরে অতি অল্পেতেই ভীত হইয়া পড়িত ; ইহাদের মতের কোনও দৃঢ়তা ছিল না। প্রতিশ্রুতি পালনে ইহারা অনভ্যস্ত ছিল। আবার অত্যন্ত লোভও স্বার্থপরতায় তাহাদিগকে শয়তান ও পিশাচে পরিণত করিয়া ছিল। উপরোক্ত ঘটনা গুলিই

তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্থল। যে ১৭।১৮ হাজার কুফাবাসী হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর নামে, হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্য়েত করিয়াছিল, যদি তাহারা আপনাদের বয়্য়েত ও প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকিত; যদি হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর প্রতি তাহাদের অনুরাগ ও ভক্তি অকপট হইত, তবে যে দিন ওবায়দুল্লাহ্-এব্নে যেয়াদ কুফায় প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দিন বা তাহার পর দিনই তাহার মুণ্ডপাত এবং তাহার সঙ্গীয় বস্রা হইতে আগত অল্পসংখ্যক সৈন্যদলের নিপাত সাধন করিত; কিংবা হজরত মোছলেম বিন্-য়কিল (রাজিঃ) কর্ত্তৃক প্রথম আক্রমণের কালে ওবায়দুল্লাহ্কে সদলবলে কুফার রাজ-প্রাসাদে কাটিয়া টুক্রা টুক্রা করিয়া ফেলিতে পারিত। অবশেষে যখন হজরত মোছলেম (রাজিঃ) ও হানী-বিন্ য়োরুয়াকে হত্যা করিল, তখনও সমাগত ১০ হাজার যোদ্ধ্পুরুষ দারুল-ওমরায় প্রবেশ করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ সহ এব্নে যেয়াদ বদ নেহাদের মস্তক ধূলিসাৎ করিতে পারিত। পরিণামে এযিদ প্রেরিত প্রবল সেনাদল আসিলেও, তাহাদিগকে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইত। তখনও কুফায় ৫০।৬০ হাজার বিক্রান্ত যোদ্ধ্ পুরুষ ছিল। শামী সেনাদল যুদ্ধে তাহাদের সঙ্গে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তাহারা অনায়াসে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে খেলাফৎ দেওয়াইতে সক্ষম হইত। মক্কা ও মদীনার ধর্ম্মপ্রাণ মোছলমানগণ এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। পারস্যাদি পূর্ব্ব দেশের মোছলমান অধিবাসিগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর পরম ভক্ত ছিল। কুফাবাসীর দুর্ব্ব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতায়ই মহামান্য হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর ঈদৃশ শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল। অবশ্য বিধাতার বিধান ইহাই ছিল।

হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর মক্কা শরীফ হইতে কুফাভিমুখে যাত্রা।

হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম মক্কা-মোয়াজ্জমা হইতে কুফা গমনের উত্তোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন প্রবাসোপযোগী সামগ্রী-সম্ভার ঠিক হইল, এবং মক্কায় এই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, হজরত এমাম হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ) কুফায় যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর প্রতি 'মোহব্বত' (ভালবাসা) ও সহানুভূতি-সম্পন্ন লোকেরা তাঁহাকে এই 'এরাদাঃ' (সঙ্কল্প) হইতে বিরত থাকিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আপনার কুফায় গমন করা বিশেষ রূপ বিপদ জনক। প্রথমতঃ আবদুর রহমান-বিন্-হারেছ আসিয়া আরজ করিলেন, আপনি কুফা যাত্রার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন। সেখানে ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ এরাকের শাসনকর্ত্তা রহিয়াছে; কুফার অধিবাসিগণ 'লাল্‌চি' (লোভী); খুব সম্ভবপর যে, যে সকল লোকেরা এক্ষণে আপনাকে তথায় আহ্বান করিয়াছে, তাহারাই আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ) তাঁহার কুফা যাত্রার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি বয়্যেত গ্রহণ করিতে এবং 'এমারত' (আমীরী—শাসনকর্ত্তৃত্ব) লাভের জন্য মক্কার বাহিরে গমন করিবেন না; আঁ হজরত (ছালঃ)-কে খোদাতালা 'দুনিয়া' ও 'আখেরাৎ' (ইহকাল এবং পরকাল)-এর মধ্যে একটি গ্রহণ করিবার জন্য 'আযাদী' (স্বাধীনতা) প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি ইহকালের পরিবর্ত্তে পরকালই

'এখ্তেয়ার' (গ্রহণ) করিয়াছিলেন ; আপনি খান্দানে নবুয়তের একজন, আপনি তুনিয়া তলব করিবেন না (অর্থাৎ পার্থিব প্রাধান্য লাভের দিকে অগ্রসর হইলেন না) ; আপনি স্বীয় পবিত্র 'দামন' (বস্ত্রের প্রান্তভাগ) পার্থিব 'আলায়েশে' (আবর্জ্জনায়) 'আলুদাঃ' (অপবিত্র) করিবেন না ; এই কথা বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে এমাম ছাহেব (রাজিঃ) ও রোদন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। নিরুপায় হইয়া হজরত আবহুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ) প্রস্থান করিলেন। তৎপর এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর পিতৃব্য হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) আসিয়া বলিলেন, আপনি কোনও ক্রমেই মক্কা ত্যাগ করিবেন না। খানাঃ-খোদা (পবিত্র কাবাগৃহ) হইতে দূরবর্ত্তী হইবেন না। আপনার ওয়ালেদ মাজেদ মক্কা ও মদীনা ত্যাগ করিয়া কুফায় বাস করাই পছন্দ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কুফাবাসিগণ তাঁহার সঙ্গে কিরূপ তুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল ; অবশেষে উহারা তাঁহাকে শহীদ পর্য্যন্ত করিল। আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর (হজরত) এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর যথাসর্ব্বস্ব কুফিগণ লুণ্ঠন করিয়া ছিল, 'কতল্' (হত্যা—শহীদ) করিতেও প্রয়াস পাইয়াছিল ; এরূপ ক্ষেত্রে কুফাবাসিদিগের বাক্যে আপনার কোনও ক্রমেই আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে। না উহাদের বয়্য়েত এবং 'কছমের' (শপথের) কোন ভরসা আছে, না উহাদের চিঠি-পত্র বিশ্বাস বা নির্ভর যোগ্য। হজরত এব্নে আব্বাছ (রাজিঃ)-এর কথা শুনিয়া হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ফরমাইলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সকলই সত্য ; কিন্তু ভ্রাতা মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ)-এর পত্র আসিয়াছে যে, কুফায় ১২ হাজার লোক আমার নামে তাঁহার হস্তে বয়্য়েত করিয়াছে ; আর ইহার পূর্ব্বে কুফাবাসী সম্ভ্রান্ত লোকদিগের দেড় শত চিঠি-পত্র

আমার নামে আসিয়াছে; সুতরাং কোনও রূপ ভয়ের কারণ নাই; আমার সেখানে যাওয়া একান্তই কর্ত্তব্য। হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) তাঁহার মতের দৃঢ়তা দেখিয়া বলিলেন, আচ্ছা, কমপক্ষে আপনি এই যেলহজ্জ (হজ্জের) মাস শেষ হইতে দিন, নূতন বৎসরের প্রারম্ভে প্রবাস-যাত্রা করিবেন। হজ্জের সময় সমাগত, মোছলেম-জগতের প্রত্যেক স্থান হইতে পবিত্র হজ্জ্ কার্য্য সম্পাদন জন্য দলে দলে লোকেরা মক্কায় আসিতেছে, আর আপনি পবিত্র মক্কা নগরী ছাড়িয়া দূরদেশে গমন করিতে চাহিতেছেন, ইহা কিছুতেই সঙ্গত বোধ হইতেছে না। ইহাই 'মোনাছেব' (কর্ত্তব্য) যে, আপনি হজ্জে 'শরীক' হন, আর হজ্জ-প্রার্থী লোকদিগকে পবিত্র হজ্জ্ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেন, তৎপরে যদি একান্তই প্রয়োজন বোধ করেন, তবে কুফায় রওয়ানা হইবেন। তদুত্তরে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) বলিলেন, এই ব্যাপার এমন গুরুতর যে, আমি কিছুতেই বিলম্ব করিতে পারি না, আমাকে 'ফওরান' (এখনই) রওয়ানা হইয়া যাওয়া চাই। এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর দৃঢ় সঙ্কল্পের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) অবশেষে বলিলেন, আচ্ছা, আপনি যদি আমার কথা না শুনেন—অনুরোধ রক্ষা না করেন, তবে 'কম্ আয্ কম' (অন্ততঃ পক্ষে—কমপক্ষে) স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন না। কারণ, কুফাবাসিদিগের উপর কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। ১২ হাজার লোক যখন আপনার নামে বয়্য়েত্ করিয়াছে, তখন তাহাদের উচিত ছিল, এযিদের নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাকে নগর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া। ঐরূপ করিয়া এবং খাযানাঃ (রাজ-কোষ) হস্তগত করিয়া আপনাকে আহ্বান করা। কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনা-পরম্পরায় ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, এযিদের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তার

বিরুদ্ধে উহারা কিছুই করিতে পারে না ; যখন তাহাদের হস্তে থাযানাও নাই, এবং শাসনকর্ত্তাকে বিতাড়িত করিবার শক্তিও নাই ; এরূপ ক্ষেত্রে বুঝা যাইতেছে যে, এযিদের অধীনস্থ 'আমেল' (শাসনকর্ত্তা) উহাদিগকে ভীতি-প্রদর্শন পূর্ব্বক বা প্রলোভন দেখাইয়া স্বীয় 'হছবে মন্‌শাঃ' (অভিপ্রায়ানুযায়ী) যখনই ইচ্ছা, স্বীয় অনুকূলে কাজ করাইয়া লইবে—উহাদিগকে আপনাদের যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিবে ; আর ইহাও সম্ভবপর যে, যাহারা এক্ষণে আপনাকে সাগ্রহে কুফায় আহ্বান করিতেছে, তাহারাই এযিদের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আপনার জীবন বিপদ-সঙ্কুল বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণ আপনার সঙ্গে থাকে, তবে হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ) যেরূপ স্বীয় 'আহ্‌লে ও আয়াল' (স্ত্রী-পরিবার) বর্গের সম্মুখে শহীদ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে হইয়াছিল, আপনার পরিবার বর্গকেও না সেইরূপ হৃদয় বিদারক শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে হয়। সেইরূপ অবস্থায় শত্রু দল তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া দাস-দাসী রূপে না বিক্রয় করে ; আমার কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে। হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) যখন হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ)-এর একথায় ও স্বীয় মতের পরিবর্ত্তন করিতে চাহিলেন না ; তখন তিনি বলিলেন, যদি আপনার হুকুমত লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আপনি আপাততঃ এমনে চলিয়া যান, সেখানে আপনার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ভক্ত লোক বিস্তর আছে, ; আর উহা পার্ব্বত্য প্রদেশ, সুতরাং শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও, আত্ম- রক্ষার বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত হেজাযের আধিপত্যও আপনি খুব সহজে লাভ করিতে পারেন। কিন্তু এমাম ছাহেব (রাজিঃ) তাঁহার কোনও পরামর্শই গ্রহণ করিলেন না। অগত্যা

তিনি নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। অবশেষে হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) আসিলেন, এবং দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, আপনি কোনও ক্রমেই কুফায় যাইবেন না। আপনার কুফা গমনের সঙ্কল্প যখন মক্কাবাসিগণ জানিতে পারিয়াছে, তখন কেহ কেহ বলিয়াছে যে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) মক্কা হইতে চলিয়া গেলে, আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) খুব সন্তুষ্ট হইবেন; কারণ মক্কায় তখন আর তাঁহার 'রকীব' (প্রতিদ্বন্দ্বী) কেহ থাকিবেন না। এজন্য আমি ঐ সকল 'বদ-গোমানওয়ালা' (ভ্রান্ত বিশ্বাসকারী) লোকদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার জন্য সরল ভাবে আপনাকে আরজ করিতেছি যে, আপনি মক্কার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করুন, আর আপনি হস্ত বাড়াইয়া দিন, আমি আপনার হস্তে এখনই বয়্য়েত করিতেছি। তদ্ব্যতীত আমি আপনার সাহায্যকারী রূপে তরবারি হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেও প্রস্তুত আছি। তাঁহার কথা শুনিয়া হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) বলিলেন, আমি প্রতিশ্রুতি-সূচক 'এত্তেলা' (সংবাদ) কুফায় পাঠাইয়াছি, যাত্রা করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছি, এক্ষণে কোনও মতেই যাত্রা স্থগিত রাখিতে পারি না। ইহা শ্রবণে হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) ও নিরাশ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অবশেষে হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম, ৬০ হিজরীর ৩রা যেলহজ্জ্ তারিখ—রবিবার দিবস, স্বীয় পরিবার বর্গও খান্দানের (বংশের) লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া মক্কা-মোয়াজ্জমা হইতে কুফাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। ঠিক ঐ তারিখেই হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ) কুফায় শহীদ হইয়াছিলেন। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) যখন মক্কা হইতে রওয়ানা হইতে ছিলেন, তখন ওমরু-বিন্-ছয়ীদ-বিন্-অল্-আছ (রাজিঃ)-প্রমুখ কতিপয় মক্কাবাসী তাঁহার গতিরোধ করিতে

চাহিলেন, এবং বলিলেন—যদি আপনি আমাদের অনুরোধে যাত্রা স্থগিত না রাখেন, তবে আমরা বল পূর্ব্বক আপনার গমনে বাধা দিব, এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিব। এমাম ছাহেব (রাজিঃ) ফরমাইলেন, তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিতে পার, আর যুদ্ধ করিবার সাধ থাকে ত সে উদ্দেশ্যও পূর্ণ কর ; ইহা শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার সম্মুখ হইতে হটিয়া গেলেন ; এবং এমাম ছাহেব (রাজিঃ) কুফাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শেষ বিদায় প্রদান কালে হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) আসিয়া বলিলেন, আমি এসময় আপনার উষ্ট্রের সম্মুখে শুইয়া পড়িতাম, আর আপনার উষ্ট্র আমাকে পদদলিত করিয়া অগ্রসর হইত ; তাহাতে যদি আপনি যাত্রায় ক্ষান্ত হইতেন, তবে আমি সেইরূপই করিতাম। কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আপনি তাহাতেও যাত্রা স্থগিত রাখিবেন না ; এবং কুফা গমনে ক্ষান্ত হইবেন না ; অতঃপর হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে পরম স্নেহ-ভাজন ভ্রাতুস্পুত্রকে বিদায় দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এমাম ছাহেব (রাজিঃ) মক্কা হইতে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে একটি 'কাফেলা' প্রাপ্ত হইলেন। এই কাফেলা এমনের শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে 'তহায়েফ্' (উপঢৌকনাদি) লইয়া এযিদের নিকট দেমেস্কে গমন করিতেছিল। তিনি এই কাফেলাঃ গেরেফ্তার করিয়া উহা হইতে কতক সামগ্রী-সম্ভার গ্রহণ পূর্ব্বক সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মক্কা ও কুফার মধ্যস্থিত 'ছফাহ' নামক স্থানে প্রসিদ্ধ আরব কবি ফরযোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল ; তিনি কুফা হইতে আসিতেছিলেন। কবি ফরযোক্ যখন কুফা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত ওবায়দুল্লাহ্-এব্নে যেয়াদ কুফায় পঁহুছিয়া ছিল না ; হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) এই কবির নিকট কুফাবাসী দিগের মতি-গতির বিষয়

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, কুফাবাসীদিগের 'দেল' (মন) ত আপনার দিকে আছে; কিন্তু তাহাদের তরবারি আপনার অনুকূলে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া মনে হয় না। এখান হইতে এমাম ছাহেব (রাজিঃ) আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে তিনি হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-জাফর (রাজিঃ)-এর একখানি পত্র—যাহা তিনি স্বীয় দুই পুত্র য়য়োন ও মোহাম্মদের হস্তে মদীনা হইতে পাঠাইয়াছিলেন—প্রাপ্ত হইলেন। তিনি পত্রে লিখিয়াছিলেন, ভ্রাতঃ! আমি খোদার 'ওয়াস্তাঃ' (শপথ) দিয়া আপনাকে অনুরোধ করিতেছি—আপনার খেদমতে আরজ করিতেছি, আপনি কুফা গমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদীনায় চলিয়া আসুন, আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনি না 'ক্বতল (নিহত) হইয়া যান। খোদার ওয়াস্তে আপনি এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে মদীনার শাসনকর্ত্তার একখানি পত্রও ঐ ক্বাছেদ (দূত) গণ হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর হস্তে প্রদান করিলেন; উহাতে লিখিত ছিল, আপনি যদি মদীনায় আসিয়া বাস করিতে চান, তবে আপনার জন্য 'আমান' (শান্তি)—অর্থাৎ আপনি নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্ত মনে এখানে বাস করিতে পারেন; কিন্তু এমাম ছাহেব (রাজিঃ), 'ওয়াপেছি' (প্রত্যাবর্ত্তন) জন্য সম্পূর্ণ রূপে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বরঞ্চ মোহাম্মদ ও য়য়োন—এই ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বয়কেও সঙ্গে লইয়া চলিলেন। বস্রাবাসী একজন লোক তদীয় পথ-প্রদর্শক রূপে সঙ্গে গমন করিতেছিল, তিনি তাহাকে বলিলেন, যতশীঘ্র সম্ভব, আমাদিগকে কুফায় পঁহুছাইয়া দাও—যাহাতে আমি ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদের পূর্ব্বেই কুফায় পঁহুছিতে পারি; কারণ কুফা-বাসিগণ আমার আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত অবস্থায় বাস করিতেছে। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই দিনই এযিদের এই মর্ম্মে পত্র ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদের নামে কুফায় পঁহুছিল যে, তুমি নিজের 'হেফাযত' এর (আত্মরক্ষার)

সুবন্দোবস্ত কর। সম্ভবতঃ এমাম হোছেন (রাজিঃ)-মক্কা হইতে কুফাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছেন; অতএব কুফার প্রত্যেক রাস্তায়ই সৈন্য সমাবেশ কর, যেন তাঁহাকে কোনও ক্রমেই কুফায় প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয়। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) মনে মনে এই ধারণা করিতেছিলেন যে, ভ্রাতা মোছলেম (রাজিঃ)-এর হস্তে প্রত্যহ দলে দলে লোক 'বয়্‌য়েত' করিতেছে, এক্ষণে তাহাদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া থাকিবে। তিনি মক্কায় থাকিয়া একই দিনে ১২ হাজার লোকের বয়্‌য়েত করিবার সংবাদ পাইয়াছিলেন, সুতরাং প্রায় এই এক মাস কাল মধ্যে ৫০।৬০ হাজার লোকের বয়্‌য়েত করার সম্ভাবনা বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু অবস্থা ইহার ঠিক বিপরীত ছিল। ওবায়দুল্লাহ্‌-বিন্‌-যেয়াদ 'বদনেহাদ' হজরত মোছলেম (রাজিঃ) ও হাদী-বিন্‌-য়োরুয়াঃকে 'শহীদ' (হত্যা) করিয়া, এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-কে বন্দী কিংবা 'কতল্‌' (শহীদ) করিবার জন্য সেনা দল সুসজ্জিত করিতে ছিল। এমাম ছাহেব (রাজিঃ) আরও কয়েক দিনের পথ অগ্রসর হইবার পর আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-মতিনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁহার গতিরোধ করিলেন, তাঁহার কুফায় গমনের কঠোর প্রতিবাদ করিলেন; এবং মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য 'কছম' দিতে লাগিলেন। তিনি বিশেষ ভাবে বুঝাইলেন যে, আপনি এরাকবাসীদিগের 'ফেরেবে' ('ধোকায়'—প্রতারণা-জালে) পতিত হইবেন না। যদি আপনি বনি-ওম্মিয়া হইতে খেলাফৎ কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করেন, তবে তাহারা নিশ্চয় আপনাকে 'কতল' (শহীদ—হত্যা) করিবে; সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বনি-হাশেম, প্রত্যেক আরব ও প্রত্যেক মোছলমানকে হত্যা করিবার জন্য সাহসী হইবে। আপনি আপনাকে 'হালাকতে' (মৃত্যুর

কবলে) নিক্ষেপ করিয়া এছলাম, আরব ও কোরেশদিগের 'হোরমত' (সম্মান) নষ্ট করিবেন না। কিন্তু হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আরও দ্রুতগতি কুফার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। "হাজর" নামক স্থানে পঁহুছিয়া কয়েছ-বিন্-মছহরের হস্তে একখানি পত্র কুফাবাসিদিগের নামে এই বলিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আমি তোমাদের খুব নিকটে আসিয়া পঁহুছিয়াছি, তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা কর। কয়েছ "কাদেছিয়ায়" পঁহুছা মাত্র এব্‌নে যেয়াদের প্রেরিত সৈন্যদল কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দী হইলেন। উহারা অবিলম্বে তাঁহাকে কুফায় ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদের নিকট, এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর ঐ পত্রসহ পাঠাইয়া দিল। এব্‌নে যেয়াদ তাঁহাকে 'কছরে এমারত' (শাসনকর্ত্তার দরবার ও বাসগৃহ)-এর ছাদ হইতে নীচে নিক্ষেপ করাইল, কয়েছ সেই অত্যুচ্চ প্রাসাদের ছাদ হইতে পতিত হইবামাত্র মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। পরদিন এমাম ছাহেব (রাজিঃ) স্বীয় 'রেযায়ী' ভাই (দুগ্ধ-ভ্রাতা) আবদুল্লাহ্-বিন্ য়েকতরকে ঐ মর্ম্মের পত্রসহ কুফাভিমুখে রওয়ানা করিলেন; তিনিও কাদেছিয়ায় এব্‌নে যেয়াদের নিয়োজিত সৈন্য দল কর্ত্তৃক ধৃত ও কুফায় নীত হইয়া, ঐরূপ শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন; অর্থাৎ তাঁহাকেও প্রাসাদের চূড়া হইতে নিম্নে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করা হইল। এই কাফেলাঃ যখন "ছয়লবিয়াঃ" নামক স্থানে পঁহুছিল, তখন হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) জানিতে পারিলেন যে, মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ)-কে কুফায় কতল (হত্যা—'শহীদ') করা হইয়াছে। এক্ষণে একটি মাত্র লোকও তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারী কুফায় নাই। এই সংবাদ শুনিবামাত্র সমগ্র কাফেলায় 'মায়ুছি' (নৈরাশ্য) ছাইয়া পড়িল; এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিবার 'এরাদাঃ' (সঙ্কল্প) করা হইল; কারণ, কুফার দিকে অগ্রসর

হইতে সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল যে, হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর সঙ্গে যে ছলুক' (ব্যবহার) করা হইয়াছে, এই কাফেলার সঙ্গেও ঐরূপ ব্যবহার করা হইবে। এই কথা শুনিয়া হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ)-এর পুত্রগণ বলিয়া উঠিলেন, আমাদিগকে কিছুতেই প্রত্যাবর্ত্তন করা চাই না। এক্ষণে আমরা হয় হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর 'ক্বেছাছ' (মৃত্যুর প্রতিশোধ) গ্রহণ করিব, নচেৎ তাঁহার ন্যায়ই জীবন বিসর্জ্জন দিব। দ্বিতীয় কথা এই যে, হজরত এমাম হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ)-এর অবস্থা হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর মতন নহে। অর্থাৎ এমাম ছাহেবের পূর্ণ প্রভাব কুফাবাসীদিগের মধ্যে আছে; তাঁহার প্রতি কুফাবাসীদিগের অসাধারণ ভক্তি-শ্রদ্ধা রহিয়াছে; যখন কুফাবাসিগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তখন তাহারা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবে; এবং এব্নে যেয়াদকে 'গেরেফ্তার' (বন্দী করিয়া লইবে। এই কাফেলার সঙ্গে প্রথম হইতেই কয়েক শত লোক ছিল; এবং পথিমধ্যে আরও বহুসংখ্যক লোক ক্রমশঃ যোগদান করিয়া, লোকসংখ্যা অনেক বাড়াইয়াছিল। কিন্তু ছয়লবিয়ায় পঁহুছিয়া যখন কুফার ঘটনা শুনিতে পাইল, এবং কাফেলা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে ছিল; তখন হইতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা কাফেলা হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিল। কেবলমাত্র স্বীয় 'খান্দান' (বংশীয়) ও কবিলার (সম্প্রদায়ের) লোকেরাই অবশিষ্ট রহিয়া গেলেন। আর কতিপয় বিশ্বস্ত ও জীবনোৎসর্গকারী অনুচর মাত্র সঙ্গে থাকিলেন। ইঁহাদের সংখ্যা ৭০।৮০ জনের বেশী ছিল না। কোনও কোনও রওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, ইঁহাদের সংখ্যা ২৫০ আড়াই শত ছিল। কিন্তু প্রথমোক্ত বর্ণনাই সঠিক বলিয়া অধিকাংশ ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত।

———

কারবালার হৃদয়-বিদারক শোচনীয় ঘটনা।

ওবায়দুল্লাহ্-বিন্ যেয়াদ, ওমরু-বিন্-ছায়াদ-বিন্-আবিওক্কাছকে 'রয়' (এস্ফাহান) প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিয়া, 'ফিলহাল' (সম্প্রতি—উপস্থিত ক্ষেত্রে) চারি হাজার সৈন্য সঙ্গে দিয়া, মরুভূমির দিকে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিল যে, কুফার দিকে মক্কা হইতে যতগুলি রাস্তা আসিয়াছে; ঐ সকল রাস্তায় যেন (হজরত এমাম) হোছেন (রাজিঃ)-এর সন্ধান করিতে থাকে। পাঠক! আশ্‌রায় মোবাশ্বরার অন্যতম ছাহাবাঃ হজরত ছায়াদ-বিন্-আবিওক্কাছ (রাজিঃ), যাঁ হজরত (ছালঃ)-এর সম্পর্কে 'মামু' (মাতুল) হইতেন; আর তিনি কত বড় ধার্ম্মিক ও কত বড় বীরপুরুষ ছিলেন, তাহা আপনারা অবগত আছেন। তাঁহারই নরাধম পুত্র ওমরু "রয়" প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব লাভের আশায় এযিদের অধীনস্থ দুর্ব্বৃত্ত শাসনকর্ত্তা ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ কর্ত্তৃক হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর বিরুদ্ধে সৈন্যদল লইয়া অগ্রসর হইল। সে দুনিয়ার লোভে পরকালের পথে কণ্টক স্থাপন করিতে একটুও ইতস্ততঃ করিল না। যাহা হউক, এব্‌নে যেয়াদ বদনেহাদ আর এক হাজার সৈন্যকে হোর-বিন্-এযিদ-য়েতিমির নেতৃত্বাধীনেও ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইল। ওমরু-বিন্-ছায়াদ কাদেছিয়ায় পঁহুছিয়া নানা দিকে সৈন্য দল প্রেরণ পূর্ব্বক, এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর সন্ধান লইবার ব্যবস্থা করিল। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও কিং-কর্ত্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় "শরাফ্" নামক স্থানে পঁহুছিলেন; তৎপরে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, হোর-বিন্-এযিদ এক হাজার

যোদ্ধৃপুরুষ সহকারে তাঁহায় সম্মুখে উপস্থিত। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) তাহাকে দেখিয়া, অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগের আহ্বানেই এখানে আগমন করিয়াছি। যদি তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি পালনে অটল থাক, তবে আমি তোমাদের নগরে প্রবেশ করি, নচেৎ আমি যেদিক হইতে আসিয়াছি, সেইদিকে ফিরিয়া চলিয়া যাই। হোর বলিলেন, আমীর ওবায়তুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদের আমার প্রতি এই আদেশ যে, আমি সসৈন্যে আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকি, এবং আপনাকে বন্দী অবস্থায় তাহার সম্মুখে উপস্থিত করি। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) বলিলেন, এ অপমান ত আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না যে, আমি গেরেফ্তার হইয়া এব্নে যেয়াদের সম্মুখে গমন করি। এই স্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে, যেয়াদ-বিন্-আবু ছুফিয়ানকে হজরত মৗবিয়া (রাজিঃ) স্বীয় ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিতেন না, তাঁহার বংশের লোকেরা যেয়াদকে ঘৃণা করিত; মহামান্য আমিরুল-মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহাকে হজরত মৗবিয়া (রাজিঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া জানিতেন; যদিও যেয়াদ হজরত আবু ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর পবিত্র এছলাম ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে একটি গ্রীক্ ক্রীত দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তবু তাহার অসাধারণ ধী-শক্তি, রাজনীতি কুশলতা ও শাসন কার্য্যে দক্ষতা দর্শনে তাঁহাকে বস্রার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। যেয়াদও ঐকার্য্য খুব দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহার পর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলে, হজরত মৗবিয়া (রাজিঃ) তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র দর্শনে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করেন; তাঁহারই দুর্দ্দান্ত ও দুরাশয় পুত্রের হস্তে হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) কিরূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়া এযিদের নামে বয়্য়েত করিতে পারিতেন? যাহা হউক, ইহার পর তিনি প্রত্যাবর্ত্তন

করিবার 'এরাদাঃ' (সঙ্কল্প) করিলেন, কিন্তু হোর,.এব্‌নে যেয়াদের ভয়ে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা প্রদান করিলেন। অর্থাৎ প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রোধ করিয়া স্বীয় সৈন্য দলসহ দণ্ডায়মান হইলেন। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) সেখান হইতে 'শেমাল' (উত্তর) দিকে গমন করিতে লাগিলেন, এবং ক্বাদেছিয়ার নিকটে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন, ওমরু-বিন্‌-ছায়াদ এক প্রবল সৈন্য দল লইয়া সেখানে অবস্থিতি করিতেছে। হোর সসৈন্যে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলেন। ক্বাদেছিয়ার নিকটে পঁহুছিয়া হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ১০ মাইল দূরবর্ত্তী "কারবালা" নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন; ওমরু-বিন্‌-ছায়াদ তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, এবং পরদিন সসৈন্যে কারবালায় গিয়া পঁহুছিল। ওমরু-বিন্‌-ছাদ স্বীয় সেনাদল হইতে অগ্রবর্ত্তী হইল হজরত এমাম ছাহেব (ছালঃ)-এর শিবিরের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিল, তিনি আহ্বান শুনিয়া নিকটে উপস্থিত হইলে ওমরু-বিন্‌-ছাদ তাঁহাকে বলিল ঃ—

"নিশ্চয় আপনি এযিদের 'মোকাবেলায়' (তুলনায়) খেলাফতের অধিকতর 'মস্তহক্ব্' (হক্‌দার) ঃ কিন্তু খোদা তা-লার ইহা ইচ্ছা নয় যে, আপনার খান্দানে 'হুকুমত্' (আধিপত্য) ও খেলাফত আইসে। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এবং হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর অবস্থা আপনার সম্মুখে সঙ্ঘটিত হইয়াছে। যদি আপনি এই 'ছোলতানৎ' ও হুকুমতের খেয়াল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হন, তবে অতি সহজেই 'আযাদ' (স্বাধীন) অবস্থায় থাকিতে পারেন। নচেৎ আপনার জীবনের আশঙ্কা আছে; আমরা আপনার গেরেফ্‌তারের জন্য নিযুক্ত হইয়াছি।"

তদুত্তরে হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালাম ফরমাইলেন ঃ—

"এক্ষণে আমি তিনটি প্রস্তাব তোমার নিকট 'পেশ' করিতেছি; ইহার মধ্যে যে প্রস্তাব ইচ্ছা আমার জন্য মঞ্জুর কর। প্রথম প্রস্তাব এই যে, আমি যে দিক্ হইতে আসিয়াছি, আমাকে ঐ দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দাও; আমি মক্কা-মোয়াজ্জমায় গমন পূর্ব্বক আল্লাহ্ তা'লার এবাদত-বন্দেগীতে আত্ম-নিয়োগ করিব। ২য়তঃ, আমাকে কোনও সীমান্ত প্রদেশের দিকে যাইতে দাও, সেখানে গিয়া আমি বিধর্ম্মীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইয়া যাইব। তৃতীয়তঃ, তুমি আমার পথ হইতে হটিয়া যাও, আমি সোজা-সুজি দেমেশ্‌কে এযিদের নিকট গমন করি, সেখানে এযিদ আমার সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে, তাহাই হইবে।

ওমরু-বিন্-ছায়াদ এই কথা শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইল; আর বলিল, আমি আপনা হইতে আপনাকে কোনও পাকা উত্তর দিতে পারি না। আমি কুফার শাসনকর্ত্তা ওবায়তুল্লাহ্ বিন্-যেয়াদকে সংবাদ পাঠাই; আমার বিশ্বাস, তিনি অবিলম্বে আপনার তিনটি প্রস্তাবের কোনও একটি প্রস্তাব মঞ্জুর করিবেন। তৎপর ওমরু-বিন্-ছায়াদ ঐ ময়দানেই সসৈন্যে শিবির সন্নিবেশিত করিল; এবং সমস্ত ব্যাপার এব্‌নে যেয়াদকে লিখিয়া পাঠাইল। ৬১ হিজরীর ২রা মহর্‌রম তারিখে এমাম ছাহেব আলায়হেচ্ছালাম কারবালায় পঁহুছিয়া ছিলেন; তৎপর দিন ওমরু-বিন্-ছায়াদ তথায় উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঐ দিন এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ঐরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ওবায়দুল্লাহ্ এব্‌নে যেয়াদ, ওমরু-বিন্-ছাদের পত্র পাঠ করিয়া খুব সন্তুষ্টি লাভ করিল, এবং বলিল, এমাম হোছেন (রাজিঃ) যে প্রস্তাব করিয়াছেন; তাহাতে বিপ্লবের অবসান হইবে। তিনি দেমেশ্‌কে এযিদের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে বয়্‌য়েত করিলে, আর কোনও খৎরাঃ (আশঙ্কা)ই বাকী থাকিবে না। কিন্তু শেমর যিল যোশন ঐ সভায় উপস্থিত ছিল, সে বলিল, হে আমির!

এসময় তোমার মহা সুযোগ উপস্থিত ; তুমি এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে এসময় 'কতল্' (হত্যা) করিলে তোমার প্রতি কোন 'এল্যাম' (দোষারোপ) হইবে না ; কিন্তু যদি এমাম হোছেন (রাজিঃ) এযিদের নিকট চলিয়া যান, তবে তাঁহার মোকাবেলায় তোমার কোন 'এয্যত' (সম্মান) ও 'কদর' (মর্য্যাদা—প্রতিপত্তি) অবশিষ্ট থাকিবে না। আর (এমাম ছাহেব) তোমাপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ করিবেন। দুর্ম্মতি শেমরের বাক্য শ্রবণে স্বার্থপর, গৌরব-লিপ্সু এব্নে যেয়াদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল ; সে উহার বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া ওমরু-বিন্-ছায়াদকে এই মর্ম্মের পত্র লিখিয়া পাঠাইল :—

" তোমার লিখিত ৩টি প্রস্তাবের একটিও মঞ্জুর করা যাইতে পারে না ; উহার কোনও প্রস্তাবই গ্রহণ যোগ্য নহে ; মাত্র একটি উপায় এই হইতে পারে যে, এমাম হোছেন (রাজিঃ) আমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া 'নেয়াবতান' (প্রতিনিধি-সূত্রে) প্রথমে আমার হস্তে বয়্য়েত করেন, পরে আমি তাঁহাকে স্বীয় বন্দোবস্তানুযায়ী খলিফা এযিদের নিকট রওয়ানা করিয়া দিব। "

এই উত্তর পাইয়া ওমরু-বিন্-ছাদ হজরত এমাম হোছেন আলায়-হেচ্ছালাম কে পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইল ; এবং বলিল, আমি 'মজবুর' (নিরুপায়) ; এব্নে যেয়াদ এযিদের খেলাফতের বয়্য়েত প্রথমে নিজে গ্রহণ করিতে চান, আর অন্য কোনও প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে তিনি রাজী নহেন।

হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম, এব্নে যেয়াদের পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া বলিলেন, এব্নে যেয়াদের হস্তে বয়্য়েত করাপেক্ষা আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

এব্নে ছাদ এই চেষ্টায় ছিল যে, যাহাতে কোনও রূপ শোণিতপাত

ব্যতীত এই ব্যাপারের মীমাংসা হইয়া যায়। হয় হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) এব্‌নে যেয়াদের প্রস্তাবে মঞ্জুর করেন ; কিংবা এব্‌নে যেয়াদই এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর ৩টি প্রস্তাবের কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে দেমেশ্‌কে্‌ এযিদের নিকট যাইতে দেন। এই সকল পত্র ব্যবহারে—প্রস্তাবের 'এন্‌কার' (অসম্মতি) ও 'এছরারে' (হঠকারিতায়—অস্বীকৃততে) এক সপ্তাহ কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। এই এক সপ্তাহ কাল মধ্যে হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম ও ওমরু-বিন্‌-ছায়াদ এবং তদীয় সৈন্যদল পরস্পর সম্মুখীন অবস্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মিলিয়া এব্‌নে ছায়াদ ও তাহার সেনাদল একত্রে নমায্‌ পড়িত ; এমাম ছাহেব (রাজিঃ)ই নমাযে এমামতি করিতেন ; এই সংবাদ যখন এব্‌নে যেয়াদের নিকট পঁহুছিল, তখন তাহার মনে এই আশঙ্কার উদ্রেক হইল যে, ওমর-বিন্‌-ছাদ না এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে। তদনুসারে সে অতি ত্রস্ততার সহিত জুয়েরাঃ-বিন্‌-এতিমি নামক এক চোপদারকে ডাকাইয়া, তাহার হস্তে এব্‌নে ছাদের নামে নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইল ঃ—

" আমি তোমাকে (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্‌-আলী (রাজিঃ)-কে গেরেফ্‌তার করিবার জন্য পাঠাইয়া ছিলাম ; তোমার ইহাই কর্ত্তব্য ছিল যে, উহাকে 'গেরেফ্‌তার' (বন্দী) করিয়া আমার নিকট আনিতে ; গেরেফ্‌তার করিতে না পারিলে উহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক আমার নিকট আনয়ন করিতে। আমি তোমাকে এই 'হোকম' (আদেশ) দিয়াছিলাম না যে, তুমি উহার 'মোছাহেবী এখ্‌তিয়ার' কর, এবং বন্ধুতা-সূচক সম্বন্ধ বাড়াও। এক্ষণে তোমার জন্য ইহাই 'বেহ্‌তর' (মঙ্গল-জনক) যে, তুমি এই পত্র পাঠ মাত্র (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্‌-

আলী (রাজিঃ)-কে অনতিবিলম্বে আমার নিকট আনয়ন কর ; তাহা না হইলে যুদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক আমার নিকট লইয়া আইস। পত্র পাওয়া মাত্র আমার আদেশ পালনে একটু মাত্র বিলম্ব করিলে, পত্রবাহক ছুরহঙ্গকে হুকুম দিয়াছি যে, তোমাকে বন্দী করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দেয় ; দ্বিতীয় সেনাপতি প্রেরণ পর্য্যন্ত সেনাদলকে ঐ স্থানে অবস্থান করিবার বন্দোবস্ত করে—যাহাকে আমি তোমার স্থলাভিষিক্ত করিয়া পাঠাইব।"

জুয়েরাঃ এই পত্র লইয়া ৬১ হিজরীর ৯ই মোহার্‌রম বৃহস্পতিবার দিন ওমরু-বিন্‌-ছাদ-এর নিকট পঁহুছাইল। এব্‌নে ছাদ ঐ সময় স্বীয় 'খিমায়' (শিবিরে) বসিয়াছিল। পত্রপাঠ মাত্র অশ্বারোহণ পূর্ব্বক স্বীয় সেনাদলকে সজ্জিত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিল ; এবং জুয়েরাঃ-বিন্‌-বদর এতিমিকে কহিল, তুমি সাক্ষী থাক, আমি আমীরের পত্র পাঠ মাত্র তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছি। সৈন্যদল অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইলে সে জুয়েরাঃকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইল, এবং এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে ডাকাইয়া বলিল, আমীর এব্‌নে যেয়াদের এই আদেশ-লিপি আসিয়াছে যে, আমি যদি তাঁহার আদেশ পালনে কিঞ্চিমাত্রও বিলম্ব করি, তবে এই 'কাছেদ' (দূত বা পত্রবাহক) বিদ্যমান আছে, ইহাকে হোকম দিয়াছেন যে, আমাকে তন্মুহূর্ত্তেই বন্দী করে। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) বলিলেন, আমাকে আগামী কল্য পর্য্যন্ত সময় দাও ; আমি ইতিমধ্যে চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া দেখি। এই কথা শুনিয়া এব্‌নে ছায়াদ জুয়েরার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, সে বলিল, কাল ত বেশী দূর নহে ; এতটা সময় দেওয়া কর্ত্তব্য। তদনুসারে এব্‌নে ছায়াদ স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল ; সৈন্যদিগকে ও অদ্যকার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিয়া বলিল, আজ যুদ্ধ হইবে না ; তোমরা অদ্য রাত্রের জন্য বিশ্রাম কর।

ওবায়তুল্লাহ্ এব্নে যেয়াদ, জুয়েরাঃ-বিন্-বদর এতিমিকে পত্র সহ এব্নে ছায়াদের নিকট পাঠাইয়া চিন্তা করিল যে, যদি এব্নে-ছায়াদ আমার আদেশ পালনে বিলম্ব করে, আর জুয়েরাঃ উহাকে বন্দী করিয়া লয়, তবে সৈন্যগণ সেনাপতি বিহীন অবস্থায় থাকিয়া 'মোন্তশর' (ছত্রভঙ্গ) হইয়া যাইবে, এবং এরূপ অবস্থায় ইহাও অসম্ভব নহে যে, ঐ নেতৃহীন সৈন্যদল এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে গিয়া সম্মিলিত হয়; এরূপ ঘটনা ঘটিলে বিষম অসুবিধায় পড়িতে হইবে, আর এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর পক্ষে বিশেষ সুযোগ ঘটিবে; হয় ত তিনি সেই সুযোগে মক্কাভিমুখে পলায়ন করিবেন। এই চিন্তা তাহার মনে উদিত হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ শেমর যিল যেশনকে ডাকিয়া পাঠাইল। সে উপস্থিত হইলে তাহাকে বলিল, আমি জুয়েরাঃ কে এব্নে ছাদের নিকট পাঠাইয়াছি, আর তাহাকে এই 'হোকম' (আদেশ) দিয়াছি যে, যদি এব্নে ছাদ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বিলম্ব করে, তবে উহাকে গেরেফ্তার করিয়া এখানে লইয়া আইসে। এব্নে ছায়াদ সম্বন্ধে আমার 'মোনাফেকানা' (বিশ্বাসঘাতকতা-মূলক) সন্দেহ আছে; যদি জুয়েরাঃ এব্নে ছায়াদ কে বন্দী করে, তবে তাহার অধীনস্থ যে সৈন্য দল কারবালার ময়দানে অবস্থান করিতেছে, উহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া নষ্ট হইবে; আমি এই কার্য্যের জন্য তোমা অপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র আর কাহাকেও দেখিতেছি না। তুমি এখনই কারবালা প্রান্তরাভিমুখে গমন কর; যদি এব্নে ছায়াদ বন্দী হইয়া থাকে, তবে তুমি গিয়া সেনাপতির পদ গ্রহণ কর; এবং এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া উহার মস্তক কাটিয়া আন। আর যদি এব্নে ছায়াদকে বন্দী করা না হইয়া থাকে, এবং সে যুদ্ধে বিলম্ব করে, তবে তুমি সেখানে পঁহুছামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দাও; ও আমার আদেশানুযায়ী অতি সত্বরে কার্য্য শেষ করিয়া ফেল। ওবায়তুল্লার

প্রস্তাব শুনিয়া শেমর যিল যোশন বলিল, আমার একটি শর্ত্ত আছে, তাহা এই যে, আপনি অবগত আছেন, আমার ভগিনী ওম্মল বয়ীন-বিন্তে-হরামকে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর চারিটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে; উহাদের নাম আবদুল্লাহ্ (রাজিঃ), জাফর (রাজিঃ), ওছমান (রাজিঃ) ও আব্বাছ (রাজিঃ)। আমার এই ভাগিনেয় চতুষ্টয় ও স্বীয় ভ্রাতা (হজরত এমাম) হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে কারবালা প্রান্তরে উপস্থিত আছে; আপনি আমার এই ভাগিনেয় চারি জনের জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করুন: তবেই আমি কারবালায় গমন করিতে পারি। এব্নে যেয়াদ এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কাগজ, কলম ও দোয়াত আনাইয়া, উপরোক্ত ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি-পত্র লিখিয়া দিল, এবং তাহাতে স্বীয় নাম স্বাক্ষর ও মোহর অঙ্কিত করিল। অতঃপর ঐ সময়েই তাহাকে কারবালাভিমুখে রওয়ানা করিয়া দিল। জুয়েরাঃ বুধবার দিবাগত রাত্রে রওয়ানা হইয়া বৃহস্পতিবার অতি প্রত্যুষে কারবালায় পঁহুছিয়াছিল; শেমর বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে রওয়ানা হইয়া ঐ দিন আছরের নমাযের সময় কারবালায় গিয়া পঁহুছে। শেমর পঁহুছিলে যুদ্ধ মুলতবি সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, উহাকে তাহা জানান হইল। দুর্ব্বৃত্ত শেমর এব্নে ছায়াদ কে বলিল, আমি ত যুদ্ধ সম্বন্ধে এক মুহূর্ত্তের ও 'মোহলত' (অবসর) দিব না। হয় তুমি এখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ সৈন্যদলের কর্ত্তৃত্ব আমার হস্তে অর্পণ কর। এব্নে ছায়াদ তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শেমরকে সঙ্গে লইয়া হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর নিকট গমন করিল; এবং তাঁহাকে বলিল, ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ এই দ্বিতীয় 'ক্বাছেদ' আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আপনাকে একটু মাত্র সময়ও মোহলত দিতে চাহেন না। তচ্ছ্রবণে হজরত এমাম হোছেন আলায়-

হেচ্ছালাম ফরমাইলেন, "'ছোব্‌হানাল্লাহ্‌' এক্ষণে 'মোহলত' (সময়) দেওয়া বা না দেওয়ার কি প্রয়োজন? সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিতেছে, তোমরা এই রাত্রিকালের জন্যও কি যুদ্ধ স্থগিত রাখিবে না? এই কথা শুনিয়া পাষাণ হৃদয় দুরাচার শেমর যিল-যোশনও আগামী কল্য প্রভাত কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখা 'মোনাছেব' (কর্ত্তব্য) মনে করিল; এবং উভয়ে আপনাদের শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাত্রি-কালেই এব্‌নে যেয়াদের পত্র সহ কুফা হইতে আর একজন লোক আসিল, ঐ পত্রে আদেশ ছিল, যদি এখনও যুদ্ধ আরম্ভ না হইয়া থাকে, তবে এই আদেশ-লিপি পঁহুছিবামাত্র পানীর উপর 'কব্‌জাঃ' (আধিপত্য বিস্তার) করিয়া লও। আর (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্‌-আলী (রাজিঃ) ও তাঁহার সঙ্গীয় লোকদিগের পক্ষে পানী বন্ধ করিয়া দাও। যদি সৈন্যদল শেমরের নেতৃত্বাধীনে আসিয়া থাকে, তবে আমার এই আদেশ তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করা চাই। এই আদেশ-লিপি পঁহুছিবামাত্র ওমরু-বিন্‌-ছায়াদ, ওমরু বিনল্‌ হেজাজকে ৫০০ পাঁচ শত সৈন্য দিয়া 'ফোরাৎ (ইউফ্রেটিস্‌) নদীর তীরে স্থাপন করিল। এমনই ব্যাপার যে, সে দিন হজরত এমাম (রাজিঃ) ছাহেবের লোকেরা প্রয়োজনীয় পানীও নদী হইতে তুলিয়া আনিয়া রাখিয়া ছিলেন না। তাঁহাদের সমুদয় জলাধার (মোশক প্রভৃতি পানীর পাত্র) পানী শূন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল। রাত্রিকালে যখন তাঁহারা পানী আনয়ন জন্য নদী তীরে গমন করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, শত্রুগণ নদী-তট দখল করিয়া পানী লইবার পথ বন্ধ করিয়া আছে। হজরত এমাম ছাহেব আলায়হেচ্ছালাম এই সংবাদ শ্রবণে স্বীয় ভ্রাতা হজরত আব্বাছ-বিন্‌-আলী (রাজিঃ)-কে ৫০ জন যোদ্ধ্‌পুরুষ সহ পানী আনয়ন জন্য ফোরাত নদীর তটে পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য, বল পূর্ব্বক পানী আনয়ন

করেন ; কিন্তু 'জালেম'গণ পানী আনিতে দিল না। ৫০০ সৈন্যের সঙ্গে ৫০ জন লোক যুদ্ধ করিয়া পানী আনয়ন করা সম্ভবপরও ছিল না ; বিশেষতঃ নিকটেই এব্‌নে ছায়াদ ও শেমরের মূল সৈন্যদল অবস্থিত করিতে ছিল ; সংবাদ পাইবামাত্র তাহারাও তন্মুহূর্ত্তে নদী-তটে উপস্থিত হইত। মরুভূমির দারুণ গ্রীষ্ম, তাহাতে পানীয় সম্পূর্ণ অভাব, ক্রমে দারুণ পিপাসায় সকলেই অস্থির হইয়া পড়িলেন। এই পানীর অভাব এমন একটি 'আযিয়েত্‌' ('মছিবত'—কষ্টকর ব্যাপার) ছিল যে, তীর ও তরবারির ব্যবহারও ঈদৃশ ভীষণ মর্ম্মান্তিক ক্লেশকর নহে।

পাঠক! এই ৯ই দিবাগত ১০ই মোহার্‌রমের ভীষণ রাত্রির কথা একবার স্মরণ করুন ; হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের শিবির কয়টিতে আজ কি হৃদয় বিদারক শোচনীয় দৃশ্য! এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর মুষ্টিমেয় আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত সহচর এবং অনুচর ; আর কতিপয় স্ত্রীলোক বালক বালিকা মাত্র। এব্‌নে ছায়াদ ও শেমরের এবং ঈঙ্গে সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে এমাম ছাহেব (ছালঃ)-এর যে শেষ কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহাতে সকলেই বুঝিয়া লইয়াছেন যে, নিশাবসানে সকলকেই মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন করিতে হইবে। এই রাত্রিই সকলের পক্ষে জীবনের শেষ রাত্রি। তজ্জন্য তাঁহারা কেহই বিচলিত, ভীত বা আতঙ্কিত হইয়াছিলেন না ; তাঁহারা সকলেই আল্লাহর প্রতি নির্ভরকারী পরম ধার্ম্মিক পুরুষও ধর্ম্ম-পরায়ণা নারী। সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কেহই জীবন দানে অণুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহারা সপ্তাহ কাল পূর্ব্বেই মৃত্যু নিশ্চিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; এব্‌নে ছায়াদ ও কুফাবাসী বিশ্বাস ঘাতকদিগের পাশব আচরণের পরিণাম ফল যাহা হইবে, তাহা তাঁহাদের বুঝিতে বাকী ছিল না! পাষণ্ড শেমরের আগমনে তাঁহাদের পরিণাম যে আরও শোচনীয় হইবে, তাহা তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এক্ষণে পানী বন্ধ হওয়াতে যুদ্ধের পূর্ব্বেই যে পিপাসায় মরিতে হইবে, তজ্জন্যই তাঁহারা নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। মানুষ অনাহারে বহু সময় থাকিতে পারে; কিন্তু পিপাসার্ত্ত হইয়া কতক্ষণ থাকা যায়? এরাকের মরু প্রদেশ কিরূপ গরম, সেখানে গ্রীষ্মের কিরূপ আতিশয্য, তাহা ভুক্ত-ভোগিগণই অনুভব করিতে পারেন। পানীর সুবিধা হইবে বলিয়া ফোরাত নদীর তটেই হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। মোছলমান হইয়া মোছলমানের পানী বন্ধ করিবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল; বিশেষতঃ হজরত নবী করিম (রাজিঃ)-এর প্রিয় দৌহিত্র-রত্ন এবং তদ্বংশীয়দিগের মহিলা ও বালক-বালিকাদিগের পানী বন্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে জীবন্মৃত করিবে, ইহা চিন্তা ও খেয়াল করা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। ২১।২২ বৎসর পূর্ব্বে যে কুফানগর হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াযহুর রাজধানী ছিল; তিনি তখনও অর্দ্ধ মোছলেম-জগতের সর্ব্ববাদী-সম্মত খলিফা ছিলেন; কুফাবাসিদিগের কতকগুলি লোক নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল, এব্নে ছাবার মতাবলম্বী থাকিলেও, অধিকাংশ অধিবাসী শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জন্য প্রাণদানে প্রস্তুত ছিল; বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর পতাকা-মূলে ও ৪০ হাজার যোদ্ধ্ পুরুষ সমবেত হইয়াছিল; আর আজ? আজ সেই কুফাবাসী বিশ্বাসঘাতক, ধূর্ত্ত, কাপুরুষ, কপটাচারিগণ, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে বয়্যেত করিবার জন্য আহ্বান করিয়া, দুরাচার ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদের আদেশে যুদ্ধ করিয়া বধ করিবার জন্য অগ্রসর; কেবল তাহাই নহে, তাঁহাদের জন্য পানী বন্ধ করিয়া, তাঁহাদিগকে যুদ্ধের পূর্ব্বেই বধ করিবার জন্য প্রস্তুত! কুফার প্রধান প্রধান লোকেরা—যাহারা এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-কে অতি ভক্তিভাবে খেলাফৎ প্রদানের আশা দিয়া আহ্বান করিয়াছিল, তাহারাই ত্যাগ এব্নে

যেয়াদের প্রেরিত সেনাদলের নেতৃরূপে, কারবালাক্ষেত্রে হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের প্রাণবধার্থ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উপস্থিত! ইহাদের হৃদয় কি পাষাণ! ইহাদের প্রবৃত্তি কি নীচ! ইহাদের কপটতা ও কাপুরুষতা কি ঘৃণিত ও সাঙ্ঘাতিক! ইহাদের হৃদয় হইতে এছলাম ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল; ইহাদের হৃদয়ে শয়তান যেন পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল; নরাধম ওবায়দুল্লার ভয়ে এবং তাহার একটু করুণা-দৃষ্টি লাভাশার ইহারা পরকালের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল; ইহারা যে মোছলমান, একথা বিস্মৃতি সলিলে বিসর্জ্জন দিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহামান্য ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের সন্তান-সন্ততিও ছিল; তাহার জীবন্ত আদর্শ ওমরু-বিন্-ছায়াদ-বিন্-আবি ওক্কাছ। ফেরেশ্‌তার ঘরে শয়তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আর শেমর-প্রমুখ কতিপয় পাষণ্ড, কতিপয় নরাধম!! এই কাল রাত্রির অবসানে সদল-বলে মহামান্য এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-কে বধ করিতে পারিবে বলিয়া কতই না আনন্দিত! আজ ভীষণ নিশান্তে হাশেম-বংশের গৌরবান্বিত সন্তানগণ, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নয়ন তারা আদর্শ মোছলমান ও আদর্শ মহাপুরুষগণ, সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যদা রক্ষার্থ, পবিত্র এছলাম ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থ কারবালা-প্রান্তরে দেহপাত করিবেন, এজন্য ফেরেশ্‌তাঃ-গণও শোকাকুলিত। পক্ষান্তরে ওমরু-বিন্-ছায়াদ ও শেমর-প্রমুখ মহাপাতকী পাষণ্ডদিগের শিবির আনন্দ কোলাহলে মুখরিত। আজ প্রায় তের শত বৎসর পরে যে শোচনীয় ঘটনা স্মরণ করিতে আমাদের বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়; মোছল-মান জগতে শোকের প্রবল প্লাবন উপস্থিত হয়—সেইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার, শোচনীয় অনুষ্ঠান, ভীষণ সংহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে এব্‌নে যেয়াদ, বদ-নেহাদ-প্রমুখ কুলাঙ্গারদিগের মনে একটুও ভাবান্তর উপস্থিত হইল না। যাঁহার মহামান্য পিতার আশ্রয়ে, অনুগ্রহে, দয়া ও সহানুভূতি প্রভাবে

হজরত আবু ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর বংশীয় লোকদিগের দ্বারা নিন্দিত, উপেক্ষিত, পরিত্যক্ত ওবায়তুল্লার পিতা যেয়াদ, উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন; বস্রার গৌরবান্বিত শাসনকর্ত্তার পদলাভ করিয়াছিলেন, হজরত আমীর মৌবিয়া (রাজিঃ) পূর্ব্বে যাঁহাকে ভ্রাতা বলিয়া কখনও স্বীকার করেন নাই; তাঁহার বুদ্ধিমত্তা দর্শনে মহামান্য আমিরুল-মুমেনিন হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু যাঁহাকে সস্নেহে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন; তাঁহারই ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া পাষণ্ড ওবায়তুল্লাহ্ আজ নবী-বংশ ধ্বংস করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! তাঁহাদিগকে পদে পদে অবমানিত ও লাঞ্ছিত করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প!! পাষণ্ডের পরকালের ভয় একটুও হইল না। মোছলমান নামে পরিচিত হইয়া এই নর-পিশাচ ও ইহার অনুচরগণ কিরূপে ঈদৃশ মনুষ্যত্ব হীন অকৃতজ্ঞতা-সূচক বর্ব্বরোচিত পৈশাচিক কার্য্য করিতে কোমর বাঁধিয়া ছিল, তাহা আমাদের কল্পনারও বহির্ভূত। তুচ্ছ শাসনকর্তৃত্বের লোভে, পার্থিব গৌরব ও আড়ম্বর লাভেচ্ছায় সে বা তাহারা পরকালের আশায় জলাঞ্জলি দিল কাট্টা কাফের হইতেও নৃশংসতা প্রকাশ করিল, ইহা একটা কল্পনাতীত ব্যাপার। আজ তের শত বৎসর ধরিয়া মোছলমানগণ কোটি কোটি কণ্ঠে এই সকল নর-নিশাচের ঘৃণিত আত্মার প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করিতেছেন; উহাদের বংশধরগণ মোখ্তারের হস্তে নির্ম্মূল হইয়া কিছু অবশিষ্ট থাকিলেও, আজ দুনিয়াতে তাহাদের অস্তিত্ব নাই; তাহারা বাঁচিয়া থাকিলেও আত্ম-পরিচয় দিতে অসমর্থ। পরিচয় পাইলে মোছলমানগণ "লানত-মালামত" না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না।

সে যে কি ভীষণ কাল রাত্রি ছিল, স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। দারুণ পিপাসায় সকলেই ছট্ফট্ করিতেছেন; অসহ্য তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, কয়টি তাম্বুর মধ্যে এক বিন্দু পানী নাই, নির্দ্দয়

পাষণ্ডগণ নদী-তট আগুলিয়া আছে। পশু-পক্ষী সকলেই ফোরাতের পানী পান করিবার অধিকারী ; কেবলমাত্র নবী-বংশের জন্যই আজ উহার পানী বন্ধ। সেই রাত্রির এক এক পল যেন এক এক বৎসর বলিয়া অনুমিত হইতেছে, মহিলাগণ নিশাবসানের কথা—আগামী কল্যের কথা ভাবিয়া আকুল। শিবির কয়টি দুঃখ-ব্যাকুলতা ও আর্ত্তনাদে মুখরিত। চেরাগ গুলিও যেন শোক-দুঃখে আলো বিস্তার করিতেছে না। মনোদুঃখে বায়ু ও যেন প্রবাহিত হইতেছে না। ফোরাতের স্রোতও যেন প্রবাহিত হইতেছে না।

হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র আলী-বিন্-হোছেন (রাজিঃ) পীড়িত অবস্থায় 'খিমায়' (শিবিরে—তাম্বুতে) শয্যাশায়ী ছিলেন ; হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর আহ্‌লিয়া এবং তদীয় ভগিনী হজরত ওম্মে কলছুম (রাঃ—আঃ), ইহা দেখিয়া আর রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র শত্রুদল আক্রমণ করিবে—যে সকল 'আযিয্' ও 'আকারেব' (আত্মীয়-স্বজন)- এখানে উপস্থিত আছে, সকলেই কতল ও শহীদ হইয়া যাইবেন, ইহা স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) খিমার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; এবং বলিলেন, শত্রুদল আমাদের অতি নিকটেই শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছে, তোমাদের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া উহারা আনন্দ লাভ করিবে ; আর আমাদের সঙ্গীয় লোকদিগের হৃদয় ভঙ্গ হইয়া যাইবে ; অতএব তোমরা ক্রন্দন করিও না। যাহা হউক, অনেক চেষ্টায় তাঁহাদের ক্রন্দন বন্ধ করিয়া তিনি শিবিরের বাহিরে আগমন করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন ; বাস্তবিকই স্ত্রীলোক এবং বালক-দিগকে সঙ্গে আনিয়া আমি অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি ; ইহাদিগকে কিছুতেই সঙ্গে আনা উচিত ছিল না। আমি আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ

শুনিলাম না ; বিশেষতঃ পিতৃব্য হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ), পরিবার বর্গ সঙ্গে আনিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন—প্রবল ভাবে বাধা দিয়াছিলেন, আমি তাঁহার অনুরোধ উপরোধে কর্ণপাত করিলাম না। অতঃপর তিনি আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত অনুচর বৃন্দকে আহ্বান করিয়া ফরমাইলেন, তোমরা এখান হইতে যে যে দিকে যাওয়া 'মোনাছেব' (উচিত) মনে কর, সেই দিকে চলিয়া যাও। তোমাদিগকে কেহই কিছু বলিবে না ; কারণ শত্রুপক্ষ আমার প্রতিই বিরূপ ; আমার হত্যা সাধন করাই উহাদের উদ্দেশ্য, তোমরা চলিয়া গেলে তাহারা ও 'গণিমত' মনে করিবে, আমি তোমাদিগকে প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি প্রদান করিতেছি, তোমরা স্বস্ব প্রাণরক্ষা কর। সঙ্গীয় আত্মীয়-স্বজন এবং অনুগত ভক্তবৃন্দ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, আমরা কোনও ক্রমেই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব না, আমরা সকলেই আপনার উপর 'কোরবান' (উৎসর্গীত প্রাণ) হইয়া যাইব। আর যে পর্য্যন্ত আমাদের দেহে জীবন থাকিবে, আপনার উপর কষ্ট হইতে কিছুতেই দিব না। ইহার একটু পরেই :তয় বংশীয় তরমাহ-বিন্-আদি নামক এক ব্যক্তি গুপ্তভাবে এমামে ছাহেব (রাজিঃ)-এর শিবিরে উপস্থিত হইলেন ; ঐ ব্যক্তি কোনও কার্য্যোপলক্ষে এই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, এবং হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) ও এব্‌নে ছায়াদের সৈন্যদলের বিষয় এবং এব্‌নে যেয়াদের ভীষণ সঙ্কল্পও পৈশাচিক আদেশের কথা শুনিয়া হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন, আপনি একাকী আমার সঙ্গে চলুন, আমি আপনাকে এমন এক গোপনীয় পথে এখান হইতে লইয়া যাইব যে, কেহ ইহার সন্ধানই পাইবে না। আর স্বীয় সম্প্রদায় বনি তয় এর মধ্যে পঁহুছাইয়া, তাহাদের ৫ হাজার যোদ্ধৃ পুরুষকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিব ; আপনি তাহাদিগকে যে আদেশ করিবেন,

বিনা আপত্তিতে—অবনত মস্তকে তাহারা সেই আদেশ পালন করিবে। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) বলিলেন, আমি এই মাত্র আমার এই সঙ্গীয় আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত-অনুগত লোকদিগকে বলিয়া ছিলাম, তোমরা আমাকে একাকী ফেলিয়া চলিয়া যাও, এবং আপনাদের প্রাণ-রক্ষা কর। কিন্তু তাহারা আমার সে প্রস্তাব কোনও ক্রমেই গ্রহণ করে নাই; এরূপ ক্ষেত্রে কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে যে, আমি ইহাদিগকে শত্রুর অস্ত্র-মুখে ফেলিয়া একাকী চলিয়া যাই। সঙ্গীয়গণ বলিলেন, হজরত! আপনি এই মাত্র ফরমাইলেন যে, শত্রুদল আমাদিগকে কিছুই বলিবে না, উহারা কেবলমাত্র আপনারই 'দোস্মণ' (শত্রু); সুতরাং এরূপ অবস্থায় আপনার একাকী চলিয়া যাওয়া ও প্রাণরক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য; সম্ভবতঃ আমাদিগকে তাহারা বধ করিবে না। তখন হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) গভীর মর্ম্ম বেদনা সহকারে ফরমাইলেন, হে প্রিয় আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত বৃন্দ! একথা কিছুতেই সম্ভবপর নহে যে, আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী স্বীয় প্রাণরক্ষা করণার্থ গোপনে এখান হইতে চলিয়া যাইব। অতঃপর তয় বংশীয় সেই সহৃদয় ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। এইরূপে সেই কাল রজনীর অবসান হইল।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালাম সদলবলে ফজরের নমায্ আদায় করিলেন। পূর্ব্ব গগনে তরুণ অরুণ দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে শেমর-যিল যোশনও ওমরু-বিন্-ছায়াদ স্ব স্ব সেনাদল সুসজ্জিত করিয়া মহোৎসাহে ও মহোল্লাসে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। কুফী যোদ্ধ্ পুরুষগণ পিশাচের ন্যায় নর্ত্তন ও কুর্দ্দন করিয়া বিকট তাণ্ডব সহকারে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ৭০।৮০ জন লোকের বিরুদ্ধে ৫।৬ হাজার দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ কি বিবেচনা বহির্ভূত হৃদয় হীন নৃশংস ব্যাপার!

আর সেই মুষ্টিমেয় লোক সারারাত্রি দারুণ পিপাসায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া মৃতকল্প হইয়াছেন; তাঁহাদের গলনালী শুকাইয়া গিয়াছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। নৃশংস নরাধমদিগের হৃদয়ে মনুষ্যোদিত দয়া ও সহানুভূতির লেশমাত্রও নাই। যাহা হউক, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ও স্বীয় মুষ্টিমেয় ভাই-ভাতিজা, আত্মীয়-স্বজন এবং ভক্ত-বৃন্দকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া যথোচিত উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক যথোপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। দুরাত্মা শেমর যিল যোশন স্বীয় ভাগিনেয় আবদুল্লাহ্‌ (রাজিঃ), জাফর (রাজিঃ), ওছমান (রাজিঃ) ও আব্বাছ (রাজিঃ)—হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর এই পুত্র এবং হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চতুষ্টয়কে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ডাকাইয়া বলিল, তোমাদিগকে আমীর এব্‌নে যেয়াদ 'আমান' (শান্তি—জীবন রক্ষার অধিকার) প্রদান করিয়াছেন। এতচ্ছ্‌বণে তাঁহারা বজ্র-নির্ঘোষে উত্তর করিলেন যে, এব্‌নে যেয়াদের 'আমান' (শান্তি প্রদান) হইতে আল্লাহ্‌ তা-লার আমান 'বেহতর' (উৎকৃষ্ট)। তাঁহাদের এই খোদা তা-লার প্রতি নির্ভর-সূচক সদর্প বাণীতে দুরাচার শেমরের কাল মুখ অধিকতর কালিমা-প্রাপ্ত হইল। জাহান্নামের ভীষণ অগ্নি উহার বক্ষঃস্থলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পাপাচারীর পাপ-পিপাসা কি সহজে নিবৃত্ত হয়? ভাগিনেয় চতুষ্টয়ের মুখের মতন উত্তরে ও পাষণ্ডের চৈতন্যোদয় হইল না।

কোনও কোনও রওয়ায়েতানুসারে ১০ই মোহর্‌রম তারিখের এই যুদ্ধে—অন্যায় সংগ্রামে হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের সঙ্গে ৭২ জন মাত্র পুরুষ ছিলেন। কোনও কোনও রওয়ায়েতানুসারে লোক সংখ্যা ১৪০ একশত চল্লিশ এবং কোনও কোনও বর্ণনানুসারে তাঁহাদের সংখ্যা ২৪০ জন ছিল। যদি উর্দ্ধ সংখ্যা এই ২৪০ জনই ধরা হয়, তবুও শত্রু পক্ষের সহস্র সহস্র সৈন্যের তুলনায় ইঁহাদের সংখ্যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ছিল।

আর শত্রুদল অস্ত্র-শস্ত্রে সম্পূর্ণ রূপ সজ্জিত, পক্ষান্তরে এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর সঙ্গিগণের মধ্যে উহার অনেকটা অভাব ছিল। হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম স্বীয় সঙ্গীয় লোকদিগকে উপযুক্ত স্থানে দাঁড় করাইয়া স্বয়ং উষ্ট্রারোহণে একাকী কুফী সৈন্যদিগের সম্মুখে গমন করিলেন। উহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে ফরমাইলেন, হে কুফিগণ! আমি একথা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার এই বক্তৃতা এ সময় আমার পক্ষে কোনও রূপ ফলপ্রদ হইবে না। আর তোমরা যে কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, তাহা হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। কিন্তু আমি ইহা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি যে, এক্ষেত্রে খোদা তা-লার আদেশ তোমাদের প্রতি পূর্ণ এবং আমার 'ওযর' (আপত্তি) ও প্রকাশ হউক। তিনি এই পর্য্যন্ত কথা বলিবামাত্র তাঁহার 'খিমাঃ' (শিবির) হইতে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। এই ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া স্বীয় বাক্যস্রোত বন্ধ করিলেন, এবং "লাহওলা" পড়িলেন; এবং ফরমাইলেন (হজরত) আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) আমাকে ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক এবং বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন না। আমি বড়ই ভুল করিয়াছি যে, তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করি নাই। পরে খানিকদুর পশ্চাদগমন পূর্ব্বক ভ্রাতা এবং পুত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া ফরমাইলেন, তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে রোদন করিতে নিষেধ কর, এবং এ সময় 'খামুশ' (নীরব) থাকিতে বল। আগামী কল্য যেন খুব প্রাণ ভরিয়া রোদন করে। তাঁহারা মহিলাদিগকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া ক্রন্দন বন্ধ করাইলেন। অতঃপর হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালাম পুনঃ অগ্রসর হইয়া কুফীদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিম্ন-লিখিত রূপ বক্তৃতা প্রদান করিলেন :—

"হে লোক সকল! তোমরা প্রত্যেকেই আমাকে বেশ করিয়া জান এবং চেন। আর যাহারা না জান, তাহারা অবগত হও যে, আমি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়াছাল্লামের 'নওয়াছাঃ' (দৌহিত্র—নাতি), এবং হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর পুত্র। হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) আমার জননী এবং হজরত জাফর তইয়্যার (রাজিঃ) আমার চাচ্চা (পিতৃব্য) ছিলেন। এই 'ফখর নছিবী', (বংশ-গৌরব) ব্যতীত আমার এ গৌরব ও আছে যে, আঁ হজরত (ছালঃ) আমাকে এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে 'জন্নত' বাসী যুবকগণের 'ছরদার' (নেতা) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যদি আমার কথায় তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তবে এখন পর্য্যন্ত আঁ হজরত (ছালঃ)-এর বহুসংখ্যক 'ছাহাবাঃ' জীবিত আছেন, তোমরা তাঁহাদের নিকট আমার বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিতে পার। আমি কখনও 'ওয়াদাঃ-খেলাফি' (প্রতিশ্রুতি পালনের বিপরীতাচরণ) করি নাই; আমি কখনও নমায্ 'ক্বযা' করি নাই; আমি কোনও মুমেন (মোছলমান)-কে 'ক্বতল' (হত্যা) করি নাই—কিংবা কাহাকেও 'আযার' পঁহুছাই নাই (কষ্ট দেই নাই); যদি হজরত ঈছা আলায়হেচ্ছালামের গর্দ্দভটি আজ জীবিত থাকিত; তবে সমুদয় ঈছায়ী (খৃষ্টীয়ান) ক্বেয়ামত পর্য্যন্ত সেই গর্দ্দভকে প্রতিপালন ও উহার তত্ত্বাবধান করিত। তোমরা কেমন মোছলমান ও ওম্মতে মোহাম্মদী যে, স্বীয় রছুলের 'নওয়াছাঃ' (নাতি)-কে হত্যা করিতে চাও? তোমাদিগের মধ্যে কি খোদা তা-লার 'খওফ্' (ভয়) ও রছুলের 'শরম' (লজ্জা) নাই? আমি যখন জীবনে কাহাকেও হত্যা করি নাই, তখন আমার নিকট হইতে কাহারও মৃত্যুর প্রতিশোধও গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এ অবস্থায় আমার শোণিতপাত করা তোমরা কিরূপে 'হালাল' (বৈধ)

মনে করিতেছ? আমি দুনিয়ার ঝগড়া হইতে 'আযাদ' (স্বাধীন) থাকিয়া মদীনায় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পাদপদ্মে শান্তিতে বাস করিতে ছিলাম, তোমরা আমাকে সেখানে সেই শান্তিভোগ করিতে দিলে না। পরে মক্কা শরীফে গিয়া পবিত্র খানাঃ খোদায় (কাবাগৃহে) এবাদত-বন্দেগীতে ব্যাপৃত ছিলাম, হে কুফিগণ! তোমরা সেখানেও আমাকে শান্তির সহিত বাস করিতে দাও নাই। আর ক্রমাগত আমাকে এই মর্ম্মের পত্র লিখিতে লাগিলে যে, আপনাকে আমরা এমামতের হক্‌দার মনে করি; আপনি এখানে আসুন, আমরা আপনার হস্তে খেলাফতের 'বয়্‌য়েত' করিব। যখন আমি তোমাদের আহ্বানে এখানে আসিলাম, তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলে; আমাকে হত্যা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলে। এখনও যদি তোমরা আমার 'মদদ' (সাহায্য) কর; তবে আমি এইটুকু মাত্র চাই যে, আমাকে 'কতল' (হত্যা) করিও না। আর আমাকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দাও, আমি মক্কা কিংবা মদীনায় গিয়া খোদা তা-লার এবাদত-বন্দেগীতে আত্ম-নিয়োগ করি; আর খোদা তা-লা এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন যে, কে হক্ পথে (ন্যায়পথে) ছিল; আর কে 'জালেম' (অত্যাচারী) ছিল।"

হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর এই বক্তৃতা শুনিয়া যুদ্ধোদ্যত কুফিগণ নীরব হইয়া রহিল, কাহারও মুখ হইতে বাক্য স্ফূরণ হইল না। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম আবার ফরমাইলেন:—

"খোদা তাঁলার শোকর, আমি তোমাদের প্রতি 'হুজ্জত' পূর্ণ করিয়া দিলাম, অতঃপর তোমরা আর কোনও 'ওযর পেশ' (আপত্তি উত্থাপন) করিতে পারিবে না।"

অবশেষে তিনি কুফার নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার আহ্বানকারীদিগের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া আওয়াষ্ দিলেন :—হে শব্‌ত-বিন্‌-রবয়ী, হে হেজাজ-বিন্‌-আল্‌-হছন, হে কয়েছ-বিন্‌-আল আয়ত, হে হোর-বিন্‌-এযিদ এতিমি ইত্যাদি—তোমরা কি আমাকে পত্র লিখিয়া ছিলে না ? আর বিশেষ অনুরোধের সহিত আমাকে এখানে আসিবার জন্ম আহ্বান করিয়াছিলে না ? তৎপর আমি যখন তোমাদের আহ্বানে এখানে আসিলাম, তখন আমাকে হত্যা করিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়াছ ? " ইহা শুনিয়া সেই মিথ্যাবাদী ভণ্ড কপটের দল বলিয়া উঠিল, আমরা আপনাকে কোন পত্র লিখি নাই, বা ডাকিয়া পাঠাই নাই। ইহা শুনিয়া হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ঐ সকল পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিলেন এবং বলিলেন, এই তোমাদের পত্র গুলি ও উহার মর্ম্ম। তখন ঐ নির্লজ্জ বেহায়া কাপুরুষের দল অম্লান বদনে বলিয়া উঠিল, আমরা এই সকল পত্র লিখিয়া থাকি, কিংবা না লিখিয়া থাকি, তাহা যাইতে দিন, কিন্তু আমরা এক্ষণে প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা আপনার প্রতি 'বেযার' (নারাজ—অসন্তুষ্ট)। এই কথা শুনিয়া জনাব হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) উষ্ট্র হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন ; এবং যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইলেন।

পাঠক ! ইহা ৬১ হিজরীর পবিত্র মোহর্‌রম মাস—পবিত্র আশুরার দিবস এবং পবিত্র জুমার দিন ছিল। এই পবিত্র দিনে মোছলমান নাম-ধারী কুফার বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন, কপট ও নির্ম্মম পাষণ্ড যোদ্ধৃগণ এব্‌নে ছায়াদ ও শেমর-যিল্‌ যোশন কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া মহামান্ত হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) ও তাঁহার মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র দলটিকে হত্যা করিবার জন্ম মহোৎসাহে ও মহোল্লাসে অগ্রসর। ইহাদের হৃদয় কি পাষাণ ! ইহাদের অন্তঃকরণ কি পাপ-কালিমায় কলঙ্কিত। ইহারা কি নির্দ্দয়

ও নৃশংস নর-পিশাচ। পৃথিবীর কোনও নির্দ্দয়-নৃশংস লোকের সঙ্গে ইহাদের শয়তানী কার্য্যের তুলনা হয় না। ইহারা মোছলমান নামে পরিচিত হইয়া " লায়েলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদোর রছুলোল্লাহ্ " এই পবিত্র কলেমা উচ্চারণ করিয়া, এছলাম ধর্ম্মের শেষ প্রবর্ত্তক, শেষ নবী— আখেরী রছুল, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্‌মদ মোজতবা (ছালঃ)-এর প্রিয়তম দৌহিত্র, আদর্শ চরিত্র, আদর্শ ধার্ম্মিক, আদর্শ নেতা, আদর্শ মনুষ্য এবং আদর্শ মোছলমান হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) এবং নবী বংশের অন্যান্য যুবক ও বালক মণ্ডলীকে হত্যা করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কোনও বিধর্ম্মী কাফেরও এরূপ ভীষণ ও পৈশাচিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারিত কি না সন্দেহ, ফলতঃ এরূপ নৃশংস কার্য্যের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। যাহা হউক, কুফি-দল হইতে প্রথমেই একটা যোদ্ধা যুদ্ধ করণার্থ এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু উহার অশ্বটি হঠাৎ ভড়্‌কিয়া উঠাতে আরোহী তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। এতদ্দর্শনে হোর-বিন্-এযিদ এতিমি সবলে অশ্ব ধাবিত করিয়া, সম্মুখ দিকে ঢাল স্থাপন পূর্ব্বক এমন ভাবে অগ্রসর হইলেন, যেন কেহ শত্রুকে আক্রমণের জন্য উৎসাহ-ভরে অগ্রসর হয়; এই বীরপুরুষ হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়াই ঢালখানি হস্ত হইতে ফেলিয়া দিলেন; তদ্দর্শনে হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হোর! তুমি কি জন্য আসিয়াছ? হোর বলিলেন, আমি ঐ ব্যক্তি—যে আপনাকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া (বেষ্টন করিয়া) এবং আপনার পথাবরোধ করিয়া কোনও দিকে যাইতে দেয় নাই; এবং আপনাকে এই ময়দানে অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছিল; আমি এই কুকার্য্যের প্রতিকার বা পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপনার পক্ষাবলম্বন

পূর্ব্বক কুফিদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। আপনি আমার জন্য 'মগ্‌ফেরাতের' (পারলৌকিক মুক্তি লাভের) জন্য দোওয়া করুন। হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) তাঁহাকে দোওয়া করিলেন; এবং তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ও সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। ঐ সময় শেমর যিল জোশন এব্‌নে ছায়াদকে বলিল, তুমি এক্ষণে আক্রমণ কার্য্যে কেন বিলম্ব করিতেছ? তচ্ছ্‌বণে ওমরু-বিন্-ছায়াদ একটি তীর হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর যোদ্ধ্‌দলের প্রতি নিক্ষেপ করিল; এবং শেমরকে বলিল, তুমি সাক্ষী থাক যে, এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর সেনাদলের প্রতি আমিই সর্ব্বপ্রথমে তীর নিক্ষেপ করিলাম। স্বার্থান্ধ এব্‌নে ছায়াদ, এব্‌নে যেয়াদ বদনেহাদের তৃপ্তি সাধন জন্য—তাহাকে রাজী রাখিয়া রয়ও তেহারান প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভের জন্য এইরূপ তোষাখোদ পূর্ণ উক্তি করিল; এবং সে যে ওবায়দুল্লার নিতান্ত আজ্ঞাবহ, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল। ইহার পর কুফি দল হইতে দুই জন যোদ্ধা বাহির হইল; এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে একজন বাহাদুর বীরপুরুষ অগ্রসর হইয়া ঐ উভয় কুফি যোদ্ধাকে শমন সদনে পাঠাইলেন। এইরূপে দ্বৈরথ যুদ্ধ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চলিল, ইহাতে কুফিদিগের পক্ষে অধিক সংখ্যক যোদ্ধা নিহত হইল। ইহার পর হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে এক এক জন বীরপুরুষ বাহির হইয়া সিংহ-বিক্রমে তাহাদের দলে প্রবেশ পূর্ব্বক, বহু সৈন্যের প্রাণ সংহারান্তে শাহাদতের শরবৎ পান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বীর-বিক্রমে বহুসংখ্যক কুফি যোদ্ধা শমন সদনে প্রেরিত হইতে লাগিল; ইহাতে ওরুর-বিন্-ছায়াদ ও শেমর অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গীয় জীবনোৎসর্গকারী বীরপুরুষগণ আলে-আবিতালেব অর্থাৎ আবিতালেব বংশীয় হাশেমী বীর বৃন্দকে ঐ সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হইতে দেন নাই—যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের একজন মাত্রও জীবিত ছিলেন। নবী বংশের প্রতি ইঁহাদের কিরূপ অতুলনীয় ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল, এই ঘটনার দ্বারা তাহার জলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ভক্ত ও অনুচর বৃন্দ সকলেই যখন শত্রু হস্তে শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলেন, তখন হজরত মোছলেম-বিন্-আঁকিল (রাজিঃ)-এর ভ্রাতাগণও পুত্রগণ সমর-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বহু কুফী সৈন্যের নিপাত সাধন করিয়া ইঁহারাও একে একে শহীদ হইয়া গেলেন। ইহার পর হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত আলী আকবর (রাজিঃ) ক্ষুধার্ত্ত কেশরীবৎ শত্রু-সৈন্যদলে প্রবেশ পূর্ব্বক, রোস্তমের ন্যায় মহাবীরত্ব সহকারে শত্রু সৈন্যের ধ্বংস সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি একবার সম্মুখে, একবার দক্ষিণে, একবার বামে অস্ত্র সঞ্চালন পূর্ব্বক যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাইলেন। অবশেষে অসংখ্য শত্রু দলের অজস্র অস্ত্র-প্রহারে তরবারি নেযাঃ (বর্শা বিশেষ) ও তীর দ্বারা জর্জ্জরিত হইয়া ক্ষত-বিক্ষত দেহে সমর-ক্ষেত্রে চির বিশ্রাম লাভ করিলেন। ইঁহার শাহাদৎ-প্রাপ্তি দর্শনে হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালাম শোক-সংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রশোকে তাঁহার হৃৎপিণ্ড যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অতঃপর এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর ভ্রাতা হজরত আবদুল্লাহ্ (রাজিঃ), মোহাম্মদ (রাজিঃ), আব্বাছ (রাজিঃ), ওছমান (রাজিঃ) ও অন্যান্য ভ্রাতাগণ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মহাবীর-বিক্রমে শত্রু সেনাদলে প্রবেশ করিলেন; এবং ভীষণ ভাবে শত্রু দলকে আক্রমণ করিয়া হাশেমী বীরত্বের পূর্ণ 'জওহর' দেখাইলেন। তৃষ্ণার্ত্ত বীরবৃন্দ অসংখ্য শত্রু সৈন্যের দেহ-পরম্পরায় কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে সমাচ্ছন্ন করিয়া একে একে শহীদ হইয়া গেলেন। ইহার পর এমাম আলায়হেচ্ছালামের তরুণ বয়স্ক

বীরপুত্র হজরত কাছেম (রাজিঃ) * শত্রু সেনাদলে প্রবেশ পূর্ব্বক অসংখ্য কুফি যোদ্ধার প্রাণ সংহার করিয়া শহীদ ও জন্নতবাসী হইলেন। এইস্থলে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকের মতে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত কাছেম (রাজিঃ) এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন; এবং মহা পরাক্রমের সহিত বহুসংখ্যক শত্রু সৈন্যের নিপাত সাধন পূর্ব্বক শহীদ হইয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের ভক্ত সহচর বৃন্দ, ক্রীতদাসগণ, ভ্রাতাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভাগিনেয়গণ, পুত্রগণ—একে একে সকলেই শহীদ হইয়া গেলেন। তাঁহারা যুদ্ধে যে অমানুষিক বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না; তাঁহাদের মধ্যে কেহ একটু মাত্র 'কমযোরী' ও 'বোয্‌দেলী' (দৌর্ব্বল্য ও কাপুরুষতা) প্রদর্শন করিয়াছিলেন না; পক্ষান্তরে প্রসন্ন চিত্তে পবিত্র এছলাম ধর্ম্মের গৌরব—ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা এবং এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর জন্য সম্মুখ সমরে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন। অকাতরে শত শত অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শত্রু সৈন্য নিপাত সাধনে বিরত হন নাই। যদি তাঁহারা দারুণ পিপাসায় কাতর না হইতেন, তাহা হইলে কারবালার যুদ্ধে কুফি-সৈন্য চতুর্গুণ নিহত হইত। পিপাসায় তাঁহাদের কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল; ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল; এই অবস্থায়ও সেই মুষ্টিমেয় খোদাগত প্রাণ আদর্শ মোছলমানগণ যে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না। আল্লাহ তা'-লার ছাচ্চা 'বান্দাঃ'—হজরত নবী করিম (ছালঃ)-এর অকপট ভক্ত ও ওম্মতগণ কারবালা যুদ্ধে পবিত্র ধর্ম্মের যে

---

* কোনও কোনও গ্রন্থে এমাম ছাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র আলী আছগর নামে অভিহিত হইয়াছেন।

আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন ; তাহা কেয়ামত পর্য্যন্ত স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) যদি এছলামের গৌরব ও আত্ম-মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া পাপাচারী এব্‌নে যেয়াদ-বদনেহাদ ওবায়দুল্লার দরবারে উপস্থিত হইতেন, এবং এযিদের খেলাফৎ স্বীকার পূর্ব্বক উহার হস্তে বয়্‌য়েত করিতেন, তবে তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদিগের জীবন রক্ষা হইত। হয়ত দেমেস্কে উপস্থিত হইলে এযিদ তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিত ; তাঁহার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ বৃত্তিরও বরাদ্দ করিত ; কিন্তু তিনি দুষ্ক্রিয়াশীল ধর্ম্মদ্রোহী এযিদের খেলাফৎ স্বীকার করিতে কোনও ক্রমেই ইচ্ছুক ছিলেন না। আর পিতৃ-ভৃত্য যেয়াদের পুত্র পাপাচারী ওবায়দুল্লার দরবারে তিনি গিয়া এযিদের নামে বয়্‌য়েত করিবেন, ইহা ত একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। পাপাচারী এব্‌নে যেয়াদ যাঁহার পিতার অন্নে প্রতিপালিত ও গর্দ্দভের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল ; তাঁহার প্রতি এই অকৃতজ্ঞতা মূলক নির্দ্দয় ব্যবহার—এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার !

অবশেষে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) স্বীয় পরম ভক্ত ও বিশ্বস্ত অনুচর বৃন্দ, ভ্রাতাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভাগিনেয়গণ এবং পুত্রগণ,—সকলকে হারাইয়া একাকী রহিয়া গেলেন। 'খিমায়' (শিবিরে) স্ত্রীলোকগণ এবং একমাত্র পীড়িত কনিষ্ঠ পুত্র আলী ওস্ত্—অর্থাৎ এমাম যয়নাল আবেদীন (রাজিঃ) ব্যতীত আর কেহই অবশিষ্ট ছিলেন না। হৃদয়হীন পাষণ্ড ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ, তাহার উপযুক্ত চেলা-চামুণ্ডা ওমর-বিন্-ছায়াদ ও শেমরের নিকট এরূপ ভীষণ আদেশ ও পাঠাইয়াছিল যে, এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর (পবিত্র) মস্তক কাটিয়া তাঁহার লাশ (মৃতদেহ) অশ্ব পদ-তলে দলিত এবং প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিবে।

হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম যখন একাকী মাত্র রহিয়া গেলেন, তখন তিনি শত্রুপক্ষকে যেরূপ অসাধারণ ও অতুলনীয় বীরত্বের

সহিত আক্রমণ করিলেন, তাহা দেখিবার জন্য তদীয় 'হামরাহী' (সঙ্গীয়) দিগের মধ্যে কেহই তখন অবশিষ্ট ছিলেন না,।তিনি ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত কুফীদিগকে আক্রমণ করিয়া ঝড়ে নিপতিত কদলী গাছের ন্যায় ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন। কখনও সম্মুখ দিকে, কখনও দক্ষিণ দিকে, কখনও বাম দিকে অস্ত্র সঞ্চালন করিয়া শত্রুদিগকে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অমানুষিক বীরত্বের সম্মুখে আজ কেহই তিষ্ঠিতে পারিতেছিল না। নিদারুণ শোক-দুঃখে তাঁহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইতেছিল, দারুণ পিপাসায় তাঁহার ছাতি ফাটিয়া যাইতে ছিল, মোছলমান নামধারী পাষাণ হৃদয় পাষাণ্ডদিগের নেযাঃ তরবারি ও তীরের আঘাতে তাঁহার শরীর জর্জ্জরীত হইতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে ছিল, তবু তিনি ক্রোধিত কেশরীবৎ শত্রু সংহার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কত কুফী বীরের ছিন্ন মস্তক ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, কাহাকেও তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিলেন, কেহ-ছিন্ন বাহু হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল, কাহারও মস্তক হইতে কোমর পর্য্যন্ত দুই ফাঁক হওয়াতে বিরাট তাল তরুর ন্যায় ভূপতিত হইল, কাহারও কোমরের ঊর্দ্ধভাগ তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইল। তাঁহার ঈদৃশ অসামান্য বীরত্ব দর্শনে নরাধম ওমর-বিন্-ছায়াদ ও নর পিশাচ শেমর-যিল যোশন একে অপরকে বলিতেছিল, আমরা এরূপ বাহাদুর ও অতুলনীয় বীরপুরুষ অদ্যাপি দেখি নাই। বীরেন্দ্র কেশরী হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর বীরপুত্র হজরত এমাম হোছেন আলায়-হেচ্ছালাম, পিতার উপযুক্ত তনয়-রত্নই ছিলেন; মহামান্য শেরেখোদা (রাজিঃ)-এর পুত্র আজ 'শেরে নর' সদৃশ শত্রুদল নিপাত করিতেছিলেন। কিন্তু সহস্র সহস্র শত্রুর সম্মুখে একজন বীরপুরুষ কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারেন—কত সময় আত্ম-রক্ষা করিতে পারেন? তাঁহার বীরত্ব-কাহিনীতে

কোনও রূপ কল্পনা বা অতি রঞ্জনের লেশমাত্রও নাই। বনি-হাশেমের গৌরব স্তম্ভ, হজরত রেছালৎমাব (ছালঃ)-এর পরম স্নেহাধার দৌহিত্র, হজরত শেরে খোদার প্রিয়তম পুত্র, হজরত ফাতেমা যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর চক্ষের পুত্তলী, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর স্নেহাস্পদ অনুজ, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) আজ অতি অন্যায় রূপে মোছলমান নামধারী দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ডদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আল্লাহ, তাঁ'লার পবিত্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন। আজ পবিত্র আশুরার দিন—পবিত্র জুমার দিন, পাষণ্ড কুফিগণ এহেন পবিত্র দিনে কি ভীষণ পাপানুষ্ঠানেই না প্রবৃত্ত হইয়াছে। এমাম আলায়হেচ্ছালামের মহামান্য মাতামহ (ছালঃ) মাত্র ৫০ বৎসর অপেক্ষাও কম সময় পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, এই অল্পকাল মধ্যে মহানবীর একদল পাপীষ্ঠ 'ওম্মত' (শিষ্য), তদীয় পরম-স্নেহভাজন দৌহিত্র-রত্নকে শহীদ করিবার জন্য রণক্ষেত্রে দানব-বেশে অবতীর্ণ; পাষণ্ডদিগের খোদা ও রছুলের ভয় হইল না, পরলোকের চিন্তা হইল না, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়া আনিয়া, আজ তাঁহার হত্যা কার্য্য সম্পাদনে পরমোৎসাহে অগ্রসর। কিন্তু তাহাদের বহু পাপাচারী, বহু নরাধম, মহামান্য এমাম আলায়হেচ্ছালামের পরম ভক্ত অনুচর বৃন্দের দ্বারা, ভ্রাতা-ভ্রাতুষ্পুত্র-ভাগিনেয় ও পুত্রগণের দ্বারা, ও তাঁহার স্বহস্তে নিহত হইয়া জাহান্নমবাসী হইয়াছে; হতাবশিষ্ট নর-পিশাচগণ দূর হইতে তীর ও নেযাঃ (বল্লম বা বর্শা বিশেষ) নিক্ষেপ করিতেছে; তদ্দ্বারা মহামান্য এমাম আলায়হেচ্ছালামের পবিত্র দেহে ৪৫টি তরবারি ও নেযার, আর ৩৫টি তীরের 'যখম' হইয়াছিল। কিন্তু এই ভীষণ 'যখম' (অস্ত্রের আঘাত) লইয়া ও তিনি শত্রুর নিপাত সাধন করিতেছিলেন। অন্য রওয়ায়েত অনুসারে তাঁহার পবিত্র দেহে ৩৩টি 'যখম' নেযার ও ৪৩টি

'যখম' তরবারির হইয়াছিল; তদ্ব্যতীত অসংখ্য তীরের যখম ছিল। প্রথমে তিনি অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিতেছিলেন; কিন্তু যখন তাঁহার প্রিয় অশ্বটি মারা গেল, তখন পদাতিক রূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শত্রুদলের মধ্যে ইহা কেহই ইচ্ছা করিত না যে, হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালাম আমার হস্তে শহীদ হন; বরং সকলেই আক্রমণ কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে—পাশ কাটাইতে চেষ্টা পাইত; এবং তাঁহাকে আপনার নিকট হইতে দূরীবর্ত্তী রাখিতে চেষ্টা করিত। অবশেষে দুরাত্মা শেমর-যিল-যোশন ৬ জন যোদ্ধৃপুরুষকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে ভীমবেগে আক্রমণ করিল; তন্মধ্যে, এক ব্যক্তির তরবারির আঘাতে তদীয় পবিত্র বাম হস্ত খানি ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি দক্ষিণ হস্তে উহাকে তরবারির আঘাত করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে দক্ষিণ হস্তখানি আর এক পাষণ্ডের তরবারির আঘাতে এমনভাবে 'মজরুহ' (আহত) হইল যে, তিনি আর তরবারি উত্তোলন করিতে পারিলেন না। এই সময় পশ্চাদ্দিক্ হইতে দুর্ব্বৃত্ত ছনান-বিন্-আনছ নখয়ী সবলে নেযাঃ নিক্ষেপ করিল; ঐ নেযাঃ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে প্রবিষ্ট হইয়া উদর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। আহা! এই ভীষণ আঘাতেই তিনি ভূপতিত হইলেন। **নরাধম যখন নেযাঃ টানিয়া বাহির করিল, তখনই তাঁহার পবিত্র অমর আত্মা দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক "জন্নতুল ফেরদওছে" চলিয়া গেল (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাযেউন)।** ইহার পর মালাউন শেমর, কিংবা তাহার আদেশে তদীয় কোনও সঙ্গী; এমাম আলায়হেচ্ছালামের পবিত্র মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। কেবল তাহাই নহে, নর-পিশাচ ওবায়দুল্লার আদেশানুযায়ী দুরাচার শেমর ১২ জন অশ্বারোহী 'মতয়ন' (নিযুক্ত) করিল, উহারা তাঁহার

পবিত্র দেহের উপর অশ্ব প্রধাবিত করিয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অস্থি রাজি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল। পৃথিবীতে এরূপ নৃশংস আচরণের দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে। এই মানুষ গুলি দৈত্য-দানব বা হিংস্র পশু হইতেও নৃশংস ছিল। মোছলমান দূরে থাকুক, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরাও এই শোচনীয় ঘটনার বিষয় পাঠ করিয়া শোক-দুঃখে মুহ্যমান হন। দুনিয়াতে কোনও ধর্ম্ম-প্রচারকের পুত্র-পৌত্র বা দৌহিতের প্রতি তাঁহার ভক্ত বা শিষ্য মণ্ডলী এরূপ নৃশংস পৈশাচিক ব্যবহার করে নাই। পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত মোছলমানগণ এই সকল পাষণ্ডের আত্মার প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করিতেছে—আর কেয়ামত পর্য্যন্ত করিবে। কুফার অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা এই পাপানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিল, এবং পাপাচারী ওবায়দুল্লাহ্, ওমরু-বিন্-ছায়াদ, শেমর-যিল যোশন প্রভৃতি এক একটি জীবন্ত পিশাচ ছিল; উহারা মোছলমান কেন? মানব নামেরও কলঙ্ক। উহারা দুনিয়াতেই পাপের পূর্ণ প্রতি-ফল ভোগে করিয়াছিল; পরকালের বিষয় আল্লাহ্ তা'লাই জানেন।

অতঃপর কুফি পাষণ্ডগণ হজরত এমাম আলায়হেচ্ছামের 'খিমাঃ' (শিবির) লুণ্ঠন করিল। "আহ্লে বয়েত" (আঁ হজরত [ছালঃ] এর পরিবারবর্গ—অর্থাৎ তাঁহার বংশের মহামাননীয়া মহিলা) দিগকে বন্দী করিল। এমাম আলায়হেচ্ছালামের রুগ্ন কনিষ্ঠ পুত্র হজরত এমাম জয়নাল আবেদীন (রাজিঃ)-এর প্রতি যখন নরাধম শেমর যিল যোশনের দৃষ্টি পতিত হইল, তখন সে তাঁহাকেও হত্যা করিতে চাহিল; কিন্তু ওমরু-বিন্-ছায়াদ তাহাকে এই দুষ্কার্য্য হইতে ক্ষান্ত রাখিল। হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের পবিত্র মস্তক মবারক ও আহ্লে বয়েত্‌কে বন্দী অবস্থায় কারবালার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কুফায়, নর-পিশাচ এব্নে যেয়াদের নিকট পাঠাইল; কুফায় ইঁহাদিগের সম্বন্ধে 'তশ্‌হীর' (মন্দভাবে

ঘোষণা—বে-আদবীর সঙ্গে তাঁহাদের বিষয় প্রচার) * করা হইল। অবশেষে দুরাচার এব্‌নে যেয়াদ এক দরবার আহ্বান করিল, হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের পবিত্র মস্তক এক 'তশ্‌তে' (থালা বা ঐ শ্রেণীর কোনও পাত্রে) রাখা হইল; নরাধম ওবায়দুল্লাহ্‌ ঐ পবিত্র মস্তকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বে-আদবী জনক কথা বলিল; অতঃপর এই ঘটনার তৃতীয় দিবসে দুর্ব্বৃত্ত শেমর যিল যোশনকে এক 'দস্তাঃ' (দল) সৈন্য সহকারে, উক্ত 'ছের মবারক' (পবিত্র মস্তক) ও বন্দীদিগকে দেমেশ্‌কে এযিদের নিকট পাঠাইয়া দিল। এই পবিত্র মস্তকের 'কারামত' সম্বন্ধে বহু গ্রন্থে বহু অপূর্ব্ব ঘটনার উল্লেখ আছে; উহার সকল 'কারামত' প্রামাণ্য না হইতে পারে, কিন্তু বহু 'কারামত' ঐতিহাসিকদিগের সিদ্ধান্তানুযায়ী প্রামাণ্য। যাহা হউক, উক্ত পবিত্র মস্তক ও পীড়িত হজরত যয়নাল আবেদীন (রাজিঃ) এবং আহ্‌লে বয়েত (আঁ হজরত [ছালঃ]-এর বংশীয় শিশু ও মহিলাগণ) দেমেশ্‌কে এযিদের নিকট যখন পঁহুছিল; হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর ছিন্ন মস্তক সে যখন দেখিতে পাইল, তখন সে সেই প্রকাশ্য দরবারে ক্রন্দন করিয়া উঠিল; এবং বলিতে লাগিল, এই 'ছমিতাঃ'-পুত্রকে (এব্‌নে যেয়াদ বদ নেহাদকে) আমি কবে হুকুম দিয়াছিলাম যে, (হজরত) এমাম হোছেন-বিন্‌-আলী (রাজিঃ)-কে 'কতল' (শহীদ—হত্যা) করে। তৎপর পাষণ্ড শেমর-যিল-

---

* এস্থলে "তশ্‌হীর" অর্থে মহামান্য এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর ছের 'মোবারক' (পবিত্র মস্তক) নেযায় বিদ্ধ করিয়া আহ্‌লে বয়্‌য়েতের সঙ্গে কুফা নগরের রাজপথে ভ্রমণ করাইল; আর রাজদ্রোহীর প্রতি এইরূপ শাস্তি বিধান করা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করাইল—অর্থাৎ অপমানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল।

খোশনও অন্যান্য এরাকীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি ত তোমাদের আনুগত্য স্বীকারে ও আমার নামে 'বয়্‌য়েত' করাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম, তোমরা (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্‌-আলী (রাজিঃ)-কে কেন হত্যা করিলে? দুর্ব্বৃত্ত শেমর যিল খোশনও উহার 'হামরাহী' (সঙ্গীয়) পাষণ্ডগণ আশা করিয়াছিল, তাহাদের ঈদৃশ পৈশাচিকও দানবীয় কার্য্যে এযিদ আমাদের প্রতি খুব সন্তুষ্ট হইয়া, আমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিবে; এবং আমাদিগের 'এয্‌যত্‌' (সম্মান) খুব বাড়াইবে; কিন্তু এযিদ উহাদিগকে পুরস্কৃত এবং সম্মানিত করিবে দূরে থাকুক, বরঞ্চ উহাদের প্রতি 'নাখুশী' (অসন্তুষ্টি—বিরক্তি) ও 'নারাজী' প্রকাশ করিল; আর উহাদিগকে ঐ অবস্থায়ই কুফায় ফেরত পাঠাইয়া দিল। পাষণ্ডগণ আপনাদের কাল মুখ লইয়া, নিতান্ত 'বেযার' হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। পাপাচারী এব্‌নে যেয়াদ ও উচ্চতম পুরস্কার, উচ্চতম পদ প্রাপ্তি এবং ধন্যবাদ প্রাপ্তির যে আশা করিয়াছিল, তাহাও নিরাশায় পরিণত হইল; তখন উহার হৃদয়ে যেন শত শত কালসর্প দংশন করিতে লাগিল। 'কমবখ্‌তের' (হতভাগার) রূহ্‌ (আত্মা) আরও 'ছেয়াহ্‌' (কাল) হইল।

এযিদ অতঃপর দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, (হজরত এমাম) হোছেন (রাজিঃ)-এর মাতা, আমার মাতা অপেক্ষা 'আচ্ছা' (উত্তম—শ্রেষ্ঠ) ছিলেন; উঁহার 'নানা' (মাতামহ) আঁ হজরত (ছালঃ) সমুদয় রছুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং আদমের আওলাদের 'ছরদার' (নেতা) ছিলেন। কিন্তু আমার পিতা মাবিয়া (রাজিঃ) ও হজরত আলী (রাজিঃ)-এর মধ্যে ঝগড়া ও বিবাদ ছিল; সেই সূত্রে আমার সঙ্গে ইঁহার মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল; (হজরত) এমাম হোছেন (রাজিঃ) ও উঁহার পিতা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)

বলিতেন, যাঁহাদের পিতামাতা আচ্ছা হয়, সেই ব্যক্তিই খলিফা হইবার যোগ্য; কিন্তু কোরআন শরীফের এই আয়াতের প্রতি তাঁহারা 'গওর' (মনোযোগ প্রদান) করেন নাই যে,—

" কুলিল্লা হুম্মা মালেকাল মোল্কে তুতেল মোলকা মান তাশাও " (আয়াত শেষ পর্য্যন্ত)। অবশেষে সকলেই বুঝিতে পারিল যে, খোদা তা-লা আমার অনুকূলেই 'ফয়ছলাঃ' (মীমাংসা) করিয়াছেন।

অতঃপর এই কয়েদীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত 'মেহমান' (অতিথি) স্বরূপ স্বীয় মহলে রাখিল; মহাসম্মানিতা মহিলা (আহ্লে বয়েত) দিগকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিল; তাঁহারা এযিদের 'মহল ছরায়' অন্তঃপুরে) প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, এযিদের পরিবারস্থ মহিলাগণ ঐরূপ ক্রন্দন, বিলাপ ও শোক প্রকাশ করিতেছেন—যেরূপে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর ভগিনী ও 'আহ্লিয়া' (স্ত্রী) প্রভৃতি, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) এবং অপরাপর শহীদদিগের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছিলেন। কিয়দ্দিবস শাহী 'মেহমান' (অতিথি) রূপে থাকিয়া এই 'বরবাদ শোদাঃ' (ধ্বংস প্রাপ্ত) কাফেলাঃ দেমেশ্ক্ হইতে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইল। এযিদ ইঁহাদিগকে যথোচিত পরিমাণ অর্থাদি দিয়া সসম্মানে বিদায় করিল। আর আলী-বিন্-হজরত এমাম হোছেন—এমাম যয়নাল আবেদীন (রাজিঃ)-কে সর্ব্ব-প্রকার 'এমদাদ' (সাহায্য) করিতে প্রতিশ্রুত হইল। তদ্ব্যতীত ইহাও বলিয়া দিল যে, আপনার যখন যাহা প্রয়োজন হয়, আমাকে জানাইলেই আমি তাহা পাঠাইয়া দিব।

এযিদ নানাপ্রকার পাপ কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও, হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে পাপীষ্ঠ এব্নে যেয়াদকে কখনও আদেশ প্রদান করিয়াছিল না। ওবায়হুল্লার নামে তাহার যে সকল আদেশ-

পত্র গিয়াছিল, ইতিপুর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে ; উহার কোনও আদেশ-লিপিতেই এরূপ কোন হুকুম ছিল না যে, হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামকে 'কতল' (শহীদ) করিবে, কিংবা তাঁহার ও তদীয় পরিবার বর্গের প্রতি কোনও রূপ অত্যাচার-অনাচার, অসম্মান জনক ব্যবহার ও বে-আদবী করিবে। প্রধানতঃ তাঁহাকে কুফায় প্রবেশ করিতে বাধা দিবার জন্যই আদেশ ছিল। পরবর্ত্তী ঘটনা-পরম্পরায় প্রমাণিত হইতেছে যে, এই অন্যায় ও হৃদয়-বিদারক হত্যাকাণ্ডে সে খুবই দুঃখিত হইয়াছিল। সে যদি তাঁহার আদেশের বিপরীত আচরণ করিবার জন্য পাষণ্ড এব্‌নে যেয়াদ, পাপীষ্ঠ শেমর-যিল যোশন-প্রমুখ দুর্ব্বৃত্তদিগের প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিত, তবে তাহার দুর্ণামের অনেকটা লাঘব হইত। সে " লানত-মালামত " হইতে অনেকটা রক্ষা পাইত। এরূপ আদেশ-অবমাননা কারীদিগকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করিলে, এতৎ সম্বন্ধে তাহার ন্যায় পরতা প্রকাশ পাইত। কিন্তু সে উহাদিগের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছিল। খোদা তালার উদ্দেশ্য মানুষের বুঝিবার শক্তি নাই ; তিনি এমাম আলায়হেচ্ছালাম, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বর্গ, পুত্র ও ভক্ত অনুচরদিগকে নৃশংস ভাবে হত্যা করাইয়া শাহাদতের উন্নত আদর্শ দেখাইয়াছেন ; এবং এই শোকাবহ ঘটনাটিকে চির স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। আজ কোটি কোটি কণ্ঠে তাঁহাদের পবিত্র আত্মার জন্য মঙ্গল কামনা করা হয়, পক্ষান্তরে দুর্ব্বৃত্ত হত্যাকারীদিগের প্রতি " লানত-মালামত " (অভিসম্পাত) করা হইয়া থাকে। এই অতি অন্যায় অনুষ্ঠান-কারীদিগের প্রতি অতি অল্প কাল মধ্যেই যে কঠোর দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ; তাহাও 'গওর' এবং 'খেয়াল' করিবার বিষয়। পাষণ্ড-দিগের সকলেই সমুচিত দণ্ড ভোগ করিয়া ছিল ; কেবল তাহাই নয়— তাহাদের পুত্র কলত্র—সন্তান-সন্ততি বর্গের মধ্যেও অনেকেই এই মহাপাপের

প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অতি শোচনীয় ভাবে নিহত হইয়া ছিল; কারবালা-কাণ্ডে যে সকল পাষণ্ড 'শরীক' (সহযোগী) ছিল; আল্লাহ্ তায়ালার পার্থিব দণ্ড বিধান হইতে তাহাদের কেহই অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল না। ঐ কাণ্ডের প্রধান প্রধান নেতাদিগের 'নাপাক' (অপবিত্র) দেহগুলি ও অতি ঘৃণিত ভাবে ধ্বংস বা আগুণে পোড়াইয়া ভস্মস্তূপে পরিণত করা হইয়াছিল। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে কৌশলময় আল্লাহ্ তা-লার অনন্ত কৌশলেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

কারবালায় শাহাদত প্রাপ্ত মহাত্মা-গণের নামের তালিকা।

১। ছৈয়দশ্ শোহাদাঃ হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম এব্‌নে হজরত আলী (কঃ—ওঃ); ২। হজরত ওছমান-বিন্-আলী (রাজিঃ); ৩। হজরত আব্বাছ এব্‌নে আলী (রাজিঃ); ৪। হজরত মোহাম্মদ এব্‌নে আলী (রাজিঃ); ৫। হজরত জাফর এব্‌নে আলী (রাজিঃ); ৬। হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আলী (রাজিঃ); ৭। হজরত কাছেম এব্‌নে এমাম হাছন (রাজিঃ); ৮। হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-হাছন (রাজিঃ); ৯। হজরত ওমর এব্‌নে এমাম হাছন (রাজিঃ); ১০। হজরত আবুবকর এব্‌নে এমাম হাছন (রাজিঃ) ১১। হজরত আলী আকবর এব্‌নে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ); ১২। হজরত আলী আছগর এব্‌নে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ); ১৩। হজরত মোহাম্মদ-এব্‌নে আবদুল্লাহ্-বিন্-জাফর তইয়্যার (রাজিঃ); ১৪। হজরত

য়ওন-এব্‌নে আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-জাফর তইয়্যার (রাজিঃ); ১৫। হজরত আবদুল্লাহ্‌ এবনে য়কিল (রাজিঃ); ১৬। হজরত আবদুর রহমান এব্‌নে য়কিল (রাজিঃ); ১৭। হজরত জাফর এব নে য়কিল (রাজিঃ)। এই ১৭ জন মহাত্মা " আহ্‌লে বয়েত আত্‌হার " কারবালায় শহীদ হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কুফায় (১) হজরত মোছলেম-বিন্‌-য়কিল (রাজিঃ) ও তাঁহার দুই পুত্র (২) এব্‌রাহিম (রাজিঃ) এবং (৩) মোহাম্মদ (রাজিঃ) শহীদ হন ; সুতরাং ইঁহাদের (নবী বংশের) সংখ্যা মোট ২০ বিংশতি জন।

কারবালার অন্যান্য শহীদগণের নাম।

১। হজরত হোর-বিন্‌-এযিদ আল্‌ রেয়াহী ; ২। হজরত মছয়ব-বিন্‌-এযিদ আল্‌ রেয়াহী (হোরের ভ্রাতা); ৩। হজরত আলী-বিন্‌-হোর ; ৪। হজরত য়খাঃ (হজরত হোরের ক্রীতদাস); ৫। হজরত যবির-বিন্‌-হেছান আছদী ; ৬। হজরত আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-ওমর ; ৭। হজরত বরির-বিন্‌-হছির হমদানী। ৮। হজরত ওহব-বিন্‌-আবদুল্লাহ আল্‌ কল্‌বী ; ৯। হজরত য়োমরু-বিন্‌-খালেদ ওয়্‌দী ; ১০। হজরত খালেদ-বিন্‌-ওমরু-ওয়্‌দী ; ১১। হজরত ছায়াদ-বিন্‌ হনযলাঃ য়েতিমি ; ১২। হজরত ওমরু-বিন্‌-আবদুল্লাহ্‌ নদহজী ; ১৩। হজরত য়েমাদ-বিন্‌-আনছ ; ১৪। হজরত ওকাছ-বিন্‌-মালেক ; ১৫। হজরত ছরিহ-বিন্‌-য়বিদ ; ১৬। হজরত মোছলেম-বিন্‌-য়ওছজঃ আছদী ; ১৭। এব্‌নে মোছলেম বিন্‌-য়ওছজঃ আছদী ; ১৮। হজরত

বেলাল-বিন্-নাফেয় ছুজলবী ; ১৯। হজরত আবতুল্লাহ্ য়িয়্নী ; ২০। হজরত এহিয়া-বিন্-ছলিম মাযনী ; ২১। হজরত আবতুর রহমান-বিন্-য়রুহ-গফ্ফারী ; ২২। হজরত মালেক-বিন্-আনছ ; ২৩। হজরত য়মরু-বিন্-মতালয় আল জয়ফি ; ২৪। হজরত ক্বয়েছ-বিন্-ময়িনাঃ ; ২৫। হজরত হাশেম-বিন্-য়তবাঃ-বিন্-ওকাছ ; ২৬। হজরত হবিব-বিন্-মজাহের ; ২৭। হজরত হরাঃ ; ২৮। হজরত য়েযিদ এব্নে মহাজর জয়ফি ; ২৯। হজরত আনিছ-বিন্-ময়কল আছজি ; ৩০। হজরত আবছ-বিন্-শয়শাকরী ; ৩১। হজরত হজাজ-নিন-মছরুক জয়ফি ; ৩২। হজরত ছয়েফ্-বিন্-হারেছ-বিন্-ছরিয় ; ৩৩। হজরত মালেক-বিন্-আবতুল্লাহ্-বিন্-ছরিয় ; ৩৪। হজরত হনজলাঃ-বিন্-ছায়াদ য়জলী ; ৩৫। য়েযিদ-বিন্-যেয়াদ আল্ য়াছবাঃ ; ৩৬। হজরত ছয়ীদ-বিন্-আল্ থফি ; ৩৭। হজরত থযাদাঃ-বিন্-হারেছ ; ৩৮। হজরত য়মরু-বিন্-থবাদাঃ ; ৩৯। হজরত মরত-বিন্-আবি ছরত গফ্ফারি ; ৪০। হজরত মোহাম্মদ-বিন্-মকদাদ ; ৪১। হজরত আবতুল্লাহ্-বিন্-আবি দোজানাঃ ; ৪২। হজরত ছায়াদ বরদাঃ ; ৪৩। হজরত আলী করম ; ৪৪। হজরত ক্বয়েছ বিন্-রবিয় ; ৪৫। হজরত আশয়ছ বিন্-ছায়াদ ; ৪৬। হজরত য়মরু-বিন্-ক্বরতাঃ ; ৪৭। হজরত আজমাঃ ; ৪৮। হজরত হহাদ রেজওয়ালোল্লাহে তায়লা আজমায়ীন।

পূর্ব্বোক্ত ১৭ জন আহ্লে বয়েত আত্হার শহীদের পবিত্র দেহ, জনাব হজরত ছৈয়দশ্ শোহাদাঃ (এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম) এর পবিত্র মযার শরীফের বামদিকে একই কবরে (গঞ্জ-শহীদান রূপে) সমাধিস্থ করা হইয়াছিল ; সুতরাং ইঁহাদের মযার (সমাধি) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নির্ম্মিত হয় নাই। কেবল মাত্র হজরত আব্বাছ (রাজিঃ)-এর মযার তাঁহার শাহাদতের স্থান—গাদর পাত্তার রাস্তায় স্বতন্ত্র ভাবে

নির্ম্মিত হইয়াছে; খাছ ও আম মোছলমানগণ ঐ পবিত্র মযার শরীফ স্বতন্ত্র ভাবে এখনও যেয়ারত করিয়া থাকেন।

ইঁহারা ব্যতীত আর যে সকল আন্‌ছার ও আওয়ান, জনাব হজরত ছৈয়দশ্‌ শোহাদার সঙ্গে কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মযায়ের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না; কিংবা কোনও কেতাবে ঐ সকল স্থানের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। কোনও কেতাব ছহিহায় লিখিত আছে, কারবালার সমুদয় শহীদগণের মযার শরীফ্ বেষ্টন করিয়া এক প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উহার এমনই বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, উক্ত প্রাচীরের কোনও নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অধুনা মযায় শরীফ অপূর্ব্ব অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে, এবং সেই কারবালা ক্ষেত্র একটি সুদৃশ্য মনোরম বৃহৎ শহরে পরিণত হইয়াছে।

ওবায়দুল্লাহ্ এব্‌নে যেয়াদের ‘মায়ুছি’ (নৈরাশ্য)।

পাষণ্ড ওবায়দুল্লাহ্ এব্‌নে যেয়াদ মনে করিয়াছিল, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর ক্বতল্ (হত্যাকাণ্ড)-এর পর আমার খুবই ‘ক্বদরদানী’ (সম্মান—প্রতিপত্তি) হইবে। কিন্তু এযিদ উহার প্রতিপত্তি বাড়াইবে দূরে থাকুক, কারবালার হৃদয়-বিদারক শোচনীয় ঘটনার পর ছলম-বিন্-যেয়াদকে খোরাছানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, ইরাণের যে সকল ছুবা বস্রার এলাকাভুক্ত ছিল, এবং দুরাচার ওবায়দুল্লাহ্ প্রধান

রাজ-প্রতিনিধি রূপে ঐ সকল ছুবা শাসন করিত, উহার অধিকাংশও ছলমের শাসনাধীন করিয়া দিল। আর শামের একদল প্রবল সৈন্য ছলমের অধীনে স্থাপন পূর্ব্বক উহাকে কুফাভিমুখে রওয়ানা করিল। তৎসঙ্গে ওবায়দুল্লাহ-বিন্-যেয়াদকে এই মর্ম্মের এক পত্র লিখিয়া পাঠাইল যে, তোমার অধীনে এরাকের যে পরিমাণ সৈন্য আছে, উহাদের মধ্য হইতে ৬০০০ ছয় হাজার সৈন্য—যাহাদিগকে ছলম পছন্দ করে—উহার সঙ্গে যাইতে দাও। ছলম কুফায় পঁহুছিয়া ঐ পত্র তাহাকে প্রদান করিল। এই ঘটনায় ওবায়দুল্লার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল; সে তখন হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের 'ক্বতল' (হত্যাকাণ্ড) সম্বন্ধে 'আফ্‌ছোছ' (আক্ষেপ) করিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, যদি এমাম ছাহেব (রাজিঃ) জীবিত থাকিতেন, তবে এযিদ আমার 'এহ্‌তিয়াজ' (আবশ্যকতা) অনুভব করিত; এবং আমার সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়াইতে ত্রুটি করিত না। কিন্তু এক্ষণে সে 'বে-ফেকের' (নিশ্চিন্ত) হইয়াছে, এজন্যই সে আমার শাসনাধীন রাজ্য ও সেনাদল আমার অধিকার ও অধীনতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিল। ছলম কুফায় পঁহুছিয়া যখন সৈন্যদল গণনা করিল; এবং তাহাদের 'ছরদার' (সেনানী)-দিগকে বলিল, তোমাদের মধ্যে কে কে আমার সঙ্গে খোরাছানে যাইতে চাও? তাহাতে উহাদের প্রত্যেকেই ছলমের সঙ্গে যাইবার জন্য অভিমত প্রকাশ করিল। ওবায়দুল্লাহ্‌ বিন্-যেয়াদ রাত্রিকালে উহাদের নিকট এই বলিয়া লোক পাঠাইল যে, আশ্চর্য্যের বিষয়, তোমরা সকলেই কেন আমার অধীনতা ত্যাগ করিয়া ছলমের সঙ্গে খোরাছানাভিমুখে যাইতে চাহিতেছ? উত্তরে কুফী সেনানায়কগণ বলিয়া পাঠাইল যে, তোমার নিকটে (অধীনে) থাকিয়া ত আমাদিগকে আহ্‌লে বয়্‌য়েত নববী (রাজিঃ) দিগের শোণিতে স্ব স্ব হস্ত রঞ্জিত করিতে হইয়াছে;

এক্ষণে ছলমের সঙ্গে গিয়া আমরা তুর্কী ও মোগলদিগের সঙ্গে জেহাদ করিবার 'মওকা' (সুযোগ) লাভ করিব, ইহাদ্বারা আমরা যদি পাপের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত ও বিধান করিতে পারি। পর দিবস ছলম ৬০০০ বাছা বাছা কুফী সৈন্যও সেনানী লইয়া খোরাছানাভিমুখে রওয়ানা হইল। দুরাত্মা ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদের কারবালার হৃদয়-বিদারক ঘটনার পর অপমান, অনুশোচনা ও আক্ষেপ ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় নাই।

এই পাষণ্ড বর্ব্বরের মধ্যে যদি মনুষ্যত্বের নামও গন্ধ থাকিত ; তবে মহামান্য এমাম আলায়হেচ্ছালামকে সোজাসুজি দেমেশ্‌কে এযিদের নিকট যাইতে অনুমতি দিত ; বরং তাহার মনে অন্য প্রকার আশঙ্কা থাকিলে প্রহরী স্বরূপ একদল সৈন্য তাঁহার সঙ্গে পাঠাইতে পারিত। এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-কে মক্কা কিংবা মদীনায় ফিরিয়া যাইতে দিলেও এযিদ তাহার প্রতি কোনও রূপ দোষারোপ করিত বলিয়া মনে হয় না। এমাম ছাহেব (রাজিঃ) ও অতঃপর আর এযিদের বিপক্ষতাচরণ না করিয়া, হয়ত এবাদত-বন্দেগীতে অবশিষ্ট জীবনাতিবাহিত করিতেন ; রাজ-নীতির বন্ধুর ক্ষেত্রে আর পদার্পণ করিতেন না। এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর বিরূদ্ধে ঐ নর-পিশাচের যুদ্ধ করিবার কোনও কারণও প্রয়োজনই ছিল না। ৭০।৭২ বা-দু'শ সংখ্যক এক প্রকার নিরস্ত্র ক্ষুদ্র দলের বিরুদ্ধে ৬।৭ হাজার অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্য প্রেরণ করা, এবং পুনঃ পুনঃ ভীষণ বর্ব্বরতামূলক আদেশ পাঠান, মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। আর হতভাগা মোছলমান নাম ধারণ করিয়া সেই পবিত্র ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতার পরম ধার্ম্মিক দৌহিত্র-রত্নকে সদল বলে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে নিহত করা, সেই মৃতদেহ অশ্ব পদতলে মর্দ্দিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণিত করা, মনুষ্যের আত্মা-বিশিষ্ট কোনও মানুষের কার্য্য নহে। পাষণ্ড একথা অবশ্যই শুনিয়াছিল যে, হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) তাঁহার এই দৌহিত্র-রত্নকে কিরূপ স্নেহ

করিতেন; ইঁনি তাঁহার বংশের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন ছিলেন। পুত্র সন্তান হীন মহানবীর দুইটি দৌহিত্রই তাঁহার পুত্র স্থানীয় ছিলেন। ইঁহাদের দ্বারাই তাঁহার বংশ-তরু প্রতিষ্ঠিত ছিল; আর হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) একজন আদর্শ ধার্ম্মিক পুরুষ যে ছিলেন, তাহাও এই দুরাত্মার অবিদিত ছিল না। কুফায় তাঁহার মহামান্য পিতার খেলাফৎ ও সে দেখিয়াছিল। এইরূপ নৃশংস পাশব অত্যাচারের পরিণাম ফল কি, মোছলমানের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, নিজে মোছলমান নামে পরিচিত হইয়া সে ইহা অবশ্যই জানিত। উহার এবং উহার উপযুক্ত অনুচর ও 'তাবেদার' ওমরু-বিন্-ছায়াদ এবং শেমর যিল-যোশন-প্রমুখ নির্দ্দয় পাষণ্ডগণের হৃদয় কি উপকরণে গঠিত ছিল, তাহা ধারণার অতীত। হজরত এমাম ছাহেবকে হত্যা করার কোন আদেশ এযিদ দিয়া ছিল না; তাঁহার পবিত্র দেহের অবমাননা করা বা আহ্‌লে বয়েতের খিমাঃ (শিবির) লুণ্ঠন করা প্রভৃতি কার্য্যেরও কোন ইঙ্গিত-এশারা ছিল না; তবু এই নরাধম কেন এরূপ পাশ্বোচিত নৃশংস কার্য্য করিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আর কুফা শহরের মাটীর যে কি গুণ ছিল, তাহাও খেয়ালের বহির্ভূত। অবশ্য এই নগরে হজরত এমাম আজম আবু হানিফাঃ (রহঃ) ও আরও বহু তাবেয়ীন বা তাবা-তাবেয়ীন এবং আলেম ও তাপস পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু সাধারণতঃ এই শহরের অধিবাসিগণ নির্দ্দয়, চঞ্চলমতি, লোভী, অকৃতজ্ঞ ও অধর্ম্মাচারী ছিল। এই দোষেই কুফা নগরী অচির কাল মধ্যে ধ্বংস-মুখে পতিত হয়; বর্ত্তমান কালে উহা একটি বিরাট শহরের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ মাত্র।

এমাম বধ রূপ পাপের প্রতিফল ও শোচনীয় পৈশাচিক কার্য্যের ভীষণ প্রতিক্রিয়া ;

অতঃপর এযিদের পাপাচরণ চরমে উঠিল। তাহার প্রেরিত পাষণ্ড সেনাপতিগণ মদীনা-তৈয়বাঃ আক্রমণ, বহু ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ও অসংখ্য মদীনাবাসীর শোণিতে ঐ পবিত্র নগরী প্লাবিত এবং আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র রওয মবারক আস্তাবলে পরিণত করিয়া, উহা কলুষিত করিল। এযিদ যেমন দুর্ব্বৃত্ত ছিল, তেমন অনুচরও অনেক গুলি জুটিয়াছিল। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর আফ্রিকা-বিজয়ী বিখ্যাত সেনাপতি য়োক্‌বার পুত্র মোছলেমের প্রতি মদীনাও মক্কা-বিজয়ের ভারার্পিত হয় ; তাহার সহকারী সেনাপতি ছিল হছিন-বিন্‌-নমির। এই উভয় নর-পিশাচ মদীনা-তৈয়বাঃ বিধ্বস্ত করিয়া মক্কায় হজরত আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-যোবের (রাজিঃ)-কে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হয় ; পথিমধ্যে " আবুয়া " নামক স্থানে মোছলেম মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল ; সে মৃত্যুকালে হছিন-বিন্‌-নমিরকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়া গিয়াছিল। এই দুরাচার মক্কা-মোকাররমা অবরোধ ও আক্রমণ করে, যে দিন মক্কা আক্রমণ করা হয় ; ঠিক ঐ দিনই এযিদের দেমেশ্‌কে মৃত্যু হয়। অগত্যা হছিন-বিন্‌-নমির মক্কা-মোয়াজ্জমার অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদীনা-তৈয়বাঃ হইয়া দেমেশ্‌কে চলিয়া যায়।

এযিদের মৃত্যুর পর খেলাফৎ লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। আরব, এরাক, মেছের ও পারস্য বাসিগণ হজরত আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-যোবের (রাজিঃ)-কে খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন। দেমেশ্‌কে

এযিদের পুত্র ২য় মোবিয়া খলিফার পদ গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করাতে, মহা গোলযোগের সৃষ্টি হয়। এব্‌নে যেয়াদ বদনেহাদ ও কুফা হইতে আসিয়া এই রাজনীতিক গোলযোগে যোগদান করে।

ইতিমধ্যে নানা গোলযোগের পর মোখ্‌তার-বিন্‌-য়বিদ কুফার শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। তিনি কুফার শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াই সৈন্য সেনাপতিদিগের প্রতি আদেশ প্রচার করিলেন, যে সকল কুফাবাসী কারবালার হত্যাকাণ্ডে যোগদান করিয়াছিল, তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। তদনুসারে কয়েকশত লোক ধরিয়া আনা হইল; এবং ইহাদিগের সকলকেই নানাপ্রকার আযাবের সঙ্গে হত্যা করা হইল। ইহাদের মধ্যে যে সকল লোক ছলমের সহিত খোরা-ছানে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই তুর্কী ও মোগলদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হইয়া ছিল। হফছ্‌-বিন্‌ ওমর-বিন্‌-ছায়াদ যখন মোখ্‌তারের দরবারে উপস্থিত হইল; তখন মোখ্‌তার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাপ এখন কোথায় আছে, এবং কি করিতেছে? সে বলিল, পিতা বেকার অবস্থায় ঘরেই আছেন; তাহা শুনিয়া মোখ্‌তার বলিলেন, সে রয় (এস্ফাহান), তবরস্তান ও তেহারানের শাসনকর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া এখন কেন ঘরে বেকার অবস্থায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে—যে শাসন-কর্ত্তৃত্বের লোভে সে এরূপ দুষ্কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিল; যদি উহাকে নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় ঘরেই বসিয়া থাকা ছিল; তবে যখন এব্‌নে যেয়াদ বদনেহাদ হজরত রছুলোল্লাহ্‌ (ছালঃ)-এর বংশধরদিগকে 'কতল' (হত্যা—শহীদ) ও 'গারত' (ধ্বংস) করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, তখন কেন সে গৃহে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল না; তাহা হইলে সে দুনিয়া (পৃথিবী) ও পরকালের 'আযাব' (শাস্তি) হইতে পরিত্রাণ পাইত। অত বড় একজন ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-এর পুত্র হইয়া তাহার

মনে খোদা ও রছুলের ভয় হইল না ; এষিদ পলিদ ও এব্‌নে যেয়াদ বদনেহাদের অধীনতায় দুর্জ্জয় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ ভীষণ পাপানুষ্ঠান করিতে তাহার পাপ-হৃদয় একটু ও বিচলিত হইল না। এক্ষণে সে কি ধার্ম্মিক সাজিয়া নীরবে গৃহে অবস্থান করিতেছে ? অতঃপর সৈন্যদিগকে আদেশ করিল, পাষণ্ড ওমর-বিন্‌-ছায়াদকে আমার নিকট ধরিয়া লইয়া আইস। সৈন্যেরা তৎক্ষণাৎ তাহার গৃহে গমন পূর্ব্বক উহাকে ধরিয়া লইয়া আসিল। সে মোখ্‌তারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে যথেষ্ট 'লানত-মালামত' করিবার পর, পিতা ও পুত্র উভয়ের মুণ্ডপাত করিতে আদেশ দিলেন ; আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল ; অতঃপর তাহাদের ছিন্ন মুণ্ড হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর অন্যতম পুত্র হজরত মোহাম্মদ-বিন্‌-হানফিয়ার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তৎপর তিনি আদেশ করিলেন ; যাহারা 'ক্বাতেলানে' আলী মকাম (হজরত এমাম ছাহেবের হত্যাকারী) দিগের মধ্যে ছিল, এবং যাহারা কারবালার যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল ; তাহাদের যাহাকে যেখানে পাইবে, বিনা জিজ্ঞাসা বাদে তাহাকে হত্যা করিবে, তাহাদের কোন আপত্তি বা 'ফরিয়াদ' শুনিবে না। মোখ্‌তার-বিন্‌-য়বিদ ছকৃফির এই আদেশে কুফায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। অনেকে এদিক ওদিক পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু যাহাকে যেখানে পাওয়া গেল, তাহাকে সেখানেই হত্যা করা হইল।

ইহার পর মোখ্‌তার, পাষণ্ড শেমর-যিল যোশনের অনুসন্ধানে স্বীয় 'গোলাম' (ক্রীত দাস) যরবীকে পাঠাইলেন। যরবী কতিপয় যোদ্ধ্‌-পুরুষকে সঙ্গে লইয়া শেমরের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া জানিতে পারিল, দুরাত্মা গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে ; যরবী সদল বলে উহার সন্ধানে ছুটিল ; এক স্থানে গিয়া দেখিল, শেমর একদল

লোকের সঙ্গে অবস্থান করিতেছে; যখন শেমর মুজীর সহচরগণ অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইল, তখন তাহারা সচকিত ও আতঙ্কিত হইয়া উহাকে বলিল, 'একিনান' (নিশ্চয়ই) কাহারা আমাদিগকে বন্দী করিবার জন্য আসিতেছে; বলিতে বলিতে তাহারা সকলেই উহাকে ঐস্থানে ফেলিয়া পলায়ন করিল। শেমর একাকী মাত্র সেখানে রহিয়া গেল। মোখ্তারের প্রেরিত অশ্বারোহী দল তৎক্ষণাৎ তাহাকে 'গেরেফ্তার' (বন্দী) করিতে চেষ্টা পাইল; শেমর তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু আবদুর রহমান-বিন্-আবিল কনছুদ নামক জনৈক যোদ্ধা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এমন সজোরে 'নেযাঃ' (বড়শা) নিক্ষেপ করিল যে, সে সেই প্রচণ্ড আঘাতে ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। মোখ্তারের প্রেরিত লোকেরা উহার মস্তক কাটিয়া লইল, এবং উহার 'নাপাক' (অপবিত্র) দেহ অশ্ব পদতলে ফেলিয়া খুব মর্দ্দিত করিল; অবশেষে উহা কুকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিল; এবং উহার ছিন্ন মস্তক মোখ্তারের নিকট নিয়া উপস্থিত করিল। পাষণ্ড স্বীয় ভীষণ দুষ্কার্য্যের প্রতিফল যথোচিত রূপে প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর মোখ্তার, ওমরু-বিন্-আল্ হেজাজের গেরেফ্তারীর আদেশ প্রদান করিলেন; আর উহাকে ধৃত করিবার জন্য একদল যোদ্ধৃপুরুষ পাঠাইয়া দিলেন। যখন উহারা তাহার অনুসরণে এক জঙ্গলে গিয়া পঁহুছিল, তখন দেখিতে পাইল, ওমরু-বিনল্ হেজাজ প্রায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ অবস্থায় ভূতলে পড়িয়া আছে। আর তাহার জিহ্বা মুখ হইতে অনেকটা বাহির হইয়া উল্টা অবস্থায় রহিয়াছে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার এ কি অবস্থা? সে 'এশারায়' (ঈঙ্গিতে) বলিল, ৩ দিন হইতে আমার 'হলকে' (কণ্ঠনালীতে) পানী প্রবেশ করিতে পাইতেছে না। দারুণ পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমার সঙ্গে যে

মোশকে পানী ছিল, ঐ মোশক আপনা হইতে চালুনীর ন্যায় ছিদ্র হইয়া, সমুদয় পানী বাহির হইয়া গিয়াছে। দলস্থ এক ব্যক্তি কয়েক ফোঁটা পানী উহার হলকে (গলনালীতে) নিক্ষেপ করিল; পানী টপ্‌কাইয়া দেওয়ায় উহা গলনালীতে পঁহুছিবামাত্র উহাতে একটি 'ছুরাখ' (ছিদ্র) হইল; এবং ছিদ্র-পথে পানীটুকু বাহির হইয়া গেল। ঐ সময় মোখ্‌তারের প্রেরিত লোকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল, ওমরু-বিনল্‌-হেজাজ, দেখিলি স্বীয় দুষ্কার্য্যের ফল? তুই হজরত আব্বাছ (রাজিঃ)-এর মোশক ছিদ্র করিয়া দিয়াছিলি, ইহা তোর সেই দুষ্কার্য্যের 'বদলা' (প্রতিদান)। এক্ষণে তুই এক 'কাৎরাঃ' (বিন্দু) পানীর জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছিস্‌! আর তোর পানীর মোশক ও গলনালী ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। এই অবসরে এক ব্যক্তি তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাতে উহার শিরশ্ছেদন করিল; এবং উহার সেই ছিন্ন মস্তক মোখ্‌তারের নিকট লইয়া গেল; আর উহার দেহ ঐ স্থানেই আগুণে পোড়াইয়া ফেলা হইল। মোখ্‌তার-বিন্‌-য়বিদ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের হত্যাকারীদিগকে এক এক করিয়া হত্যা না করিব, তত্তাবৎকাল 'বেস্তরের' (বিছানার—শয্যার) সঙ্গে পীঠ লাগান আমার পক্ষে হারাম হইবে। এজন্য তিনি দিবারাত্রি এই 'ফেকেরে' (চিন্তায়) 'মছরুফ্‌' (মগ্ন—অভিভূত) থাকিতেন, এবং 'ক্কাতেলানে' (হত্যাকারিগণ) এমাম আলায়হেচ্ছালাম ও 'দোশ্‌মনানে' (শত্রুগণ) আহ্‌লে বয়্‌য়েত কে খুজিয়া খুজিয়া গেরেফ্‌তার করাইতেন, এবং উহাদিগকে নানাপ্রকার কঠোর শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক 'ক্কতল্‌' করিতেন। তদনুসারে ওমরু-বিন্‌-আল হেজাজকে হত্যা করিবার পরে স্বীয় সৈন্য ও সেনাপতিদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন যে, হবিব, কয়েছ, বশির ও আছুদকে ধৃত করিয়া আনয়ন কর। তাহারা এই দুর্ব্বৃত্ত চতুষ্টয়কে

ধরিয়া মোখ্‌তারের নিকট আনয়ন করিল। মোখ্‌তার উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রে খোদার ভয়-বিরহিত পাষণ্ডগণ! এক্ষণে বল্ ঐ সকল 'বদ-ছলুকী' (দুর্ব্ব্যবহার) ও 'বে-আদবীর' (অশিষ্টতার) কি শাস্তি তো দিগকে দেওয়া যায়—যাহা তোরা হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের প্রতি 'রওয়া' (সিদ্ধ—কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত) রাখিয়াছিলি। উহারা বলিতে লাগিল, মোখ্‌তার! আমাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, আমরা পাপ হইতে তওবাঃ (অনুতাপ) করিতেছি। মোখ্‌তার বলিলেন, রে পাপাচারিগণ! ঐ সময় তোদের প্রস্তরময় হৃদয় কেন বিগলিত হইয়াছিল না—যখন হজরত নবী করিম (ছালঃ) এর 'নওয়াছে' (দৌহিত্র—নাতি) তোদের নিকট দয়া ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; আজ আপনাদিগকে মৃত্যুর কবলে পতিত হইবার উপক্রম দেখিয়া দয়া-প্রার্থনা করিতেছিস্। আমি তোদের ন্যায় পাষণ্ড পিশাচদিগকে কিছুতেই জীবিত রাখিব না; অতঃপর স্বীয় সৈন্য-সেনাপতিদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন, যেরূপে এই পাষণ্ড বর্ব্বরগণ হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালাম ও তাঁহার স্ববংশীয় পুরুষ এবং ভক্ত বৃন্দকে কারবালার সমরক্ষেত্রে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ও যাতনা প্রদান পূর্ব্বক নিহত করিয়াছিল, ইহাদিগকেও সেইরূপ 'যেল্লত' (লাঞ্ছনা) ও 'বে-হোরমতির (অপমানের) সহিত হত্যা কর। সৈন্যগণ আদেশ প্রাপ্তিমাত্র উহাদিগের প্রতি ধাবিত হইয়া অতি লাঞ্ছনা ও অপমানের সহিত ঐ কয়জনকেই হত্যা করিল; আর উহাদের 'নাপাক' (অপবিত্র) মৃতদেহ গুলি শৃগাল-কুকুরের মৃতদেহের ন্যায় জঙ্গলে ফেলিয়া দিল।

উপরোক্ত নর-পিশাচদিগের হত্যা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মোখ্‌তার হুকুম এব্‌নে মালেক ও আবদুল্লাহ্ এব্‌নে ওমেদকে গেরেফ্‌তার করিয়া আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। এই পাষাণ হৃদয়

'ছেয়াউল-কল্গব' কুফিদ্বয় সম্বন্ধে রওয়ায়েত আছে যে, যখন হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালাম শহীদ হইয়া গেলেন, তখন এব্‌নে ছায়াদের সৈন্যদিগের মধ্যে কোনও ব্যক্তি বলিল, যাহা হইবার তাহাত হইয়া গিয়াছে, আইস, এক্ষণে রছুলের নাতির জানাযার নমায্‌ পড়িয়া লওয়া যাউক। সেই কথা শুনিয়া এই 'জালেম' (অত্যাচারী—পাপী) দ্বয় তাঁহার পবিত্র মস্তক তরবারির আঘাতে কাটিয়া ফেলিল; এবং বলিল, আয় (হে) এমাম আলায়-হেচ্ছালামের 'হেমায়েতী' (সাহায্যকারি)! তুই এযিদের শত্রুর পক্ষ সমর্থন করিতেছিস্‌! স্থূলকথা এই যে, উপরোক্ত উভয় দুর্ব্বৃত্ত ধৃত হইয়া মোখ্‌তার সমীপে আনীত হইল; মোখ্‌তার তৎক্ষণাৎ উহাদিগের মুণ্ডপাত করিলেন।

অতঃপর মোখ্‌তার এব্‌নে য়বিদ হুকুম প্রদান করিলেন যে, এইবার খুলি-বিন্‌-এযিদকে ধরিয়া আন। খুলি যখন জানিতে পারিল যে, উহাকে ধৃত করিবার জন্য আদেশ জারী হইয়াছে, তখন সে স্বীয় গৃহের 'তহ্‌ঃখানায়' (গ্রীষ্মের আতিশয্য কালে মৃত্তিকার নিম্নে যে প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করা হয়) গিয়া আত্ম-গোপন করিল; কিন্তু মোখ্‌তার-প্রেরিত সৈন্যগণ তাহার গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া উহাকে সেই 'তহ্‌ঃখানাঃ' হইতে বাহির করিল, এবং বন্দী করিয়া মোখ্‌তারের নিকটে লইয়া আসিল; মোখ্‌তার বলিলেন, এই পাষণ্ড ঐ ব্যক্তি—যে হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের পবিত্র মস্তক নেযায় বিদ্ধ করিয়া আহ্‌লে বয়েতের সম্মুখে আসিয়াছিল; এবং তাঁহাদিগকে এমনভাবে ক্রন্দন করাইয়াছিল, যাহা স্মরণ করিলেও হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়। উহাকে কতল্‌ করিয়া উহার মস্তক ও বর্শাবিদ্ধ করিয়া উহার পুত্র পরিজনের সম্মুখে লইয়া যাও, তাহাদিগকে দেখাইয়া সমগ্র শহরে পরিভ্রামিত কর, এবং কুফাবাসীদিগকে দেখাও। তাঁহার আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল।

মোখ্‌তার 'জালেম' দিগকে হত্যা করিতেন, কিন্তু তাঁহার দেল ঠাণ্ডা

ও ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইত না। তিনি ক্রোধভরে বলিতেন, যদি আমি কুফা ও শামের সকল লোককেও হত্যা করি, তবু 'মজলুম' 'উৎপীড়িত' এমাম আলায়হেচ্ছালামের একবিন্দু শোণিতেরও বদলা হইবে না।

অতঃপর তিনি হকীম-বিন্-তফিলের গেরেফ্তারীর আদেশ প্রদান করিলেন—যে পাষণ্ড হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের 'পেশানীতে' (কপালে) তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল। সে যখন ধৃত হইয়া আনীত হইল; তখন মোখ্তার স্বীয় সৈন্যদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন যে, উহাকে দাঁড় করাইয়া উহার কপালে ও মুখে এই পরিমাণ তীর বর্ষণ কর, যেন হতভাগ্য উহাতেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। তদনুসারে তীরন্দাযগণ উহার প্রতি অবিরল ধারে তীর বর্ষণ করিতে লাগিল; সে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল; তচ্ছ্রবণে মোখ্তার-বিন্-যবিদ বলিলেন, রে দুর্ব্বৃত্ত জালেম, মনে ভাবিয়া দেখ্, তোর নিক্ষিপ্ত তীরে 'ছবত্ রছুলের' (পয়গম্বর [ছালঃ]-এর নাতির) এইরূপ কষ্টই হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে অজস্র তীরে বর্ষণের ফলে পাপাচারীর পাপ আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

বহুসংখ্যক জালেম পাষণ্ড এই কঠোর শাস্তির বিষয় জানিতে পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া পাপের মহা প্রতিফল ভোগ করিল; মোখ্তার উহাদের গৃহাবলী সমভূমি করিয়া ফেলিলেন; দুই দশজন পলায়ন করিয়াও জীবন রক্ষা করিল; কিন্তু খোদাতা-লার গযব হইতে উহারা নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। কারবালা-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল লোকই দুনিয়াতে তাহাদের মহাপাপের প্রতিফল ভোগ করিয়াছিল; তাহাদের বংশাবলী পর্য্যন্ত উৎসন্ন গিয়াছিল।

যখন কুফার সমস্ত অত্যাচারী দল নিপাত হইল, তাহাদের অস্তিত্ব মাত্র রহিল না; তখন মোখ্তার, হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর প্রধান সেনাপতি ও পরম ভক্ত মহাবীর মালেক আশ্তরের বীরপুত্র এবরাহিম আশ্তরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন; তিনি উপস্থিত হইলে

তাঁহাকে বলিলেন, হে এব্রাহিম! আমি আহ্লে বয়েতের শত্রু দল হইতে যতদূর সম্ভব, প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি; এক্ষণে কেবলমাত্র এব্নে যেয়াদ বদনেহাদ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা বাকী আছে—যে পাষণ্ড এই অত্যাচারী দলের সর্ব্ব প্রধান নেতা ও পরিচালক ছিল; তুমি সত্বরে মওছল (মোসল) শহরে যাও; এবং উহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া উহার মস্তক কাটিয়া আন।

মোখ্তারের আদেশানুসারে তদীয় প্রধান সেনাপতি এব্রাহিম আশ্তর একদল প্রবল সৈন্য লইয়া মওছলে পঁহুছিলেন। যখন ওবায়তুল্লাহ্ এব্নে যেয়াদ তাঁহার আগমন সংবাদ পাইল, সেও স্বীয় সৈন্যদল সুসজ্জিত করিয়া নগর হইতে মহাড়ম্বরে বাহির হইল। বলা বাহুল্য, খেলাফতের গোলযোগের সময় সে মওছলের শাসনকর্ত্ত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল; এখন সে আর পূর্ব্বের ন্যায় বিশাল জনপদের রাজ-প্রতিনিধি ছিল না; একটি ক্ষুদ্র ছুবার শাসনকর্ত্তা মাত্র ছিল; উহার বীরত্ব ও পরাক্রম সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ ছিল না; সে কয়েক সহস্র বিক্রান্ত সৈন্য লইয়া মহাবীর এব্রাহিম আশ্তরের সম্মুখীন হইল। দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এব্নে যেয়াদ বদনেহাদ ও তাহার সৈন্যগণ বীরত্ব-প্রদর্শনে কিছুমাত্র ত্রুটি প্রদর্শন করিল না; কিন্তু পাপাচারীর পাপ লীলার অবসান হইয়া আসিয়াছিল; খোদা তা-লা মহামান্য এমাম আলায়হেচ্ছালামের শত্রুদল-নিপাত এবং ভীষণ নিষ্ঠুর কার্য্যের প্রতিশোধ গ্রহণের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং ভীষণ যুদ্ধের পর এব্রাহিম আশ্তর জয়ী হইলেন; এব্নে যেয়াদের সেনাদল পরাজিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

মহাবীর এব্রাহিম-বিন্-মালেক আশ্তর যখন যুদ্ধে জয়ী হইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; তখন স্বীয় সৈন্যদিগকে বলিলেন, আল্লার শপথ, আমি আজ এক ব্যক্তিকে 'কতল্' (হত্যা) করিয়াছি—যাহার হস্তে ছরদারীর 'নিশান' (পতাকা) ছিল। সে নহর খারযের (খারযনামক ক্ষুদ্র তটিনীর)

তটে দণ্ডায়মান ছিল ; আমি স্বীয় রক্ত-রঞ্জিত তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাতে উহাকে দ্বি-খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছি ; যখন সে দ্বি-খণ্ডিত হইয়া অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তখন উহার হস্ত পূর্ব্বদিকে ও পদদ্বয় পশ্চিম দিকে ছিল। উহার পরিহিত বস্ত্র সাদা, এবং উহা মেশ্‌ক্ ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা 'খোশ্‌বুদার' ছিল। উহার মৃতদেহ 'তালাশ' করিয়া (খুঁজিয়া) শীঘ্র আনয়ন কর। তদনুসারে তাঁহার কতকগুলি সৈন্য দৌড়িয়া 'খারয' নামক স্রোতস্বতীর তটে উপস্থিত হইল ; এবং এব্‌রাহিম-বিন্-মালেক আশ্‌তরের নির্দ্দেশিত স্থানে তালাশ করিয়া পাষণ্ড এব্‌নে যেয়াদ বদ-নেহাদের দ্বি-খণ্ডীকৃত মৃতদেহ প্রাপ্ত হইল ; সৈন্যগণ তাহা তুলিয়া সেনাপতি এব্‌রাহিম আশ্‌তরের নিকটে লইয়া আসিল। বিশেষ-ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানা গেল, উহা বাস্তবিকই দুরাচার ওবায়দুল্লাহ্‌ এব্‌নে যেয়াদের মৃতদেহ। তৎক্ষণাৎ উহার মস্তক ছেদন করিয়া মোখ্‌তারের নিকট কুফায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল ; আর তাহার মস্তক হীন দেহটা সেই খানেই অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

৬৬ হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে মোখ্‌তার কর্ত্তৃক কারবালার শোচনীয় কাণ্ডের প্রধান প্রধান নায়কগণ, ঐকার্য্যে সংশ্লিষ্ট কুফার পাষণ্ড অধিবাসিগণ সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছিল। খোদা তা-লা যেন ঐ সকল পাষণ্ডের দণ্ড বিধান জন্যই মোখ্‌তার-বিন্-য়বিদ-বিন্ মছয়ূদ ছকৃফিকে আবির্ভূত করিয়াছিলেন ; তাঁহার এই কার্য্যের জন্য একটি স্বর্ণ-সুযোগও উপস্থিত হইয়াছিল। যদি ঐ সময় মারওয়ান কিংবা তৎপুত্র আবদুল মালেক খলিফার পদে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন ; তবে মোখ্‌তার এই সকল পাষণ্ডের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে পারিতেন না। বনি-ওম্মিয়ার খলিফাগণ (হজরত ওমর-বিন্-আবদুল আযিয্‌ [রাজিঃ] ব্যতীত) আহ্‌লে বয়েতের প্রতি তেমন ভক্তিমান্ ও সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন

না। সুতরাং স্বয়ং খোদাতা-লাই এসম্বন্ধে মহা সুযোগ উপস্থিত করিয়া-দিয়াছিলেন ; এবং মহা পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানকারীদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। কম বেশ সাড়ে চারি বৎসর মাত্র সময়ের মধ্যে এযিদ হইতে আরম্ভ করিয়া এব্‌নে যেয়াদ-প্রমুখ দুরাচারগণ, মদীনার হত্যাকাণ্ডের নায়ক এবং উক্ত পবিত্র নগরীর বিধ্বস্তকারী মোছলেম-বিন্‌-য়োক্‌বাঃ প্রভৃতি পাষণ্ডগণ শমন সদনে প্রেরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কারবালা-কাণ্ডের নায়কগণের নিপাত ব্যাপার একটি শিক্ষনীয় ব্যাপরে। তাহাদের ঐ মহা পাপকার্য্যের প্রতিশোধ খোদা তাঁলা কিরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাহা চিন্তা ও খেয়াল করিবার বিষয়। যদি কারবালার ভীষণ শাহাদৎ-কাণ্ড সজ্ঘটিত না হইত, তবে হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালাম " ছৈয়দশ্‌ শোহাদাঃ " বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন না ; শহীদের মর্ত্তবা (পদ-মর্য্যাদা) ও দর্‌জা এত বৃদ্ধি হইত না ; আর গত ত্রয়োদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত শত শত কোটি মোছলমান তাঁহাদের জন্য কঠোর শোক প্রকাশ এবং অশ্রুমালায় বক্ষঃ ভাসাইত না ; এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত এই শোক প্রকাশের প্রবল স্রোত, প্রবাহিত ও তাঁহাদের পবিত্র আত্মার মঙ্গল কামনায় দোওয়া করা সম্ভবপর ছিল না। নবী-বংশের প্রতি হজরত আব্বাছ বংশীয় খলিফাদিগের মধ্যে মনছুর-প্রমুখ কেহ কেহ ঘোর অত্যাচার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এব্‌নে যেয়াদী দলের অত্যাচারের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। আবার কারবালার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট লোকগুলি যেরূপ ভাবে সমূলে নির্ম্মূল ও তাহাদের গৃহাবলী যেরূপ ভাবে ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলা হইয়াছিল, এমন ব্যাপার এবং দুষ্কার্য্যের প্রতিক্রিয়া ও দুনিয়াতে আর কখন হয় নাই।

হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর শাহাদতের পরবর্ত্তী কতিপয় ঘটনা।

মাবিয়া বিন্ এযিদের খেলাফৎ।

মাবিয়া-বিন্-এযিদের কুনিয়েত আবুলেয়লী এবং আবদুর রহমান। এযিদের মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ২০ বিশ বৎসর কয়েক মাস মাত্র ছিল। এই যুবক পরম ধর্ম্ম-পরায়ণ, 'ছালেহ্' (নিষ্পাপ), 'আবেদ' ('এবাদত' অর্থাৎ উপাসনাকারী), 'যাহেদ' (পরহেয্গার—পার্থিব সুখ-সম্ভোগে ও ভোগ-লিপ্সায় বিতৃষ্ণ) পুরুষ ছিলেন। আহ্লে শাম অর্থাৎ শামবাসিগণ এযিদের মৃত্যুর পর ইঁহার হস্তে বয়্য়েত করিল। এযিদের প্রেরিত মক্কা আক্রমণকারী সেনাপতি হছিন-বিন্-নমির যখন শামী সেনাদল এবং বনি-ওম্মিয়াদিগকে (যাহারা মদীনায় নিঃসহায় অবস্থায় অবস্থিতি করিতে ছিল) লইয়া দেমেশ্কে পঁহুছিল, তৎপূর্ব্বেই লোকেরা মাবিয়া-বিন্-এযিদের হস্তে বয়্য়েত করিয়াছিল। মাবিয়া, খেলাফৎ ও লোকের নিকট হইতে বয়্য়েত গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন না। পিতার অন্যায় ও অসঙ্গত এবং ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য-কলাপ সকল তাহার চক্ষের সমক্ষে ঘটিয়াছিল। কারবালার শোচনীয় ঘটনা—অর্থাৎ হজরত এমাম হোছেন আলায়-হেচ্ছালামের শাহাদৎ-ঘটনাও তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ আঘাত প্রদান করিয়াছিল; প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, মন্ত্রী, সেনাপতি ও আমীর-ওমরাহ

প্রভৃতির মধ্যেও ধর্ম্মভাবের একান্তই অভাব দেখিতে পাইতেছিলেন; স্বার্থপরতা, গৌরব-স্পৃহা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, শাসন-ক্ষমতা লাভ, লোকের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন প্রভৃতির প্রবৃত্তিই প্রধান প্রধান লোকের মধ্যে সাধারণতঃ দৃষ্ট হইত। মাবিয়া বিশাল মোছলেম জগৎ শাসন করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা নিজের মধ্যে দেখিতে পাইতে ছিলেন না; আবার তাঁহার স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না; পীড়িত ছিলেন। এই পীড়িত অবস্থায়ই লোকেরা তাঁহার হস্তে বয়্য়েত করিয়া ছিল। ইঁনি লোকের একান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া বয়্য়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন; আর মাত্র ৫০ দিন কাল, অপর রওয়ায়েতানুসারে দুই মাস (৬০ দিন), তৃতীয় বর্ণনানুসারে ৩ মাস (৯০ দিন) মাত্র খেলাফতের পদে অভিষিক্ত থাকিয়া, খেলাফৎ ত্যাগ করেন ও মৃত্যু-মুখে পতিত হন। এই অল্পকাল মধ্যে কোনও উল্লেখ যোগ্য কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই। মাবিয়ার পীড়া যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন লোকেরা বলিল, আপনার পরে কে খলিফা হইবেন, আপনি তাহা মনোনীত করুন। মাবিয়া বলিলেন, আমি প্রথম হইতেই আমার মধ্যে খলিফার উপযুক্ত 'তাকত' (শক্তি) দেখিতে পাই নাই; তোমরা 'যবরদস্তী'ক্রমে (বলপূর্ব্বক) আমাকে খলিফার পদে অভিষিক্ত করিয়াছ। আমি মনে করিয়াছিলাম, যদি কোনও ব্যক্তিকে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর মতন উপযুক্ত প্রাপ্ত হই, তবে তাঁহার হস্তে খেলাফতের ভার অর্পণ করিব; কিন্তু সেরূপ লোক কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। পরে মনে করিলাম, হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) যেমন মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েক ব্যক্তির (৬ ব্যক্তির) উপর খলিফা-নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ কতিপয় ব্যক্তিকে খলিফা-নির্ব্বাচন জন্য মনোনীত করি; কিন্তু ঐরূপ উপযুক্ত লোকও আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে না।

সুতরাং খেলাফৎ সম্বন্ধে আমি কোনও কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। তোমাদের যাহাকে ইচ্ছা, খলিফা নির্ব্বাচন কর, আমার তাহাতে কোনও 'ছরোকার' (সম্বন্ধ) নাই। এই কথা বলিয়া তিনি সমবেত লোকদিগকে গৃহ হইতে বাহির করাইয়া দিয়া, 'মহল ছরার' (রাজ-প্রাসাদের) দ্বার বন্ধ করাইয়া দিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই তাঁহার জানাযাঃ মহলছরাঃ হইতে বাহির হইল।

এযিদ স্বীয় ২য় পুত্র খালেদকে অধিকতর ভালবাসিত; কিন্তু মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র মোবিয়াকেই 'ওলি আহাদ' (স্থলাভিষিক্ত—রাজ্যের উত্তরাধিকারী) নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছিল। খালেদ অতি তরুণ বয়স্ক যুবক ছিলেন।

বস্রায় এব্‌নে যেয়াদ বদ-নেহাদের বয়্‌য়েত গ্রহণ।

ওবায়দুল্লাহ্‌ এব্‌নে যেয়াদ কারবালার ভীষণ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়া এযিদের নিকট হইতে কোনও পুরস্কার লাভ ত করিলই না, বরং বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের সুবিস্তৃত এলাকার শাসন-ভার তাহার হস্তচ্যুত হইল। কুফাবাসী বীর সৈন্য ও সেনাপতিগণ তাহার নিকট হইতে খোরাছানাভিমুখে চলিয়া গেল; সে মাত্র কুফা ও বস্রার শাসনকর্ত্তাই রহিল। সে স্বীয় কৃতকার্য্যের কোনও পুরস্কার এযিদের নিকট হইতে পাইল না; অথচ এযিদের পক্ষ হইতে এমন অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম ও তাঁহার মুষ্টিমেয় ভ্রাতা-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত-অনুচর বৃন্দকে নিহত করিল, মহাপাপের বোঝা স্বীয়

স্কন্ধে লইল, পরে ইহাতে তাহার মনস্তাপের সীমা পরিসীমা রহিল না; এযিদের প্রতি তাহার সহানুভূতি থাকা দূরে থাকুক, বরং জাতক্রোধ উপস্থিত হইল। কিন্তু ইহার কোনও রূপ প্রতিকার করিবার উপায় তাহার নিকট ছিল না। অশান্তির ভীষণ অনলে তাহার পাপ-হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। মদীনা হইতে যে দশ ব্যক্তি তত্রত্য শাসনকর্ত্তা ওছমান-বিন্-মোহাম্মদ-বিন্-আবুছুফিয়ান কর্ত্তৃক এযিদের নিকট দেমেশ্‌কে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৯ জন যথোচিত পুরস্কার লাভ করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; কিন্তু মনযর-বিন্-যবির মদীনায় না গিয়া কুফায় এব্‌নে যেয়াদের নিকট গমন করিলেন; কারণ এব্‌নে যেয়াদের সঙ্গে ইহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। যখন মদীনার প্রতিনিধিগণ মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এযিদের সুরা পান ও অন্যান্য প্রকার শরিয়ত-বিরুদ্ধ দুষ্কার্য্যের বিষয় প্রচার করিয়া, তাহার খেলাফতের বিরুদ্ধে মদীনা-বাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, ঐ সংবাদ এযিদ প্রাপ্ত হইয়া কুফায় এব্‌নে যেয়াদকে এই বলিয়া পত্র লিখিল যে, মন্‌যর-বিন্-যবির তোমার নিকট কুফায় গিয়াছে, তুমি পত্র পাওয়ামাত্র তাহাকে ধৃত করিয়া বন্দী কর; উহাকে কোনও ক্রমেই মদীনায় যাইতে দিও না। এব্‌নে যেয়াদ এযিদের প্রতি 'নাখোশ্' (অসন্তুষ্ট) ছিল, এজন্য স্বীয় বন্ধু মন্‌যর-বিন্-যবিরকে তাড়াতাড়ি মদীনায় রওয়ানা করিয়া দিল; আর এযিদকে পত্র লিখিল যে, আপনার পত্র পঁহুছিবার পূর্ব্বেই মন্‌যর মদীনায় রওয়ানা হইয়া গিয়াছে।

ওদিকে মন্‌যর মদীনায় পঁহুছিয়া আবল্লাহ্ বিন-হনজলাঃ ও আবদুল্লাহ্ বিন-মতিয়কে বলিলেন, তোমাদের পক্ষে উচিত, আলী-বিন্-হোছেন (এমাম যয়নাল আবেদীন [রাজিঃ]) এর হস্তে খেলাফতের বয়্‌য়েত করা। তদনুসারে মদীনার একদল প্রধান লোককে সঙ্গে লইয়া ইঁহারা

হজরত আলী-বিন্-হোছেন (রাজিঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে এ বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, এবং বলিলেন, আমার পিতা এবং পিতামহ, ইঁহারা উভয়েই এই খেলাফৎ লাভের চেষ্টায় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, এরূপ ক্ষেত্রে আমি ঈদৃশ 'খতরনাক' (ভয়াবহ) কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি না; আমি নিজেকে 'কতল' (হত্যা) করাইতে কোনও ক্রমেই ইচ্ছুক নহি। ইহা বলিয়াই তিনি মদীনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী এক পল্লীগ্রামে সপরিবারে চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে মদীনা বাসীদিগের মধ্যে মহা উত্তেজনার সঞ্চার হইল। মারওয়ান-বিন্-হকম-প্রমুখ বনু ওম্মিয়ার প্রধান প্রধান লোকদিগকে তাহারা বন্দী করিলেন। হজরত এমাম যয়নাল আবেদীন (রাজিঃ) মদীনার বর্ত্তমান অবস্থা দেমেশ্‌কে এযিদকে লিখিয়া পাঠাইলেন। এযিদ মদীনার অবস্থা অবগত হইয়া নওমান-বিন্-বশির আনছারী (রাজিঃ)-কে এই বলিয়া মদীনায় প্রেরণ করিলেন যে, তুমি যাইয়া মদীনাবাসীদিগকে বুঝাইয়া বল, তাহারা আমার বিরুদ্ধাচরণে ক্ষান্ত হউক। বিশেষতঃ তুমি আবদুল্লাহ-বিন্-হন্‌যলাঃ কেও এই বলিয়া উপদেশ দান করিও যে, তোমরা এযিদের নিকট গমন করিলে, এবং 'এন্‌য়াম' ও 'একরাম' ('বখ্‌শেশ্' ও পুরস্কারাদি) গ্রহণ পূর্ব্বক মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক এযিদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, লোকদিগকে এযিদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তাহার প্রতি কোফরের ফত্‌ওয়া জারী করিলে? তোমাদের এরূপ কার্য্য বুদ্ধিমত্তা এবং বীরত্বের পরিচায়ক নহে। তুমি আলী-বিন্-(এমাম) হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মিলিয়া মদীনাবাসীদিগকে গিয়া বল, তোমাদের 'ওফাদারী' (আনুগত্য—বিশ্বস্ততা) ও 'কার গোযারীর' (কার্য্য-কলাপের—কর্ত্তব্য নিষ্ঠার) পুরস্কার অবশ্যই দেওয়া যাইবে। বনু-ওম্মিয়ার যাহারা মদীনায় উপস্থিত

আছে, তাহাদিগকে এই কথা বলিবে, তোমরা কি এই টুকু কার্য্যও করিতে পারিলে না যে, যে দুই ব্যক্তি তথায় বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে, তাহাদিগকে 'ক্বতল' (হত্যা) করিয়া বিপ্লবের অবসান করে? নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ) এযিদের আদেশানুসারে এক দ্রুতগামিনী উষ্ট্রীতে আরোহণ করিয়া মদীনায় রওয়ানা হইয়া গেলেন; মদীনায় পঁহুছিয়া তিনি বিপ্লবানল নির্ব্বাপিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু ধর্ম্ম-প্রাণ মদীনাবাসিগণ সুরাপায়ী, ব্যভিচারী ও শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণকারী এযিদের খেলাফৎ কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। অগত্যা নওমান-বিন-বশির (রাজিঃ) বিফল মনোরথ হইয়া দেমেশ্‌কে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার পর এযিদ সেনাপতি মোছলেম-বিন্-যোক্বাঃ ও হছিন-বিন-নমিরকে মদীনায় পাঠাইয়া ঐ পবিত্র নগরীর অধিবাসীদিগকে কিরূপ ভাবে হত্যা করাইয়া ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

এযিদ মদীনা আক্রমণ জন্য মোছলেম-বিন্-য়োক্‌বাকে সসৈন্যে রওয়ানা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ওবায়দুল্লাহ্ এব্‌নে যেয়াদের নামে একখানি পত্র লিখিয়া, একজন 'ক্বাছেদ' (দূত) কুফায় প্রেরণ করিল। ঐ পত্রে লিখিত ছিল, তুমি স্বীয় অধীনস্থ সেনাদল লইয়া গিয়া মক্কা আক্রমণ কর; আর আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর 'ফেৎনাঃ' (বিপ্লব-মূলক কার্য্যের) মূলোচ্ছেদ কর। এব্‌নে যেয়াদ ঐ পত্র পাইয়া এযিদকে উত্তরে লিখিল, দুই কার্য্য আমার দ্বারা সম্পাদিত হইবে না। আমি (হজরত) এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর বধকার্য্য সম্পাদন রূপ এক কার্য্য করিয়াছি; এক্ষণে খানাঃকাবাঃ 'বিরান্' (ধ্বংস) করা কার্য্য আমার দ্বারা কিছুতেই সম্পাদিত হইবে না; আপনি ঐ কার্য্যের জন্য অন্য যাহাকে ইচ্ছা, নির্ব্বাচিত করুন। এস্থলে দেখা যায়, পাষণ্ড ওবায়দুল্লাহ্, হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামকে সদল বলে নৃশংস

ভাবে শহীদ করাইয়া, স্বীয় কুকার্য্যের বিষয় অনুভব করিয়া কতকটা অনুতপ্ত হইয়াছিল। নচেৎ তাহার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য দুর্দ্দান্ত দানবের পক্ষে মক্কা আক্রমণ করিতে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ এমাম ছাহেবকে শহীদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এযিদের নিকট হইতে কোনও পুরস্কার বা ধন্যবাদ লাভ করা দূরে থাকুক, বরং অবমানিত ও অপদস্থই হইয়াছিল। তাহার শাসনাধীন বিস্তৃত ভূভাগ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল; এবং তদ্‌ধীন সৈন্যসংখ্যা ও হ্রাস করা হইয়াছিল; এই সকল কারণে এযিদের প্রতি তাহার আদৌ সহানুভূতি ছিল না। যাহা হউক, এই ঘটনার পর এযিদ আর বেশী দিন বাঁচিয়া থাকে নাই; সুতরাং ওবায়দুল্লার প্রতি তাহার নূতন কোনও আদেশ জারী করিবার ও সুযোগ ঘটে নাই। এযিদের মৃত্যু, মোবিয়া-বিন্‌-এযিদের খেলাফৎ ত্যাগ এবং মৃত্যুর পর দেমেশ্‌কে খেলাফৎ সম্বন্ধে যে মতভেদ ও বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, যাহাতে একদল বনু-ওম্মিয়ার পক্ষপাতী হইয়া খালেদ-বিন্‌-এযিদকে খেলাফৎ প্রদানে ইচ্ছুক হইয়াছিল; তাহাদের প্রতিদ্বন্দী রূপে দেমেশ্‌কের মহা পরাক্রমশালী শাসনকর্ত্তা জোহাক-বিন্‌-কয়েছের পক্ষাবলম্বী একটি প্রবল দল, হজরত আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-যোবের (রাজিঃ)-এর খেলাফতের পক্ষপাতীত্ব প্রদর্শন করেন এবং দুই দলে যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হয়। খালেদ-বিন্‌-এযিদ মাঝে পড়িয়া আপাততঃ এই বিবাদ মিটাইয়া দেন। ঠিক ঐ সময় ওবায়দুল্লাহ্‌-বিন্‌-যেয়াদ কুফার শাসন-কর্ত্ত্ব হইতে বিতাড়িত হইয়া দেমেশ্‌কে আসিয়া পঁহুছে। উহার আগমনে বনু-ওম্মিয়ার সাহস অনেক বৃদ্ধি পাইল; এতদিন খালেদ-বিন্‌-এযিদের পক্ষেই বনু-ওম্মিয়ার নেতৃমণ্ডলী খেলাফতের দাবী করিতেছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কুচক্রী মারওয়ান-বিন্‌-হকম, নিজের খেলাফৎ লাভ সম্বন্ধে গোপনে যোগাড়-যন্ত্র করিতে ছিল; এবং বহু

সংখ্যক লোককে স্বীয় অনুকূল মতাবলম্বী করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে রূহ-বিন্-যন্বায় এক প্রকাণ্ড সভায় খালেদের তরুণ বয়স্কতা প্রদর্শন করিয়া মারওয়ানের অনুকূলে এক বক্তৃতা প্রদান করাতে, ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদের সমর্থনে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইল। তদনুসারে ৬৪ হিজরীর ৩রা যেল্কদ তারিখে "জাবিয়া" নামক স্থানে মারওয়ানের হস্তে বনু-ওস্মিয়া, বনু-কলব, গচ্ছান ও তয় সম্প্রদায়ের লোকেরা বয়্যেত করিল। আমরা এই স্থলে ওবায়দুল্লাহ্‌কে খেলাফৎ নির্ব্বাচন-ব্যাপারে একজন প্রধান পাণ্ডা রূপে দেখিতে পাইতেছি। ওবায়দুল্লাহ্ একজন প্রতিভা-শালী ও মহাশক্তিশালী বীর-পুরুষ এবং রাজনীতি-কুশল ব্যক্তি ছিল, সন্দেহ নাই। সে কুফা ও বস্রাবাসীদিগকে অতি কঠোর হস্তে শাসন করিয়া-ছিল; কিন্তু তাহার নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, গৌরব-লিপ্সা—সর্ব্বোপরি ধর্ম্মভাবের অভাব অত্যন্ত মারাত্মক ছিল। তাহার এই সকল মারাত্মক দোষের ফল যে সে অচির কাল মধ্যে হাতে হাতেই পাইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার শয়তানী ও পৈশাচিক কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিদান তাহার অদৃষ্টে এই দুনিয়াতেই ঘটিয়াছিল। হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের প্রতি তাহার এবং শেমর-যিল-যোশন-প্রমুখ পাপাত্মা-দিগের ঈদৃশ নির্দ্দয় ব্যবহারের কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মানুষ স্বার্থ লাভের জন্য যে এত দূর অন্ধ হইতে পারে, এবং ঈদৃশ পশ্বোচিত নির্ম্মম ব্যবহার করিতে পারে, ইহা কল্পনারও অতীত। শেষ জীবনে এব্নে যেয়াদ মোছলের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল; এবং ঐ স্থানেই তাহার ভীষণ পাপের ভীষণ প্রতিফল ভোগ করিয়া, চিরদিনের জন্য মোছলমানগণের অভিসম্পাতের পাত্র হইয়া আছে। মোখ্তারকে আল্লাহ্ তা-লা এই পাষণ্ডদলের যম স্বরূপ দুনিয়ায় অবতীর্ণ করিয়া-ছিলেন। উহারা সকলেই স্বকৃত ভীষণ পাপের ভীষণ প্রতিফল হাতে

হাতে পাইয়াছিল। উহাদের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইবার লোক পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিলেও, মোছলমানদিগের "লানত-মালামতের" ভয়ে তাহারা বোধ হয় আত্ম-পরিচয় দিতে অক্ষম। দুনিয়াতে যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন এই সকল হৃদয়হীন পাষণ্ড, অভিসম্পাতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে না। ওবায়দুল্লার প্রভাব ও প্রাধান্য বোধ হয় ৭।৮ বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী ছিল না।

তাজিয়াদারীর ইতিহাস।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যখন মোছলেম-জগতের খলিফা ছিলেন, এবং কুফা নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল; ঐ সময় তিনি একখানি 'কুরছি'তে (চেয়ার বা ঐ শ্রেণীর আসনে) বসিয়া খেলাফতের 'হুকুম-আহ্‌কাম' জারী, এবং বিচার কার্য্য সম্পাদন করিতেন; তাঁহার শাহাদৎ-লাভের পর ঐ আসন খানি তদীয় ভাগিনেয় ওম্মেহানী-বিন্তে-আবি তালেবের পুত্র, জায়দাঃ-বিন্-হবিবের নিকট ছিল। জায়দাঃ কুফা শহরেই বাস করিতেন। মোখ্‌তার কুফার শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া ঐ কুরছি খানির সন্ধান পাইলেন; এবং জায়েদাঃ কে ডাকাইয়া বলিলেন, ঐ কুরছি খানি আমাকে আনিয়া দাও। জায়দাঃ বলিলেন, আমাকে এক সপ্তাহের সময় দিন, আমি কুরছি খানি আপনাকে আনিয়া দিতেছি। উহা কোথায় পড়িয়া আছে, আমাকে সন্ধান করিয়া আনিতে হইবে। মোখ্‌তার বলিলেন, আমি তোমাকে ৩ দিনের বেশী সময় দিতে পারি না; ৩ দিনের মধ্যে তুমি যদি ঐ কুরছি আমার নিকট পঁহুছাইয়া

না দাও, তবে কঠোরতার সহিত, বলপূর্ব্বক তোমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করা যাইবে। জায়দাঃ তাহাতেই সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জায়দার মহাল্লায় এক তৈল-বিক্রেতার গৃহে ঠিক ঐরূপ একখানি কুরছি ছিল; জায়দাঃ সেই কুরছি খানি উহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইলেন; এবং অতি গোপন ভাবে উহা গৃহে আনয়ন করিলেন; অতঃপর উহা খুব পরিষ্কার করিয়া উহাতে মূল্যবান্ 'গেলাফ্' (আস্তরণ) চড়াইলেন; তৎপর অতি সম্মান সহকারে মোখ্তারের দরবারে নিয়া পঁহুছাইলেন। মোখ্তার ঐ নকল কুরছি খানি পাইয়া জায়দাঃকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন; এবং ভক্তি সহকারে সেই নকল কুরছি থানিকে 'বোছা' দিলেন (চুম্বন করিলেন)। আর উহা সম্মুখে রাখিয়া দুই রেকয়াত নফল নমায্ও পড়িলেন। অতঃপর স্বীয় ভক্ত-অনুরক্ত মুরীদদিগকে সমবেত করিয়া বলিতে লাগিলেন, যে প্রকারে খোদা তা'-লা 'বনি এস্রাইল' (এস্রাইল বংশীয়) দিগের জন্য "তাবুত ছকিনা" কে তাহাদের বিজয় লাভ ও বরকতের অবলম্বন স্বরূপ করিয়া ছিলেন, সেইরূপে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ভক্ত বৃন্দের জন্য এই কুরছি 'নেশানী' (নিদর্শন) স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে প্রত্যেক যুদ্ধে 'ফতেহ্' ও বিজয় লাভ হইবে। তদনুসারে তাঁহার মুরীদিগণ ঐ কুরছিতে চক্ষু মলিতে (আমর্ষণ করিতে) ও 'বোছা দিতে (চুম্বন করিতে) লাগিল; এবং উহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া, ও নতজানু হইয়া ভক্তি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। তৎপর মোখ্তার আদেশ প্রদান করিলেন, এক্ষণে একটি 'তাবুত' নির্ম্মাণ করা উচিত। তদনুসারে নানা কারুকার্য্য বিশিষ্ট একটি সুন্দর তাবুত প্রস্তুত করা হইল। ঐ তাবুতের ভিতর পরম যত্ন ও ভক্তি সহকারে ঐ উৎকৃষ্ট গেলাফ্ বিমণ্ডিত কুরছি খানি রাখা গেল। পরে 'চান্দি' (রৌপ্য) নির্ম্মিত একটি তালা উহাতে লাগাইয়া

উহার হেফাজতের জন্য লোক নিযুক্ত করা হইল। অবশেষে কুফার বিরাট জামেয় মছজেদে আনিয়া ঐ তাবুত খানি রাখা গেল। লোকেরা নমায্ পড়িবার পর ঐ তাবুত চুম্বন করিত। মোখ্তার কুফার শাসন-কর্তৃত্ব লাভের পূর্ব্ব হইতেই স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছিল। শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়া দিন দিন নিজের কারামত ও বোযর্গী জাহের (প্রকাশ) করিতে লাগিল। অবশেষে নবুয়তের দাবী করিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধঃপতনের পথ ও পরিষ্কার হইয়া আসিল। এমন একটি লোকের শোচনীয় অধঃপতনে হৃদয়ে অবশ্যই দারুণ আঘাত লাগে।

মোখ্তারের পরবর্ত্তী চালবাজী, আরব, পারস্য ও মেছেরের স্বীকৃত খলিফা হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) বুঝিতে পারিয়া, উপযুক্ত সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে স্বীয় ভ্রাতা মছয়ব-বিন্ যোবের (রাজিঃ)-এর অধিনায়কতায় বস্রা হইতে মোখ্তারের বিরুদ্ধে কুফাভিমুখে যাইতে আদেশ করিলেন। প্রধান সেনাপতি মছয়ব (রাজিঃ) তখন বস্রার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি মহলবকে আদেশ করিলেন, তুমি "জছরে আকবর" এ গিয়া সৈন্যদল সন্নিবিষ্ট কর ; আবদুর রহমান-বিন্-আথফ্কে কুফা শহরাভি-মুখে রওয়ানা করিলেন, এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, তুমি কুফায় পঁহুছিয়া গোপন ভাবে লোকদিগের নিকট হইতে হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর নামে বয়্য়েত গ্রহণ কর। এদিকে স্বয়ং যেয়াদ-বিন্-হছিন হতিম তমিমিকে অগ্রবর্ত্তী সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া মহাড়ম্বরে কুফাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 'ময়মনাঃয়' (দক্ষিণপার্শ্বে) ওমর্-বিন্-ওবেদুল্লাহ্-বিন্-ময়মরকে, আর 'ময়ছরায়' (বাম পার্শ্বে) মহলব-বিন্-আবি ছোফরাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং 'কলবে লশ্কর'—মধ্য অর্থাৎ সম্মুখ ভাগের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলেন,

এইরূপে তিনি মহাড়ম্বরে বস্রা হইতে কুফাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মোখ্‌তার যখন জানিতে পারিল যে, বস্রা হইতে তাহার বিরুদ্ধে একটি প্রবল অভিযান রওয়ানা হইয়াছে; তখন সেও যতদূর সম্ভব, সৈন্যদল সংগ্রহ পূর্ব্বক কুফা হইতে বাহির হইল। মহাবীর এব্‌রাহিম-বিন্‌-মালেক আশ্‌তর ঐ সময় কুফায় উপস্থিত ছিলেন না। ওবায়দুল্লাহ্‌-এব্‌নে যেয়াদের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি মওছল (মোসল)-এর শাসন-কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত ছিলেন। বস্রার সেনাদলের মধ্যে একদল ঐ সৈন্যও ছিল—যাহারা কুফা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক বস্রায় পঁহুছিয়া, হজরত মছয়ব (রাজিঃ)-এর সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। ঐ সেনাদলের সেনাপতি পদে মোহাম্মদ-বিন্‌-আল্‌-আশ্‌য়তকে নিযুক্ত করা হইল। বস্রার প্রচণ্ড সেনাদল অগ্রসর হইয়া "মদারা" নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে, মোখতারের সঙ্গে তাহাদের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল; উভয় দলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গেল; ভীষণ শোণিত পাতের পর অবশেষে মোখ্‌তার পরাজিত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক কুফা নগরে প্রবেশ করিল। সে 'কছরে এমারতে' (রাজ-প্রাসাদে) প্রবেশ পূর্ব্বক উহা খুব সুরক্ষিত করিয়া, তথায় আত্ম-রক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কুফী সেনাদল যখন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, ঐ সময় মোহাম্মদ-বিন্‌ আলাশয়ত ঐ পলায়মান সৈন্যদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; এবং ঐ পলায়মান সৈন্যদিগকে বহু-দূর পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া চলিলেন। মছয়ব-বিন্‌-যোবের (রাজিঃ) অগ্রবর্ত্তী হইয়া কুফার রাজ-প্রাসাদ অবরোধ করিলেন; এই অবরোধ কার্য্য কয়েক দিন পর্য্যন্ত চলিয়া ছিল; মোখ্‌তারের সঙ্গে ১০০০ লোক রাজ-প্রাসাদে অবরুদ্ধ ছিল; অবশেষে যখন রসদ ফুরাইয়া আসিল, লোক-দিগের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যের বিশেষ অভাব ঘটিল, তখন সে রাজ-প্রাসাদের দ্বার খুলিয়া জীবনান্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল; তাহার

সঙ্গিগণ তাহাকে এ বিষয়ে বাধা প্রদান করিয়া বলিল, মছয়ব (রাজিঃ)-এর নিকট জীবন-ভিক্ষা করিয়া রাজ-প্রাসাদের দরওয়াযাঃ খোলা হউক, আশা করা যায়, তিনি আমাদের জীবন রক্ষা করিবেন। কিন্তু মোখ্তার তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিল না। সে মস্তকে সুগন্ধি তেল মাথাইল, বস্ত্রে আতরাদি লাগাইল; এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রাজ-প্রাসাদের দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক শত্রুদলের সম্মুখীন হইল। এক সহস্র যোদ্ধৃপুরুষের মধ্যে মাত্র উনিশ জন মাত্র লোক তাহার সঙ্গে বাহির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; অবশিষ্ট লোকেরা রাজ-প্রাসাদেই রহিয়া গেল। মোখ্তার বাহির হইয়াই ভীষণভাবে অস্ত্র-সঞ্চালন করিতে লাগিল; কিন্তু কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর তরফাঃ ও তরাফ্-বিন্-আবদুল্লাহ্ বিন্-দজাজাহ্ থয়ফি নামক ভ্রাতৃ-যুগলের হস্তে নিহত হইল। ৬৭ হিজরীর ১৪ই রমজানুল মবারক মোখ্তার 'মক্তুল' (নিহত) হইয়াছিল। মোখ্তারের 'হামরাহী' (সঙ্গীয়) দিগের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ্ বিন্-আলী-বিন্-আবিতালেব ও নিহত হইয়াছিলেন।

অতঃপর কছরে এমারতস্থ অবরুদ্ধ লোকদিগকেও বন্দী করা হইল; ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধে পরাজিত লোকদিগের মধ্যেও বহুসংখ্যক যোদ্ধৃ-পুরুষ বন্দী হইয়াছিল। ইহাদের সকলকে কুফা নগরের এক প্রশস্ত ময়দানে আনয়ন করা হইল। ইহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত, মছয়ব (রাজিঃ) সেনাপতিদিগের নিকট এ বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেনাপতি মহলব-বিন্-আবি ছফ্রাঃ বলিলেন, ইহাদিগের সকলকেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; কিন্তু মোহাম্মদ-বিন্-আলাশয়ত এবং অন্যান্য কুফী সেনানিগণ মছয়ব-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-কে বলিলেন; আপনি কদাচ এই সকল লোকের জীবন রক্ষা করিবেন না। মছয়ব-বিন্-যোবের (রাজিঃ) হয়রান ছিলেন যে, এ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য। কুফী

নেতৃ-মণ্ডলী বলিতে লাগিলেন, এই বন্দী লোক গুলি মোখ্তারের হস্তে বয়্য়েত করিয়া কুফা নগরের এমন কোনও ঘর ছাড়িয়া দেয় নাই, যে গৃহের কোনও না কোনও লোককে হত্যা করা হইয়াছে। যদি এই লোক গুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে কুফার লোকেরা বিদ্রোহ উপস্থিত করিবে। এই বন্দী লোকদিগের সংখ্যা ছিল ৬০০০ ছয় হাজার; ইহাদের মধ্যে ৭০০ আরব, আর সকলে ইরাণী (পারস্যবাসী) ছিল। মছয়ব-বিন্-যোবের (রাজিঃ) অনেক চিন্তা করিয়া শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইহাদিগকে 'কতল্' (হত্যা) করাই উচিত। তদনুসারে ইহাদিগকে হত্যা করা হইল; সঙ্গে সঙ্গে কুফাবাসিগণ ও শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিন্তু এই সকল নিহত লোকেরা কারবালার ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংশ্লিষ্ট লোক-দিগেরই হত্যা সাধন করিয়াছিল, সে কার্য্য তাহাদের পক্ষে অসঙ্গত ছিল না; রাজ-নীতিক-চক্রে আজ তাহাদের হত্যা সাধন হইল।

মছয়ব (রাজিঃ) মোখ্তারের দুই হস্ত কাটাইয়া, কুফার জামেয় মছজেদের দ্বারদেশে তাহার মৃতদেহ লট্কাইয়া (ঝুলাইয়া) রাখিলেন। হোজ্জাজ-বিন্-ইউছফের শাসনকালের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ঐ মৃতদেহ তথায় ঝুলিতে ছিল। এইরূপে কারবালা-কাণ্ডের যবনিকা পতন হইল।

এরাকের কুফাঃ শহর।

হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ-কালে যখন পারস্যের রাজধানী "মদায়েন" ও অন্যান্য বহু নগর-নগরী বিজয়ী মোছলমানদিগের অধিকার ভুক্ত হইল, তখন পারস্য-বিজয়ী মহাবীর হজরত ছায়াদ-বিন্-

আবি ওক্কাছ (রাজিঃ), মহামান্য খলিফাকে পত্র লিখিলেন যে, মদায়েনের 'আব-হাওয়া' (জলবায়ু) আরবদিগের স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে ; ঐ সময় মদায়েনেই পূর্ব্বদেশ আক্রমণকারী মোছলমানদিগের প্রধান সামরিক আড্ডা (কেন্দ্রস্থল) ছিল। প্রধান সেনাপতি পত্রে ইহাও লিখিলেন যে, আব-হাওয়ার প্রতিকূলতা বশতঃ আরবদিগের 'রং-রূপ' (বর্ণ এবং সৌন্দর্য্য) ও বদলিয়া গিয়াছে। পত্র পাইয়া মহামান্য খলিফা উত্তর লিখিলেন, ছাউনীর জন্য এমন কোনও স্থান নির্ব্বাচন করুন, যে স্থান ফোরাত (ইউফ্রেটিস্) নদীর তটবর্ত্তী এবং যে স্থান শ্যামল বৃক্ষ লতাদি পূর্ণ ও স্বাস্থ্যকর হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে জল ও স্থল উভয় বিষয়ের পক্ষেই সুবিধা-জনক এবং অনুকূল হইতে পারে। মহামান্য খলিফার আদেশ ক্রমে প্রধান সেনাপতি হজরত ছায়াদ-বিন্ আবি ওক্কাছ (রাজিঃ)—ছোলেমান (রাজিঃ) ও হযিফাঃ (রাজিঃ)-কে উপযুক্ত স্থান-নির্ব্বাচন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা উভয়ে কুফার যমিনই এছলামী সেনাদলের বাসস্থানের জন্য মনোনীত করিলেন। " কুফাঃ " শব্দের অর্থ 'রেতিলি' (বালুকাপূর্ণ) ও 'কঙ্করিলী' (কঙ্কর পূর্ণ) ভূভাগ ; এই অর্থে এই নগরের নাম " কুফাঃ " রাখা হইয়াছিল। ইতিহাসবেত্তা দিগের অনেকের মতে ইহা ঐ স্থান—যে স্থান হইতে হজরত নোহ্ (আলাঃ) মহাজল-প্লাবনের সময় জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন। আবার আরব জাতির বিশ্বাস, যে সর্প বেহেশ্‌তে হজরত হাওয়া (রাঃ—আঃ)-কে ধোকা দিয়াছিল ; সেই সর্প রূপ শয়তান এই স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়। এই জন্যই বোধ হয় কুফাঃ নগর বাসীদিগের মধ্যে ধূর্ত্ততা, অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও দাগাবাযীর প্রভাব এত বেশী ছিল। প্রাচীন কালে (এছলামের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে) যখন নওমান-বিন্-মন্যর এরাকও আরবের অধিপতি ছিলেন ; তখন এই স্থানের নিকটে তাঁহার রাজধানী ছিল। নওমান বংশীয়দিগের বিশ্ব-

বিশ্রুত য়েমারত (প্রাসাদ) 'খোরনক্' ও 'ছদিরাঃ' প্রভৃতিও এই স্থানের আশ-পাশে অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত হয়। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম এবং ফোরাত নদী হইতে মাত্র দেড় মাইল পশ্চিম দিকে ইহা অবস্থিত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। আরবগণ এই স্থানকে " খদ্দল আয্রা " অর্থাৎ " আরেজে মহবুব " নামে অভিহিত করিত। কারণ, এইস্থান বিভিন্ন প্রকার আরবীয় কুসুম মালার আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ ; যথা ঃ—কাহ্ওয়ান, ককায়েশক্, কয়ছুম, ফরামী প্রভৃতি কুসুমদাম এই স্থানে আপনা হইতে জন্মিত। পরবর্ত্তী কালে এই বৃহৎ নগরটি এমনই প্রসিদ্ধি লাভ করিল যে, ফরাত নদীও কুফাঃ নামে অভিহিত হইতে লাগিল। স্থূলকথা, ১৭শ হিজরীতে এই নগরের 'বনিয়াদ' (ভিত্তি) স্থাপিত হয়। আর মহামান্য খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর নির্দ্দেশ অনুযায়ী ৪০ হাজার লোকের বাসোপযোগী করিয়া এই নগর প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ পরিমাণ লোকের বাসোপযোগী গৃহাবলীও প্রথমেই কুফা নগরে নির্ম্মিত হয়। হেইয়াজ্-বিন্-মালেকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন গোষ্ঠীও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের জন্য বিভিন্ন মহাল্লা (পাড়া—পল্লী) গঠিত হইয়াছিল। নগরের গঠন-প্রণালী ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন সম্বন্ধে মহামান্য খলিফার খাছ আদেশ-লিপি আসিয়াছিল। তীক্ষ্মদর্শী মহামান্য খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), রাজধানী মদীনা-তৈয়বায় বসিয়া নগরের নক্শা ঠিক এবং রাস্তা গুলির পরিসর ইত্যাদি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন ; সর্ব্ব প্রধান সাধারণ পথ গুলি ৪০ (৬০ ফুট) হাত চওড়া ছিল ; এই রোড্ বা ষ্ট্রীট্ গুলি স্থান বিশেষে ৩০ হাত এবং ২০ হাত প্রশস্তও রাখা হইয়াছিল। আর সাধারণ গলি পথ অর্থাৎ লেন গুলির পরিসর ছিল ৭ হাত। জামেয়-মছজেদ একটি চৌরাস্তার সঙ্গম স্থলে উচ্চ চবুতরার উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ মছজেদ এত বৃহৎ ও প্রশস্ত ছিল যে, ৪০ হাজার

লোক একত্রে উহাতে নমায্ পড়িতে পারিত। মছজেদের চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত 'খোলা যমিন' (উন্মুক্ত ভূখণ্ড—ময়দান) রাখা হইয়াছিল।

নগর-পত্তনের সময় গৃহাবলী প্রথমে ঘাস ও পাতার দ্বারা নির্ম্মিত হয়; কিন্তু যখন ঘন ঘন আগুণ লাগিয়া উহা ভস্মীভূত হইতে লাগিল; ঐ সংবাদ পাইয়া মহামান্ত খলিফা ইষ্টক, প্রস্তর ও মার্ব্বেল পাথরাদি দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদান করিলেন। উৎকৃষ্ট এমারতাদির মূল্যবান্ প্রস্তর ও কাষ্ঠ সকল মদায়েন রাজধানীর পরিত্যক্ত গৃহাবলী হইতে আনিয়া লাগান হইল—যেমন বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের ভগ্নাবশেষ হইতে ইষ্টক ও প্রস্তর রাজি আনিয়া নব-প্রতিষ্ঠিত রাজধানী মুর্শিদাবাদের বহু অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। বাজারের রাস্তাগুলি খুব সোজা (সরল) রাখা হইয়াছিল; এবং বাজারের ঠিক মধ্যস্থলে অতি সুন্দর " চওক " বিরাজ করিতেছিল। উহারই পার্শ্বে একটি 'আজিমশ্বান' (বিরাট—বিশাল) জামেয় মছজেদ উন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া, এছলামের গৌরব ঘোষণা করিতেছিল। মছজেদের বিপরীত দিকে 'মণ্ডি' (বণিক্‌দিগের কারবারের গৃহাবলী) নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহারই সম্মুখ ভাগে একটি সুবিস্তৃত 'ছায়েবান' (ছাদ-বিশিষ্ট খোলা গৃহ) প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহার দৈর্ঘ্য ছিল ২০০ হস্ত। " ছঙ্গে-রকাম " নামক প্রস্তরের থামের উপর উহার ছাদ নির্ম্মিত হওয়াতে, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিত। সম্রাট্ নওশেরওয়ানের হর্ম্ম্য ও এমারতাবলী হইতে এই সকল মুল্যবান্ প্রস্তর আনিয়া এই ছায়েবান নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এস্থলে একথাও প্রণিধাণ যোগ্য যে, এ সময় পরিত্যক্ত ও উৎসন্ন প্রাপ্ত মদায়েন রাজধানীর কেহ অধিকারী ছিল না, সুতরাং ইহার এমারত ও অট্টালিকাদির মালেক যদি কেহ ছিলেন, তিনি বিজয়ী খলিফা। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ সদ্বিচারক মহামান্ত খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), পারসিক প্রজাদিগের যমিন

ও পরিত্যক্ত গৃহাদির মূল্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক, "জরিয়া" নামক করে (ট্যাক্সে) উহা উসুল দিয়াছিলেন। জামেয় মছজেদ হইতে ২০০ হাত দূরে 'আয়ওয়ানে হুকুমত' (শাসনকর্ত্তার দরবার গৃহ ও বাসগৃহ বা রাজ-প্রাসাদ) নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহাতে 'বয়তুল-মাল' অর্থাৎ খাজানাঃখানাঃ (রাজকোষ বা সাধারণ ধনাগার) ও ছিল। আবার অতিথি-অভ্যাগত দিগের বাসের জন্য একটি 'আম মেহমান খানাঃ' (সাধারণ অতিথিশালা)ও নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহাতে বিভিন্ন দেশ হইতে আগত 'মোছাফের' (প্রবাসী) গণ বাস করিতেন ; 'বয়তুল মাল' (সাধারণ ধনাগার) হইতে তাঁহাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রধান সেনাপতি হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওক্কাছ (রাজিঃ) পারস্য দেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়া, ইরাণীদিগের ন্যায় অনেকটা আড়ম্বর প্রিয় ও শৌখীন খেয়াল সম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি স্বীয় বস-বাসের জন্য মহাজাঁক-জমক বিশিষ্ট একখানি বিরাট গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ঐ গৃহের 'দরওয়াযাঃ' (দ্বার) অতি 'আলীশান' (বিরাট—বিশাল) ছিল ; এই গৃহ-নির্ম্মাণের সংবাদ যখন মহামান্য খলিফার নিকট পঁহুছিল, তিনি ইহাতে এই বলিয়া বড়ই 'নারাজ' হইলেন যে, আরব জাতি আরবের সাদা-সিদে ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভিন্ন দেশের—ভিন্ন জাতির আড়ম্বর-প্রিয়তা ও বিলাসিতা অবলম্বন করিয়া, আপনাদের 'শোজাঃআনা' (বীরত্ব-ব্যঞ্জক) আদর্শ গুলি না বিসর্জ্জন দিয়া বসে। এজন্য সেনাপতি হজরত-ছায়াদ (রাজিঃ)-কে এই বলিয়া পত্র লিখিলেন যে, আমি জানিতে পারিলাম, আপনি স্বীয় বস-বাসের জন্য একটি 'কেলআ' (কেল্লা—দুর্গবৎ বৃহৎ অট্টালিকা) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জানিয়া রাখুন, উহা দোযখেরই একটি মহল। আমার 'কারকুন' (কর্ম্মচারী) হইয়া আপনি এরূপ আড়ম্বর পূর্ণ বিলাসিতার পরিচায়ক অট্টালিকায় বাস করিবেন—যেখানে গরীব 'মিছকিন'

ও 'মজলুম' (উৎপীড়িত) লোকেরা আপনার নিকট পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারিবে না—তাহাদের 'ফরিয়াদ' (অভিযোগ) আপনার কর্ণগোচর হইবে না। এমতাবস্থায় আপনার অধিকৃত বিশাল এলাকার চতুর্দ্দিকে অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়া যাইবে। তিনি শুধু এইরূপ পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন না— বরং মোহাম্মদ-বিন্-মোছলেমার নামে আদেশ-লিপি পাঠাইলেন যে, তুমি অবিলম্বে কুফা নগরে পঁহুছিয়া, প্রধান সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা ছায়াদ-বিন্-আবি ওক্কাছ (রাজিঃ)-এর নির্ম্মিত বিরাট অট্টালিকা অগ্নি দ্বারা পুড়াইয়া দাও, ও উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া ফেল। আমি ইহা 'পছন্দ' করি না যে, আমার 'আহেল্কার' (অধীনস্থ কর্ম্মচারী) এরূপ আড়ম্বর ও জাঁক জমক বিশিষ্ট বিশাল অট্টালিকায় বাস করে—যাহাতে প্রজা সাধারণের পক্ষে তাঁহার 'বারএয়াবি' (সাক্ষাৎ লাভ) সম্বন্ধে কষ্ট ও অসুবিধা ঘটে। আদেশ প্রাপ্তি মাত্রে মোহাম্মদ-বিন্-মোছলেমাঃ কুফায় পঁহুছিয়া, রাশিকৃত কাষ্ঠ ঐ গৃহের দরওয়াযার নিকট স্তূপীকৃত এবং উহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন ; হজরত ছায়াদ (রাজিঃ) আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপন বা উচ্চবাচ্য করিলেন না ; দেখিতে দেখিতে সেই বিরাট অট্টালিকা ভস্মীভূত হইয়া ভস্ম-স্তূপে পরিণত হইল। পরবর্ত্তী কালে দেখা গিয়াছে, হজরত ছায়াদ (রাজিঃ)-এর পুত্র ওমরু, দুর্জ্জয় পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া, হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, এবং তাঁহার শাহাদতের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু পরিণামে অতি শোচনীয় ভাবে নিজেও নিহত হইল।

কিছুদিন পরে একদা কুফার 'বয়তুল-মালে' (সাধারণ ধনাগারে) চুরি হইল। মহামান্য খলিফার দূরদর্শিনী জ্ঞান, প্রতিভা ও সুবন্দোবস্ত প্রভাবে সকল দেশের—সকল স্থানের ছোট বড় সংবাদ অচিরকাল মধ্যে তাঁহার হুজুরে পঁহুছিত ; কারণ তাঁহার নিযুক্ত অতি বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ গুপ্তচরগণ

সর্ব্বত্র বিরাজ করিত; এই চুরির সংবাদও অনতিবিলম্বে তাঁহার কর্ণ গোচর হইল। তিনি শাসনকর্ত্তা হজরত ছায়াদ (রাজিঃ)-কে পত্র লিখিলেন 'আয়ওয়ানে হুকুমত্' (শাসনকর্ত্তার কাছারী গৃহ) মছজেদের সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিন। তদনুসারে হজরত ছায়াদ (রাজিঃ) রোযিয়াঃ নামক একজন সুবিখ্যাত পারসিক 'মেয়মার' (স্থপত্য—ইঞ্জিনিয়ার) কে এই নূতন 'তায়মির' (নির্ম্মাণ) কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সে অতি দক্ষতা সহকারে রাজ-প্রতিনিধির দরবারগৃহ মছজেদের সঙ্গে মিলাইয়া দিল। এই মিলান কার্য্য অতি সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। হজরত ছায়াদ (রাজিঃ) এই পারসিক ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, ঐ সুদক্ষ স্থপত্যের সঙ্গে আরও কতিপয় কর্ম্মঠ পারসিক রাজমিস্ত্রিকে মহামান্য খলিফার নিকট মদীনা-তৈয়বায় পাঠাইয়া দিলেন। মহামান্য খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) এই সৌধ-শিল্পীর প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন; এবং তাহার রোযিনাঃ (দৈনিকবৃত্তি) নির্দ্দিষ্ট ও তাহার সঙ্গীয় স্থপত্যদিগকে সরকারী কর্ম্মচারী রূপে নিযুক্ত করিলেন। জামেয় মছজেদ ব্যতীত প্রত্যেক কেল্লার (দুর্গের) জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মছজেদ নির্ম্মিত হইল। প্রথমতঃ কুফাঃ নগরে যে সকল 'ক্বিলাঃ (জাতি—সম্প্রদায়) বসতি-স্থাপন করিল, তাহাদের সংখ্যা এইরূপ :—এমনের ১২ হাজার ও নযার নামক স্থানের ৮ হাজার অধিবাসী ছিল; অন্যান্য যে সকল জাতীয় লোক তথায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল, তাহাদের নাম এই :—বনি ছক্বিফ্, বনি হমদান, বনি বহিলাঃ, বনি হওয়াযন, বনি তগ্লব, বনি তমিম, বনি আছদ এবং আরও বহু সম্প্রদায়। ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের মধ্যে ১০৫০ জন এই নগরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে ২৪ জন 'বোযর্গ' (মহাত্মা) এরূপ ছিলেন, যাঁহারা বদর যুদ্ধে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। এই মহাত্মা-

দিগের দ্বারা কুফা নগরে হাদীছের রওয়ায়েত সম্বন্ধীয় আলোচনা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল; এই কুফার এক এক গৃহ হাদীছ ও রওয়ায়েতের 'দরছগাহ্' (মাদ্রাছা বা শিক্ষাগার) এ পরিণত হইয়াছিল। সোফিয়ান-বিন্-আফিনাঃ—যিনি 'আম্মাঃ হাদীছ' অর্থাৎ হাদীছ শাস্ত্র-বিদগণের মধ্যে অন্যতম পুরুষ, তিনি বলিতেন, পবিত্র হজ্জ্ কার্য্য সম্পাদন জন্য মক্কাঃ-মোয়াজ্জমা, 'কেরয়াত' (বিশুদ্ধভাবে কোরআন-পাঠ)-এর জন্য মদীনাঃ তৈয়বাঃ, আর হালাল-হারাম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ—অর্থাৎ ফেকাহ্ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য কুফা নগর 'মস্তনদ' (সনন্দ প্রাপ্ত)। এই শহর খলিফাঃ হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ-কাল মধ্যে উন্নতি, সম্মান ও গৌরবের এরূপ উন্নত শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল যে, ইহা " জময়তল আরব ", " হজ্জাল্লাহ্ ", " কানযল ঈমান ", " রাছল এছলাম" প্রভৃতি মহা গৌরব জনক নামে অভিহিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ এই শহরের লোকসংখ্যা অপ্রত্যাশিত রূপে বৃদ্ধি পাইতেছিল। ৪র্থ খলিফা হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহু ইহাকে স্বীয় 'দারুল-খেলাফতে' (খলিফীয় রাজধানীতে) পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নগরের বিশেষত্বঃ এই ছিল যে, ঔপনিবেশিকগণ প্রধাণতঃ আরব জাতীয় লোকই ছিল; অন্যান্য জাতীয় লোকের সংখ্যা খুব কমই দৃষ্ট হইত। ২৬৪ হিজরীতে আব্বাছ বংশীয় খলিফা ময়তমদ বিল্লাহের খেলাফৎ কালে যখন আলী-বিন্-যয়েদ উলুভীর বিদ্রোহ দমন করিবার পর খলিফার আদেশে এই নগরের লোকসংখ্যা গণনা করা হইল, তখন ৫০ হাজার ঘর কেবল রবিয় ও মযর সম্প্রদায়ের ও ২৪ হাজার ঘর অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তদ্ব্যতীত এমন বাসী ৬ হাজার ঘর অধিবাসী এই শহরে বাস করিত। সুতরাং এই নগরের ৮০ হাজার গৃহে (বাটীতে) কম বেশ অন্ততঃ ২ লক্ষ অধিবাসী বাস করিত। বোগদাদ নগর পত্তনের পূর্ব্বে এই নগরের

অধিবাসী সংখ্যা যে আরও অধিক ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর খেলাফৎ-কালে যখন ৬০।৭০ হাজার যোদ্ধ্-পুরুষ এই নগর হইতেই বাহির হইত, তখন ইহার লোক সংখ্যা বোধ হয় ৩।৪ লক্ষের কম ছিল না।

পরবর্ত্তী কালের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনে যদিও পূর্ব্ববর্ত্তী এমারতাদি অক্ষুণ্ণ থাকে নাই, তবুও ইহা 'তায়াজ্জবের' (আশ্চর্য্যের) বিষয় নহে যে, কোনও কোনও এমারতের 'নেশান' (চিহ্ন) সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত 'ক্বায়েম' (বিদ্যমান) ছিল। হিজরীর অষ্টম শতাব্দীর বিশ্ব-বিশ্রুত ভ্রমণ-কারী এব্‌নে বতুতাঃ স্বীয় সুবিখ্যাত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওক্কাছ (রাজিঃ) যে 'আয়ওয়ান' (প্রাসাদ) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহার 'বনিয়াদ' (ভিত্তি) এখনও বিদ্যমান আছে।

কুফার 'এল্‌মি হায়ছিয়ত' (বিদ্যালোচনার গৌরব) এই যে, আহ্‌লে ছোন্নত জমায়াতের 'মশ্‌হুর' (সুবিখ্যাত) এমাম—এবং ফেকাহ-শাস্ত্রের এমাম আজম হজরত এমাম আবু হানিফাঃ (রহঃ) এই নগরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফেকাহ্ হান্‌ফির ভিত্তি এই নগরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল। এমাম ছাহেব (রহঃ), স্বীয় প্রধান শিষ্য এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) ও এমাম কাজী আবু ইউছফ (রহঃ)-প্রমুখ মহা বিদ্বান্ পুরুষদিগের 'শরকতে' (সহকারিতায়) ফেকার যে 'মজলেছ' (সমিতি) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, উহা এই নগরেই বিরাজিত ছিল। 'ফণ নোহ্' এর (নোহ বিদ্যার—ব্যাকরণের) ভিত্তি ও প্রথমে এই নগরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আবুল আছওদ ও দুইলী এখানে বসিয়াই প্রথমে নোহ বিদ্যার 'ক্বওয়ায়েদ' (কায়দা বা প্রণালী) 'মজবুৎ' (দৃঢ়তর) করিয়া ছিলেন। 'কুফি খৎ' (কুফি ছাঁদের আরবী অক্ষর) এখানে বসিয়াই আরব পণ্ডিতগণ জারী করেন। হাদীছ, নোহ ও

আরবীর বড় বড় 'ফনের' (বিস্থার) আবিষ্কারকদিগের মধ্যে এব্রাহিম নখয়ী (রহঃ), হেমাদ (রহঃ), এমাম আবু হানিফাঃ (রহঃ), এমাম শাফেয়ী (রহঃ) প্রভৃতি, মোছলেম জগতে মহাপ্রাজ্ঞ ও মহা পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত। জগতে তাঁহাদের তুলনা নাই।

বর্ত্তমান সময়ে এই বৃহৎ নগরী উৎসন্ন প্রাপ্ত, জন-মানব শূন্য। ইহার বিপুল ভগ্নাবশেষ বোগ্দাদ হইতে ৮৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

নূতন কুফাঃ।

কুফার ধ্বংসাবশেষের নিকটেই একটি নূতন 'ক্ছবাঃ' (নগর) গড়িয়া উঠিতেছে—যাহা "নজফ্ আশরফ্" (যে নগরে হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর পবিত্র মযার শরীফ্ বিরাজিত) হইতে ৪।৫ মাইল মাত্র দূরবর্ত্তী। কাজেমীন ও বোগ্দাদ হইতে এই পর্য্যন্ত ট্রাম গাড়ী যাতায়াত করে। এই ট্রাম অশ্ব-চালিত, এবং গাড়ীগুলি দ্বিতল। নূতন শহরে নদীর তটে একটি নূতন বাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উপরে কুফার যে বিরাট জামেয় মছজেদের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে; তথায় আজকাল এক বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মছজেদের আজিমশ্বান "ছহন" (চাতান) মহামান্য খলিফা হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর 'দারুল এমারতাঃ' (আদালত বা কাছারী-গৃহ) রূপে ব্যবহৃত হইত। এখনও কাছারী গৃহের 'নেশান' (চিহ্ন) 'মওযুদ' (বর্ত্তমান) আছে। যে মেহ্রাব বা দরওয়াযার নিকটে তাঁহার হত্যাকারী আবদুর রহমান এব্নে মলজম তাঁহাকে তরবারির ভীষণ আঘাত করিয়াছিল, তথায় একখানি 'খোশনুমাঃ' (সুদৃশ্য) বাঙ্গলা নির্ম্মিত

হইয়াছে। হজরত মোছলেম (রাজিঃ) ও হজরত হানী (রাজিঃ)-এর পবিত্র সমাধি এই স্থানে পরস্পর সম্মুখ ভাগে (ছামনা-ছামনী) অবস্থিত। দুরাত্মা ওবায়দুল্লাহ-বিন্-যেয়াদ কর্ত্তৃক ইঁহারা যে অতি নৃশংসভাবে শহীদ হইয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক যাত্রী এই কবরদ্বয় যেয়ারত করিতে গমন করিয়া থাকেন। নব-প্রতিষ্ঠিত শহরের লোক সংখ্যা ১০ হাজার হইবে। ওছমানী আধিপত্যের শেষভাগে এই নব-গঠিত কুফা নগর ক্রমশঃ উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতেছিল। বর্ত্তমান এরাকী গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে সেই উন্নতি-স্রোত বোধ হয় অক্ষুণ্ণ আছে। বর্ত্তমান কুফা ও কারবালার মধ্যে আজকাল নৌকা-পথে যাতায়াত চলে। বর্ত্তমান সময়ে এই নগরে বরফের কলও স্থাপিত হইয়াছে। কুফা ও কারবালা নগর ফোরাত নদী ও নব খনিত 'নহর' (খাল) দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত।

কারবালা শহর ;

যে কারবালা-ক্ষেত্রে হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম সদল বলে, অতি শোচনীয় রূপে—নৃশংসভাবে শহীদ হইয়াছিলেন, আর তাঁহার পবিত্র দেহ পাপাচারী পিশাচগণের দ্বারা অশ্ব পদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল ; শাহাদতের ২।৩ দিন পরে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা আসিয়া এমাম আলায়হেচ্ছালামের সেই চূর্ণ-বিচূর্ণীকৃত দেহাংশ এবং অপর শহীদগণের দেহ সকল যথানিয়মে কবরস্থ করিয়াছিল। অধুনা ঐস্থানে একটি সুদৃশ্য বৃহৎ নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই শহর বেলায়েত বোদগাদে—

বর্ত্তমানে এরাক গবর্ণমেণ্টের অধীনে বোগদাদের ৬০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কারবালার সেই চির স্মরণীয় ময়দান বা বর্ত্তমান কারবালাঃ শহর হইতে ফোরাত নদী ২০ মাইত দূরে সরিয়া গিয়াছে। কারবালার-কাণ্ডের সময় নদী ঐ স্থানের ঠিক পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিত হইত। এই তেরশত বৎসরে উহা ক্রমশঃ চড়া পড়িয়া ২০ মাইল দূরবর্ত্তী হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে নদী হইতে একটি 'নহর' (থাল) খনন করান হইয়াছে। ঐ খাল "হিন্দিয়া" নামে অভিহিত। শহরের চতুর্দ্দিক ২৪ ফিট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। কারবালা নগর আজকাল একটি প্রধান বাণিজ্য-স্থান। ১৮৭৮ সালের গণনায় এই নগরের লোক সংখ্যা ৬০ হাজার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে লোক সংখ্যা আরও অনেক বাড়িবার কথা; সম্ভবতঃ এক্ষণে প্রায় ১ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় তীর্থ যাত্রীর সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে; শিয়াদিগের পক্ষে এই নগরী সর্ব্ব প্রধান তীর্থ স্থান। নজফ্ আশরফ এবং কাজেমীনে ও শিয়াদিগেরই আধিক্য। এই সকল পবিত্র নগরে শিয়া-প্রধান দেশ হইতে শিয়াদিগের মৃতদেহ লইয়া গিয়া দফণ করা হয়; তজ্জন্য এই সকল নগর প্রধানতঃ বিশাল "গোরস্থানে" পরিণত হইয়াছে। ভারতীয় বড় বড় শিয়াদিগের মৃতদেহ ও প্রধানতঃ কারবালায় সমাহিত হইয়া থাকে। গবর্ণরের বাসগৃহ যে বাজারের পথে অবস্থিত, ঐ স্থানের রাস্তা ঘাট অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দ্বিতীয় বাজারের রাস্তা ও গলি সমূহ সঙ্কীর্ণ। এই নগরে ৬টি খুব বৃহৎ জামেয় মস্জেদ বিদ্যমান। ইহার মধ্যে হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের কবর যে মছজেদে আছে, ঐ মছজেদ অতি 'শানদার' (আড়ম্বর ও শৌষ্ঠব পূর্ণ) ও বহু কারুকার্য্য বিশিষ্ট; উহার গুম্বজোপরিস্থ স্বর্ণ কলস সমূহ বহু দূর হইতে যাত্রীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতি বৎসর প্রায় ২ লক্ষ 'যায়েরীণ' (তীর্থযাত্রী

বা যেয়ারতকারী), যেয়ারতার্থে তথায় গমন করেন। কারবালা মোয়াল্লার যমিন (ভূমি) তেমন উৎকৃষ্ট ও উর্ব্বরা নহে; উহা মরুভূমি-সংশ্লিষ্ট অনুর্ব্বর স্থানই ছিল। বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ এবং অর্থব্যয়ে উহাতে সুন্দর বাগ-বাগিচাঃ তৈয়ার করা হইয়াছে। রওজাঃ শরীফের অভ্যন্তরস্থ কোব্বায় ছৈয়দশ্ শোহাদাঃ হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালাম ও তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র তরুণ যুবক ছৈয়দশ্ শোহাদাঃ হজরত আলী আকবর (রাজিঃ) এর কবর, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নির্ম্মিত আছে। কোব্বার বাহিরে হজরত হবিব-এব্‌নে মজাহেরের কবর ও স্বতন্ত্র ভাবে রহিয়াছে; কিন্তু ইঁহার স্বতন্ত্র কবরের অস্তিত্ব সন্দেহ জনক। অবশিষ্ট শহীদগণের মৃতদেহ একই কবরে দফণ করা হইয়াছিল। এখান হইতে ২ বা ৩ মাইল দূরে হজরত আব্বাছ 'আলমদার' (যুদ্ধের পতকাবাহী [রাজিঃ])-এর কবর বিরাজিত। এই কবর ও হজরত ছৈয়দশ্ শোহাদাঃ (রাজিঃ)-এর সমাধি-গৃহের অনুকরণে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নির্ম্মিত; কিন্তু ইহাতে শীশার (কাচের) কারুকার্য্য অতি মনোহর ও শোভনীয়। এই উভয় কবরের মধ্যস্থলে একটি নব-নির্ম্মিত সুদৃশ্য বাজার অবস্থিত। মিউনিসিপ্যালিটীর বাহিরে কতিপয় মিনার দৃষ্ট হয়; উহাতে ছোলতানতে ওছমানীয়ার বিবিধ ঘটনা যুক্ত প্রস্তর-ফলক আছে।

কারবালা মোয়াল্লার রওজাঃ মোকদ্দছ প্রথমতঃ ইষ্টক ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত মামুলী রকমের ছিল। কিন্তু মহা পরাক্রমশালী ওছমানীয় ছোলতান ছলিম—যাঁহার সঙ্গে পারস্যের শিয়া বাদশাহের সর্ব্বদা যুদ্ধ-হাঙ্গামা হইত; আর যিনি মেছের জয় করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন মেছেরের আব্বাছীয় খলিফাকে কিছু 'পেশ্‌কশ্‌' বা 'নজরানাঃ' প্রদান পূর্ব্বক খেলাফত গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইঁনি বড়ই দীনদার পরহেয্‌গার এবং খাদেমে-এছলাম ছিলেন। উল্লিখিত মহামান্য ছোলতান এই পবিত্র মযার শরীফ্‌কে অতি

সুদৃশ্য ভাবে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, এবং উহার চতুর্দ্দিকে বাজার বসান। তিনি আরবদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া উপরোক্ত নহর অর্থাৎ খাল খনন করাইয়া দেন। কারবালায় প্রবাদ আছে যে, ছোলতান ছলিম টাকা মাটীতে বিছাইয়া দিয়াছিলেন; আর তত্রত্য আরবদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা খাল কাটিয়া এই টাকা তুলিয়া লইয়া যাও। ইঁনিই হজরত ছৈয়দশ্ শোহাদাঃ ও হজরত আব্বাছ (রাজিঃ)-এর কবরের তত্ত্বাবধান জন্য একদল 'খাদেম' (তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করিয়া দেন। ঐ খাদেমদিগের বংশধর দিগের নিকট ঐ 'নেকনাম' ছোলতানের প্রদত্ত নিয়োগ-পত্র বা সার্টিফিকেট রহিয়াছে।

ওছমানীয়া খেলাফতের শেষভাগে—ছোলতান আবদুল হামিদ খানের ছোলতানতের শেষ অংশে, মহামতি কাজেম পাশা বোগদাদের গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইয়া আসিয়া, বাজার গুলিকে 'বা-কায়েদাঃ' (শৃঙ্খলাবদ্ধ) ও রাস্তা গুলিকে বেশ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। এখানকার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা কালেক্টর কিংবা ডেপুটী কমিশনারের পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, ইঁনি স্বয়ং কুলিদিগের সঙ্গে মিলিয়া কুলিদিগের ন্যায়ই কাজ করিতেন; এবং কঠোর পরিশ্রম করিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেন না। এই কার্য্যের বরকতে ইঁনি পরে বস্রার গবর্ণর নিযুক্ত হন। ইঁনি ভৃত্যাদিগের সঙ্গে থাকিয়া রাত্রিকালে স্বয়ং মযার শরীফের বাতিগুলি জ্বালাইতেন।

পরবর্ত্তী এক গণনায় নগরের গৃহ-সংখ্যা ৮০০০ ও অধিবাসী সংখ্যা ৮০ হাজার স্থিরীকৃত হইয়াছে; ইহাদের অধিকাংশই শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। এই নগরে ছাপাখানাও আছে, সেই প্রেস হইতে "আছর" নামক পারসী ভাষায় একখানি দৈনিক সংবাদপত্র বাহির হয়। শিয়াগণের বিশ্বাস, এই পবিত্র নগরে কবরস্থ হইলে তাহাদের 'নজাত' (মুক্তি) লাভ সুনিশ্চিত। ছৈয়দশ্ শোহাদার পবিত্র মযার শরীফের

নৈকট্য ও দূরত্বানুসারে তুর্কী ছোলতানতের সময় প্রত্যেক কবরের জন্ম দেড় গিনি হইতে ১২ গিনি পর্য্যন্ত মূল্য আদায় করা হইত। বর্ত্তমান এরাক গবর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, জানা যায় নাই। এই টাকা ওয়াক্‌ফ্‌ বিভাগে জমা হইত—যাহা হরমের মেরামত এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য কার্য্যে ব্যয় করা যাইত।

কারবালা মোয়াল্লার যেয়ারতের জন্য যখন আরব, পারস্য, সিরিয়া, মেছের ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হয়, তখন এখানে জিনিষ-পত্র ক্রয়-বিক্রয় যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। যে সকল কাফণের কাপড়ে দোওয়া-দরুদের ছাপ দেওয়া থাকে, উহা বহুল পরিমাণে বিক্রয় হয়। লোকে ঐরূপ কাফণের কাপড় বিস্তর ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া যায়। তছবিহ্‌ ও যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। ভারতীয় যাত্রিগণের পক্ষে করাচি হইতে জাহাজে বস্রা হইয়া তথায় যাওয়াই সুবিধা-জনক। যাহারা হেজাযের পথে গমন করেন, তাঁহারা মদীনা-তৈয়্যবাঃ হইতে রেলযোগে দেমেস্ক বা হলব হইয়া, মোটর যোগে বোগ্দাদের পথে কারবালায় উপস্থিত হইতে পারেন।

যাঁহারা পবিত্র হজ্জ্‌ কার্য্য সম্পাদন জন্য পবিত্র আরবস্থ হেজায্‌ ভূমিতে গমন করেন, তাঁহারা যদি অন্ততঃ শা'বান মাসের ১ম ভাগে এদেশ হইতে যাত্রা করেন, এবং পবিত্র রমজান শরীফ্‌ মক্কা-মোকার্‌রমায় অতিবাহিত করিয়া মদীনা-মনুওরায় যান; আর তথা হইতে হেজায্‌-রেলওয়ে যোগে বয়তুল মোকাদ্দছ ও দেমেশ্‌ক্‌ হইয়া মোটর যোগে বোগ্দাদ, কারবালা, কুফাঃ, নজফ্‌-আশরফ্‌, কাজেমীন ও বস্রার যেয়ারত কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক আবার ঐ পথে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং পবিত্র হজ্জ্‌ কার্য্য যথাসময়ে সম্পন্ন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তবে বেশ হইতে পারে। কিন্তু ইহা অর্থশালী লোকদিগের জন্যই সুবিধাজনক। পক্ষান্তরে

ঠিক ঐ সময়ে করাচি বন্দর হইতে এরাকে—বছ্রায় গমন পূর্ব্বক সমুদয় পবিত্র স্থানের যেয়ারত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, মদীনা-তৈয়বায় উপস্থিত হইলে, এবং তথাকার যেয়ারত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মক্কা-মোয়াজ্জমায় গমন এবং হজ্জ্ কার্য্য সম্পন্ন করিলে, যথা সময়ে জেদ্দার পথে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, ইহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যাত্রীদিগের পক্ষে সুবিধাজনক। ইহাতে ৫টি মাস সময় অতিবাহিত হয়। এরাক, শাম ও 'ফলস্তিন'—প্যালেষ্টাইন (বয়তুল-মোকদ্দছ)-এর জেয়ারত কার্য্য করা অতি পুণ্যানুষ্ঠান। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের নওয়াব, আমীর-ওমরাহ, জমীদার-তালুকদার-ছওদাগর প্রভৃতি অর্থশালী লোকেরা হজ্জের ফরজ আদায় করিতে নিতান্তই কুণ্ঠিত; অথচ নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ এবং বিলাস-ব্যসন জনক বেহুদা কাজে অজস্র অর্থ অপব্যয় করেন। তাঁহারা পবিত্র হজ্জ্ কার্য্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল পবিত্র স্থানের যেয়ারত কার্য্য সম্পন্ন করিলে একদিকে 'ছওয়াব্ হাছেল' (পুণ্যলাভ), অন্য দিকে ভ্রমণ-জনিত সুখভোগ ও স্বাস্থ্য-সম্পদ লাভ করিতে পারেন।

হজরত এমাম হোছেন আলায়-হেচ্ছালামের 'ছের মবারক' (পবিত্র মস্তক)।

হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের পবিত্র মস্তক, এমাম জয়নাল আবেদীন (রাজিঃ), দেমেশ্ক্ হইতে মদীনায় লইয়া আসিয়াছিলেন, ইহা ত বিভিন্ন রাবি ও বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়;

কিন্তু উহা কোথায় দফণ করা হইয়াছিল, একথা সুস্পষ্ট রূপে জানা যায় না। মেছেরের রাজধানী 'কায়রো' (আল্-কাহেরা) শহরে তাঁহার পবিত্র মস্তক দফণ হইয়াছিল বলিয়া কথিত ; এবং সেই স্থলে এক অতি বিরাট ও সুদৃশ্য জামেয়-মছজেদ বিরাজ করিতেছে। বিভিন্ন দেশের অসংখ্য মোছলমান যাত্রী গিয়া সেই পবিত্র মযার শরীফ্ যেয়ারত করিয়া থাকেন। ছের মবারক কিরূপে মেছেরে নীত হইল, তাহার প্রমাণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ নীরব। হজরত এমাম যয়নাল আবেদীন (রাজিঃ), স্বীয় ওয়ালেদ-মাজেদের পবিত্র মস্তক মদীনা তৈয়বায়, তাঁহার মহামাননীয়া দাদী আম্মা ও জ্যেষ্ঠ চাচ্চার পবিত্র কবর শরীফের পার্শ্বে কেন দফন করাইলেন না ; ইহার কোনও কারণ উপলব্ধি করা যায় না। যেখানে তাঁহার পিতার নানাজানের— হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত জনাব রছুলে আকরম (ছালঃ)-এর পবিত্র রওজাঃ মবারক বিদ্যমান, যে পবিত্র নগরী তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যের জন্মভূমি, সেই নগরে ছের মবারক দফণ না করিয়া বহু দূরবর্ত্তী মেছেরে কেন পাঠাইলেন, আর কে তাহা সেখানে লইয়া গিয়াছিলেন, ইহা একটি প্রহেলিকাময় ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। অগত্যা মেছের—কায়রো শহরে তাঁহার ছের মবারক কবরস্থ হইয়াছে বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে।

গ্রন্থকারের শেষ প্রার্থনা।

আমরা এই স্থলেই হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের জীবনী এবং পাক পাঞ্জতনের পূত জীবন-কাহিনী শেষ করিলাম। এক বিশাল দুর্লঙ্ঘ্য সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম বলিয়া আজ পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। জীবনের শেষ ভাগে—এই ভগ্নদেহে, ঈদৃশ

বিরাট কার্য্য যে সমাধা করিতে পারিব, সে ভরসা বড় ছিল না। জনাব হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) ও পাক পাঞ্জতনের দোওয়ার বরকতে আমার এই চেষ্টা ও সাধনা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে ; এজন্য আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নামে লক্ষ লক্ষ দরুদ ; আর মহামান্য আহ্‌লে বয়েত ও ছাহাবা কারামের পবিত্র রূহের প্রতি সংখ্যাতীত ছালাম জ্ঞাপন করিতেছি। হে দয়াময় আল্লাহ্‌, জল্লশানহু! তুমি তোমার প্রিয় নবীর ওছিলায় মোছলমান-দিগের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল বিধান কর। আহ্‌লে বয়েত ও শহীদানে কারবালার আত্মত্যাগ ও শাহাদৎ-প্রাপ্তির বরকতে এবং পুণ্য ফলে সমগ্র মোছলমান জাতির মঙ্গল বিধান কর ; তাহাদিগকে সৎপথের পান্থ কর ; তাহাদিগকে সর্ব্ব-প্রকার পাপ কার্য্য হইতে বিরত ও বিমুক্ত রাখ। আর পাক পাঞ্জতনের অতুলনীয় পবিত্র আদর্শ সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক তাহারা যাহাতে আদর্শ মোছলমান রূপে দুনিয়াতে বিরাজ করিতে পারে, তাহার 'তওফিক' প্রদান এবং ব্যবস্থা কর। সর্ব্ব-প্রকার পাপাচার, স্বার্থ-পরতা, কুটিলতা, পরানিষ্ট সাধন-স্পৃহা ও শয়তানের 'পয়রবি' হইতে ওম্মতে মোহাম্মদীকে রক্ষা কর। পবিত্র শরা-শরিয়তের অনুগামী হইয়া প্রত্যেক মোছলমান যাহাতে জন্নত (বেহেশ্‌ত্‌) বাসের, এবং তোমার পবিত্র দীদার লাভের অধিকারী হইতে পারে, হে দয়াময় আল্লাহ্‌! তুমি তাহার উপায় বিধান কর। এছলামের জন্য আত্মোৎসর্গের শক্তি তাহাদিগকে দাও। তুচ্ছ পার্থিব লোভের বশবর্ত্তী করিয়া তাহাদিগকে পরকালের ভীষণ আঁধারে নিপাতিত করিও না।

হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের শাহাদত-ব্যাপার পৃথিবীর মোছলমানদিগের পক্ষে একটি হৃদয়-বিদারক শোচনীয় ঘটনা ; পক্ষান্তরে একটি মহান্ শিক্ষণীয় বিষয়। এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার অধিবাসী ও প্রবাসী মোছলমান মাত্রেই প্রতি বৎসর মোহর্‌রম মাসে

একবার ইঁহাদের জন্য শোক-প্রকাশ করিয়া থাকেন। আবার শাহাদতের দিবস—অর্থাৎ ১০ই মোহর্‌রম আশুরার দিন শোক প্রকাশের প্রধান স্মৃতি-দিবস। কিন্তু এই উপলক্ষে নানাদেশে—বিভিন্ন জাতীয় মোছলমানদিগের মধ্যে নানাপ্রকার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বেদয়াত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পারস্যদেশবাসী শিয়াদিগের বেদয়াত-অনুষ্ঠান চির প্রসিদ্ধ। সেই অনুকরণে ভারতবাসী শিয়াগণও নানাপ্রকার বেদয়াত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেবল তাহারাই নহে—ভারতীয় ছুন্নী মোছলমানগণের এক প্রকাণ্ড দল এই উপলক্ষে যে সকল বেদয়াত ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেয়, তাহা অধিকতর লজ্জা-জনক পাপানুষ্ঠান। তাহাদের সেই অস্বাভাবিক ও উদ্ভট নর্ত্তন-কুর্দ্দন, তাজিয়াদারী, "হায় হোছেন—হায় হোছেন" বলিয়া উচ্চ চীৎকার ও উৎকট তাণ্ডব বড়ই হৃদয় বিদারক ব্যাপার। কোথায় শাহাদত-প্রাপ্ত মহাত্মাদিগের নামে কোরআন শরীফ ও দোওয়া দরুদ পাঠ এবং নফল নমায্ পড়িয়া, উহার ছওয়াব তাঁহাদের পবিত্র রূহের প্রতি বখ্‌শিয়া দিবে; রোজা রাখিয়া, দান-খয়রাত করিয়া ও দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইয়া তাহার পুণ্য শহীদ মহাত্মাদিগের রূহের উপর অর্পণ করিবে; নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিবে; তাঁহাদের পবিত্র জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া নীরবে শোক প্রকাশ করিবে; তাঁহাদের পবিত্র আদর্শ সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক আপনাদের চরিত্র গঠন করিবে; পবিত্র এছলাম ধর্ম্ম-রক্ষার্থ আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা করিবে; এবং স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে ঐ পুণ্য-কাহিনী শুনাইয়া ধর্ম্মের নামে আত্মাহুতি প্রদানে অনুপ্রাণিত করিবে; অনবরত দরুদ শরীফ পাঠ করিবে; এতিম বালক-বালিকাদিগের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া স্নেহ ও করুণা প্রদর্শন করিবে; মোছলমানদিগকে শরবৎ পান করাইবে; খিচুড়ি বা অন্ন ও রুটি ইত্যাদি খাওয়াইবে; বিশেষতঃ আশুরার পূর্ব্ব রজনীতে নির্দ্দিষ্ট নফল নমায্ সকল পড়িবে, এবং পরম করুণাময় খোদা

তা-দার দরগায় গিরিয়া ও জারি করিতে থাকিবে; পবিত্র এছলাম ধর্ম্মের অনন্ত গৌরব এবং সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার্থ কিরূপে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত করিবে; তাহা না করিয়া নানাপ্রকার 'বেহুদা হরকৎ', শোক-গাথা বা 'মরছিয়া' পাঠ করা, আগুণের লুক (মশাল) জ্বালাইয়া অগ্নি-ক্রীড়া করা, বাদ্য-বাজনা করা, পরস্পরের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মারামারি করা—এমন কি মদ ও তাড়ি প্রভৃতি নেশা পান করা কতদূর ভীষণ পাপানুষ্ঠান, তাহা একবারও স্মরণ করে না। এই সকল পাপানুষ্ঠানে তাহারা অজস্র অর্থব্যয় করিয়া থাকে। সুখের বিষয়, বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামে এই সকল বেহুদা অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব অধুনা নাই বলিলেই চলে। কলিকাতা, ঢাকা, মুরশিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি বড় বড় শহরে, বড় বড় কল-কারখানার শ্রমজীবী দিগের মধ্যে—বিশেষতঃ হিন্দুস্থানী ও বিহার প্রদেশীয় এবং খাছ শহরবাসী লোকের মধ্যে এই সকল বেদয়াত আজিও পূর্ণভাবে বিরাজিত।

কিন্তু এই মহর্‌রম উপলক্ষে লাঠি ও তরবারি খেলা, তীর ও গুলেল বাঁশের লক্ষ্য ঠিক করা, ডন ও কুশ্‌তি-কছরত প্রভৃতি বীরত্বাভিনয় করা বর্ত্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এটুকু না করিলে মোছলমানদিগকে ভবিষ্যতে বড়ই বিপন্ন হইতে হইবে।

মোনাজাত।

রহমান রহিম আল্লা, জলিল জব্বার রব।
তব সৃষ্ট আকাশ ও চন্দ্র সূর্য্য আদি সব॥
গ্রহ-উপগ্রহ তারা, সাগর পাহাড় যত।
ধূমকেতু উল্কাপিণ্ড, আদি নাম কব কত॥

বৃক্ষ লতা তৃণ গুল্ম, ফেরেস্তা ও জেন নর।
গো-মহিষ মেষ ছাগ, সিংহ ব্যাঘ্র কি বানর॥
মৃত্তিকা ও বায়ু পানী, সুবিশাল মরুভূমি।
হে করিম! এ সবার একমাত্র স্রষ্টা তুমি॥
সকলের স্রষ্টা তুমি, অনাদি অনন্ত প্রভু।
জন্ম নাই মৃত্যু নাই, বিশ্রাম নাহিক কভু॥
শ্রান্তি ক্লান্তি শূন্য প্রভু, নহ পুত্র নহ পিতা।
নিরাকার নির্ব্বিকার জাহানের স্থাপয়িতা॥
জ্ঞানের ভাণ্ডার তুমি করুণার মহাসিন্ধু।
সবাকার হিতকামী তুমিই প্রকৃত বন্ধু॥
সৃষ্ট মধ্যে শ্রেষ্ঠ তব, নুর-নবী মোহাম্মদ (ছালঃ)।
সর্ব্বগুণে গুণান্বিত, অনুপম শ্রদ্ধাস্পদ॥
তোমার প্রথম সৃষ্ট, নবী মধ্যে তিনি শেষ।
তিনি সর্ব্ব নবী শ্রেষ্ঠ, সন্দেহের নাহি লেশ॥
পাপ-পূর্ণ ধরা মাঝে, গড়িলেন ধর্ম্ম রাজ্য।
অতুল তাঁহার শক্তি, অনুপম তাঁর কার্য্য॥
ঘোষিলেন মহাতেজে, তৌহিদের মহাবাণী।
তাঁর শিষ্যগণ ছিল, জ্ঞান রাজ্যে মহাজ্ঞানী॥
কোরাণ নাজেল কৈলে, সেই ত নবীর প্রতি।
যাহার তুলনা নাই, ওহে জগতের পতি!
অনন্ত রত্নের খনি, অই যে কোরাণ খানি।
ওহে মহাপ্রভু তব, অমীয় পবিত্র বাণী॥
খোল্‌ফায়ে রাশেদীন, আর আছহাবগণ।
আদর্শ মানব তাঁরা, আদর্শ ধার্ম্মিক জন॥

ফাতেমা নবীর কন্যা, নারী মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা।
স্বর্গের সম্রাজ্ঞী তিনি, নাহিক তাঁর উপমা॥
জামাতা হজরত আলী, শেরে খোদা মহামতি।
বীরত্বে অতুলনীয়, ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি॥
ধর্ম্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি নবীর দুইটি নাতি।
ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিতেন দিবারাতি॥
শহীদের অগ্রগণ্য ইঁহারা দুইটি ভাই।
ছারে জাহানের মাঝে এঁদের তুলনা নাই॥
দরুদ তাঁহার প্রতি, বহুত ছালাম আর।
তিনি বিনে ওম্মতেরে তরাইতে শক্তি কার?
হে পরোয়ার দেগার, ওহে আল্লা দয়াময়!
তোমার দীদার যেন, সবার নছীব হয়।
লেখকের পিতা মাতা আর ভাই বন্ধুগণ।
তোমার করুণা লাভে যেন না বঞ্চিত হন॥
প্রকাশক—মালেকের আত্মীয়-কুটুম্বগণ।
পিতা মাতা আর যত বান্ধব কিম্বা স্বজন॥
সবাকার তরে আল্লা দিও মুক্তি ও নাজাত।
দুই হাত তুলে এই করিতেছি মোনাজাত॥